আর্-রাহীকুল মাখতূম

বা

মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা



শায়খুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রঃ)

www.islamiboi.wordpress.com

আর-রাহীকুল মাখতূম

বা

মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা

[বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বিশ্বখ্যাত জীবনী গ্রন্থ)

১৯৭৮ সালে রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী আয়োজিত নবী ﷺ-এর জীবনীর উপর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী স্মারক গ্রন্থ

[লেখককর্তৃক সম্পাদিত ১৯৯৪ সালের বর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণের আলোকে মুদ্রিত]

মূল

শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)

সাবেক অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ

আবদুল খালেক রহমানী

সাবেক উপাধ্যাক্ষ, কামারখন্দ সিনিয়র মাদরাসা, পাবনা

মুয়ীনুদ্দীন আহমাদ

প্রভাষক, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি কলেজ, রাজশাহী

ভাষা সম্পাদনা

সাইফুদ্দীন আহমাদ

অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

email : tawheedpp@gmail.com

আর-রাহীকুল মাখতূম বা মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা
শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহ.)

মূল প্রকাশক : ফাইজুর রহমান (লেখকের বড় ছেলে)
হোসাইনাবাদ, পো: মুবারকপুর
জেলা : আজমগড়, ইউ.পি.

প্রকাশনায় :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০
ফোন : 7112762, 01190368272, 01711646396
ইমেইল : tawheedpp@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব (©) :

এ বইয়ের সকল ভাষার সংস্করণ লেখকের উত্তরাধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। কোন ভাষাতেই এ বইয়ের অনুবাদ তাদের বিনা অনুমতিতে ছাপানো ও প্রকাশ করা অনৈতিক, অবৈধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল সালাফী
ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী
আবদুর রব আফফান

প্রথম সংস্করণ (বাংলাদেশ) : রমাযান ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

ISBN : **978-984-8766-06-4**

মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : চারশত টাকা মাত্র।

AR-RAHEEQ AL- MAKHTUM [The Sealed Nectar] by : Shaikhul Hadith Allama Safiur Rahman Mubarakpuri Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah sarkar lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01711646396, Email : tawheedpp@gmail.com. © : All Rights Reserved by the Author. Price 400 Taka Bangladeshi. 45 Saudi Riyal. 10 U$

Email : tawheedpp@gmail.com. © : All Rights Reserved by the Author. Price 380 Taka Bangladeshi. 45 Saudi Riyal. 10 U$

সতর্কীকরণ

বাংলাদেশে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কপি রাইট আইন **লঙ্ঘন করে** মূল লেখকের অনুমতি ছাড়াই অনুবাদ **করে অথবা** মূল লেখকের তত্ত্বাবধানে অনূদিত বাংলা **সংস্করণের** কপি কিছুটা রদবদল করে অনৈতিক ও অবৈধভাবে প্রকাশ ও বিক্রয় করে আসছে। **যেহেতু বইটির বাংলা অনুবাদ মূল লেখকের তত্ত্বাবধানেই ১৯৯৬ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সেহেতু দ্বিতীয়বার এ বইয়ের বাংলা অনুবাদের প্রশ্নই ওঠে না।** অবিলম্বে এহেন অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আশাকরি কারো হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবেন এবং এটি মুদ্রণ হতে বিরত থেকে আপন আপন প্রকাশনার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন।

সুবিবেচক পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ, আশাকরি মূল রাইটাইরের হক বিনষ্টকারী অবৈধভাবে প্রকাশিত আররাহীকুল মাখতূমের কোন সংস্করণ ক্রয় করবেন না। **তাওহীদ পাবলিকেশন্সকে** শুধুমাত্র এর বাংলা সংস্করণটি ছাপানোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম প্রকাশকের নিবেদন .

শায়খ সফিউর রহমান মুবরাকপুরী (রাহি.) ১৯৭৮ সালে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনী লিখে প্রথম পুরস্কার (সে সময় আনুমানিক দেড় লক্ষ ভারতীয় টাকা) অর্জনের এক দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হন, তখন আমি বাংলাতেই পড়াশুনা করতাম। পরে সৌভাগ্যক্রমে 'জামি'আহ সালাফিয়্যাহ' বেনারসে পড়তে যাওয়ার সুযোগ ঘটে এবং এ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের শিষ্যত্ব অর্জন করে ধন্য (১৯৮০ হতে ১৯৮৬ পর্যন্ত) হই।

তিনি মূল আরবী গ্রন্থটি উর্দুতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ১৯৮০ সালে। এ বইয়ের বাংলা অনুবাদের জন্য তিনি সে সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক জনাব ড. মুজীবুর রহমানকে অনুমতি দান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনাব ড. মুজীবর রহমান সাহেব নিজ কর্মব্যস্ততার দরুন এ গুরুদায়িত্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রভাষক জনাব মুয়ীনুদ্দীন আহমাদ-এর উপর অর্পণ করেন। তিনি মূল বইয়ের প্রায় ১/৩ অংশ অনুবাদ করার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করে দেন। পরিশেষে এ অনুবাদের কাজে হাতে লাগান কামারখন্দ সিনিয়র মাদ্রাসার উপাধ্যাক্ষ জনাব আব্দুল খালেক রহমানী। তিনি কৃতিত্বের সাথে এ কাজটি সমাধা করেন।

অনুবাদ শিল্প খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর। উভয় ভাষায় পারদর্শী না হলে মূল ভাবধারা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় যথাযথ জ্ঞান ও যোগ্যতা না থাকলে তাতে সাহিত্য রস সৃষ্টি করা ও তার লালিত্য বজায় রাখা শুধু কঠিনই নয়, দুঃসাধ্য কাজ। সেহেতু এ অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা সম্পাদনার গুরুভার গ্রহণ করেন পি.টি. আই রাজশাহীর প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জনাব সাইফুদ্দীন আহমাদ। অন্যের অনুবাদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য তিনি স্বাধীনভাবে সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণা করতে পারেন নি। বরং তাঁকে অনেক স্থানে ভাব উদ্ধারের জন্য বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এ বইয়ের গুরুত্ব ও মূল্য যে কতটা তা পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারবেন ইন্‌শাআলাহ, যদি মূল বই আরম্ভ করার আগে এর ভূমিকা ও পূর্বকথা সমূহ পাঠ করেন। তবে আমাদের দেশে সহজলভ্য যত জীবন চরিত আছে তাতে বিশুদ্ধ ও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার খুব সামান্য চেষ্টাই গ্রহণ করা হয়েছে। লেখকমণ্ডলী ভক্ত হিসেবে বিশুদ্ধ-অশুদ্ধ তথা সহীহ-যঈফ যে কোন তথ্য পেয়েছেন যাঁচাই না করে সেটাকেই বইয়ের পাতায় সাজিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। পরিণাম স্বরূপ আমরা পেয়েছি বুজুর্গানে দ্বীনদের নামে শির্ক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। কবর পূজা, তাযিয়া পূজা, ঈদ মীলাদুন্নবী সহ অগণিত শরীয়ত বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের রমরমা। আর এগুলোকেই আসল দ্বীন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমি মাওলানা আকরাম খাঁর (রাহি.) *'মোস্তফা চরিত্র'*-এর ভূমিকার অংশ বিশেষ এখানে তুলে না ধরে পারছি না।

তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক হিসেবে (ভক্তের হিসেবে নহে) জগতের সাধু সজ্জন ও মহাপুরুষগণের জীবন ও চরিত্র আলোচনার চেষ্টা করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিংবদন্তি সংকলক ঐতিহাসিক এবং অন্ধ ভক্ত লেখকগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবন ও জীবনের আদর্শাস্থানীয় আসল বিষয়গুলো হয়ত একেবারে ঢেকে গেছে। অথবা এমন পর্বত পরিমাণ ও অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জনারাশির নিচে তাহা চাপা পড়ে গেছে। যার উদ্ধার একেবারে অসাধ্য না হইলেও সহজসাধ্যও নহে। মানুষের দেহের মতো তার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলোও খুব বাবু। এ বাবুগিরির খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক, স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা, অসত্যের পুঞ্জীকৃত ন্যাক্কারজনক আবর্জনারাশির নিম্ন হইতে সত্যের উদ্ধার সাধন করার জন্য, পরিশ্রম স্বীকার করতে বড় একটা চায় না। এ সহজ মানসিকতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গাড়ী-পাল্কীগুলোতে চড়ে পরম আনন্দে গা দিয়ে শুইয়া পড়ে। এটা মানবীয় দূর্বলতার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা- এ সব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাঁহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়ে গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয় কুল রক্ষা করার জন্য কিছু আজগুবি, অনৈতিহাসিক গল্প গুজব এবং কিছু অলৌকিক ও

অস্বাভাবিক উপকথার আবিস্কার করেন এবং সেগুলোর মধ্য দিয়া মহাপুরুষের নামে জয়জয়কার করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে এ সব কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেস্সা কাহিনী। মহাপুরুষগণের জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে দূরে সরাইয়া দিয়া, ইতিহাস ও পুরাণ-পুস্তক সমূহের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অধিকার জমাইয়া বসে। কালক্রমে তা 'শাস্ত্র' হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলো সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কেউ কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোন কথা বলে উদ্ধার পাবার আশাও এক্ষেত্রে খুবই কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করে, এমন কি মূল শাস্ত্রগ্রন্থের শত শত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও, কিন্তু 'ভক্তের' নিকট সবই বিফল। তিনি এক কথায় সকল যুক্তির উত্তর দিয়ে বলবে- প্রাচীন মুনি ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ 'সালাফে সালেহীন' ও 'বোজর্গানে দ্বীন'- কি এ সকল কথা বুঝিতেন না? তোমরা বাপু কি তাঁহাদের বলে গিয়েছ তাহাকেই আঁকড়িয়ে জড়িয়ে ধরিতে হইবে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম ভয়াবহ'। এটাই হচ্ছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয়তম অধঃপতন।'

শায়খ সফিউর রহমান মুবারাকপুরী হাফিযাতুল্লাহ এ বইয়ে বাস্তব ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন। আশাকরি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল জ্ঞানপিপাসু পাঠক তথা গবেষকদের জন্য এটা প্রামান্য বই হিসেবে গণ্য হবে।

শায়খ এ বইয়ের নামকরণ করেছেন কুরআন মাজীদের আয়াত, *'ইয়ুসকওনা মির রাহীকিম মাখতুম'* (সুরা তাওফীক) থেকে। জান্নাতের মোহারাংরকিত সুধা যা পান করে জান্নাতিরা এক অভাবনীয় আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করবেন। আলাহ্র রাসূলের ﷺ জীবনীটাকে স্বর্গের সেই নির্ভেজাল সুধার সঙ্গে তুলনা ক'রে একই নামকরণ করার মাধ্যমে যেন তিনি বলতে চেয়েছেন, কেউ যদি তাঁর জীবন চরিত্রকে অনুশীলন করে ও মেনে চলে তাহলে সে অনুরূপ তৃপ্ত ও অনন্দিত হবে।

বইটিকে অনুবাদ করা ও ছাপানোর যাবতীয় খরচ বহন করেছেন শায়খ মুবারাকপুরী নিজেই। আমি তাঁর একেবারে নিকটের ছাত্র হিসেবে বইটিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব বহন করেছি মাত্র। সুতরাং এর 'কপিরাইট' শায়খের নিজেরই। ভারত কিংবা বাংলাদেশের যে কেউ বিনা অনুমতিতে অংশবিশেষও যদি ছাপেন তাহলে তিনি আইনত দণ্ডিত হবেন।

পরিশেষে, আমরা যে সকল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের নিকটে আমরা ঋণী। বিশেষ করে, আব্বা ইসমাঈল শামশীর (হাফিযাহুল্লাহ) সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিকে মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। ভাই শামসুযোহা নূরপুরী প্রথম প্রুফ রিডিং করে আমার শ্রম কিছুটা লাঘব করেছেন।

এ বই ছাপাতে গিয়ে পাগলের মতো মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। যদি না কম্পোজিটর শ্রীজয়ন্ত সরকারের নিরলস তৎপরতা ও সহযোগিতা পেতাম তাহলে হয়ত আরও কিছুকাল বই প্রকাশে দেরী হতো।

বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে অনুবাদকদ্বয়, সম্পাদক মহাশয় ও প্রকাশকসহ সংশিষ্ট ব্যক্তি সমূহের শ্রম সার্থক হবে। শিক্ষিত মহলের নিকট হতে যে কোন প্রকার মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও বিভিন্ন শব্দের বানানে ভুল থাকার সম্ভাবনা মানবিক কারণে থাকতেই পারে। আশাকরি সংশোধন করে পড়ে নিবেন। তাছাড়া প্রথম খণ্ডে অনিচ্ছাকৃত যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়ার কারণে আমরা দুঃখিত। পরবর্তী সংস্করণের জন্য পাঠক মহলের যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমাদের সকলের শ্রমকে পরকালের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন। আমীন!!

বিনীত

আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল সালাফী

হলদী, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

তাং ১৩/৭/৯৫ ঈসায়ী

প্রকাশকের ভূমিকা (বাংলাদেশ সংস্করণ)

আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহর ফযল ও করমে বিশ্বখ্যাত জীবনী গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতূমের বাংলা সংস্করণটি বাংলাদেশে প্রকাশিত হলো। যদিও এ বইটির বাংলা ভাষার সংস্করণটি লেখক নিজের তত্ত্বাবধানেই বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং এর কপি রাইটও তাঁরই ছিল।

অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কপিরাইট আইন লংঘন করে এবং সরাসরি আরবী থেকে অনুবাদ না করে ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে লেখকের বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে প্রকাশ করেন। মূল লেখক তাঁর জীবদ্দশায় দুঃখ করে বলেছিলেন, শুনেছি বাংলাদেশে আমার বইটি দেদারসে বিক্রী হচ্ছে অথচ আমার নিকট একটি সৌজন্য সংখ্যাও পাঠানো হয়নি কিংবা অনুমতিও নেয়া হয়নি। অনুবাদক বইটির মধ্যে কিছু আক্বীদা বিরোধী কথাও লিখেছেন এবং অনুবাদ সংক্ষেপ করে বইটির সৌন্দর্য বিনষ্ট করেছেন, তেমনি একে করেছেন কলুষিত। যদিও ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত বইয়ে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বিধিনিষেধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আমরা **আর রাহীকুল মাখতূম**-এর বাংলা সংস্করণটি বাংলাদেশে প্রকাশের অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করলাম। আশাকরি যাঁরা অনৈতিকভাবে বইটি অনুমতি ব্যতীত অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাজারজাত করেছেন তারা এ অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হালাল রুজি খাওয়ার তাওফীক দান করুন। পাঠক সমাজের প্রতিও বিশেষ অনুরোধ থাকল মূল লেখকের হক্ক বিনষ্টকারী এ সকল প্রকাশকের প্রকাশিত **আর রাহীকুল মাখতূম**-এর অবৈধ পাইরেটেড কপি না কেনার জন্য।

আর-রাহীকুল মাখতূম-এর নতুন করে বাংলা অনুবাদ যেমন অনৈতিক ও অবৈধ তেমনি বাংলাদেশে বাংলা সংস্করণ ছাড়াও যে কোন ভাষার সংস্করণ প্রকাশ করা অবৈধ বলেই বিবেচিত হবে।

প্রথম প্রকাশিত বাংলা সংস্করণের সঙ্গে মূল লেখক কর্তৃক ১৯৯৪ সালের সর্বশেষ আরবী সংস্করণের আলোকে কিছু কিছু স্থানে পরিবর্ধন করা হয়েছে। যার কিছুটা অত্র সংস্করণে সংজোযন করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এর সর্বশেষ সংস্করণ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে প্রকাশ করা হবে।

সময় স্বল্পতার কারণে মুদ্রণগত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া হবে। আল্লাহ তুমি আমাদের এ কর্মটিকে নাজাতের অসীলা বানিয়ে দাও। আমীন !

বিনীত
প্রকাশক

এ গ্রন্থঃ

আল্লাহ তা'আলার (হাম্‌দ) প্রশংসা, নবী ﷺ ও তাঁর আত্মীয়, সহচর ও আনুসারীদের প্রতি সলাত ও সালাম (শান্তি) কামনার পর রবিউল আওয়াল ১৩৯৬ হিজরী মুতাবেক মার্চ ১৯৭৬ ইং সনের কথা। বিশ্ব ইসলামী সংস্থার প্রথম সিরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে। এ সম্মেলনে বিশ্ব ইসলামী সংস্থা, মক্কা মুকাররমার ভূমিকা ছিল বেশ অগ্রণী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাপনী লগ্নে এ সম্মেলন বিশ্বের সকল গ্রন্থ রচিয়তাগণকে এ বলে আহ্বান জানান যে, কোন গ্রন্থ রচয়িতা বিশ্বনবী ﷺ জীবন চরিত্র বিষয়ে যে কোন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' 'তৃতীয়' 'চতুর্থ' কিংবা পঞ্চম স্থান অধিকার করবেন তাঁকে উল্লেখিত ক্রমানুসারে পঞ্চাশ, চলিশ, ত্রিশ, বিশ ও দশহাজার সউদী রিয়াল দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

রাবেতার নিজস্ব মুখপাত্র *'আখবার আল আলমে ইসলামীর"* কয়েক সংখ্যায় এ বিজ্ঞপ্তি একাধারে প্রচারিত হয়, কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হচ্ছে, এ বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য বা বিষয়বস্তু সময়মতো অবহিত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিছুদিন পর যখন আমি আমার কর্মস্থল থেকে বাড়ি মুবারকপুরে যাই, তখন আমার ফুপাতো ভাই এবং শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সাহেব (শাইখুল হাদীস মাওলানা উবায়দুল্লাহ রহমানীর পুত্র) বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, আমি যাতে এ প্রতিযোগিতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি সে ব্যাপারেও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা এবং খুব দ্রুত আমাকে তাগিদ দিতে থাকেন তিনি। কিন্তু যেহেতু আমার বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতা সম্পর্কে আমি সদাসতর্ক তাই সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মহাজীবন চরিত রচনার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে প্রথমে আমি সাহসই করি নি। প্রকৃতপক্ষে আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও অনভিজ্ঞতার কারণেই এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলাম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব তাঁর প্রস্তাবে অটল, অনড় রইলেন। বারবার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এ বলে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে চললেন যে, 'আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তুমি এ গ্রন্থটি রচনা করে মোটা অংকের পুরস্কার লাভ করবে। বরং আমি এটাই চাচ্ছি যে, এ সুযোগে বিশ্ব মু'মিনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে যাবে।' তাঁর এ উপর্যুপরি তাগাদা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার, তেমনি অন্যদিকে তার চাইতেও দুরুহ ব্যাপার ছিল মহানবীর ﷺ মহাজীবন চরিত রচনার মতো এক মহামহিম কাজ হাতে নেয়া। কাজেই সবকিছু ভেবেচিন্তে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয় বলে মনে করলাম। কিন্ ওপ্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তেই স্থির রইলাম।

এমতাবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর *'জমঈয়তে আহলে হাদিস হিন্দ'*-এর মুখপাত্র **'পাক্ষিক তারজুমানে'** রাবেতার এ বিজ্ঞাপনটি উর্দুতে প্রচারিত হয়। উর্দু ভাষায় এ বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু অবগত হয়ে, আমার মনে এক ভাবানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের এক দুর্বার বাসনা যেন ধীরে ধীরে মনের কোণে দানা বাঁধা উঠতে থাকে।

'জামি'আহ সালাফিয়্যাহ'র শিক্ষার্থীগণের নিরন্তর পরামর্শ এবং প্রেরণাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পথে, প্রান্তরে, প্রতিষ্ঠানে যখনই যেখানে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই তারা এ প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এমন এক ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত এবং সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উপর্যুপরি পরামর্শ এবং প্রেরণাই যেন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিজয় সংকেত। সুতরাং সকলের দু'আ এবং আল্লাহ তা'আলার ইপ্সিত অনুগ্রহের প্রতি অবিচল আস্থা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। কিন্তু কাজের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর এবং প্রকৃতি ছিল সময় ও সুযোগের প্রেক্ষাপটে মাঝে-মধ্যে এবং কখনো-কখনো।

তখনো ছিলাম গ্রন্থ প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এমতাবস্থায় রামাযানের দীর্ঘ অবকাশ যাপনের সময় এসে গেল প্রায় দোর গোড়ায়। এদিকে রাবেতা আবার ঘোষণা দিল যে, সীরাত প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের নিজ নিজ পাণ্ডুলিপি দেয়ার সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত তারিখ হল মুহাররামের প্রথম দিন। সুতরাং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্য থেকে সাড়ে পাঁচ মাস এভাবেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হাতে ছিল তখন মাত্র সাড়ে তিন মাস সময়। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজন পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে ডাকযোগে তা প্রেরণ করা। এদিকে সমস্ত কাজ কর্মই ছিল অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে দ্বিতীয়বার পঠন-পাঠন এবং সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ রকম এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আমি যখন সংশয় দোলায় দোল খাচ্ছিলাম তখন ছাত্র, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্খী ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে এমন প্রচণ্ড এক চাপ সৃষ্টি হতে থাকল যে, এ ব্যাপারে সংশয় কিংবা আলস্যের কোন অবকাশই রইল না। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায়ই তাঁরা আমাকে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন এ উদ্দেশ্যে যে, বিমূঢ়তা কিংবা বিহ্বলতার কোন লেশ যেন আমার মনের মধ্যে ঠাঁই না পায়।

দেখতে দেখতেই মাহে রামাযানুল মুবারক এসে উপস্থিত হল দ্বারপ্রান্তে। সদ্য সমাপিত এ রমাযানুল মুবারাককে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আগত খাস রহমত ও নি'আমত মনে করে অথৈ সাগরে ঝাঁপ দেয়ার মতোই কাগজ-কলম হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি মহানন্দিত, বিশ্ববরেণ্য মহামানবের ﷺ মহা জীবন চরিত রচনারূপী মহাসাগরে। সুখ-স্বপ্নের আবেশ মধুর মুহূর্তগুলোর মতোই রমাযানুল মুবারকের দীর্ঘ ছুটি কখন যে কিভাবে শেষ হয়ে এল তা যেন আমি ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারলাম না।

ছুটি শেষে যখন কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন পাণ্ডুলিপি সংকলনের মাত্র দুই- তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে সংকলিত বিষয়াদির পুনঃপঠন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। কাজেই উপায়ান্তর না দেখে প্রতিযোগিতার উপযোগী সুদর্শন, পরিপাটি ও পরিচ্ছন্নভাবে তাঁরা যাতে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করে দেন সে ব্যাপারে আমার সহকর্মী ও ছাত্রদের নিকটে অনুরোধ পেশ করলাম। বলাই বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে সাগ্রহ ও সানন্দে তাঁরা আমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করেন।

অবশিষ্টাংশ প্রস্তুতির ব্যাপারেও অনুরূপভাবে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে রমাযানুল মুবারাকের ছুটির পর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পুরোপুরি শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে হাতে ততটা সময় ছিল না যতটা প্রয়োজন ছিল। সময়ের অপ্রতুলতার কারণেই শেষের দিকে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে আমাকে একটানা কঠোর পরিশ্রমের শিকার হতে হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে আমার গভীর পরিতৃপ্তি ও আনন্দের ব্যাপার হল, আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং সাহায্য-সহযোগিতার ফলে মুহাররম মাস আরম্ভ হওয়ার বার-তের দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ডাকযোগে প্রেরণ করতে আমি সক্ষম হলাম। এ প্রাথমিক সাফল্য আমার সংশয়গ্রস্ত ও চিন্তাযুক্ত প্রাণে এনে দিল অব্যক্ত এক আনন্দের দোলা।

মাস কয়েক পর রাবেতার পক্ষ থেকে দু'টি রেজিষ্ট্রী চিঠি আমার নামে আসে। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল রাবেতা নির্দেশিত শর্তাবলীর আলোকে আমার গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আমার নামটি প্রতিযোগীদের তালিকাভূক্ত হয়েছে। বহু প্রতীক্ষিত এ সংবাদটি আমার মনে এক অকৃত্রিম আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে। আমার জীবনে এটা নিশ্চিতরূপে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকবে।

কালচক্রের আবর্তনে অব্যাহত থাকে সময়ের অগ্রযাত্রা এবং এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় দেড়টি বছর। রাবেতা ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, নীরব। চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেও তেমন কিছুই অবহিত হওয়া সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। তারপর ঘটনা পরম্পরায় বিভিন্নমুখী তৎপরতা ও কাজকর্মের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে হল যে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কথাটি আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম।

১৯৭৮ সালের ৬-৮ই জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন সম্পর্কিত সংবাদ অবগত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে অদম্য আগ্রহ ও কৌতুহলের উদ্রেক হতে থাকে। তাই এ সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় দৃষ্টি রেখে যেতে থাকি। এমন এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ট্রেনের বিলম্বের কারণে এক দিন আমি *'ভাদুমি'* রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষমান ছিলাম অস্থিরচিত্তে। কিছুতেই যেন সময় কাটছিল না। তাই একটু সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলাম অতি সন্তর্পণে অথচ কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে।

হঠাৎ ছোট্ট একটি খবরের প্রতি আকৃষ্ট হল আমার দৃষ্টি। খবরটি ছিল করাচীতে অনুষ্ঠিত এশীয় ইসলামী সম্মেলনের কোন এক বৈঠকের একটি বিশেষ ঘোষণা সংক্রান্ত। এ বৈঠকে রাবেতা আলমে ইসলামী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন চরিত রচনা বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পাঁচজন পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন। ঐ পাঁচজনের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিকও নাকি রয়েছেন। খবরটি পাঠ করার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল আমার চিত্তচাঞ্চল্য, পড়ে গেল খোঁজাখুঁজির এক অন্তহীন হিড়িক, সৃষ্টি হয়ে গেল কোলাহলময় এক অস্থিরতার। বানারাসে প্রত্যাবর্তনের পর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবগত হবার জন্য বহু চেষ্টা করেও ফললাভ সম্ভব হল না।

তারিখটা ছিল ১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাইয়ের সকাল বেলা। সারা রাত্রি বজরডিহা (বানারস শহরের একটি মহলা) মুনাযারার (বিতর্ক সভার) শর্তাবলী স্থির করার পর নিশ্চিন্তে শুয়েছিলাম। হঠাৎ আমার ঘর সংলগ্ন সিঁড়ির ওপর ছাত্রদের কণ্ঠ নিঃসৃত শোরগোল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হতেই জেগে উঠলাম। ইতোমধ্যেই আমার ঘরে ছাত্রদের রীতিমত ভিড় জমে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলীতে আনন্দ ও উলাসের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে ও উষ্ণ কণ্ঠে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ উচ্চারিত হচ্ছে।

তাদের এ আকস্মিক আগমনে ও অভিনন্দন জ্ঞাপনে কিছুটা বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। 'কি হয়েছে বল তো তোমাদের? মুনাযারার (বিতর্কসভার) প্রতিদ্বন্দীগণ মুনাযারা করতে অস্বীকার করেছে কি?" আমি শায়িত অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম। আনন্দ আবেগে উচ্ছসিত কণ্ঠে তারা বলল, 'জী না! তা নয়, বরং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন চরিত রচনা। প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এ প্রেক্ষিতেই আমাদের এ আনন্দ উলাস এবং শোরগোল। এ আনন্দ সংবাদটি জানানোর উদ্দেশ্যেই আমরা ছুটে এলাম আপনার নিকট।'

এ শুভ সংবাদ শোনা মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে বললাম, 'আলহামদুল্লিাহ'। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথা থেকে কিভাবে তোমরা এ সংবাদ অবগত হলে?"

তারা বলল, 'মাওলানা ওযায়ের শামস[1] এ খোশ খবর এনেছেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মওলানা ওযায়ের শামস কি এখানে এসেছেন?'

তারা উত্তরে বলল, 'জী হ্যাঁ'।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখমণ্ডলে হাসি-খুশির সুস্পষ্ট অভিব্যাক্তি সহ কক্ষে প্রবেশ করলেন মাওলানা সাহেব। বিষয়টি বিস্তারিত অবগত হলাম তাঁর মুখ থেকে।

২২শে শাবান, ১৩৯৮ হিজরী সন মোতাবেক ১৯৭৮ ইং সনের ২৯ জুলাই তারিখে রাবেতার পক্ষ থেকে রেজিষ্ট্রীকৃত একট পত্রও পেলাম আমি। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করায় এ পত্র মারফত আমাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একই সাথে এ আনন্দ সংবাদও দেয়া হয়েছে যে, ১৩৯৯ হিজরী সনের মুহাররম মাসে পুরস্কার বিতরণের জন্যে মক্কা মুকার্‌রমার রাবেতা কার্যালয়ে এক জাঁকালো অনুষ্ঠানের

---

[1] শাইখুল হাদীস শামসুল হকের (রহঃ) পুত্র। আরবী এবং উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডিগ্রী প্রাপ্ত অনুবাদক ।

ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের জন্য এ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অবশ্য, এ অনুষ্ঠানটি মুহার্‌রম মাসের পরিবর্তে ১২ই রবিউল আখের, ১৩৯৯ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এতে যোগদান উপলক্ষে হারামাইন শারীফাইনে উমরাহ এবং যিয়ারাতের সৌভাগ্যও আমার হয়ে গেল। ১০ই রবিউল আখের বৃহস্পতিবার মক্কা মুকার্‌রামার সেই নয়নাভিরাম রাবেতা কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শেষে আনুমানিক ১০ ঘটিকায় কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি আরম্ভ হল।

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সৌদী বিচার বিভাগের প্রধান শাইখ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ। পুরস্কার প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন মক্কার গভর্নরের প্রতিনিধি আমীর সাউদ বিন আব্দুল মুহসিন। তিনি হচ্ছেন মালেক আব্দুল আযীযের পুত্র। কুরআন তিলাওয়াতের পর মক্কার গভর্নর সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তারপর রাবেতার যুগ্ম সম্পাদক শাইখ আলী আল- মুখতার অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং মর্মস্পর্শী এক ভাষণ দিলেন। তিনি কিছুটা বিস্তারিত আকারে অত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পটভূমি সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য ও পূর্বাভাস পেশ করেন। অধিকন্তু, অত্যন্ত সূক্ষ্ম মান-নিরূপণী কলা-নির্বাচনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সে সব বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

প্রসঙ্গত তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, 'রাবেতা কর্তৃক প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পর প্রতিযোগীগণের নিকট থেকে রাবেতা মোট ১১৮২ টি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। এ সব পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সমীক্ষকগণ প্রাথমিক বিচারে ১৮৩টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। তারপর চূড়ান্ত পরীক্ষা, নির্বাচন ও ফলাফলের জন্য সৌদী শিক্ষামন্ত্রী শাইখ হাসান বিন আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট এক লক্ষ সমীক্ষাদল গঠিত হয়। এ আটজন সদস্যই ছিলেন মক্কা মুকার্‌রমা মালেক আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ অনুষদের (বর্তমানে জামেয়া উম্মুল কোরা) অধ্যাপক। তাঁরা সকলেই মহানবীর সীরাত শাস্ত্র ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যথাক্রমে তাঁদের নাম হল :

১. ড. ইবরাহিম আলী-শউত। ২. ড. মুহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী। ৩. ড. রহমান ফাহমী মুহাম্মদ। ৪. ড. ফকরী আহমদ উকায়। ৫. ড. আহমাদ সাইয়েদ দারাজ। ৬. ড. ফায়েক বকর সওয়াফ। ৭. ড. শাকের মাহমুদ আব্দুল মুনায়েম। ৮. ড. আবুল ফাত্তাহ মানসুর।

এ পরীক্ষক দলের সদস্যগণ নির্বাচিত পাণ্ডুলিপি সমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পর যে পাঁচজন প্রতিযোগীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন :

প্রথমঃ 'আর রাহীকুল মাখতূম' (আরবী), রচনায় সফিউর রহমান মোবারকপুরী, শিক্ষক, জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, হিন্দ।

দ্বিতীয়ঃ খাতিমুন নাবিয়্যীন (ইংরেজী), রচনায় ড. মাজেদ আলী খাঁন।

তৃতীয়ঃ 'পয়গাম্বরে আযম ওয়া আখের' (উর্দু), রচনায় ড. নাসীর আহমাদ। নাসের, ভাইস চ্যান্সেলর, জামেয়া ইসলামিয়া ভাওয়াল পুর, পাকিস্তান।

চতুর্থঃ 'মুনতাকান নকুল ফী সীরাতে আ'যামীর রাসূল' (আরবী), রচনায় শাইখ হামেদ মা'হমুদ বিন মুহাম্মাদ মানসুর লিমূদ- জিজাহ, মিশর।

পঞ্চমঃ 'সীরাতে নাবিয়্যীল হুদা ওয়ার রাহমাহ' (আরবী), রচনায় অধ্যাপক আব্দুস সালাম হাফেজ, মদীনা মোনাওয়ারা, মামলাকাতে সউদিয়া আরাবিয়া।

সহকারী সম্পাদক মুহতারাম শাইখ আলিইল মুখতার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষণমূলক ভাষণ দানের পর বিজয়ীদের অভিনন্দন ও উৎসাহিত ক'রে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন।

এরপর আমাকে বলা হয় কিছু বক্তব্য পেশ করার জন্য। আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাবেতার দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে যে সকল ক্ষেত্রে শূন্যতা ও ঘাটতি রয়েছে অথচ সেগুলো অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় সে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সকল শূন্যতা ও ঘাটতি পূরণ করা হলে তা কী কী সুফল বয়ে আনতে পারে তার প্রতিও আলোকপাত করি। প্রত্যুত্তরে বাবেতার পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়াও পাওয়া যায়।

তারপর আমীর মুহতারম সাউদ বিন আব্দুল মুহসীন ক্রমধারানুযায়ী বিজয়ী পাণ্ডুলিপি প্রণেতাগণের হাতে পূর্বঘোষিত পুরস্কার তুলে দেন। পারিশেষে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৭ রবিউল আওয়াল বৃহস্পতিবার আমাদের দলটি ছিল মদীনা মুনাওয়ারার পথে অগ্রসরমান হয়। মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার পথযাত্রায় আবেগ ও উল্লাসে আমাদের সমগ্র চেতনা ছিল ভরপুর। পথচলার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা পরিদর্শন করলাম বদরের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে আসর ওয়াক্তের কিছু পূর্বে গিয়ে উপস্থিত হলাম মাসজিদে নববীতে। মদীনা মুনাওয়ারায় দিন কয়েক অতিবাহিত করার পর কোন এক সকালে গেলাম খায়বরে। সেখানে ঐতিহাসিক দূর্গের ভিতর ও বাহির পরিদর্শন করার পর কিছুসময় কেটে গেল হাসি-আনন্দ, গল্প-গুজবে, হালকা রসিকতায় ও আমোদ স্ফূর্তিতে। তারপর ফিরে এলাম মদীনায়।

আখেরী নবীর (ﷺ) সাধনা ও সাফল্যের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি মদীনার বিভিন্ন স্থান এবং আসমানী দূত জিব্রাঈল আমীনের (ﷺ) আগমন স্থল ও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার জায়গাগুলো পরিদর্শনে সপ্তাহ দুয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় ফিরে এলাম আমরা মক্কা মুকাররমায়।

এখানে কা'বার তাওয়াফ ও সায়ী করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল আরও একটি সপ্তাহ। তারপর এ পূণ্যভূমির প্রিয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ওস্তাদ ও ওলামা ও মাশায়েখগণের উষ্ণ আদর-আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল আরও কয়টা দিন। এমনভাবে স্বপ্নলোকের মতো একান্ত আকাঙ্খিত মেজাজের সেই পূণ্যভূমিতে মাসাধিক কাল অবস্থানের পর ফিরে এলাম আবার তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ, পৌত্তলিকতার লীলা-নিকেতন হিন্দুস্থান। দুঃখ রইল শুধু এটুকু যে দেখতে দেখতে শুরু হতে না হতেই যেন শেষ হয়ে এল বন্ধুত্বের উষ্ণ আবেশ, পুষ্পের সুস্নিগ্ধ সুবাসে পরিতৃপ্ত হতে না হতেই শেষ হয়ে এল বসন্ত।

হেজায থেকে ফিরে আসতে না আসতেই উর্দু ভাষাভাষীগণের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হল বইটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করার জন্য। সেই দাবী অনবরত আসতেই থাকল বছর কয়েক যাবৎ। এদিকে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে অনুবাদ কার্যে হাত দেয়া আমার পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অথচ ব্যাপারটি এড়িয়ে চলা কিংবা উপেক্ষা করারও উপায়ন্তর আমার ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অনুবাদ কাজ আরম্ভ করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকুর, কয়েক মাসের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সমষ্টিগত ফল হল সমগ্র বইটির অনুবাদ। আল্লাহই পূর্বের ও পরের সমস্ত কাজকর্মের একমাত্র মালিক:

পরিশেষে, যে সকল বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজন কোন না কোনভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি অজস্র ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার ওস্তাদ মুহাতারাম মওলানা আব্দুর রহমান সাহেব, প্রিয়জন শাইখ ওবায়ের সাহেব এবং হাফেজ মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব, ফাজেলানে মদীনা বিশ্ববিদ্যায় এ কারণে চিরকৃতজ্ঞ যে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ব্যাপারে তাঁরা সময় মতো আমাকে অভিমত ও পরামর্শ দ্বারা উৎসাহিত এবং উপকৃত করেছেন। আমার প্রার্থনা, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল স্বহৃদয় ব্যক্তিকে উত্তম বদলা দ্বারা তৃপ্ত করুণ এবং আমাদের সহায়ক ও মদদগার হউন। এ গ্রন্থ প্রণয়নের রচনাকারী গ্রন্থ প্রণেতা, পরীক্ষক এবং এ গ্রন্থ থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যাঁরা উপকৃত হবেন সকলের নাজাত লাভের ওসীলা হোক অত্র গ্রন্থ। আমীন!!

১৮ই রবীউল আওয়াল ১৪১৫ — সফিউর রহমান মুবারকপুরী

২৬শে আগস্ট ১৯৯৪ ঈসায়ী

পরম করুণাময় কৃপানিধান আলাহর নামে
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা (আরবী)
সম্মানিত ড. আবদুল্লাহ উমর নাসীফ

মহাসচিব,

রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা কর্তৃক প্রদত্ত।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'আলার যাঁর অপার অনুগ্রহে সমস্ত সৎকর্ম পূর্ণতা লাভ করে থাকে। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনই উপাস্য নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা, প্রেরিত রাসূল এবং মনোনীত বন্ধু। তিনি তাঁর উপর অর্পিত আসমানী আমানত যথাযথভাবে প্রদান করেছেন এবং উম্মতগণকে এমন এক দীপ্তিময় আলোক-বর্তিকা এবং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন যার রাত্রিও দিবালোকের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল। আল্লাহ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের (রা.) প্রতি শান্তি বর্ষণ করুণ। আর সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান হোক যিনি তাঁর প্রদর্শিত বিধানানুযায়ী আমল করেন। হে আল্লাহ, আমরা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করছি। আপনিই একমাত্র দয়ার আধার এবং সর্বোচ্চ দয়াময়।

আল্লাহর নবীর ﷺ পবিত্র আদর্শ হচ্ছে চির পুরাতনের পথ বেয়ে আসা চির নতুন, সর্বোচ্চ দাতার এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বিদ্যমান এক শাশ্বত পাথেয়। এ অবিনশ্বর আদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা এবং পুস্তকাকারে তা লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নাবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পর থেকেই মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলে আসছে এবং বিভীষিকাময় ক্বিয়ামাতের সেই প্রলয়কারী ধ্বংস পর্যন্ত বহাল থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এ আদর্শ এবং উদাহরণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেখানে সামান্যতম শূন্যতা, কমতি কিংবা ঘাটতির কোনই অবকাশ নেই এবং এমন একটি ছাঁচ যে ছাঁচে সার্বিক জীবন ধারা সংগঠিত এবং পরিচালিত হওয়া বিধেয়। আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রত্যেকটি বিধি-বিধান অনুসরণের মাধ্যমে রাসূল ﷺ এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা সর্বকালে ও সর্বযুগে সকল মানুষের জন্য সমভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে।" (আল-আহযাব ৩৩ : ২১)

আর যখন 'আয়িশা رضي الله عنها-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র কেমন ছিল?' তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, পবিত্র কুরআন কারীমই ছিল তাঁর চরিত্র।

অতএব যারা দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত ও প্রদর্শিত পথে নিজেকে পরিচালিত করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বন ছাড়া কোন উপায়ন্তর নেই। শুধু তাই নয়, বরং তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, নবীর ﷺ জীবন চরিতই হচ্ছে আলাহর বিধান ব্যবস্থিত সরল পথ বা সিরাতুল মুসতাকীম। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কুরআনে বর্ণিত বিধানাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নবী ﷺ প্রদর্শিত এ পথে ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, পরিচালক-পরিচালিত, নর-নারী, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সকলের জন্যই হিদায়াত রয়েছে। অধিকন্তু, আরও রয়েছে রাজনীতি-শাসননীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

বর্তমানে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় আল্লাহ প্রদত্ত সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন অধঃপতন ও অন্ধকারের অতল তলে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন এটা কি তাঁদের জন্য উত্তম নয় যে তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক হবেন এবং শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও তাহযীব-তামাদ্দুন সহ সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নাবীর ﷺ জীবনের চরিতকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে রেখে অগ্রসর হবেন। কেননা, এটা শুধু চিন্তাভাবনার বিষয়ই নয়, বরং আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের এটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের যথার্থ কল্যাণ। অধিকন্তু এটাই হচ্ছে চরিত্র গঠনের উন্মুক্ত প্রান্তরে আল্লাহর কালাম কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শিক্ষাগত সর্বোত্তম পন্থা। যার ফলে একজন মু'মিন বান্দা শরীয়তের অনুসারী হয়ে ওঠে এবং সমাজ-জীবন যাপনের সকল বিষয়ে আল্লাহকে একমাত্র ব্যবস্থাপক হিসেবে গ্রহণ করে।

আলোচ্য গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম' বিজ্ঞ রচিয়তা শাইখ সফিউর রহমান কর্তৃক রচিত। যথেষ্ট সময়, শ্রম এবং কায়িক ও মানসিক শক্তি ব্যবহারের বিনিময়ে রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৩৯৬ হিজরী সনে নবীর ﷺ জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভের এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব মরহুম আস শাইখ মুহাম্মদ আলী আল হারকান (আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুণ এবং উত্তম বিনিময় প্রদান করুণ) প্রথম ভূমিকায় বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করছেন।

এ গ্রন্থটি আপামর সকলের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। সকলেই অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন এ গ্রন্থ রচিয়তার। প্রকাশিত হওয়ার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের দশ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়েছে। এরপর মুহাতারাম হাস্‌সান হামাভী নিজ অনুগ্রহে আরও পাঁচ হাজার কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা প্রদান করুন।

সে সময় তিনি এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা তৈরি করে দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। তাই তাঁর এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সংক্ষিপ্ত আকারে এ ভূমিকাটি লিখে দিলাম। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ কাজকে তাঁর জন্য কবুল করে নেন এবং এর দ্বারা মুসলিমদের উপকৃত করেন যাতে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের এ লাজুক ও নাজেহাল অবস্থা উত্তম অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার সেই হৃত গৌরব ও মর্যাদা যা দিয়ে তাঁরা বিগত দিনে নের্তৃত্ব করতেন তা যেন ফিরে পান। আল্লাহ তা'আলার সেই মহা নির্দেশ যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]

'১১০. তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।' (আলু 'ইমরান ৩ : ১১০)

এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলে কারীম ﷺ-এর উপর যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ, যিনি ছিলেন বিশ্ব মানবের পথ প্রদর্শক এবং মুক্তির দিশারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ (রা.) এবং সৎকর্মশীলদের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য।

ড. আব্দুল্লাহ ওমর নাসীফ
মহা সচিব,
রাবেতা আলমে ইসলামী,
মক্কা মুকাররমা।

পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে

ভূমিকা

সম্মানিত শাইখ মুহাম্মদ আলী আল-হারকান,

মহা সচিব, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা ,

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা প্রতিপালক, যিনি আসমান-জমিন এবং অন্ধকার-আলোর সৃষ্টিকর্তা। আর আল্লাহর দরুদ অবতীর্ণ করুন রাহ্‌মাতুলিল 'আলামীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যিনি আখেরী নবী এবং নবী-রাসূলগণের প্রধান। তিনি সত্য ও সৎকর্মের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন এবং অসত্য ও অসৎ কর্মের জন্য ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন, তিনি ওয়াদাদ করেন এবং অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে আদমের সন্তানকে ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন এবং সঠিক সরল পথে চলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। আসমান ও জমিনের যেখানে যা কিছু রয়েছে সব কিছুকেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। তারপর আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা নিজ রাসূল ﷺ-কে উচ্চ প্রশংসিত স্থান এবং মু'মিনদিগের জন্য শাফা'আত করা মর্যাদা দান করেছেন। নবী ﷺ-এর সঙ্গে সকলের মহব্বত ও মর্যাদার সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং আদর্শের অনুসরণ করে চলাকে মহব্বতের চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কুরআনে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]

'বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন।' (আলু 'ইমরান ৩ : ৩১)

এ জন্যই মানুষ তাদের অন্তরের সাথে নবী করীম ﷺ-কে ভালবাসার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত পথ বা উপায় অন্বেষণ করতে থাকে যার মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্কটা অত্যন্ত দৃঢ়তর হয়ে যায়। যেমন ইসলামের শুরু থেকে মুসলিম নবী করীম ﷺ-এর গুণাবলী ও জীবন চরিত আলোচনা, রচনা, প্রকাশ ও প্রচারের জন্য একজন অপর জন থেকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। নবী ﷺ-এর চরিত বলা হয় তাঁর কথা, কাজ এবং উত্তম চরিত্রকে। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনই হল তাঁর চরিত্র। আর এ মহাসত্যটি অবশ্যই সকলের জানা রয়েছে যে, কুরআনুল কারীম হল আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব এবং তাঁর পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাণীর নাম। অতএব, যাঁর চরিত্র বা গুণাবলী হচ্ছে পুরো কুরআন তিনি অবশ্যই মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম, পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির সর্বাধিক মহব্বত লাভের সর্বোত্তম হকদার।

মুসলিমদের অন্তর ও জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবেই এ গভীর ভালবাসা সর্বদা চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নবী করীম ﷺ-এর জীবন চরিত বিষয়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাবেতা এ সম্মেলনেই ঘোষণা দেন যে, নিম্নোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে যাঁরা নবী ﷺ-এর জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থের উত্তম পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন, তাঁদের পাঁচ জনকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৌদি রিয়াল পুরস্কার প্রদান করা হবে।

শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. বিষয়ের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ এবং যথাসময়ে ক্রমানুসারে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সুবিন্যস্ত হতে হবে।

২. আলোচনার মান অবশ্যই উৎকৃষ্ট হতে হবে এবং তা যেন ইতোপূর্বে প্রকাশিত কিংবা প্রচারিত না হয়ে থাকে তার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. বিষয়াদি আলোচনার সময় যে সকল সূত্র থেকে তা গৃহীত হয়েছে ঐ সকল সূত্রের বরাতগুলো পুরোপুরি উল্লেখ করতে হবে।

৪. গ্রন্থ রচয়িতা বিস্তারিতভাবে নিজের জীবন চরিত্র উল্লেখ করবেন। অধিকন্তু, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নিজস্ব কোন রচনা যদি থাকে তবে তাও উল্লেখ করবেন।

৫. পাণ্ডুলিপির লেখা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট এবং সহজ পাঠ্য হতে হবে।

৬. আরবী ভাষা কিংবা অন্য কোন বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত ভাষায় গ্রন্থ রচিত হলে তা গৃহীত হবে।

৭. ১লা রবিউল সানী, ১৩৯৬ হিজরী সন হতে ১লা মুহাররম ১৩৯৭ হিজরী পর্যন্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হবে।

৮. গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 'রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা' সচিবালয়ে সীল মোহরকৃত খামে প্রেরণ করতে হবে যার উপর রাবেতা নিজস্ব একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করবেন।

৯. বিজ্ঞ আলেমগণের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

রাবেতার এ ঘোষণা নবী প্রেমিকগণের জন্য ছিল চরম এক আনন্দের ব্যাপার। তাঁরা প্রবল আগ্রহ ও আনন্দ উদ্দীপনার সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। এদিকে রাবেতা আলমে ইসলামী ও আরবী, ইংরেজী, উর্দু এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষায় সংকলিত পাণ্ডুলিপি সাদরে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

তাই আমাদের সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ বিবিধ ভাষায় পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করতে শুরু করেন প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মোট সংখ্যা ছিল ১১৮২টি যার মধ্যে আরবী ভাষায় ছিল ৮৪টি, উর্দু ভাষায় ৬৪টি, ইংরেজী ভাষায় ২১টি এবং ফ্রান্সের ভাষায় ছিল ১টি হুসা ভাষায় ১টি। মোট ১৭১টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য গৃহীত হয়।

এ পাণ্ডুলিপিগুলো ভালভাবে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্ধেশ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ক্রমধারায় বিন্যস্ত করা হয়:

১. **প্রথম পুরস্কার:** শাইখ সফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া , হিন্দ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার সৌদী রিয়াল।

২. **দ্বিতীয় পুরস্কার:** ড. মাজেদ আলী খাঁন, জামেয়া মিলিয়া ইসলামিয়অ, নয়া দিলী, হিন্দ ৪০ হাজার সৌদী রিয়াল।

৩. **তৃতীয় পুরস্কার:** ড. নাসীর আহমাদ নাসের ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যাদল, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান, ৩০ হাজার সৌদী রিয়াল।

৪. **চতুর্থ পুরস্কার:** অধ্যাপক হামিদ মাহমুদ মুহাম্মদ মানসুর, লিমুদ, মিশর, ২০ হাজার সৌদী রিয়াল।

৫. **পঞ্চম পুরস্কার:** অধ্যাপক আব্দুস সালাম হাশেম হাফেজ, মদীনা মুনাওয়ারা মামলাকাতে সৌদী আরব ১০ হাজার সৌদী রিয়াল।

রাবেতা ১৩৯৮ হিজরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে উল্লেখিত বিজয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তারপর পুরস্কার বিতরণের জন্য রাবেতা মক্কা মুকাররমার নিজস্ব কার্যালয়ে আমীর সাউদ বিন আব্দুল মুহসিন বিন আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে ১৩৯৯ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল শনিবার সকালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মক্কার গভর্নর আমীর ফাওয়াজ বিন আব্দুল আযীযের সেক্রেটারী আমীর সউদ এ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ অনুষ্ঠানেই রাবেতার সচিবালয় হতে পুরস্কার প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি প্রণেতাদের পাণ্ডুলিপিগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ছাপানোর পর বিতরণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শাইখ সফিউর রহমান মোবারকপুরী হিন্দ রচিত আরবী ভাষায় গ্রন্থটিকে সর্ব প্রথম মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, তিনিই হচ্ছেন প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থকার। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গ্রন্থগুলো যথাক্রমে মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম তাঁর জন্য খাঁটি করে নিয়ে অনুগ্রহ করে নিজ দরবারে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই, তিনিই আমাদের একক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

মুহাম্মদ আলী আলহারাকান
মহাসচিব
রাবেতা আলমে ইসলামী
মক্কা মুকাররমা।

গ্রন্থ রচিয়তার জীবন বৃত্তান্ত

রাসূল ﷺ-এর জীবন চরিত বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক গ্রন্থ রচানর জন্য রাবেতা আলমে ইসলামীর অন্যতম শর্ত ছিল প্রতিযোগিদের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করা। তাই এ পর্যায়ে আমি আমার নিজস্ব ভাষায় সাদাসিধে জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করছিঃ

পুরো নাম এবং পরিচয় : আমার নাম সফিউর রহমান বিন আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আকবর বিন মুহাম্মদ আলী বিন আব্দুল মু'মিন বিন ফকীরুল্লাহ মোবারকপুরী আযমী।

জন্ম তারিখ : সনদ মুতাবিক আমার জন্ম তারিখ ৬ই জুন, ১৯৪৩ ইং সন। কিন্তু এ হচ্ছে কিছুটা আনুমানিক ব্যাপার। অনুসন্ধানে বিলক্ষণ জানা যায় যে, আমার জন্ম হয় ১৯৪২ সালে মধ্যভাগে। জন্মস্থান সূত্রে আমার গ্রামের নাম হচ্ছে হোসাইনাবাদ। এটা হল মোবারকপুরের উত্তর দিকে এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রামে। মোবারকপুর হল শিল্পোন্নত ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ আজমগড়ের ছোট্ট একটি শহর। এ প্রেক্ষিতে হোসাইনাবাদ এবং মোবারকপুর উভয় নামের সঙ্গেই আমি সমভাবে সম্পর্কিত।

শিক্ষাদীক্ষা : ছোট বেলায় আমি আমার দাদা ও চাচার নিকট থেকে কুরআন মাজীদের কিছু অংশ শিখেছিলাম। তারপর ১৯৪৮ সালে *'মাদ্রাসায়ে দারুত তালীম'* মোবারকপুরে ভর্তি হই। সেখানে ছয় বছর যাবৎ গভীর মনোযোগ সহকারে প্রাথমিক থেকে জুনিয়র কোর্স পর্যন্ত লেখাপড়া করি। অন্তবর্তীকাল কিছু ফার্সী চর্চাও করি।

তারপর ঈসায়ী ১৯৫৪ সনের জুন মাসে মাদ্রাসা এহইয়াউল উলুম মোবারকপুরে ভর্তি হয়ে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, নাহু, সার্ফ এবং অন্যান্য বিষয়ে নিষ্ঠার সাথে পড়াশোনা করি। সেখানে বছর দুয়েক কাটানোর পর মৌনাথ ভঞ্জনের মাদ্রাসা ফাইজে আম মউয়ে ভর্তি হই। এ শিক্ষায়তনটি ছিল সেখানকার একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। মোবারকপুর শহর হতে মৌনাথ ভঞ্জন প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

১৯৫৬ সনের মে মাসে আমি ফাইজে ভর্তি হই এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ সেখানে অবস্থান করি। সেখানে আরবী ভাষা, ব্যকরণ ও ধর্মীয় বিষয়াদি অর্থাৎ তাফসীর, হাদীস, উসুলে হাদীস, ফিক্বাহ, উসুলে ফিক্বাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করি। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে শিক্ষাকোর্স সমাপনান্তে আমাকে নিয়মিত পাগড়ী ও শিক্ষা সমাপনী সনদ প্রদান করা হয়। এ সনদ খানা ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সুশিক্ষা লাভের একটি সম্মান সূচক পদক প্রতীক। এ সনদে আলোচ্য বিষয়াদির শিক্ষাদান এবং ফতোয়া প্রদানেও যথারীতি অনুমতি রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সকল পরীক্ষাতেই আমি উল্লেখযোগ্য ও ইপ্সিত সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হয়েছিলাম। শিক্ষা গ্রহণকালে আমি এলাহাবাদ বোর্ড পরীক্ষাতেও অংশ গ্রহণ করি। ১৯৫৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী আলেম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে উভয় পরীক্ষাতেই বেশ কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।

তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাবন্টনের নতুন অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ ইং সনে ফাযিলে আদাব ও ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সনে ফাজিলে দীনিয়াৎ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে উভয় পরীক্ষাতেই আমি সুনামের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।

বাস্তব কর্মজীবন : ১৯৬১ সনে *'মাদ্রাসা ফাইযে আম'* থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে এলাহাবাদ জেলায় ও নাগপুর শহরে শিক্ষাদান কার্যে এবং সেই সঙ্গে বক্তৃতা দান কার্যেও আত্মনিয়োগ করি। বছর কয়েক পর মার্চ ১৯৬৩ সনে মাদার ইলমী মাদ্রাসা ফাইযে আমের প্রধান কর্মকর্তা আমাকে শিক্ষকতার জন্য আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি কাজে যোগদান করি, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে দু'বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আমি সেই স্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হই। ঠিক পরের বছরটি আমি অতিবাহিত করি আজমগড়ে অবস্থিত **'জামেয়াতুর রাশাদে'** এবং ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সনে মুদাররিস হিসেবে 'মাদ্রাসা দারুল হাদীস মৌ' এর দাওয়াত

গ্রহণ করি। এখানে তিন বছরের অবস্থানকালে শিক্ষকতা এবং সহকারী প্রধান হিসেবে আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধায়কের **দায়িত্ব পালন করতে** হয়। তারপর এ কার্যে ইস্তফা দিয়ে 'মাদ্রাসা ফাইজুল উলুম সিউনীর' সেবায় নিজেকে **সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত** করি। মৌনাথ ভনজন হতে অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবধান ছিল প্রায় সাত শত কিলোমিটার। **প্রতিষ্ঠানটি** মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। জানুয়ারী, ১৯৬৯ সন হতে সেখানে শিক্ষকতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠান প্রধান মুদার্রেস **হিসেবে দায়িত্ব** পালন করি এবং আশপাশের এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজও করতে থাকি। অধিকন্তু **জুমার খুৎবার** দায়িত্বও পালন করি।

তারপর ১৯৭২ সনের প্রান্তভাগে মাদ্রাসা দারুত তালীম, মোবারকপুরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। এ মাদ্রাসায় দু'বছর অবস্থানের পর ১৯৭৪ সনের অক্টোবর দেশের শিক্ষায়তন 'জামেয়া সালাফিয়ায়' চলে আসি। বর্তমানে সেখানেই চাকুরীতে রয়েছি। এছাড়া 'মুহাদ্দিস' নামক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্বও ন্যস্ত ছিল আমারই কাঁধে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ দায়িত্বটিও পালন করে আসছি নিষ্ঠার সঙ্গে।

রচনাবলী : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনান্তে কিছু কিছু রচনা এবং অনুবাদ কার্যেও হাত দিই। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাবলী এবং অনুবাদ হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপঃ

১. *'তাযকেরায়ে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব।'*, প্রকাশকাল ইং ১৯৭২ সাল। অত্র পুস্তকটি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে অল্প কালের মধ্যেই চার চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২. *'তারীখ আলে সাউদ'*, (উর্দু) প্রকাশকাল ১৯৭২ সাল। পুস্তকটি দুইবার মুদ্রিত হয়েছে।

৩. *'ইতহাফুল কেরাম তালিকু বুলুগুল মারাম'*, (আরবী) লি-ইবনে হাজার আসকালানী। প্রকাশকাল ১৯৭৪ সাল।

৪. *'কাদেয়ানিয়াত আপনে আয়না মে'*, (উর্দু) প্রকাশকাল ১৯৭৬ সাল।

৫. *'ফেতনা-ই-কাদেয়ানিয়াত আওর মওলানা সানাউলাহ অমৃতসরী' (উর্দু)*, প্রকাশকাল ১৯৭৭ সাল।

৬. *'আর রাহীকুল মাখতূম'*, রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক আহ্বানকৃত প্রতিযোগিতার জন্য প্রণীত।

৭. *'ইনকারে হাদীস হক্ক ইয়া বাতিল'*, (উর্দু) ইং ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত।

৮. *'রাযমে হক্ক ওয়া বাতিল'*, (বাজর ডিহা নামকস্থানে অনুষ্ঠিত বিতর্কানুষ্ঠানের বিবৃতি'।

৯. *'এবরাযুল হক্ক ওয়াস সওয়াব ফী মাসয়ালতিস সুফুরে ওয়াল হিজাবে' (আরবী)*, প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল। পর্দা সম্পর্কে আলামা ড. তাকিউদ্দীন হিলালী মারাকুশীর (রাহি.) অভিমতের উপর অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থ। অত্র গ্রন্থটি 'জামেয়া সালাফিয়া' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১০. *'তাতাওয়ারুস শৌউব ওয়াদ্দিয়ানতে ফীল হিন্দ ওয়া মাজালুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়াত ফীহা' (আরবী)*, ১৯৭৯ সনে 'জামেয়া সালাফিয়ার' মাসিক প্রত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১১. *'আল ফিরকাতুন নাজিয়া অল ফেরাকুল ইসলামিয়াতুল উখরা' (আরবী)*, রচনাকাল ১৯৮২ সাল (অপ্রকাশিত)।

১২. ***'ইসলাম** আওর আদমে তাশাদ্দুদ' (উর্দু)*, প্রকাশকাল ১৯৮৪ সাল। পরবর্তী কালে অত্র **গ্রন্থটি হিন্দী** এবং **ইংরেজী ভাষায়** অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৩. ***'আহলে তাসাওয়াফ** সিয়াসিয়া ফীল ইসলাম' (আরবী)*, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।

১৪. ***'আল আহজাবুস** সিয়াসিয়া ফীল ইসলাম' (আরবী)*, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।

এ ছাড়া আমি 'মাসিক মুহাদ্দিস' বেনারসের সম্পাদকের পদেও নিযুক্ত এবং **কর্মরত ছিলাম।**

والله الموفق وازمة الأمور كلها بيده – ربنا تقبله منا بقبول حسن واتيته نباتا حسنا

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظره على الدين كله لجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ووسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفجر لهم بنا بيع الرحمة والرضوان تفجيرا — أما بعد :

এটা বড়ই খুশি ও আনন্দের কথা যে, রবিউল আওয়াল ১৩৯৬ হিজরীতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত মহানবী ﷺ-এর সীরাত বা জীবন চরিত বিষয়ক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে রাবেতা আলমে ইসলামী নবীকূল সম্রাটের ﷺ সীরাত সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলক গ্রন্থ রচনা এবং মানের উৎকর্ষতার ভিত্তিতে প্রথম থেকে পঞ্চম এ পাঁচ জন গ্রন্থ রচয়িতাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করেন। এ মহতী প্রয়াসের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল উপরোক্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে সুগভীর মনীষা ও গবেষণাজনিত অভিসন্দর্ভ রচনা এবং গ্রন্থ রচনা। আমার মতে এটা হচ্ছে অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণপ্রদ একটি পদক্ষেপ। কারণ গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা ভাবনা করে দেখলে এটা সুস্পষ্ট দিবালোকের মতোই প্রতিভাত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে নবীর ﷺ জীবন চরিত ও মুহাম্মদী জীবনাদর্শ হচ্ছে এমন একটি মূল উৎস যেখান থেকে পুরাতনকে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবন দান বিশ্ব ইসলামী জীবনে নব জাগরণ এবং মানব সমাজে সৌভাগ্যের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে পারে। নবী করীমের ﷺ বরকতময় সত্তার প্রতি অগণিত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক অজস্র ধারায়।

তারপর আমি মনের কোণে এরূপ ধারণা করে নিলাম যে, যদি আমি এ কল্যাণপ্রদ ও শুভ প্রতিযোগতিায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি তাহলে ইনশাআল্লাহ তা হবে আমার জন্য অসীম আনন্দ ও অন্তহীন সৌভাগ্যের প্রতীক। কিন্তু এ প্রশ্নটিও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকল যে, কতটুকুই বা আমার বিদ্যা-বুদ্ধি কিংবা যোগ্যতা রয়েছে যে দু'জাহানের অবিসংবাদিত ও মহা সম্মানিত ব্যক্তির পবিত্র জীবন-চরিত সম্পর্কে আমি যথাযথ আলোকপাত করতে পারি। আমি যখন নবী করিমের ﷺ সর্বোতমুখী প্রতিভা ও জ্ঞানালোকের কিছু অংশ নিজের ভাগ্যে অর্জন করতে সক্ষম হব তখন নিজেকে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান এবং সফলকাম বলে মনে করব। আর তখন হতে আমি অজ্ঞানতার অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে একজন উম্মত হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রদর্শিত জীবন ধারায় জীবন যাপন করছি বলে ভাবতে পারব এবং এর মধ্যেই আমার মৃত্যু নেমে আসবে। তারপর নবী করীমের ﷺ শাফায়াতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা অতীত জীবনে অর্জিত আমার পাপরাশি মার্জনা করবেন বলে প্রত্যাশা করব।

এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কিত প্রাক-চিন্তন প্রসঙ্গটি সবিনয়ে নিবেদন করার যে প্রয়োজন এ সময়ে অনুভব করছি এবং তা হচ্ছে, এ গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে গ্রন্থ খানা পাঠকের মনে বিরক্তি বা এক ঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে এমন দীর্ঘ কলেবর বিশিষ্ট কিংবা হৃদয়ঙ্গম বা বোধগম্য হওয়ার ব্যাপারে অসুবধা সৃষ্টি করতে পারে এমন সংক্ষিপ্তও যেন না হয়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় এবং বিধেয় মনে করে কাজে হাত দিই।

কিন্তু যখন মহানবীর ﷺ সীরাত বা জীবন চরিত সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর প্রতি সমীক্ষাসূচক দৃষ্টি নিক্ষপ করলাম তখন দেখা গেল যে ঘটনাবলীর ক্রমবিন্যাসে সামান্য বিষয়াদি সম্পর্কে বর্ণনায় যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এ জন্য আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, যে সব স্থানে এ জাতীয় পার্থক্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হবে সে সব স্থানে আলোচনার সকল দিকেই দৃষ্টিপ্রদান করে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে যে ফল দাঁড়ায় তা-ই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হবে। তবে প্রাসঙ্গিক দলীল ও সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণাদি এবং একে প্রাধান্য প্রদানের আমি উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, এতে অযথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির যথেষ্ট আশঙ্কা থাকবে।

তবে এ ব্যাপারে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করলাম যে, যদি এমনটিও হয় যে আমার উপস্থাপিত বিষয়বস্তু পাঠকের মনে কিছুটা বিস্ময় কিংবা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা যে ঘটনাবলীর ব্যাপারে সাধারণ লেখক বিষয়বস্তু সম্পর্কে এমন এক চিত্র উপস্থাপন করছেন যা আমার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নয় সেখানে সাক্ষ্য প্রমাণাদির উল্লেখ অবশ্যই থাকবে।

হে আলাহ, আমার তকদীরে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ বিধান করো। তুমি যথার্থই ক্ষমাশীল, পরম বন্ধু, 'আরশের মালিক এবং মহান ও উর্দ্ধতন কর্তা।

জুমু'আতুল মুবারক
২৪ শে রজব, ১৩৯৬ হিজরী
মোতাবেক ২৪ শে জুলাই, ১৯৭৬ ইং।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী
জামেয়া সালাফিয়া,
বেনারস, হিন্দুস্থান।

العرب، الأرض والشعب، الحكم والاقتصاد، الديانة

ইসলামের বিকাশমান অবস্থায় আরব পরিস্থিতি

موقع العرب

আরব, আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং গোত্র সমূহ

নবী ﷺ-এর জীবন চরিত বলতে বুঝায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত সেই বার্তা বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির বাস্তবায়ন বা রূপায়ণ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মানব জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন এবং যার মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্টতার গাঢ় তিমির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে শাশ্বত আলোকজ্জ্বল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মানুষের দাসত্ব ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবিষ্ট করেছেন।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন ধারার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি অঙ্কন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ না করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকৃত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাক ইসলামিক আরবের ভৌগোলিক সীমারেখা, আরব ভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা ও অবস্থান এবং তাদের ক্রমোন্নতির ধারা যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব তার একটি নিখুঁত চিত্র পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরা হল।

আরবের অবস্থান : 'আরব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বালুকাময় প্রান্তর' উষর ধূসর মরুভূমি বা লতাগুল্ম তৃণশষ্যবিহীন অঞ্চল। স্মরণাতীত কাল থেকেই বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যগত অর্থে আরব উপদ্বীপ এবং সেখানে বসাবাসকারী সম্প্রদায়ের জন্য এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর সামায়ে সীনা উপদ্বীপ, পূর্বে আরব উপসাগর, দক্ষিণে ইরাকের এক বড় অংশ এবং আরব সাগর যা ভারত মহা সাগরের বিস্তৃত অংশ, উত্তরে শামরাজ্য এবং উত্তর ইরাকের কিছু অংশ। উল্লেখিত সীমান্ত সমূহের কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। সমগ্র ভূভাগের আয়তন ১০ লক্ষ থেকে ১৩ লক্ষ পর্যন্ত বর্গ মাইল ধরা হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক এবং ভূপ্রাকৃতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আরব উপদ্বীপ অত্যন্ত গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বহন করে। এ উপদ্বীপের চতুর্দিক মরুভূমি বা দিগন্ত বিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যে কারণে এ উপদ্বীপ এমন এক সুরক্ষিত দূর্গে পরিণত হয়েছে যে, যে কোন বিদেশী শক্তি বা বহিঃশত্রুর পক্ষে এর উপর আক্রমণ পরিচালনা, অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রভাব বিস্তার করা অত্যন্ত কঠিন। এ নৈসর্গিক কারণেই আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের অধিবাসীগণ সেই সুপ্রাচীন এবং স্মরণাতীত কাল থেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে নিজস্ব স্বাতন্ত্রগত বৈশিষ্ট বজায় রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে। অথচ অবস্থানের দিকে দিয়ে এ উপদ্বীপটি এমন দু'পরাশক্তির প্রতিবেশী যে, ভূপ্রকৃতিগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এ পরাশক্তিদ্বয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা আরববাসীগণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হতো না।

বহির্বিশ্বের দিক থেকে আরব উপদ্বীপের অবস্থানের প্রতি লক্ষ করলেও প্রতীয়মান হবে যে, দেশটি পুরাতন যুগের মহাদেশ সমূহের একেবারে মধ্যস্থল বা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং জল ও স্থল উভয় পথেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। এর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ গমনের প্রবেশ পথ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশের প্রবেশদ্বার এবং পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে ইরান ও মধ্য এশিয়া হয়ে চীন ভারত সহ দূর প্রতীচ্যের অন্যান্য গমনামনের দরজা। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ থেকে সাগর ও মহাসাগর হয়ে আগত জল পথে চলে আরব উপদ্বীপের সঙ্গে চমৎকার যোগসূত্র রচনা করেছে। বিভিন্ন দেশের জাহাজগুলো সরাসরি আরবের বন্দরে গিয়ে ভিড়ে। এরূপ ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমারেখার প্রেক্ষিতে আরব উপদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত ছিল বিভিন্ন সম্প্রাদয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও মত বিনিময়ের লক্ষ্যস্থল বা কেন্দ্রবিন্দু।

আরব সম্প্রদায় সমূহ : জন্মসূত্রের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদগণ আরব সম্প্রদায় সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১. **আরবের বায়েদা :** এঁরা হল ঐ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায় যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এঁদের খোঁজ খবর সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদির সন্ধান লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে আদ, সামুদ, তাসম, জাদীস, ইমলাক, উমাইম, জুরহুম, হাযূর, ওয়াবার, 'আবীল, জাসিম, হাযারামাওত ইত্যাদি।[১] বিস্মৃতির অতল তলে এরা এমনভাবে তলিয়ে গিয়েছেন যে, এদের পতনের পর উত্থানের আর কোন আভাষই পাওয়া যায় নি।

২. **আরবে আরেবা :** এঁরা হচ্ছে ঐ সমস্ত গোত্র যারা ইয়ারুব বিন ইয়াশজুব বিন কাহতানের বংশোদ্ভূত। এঁদেরকে কাহতানী আরব বলা হয়।

৩. **আরবে মোস্তা'রেবা :** এঁরা হচ্ছেন ঐ আরব সম্প্রদায় যারা ইসমাঈল (عليه السلام)-এর বংশধারা থেকে আগত। এঁদেরকে আদনানী আরব বলা হয়।

আরবে আরেবা অর্থাৎ কাহতানী আরবদের প্রকৃত আবাসস্থল ছিল ইয়েমেন রাজ্য। এখানেই তাদের বংশধারা এবং গোত্র সমূহ বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পরবর্তী কালে দু'গোত্রই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেগুলো হল:

(ক) **হিমইয়ার :** এর প্রসিদ্ধ শাখাগুলো হচ্ছে যাইদুল জামহুর কোযায়াহ এবং সাদাসেক।

(খ) **কাহলান :** এর প্রসিদ্ধ শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে হামদান, আনমার, তাই মাযহিজ, কিন্দাহ লাখম, জুযাম, আযদ, আউস, খাজরায এবং জাফরান বংশধরগণ। এঁরা পরে শাম রাজ্যের আশেপাশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলে গাস্সান নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

অধিকাংশ কাহলানী গোত্র পরে ইয়েমেন রাজ্য পরিত্যাগ করে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে তাদের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে 'সাইলে আরেমের' কিছু পূর্বে। ঐ সময়ের ঘটনা, যখন রোমীয়গণ মিশর ও শামে অনুপ্রবেশ করে ইয়েমেনের অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জলপথের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্থলপথের যাবতীয় সুযোগ সুবিধারও চিরতরে অবসান ঘটে। এর ফলে কাহলানীদের ব্যবসা-বাণিজ্য একদম উজাড় হয়ে যায়।

হিমইয়ারী ও কাহলানী গোত্রদ্বয়ের বংশদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কারণ। যার ইঙ্গিত বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এ সকল সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, আত্মকলহের কারণে জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় কাহলানী গোত্র সমূহ স্বদেশভূমির মায়া-মমতা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু হিমইয়ারী গোত্র সমূহ স্বস্থানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যে সকল কাহলানী গোত্র স্বদেশের মায়া-মমতা কাটিয়ে অন্যত্র গমন করে তাদের চারটি শাখায় বিভক্ত হওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় :

১। **আযাদ :** এঁরা নিজ নেতা ইমরান বিন আমর মুযাইকিয়ার পরামর্শানুক্রমে দেশত্যাগ করেন। প্রথম দিকে এঁরা ইয়েমেনের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে থাকেন। তাঁদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রার প্রাক্কালে নিরাপত্তার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য অগ্রভাগে অনুসন্ধানী প্রহরীদল প্রেরণ করতেন। এভাবে পথ পরিক্রমা করতে করতে তাঁরা অবশেষে উত্তর মুখে অগ্রসর হওয়ার এক পর্যায়ে বহু শাখা-প্রশাখা বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং এখানে-সেখানে পরিভ্রমণ করতে করতে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে নেন। তাঁদের এ দেশান্তর এবং বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

---

[১] ১৯৯৪ সালে লেখক কর্তৃক সম্পাদিত কপিতে জুরহুম, হাযূর, ওয়াবার, 'আবীল, জাসিম, হাযারামাওত নামগুলো বৃদ্ধি করেছেন। যা পুরাতন কপিতে নেই।

সা'লাবা বিন আমর : তিনি প্রথমত হেজায অভিমুখে অগ্রসর হয়ে সা'লাবিয়া ও যীকার নামক স্থানের মধ্যস্থানে বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। যখন তাঁর সন্তান সন্ততি বয়োঃপ্রাপ্ত হন এবং বংশধরগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেন তখন মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মদীনাকেই বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান মনে করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ঐ সা'লাবার বংশধারা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল আউস এবং খাযরাজ গোত্রের তথা মদীনার আনসারদের।

হারেসা বিন আমর : অর্থাৎ খোযায়া এবং তাঁর সন্তানাদি। এঁরা হেজায ভূমিতে চক্রাকারে ইতস্তত পরিভ্রমণ করতে মার্রুয যহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে বসাবাস করতে থাকেন। তারপর হারাম শরীফের উপর প্রবল আক্রমন পরিচালনা করে বানু জুরহুমকে সেখান থেকে বহিস্কার করেন এবং নিজেরা মক্কাধামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

ইমরান বিন আমর : তিনি এবং তাঁর সন্তানাদি 'আম্মানে' বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁদেরকে 'আযাদে আম্মান' বলা হতো।

নসর বিন আমর : এঁর সঙ্গে সম্পর্কিত গোত্রগুলো তেহামায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। এঁদেরকে 'আযাদে শানুআহ' বলা হতো।

জাফনা বিন আমর : তিনি শাম রাজ্যে গমন করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং সন্তানাদিসহ বসবাস করতে থাকেন। তিনি হচ্ছেন গাসসানী শাসকগণের ও প্রখ্যাত পূর্ব পুরুষ। শাম রাজ্যে গমনের পূর্বে হেজাযে গাস্‌সান নামক ঝর্ণার ধারে তাঁরা কিছুদিন বসবাস করেছিলেন তাই তাঁদের বংশধারাকে গাস্‌সানী বংশ বলা হতো।

২। **লাখম ও জুযাম গোত্র :** এ লাখমীদের মধ্যে নাসর বিন রাবীয়া নামক এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি হীবার মুনযির বংশের শাসকগণের অত্যন্ত প্রভাবশালী পূর্বপুরুষ ছিলেন।

৩। **বানু তাই গোত্র :** এ গোত্র বানু আযদ গোত্রের দেশ ত্যাগের পর উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আজা এবং সালমা দু'পাহাড়ের পাদদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ গোত্রের নামানুসারে পাহাড় দুটি 'বানু তাই' গোত্রের নামে পরিচিতি লাভ করে।

কিন্দা গোত্র : এ গোত্র সর্বপ্রথম বাহরাইনে বর্তমান আল আহসায় শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু সেখানে আশানুরূপ পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে 'হাযরা মাহওত' অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানেও তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা করতে না পারায় অবশেষে নাযদ অঞ্চলে গিয়ে বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে তাঁরা একটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু সে রাষ্ট্র বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, অল্প কালের মধ্যেই তার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কাহলান ব্যতিত হিময়ারেরও অনুরূপ একটি কোযায়া গোত্র রয়েছে। অবশ্য যাঁরা ইয়েমেন হতে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ইরাক সীমান্তে বসতি স্থাপন করেন তাঁদের হিময়ারী হওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা মতভেদ রয়েছে।[1]

আরবে মোস্তা'রেবা : এঁদের প্রধান পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (ﷺ) মূলত ইরাকের নদীর তীরে কুফার সন্নিকটে অবস্থিত। এ শহরটি ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কুফার সন্নিকরেট অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক ঐ শহরটির ভূগর্ভ খননের সময় যে সকল শিলালিপি পুঁথি-পুস্তক ও দলিলাদী উদ্ধার করা হয়েছে তার মাধ্যমে এ শহর সম্পর্কে নানা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু, এ সবের মাধ্যমে ইবরাহীম (ﷺ), তাঁর উর্ধ্বতন বংশধরগণ এবং তথাকার বাসিন্দাগণের ধর্মীয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং অবস্থা সম্পর্কে বহু নতুন নতুন তথ্য উদঘাটিত এবং নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

---

[1] গোত্র সমূহের বিস্তারিত বিবরণাদির জন্য দ্রষ্টব্য আলামা খুযরীরঃ 'মোহাযারাতে তাবীখিল উমামিল ইসালামিয়াহ' ১ম খণ্ড ১১-১৩ পৃঃ এবং 'কালার জাযীরাতুল আরব' ২৩১-২৩৫ পৃঃ। দেশত্যাগের ঘটনাবলীর সময় এবং কারণ বির্ধারণের ব্যাপারে ঐতিহাসিক উৎসবের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন দিক আলোচনা পর্যালোচনা করে যা সঠিক বিবেচনা করা হয়েছে তাই এখানে লিপিবদ্ধ হলো।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরও বিলক্ষণ অবগত রয়েছি যে, ইবরাহীম (ﷺ) এ স্থান থেকে হিজরত করে হার্রান শহরে আগমন করেছিলেন তারপর সেখানে থেকে তিনি আবার ফিলিস্তীনে গিয়ে উপনীত হন এবং সে দেশকেই তাঁর নাবওয়াতী বা আল্লাহর আহ্বান জনিত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। আল্লাহ সুবহানাহূ তা'আলা তাঁকে পরম সম্মানিত 'খলিলুলাহ' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর সম্বন্ধে রিসালাতের যে সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন সেখান থেকেই দেশের অভ্যন্তরভাগে এবং বহির্বিশ্বের ব্যাপক সম্প্রচার এবং প্রসারের জন্য তিনি সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ইবরাহীম (ﷺ) একদা মিশর ভূমিতে গিয়ে উপনীত হন। মিশরের তৎকালীন বাদশাহ ফেরাউন তাঁর মন্ত্রীর মুখে বিবি সারার অপরিসীম রূপগুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে স্বীয় যৌন লীপ্সা চরিতার্থ মানসে তাঁর দিকে অগ্রসর হন। এদিকে একরাশ ঘৃণ্য ক্ষোভানলে বিদগ্ধপ্রাণা বিবি সারা আবেগকুলচিত্তে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা জানালে তৎক্ষণাৎ তিনি তা কবূল করেন এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে ফেরাউন বিকারগ্রস্ত হয়ে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকেন। অদৃশ্য শক্তিতে শেষ পর্যন্ত তিনি একদম নাজেহাল এবং জর্জরিত হয়ে থাকেন।

তাঁর এ ঘৃণ্য ও জঘণ্য অসদুদ্দেশ্যের ভায়াবহ পরিণতিতে তিনি একেবারে হতচকিত এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। এভাবে অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অনুধাবন করেন যে 'সারা' কোন সাধারণ নারী নন, বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার উত্তম শ্রেণীভূক্ত এক মহিয়সী মহিলা।

'সারার' এ ব্যক্তি বিশিষ্টতায় তিনি এতই মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে পড়েন যে তাঁর কণ্যা হাজেরাকে[১] বিবি সারার খেদমতে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করে দেন। বিবি হাজেরার সেবা যত্ন ও গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে তারপর তিনি তাঁর স্বামী ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে হাজেরা বিবাহ দেন।[২]

ইবরাহীম (ﷺ) 'সারা' এবং হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তীন ভূমে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা হাজেরার গর্ভে ইবরাহীম (ﷺ)-কে পরম ভাগ্যমন্ত এক সন্তান দান করেন। তাঁর এ সন্তানই হচ্ছেন "যাবীহুল্লাহ" খেতাবে ভূষিত বিশ্ব নন্দিত মহামানব ও নবী ইসমাঈল (ﷺ) বিবি 'সারা' ছিলেন নিঃসন্তানা। বিবি হাজেরার গর্ভে ইবরাহীম (ﷺ)-এর ঔরসজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তিনি কিছুটা লজ্জিত এবং বিব্রতবোধ করতে থাকলেন এবং নবজাতকসহ বিবি হাজেরাকে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি করে চললেন।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (ﷺ) বিবি সারার কথা মানতে বাধ্য হলেন। তিনি বিবি হাজেরা ও নবজাত পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে হিজায ভূমিতে এসে উপনীত হলেন। তারপর বায়তুল্লাহ শরীফের সন্নিকটে পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁদের রেখে দিলেন। ঐ সময় বর্তমান আকারে বায়তুল্লাহ শরীফের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বর্তমানে যে স্থানে বায়তুল্লাহ শরীফ অবস্থিত সেই সময় সে স্থানটির আকার ছিল ঠিক একটি উঁচু টিলার মতো। কোন সময় প্লাবনের সৃষ্টি হলে ডান কিংবা বাম দিক দিয়ে সেই পাবনের ধারা বয়ে চলে যেত। সেই সময় যমযম কূপের পাশে মসজিদুল হারামের উপরিভাগ বিরাট আকারের একটি বৃক্ষ ছিল। ইবরাহীম (ﷺ) স্ত্রী বিবি হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাঈল (ﷺ)-কে সেই বৃক্ষের নীচে রেখে গেলেন।

সেই সময় এ স্থানে না ছিল কোন জলাশয় বা পানির কোন উৎস, ছিল না কোন লোকালয় বা জনমানব বসতি। একটি পাত্রে কিছু খেজুর এবং একটি ছোট্ট মশকে কিছুটা পানি রেখে ইবরাহীম (ﷺ) আবার পাড়ি জমালেন সেই ফিলিস্তিন ভূমে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল খেজুর, ফুরিয়ে গেল পানিও। কঠিন সংকটে নিপতিত হলেন হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাঈল। কিন্তু এ ভয়াবহ সংকটেরও সমাধান হয়ে গেল আল্লাহ

---

[১] বর্ণিত আছে যে হাজেরা দাসী ছিলেন কিন্তু আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি দাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফেরাউনের মেয়ে মুক্ত এবং স্বাধীন। দ্রষ্টব্য রহামাতুলিল আলামীন, ২য় খণ্ড ৩৬-৩৭ পৃঃ

[২] উল্লেখিত গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠার বিস্তারিত ঘটনা দ্রষ্টব্য সহীহা বুখারী ১ম খণ্ড ৪৮৪ পৃ দ্রঃ।

তা'আলার অসীম মেহেরবানীতে অলৌকিক পন্থায়। সৃষ্টি হল আবে হায়াত যমযম ধারা। ঐ একই ধারায় সংগৃহীত হল দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী।[১]

কিছুকাল পর ইয়েমেন থেকে এক গোত্রের লোকজনেরা সেখানে আগমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ গোত্রকে 'জুরহুম সানী" বা 'দ্বিতীয় জুরহুম বলা হয়ে থাকে। এ গোত্র ইসামাঈল (عليه السلام)-এর মাতার নিকট অনুমতি নিয়ে মক্কাভূমিওতে অবস্থান করতে থাকেন। এ কথাও বলা হয়ে থঅকে যে প্রমথাবস্থায় এ গোত্র মক্কার আশপাশের পর্বতময় উন্মুক্ত প্রান্তরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফে সুস্পষ্টভাবে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, মক্কা শরীফে বসবাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা আগমন করেছিলেন ইসামাঈল (عليه السلام)-এর আগমনের পর কিন্তু তাঁর যৌবনে পদার্পণের পূর্বে। অবশ্য তার বহু পূর্ব থেকেই তাঁরা সেই পর্বত পরিবেষ্টিত প্রান্তর দিয়ে যাতায়াত করতেন।[২]

পরিত্যক্ত স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (عليه السلام) সময় সময় মক্কাভূমিতে আগমন করতেন। কিন্তু তিনি কতবার মক্কার পুণ্য ভূমিতে আগমন করেছিলেন তার সঠিক কোন বিবরণ বা হদিস খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে ইতিহাসবিদগণের অভিমত হচ্ছে যে, তিনি চার বার মক্কায় আগমন করেছিলেন, তাঁর এ চার দফা আগমনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১. কুরআনুল মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, আলাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (عليه السلام)-কে দেখালেন যে তিনি আপন পুত্র ইসমাঈল (عليه السلام) কে কুরবাণী করেছেন। প্রকারান্তরে এ স্বপ্ন ছিল আলাহ তা'আলার একটি নির্দেশ এবং পিতাপুত্র উভয়েই একাগ্রচিত্তে সেই নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন মনে প্রাণে।

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (سورة صافات ٣٧ : ١٠٣-١٠٧)

'পিতা যখন পুত্রকে কুরবাণী করার উদ্দেশ্যে কাপাল-দেশ মাটিতে মিশিয়ে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী ঘোষিত হল, 'হে ইবরাহীম! তোমার স্বপ্নকে তুমি সর্বতোভাবে সত্যে পরিণত করেছ। অবশ্যই আমি সৎকর্মশীলগণকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতরূপে এ ঘটনা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে এক মহা অগ্নি পরীক্ষা এবং আল্লাহ তা'আলা বিনিময়ে তাঁদেরকে স্বীয় মনোনীত একটি বড় রকমের প্রাণী দান করেছিলেন।"[৩] [আস-সফফাত (৩৭) : ১০৩-১০৭]

'মাজমুয়া' বাইবেলের জন্ম পূর্বে উল্লেখ আছে যে, ইসমাঈল (عليه السلام) ইসহাক (عليه السلام)-এর চাইতে ১৩ বছরের বয়োজোষ্ঠ্য ছিলেন এবং কুরআন শরীফের হিসাব অনুযায়ী ঐ ঘটনা ইসহাক (عليه السلام)-এর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, ইসমাঈল (عليه السلام)-এর বিস্তারিত বর্ণনার পর ইসহাক (عليه السلام)-এর জন্ম প্রসঙ্গে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা থেকেই এক কথা প্রতিপন্ন এবং সাব্যস্ত হয়ে যে ইসমাঈল (عليه السلام)-এর যৌবনে উপনীত হওয়ার আগে কমপক্ষে একবার ইবরাহীম (عليه السلام) মক্কা আগমন করেছিলেন। অবশিষ্ট তিন সফরের বিবরণ সহীহ বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে সরাসরি বর্ণিত হয়েছে।[৪] তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. ইসমাঈল (عليه السلام) যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন জুরহুম গোত্রের লোকজনদের নিকট থেকে আরবী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ব করেন এবং সবদিক দিয়েই সংশিষ্ট সকলের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এরপর

---

[1] সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড আম্বিয়া পর্ব, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫।

[2] সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড আম্বিয়া পর্ব, পৃঃ ৪৭৫।

[3] সূরা সাফ্ফাত ঃ [(২৩) ১০৩-১০৭]

[4] সহীহ বুখারী শরীফঃ ১ম খণ্ড ৪৭৫-৪৭৬ পৃঃ।

কিছু সময়ের মধ্যেই এ গোত্রের এক মহিলার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল তখন তাঁর নয়নমনি ইসমাঈল (ﷺ) কে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিবি হাজেরা জান্নাতবাসিনী হয়ে যান। (ইন্না লিলাহ.....রাজিউন)

এ দিকে পরিত্যক্ত পরিবারের কথা স্মৃতিপটে উদিত হলে ইবরাহীম (ﷺ) পুনরায় মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সহধর্মিণী হাজেরা তখন জান্নাতবাসিনী। তিনি প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হলেন ইসমাঈল (ﷺ)-এর গৃহে। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির কারণে পিতা-পুত্রের মধ্যে সাক্ষাৎকার আর সম্ভব হল না। দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হল পুত্র বধূর সঙ্গে। আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে পুত্রবধূ সাংসারিক অসচ্ছলতার অভিযোগ অনুযোগ পেশ করলে তিনি এ কথা বলে উপদেশ প্রদান করেন যে, 'ইসমাঈল (ﷺ)-এর আগমনের পর পরই যেন এ দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে নেয়া হয়"। পিতার উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসমাঈল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ মহিলা ছিলেন জুরহুম গোত্রের মযায বিন আমর এর কন্যা।[1]

২. ইসমাঈল (ﷺ)-এর দ্বিতীয় বিয়ের পর ইবরাহীম (ﷺ) পুনরায় মক্কা গমন করেন, কিন্তু এবারও পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎসম্ভব হয়নি। পুত্রবধূর নিকট কুশলাদি অবগত হতে চাইলে তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ইবরাহীম (ﷺ) দরজার চৌকাঠ স্থায়ী রাখার পরামর্শ দেন এবং পুনর্বার ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

৩. এরপর ইবরাহীম (ﷺ) তৃতীয় দফায় মক্কা আগমন করেন তখন ইসমাঈল (ﷺ) যমযম কূপের নিকট বৃক্ষের নীচে তীর তৈরি করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ পিতাকে দেখতে পেয়ে তিনি যুগপৎ আবেগ ও আনন্দের আতিশায্যে একেবারে লাফ দিয়ে উঠলেন এবং পিতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কে কোলাকুলি ও আলিঙ্গনাবস্থায় বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। এ সাক্ষাৎকার এত দীর্ঘসময় পর সংঘটিত হয়েছিল যে সন্তান-বৎসল, কোমল হৃদয় ও কল্যাণময়ী পিতা এবং পিতৃবৎসল ও বাধ্যানুগত পুত্রের নিকট তা ছির অত্যান্ত আবেগময় ও মর্মস্পর্শী। ঐ সময় পিতা পুত্র উভয়ে মিলিতভাবে কবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এ কাবা গৃহের নির্মাণ কাজ পরিসমাপ্তির পর সেখানে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য ইবরাহীম (ﷺ) বিশ্ব-মুসলিম গোষ্ঠিকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

আল্লাহ তা'আলা মযায-এর কণ্যার গর্ভে ইসমাঈল (ﷺ)-এর ১২টি অথবা ৯টি সুসন্তান দান করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে- নাবেত বা নাবায়ূত, কায়দার, আদবাঈল, মোবশাম, মেশমা, দোমা, মিশা, হাদদ, তাইমা ইয়াতুর, নাফিস, কাইদমান।

ইসমাঈল (ﷺ)-এর ১২টি সন্তান থেকে ১২টি গোত্রের সূত্রপাত হয় এবং সকলেই মক্কা নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল ইয়েমেন, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি। দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ গোত্রগুলো ক্রমান্বয়ে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এমন কি আরবের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয় এবং মনোনীত এক মহাপুরুষের রক্তধারা থেকে এ সকল গোত্রের সৃষ্টি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে সৃষ্ট যবনিকার অন্তরালেই অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় থেকে যান। শুধুমাত্র নাবেত এবং কায়দারের বংশধরগণই কালচক্রের আবর্তনে সৃষ্ট গাঢ় তিমির জাল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। কালক্রমে উত্তর হেজাযে নাবেতীদের সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা একক শক্তিশালী জাতি এবং বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, এবং আশপাশের জনগোষ্ঠীগুলোকে তাঁদের অধিনস্থ করে নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত ট্যাক্স বা করও আদায় করতে থাকেন। এঁদের রাজধানী ছিল বাতরা। এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দিতা করার মতো সৎ সাহস কিংবা শক্তি আশপাশের কারো ছিল না।

---

[1] Ôকালব জাযীরাতুল আরব" ২৩০ পৃঃ।

তারপর কালচক্রের আবর্তনে রুমীদের অভ্যূদয় ঘটে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা এতই উন্নতি সাধন এবং এত বেশী শক্তি সঞ্চয় করে যে তখন নাবেতীদের শক্তি-সামর্থ এবং শৌর্যবীয্যের কথা রূপকথার মতো কল্প করিহনীতে পর্যবসিত হয়ে যান। মওলানা সৈয়দ সোলাইমান নদভী স্বীয় গবেষণা, আলোচনা ও গভীর অনুসন্ধানের পর একথা প্রমাণ করেছেন যে গাস্‌সান বংশধর এবং মদীনার আনসার তথা আওস ও খাজারায গোত্রের কেউই কাহতানী আরবের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না, বরং ঐ অঞ্চলের মধ্যে নাবেত বিন ইসমাঈল (ﷺ)-এর বংশধরগণের যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন কেবল তাঁদেরই অবস্থান আরব ভূমিতে ছিল।[1] মক্কা নগরীর পুণ্য ভূমিতেই কায়াদর বিন ইসমাঈল (ﷺ)-এর বংশবৃদ্ধি হয় এবং কালক্রমে তাঁরা সেখানে প্রগতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহন করেন। তারপর কালচক্রের আবর্তনে এক সময় তাঁরা অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে পড়েন। তারপর সে স্থানে আদনান এবং তাঁর সন্ত ানাদির অভ্যূদয় ঘটে। আরবের আদনানীগণের বংশ পরস্পরা সূত্র বিশুদ্ধভাবে এ পর্যন্তই সংরক্ষিত রয়েছে।

আদনান হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর বংশ তালিকায় ২১ তম উর্ধ্বতন পুরুষ। কোন কোন বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে যে নবী করীম ﷺ যখন নিজ বংশ তালিকা বর্ণনা করতেন তখন আদনান পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতেন, আর একটুও অগ্রসর হতেন না। তিনি বলতেন যে, 'বংশাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা ভুল বলেছেন।'[2] কিন্তু আলেমগণের মধ্যে এক-দলের অভিমত হচ্ছে, আদনান হতে আরও উপরে বংশপরস্পরা সূত্র বর্ণনা করা যেতে পারে। নবী করীম ﷺ এ বর্ণনাকে 'দুর্বল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান অনুযায়ী আদনান এবং ইবরাহীম (ﷺ)-এর মধ্যবর্তী স্থানে দীর্ঘ ৪০টি পিঁড়ির ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে।

যাহোক, মায়াদ এর সন্তান নাযার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ছাড়া মায়াদের অন্য কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু এ নাযার থেকেই আবার কয়েকটি পরিবার অস্তিত্ব লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাযারের ছিল চারটি সন্তান এবং প্রত্যেক সন্তান থেকেই এক একটি গোত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। নাযারের এ চার সন্তানের নাম ছিল যথাক্রমে ইয়াদ, আনমার, রাবি এবং মুযার। এঁদের মধ্যে রাবিয়া এবং মুযার গোত্রের শাখা-প্রশাখা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত লাভ করে। অতএব, রাবিয়া হতে আসাদ বিন রাবিয়া, আনযা, আব্দুল কাইস, ওয়ায়েল, বাকর, তগলব এবং বনু হানিফা অস্তিত্ব লাভ করে। মুযারের সন্তানগণ দুইটি বড় বড় গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সে গোত্র দু'টো হচ্ছেঃ

(১) কাইস আইলাম বিন মুযার, (২) ইলিয়াস বিন মুযার।

কাইস আইলাম হতে বনু সুলাইম, বনু হাওয়াযেন, বনু গাৎফান। গাতফান হতে আরস, যুবইয়ান, আশজা এবং গানি বিন আসুর গোত্র সমূহের সুত্রপাত্র হয়।

ইলিয়াস বিন মুযার হতে তামীম বিন মুররাহ, হুযাইল বিন মুদরেকাহ, বনু আসাদ বিন খুযাইমাহ এবং কেনানাহ বিন খুযাইমাহ গোত্র সমূহের উদ্ভব হয়। তারপর কেনানাহ হতে কুরাইশ গোত্রের উদ্ভব হয়। এ গোত্রটি ফেহর বিন মালেক বিন নাযার বিন কেনানাহ এর সন্তানাদি।

তারপর কুরাইশ গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মশহুর শাখাগুলোর নাম হচ্ছে- জুমহত, সাহম আদী, মাখযুম, তাইম, যুহরা এবং কুসাই বিন কেলার এর বংশধরগণ। অর্থাৎ আব্দুদ্দার, আসাদ বিন আব্দুল ওয্যা এবং আবদে মানাফ এ তিন গোত্রই ছিল কুসাইয়ের সন্তান। এঁদের মধ্যে আব্‌দে মানাফের ছিল চার পুত্র এবং চার পুত্র থেকে সৃষ্টি হয় চারটি গোত্রের, অর্থাৎ আব্‌দে শামস, নওফাল, মোত্তালেব এবং হাশেম। এ হাশেম গোত্র থেকেই আলাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ কে নবী ও রাসূলরূপে মনোনীত করেন।[3]

---

[1] সৈয়দ সোলাইমান নদভী ঃ তারিখে আরযুল কুরআন ২য় খণ্ড ৭৮-৮৬ পৃঃ এবং ডঃ এম মজীবুর রহমানঃ মদীনার আনসার ঃ পৃঃ ১৩-২৩।

[2] ইবন্ জাবীর তারাবীঃ তারীখুল উমাম ওয়ালি মূলক ১ম খণ্ড ১৯১-১৯৪ পৃঃ। 'আল ই'লাম" ৫ম খণ্ড ৬ পৃঃ।

[3] আলামা খুযরী ঃ মুহাযারাত ১ম খণ্ড ঃ ১৪-১৫পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আলাহ তা'আলা ইবরাহীম (عليه السلام) সন্তানাদির মধ্য থেকে ইসমাঈল (عليه السلام) কে, ইসমাঈল (عليه السلام)-এর সন্তানাদির মধ্যে থেকে কেনানাকে মনোনীত করেন। কেনানার বংশধারার মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।[১]

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং আমাকে সর্বোত্তম দলভূক্ত কনের। তারপর গোত্রসমূহ নির্বাচন করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে সর্বোত্তম গোত্রের মধ্যে শামিল করা হয়। তারপর পারিবারিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অতএব, আমি আমার ব্যক্তিসত্তায় যেমন উত্তম, বংশ মর্যাদার ব্যাপারেও তেমনি সব চাইতে উত্তম।[২]

যাহোক, আদনানের বংশদরগণ যখন অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন তখন জীবিকার অন্বেষণে আরব ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষিতে আব্দুল কাইস গোত্র, বকর বিন ওয়ায়েলের কয়েকটি শাখা এবং বনু তামীমের বংশধরগণ বাহরায়েন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

বনু হানীফা বিন স'ব বিন আলী বিন বকর গোত্র ইয়ামামা অভিমুখে গমন করেন এবং উহার কেন্দ্রস্থল হিজর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের অবশিষ্ট শাখা সমূহ ইয়ামামা থেকে বাহরায়েন, সাহেলে কাযেমা, খালীজ, সওয়াদে ইরাক, উবুলাহ এবং হিত অবধি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

বনু তাগলব গোত্র ফোরাত উপদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। অবশ্য তাঁদের কোন শাখা বনু বকরের সঙ্গেও বসবাস করতে থাকেন। এ দিকে বনু তামীম গোত্র বসরার প্রত্যন্ত অঞ্চলকে বসবাসের জন্য উপযুক্ত ভূমি হিসেবে মনোনীত করেন।

বনু সোলাইম গোত্র মদীনার নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের আবাসস্থল ছিল ওয়াদিউল কোরা হতে আরম্ভ করে খায়বার এবং মদীনার পূর্বদিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে হাররায়ে বনু সোলাইমের সাথে মিলিত দুই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

বনু সাকিফ তায়েফে বসতি স্থাপন করেন এবং বনু হাওয়াযিন মক্কার পূর্বদিকে অবস্থিত ওয়াদিয়ে আওতাস নামক স্থানের আশপাশে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের আবাস স্থল ছিল মক্কা বসরা রাজপথের পাশে।

বনু আসাদ তাঁর বসতিত স্থাপন করেন তাইমার পূর্বে ও কুফার পশ্চিমে। ওঁদের ও তাইমার মধ্যভাগে বনু তাই গোত্রের এক বোতত্তার পরিবারের আবাদ ছিল। বনু আসাদের কর্ষিত ভূমি এবং কুফার মধ্যকার পথের দূরত্ব ছিল পাঁচদিনের ব্যবধান।

বনু যুবইয়ার গোত্র বসতি স্থাপন ও আবাদ করতেন তাইমার নিকটে হাওয়ানের আশপাশে।

বনু কেনানা গোত্রের লোকজন থেকে যান তেহামায়। এঁদের মধ্য থেকে কুরাইশগণ বসতি স্থাপন করেন মক্কা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে। এ সব লোক ছিলেন বিচ্ছিন্ন ধ্যান-ধারণার অধিকারী। তাঁদের মধ্যে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। এভাবেই তাদের জীবন ধারা চলে আসছিল। তারপর কুসাইবিন কেলার নামক এক ব্যক্তি তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সঠিক পরিচালনাদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে প্রচলিত অর্থে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে উন্নীত করেন এবং ঐশ্বর্যশালী ও বিজয়ী করেন।[৩]

---

[1] **সহীহ মুসলিম শরীফ** ঃ ২য় খণ্ড ঃ ২৪৫ পৃঃ জামে তিরমিযী ২য় খণ্ড ঃ ২০১ পৃঃ।

[2] **তিরমিযী শরীফ** ২য় খণ্ড ঃ ২০১ পৃঃ।

[3] **আল্লামা খুযরী মুহাযারাত** ১ম খণ্ড ১৫-১৬ পৃঃ।

الحكـم والإمـارة فـي العـرب

সমসাময়িক আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ

ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও রাজনৈতিক অবস্থা, নেতৃত্ব, সম্প্রদায়, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়াদি সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হল। এর মাধ্যমে প্রাক-ইসলামিক ও ইসলাম পরবর্তী আরবের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

আরব উপদ্বীপে যে সময় ইসলাম-সূর্য্যের দীপ্তিময় শিখার বিকাশ ক্রমান্বয়ে সূচিত হয়ে উঠতে থাকল তখন দু'প্রকারের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে এক প্রকার ছিল মুকুট পরিহিত সম্রাট যিনি প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত ছিলেন না। অন্য প্রকার ছিলেন গোত্রীয় দলনেতাগণ। মুকুট পরিহিত সম্রাটগণের যে মর্যাদা ছিল অন্যান্য খ্যাতি সম্পন্ন গোত্রীয় দলনেতাগণেরও সেই মর্যাদা ছিল। কিন্তু অধিকাংশই ক্ষেত্রেই তাঁদের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি ছিল তা হচ্ছে, তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে সকল সাম্রাজ্যে মুকুটধারী সম্রাটগণের প্রশাসন কায়েম ছিল সেগুলো হচ্ছে শাহানে ইয়েমেন, শাহানে আলে গাস্সান (শামরাজ্য) এবং শাহানে হীরাহ (ইরাক)। অবশিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই সকল ক্ষেত্রেই ছিল গোত্রীয় দলনেতার প্রশাসন।

ইয়েমেন সাম্রাজ্য (الملك باليمن) : আরবে আরেবার অন্তর্ভূক্ত যে সকল সম্প্রদায় প্রাচীনতম ইয়েমেন সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নত ছিল তারাই ছিল সাবা সম্প্রদায় ভূক্ত। প্রাচীন 'উর' (ইরাক) ভূখণ্ডের বহু পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ধ্বংসস্তুপ থেকে যে সকল তথ্য প্রমাণাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাতে খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বের সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতকে তাঁদের অভ্যূদয় সূচিত হয়েছিল বলে তথ্য প্রমাণাদিসূত্র অনুমতি হয়েছে। গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ হতে তাঁদের যুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় কালে শাহানে সাবার মর্যাদাসূচক উপাধি ছিল 'মোকাররবে সাবা"। তাঁর রাজধানী ছিল সাবওয়াহ- যার ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা চিহ্ন আজও মায়ারেবের পশ্চিমে এক দিন পথের দূরত্বে দেখতে পাওয়া যায় এবং তা খারিবা নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সেই যুগেই মায়ারেবের সেই বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয় যা ইয়েমেনের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ঐ যুগে সারা সাম্রাজ্যের এত বেশী বিস্তৃতি ঘটেছিল যে তাঁরা আরবের অভ্যন্তরে এবং বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন আবাস এবং শহর ও নগর গড়ে তুলেছিলেন।

২. খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত সময় কালে 'সাবা' সম্রাটগণ মোকাররব উপাধি পরিত্যাগ করে 'রাজা' (বাদশা) সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করেন এবং 'সারওয়াহ' এর পরিবর্তে মায়ারেবকে সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা দেন। সেই শহরের ধ্বংসস্তুপ আজও 'সনয়া' নামক স্থানের ৬০ মাইল পূর্বে পরিদৃষ্ট হয়,

৩. খ্রীষ্টপূর্ব ১১৫ থেকে ৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে সাবা রাষ্ট্রের উপর 'হিময়ার' গোত্র প্রাধান্য লাভ করে মায়ারেবের পরিবর্তে 'রায়দানকে' রাজধানী করেন। পরে রাজধানীর নাম 'রায়দান' পরিবর্তন করে 'জেফার' রাখা হয়। এ শহরের ধ্বংসাবশেষ আজও 'ইয়ারিম' শহরের নিকটে এক গোলাকার পর্বতে পরিদৃষ্ট হয়।

এ সময় থেকেই সাবা সম্প্রদায় এর পতন শুরু হয়ে যায়। নাবতীয়গণ প্রথমে হেজায়ের উত্তর প্রদেশ নিজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে সাবা সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনকারীদের সেখান থেকে বহিস্কার করেন। অধিকন্তু রুমীগণ মিশর, শাম এবং হেজাজের উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়ার ফলে সমুদ্রপথে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে কাহতানী গোত্র সমূহও নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ার ফলে নিজ নিজ আবাস স্থল পরিত্যাগ করে তাঁরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

(৪) ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত সময় কালে ইয়েমেনের মধ্যে অব্যাহতভাবে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটতে থাকে। একের পর এক বহু বিপব ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে এবং এর ফলে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের অবাঞ্ছিত সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন কি এ পর্যায়ে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যার ফলশ্রুতিতে ইয়েমেনের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেই যুগের রুমীগণ আদন দ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করে তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর হিময়ার ও হামদানের পারস্পরিক আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে হাবশীগণ রুমী গোত্রের সহায়তায় তাঁদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে হাবশীগণের এ দখলদারিত্ব স্থায়ী থাকে ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর পর ইয়েমেনের স্বাধীনতা এক প্রকার পূনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু মায়ারেবের মশহুর বাঁধে শুরু হল ফাটল। সেই ফাটল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। এ বাঁধের ভাঙ্গনের ফলে ভয়াবহ পাবনের সৃষ্টি হয়ে যায়, যার উল্লেখ কুরআন শরীফের (সুরা সাবা) সায়লে আরেম নামে উল্লেখিত হয়েছে। এ ভয়াবহ প্লাবনের ফলে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে যায় এবং বহু গোত্র নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে ৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভিন্ন ধাঁচের এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইয়েমেনের ইহুদী সম্রাট 'যূনওয়াস' নাজরানের খ্রীষ্টানদের উপর এক ন্যাক্কার জনক আক্রমণ পরিচালন করে খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ কোনক্রমেই এতে সম্মত না হওয়ায় 'যূনওয়াস' কতগুলো গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং সেই সকল অগ্নিকুণ্ডে খ্রীষ্টানদের নিক্ষেপ করেন। কুরআন শরীফের সূরা বূরুজের ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ শেষ অবধি আয়াত দ্বারা এ লোমহর্ষক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ ঘটনার ফলে এ দাঁড়ায় যে রুমীয় সম্রাটগণের নেতৃত্বে খ্রীষ্টানগণ আরব উপদ্বীপের শহর ও নগরের উপর বার বার আক্রমণ চালিয়ে বিজয়ী হতে থাকেন। এতে উৎসাহিত হয়ে ইহুদীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হয়ে যান এবং এ প্রতি আক্রমণে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাদানের জন্য হাবশীগণকে সরবরাহ করা হয়। রুমীগণের সহযোগিতালাভের ফলে হাবশীগণ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং ৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইরয়াতের নেতৃত্বে ৭০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং পুনরায় ইয়েমেনের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়েমেন ইরয়াত ইয়েমেনের শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু আবরাহা নামে তাঁর অধিনস্থ এক সৈনিক তাঁকে হত্যা করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে হাবশ সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চললে সক্ষম হন। ইনি ছিলেন সেই আবরাহা যিনি কাবা গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিশাল হস্ত ী বাহিনী সহ কাবা অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেস পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষী বাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনে এ ঘটনা 'আসহাবে ফীল' (হস্তীবাহিনী) নামে প্রসিদ্ধদ রয়েছে।

আসহাবে ফীলের হাবশীগণ অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ইয়েমেনবাসীগণ এ সুযোগ পারস্যরাজ্যের সাহায্যপুষ্ট হয়ে হাবশীগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইয়েমেনবাসীগণ সাইফেযী ইয়াযান হিময়ারীর সন্তান মাদীকরেরের নেতৃত্বে হাবশীগণকে সে দেশ থেকে বহিস্কার করে মুক্ত স্বাধীন সম্প্রদায় হিসেবে মাদী করেককে সম্রাট মনোনীত করেন। এ ছিল ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের পর মাদীকরের কিছু সংখ্যক হাবশীকে নিজের খেদমত এবং রাজদরবারের জাঁকজমক বৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত করে ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ অবিমৃষ্যকারিতা প্রসূত ভ্রান্ত ধারণাই 'দুগ্ধ কলা সহকারে সর্প পালন" প্রবাদ বাক্যটি এক মর্মান্তিক সত্যে পরিণত হয়ে যায়। প্ররোচিত হয়ে ঐ হাবশীগণ একদিন মাদীকরেবকে হত্যা করার মাধ্যমে যী ইয়াযান পরিবারের শাসন ক্ষমতাকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়।

এ নাজুক অবস্থাকে একটি মোক্ষম সুযোগ মনে করে পারস্য রাজ কেসরা 'সানআ" প্রদেশের পারস্য বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তাঁর মাধ্যমে দেশটিকে পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণনত করেন। এরপর থেকে পারস্য বংশোদ্ভূত কয়েকজন গভর্ণর একাদিক্রমে ইয়েমেন প্রদেশের শাসন

সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। অবশেষে সর্বশেষ পার্সী গভর্ণর বাযান ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করলে ইয়েমেন পারস্য শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী জীবনধারা ও শাসন সৌকর্যের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে।[১]

হীরার সাম্রাজ্য (الملك بالحيرة) : ইরাক এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোরোশকাবির (খোরাশ অথবা সায়রাস জুর কারনাইন ৫৫৭-৫২৯ খ্রীষ্টাব্দপূর্ব অব্দ) এর সময় হতেই পারস্যবাসীগণের শাসন ব্যবস্থা চলে আসছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো শক্তি কিংবা সাহস কারই ছিল না। তারপর খ্রীষ্টাব্দপূর্ব ৩২৬ অব্দে সেকান্দার মাকদুনী পারস্য রাজ প্রথম দারাকে পরাজিত করে পারস্য শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে ফেলে। এর ফলে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। এ বিশৃঙ্খলা অবস্থা চলতে থাকে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ সময় কাহতানী গোত্র সমূহ দেশত্যাগ করা ইরাকের এক শস্য শ্যামল সীমান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এ দিকে আবার দেশত্যাগী আদাননীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। তারপর যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁরা ফোরাত নদীর উপকূল ভাগের এক অংশে বসতি স্থাপন করেন।

অন্য দিকে ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে আরদশীর যখন সাসানী সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ধীরে ধীরে পারস্যসাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ও ক্ষমতার পুনরুদ্ধার হতে থাকে। আরদশীর সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেন এবং দেশের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আরবদের অধিনস্থ করেন। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোযায় গোত্র শাম রাজ্যের দিকে গমন করেন। পক্ষান্তরে হীরা আনবারের আরব বাসিন্দাগণ বশ্যতা স্বীকারের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন।

আরদশীর সময়কালে হীর, বাদিয়াতুল ইরাক এবং উপদ্বীপবাসীগণের রাবীয়ী এবং মুযারী গোত্র সমূহের উপর জাযীমাতুল ওয়ায্যাহদের আধিপত্য ছিল। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, আরববাসীদের উপর আরদশীর সরাসরি আধিপত্য বিস্তার করতে চাননি। তিনি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আরববাসীগণের উপর সরাসরি আধিপত্য বিস্তার করার কিংবা সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের লুঠতরাজ বন্ধ করা খুব সহজ সম্ভব হবে না। এ প্রেক্ষিতে একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং তা ছিল, যদি গোত্র থেকে একজন শাসক নিযুক্ত করা হয় তাহলে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকজন এবং আত্মীয় স্বজনদের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সাহায্য লাভ সম্ভব হতে পারে।

এর ফলে আরও যে একটি বিশেষ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা ছিল তা হল, প্রয়োজনে রুমীয়গণের বিরুদ্ধে তাঁদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণের সুযোগ থাকবে। অধিকন্তু, শাম রাজ্যের রোম অভিমুখী আরব অধিপতিদের বিরুদ্ধে ঐ সকল আরব অধিপতিদের দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতিকে কিছুটা অনুকূল রাখা সম্ভব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে সময়ের জন্য মৌজুদ রাখা হতো যার দ্বারা মরুভূমিতে বসাবাসকারী বিদ্রোহীদের দমন করা সহজসাধ্য হতো।

২৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সময় সীমার মধ্যে জাযীমা মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং আমর বিন আদী বিন নাসর লাখমী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন লাখম্ গোত্রের প্রথম শাসনকর্তা এবং শাপুর আরদশীর সম-সাময়িক। এরপর কোবায বিন ফীরোযের যুগ পর্যন্ত হীরার উপর লাখমীদেরই শাসন কায়েম ছিল। কোবায়ের সময় মুজদাকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন স্বাধীন চেতা নরপতি। কোবায এবং তাঁর বহু প্রজা মুযদাকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কোবায আবার হীরার সম্রাট মুনযের বিন মাউস সামায়ের নিকট এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন সেই ধর্মগ্রহণ করে নেন। কিন্তু মুনযের ছিলেন কিছুটা আত্মমর্যাদা বোধ প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। প্রেরিত

---

[1] সৈয়দ সোলাইমান নদভী (রহঃ) 'তারিখে আবযুল কুরআন" ১ম খণ্ড ১৩৩ পৃঃ থেকে শেষ পযন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণাদির আলোকে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিবরণসহ আলোচনা করেছেনত, মওদূদী (রহ.)ও তাফহীমুল কুরআনের চতুর্থ খণ্ডে ১৯৫-১৯৮ পৃষ্ঠায় বিবরণাদি একত্রিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের উৎস হিসেবে এ সব ক্ষেত্রে বেশ মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কোন কোন গবেষক বিবরণাদি পূর্ববর্তীগণের কাহিনী বলে বর্ণনা করেছেন। {إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} (৮৩) سورة المؤمنون}

পয়গামের কোন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে, কোবায তাঁকে তাঁর পদ হতে অপসারণ করে তাঁর স্থানে মুযদাকের এক শিষ্য হারেস বিন আমর বিন হাজর ফিন্দীর হাতে হীরার শাসনভার অর্পণ করেন।

কোপায়ের পর পারস্যের রাজ্য শাসনভার এসে পড়ে কেসরা নওশের ওয়ার হাতে। ঐ ধর্মের প্রতি তাঁর মনে ছিল প্রবল ঘৃণা। তিনি মুযদাক এবং তাঁর অনুসারীগণের এক বড় দলকে হত্যা করেছিলেন। তারপর পুনরায় মুনযেরের প্রতি হীরার শাসনভার অর্পিত হয় এবং হারেস বিন আমরকে তাঁর দরবারে আগমণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তিনি বনু কালব গোত্রের দিকে পলায়ন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

মুনযের বিন মাউস সামা পরে নোমান বিন মুনয়ের কাল পর্যন্ত হীরার রাজ্য পরিচালনের দায়িত্ব তাঁরই বংশোধরের উপর ন্যস্ত করেন। আবার যায়েদ বিন আদী উবাদী কেসরার নিকট নোমান বিন মুনযের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করলে কেসরা রাগান্বিত হয়ে নোমানকে নিজ দরবারে তলব করেন। নোমান গোপনে বুন শায়বান গোত্রের দলপতি হানী বিন মাসউদের নিকট গিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যবৃন্দদ এবং সহায় সম্পদ তাঁর হেফাজতে দিয়ে কেসরার নিকট যান। কেসরা তাঁকে জেলখানায় আটক করে রাখেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ দিকে কেসরা নোমানকে কয়েদ খানায় আটকের পর তাঁর স্থানে ইয়াস বিন কাবিসা তায়ীকে হীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং হানী বিন মাসউদের নিকট থেকে নোমানের রক্ষিত আমানত তলব করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুটা সুক্ষ্ণ মর্যাদা সম্পন্ন লোক হানী তলবী আমানত প্রদান করতে শুধু যে অস্বীকারই করলেন তাই নয় বরং যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। তারপর যা হবার তাই হল। ইয়াস নিজের সুসজ্জিত বাহিনী কেসরার বাহিনী এবং মুরযবানের পুরো বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন মোকাবিলা করার জন্য। 'যীকার" নামক ময়দানে উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বনু শায়বান বিজয়ী হন এবং পারস্যবাসীগণ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ অতীব গুরত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আজমীদের বিরুদ্ধে আরবীদের এটাই ছিল প্রথম বিজয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবী করীম ﷺ-এর জন্মের অল্প কিছুকাল পর। হীরার উপর ইয়াসের আধিপত্য লাভের অষ্টম মাসে নবী করীম ﷺ দুনিয়াতে তশরীফ আনয়ন করেন।

ইয়াস এরপর কেসরা এক পার্সীকে হীরার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে লাখমীদের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুনযের বিন মা'রুব নামক এ গোত্রের এক ব্যক্তি শাসন কাজ পরিচালনে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের সময়ানুক্রমে যখন সবেমাত্র অষ্টম মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল এমতাবস্থায় তখন ইসলামের বিশ্ববিশ্রুত বীর কেশরী সিপাহ সালার খালেদ বিন ওয়ালীদ ইসলামের উপচে পড়া প্রবহমান পাবনধারার অগ্রদূত হিসেবে প্রবেশ করেন হীরায়।

শাম রাজ্যের শাসন (الملك بالشام) : যে যুগ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে সেই যুগে এক স্থান থেকে স্থানান্তরের হিজরত করে যাওয়ার এক হিড়িক সৃষ্টি হয়েছিল আরব গোত্র সমূহের মধ্যে। কোযায়া গোত্রের কয়েকটি শাখা শাম রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন সেখানে। বনু সোলাইম বিন হুলওয়ানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। বনু যাজআম বিন সোলাইম নামক যে গোত্রটি যাজায়েমাহ নামে পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল তা ছিল ওদের অন্তর্ভূক্ত। কোযায়ার সেই শাখাকে রুমীগণ আরব মরুভূমিতে যাযাবরগণ কর্তৃক পরিচালিত লুটতরাজের কবর থেকে নিস্কৃতি লাভ ও লুটতরাজ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এবং পার্সীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে তাঁদেরই এক ব্যক্তির মাথায় রাজ্য শাসনের মুকুট পরিধান করেছিল।

এরপর থেকে বেশ কিছু কিাল যাবৎ তাঁরই পরিচালনাধীন রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এঁদের মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধ শাসক ছিলেন সম্রাট যিয়াদ বিন হায়ুলাহ। অনুমান করা হয় যে যাজায়েমাহ গোত্র কর্তৃক পরিচালিত রাজ্য শাসন ব্যবস্থা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের পুরোটা জুড়েই চলছিল। তারপর সেই অঞ্চলে গাস্‌সানী গোত্রের বংশোধরগণের আগমনের কথাবার্তা চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এটা বলাই বাহুল্য যে

ইতিমধ্যেই গাস্সানীগণ বনু যাজাআমাকে পরাজিত করে তাঁদের ক্ষমতা ও সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এহেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রুমীগণ গাস্সানী বংশের শাসককে শাম অঞ্চলের জন্য আরবীয়দের সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। গাসসআনীদের রাজধানী ছিল দুমাতুল জান্দল। রুমীয় কর্মকাণ্ডের পরিচালক হিসেবে শাম অঞ্চলে পর্যায় ক্রমে সে পর্যন্ত তাঁদেরই রাজত্ব চলতে থাকে, যে পর্যন্ত ফারুকী প্রতিনিধিত্ব কালের মধ্যে ১৩শে হিজরীতে ইয়ার্মুক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং গাস্সানী বংশের শেষ শাসক জাবলা বিন আইহাম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন[1]। যদিও তার অহংবোধ ইসলামী সাম্যকে বেশী সময় পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে সে স্বধর্ম ত্যাগী হয়ে যায়।

হেজাযের নেতৃত্ব (الإمارة بالحجاز) : এটা সর্বজনিতবিদিত বিষয় যে, মক্কায় জনবসতির সূত্রপাত হয় ইসমাঈল (ﷺ)-এর মক্কাবাস থেকে ১৩৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত[2] থাকেন এবং আজীবন মক্কাবাসীগণের সর্দার ও বায়তুলাহ শরীফের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন[3]। তাঁর ওফাত প্রাপ্তির পর নাবেত ও কায়দার দু'সন্ত ানই পর্যায়ক্রমে মক্কার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তাঁর নানা মোয়ায বিন আমর জুরহুমী রাজ্যের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এভাবে মক্কার নেতৃত্ব বনু জুরহুম গোত্রের হাতে চলে যায় এবং এক যুগ পর্যন্ত তা তাঁদের হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকে। যেহেতু ইসমাঈল (ﷺ) পিতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বায়তুলাহ শরীফের নির্মাণ কাজ করেছিলেন, সেইহেতু তাঁর সন্তানদি বিশেষ এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। যদিও নেতৃত্ব কিংবা অধিকার লাভে তাঁদের কোন অংশীদারিত্ব ছিল না[4]।

তারপর দিনের পর দিন এবং বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হতে থাকল। কিন্তু ইসামাঈল (ﷺ) সন্তানগণ যেন মাতৃগর্ভেই রয়ে গেলেন। জনসমাজে তাঁরা অজ্ঞাত অখ্যাতেই রয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে বুখতে নস্সরের খ্যাতি প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বনু জুরহুম গোত্রের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মক্কার আকাশে আদনানীদের রাজনৈতিক নক্ষত্রের দ্যুতি চমকাতে আরম্ভ করে। এর প্রমাণ হচ্ছে, বুখতে নস্সর জাতে ইরক নামে স্থানে আরবদের সঙ্গে যে ভীষণ লড়াই করেছিলেন তার মধ্যে আরব সৈন্যদের সেনাপতি জুরহুমী ছিলেন না[5]।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দে বুখতে নস্সর আবার যখন মক্কা আক্রমণ করেন তখন আদনানীগণ পলায়ন করে ইয়েমেন চলে যান। সেই সময় বনি ইসরাঈলগণের নবী ছিলেন ইয়ারমিয়াহ। তিনি আদনানের সন্তান মায়াদ্দকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে শাম দেশে চলে যায় এবং বুখতে নস্সরের প্রভাব বিলুপ্তি হয়ে গেলে মায়াদ্দ পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর জুরহুম গোত্রের মাত্র এক জনের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন জুরহুম বিন জালহামাহ। মায়াদ্দ তাঁর কন্যা মায়ানাহকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন নেযার[6]।

এরপর থেকে মক্কায় জুরহুম গোত্রের অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকে। তাঁদেরকে প্রকট অসচ্ছলতার মধ্যে নিপতিত হতে হয়। ফলে তাঁর বায়তুলা হজ্বতীর্থ যাত্রীদের উপর নানা প্রকার অন্যায় উৎপীড়ন শুরু করে দেয়। খানায়ে কাবার অর্থ আত্মসাৎ করতেও তাঁর কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করেন না[7]।

এদিকে বনু আদনান গোত্র তাঁদের এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের উপর গোপনে গোপনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে থাকেন এবং তাঁদের উপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ ও কূপিত হয়ে উঠেন। তাই যখন বনু খোযায়া গোত্র মারুয্যাহরানে শিবির স্থাপন

---

1 মুহাযারাতে খুযরী, ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ তারীখে আবযুল কুরআন ২য় খণ্ড ৮০-৮২ পৃঃ।

2 পযদায়েশ মোজমুআ বাইবেল ২৫-১৭।

3 কালরে জাযীরাতুল আরব ২৩০-২৩৭ পৃঃ । ইবনে হেশাম ইসামাঈল (ﷺ)-এর বংশোধর থেকে কেবলমাত্র নাবেতকে নেতৃত্বদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

4 ইবনে হেশাম ইসামাঈল (ﷺ)-এর বংশোধর থেকে কেবলমাত্র নাবেতকে নেতৃত্বদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

5 কালবে জাযীরাতুল আরব ২৩০ পৃঃ।

6 রহাতামুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

7 কালবে জাযীরাতুল আরব ২৩১ পৃঃ।

করেন এবং লক্ষ্য করেন যে বনু আদনান গোত্র বুন ঘৃণাার চোখে দেখেছেন তখন এ সুযোগ গ্রহণ করে এক আদনানী গোত্রকে (বনু বকর বিন আবদেমানাফ বিন কেনানাহ) সঙ্গে নিয়ে বুন জুরহুম গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন এবং মক্কা থেকে তাঁদেরকে বিতাড়িত করা ক্ষমতা দখল করে নেন। এ ঘটনাটি ঘটে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দীর মধ্য ভাগে।

বনু জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যাবার সময় যমযম কূপের মধ্যে নানা প্রকার জিনিসপত্র নিক্ষেপ করে তা প্রায় ভরাট করে ফেলেন। যে সব জিনিস পত্র তাঁরা যমযম কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তার মধ্যে ছিল কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক নিদর্শন। মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বিবরণ মতে আমর বিন হারেস বিন মোযায জুরহুমী[১] খানায়ে কাবার দুটি হরিণ[২] কর্ণারে গ্রোথিত পাথরটি (হাজারে আসওয়াদ বা কালোপাথর) বাহির করে নিয়ে তা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তারপর নিজ গোত্র বনু জুরহুমকে সঙ্গে নিয়ে পরিত্যাগ এবং সেখানকার রাজত্ব শেষ হওয়ার কারণে তাঁদের দুঃখের অন্ত ছিল না। এ প্রেক্ষিতেই আমর নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন,

كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصَّفَا ** أنيس ولم يَسْمُر بمكة سامر

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ** صُرُوف الليالى والجُدُود العَوَاثِر [৩]

'হাজুন থেকে সাফা পর্যন্ত নিশিতে গল্প বলার কেউ ছিল না, কেন নেই? আমরাতো এরই অধিবাসী, সময়ের পরিবর্তনে আজ আমরা ভাগ্যাহত, হায়, আমাদের সর্বহারা বানিয়ে দিয়েছে'

ইসমাঈল (ﷺ)-এর যুগ ছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক দু'হাজার বছর পূর্বে। সেই হিসেবে মক্কায় জুরহুম গোত্রের অস্তিত্ব ছিল দু'হাজার একশত বছর পর্যন্ত এবং তাঁদের রাজত্ব কাল ছিল দু'হাজার বছর পর্যন্ত।

মক্কার উপর অধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর বনু বকরকে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বকে অন্তর্ভূক্ত না করেই বুন খোযায়াহ এককভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু তা সত্বেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং মর্যাদাসম্পন্ন তিনটি পদের অংশীদারীত্ব বনু মুযার গোত্র লাভ করেছিলেন। পদগুলো হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ:

১. হাজীদের আরাফা থেকে মুজাদালেফায় নিয়ে যাওয়া এবং ইয়াওমুন নাফার অর্থাৎ ১৩ই (যিলহজ্জের শেষ দিন) মীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার জন্য হাজীদের লিখিত আদেশ প্রদান। এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন ইলিয়াস বিন মুযার বংশোধরের মধ্যে বনি গাওস বিন মুররাহ যাদের বলা হতো 'সুফা'। এ মর্যাদার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে যতক্ষণ না সুফার কোন একজন লোক সকলের আগে কংকর নিক্ষেপ কাজ সম্পন্ন করতেন ততক্ষণ হজ্জযাত্রীগণ কংকর নিক্ষেপ করতে পারতেন না। অধিকন্তু, হজ্জযাত্রীগণ যখন কংকর নিক্ষেপ কাজ সম্পন্ন করতেন এবং মীনা হতে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন সুফার লোকেরা মীনার একমাত্র পথ অকাবার দু'পাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং যতক্ষণ না তাঁদের সকলের যাওয়া শেষ হতো ততক্ষণ সেই পথে যেতে দেয়া হতো না। তাঁদের চলে যাওয়ার পর অন্যান্য লোকদের জন্য পথ ছেড়ে দেয়া হতো। যখন সুফা বিদায় নিল তখন এ সম্মান বনু তামীমের এক পরিবার বনু সায়াদ বিন যায়েদ মানাতের অনুকূলে গেল।

২. ১০ই জিহজ্জ্ব তারিখ সকালে মুজদালেফা থেকে মীনার দিকে যাত্রা করার ব্যাপারটি (এফাজার জন্য) ছিল বনু আদওয়ানের এখতিয়ার্ভূক্ত এক মহা সম্মানের প্রতীক।

৩. হারাম মাস গুলোকে এগিয়ে নিয়ে আসা কিংবা পেছিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছিল উচ্চ সম্মানের প্রতীক। এ সম্মানের ব্যাপারটি ছিল বনু কেনানাহ গোত্রের অন্যতম শাখা বনু তামীম বিন আদীর এখতিয়ার্ভূক্ত[১]।

---

[1] **ইনি ঐ মুযায জুরহুমী নান যাঁর উল্লেখ ইসমাঈল (ﷺ)-এর ঘটনাতে আছে।**

[2] **মাসউদী লিখেছেন যে,** অতীতে পারস্যবাসীগণ খানায়ে করার জন্য প্রচুর সম্পদ ও মোতি পাঠাতেন। সাসান বিন বাবুক সোনার তৈরি দুটি হরিণ **মুক্তা তরবারী এবং অনেক** সোনা প্রেরণ করে। আমর সেই সবকে যমযম কূপে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলেন । মুরাওায়্যযাহাব ১ম খণ্ড ২০৫ পৃঃ।

[3] **ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৪-১১৫** পৃঃ।

মক্কার উপর বনু খোযায়া গোত্রের কর্তৃত্ব প্রায় তিনশত বছর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল[২]। এ সময়ের মধ্যে আদনানী গোত্রসমূহ মক্কা এবং হেজায সীমান্ত অতিক্রম করে নাজদ, ইরক, বাহরায়এন ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। মক্কার আশপাশে কেবলমাত্র কুরাইশদের কয়েকটি শাখা অবশিষ্ট ছিল। অবশ্য এঁদের ঘরবাড়ি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ছড়ানো ছিটানো এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এঁরা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার বসবাস করতেন। বনু কেনানাহ গোত্রের মধ্যেও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাদের কয়েকটি ঘড়বাড়ি ছিল। কিন্তু মক্কার প্রশাসন কিংবা বায়তুলাহর অভিভাবকত্বে তাঁদের কোন অংশ ছিল না। এমন এক সময়ে কুসাই বিন কেলাব গোত্র আত্মপ্রকাশ করে[৩]।

কুসাই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন মায়ের কোলে ছিলেন তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর মা বনু উযরা গোত্রের রাবিয়া বিন হারাম নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এ গোত্র শাম রাজ্যের কোন এক অঞ্চলে বসবাস করত। কাজেই কুসাইয়ের মা কুসাইকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে যান। বয়োঃপ্রাপ্তির পর কুসাই মক্কায় ফিরে আসেন। সেই সময় খোযায়ী গোত্রের হোলাইল বিন হামশিযা খোযায়ী ছিলেন মক্কার অভিভাবক। কুসাই হোলাইল কন্যা হোবাকে বিয়ে করা প্রস্তাব দিলে তিনি তা মঞ্জুর করেন এবং উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান[৪]। এর কিছু দিন পর হোলাইল মৃত্যু মুখে পতিত হলে মক্কা এবং বায়তুলাহর অভিভাবকত্ব নিয়ে খোযায়া এবং কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধোত্তর মক্কায় কুসাইয়া হয়ে উঠেন মধ্যমণি। মক্কা এবং বায়তুলাহর অভিভাকত্ব অর্পিত হয় তাঁরই হাতে।

খোযায়া এবং কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে তিন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, যখন কুসাইয়ের সন্তানাদি খুব উন্নতি লাভ করল, তাঁদের হাতে সম্পদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হল এবং মান-সম্মান ও বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এ দিকে হোলাইল যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন কুসাই এটা উপলব্ধি করলেন যে মক্কায় প্রশাসন এবং কা'বার অভিভাবকত্বের ব্যাপারে বনু খোযায়া ও বকরের তুলনায় তার দাবীই অগ্রাধিকারযোগ্য। তিনি এ ধারণাও পোষণ করতে থাকলেন যে কুরাইশগণ হচ্ছেন ইসমাঈলীয় বংশোদ্ভুত খাঁটি আরব এবং ইসামাঈলীয় বংশের অন্যান্যদের সরদার। কাজেই নেতৃত্বের অধিকার রয়েছে কেবল মাত্র তাঁদের।

এ প্রেক্ষিতে তিনি কুরাইশ এবং বনু খোযায়ার কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে এ মর্মে আলাপ-আলোচনা করেন যে, কেন বনু বকর এবং বনু খোযায়াকে মক্কা থেকে বহিস্কার করা হবে না। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ এ ব্যাপারে তাঁর মতের সঙ্গে অভিন্নমত পোষণ করেন[৫]।

দ্বিতীয় বিবরণ হচ্ছে, বনু খোযায়াব কথানুযায়ী হোলাইল নিজেই কুসাইকে অসীয়ত কনের যে, তিনিই মক্কার শাসনভার গ্রহণ করবেন এবং কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন[৬]।

তৃতীয় বিবরণ হচ্ছে হোলাইল তাঁর কন্যা হোবার হাতে বায়তুলাহর অভিভাবকত্ব ন্যস্ত করেন এবং আবু গিবশান খোযায়ীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হোবার প্রতিনিধি হিসেবে আবু গিবশান খোযায়াই হয়েযান কা'বার দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এ দিকে হোলাইল যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন কুসাই এক মশক মদের বিনিময় আবু গিবশানের নিকট থেকে কা'বার অভিভাবকত্ব ক্রয় করে নেন। কিন্তু খোযায়া সম্প্রদায় এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটি অনুমোদন না করে বায়তুলার ব্যাপারে কুসাইকে বাধা প্রদান করতে থাকেন। কুসাই ও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। বনু খোযায়াকে মক্কা থেকে বহিস্কার করার মানসে কুরাইশ এবং বনু কেনানাকে একত্রিত করে তাঁদের সহায়তা লাভের জন্য আবেদন জানালেন। কুসাইয়ার আহ্বানের সাড়া দিয়ে তাঁরাও একাত্মতা ঘোষণা করলেন।[৭]

---

[1] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ৪৪ ও ১১৯-১২০ পৃঃ।

[2] ইয়াকুতঃ মাদ্দাহ মক্কা।

[3] আলামা খুযরী মুহাযাবাত ১ম খণ্ড ৩৫ পৃঃ। ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭ পৃঃ।

[4] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭-১১৮ পৃঃ।

[5] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭-১১৮ পৃঃ।

[6] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭-১১৮ পৃঃ।

[7] রহামাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ৫৫পৃঃ।

কারণ যা হোক না কেন, ঘটনার রূপটি ঠিক এ রকম ছিল যে, হোলাইল যখন মৃত্যুবরণ করলেন সুফা তখন তাই করতে চাইলেন যা তিনি সর্বদা করে আসছিলেন। কুসাই তখন কুরাইশ এবং কেনানার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে আকাবার যে স্থানে তাঁরা সম্মিলিত হয়ে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, 'খানায়ে কা'বার অভিভাবকত্বের জন্য তোমাদের তুলনায় আমরা অধিকতরযোগ্য এবং আমাদের দাবী অগ্রগণ্য।'

কিন্তু কুসাইয়ার কথায় কর্ণপাত না করে তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। এ যুদ্ধে কুসাই তাঁদের পরাজিত করে তাঁর ইপ্সিত মান-মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দিকে কুসাই এবং সুফার মধ্যকার বিরোধের সুযোগ নিয়ে বনু খোযায়া ও বনু বকর অসহযোগিতার পথ অবলম্বন করলে কুসাই তাঁদের ভয় প্রদর্শন করে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। কিন্তু এ দু'গোত্রের লোকজন তাঁর কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা। করে বসেন। এভাবে উভয় পক্ষই এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহু লোকজন হতাহত হয়।

জানমালের প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে আপোষ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্যে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যেই আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং উভয় পক্ষই একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হন। এ লক্ষ্যে বনু বকর গোত্রের 'ইয়ামার বিন আওফ" নামক এক ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী মনোনীত করা হয়। সমস্যার সকল দিক পর্যালোচনা করে তিনি রায় দেন যে, মক্কার শাসন এবং খামায়ে কা'বার অভিভাবকত্বের ব্যাপারে খোযায়ার তুলনায় কুসাই অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী। অধিকন্তু তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এ যুদ্ধে কুসাই যত রক্তপাত ঘটিয়েছেন তার সবই অর্থহীন এবং পদদলিত বলে ঘোষণা করছি। তাছাড়া এ সিদ্ধান্তও ঘোষণা ঘোষিত হল যে, খোযায়া ও বন্ধু বকর যে সকল লোকজনকে হত্যা করেছেন তাঁদের জন্য দিয়াত প্রদান এবং খানায়ে কা'বার অভিভাবকত্ব অকুণ্ঠচিত্তে কুসাইয়ের হাতে সমর্পণ করতে হবে। সেই বিচারের রায়ের কারণে ইয়ামারের উপাধি হয়েছিল 'শাদ্দাখ'[1]। শাদ্দাখ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'পদ দলিতকারী ব্যক্তি"।

এ আপোষ-নিষ্পত্তি এবং চুক্তির ফলে মক্কার উপর কুসাই ও কুবাইশদের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ সম্ভব হয় এবং বায়তুলার ধর্মীয় নেতার মহা-সম্মানিত পদটিও কুসাই লাভ করেন। এর ফলে খানাযে কা'বা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লোকজনদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। মক্কার উপর কুসাইয়ের আধিপত্যের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে, অর্থৎ ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে [2]।

মক্কার শাসন ক্ষমতা লাভের পর কুসাই শাসন ব্যবস্থার কিছুটা সংস্কারমুখী কাজকর্মের দিকে মনোনিবেশ করেন। মক্কার আশপাশে বসাবাসরত কুরাইশগণকে মক্কায় নিয়ে এসে তিনি পুরো শহরটাকে তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার মাধ্যমে প্রত্যেক বংশের লোকজনদের বসাবসের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেন। তবে যাঁরা মাসকে আগে পিছে করতেন তাঁদের, এমন কি আলসফওয়ান, বনু আদওয়ান এবং বনু মুররা বিন আওফ প্রভৃতি গোত্র সমূহের লোকজনদের তাঁদের স্ব-স্ব পদে রাখেন। কারণ, কুসাই মনে করতেন যে, এ সকল কাজকর্মও ধর্মকর্মের অন্তর্ভূক্ত এবং এ সব ব্যাপারে রদ-বদল সঙ্গত নয়[3]।

কুসাইয়ের সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ডের এটাও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, তিনি কা'বা হারামের উত্তরে দারুন নাদওয়া স্থাপন করেন (এর দরজা ছিল মসজিদের দিকে)। দারুন নাদওয়া ছিল প্রকৃতই কুরাইশদের সংসদ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়াদির বিচার-বিশেষণ করা হতো। কুরাইশদের জন্য এটা ছিল একটি অত্যন্ত কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান।

---

[1] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১২৩-১২৪ পৃঃ।
[2] কালবে জাযীরাতুল আরব ২৩২ পৃঃ।
[3] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১২৫ পৃঃ

কারণ, এ দারুন নাদওয়াই ছিল তাঁদের ঐক্যের প্রতীক এবং এখানেই তাঁদের বিক্ষিপ্ত ও বিতর্কিত সমস্যাবলী ন্যায়সঙ্গত উপায়ে মীমাংসিত হতো[১]।

কুসাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও দলনেতৃত্বের প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের অধিকার তিনি লাভ করেন ঃ

১. তিনি দারুন নাদওয়ার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে পারতেন এ সকল অধিবেশনে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। সেখানে সমাজের লোকজনদের কন্যাদের বিবাহ-শাদীর আয়োজনও করা হতো।

২. **লেওয়া :** অর্থাৎ যুদ্ধের পতাকা কুসাইয়ের হাতেই বেঁধে রাখা হতো।

৩. **হেজাবাত :** এর অর্থ হচ্ছে খানাযে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ। কুসাই নিজেই খানায়ে কা'বার দরজা খুলতেন এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করতেন।

৪. **সেকায়া :** এর অর্থ হচ্ছে পানি পান করানো। হজ্জযাত্রীদের পানি পান করানোর একটা সুন্দর রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। এ উদ্দেশ্যে জলাধার বা চৌবাচ্চার পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকত। সেই পানিতে পরিমাণ মতো খেজুর ও কিসমিস দিয়ে বেশ সুস্বাদু পানীয় বা শরবত তৈরি করা হতো। হজ্জযাত্রীগণ মক্কায় আগমন করলে তিনি তাঁদের সেই পানীয় পান করাতেন[২]।

৫. **রেফাদাহ্ :** অর্থাৎ হজ্জযাত্রীদের মেহমানদারিত্ব। হজ্জযাত্রীগণের আপ্যায়ন ও এহসানির জন্য খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে খাওয়ানোর একটা রেওয়াজও প্রচলিত ছিল। এ উদ্দেশ্যে কুসাই কুরাইশগণের উপর একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা নির্ধারণ করে তা সংগ্রহ করতেন। সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল কিংবা যাঁদের নিকট খাদ্যবস্তু থাকত না এমন সব হজ্জযাত্রীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হতো[৩]।

উল্লেখিত কাজাকর্মগুলো প্রত্যেকটি ছিল উচ্চমার্গের সম্মানের প্রতীক এবং কুসাই ছিলেন এ সবের প্রতিভূ। কুসাইয়ের প্রথম পুত্রের নাম ছিল আবদুদ্দার। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুসাইয়ের জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয় পুত্র আবদে মানাফ সম্মান ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

এ কারণে কুসাই তাঁর পুত্র আব্দুদ্দারকে বললেন, যদিও কেউ কেউ সম্মান ও নেতৃত্বের ব্যাপারে তোমার চাইতেও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন রয়েছে তবুও তোমাকে আমি কোনভাবেই খাটো করে রাখতে চাইনা। আমি চাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুমি তাঁদের সমকক্ষ হয়ে থাকবে। এ আশ্বাসের প্রেক্ষিতে প্রথম পুত্র আব্দুদ্দারের অনুকূল তাঁর নেতৃত্বেও সম্মানের বিষয়গুলো অসিয়ত করেছিলেন। অর্থাৎ দারুন নাদওয়ার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার অধিকার খানায়ে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, যুদ্ধের পতাকা বহনের অধিকার, হজ্জযাত্রীগণকে পানি পান করানো হজ্জযাত্রীগণের মেহমানদারীর দায়িত্ব ইত্যাদি সব কিছুরই অধিকার আব্দুদ্দারকে অসিয়ত করলেন। কুসাই ছিলেন খুবই উন্নত মানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা। কাজেই, কেউ কখনো তাঁর বিরোধীতা করত না এবং তাঁর কোন প্রস্তাব কিংবা সিদ্ধান্ত কেউ কখনো প্রত্যাখ্যানও করত না। তাঁর মৃত্যুর পরও ধর্মের অন্তর্ভূক্ত করণীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো। এজন্য পুত্রগণ তাঁর মৃত্যুর পরেও দ্বিধাহীন চিত্তে অসিয়তগুলো মেনে চলেছিলেন।

কিন্তু আবেদমানাফ যখন ইনতেকাল কললেন তখন তাঁর পুত্রগণ উল্লেখিত পদ সমূহের ব্যাপারে আব্দুদ্দারের সন্তানের সঙ্গে রেষারেষি আরম্ভ করলেন। যার ফলে কুরাইশগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন এবং দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে উভয় পক্ষই সংযম প্রদর্শন করে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তির ফলে নেতৃত্ব ও মান মর্যাদার বিষয়গুলো উভয় পক্ষের মধ্যে বন্টিত হয়ে গেল। সেকায়া ও রেফাদাহ এ পদ দুটি দেয়া হল বনু আবদে মানাফকে। দারুনানদওয়ার সভাপতিত, লেওয়া ও হেজাবাতের দায়িত্ব বনু আব্দুদ্দারের হাতেই রয়ে গেল।

---

[1] মহাযাবাত খুযরী ১ম খণ্ড ৩৬ পৃঃ এবং আখবারুল কিরাম ১৫১পৃ ঃ।

[2] মুহাযারাতে খুযরী ১ম খণ্ড ৩৬ পৃঃ।

[3] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৩০ পৃঃ।

বনু আবদে মানাফ আবার তাঁদের প্রাপ্ত পদগুলোর জন্য নিজেদের মধ্যে লটারী করলেন। লটারীতে নাম উঠল হাশেম বিন আবদে মানাফের। তখন থেকে হাশেমই সেকায়া ও রেফাদাহ এ দুটি বিষয়ে নেতৃত্ব দান করতে থাকেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। হাশেমের মৃত্যু হলে তাঁর সহোদর মুত্তালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মুত্তালিবের পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আব্দুল মুত্তালিব (যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা) এ পদের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এমন কি যখন ইসলামের যুগ আরম্ভ হতো তখন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১]

এতদ্ব্যতীত আরও কিছু সংখ্যক পদ ছিল যা কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বিলিবন্টন করে নিয়েছিলেন। সেই সকল পদের সঙ্গে সংশিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কুরাইশগণ একটি ছোট রাষ্ট্র, বরং বলা যায় যে একটি রাষ্ট্রমুখী সমাজ কাঠামো প্রবর্তন করে নিয়েছিলেন। বর্তমানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় যে গনতান্ত্রিক ধারা অনুসৃত হয়ে থাকে কতটা যেন সেই ধাঁচ ও ছাঁচের প্রশাসনিক কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা তৎকালীন মক্কায় গড়ে তোলা হয়েছিল। যে পদগুলোর কথা ইতোপূর্বে বলা হল সে পদগুলোর হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. ঈসার : এতে ভবিষ্যৎ কথনধারা নিরূপণ এবং ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য মূর্তির পাশে রক্ষিত তীরের মালিকানার ব্যবস্থা ছিল। এ পদের অধিকর্তা ছিলেন বনু জুমাহ।

২. ধন-সম্পদের ব্যবস্থাপনা : মূর্তির নৈকট্য লাভের জন্য যে কুরবানী এবং মানত বা মানসী উৎসর্গ করা হতো। এ হচ্ছে তারই ব্যবস্থাপনা। বিবাদ বিসম্বাদ এবং মামলা মোকদ্দমা মীমাংসার ব্যাপারটিও ছিল এর সঙ্গে সংশিষ্ট। এ সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পিত ছিল 'বনু সহজ' গোত্রের উপর।

৩. শূরা : এ সম্মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোত্র ছিলেন বনু আসাদ।

৪. আশনাক : এ অধিদপ্তরের কাজ ছিল শোনিতপাতের খেসারত এবং জরিমানার ব্যবস্থা। এর দায়িত্ব অর্পিত ছিল বনু তায়েম গোত্রের উপর।

৫. উকার : এর কাজ ছিল জাতীয় পতাকা ধারণ। এ অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন বনু উমাইয়া গোত্র।

৬. কুব্বাহ : এ পদটি ছিল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল সৈন্যদের শিবির স্থাপন এবং সৈন্য পরিচালন। এ দায়িত্ব অর্পিত ছিল বনু মাখযুম গোত্রের উপর।

৭. সাফারাত : এ অধিদপ্তরের কর্তব্য ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন। এর দায়িত্বপ্রাপ্ত গোত্র ছিলেন বনু আদী।[২]

আরব দলপতিত্বের আরও কিছু কথা (الحكم في سائر العرب) :

ইতোপূর্বে কাহতানী ও অদানানীদের নিজ নিজ বাস্তাভিটা পরিত্যাগ করে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করা হয়েছে যে সবগুলো আরব রাষ্ট্রেই সংগঠিতত হয়েছিল এ সকল গোত্রের সমন্বয়ে। অধিকন্তু, তাঁদের নেতৃত্ব এবং দলপতিত্বের স্বরূপ এরূপ ছিল যে, যে সকল গোত্র হীরার আশপাশ বসাবাসরত ছিল তাদেরকে হীরা বা ইরাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত ধরা হয়েছে এবং যে সকল গোত্র বাদিয়াতুস শামে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁদেরকে গাস্সানী শাসকদের অন্তর্ভূক্ত ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে যেভাবে যতটুকুই বলা হোকনা কেন, তা হবে শুধু কথার কথা। এ সকল গোত্র, উপগোত্র, তাঁদের বসবাস, দেশত্যাগ এবং দেশে পুনরাগমন সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক সূত্র কিংবা আলোচনাকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

উপরি উল্লেখিত গোত্র সমূহ ছাড়া আরও যে সকল গোত্র দেশের অভ্যন্তরে বসবাস করত তাঁদের সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সকল দিক দিয়েই এ সব গোত্র স্বাধীন ছিল। এদের মধ্যে দলপতি ব্যবস্থা চালু ছিল। গোত্রের জনসাধারণ নিজেরাই তাদের দলপতি নির্বাচিত করত। তাঁরা নিজ গোত্রকে একটি ছোট রাষ্ট্র এবং

---

1 ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১২৯-১৩২, ১৩৭, ১৪২, ১৭৮-১৭৯ পৃঃ।

2 তারীখে আবযুল কুরআন ২য় খণ্ড ১০৪-১০৬ পৃঃ।

গোত্রপতিকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা প্রদান করত। গোত্রীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্থিতিশীলতা ও অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, গোত্রীয় **জনগণের নিরাপত্তা, বহিঃশত্রুর** আক্রমণ পতিহত করা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই গোত্রীয় সম্মিলিতভাবে কাজ করত।

যে কোন গোত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ ঘোষণঅ, যুদ্ধ পরিচালনা কিংবা সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করতে পারত। **যুদ্ধ কিংবা শান্তি** যে কোন অবস্থাতেই গোত্রের লোকজনকে গোত্র পতির নির্দেশ মেনে চলতে হতো, কোন **অবস্থাতেই** গোত্রের লোকজনকে গোত্র পতির নির্দেশ মেনে চলতে হতো, কোন অবস্থাতেই তাঁর বিুরদ্ধাচরণ করা চলত না। এমনকি কোন কোন দলপতির অবস্থা এমনটিও হতো যে, যদি তিনি রাগান্বিত হতেন তাহলে তৎক্ষাণাৎ সহস্রাধিক তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে যেত। সে ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার কোন অবকাশই থাকত না যে গোত্রপতির রাগন্বিত হওয়ার কারণটি কী?

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নেতৃত্বের প্রশ্নে দলপতির চাচাত ভাইদের সঙ্গে রেষারেষি এবং দ্বন্ধও শুরু হয়ে যেত। এ কারণে দলপতিকে কতগুলো নিয়ম বিধি মেনে চলতে হতো। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

১. স্বগোত্রীয় লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে দলপতিকে সংযমের পরিচয় দিতে হবে এবং উদার মনোভাব অবলম্বন করতে হবে।

২. রাষ্ট্রীয়- অর্থ সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে তাঁকে মিতব্যয়ী হতে হবে। কোনক্রমেই তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করবেন না।

৩. মেহমানদারী করার ব্যাপারে তাঁকে অগ্রণী ভূমিকাপালন করতে হবে।

৪. কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই দয়া ও ধৈর্যশীলতার সঙ্গে কাজকর্ম করতে হবে।

৫. গোত্রীয় বীরত্বের প্রতিভূ হিসেবে তাঁকে বীরত্বের বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করতে হবে।

৬. যে কাজ করলে লজ্জিত হতে হবে এমন সব কাজকর্ম করা থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হবে।

৭. সাধারণ লোকজনদের দৃষ্টিতে একটি কল্যাণমুখী সমাজ এবং বিশেষভাবে কবিগণের দৃষ্টিতে একটি সুন্দর ও চরমোৎকর্ষের পথে অগ্রসরমান সমাজ জীবনের জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে। কবিগণকেই সমাজের মুখ্য মুখপাত্র মনে করা হতো। এভাবে গোত্রপতিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীগণের তুলনায় উচ্চাসন বা উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য বিধিবদ্ধ আচরণ ধারার অনুসরণের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক জীবন যাপন করতে হতো।[1]

দলপতিগণের নিকট থেকে সমাজ যেমন অনেক কিছুটা আশা করত, অপরপক্ষে তেমনি আবার সমাজ দলপতিগণের জন্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করত। সে সম্পর্কে জনৈক কবি তাঁর ছন্দ-সৌকর্যের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন :

لك المِرْبَاع فينــا والصَّفَايا ** وحُكْمُكَ والنَّشِيطة والفُضُول

"আমাদের নিকটে তোমার জন্য গণীমতের সম্পদের এক চতুর্থাংশ ('১/৪) এবং যা তুমি পছন্দ করবে এবং সেই মাল যার তুমি মীমাংসা করবে এবং বিনা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ এবং বিলিবন্টন থেকে যা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।"

মেরবা : মালে গণীমতের এক চতুর্থাংশ (১/৪)

সফি : ঐ সম্পদ যা বন্টনের পূর্বেই দলপতি নিজের জন্য নির্ধারিত করে রাখেন।

নাশিতা : এ সম্পদ যা মৌলিকস্তর অর্থাৎ সাধারণ লোকজনের নিকট পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে দলপতি গ্রহণ করেন।

ফযুল : ঐ সম্পদ যা গাজীদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা সম্ভব না হওয়ার কারণে অবশিষ্ট থেকে যায়। বন্টনের পর অবশিষ্ট উট ঘোড়া ইত্যাদি সম্পদ দলপতিগণের প্রাপ্য হয়ে থাকে।

---

[1] ইবনে হিশাম ১২৯, ১৩২, ১৩৭, ১৪২, ১৭৮ ও ১৭৯ পৃষ্ঠা।

রাজনৈতিক অবস্থা (الحالة السياسية) :

আরব উপদ্বীপের গোত্র সমূহ এবং গোত্রপতিগণ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আরব উপদ্বীপের তিন দিকের সীমান্তবর্তী দেশ সমূহের রাজনৈতিক অবস্থা দারুণ অস্থিতিশীল, বিশৃঙ্খলা এবং পতনোন্মুখ। সমাজের মানবগোষ্ঠী হয় মানব, নয়তো দাস, কিংবা হয় রাজা, নয়তো প্রজা, এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মনির, রাজা দলপতি, নরপতি যে উপাধিতেই ভূষিত থাকুন না কেন, সমাজ-জীবনেরদ যাবতীয় কল্যাণ বা সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত থাকত তাদেরই জন্য বিশেষ করে বহিরাগত নেতাদের জন্য। অপরপক্ষে, দলপতি বা নরপতিগণের যাবতীয় আরাম-আয়াশে, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির আয়োজন ও উপকরণাদির জন্য প্রাণপাত প্ররিশ্রম করতে হতো জনসাধারণ এবং দাসদাসীগণকে। আরও সহজ এবং সুস্পষ্টভাবে বললে বলা যেতে পারে যে, প্রজারা ছিল যেন শস্যক্ষেত্র স্বরূপ যেখান থেকে সংস্থান হতো রাষ্ট্রের যাবতীয় আয়-উপার্জনের। রাষ্ট্র নায়কগণ এ সকল উপার্জন তাঁদের ভোগ-বিলাস, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং অন্যান্য নানাবিধ দুষ্কর্মে ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার কোনই মূল্য থাকতনা। অত্যাচার অনাচারে জর্জরিত আরও শতধারে বর্ষিত হতে থাকত তাঁদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের অগ্নিধারা। এক কথায়, স্বৈরাচারী শাসন বলতে যা বোঝায় তা চরমে পৌঁছেছিল সেই সব অঞ্চলে। কাজেই, অসহায় মানুষের মুখ বুজে সে সব সয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

সেই সব অঞ্চলের আশপাশে বসাবাসকারী গোত্রগুলোকেও মাঝে মাঝে এ সব অনাচার উৎপীড়নের শিকার হতে হতো। উল্লেখিত স্বৈরাচারী দলপতিগণের ভোগলীপ্সা, স্বার্থান্ধতা এবং অর্থহীন অহংবোধের বিষ-বাষ্পে বিপর্যস্ত হয়ে তাঁদেরকেদ ছুটে বেড়াতে হতো দ্বিগ্বিদিকে। এ দলপতিগণ তাঁদের হীন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে আরও একটু অগ্রসর হয়ে কখনো ইরাকীদের হাতকে শক্তিশালী করত, কখনো বা তাল মিলিয়ে চলত শামবাসীদের সঙ্গে।

যে সকল গোত্র আরব ভুখণ্ডের অভ্যন্তরভাগে বসবাস করত তাদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও নানাবিধ সমস্যা এবং বিশৃঙ্খলা অবস্থা বিরাজ করত। গোত্রে গোত্রে বিবাদ-বিসম্বাদ, বংশপরস্পরাগত শত্রুতা, ধর্মীয় মতবিরোধ, গোষ্ঠিগত বিদ্বেষ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরিবেশ থাকত উত্তপ্ত। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজ নিজ গোত্রের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হোক তা যাচাই বাছাইর্য়ের কোন প্রশ্নই থাকত না। যেমনটি তাদের মুখপাত্রে বলা হয়েছে ঃ

وما أنا إلا من غَزِّية إن غَوَتْ ** غويت، وإن ترشد غزية أرشد

'আমিও তো গাযিয়া গোত্রের একজন। যদি সে ভ্রান্ত পথে চলে তবে আমিও ভ্রান্ত পথে চলব এবং যদি সে সঠিক পথে চলে তবে আমিও সঠিক পথে পরিচালিত হব।

আরবের অভ্যন্তরে এমন কোন পরিচালক ছিলেন না যিনি তাঁদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করবেন এবং এমন কোন আশ্রয়স্থল ছিল না বিপদ-আপদ কিংবা সমস্যা -সংকুল সময়ে যেখানে তাঁরা আশ্রিত হতে পারবেন এবং প্রয়োজনে যার উপর তাঁরা নির্ভরশীল হতে পারবেন।

তবে হ্যাঁ, এটা নিঃসন্দেহ যে, উপদ্বীপ রাষ্ট্র হেজাযকে কোন মতে সম্মানের আসনে আসীন বলে মনে করা হতো এবং ধর্মকেন্দ্র ও ধর্মীয় আচর-আচরণের পরিচালক ও রক্ষক হিসেবে ধারণা করা হতো। প্রকৃতপক্ষে এ রাষ্ট্র ছিল পার্থিব পরিচালন ও ধর্মীয় পুরোহিত তত্ত্ববিদদের এক এক প্রকার মিশ্রিত রূপ। এর দ্বারা আরববাসীদের উপর ধর্মীয় পরিচালনার নামে তাঁদের মর্যাদার উচ্চাসন অর্জিত হতো এবং হারাম শরীফ ও হারাম শরীফের আশ-পাশের শাসন কাজ নিয়মিত পরিচালিত হতো। তাঁরাই বায়তুলার পরিদর্শকগণের জন্য প্রয়োজন পরিপূরণের ব্যবস্থাপনা এবং ইবরাহীম শরীয়তের হুকুম আহকাম চালু রাখার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এ রাষ্ট্র এতই দুর্বল ছিল যে, আরবের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ দায়-দায়িত্বের গুরুভার বহনের ক্ষমতা তার ছিল না। এ সত্যটি হাবশীদের আক্রমণের সময় সুস্পষ্টভাবে প্রামণিত হয়ে যায়।

আরবে ধর্মকর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গে (ديانات العـــرب) :

আরবে বসবাসকারী সাধারণ লোকজন ইসমাঈল (عليه السلام)-এর দাওয়াত ও প্রচারের ফলে ইবরাহীম (عليه السلام) **প্রচারিত দ্বীণের** অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই তাঁরা ছিলেন আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাসী এবং একমাত্র আল্লাহরই **উপাসনা করতেন**। কিন্তু কাল প্রবাহে ক্রমান্বয়ে তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদ এবং খালেস দ্বীনী শিক্ষার কোন কোন **অংশ ভুলে** যেতে থাকেন, কিংবা সে সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আল্লাহর একত্ববাদ এবং দ্বীনে ইবরাহীম (عليه السلام)-এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট অবশিষ্ট থেকে যায় যে পর্যন্ত না বনু খোযায়া গোত্রের সর্দার আমর বিন লোহাই জন সমক্ষে এসে উপস্থিত না হন। ধর্মীয় মতাদর্শের লালন ও পরিপোষণ, দান খয়রাত এবং ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কারণে লোকজন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপোষণ করতে থাকেন। অধিকন্তু, তাঁকে বড় বড় আলেম এবং সম্মানিত ওলীদের দলভূক্ত ধরে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন।

এমন অবস্থার এক পর্যায়ে তিনি শাম দেশ ভ্রমণে যান এবং সেখানে গিয়ে মূর্তি পূজো-অর্চনার জাঁকালো চর্চা প্রত্যক্ষ করেন। শাম দেশ বহু পয়গম্বরের জন্মভূমি এবং আল্লাহর বাণী নাজিলের ক্ষেত্র হওয়ায় ঐ সকল মূর্তি পূজোকে তিনি অধিকতর ভাল এবং সত্য বলে ধারণা করেন। তাই দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি 'হোবল" নামক মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং খানাযে কা'বার মধ্যে তা রেখে দিয়ে পূজো অর্চনা শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসীগণকেও পূজা করার জন্য আহ্বান জানান। মক্কাবসীগণ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মূর্তি হোবলের পূজা করতে থাকেন। কাল-বিলম্বে না করে হেজাযবাসীগণও মক্কাবাসীগণের পদাংক অনুসরণ করতে থাকেন। কারণ, তাঁরাও এক কালে বায়তুলাহর অভিভাবক এবং হারামের বাসিন্দা ছিলেন।[১] এভাবে একত্ববাদী আরববাসী অবলীলাক্রমে মূর্তিপূজার মতো এক অতি জঘণ্য এবং ঘৃণিত পাপাচার ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এভাবে আরব ভূমিতে মূর্তিপূজার গোড়াপত্তন হয়ে যায়।

'হোবল' ছাড়া আরবের প্রাচীনতম মূর্তিগুলোর মধ্যে ছিল 'মানাত' মূর্তি। লোহিত সাগরের তীরে কোদাইদ নামক স্থানে ভূখণ্ডের সন্নিকটস্থ মুসালাহ নামক স্থানে তা প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২] এরপর তায়েফে নাখলা নামক উপত্যকায় 'উয্যা' নামক মূর্তির পূজা চলতে থাকে। এ তিনটি ছিল আরবের সব চাইতে বড় এবং বিখ্যাত মূর্তি। এর পর হেজাযের বিভিন্ন অংশে শিরক ও মূর্তি পূজার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

কথিত আছে যে এক জিন আমর বিন লোহাইএর অনুগত ছিল। সে বলল যে, নূহ সম্প্রাদায়ের মূর্তি ওয়াদ্দা সোওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর জেদ্দার ভূমিতে প্রোথিত রয়েছে। এ মূর্তির খোঁজ পেয়ে আমির বিন লোহাই জেদ্দায় যান এবং মাটি খনন করে মূর্তিগুলোকে বাহির করেন। তারপর সেগুলোকে তেহামায় নিয়ে যান এবং পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে মূর্তিগুলো বিভিন্ন গোত্রের হাতে তুলে দেন। এভাবে একেকটি মূর্তি গোত্রগুলোর অধিকারে এসে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকজনদের ঘরে ঘরেও মূর্তি স্থান পেয়ে যায়।

তারপর মক্কার মুশরিকগণ একের পর এক মূর্তি দিয়ে মসজিদুল হারামওে পরিপূর্ণ করে তোলেন। কথিত আছে যে, মক্কায় বিজয়ের পূর্বে মসজিদুল হারামে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মুবারকগুলোকে লাঠি দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। একের পর এক তিনি যখন মূর্তিগুলোকে লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন তখণ সেগুলো পড়ে যাচ্ছিল। তারপর তিনি সেগুলোকে মসজিদুল হারামের বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[৩] উদ্দেশ্য ছিল, মূর্তিপূজা ও অংশীবাদিতা দ্বীনের ক্ষেত্রে সব চাইতে নিকৃষ্ট অনাচার এবং পাপাচার হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন আরববাসীগণের অসার অহংকার ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তাঁরা দ্বীনে ইবরাহীম (عليه السلام)-এর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এ ধারণাকে একদম ধূলিসাৎ করে দেয়।

---

[1] শাইখ মুহাঃ আব্দুল নাজদী (রহঃ) মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (ﷺ) ১২ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ২২২ পৃঃ।

[3] শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী মুখতাসার সীবাতুর রাসূল (ﷺ) ১৩, ৫০-৫৪ পৃঃ।

এ দিকে আবার জাহেলিয়া যুগের লোকজনদের মূর্তি পূজার বিশেষ বিশেষ রীতি পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। এ সবের অধিকাংশই আমর বিন লোহায়েরই মন গড়া তৈরি। ইবনে লোহাই প্রবর্তিত মূর্তিপূজকের দল মনে করত যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে তিনি যে রীতিপদ্ধতির কথা বলেছেন তা ইবরাহীম (عليه السلام) প্রবর্তিত দ্বীন এর পরিবর্তন কিংবা বিলোপসাধন নয়। বরং সেটা হচ্ছে ভালোর জন্য কিছু কিছু নবতর সংযোজনের মাধ্যমে সর্বযুগের সকল মানুষের উপযোগী একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান প্রবর্তন। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা তাঁদের মন গড়া দ্বীনের ক্ষেত্রে যে রীতি পদ্ধতির প্রচলন করে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. মূর্তিপূজকগণ দরগার খাদেমের মতো মূর্তির পাশে বসে তাদের নিকট আশ্রয় অনুসন্ধান করতেন, উচ্চকণ্ঠে তাদের আহ্বান জানাতেন, অভাব মোচন ও বিপদাপদ হতে উর্দ্ধারের জন্য অনুনয় বিনয় সহকারে তাদের নিকট প্রার্থনা জানাতেন। প্রার্থনাকারীগণ মনে করতেন যে, মূর্তিরূপী এ সকল দেবদেবী তাঁদের প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর নিকটে সুপারিশ পেশ করবে যা তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

২. তাঁরা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ সম্পন্ন করতেন, মূর্তিকে তাওয়াফ এবং সেজদাহ করতেন এবং তাদের সামনে অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়াবনত আচরণ করতেন।

৩. মূর্তিদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মানত এবং কুবাণী উৎসর্গ করা হতো। উৎসর্গীকৃত জীবজানোয়ারগুলোকে মূর্তির বেদীমূলে তার নাম নিয়ে জবেহ করা হতো। ঘটনাক্রমে অন্য কোথাও জবেহ করা হলেও মূর্তির নাম নিয়েই তা করা হতো। তাঁদের এ উসর্গীকৃত পশু জবেহ করা প্রসঙ্গে দুটি রীতির কা আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন :

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]

" আর যা কোন আস্তানায় (বা বেদীতে) যবহ করা হয়েছে।" [মায়িদা (৫) : ৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:١٢١]

"যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না।" (আল আন'আম ৬ : ১২১)

৪. মূর্তি পূজকগণ পূজার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের কিছু অংশ, উৎপাদিত শস্যাদি এবং পালিত পশুদলের কিছু অংশ মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখত। এ ক্ষেত্রে আরও একটি আকর্ষণীয় ও প্রনিধানযোগ্য ব্যাপার ছিল, উৎপাদিত শস্যাদি এবং পালিত পশুদলের কিছু অংশ আল্লাহর নামেও নির্দিষ্ট করে রাখা হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটি হতে দেখা যেত যে আল্লাহর নির্দিষ্ট করে রাখা দ্রব্যাদি মূর্তির জন্য রেখে দেয়া দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে তা মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেয়া হতো, কিন্তু মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে কখনই তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام:١٣٦]

" আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তাথেকে তারা আল্লাহ্‌র জন্য একটা অংশ নির্দিষ্ট করে আর তারা তাদের ধারণামত বলে এ অংশ আল্লাহ্‌র জন্য, আর এ অংশ আমাদের দেবদেবীদের জন্য। যে অংশ তাদের দেবদেবীদের জন্য তা আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, কিন্তু যে অংশ আল্লাহ্‌র তা তাদের দেবদেবীদের নিকট পৌঁছে। কতই না নিকৃষ্ট এ লোকদের ফায়সালা!" (আল আন'আম ৬ : ১৩৬)

৫. মূর্তির নৈকট্য লাভের আরও একটি রীতি ছিল যে, মুশরিকগণ শস্যাদি এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির মানত মানত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

﴿وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:١٣٨].

'তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এ গবাদি পশু ও ফসল সুরক্ষিত। আমরা যার জন্য ইচ্ছে করব সে ছাড়া কেউ এগুলো খেতে পারবে না। এ সব তাদের কল্পিত। কিছু গবাদি পশুর পিঠে চড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিছু গবাদি পশু যবহ করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না।' [আল আন'আম (৬) : ১৩৮]

৬. সে সব চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে 'বাহীরা, সায়েরা, ওয়াসীলা এবং হামী' নামে পশু ছিল। ইবনে ইসহাক বলেন যে, 'বাহীরা' সায়েবারই' মেয়ে সন্তানকে বলা হয় এবং সেই উটকে 'সায়েবা' বলা হয় যার গর্ভ থেকে দশ বার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে, এর মধ্যে কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয় নি। এমন অবস্থা বা প্রকৃতির উটকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। এর পৃষ্ঠদেশে কেউ আরোহণ করত না, এর লোশম কর্তন করত না এবং মেহমান ব্যতীত অন্য কেউই তার দুগ্ধ পান করত না।

এরপর সেই উট যখন মেয়ে সন্তান প্রসব করত তখন তাঁর কান চিরে দেয়া হতো এবং তাকেও তার মায়ের সঙ্গে মুক্তভাবে চলা ফেরার জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। এর পৃষ্ঠদেশে কেউ সওয়ার হতো না, তার লোম কাটা হতো না এবং মেহমান ব্যতীত অন্য কেউই তা দুগ্ধও পান করত না। একে বলা হতো 'বাহীরা' এবং তার মাকে বলা হতো 'সায়েরা'।

'ওয়াসীল' বলা হতো সেই ছাগীকে যে ছাগী একাদিক্রমে দুটি দুটি করে পাঁচ দফায় দশটি কন্যা সন্তান প্রসব করে এবং এর মধ্যে কোন পুত্র সন্তান প্রসব করে না। সেই ছাগীকে এ কারণে ওয়াসীলা বলা হয় যে, সে তার সবগুলো মেয়ে সন্তানকে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। এর পর সেই ছাগী যে বাচ্চা প্রসব করবে তাকে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেতে পারবে, মহিলারা খেতে পারবে না। তবে কোন মৃত বাচ্চা প্রসব করে তবে পুরুষ এবং মহিলা সকলেই তাকে খেতে পারবে।

সেই উটকে 'হামী' বলা হয় যার প্রজননের মাধ্যমে পর পর একাদিক্রমে দশটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে এবং এ সবের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে নি। এ জাতীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষিত থাকত, অর্থাৎ এর প্রষ্ঠদেশে আরোহন নিষিদ্ধ ছিল। এর লোমও কর্তন করা হতো না। শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যে উটের পালের মধ্যে ওকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো, অন্য কোন কাজে ওকে ব্যবহার করা হতো না। জাহেলিয়াত আমলের মূর্তি পূজার সেই সকল রীতি পদ্ধতির প্রতিবাদ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

:﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة:١٠٣]

' আল্লাহ না নির্দিষ্ট করেছেন বাহীরাহ্, না সাইবাহ্, না ওয়াসীলাহ্, না হাম বরং যারা কুফুরী করেছে তারাই আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে তা আবিষ্কার করেছে, তাঁদের অধিকাংশই নির্বোধ। " (আল-মায়িদাহ ৫ : ১০৩)

:﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ [الأنعام:١٣٩]

'তারা আরো বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা খাস করে আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, আর আমাদের স্ত্রীলোকদের জন্য নিষিদ্ধ, কিন্তু তা (অর্থাৎ গর্ভস্থিত বাচ্চা) যদি মৃত হয় তবে সকলের অতে অংশ আছে।" (আল-আন'আম ৬ : ১৩৯)

যেভাবে উল্লেখিত পশুগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেমন- বাহীরা, সায়েবা ইত্যাদি এবং এ ছাড়া আরও বর্ণনা করা হয়েছে[1]

তা ইবনে ইসহাকের উল্লেখিত ব্যাখ্যার কিছু বিপরীত এবং কিছুটা অন্য ধরণের বলে মনে হয়। সাঈদ বিন মুসাইভ (رحمه الله)-এর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ পশুগুলো মুশরিকদের তাগুত মূর্তি সমূহের জন্য ছিল।[2]

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

(رأيت عمرو بن عامر بن لحى الخزاعى يجر قصبه [أي أمعاءه] في النار)

'আমর বিন লোহাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মূর্তির নামে চতুষ্পদ জন্তু উৎসর্গ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।'[3]

আরববাসীগণ মূর্তিকে কেন্দ্র করে এতসব কিছু করত এ বিশ্বাসে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে। যেমনটি কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]

(মুশরিকগণ বলত) 'আমরা তাদের 'ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।" (আয-যুমার ৩৯ : ৩)

আরও ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾ [يونس:١٨]

"আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে 'ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, 'ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশকারী।" (ইউনুস ১০ : ১৮)

আরবের মুশরিকগণ 'আযলাম' অর্থাৎ কথন সম্পর্কে ফলাফল নির্ণয়ের জন্য তীরও ব্যবহার করত (আযলাম হচ্ছে যালামুন এর বহু বচন এব যালাম ঐ তীরকে বলা হয় যার উপর পালক লাগানো হতো না)। ভবিষ্যৎ কথন সম্পর্কিত ফলাফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তীরগুলো ছিল তিন প্রকারের:

প্রথম : এ শ্রেণীভূক্ত তীরগুলোর গায়ে 'হ্যাঁ" কিংবা না লেখা থাকত। এ শ্রেণীভূক্ত তীরগুলোর সাধারণত ভ্রমণ, বিয়ে-শাদী এবং অনুরূপ অন্য কোন কার্যোপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হতো। বিশেষ একটি পদ্ধতিতে তীর বাছাই পর্ব সম্পাদিত হতো। কর্মপন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাছাইকৃত তীর গোত্রে 'হ্যাঁ" লেখা থাকলে পরিকল্পিত কাজ আরম্ভ করা হতো। কিন্তু বাছাই করতে গিয়ে 'না" লিখিত তীর বাহির হলে পরিকল্পিত কাজটি এক বছরের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হতো এবং আগামীতে আবার এ কাজের জণ্য গুণাগুণ বা লক্ষণ নির্ধারক বাহির করা হতো।

দ্বিতীয় : এ শ্রেণীভূক্ত তীরগুলোর কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'পানি" কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'দিয়াত" এবং অন্যান্য গুলোর গায়ে লেখা থাকত অন্য কোন কিছু।

তৃতীয় : এ শ্রেণীভূক্ত তীরগুলোর মধ্যে কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'তোমাদের অন্তর্ভূক্ত", কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'তোমাদের ছাড়া", হয়তো বা কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'মুলহাক' (যার অর্থ হচ্ছে মিলিত)। উল্লেখিত তীরগুলোর ব্যবহার ছিল এরূপ- কারো বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে যখন সন্দেহের সৃষ্টি হতো তখন তাকে একশত উট সহ হোবল নামক মূর্তির নিকট নিয়ে যাওয়া হতো। উটগুলো তীরধারী সেবায়েতের (ঋষি) নিকট সমার্পণ করা হতো। তিনি সবগুলো তীর একত্রিত করে ঝাঁকুনী দিয়ে দিয়ে ঘুরাতে থাকতেন। তারপর তার মধ্য থেকে একটি তীর বাহির করে আনা হতো। তীর গোত্রে 'তোমাদের অন্তর্ভূক্ত' লিখিত তীরটি যদি বাহির হতো

---

[1] সীরাতে ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ৮৯-৯০ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৪৯৯ পৃঃ।

[3] প্রাগুক্ত

তবে তাঁকে তাঁদের গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে স্থান দেয়া হতো। অপরপক্ষে যদি 'তোমাদের **বাহিরের' লিখিত** তীরটি বাহির হতো তখন তাঁকে 'হালীফ' হিসেবে স্থান দেয়া হতো। কিন্তু যদি 'মুলহাক' লিখিত **তীরটি বাহির হতো** তাহলে তাঁকে তাঁর নিজস্ব স্থানেই রাখা হতো। সেই গোত্রীয় ব্যক্তি কিংবা 'হালীফ' হিসেবে **স্থান** দেয়া হতো না।[1]

আরবের মুশরিকগণ তথাকথিত ভবিষ্যদ্বক্তা যাদুকর এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদগণের ভবিষ্যদ্বাণী, কলাকৌশল এবং কথাবার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন। যিনি আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং গোপন তত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি অবগত আছেন বলে দাবী করতেন তাঁকে বলা হতো 'কাহেন'। কোন কোন কাহেন এরূপ দাবীও করতেন যে, একটি জিন তাঁর অনুগতত রয়েছে এবং সে তাঁকে সংবাদটি সংগ্রহ ও পরিবেশন করে থাকে। কোন কোন কাহেন আবার এরূপ দাবীও করতেন যে, অদৃশ্যের খবরাখবর নেয়ার মতো যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর রয়েছে এবং তিনি তা নিয়েও থাকেন।

তৎকালীন সমাজে আরও এক ধরণের লোক ছিলেন যাঁরা মানুষের কথা ও কর্মের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। এঁরা 'আশরাফ' নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁদের দাবী ছিল, কোন লোক যখন কোন কিছু ব্যাপারে অবগত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট আগমণ করেন তখন তাঁর অবস্থা, কিছু কিছু পূর্ব লক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কথাবার্তার মাধ্যমে ঘটনার স্থান বা ঠিকানা এবং ঘটনার সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিগোষ্ঠির খোঁজখবর তিনি দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- অপহৃত সম্পদ, অপহরণের স্থান ও সময়, হারানো পশু কিংবা অন্য কোন কিছু সম্পর্কিত খোঁজ খবর।

জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ : আকাশ মণ্ডলে তারকা রাজির গতিবিধি, উদয়াস্ত, আগমন-প্রত্যাগমণ ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের আবহাওয়া কিংবা ঘটতে পারে এমন ঘটনা, কিংবা দুর্ঘটনা সম্পর্কে আভাস ইঙ্গিত প্রদান হচ্ছে জ্যোতিষীগণের কাজ।[2] জ্যোতিষীগণের চিন্তা-চেতনা এবং গণনার প্রভাব আজও যেমন জন-সমাজে লক্ষ্য করা যায় সেকালেও তেমনটি ছিল। কিন্তু বিশেষ তফাৎ ছিল, তারকারাজির অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টি বাদলের পূর্বাভাষ দেয়া হলে, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এ তারকাই তাঁদের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। তাঁদের মঙ্গলামঙ্গলের মূলে রয়েছে এ তারকারা। এভাবে তাঁরা জঘণ্য শির্ক করে বসতেন।[3]

তীয়ারা : আরবের মুশরিকগণ কোন কাজকর্ম আরম্ভ করা পূর্বে কাজের ফল 'ভালো' কিংবা 'মন্দ' হতে পারে তা যাঁচাই করে নেয়ার জন্য কতিপয় মনগড়া রেওয়াজের প্রচলন করে নিয়েছিল। এরূপ যাচাইয়ের এ প্রথাকে বলা হতো তোয়ারা। এতে তাঁদের স্বকীয় ধারণা-প্রসূত যে সকল কাজকর্ম করা হতো তা হচ্ছে-

যখন তাঁরা কোন কাজ করার ইচ্ছা করতেন তখন তা আরম্ভ করার পূর্বে কোন পাখিকে উড়িয়ে দেয়া হতো কিংবা হরিণকে তাড়া করা হতো। পাখি কিংবা হরিণ যদি তাঁদের ডান দিক দিয়ে পলায়ন করত তাহলে এটাকে শুভ লক্ষণ মনে করে তাঁরা তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করে দিতেন। কিন্তু বাম দিক দিয়ে পলায়ন করলে সেটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে কাজ করা থেকে বিরত থাকত। অনুরূপভাবে কোন পশু কিংবা পাখিকে যদি রাস্তায় আঁচোড় কাটতে দেখা যেত তাহলে সেটাকে অমঙ্গলের পূর্ব লক্ষণ বলে মনে করা হতো। (কোন কোন শির্ক কিংবা বিদ'আত পন্থী) লোকজনদের মধ্যে এ যুগেও এ জাতীয় কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে বসা, চলা, কিংবা দাঁড়ানোর বিশেষ কোন ভঙ্গীকেও অশুভ মনে করা হতো। অশুভ কোন কিছুর প্রভাব কাটানোর জন্য খরগোশের পায়ের গোড়ালির উপরের হাড় ঝুলিয়ে রাখা হতো। সপ্তাহের কোন কোন দিন

---

[1] মুহাযারাতের খুযরী ১ম খণ্ড ৫৬পৃঃ। ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১০২-১০৩ পৃঃ।

[2] মিবআতুল মাফাতীহ শাবাহ শিকাতুল মাসাবীহ (লক্ষৌমুদ্রণ্য ২য় খণ্ড ২-৩ পৃঃ।
সহীহ মুসলিম শরীফ নববী শাবাহ সহ ঈমান পর্ব বাবু বয়ানে কুফরি মান কালা মোতেবনা বিন নাওই ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ।

[3] সহীহ মুসলিম শরীফ নববী শাবাহ সহ ঈমান পর্ব বাবু বয়ানে কুফরি মান কালা মোতেবনা বিন নাওই ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ।

অশুভ, কোন কোন মাস অশুভ, কোন কোন চতুষ্পদ জন্তু অশুভ, কোন কোন মহিলার দর্শন অশুভ, দিন-রাত্রির কোন কোন সময় অশুভ, কোন কোন বাড়িঘর অশুভ ইত্যাদি নানা কুসংস্কার তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদিদ মহামারীকে কোন অশুভ শক্তির পাঁয়তারা বলে মনে করা হতো। অধিকন্তু, মানাবাত্মা পেঁচায় পাওয়ার ব্যাপারটিও তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তাঁদের এ বিশ্বাস ছিল যে কোন লোককে কেউ হত্যা করলে যতক্ষণ তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয় ততক্ষণ সে আত্মার শান্তি লাভ হয় না। সেই আত্মা পেঁচায় পরিণত হয়ে জনশূন্য প্রান্তরে ঘোরাফেরা করতে থাকে[১] এবং 'পিপাস পিপাসা' অথবা 'আমাকে পান করাও' 'আমাকে পান করাও' বলে আওয়াজ করতে থাকে। যখন সেই হত্যা পতিশোধ গ্রহণ করা হয় তখন সে শান্ত হয়।

দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশগণের বিদ'আত সংযোজন :

দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশদের সংযোজিত ও অনুসৃত বিদ'আত সমূহই ছিল জাহেলিয়াত আমলের আরববাসীগণের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মূলরূপ। ইবরাহীম (ﷺ) প্রবর্তিত সত্য ধর্মের কোন কোন আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু অংশ তখনো অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ ইবরাহীম (ﷺ) প্রবর্তিত দ্বীনকে তাঁরা সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দেননি ফলে বায়তুলাহর প্রতি তাঁরা যথারীতি সম্মান প্রদর্শন এবং তওয়াফ করতেন, ওমরা এবং হজ্জ পালন করতেন, আরাফা এবং মুযদালেফায় অবস্থান করতেন এবং হাদীয়ার পশু কুরবাণী করতেন।

সনাতন ইসলামের কিছু কিছু রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরা এত বেশী শির্ক-বিদ'আতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যে, সত্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। আরববাসীগণ আরও যে সব বিদ'আতের প্রচলন করে নিয়েছিল তা হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. কুরাইশরা দাবী করতেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ইবরাহীম (ﷺ)-এর বংশধর এবং তাঁরাই হচ্ছেন হারাম শরীফের সংরক্ষক ও অভিভাবক এবং মক্কার প্রকৃত অধিবাসী। কোন ব্যক্তিই তাঁদের সমকক্ষ নয় এবং কারো প্রাপ্য তাঁদের প্রাপ্যের সমান নয়। এ সব কারণে তাঁরা নিজেরাই নিজেদেরকে 'হুমস' (বীর এবং শক্তিশালী) আখ্যায় আখ্যায়িত করতেন। কাজেই, তাঁরা এটা মনে করতেন যে, হারাম সীমানার বাইরে অগ্রসর হওয়া তাঁদের উচিত না। তাই হজ্জ মৌসুমে তাঁরা আরাফাত যেতেন না এবং সেখান থেকে তাঁরা তাওয়াফে ইফাযাও করতেন না। তাঁরা মুযদালিফায় অবস্থান করতেন এবং সেখান থেকেই তাওয়াফে ইফাযা করে নিতেন। তাঁদের সেই বিদ'আত সংশোধনের জন্য আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة:١٩٩]

'তারপর তোমরা ফিরে আসবে যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে।' (আল-বাক্বারাহ ২ : ১৯৯) [২]

এদের আরও একটি বিদ'আতের ব্যাপার ছিল, তাঁরা বলতেন যে, হুমুযদের (কুরাইশ) জন্য এহরামের অবস্থায় পণীর এবং ঘী তৈরি করা ঠিক নয় এবং এটাও ঠিক নয় যে, লোম নির্মিত গৃহে (অর্থাৎ কম্বলের শিবিরে) প্রবেশ করবে। এটাও ঠিক নয় যে, ছায়ায় অবস্থানের প্রয়োজন হলে চামড়ার তৈরি শিবির ব্যতীত কোথাও অন্য কোন কিছুর ছায়ায় আশ্রয় নেবে।[৩]

৩. তাঁদের আরও একটি বিদ'আতের ব্যাপার ছিল যে, তাঁরা বলতেন যে, হারামের বাহির থেকে আগত হজ্জ ওমরাহকারীগন হারামের বাহির হতে খাদ্যদ্রব্য কিংবা অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে আসলে তা তাঁদের জন্য খাওয়া ঠিক নয়।[৪]

---

[1] সহীহ বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড ৮৫১, ৮৫৭ পৃঃ (ব্যাখ্যা সহ)।

[2] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৯৯ পৃঃ, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ।

[3] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২০২ পৃঃ।

[4] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২০২ পৃঃ।

৪. **আরও একটি বিদ'আতের** কথা জানা যায় এবং তা হচ্ছে, তাঁরা হারামের বাহিরের বাসিন্দাদের প্রতি **নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে**, হারামের মধ্যে প্রবেশ করার পর হুমস হতে সংগৃহীত বস্ত্র পরিধান করে তাঁদের **প্রথম তওয়াফ করতে হবে**। এ প্রেক্ষিতে হুমসের বস্ত্র সংগৃহীত করা সম্ভব না হলে পুরুষেরা উলঙ্গ অবস্থাতেই **তওয়াফ করত** এবং মহিলারা পরিধানের কাপড় চোপড় খুলে ফেলে দিয়ে একটি ছোট রকমের খোলা জামা **পরিধান করতেন** এবং ঐ অবস্থাতেই তওয়াফ করতেন। তওয়াফ কালে তাঁরা কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করতেন :

اليـــوم يبـــدو بعضــه أو كله ** ومـــا بدا منـــه فـــلا أحلـــه

'অদ্য কিছু অথবা সম্পূর্ণ লজ্জাস্থান উলঙ্গ হয়ে যাবে, কিন্তু যা খুলে যায় আমি তা দেখা বৈধ বলে সাব্যস্ত করি না।'

এ সমস্ত অশ্লীলতা থেকে পরহেজ করে চলার জন্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:٣١]

'হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর, আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (আল-আ'রাফ ৭ : ৩১)

অপরদিকে, যদি কোন মহিলা কিংবা পুরুষ নিজেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে হারামের বাহির থেকে আনা পোষাকে তওয়াফ করে নিত তাহলে তওয়াফের পর এ পোষাক তাঁকে ফেলে দিতে হতো। এর ফলে তাঁরা না নিজে উপকৃত হতেন না অন্য কেউ।[1]

বিদ'আতের আরও একটি ব্যাপার ছিল, হারাম অবস্থায় তাঁরা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। ঘরে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা ঘরের পিছন দিকে একটা বড় ছিদ্র করে নিয়ে সেই ছিদ্র পথে আসা-যাওয়া করতেন। অবোধ এবং আহাম্মকের মতই এ কাজকে তাঁরা পুণ্যময় কাজ বলে মনে করতেন। এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন :

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

[البقرة:١٨٩]

'তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (আল-বাক্বারাহ ২ : ১৮৯)

উপরোল্লেখিত আলোচনা সূত্রে আমাদের মানসিক দৃষ্টিপটে দ্বীনের যে চিত্রটি চিত্রিত হল সেটাই ছিল সাধারণ আরববাসীগণের দ্বীনের স্বরূপ। মূর্তিপূজা, শির্ক, বিদ'আত, কল্পনা, কুসংস্কার, অশ্লীলতা, ইত্যাদির আবরণে চাপা পড়ে গিয়েছিল ইবরাহীম (عليه السلام) প্রবর্তিত সত্য ও সনাতন ইসলাম।

এ ছাড়া আরবীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদীবাদ, খ্রীষ্টবাদ, প্রাচীনতম পারসীক যাজকতাবাদ এবং সাবাঈধর্ম স্থান দখলের সুযোগ সক্রিয় ছিল। তাই সে সবেরও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের কমপক্ষে দু'টি যুগ অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম যুগটি সেই সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল যখন ফিলিস্তীনে বারেল এবং আশুরের রাষ্ট্র বিজয়ের কারণে ইহুদীগণকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। বাহিনী কর্তৃক ব্যাপকভাবে ইহুদীদের ধরপাকড়, বুখতে নস্‌সরের হাতে ইহুদীবসতি ধ্বংস ও উজাড়, তাঁদের মুখাকৃতির ক্ষতিসাধন এবং বাবেল থেকে ব্যাপকভাবে দেশান্তরের ফলে একদল ইহুদী ফিলিস্তীন ছেড়ে গিয়ে হেজাযের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।[2]

---

[1] **ইবনে হেশাম** ১ম খণ্ড ২০৩ পৃঃ এবং সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ।

[2] **কালবে জাজীরাতুল** আরব ২৫১ পৃঃ।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় যখন টাইটাস রুমীর নের্তৃত্বে রুমীগণ যখন ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জোর করে ফিলিস্তীন দখল করে নেয়। সেই সময় রুমীগণের বহু ইহুদী বসতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁদের মুখাকৃতির ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে বহু ইহুদী গোত্র হেজায থেকে পলায়ন করে ইয়াসরের, কায়বর এবং তাইমায়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সকল স্থানে তাঁরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করনে এবং আর্থিক সমৃদ্ধি ও সঙ্গতি লাভের দূর্গ ও মোরচা নির্মাণ করেন।

উল্লেখিত দেশত্যাগী ইহুদীদের মাধ্যমে আরববাসীগণের মধ্যে এক প্রকার ইহুদী প্রথা চালু হয়ে যায়। এ আরব ইহুদী সংমিশ্রণের সূত্রপাত হয় ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনা প্রাবাহের প্রেক্ষাপটে তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইসলামের আবির্ভাবকালে উল্লে-খযোগ্য ইহুদী গোত্রগুলো ছিল যথাক্রমে খায়বর, নাযীর, মুস্তলাক, কোরাইয়া এবং কায়নুকা। বিখ্যাত সামহুদী 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে তৎকালে ইহুদী গোত্রগুলোর সংখ্যা বিশেরও (২০) কিছু বেশী ছিল।[১]

ইয়েমেনে ইহুদী মতবাদ বেশ বিস্তার লাভ করে। এখানে এর বিস্তার লাভের মূল হোতা ছিলেন তাব্বান আসয়াদ আবু বকর। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে ইয়াসরাবে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং বনু কোরাইবার দু'জন ইহুদী বিদ্বানকে সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেন যান। এভাবে ইয়েমেনে ইহুদীদ মতবাদ বিস্তার লাভ করেন।

আবু বকরের পর তাঁর পুত্র ইউসুফ যুনাওয়াস ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনভার গ্রহণ করার পর তিনি নাজরানবাসী খ্রীষ্টানগণের উপর ইহুদী মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। কিন্তু প্রবল চাপ সত্ত্বেও খ্রীষ্টানগণ ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন যার ফলশ্রুতিতে যুনাওয়াস গর্ত খনন করে সেই গর্তে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেন এবং যুবা, বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলা, নির্বিশেষে অনেককে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ থেকে চলিশ হাজার লোক এ নরকীয় ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। এ নরকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ৫২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কুরআন মাজীদের সূরা বূরুজে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[২]

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ [البروج: ٤- ٧]

"ধ্বংস হয়েছে গর্ত ওয়ালারা ৫. (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল, ৬. যখন তারা গর্তের কিনারায় বসেছিল ৭. আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল।' (আল-বুরূজ ৮৫ : ৪-৭)

খ্রীষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হল, আরবের শহরগুলোতে ওদের আগমনের ব্যাপারটি ঘটেছিল হাবশী এবং রুমীগণের জবর দখলের পর বিজয়ীদের মাধ্যমে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইয়েমেনের উপর হাবশীগণের প্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তা স্থায়ী থাকে। এ মধ্যবর্তী সময়ে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার কাজ চালাতে থাকেন। প্রায় সেই সময়েই এমন এক বুজর্গ ব্যক্তি নাজরানে আগমন করেন যাঁর প্রার্থনা আল্লাহর নিকটে কবুল হতো বলে কথিত আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও কেরামতওয়ালা পুরুষ। তাঁর নাম ছিল ফাইমিউন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি নাজরানে খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। নাজরানবাসীগণের উপর তাঁর প্রচার কাজের প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। তাঁরা তাঁর কাছে এমন কিছু কেরামত দেখতে পান যা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে অধিকতর দৃঢ় করে তোলে। এরপর তাঁরা সকলেই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।[৩]

---

[1] কালবে জাজীরাতুল আরব ২৪১ পৃঃ।

[2] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২০-২২ পৃঃ ২৭, ৩১, ৩৫-৩৬ পৃঃ। অধিকন্তু তাফসীর গ্রন্থে সূরা বরুজের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[3] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ৩১-৩৪ পৃঃ।

তারপর যুনাওয়াসের পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের প্রতিশোধস্বরূপ রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র নায়কের আসনে সমাসীন হওয়ার পর নতুন উদ্যমে খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রচার ও প্রসার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিই হচ্ছে ইয়েমেনে অন্য একটি কা'বা গৃহনির্মাণ এবং তাঁর নির্মিত কা'বা গৃহ হজ্জ পালনের জন্য আরববাসীগণকে আহ্বান জানানো।

শাসক আবরাহা শুধু অন্য একটি কা'বা গৃহ নির্মাণ এবং হজ্জ পালনের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি খানায়ে কা'বা কে সমূলে ধ্বংস করাতো দূরের কথা, আল্লাহ তা'আলার গজবে পড়ে বিশাল এক হস্তী বাহিনীসহ তিনি নিজেই সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমনটি কুরআন কারীমের সূরা 'ফীলে' বলা হয়েছে। সূরা ফীলের এ ঘটনা সর্ব যুগের সকল মানুষের শিক্ষা লাভের জন্য একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

অপরদিকে রুমীয় অঞ্চল সমূহের সন্নিকটস্থ হওয়ার কারণে আলে গাস্সান, বনু তাগলিব, বনু তাই এবং অন্যান্য আরব গোত্র সমূহে খ্রীষ্টীয় মতবাদ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। হীরার আরব সম্রাটগণও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

মাজুসী মতবাদ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, পারস্যের সন্নিকটস্থ আরব ভূমিতে এ মতবাদ বেশ প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যেমন- আরবের ইরাকে, বাহরায়েনে (আল আহসা), হিজর এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্ত অঞ্চলে। তাছাড়া ইয়েমেনে পারস্য শাসনামলেও বিচ্ছিন্নভাবে দু-একজন মাজুসী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর অবশিষ্ট থাকে সাবী মতবাদের কথা। ইরাক এবং অন্যান্য দেশের প্রাচীন শহর-নগরের ধ্বংস্তুপ খননের সময় যে সকল দলিল-দস্তাবেজ হস্তগত হয়েছে তা থেকে এটা বুঝা যায় যে, তা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর কালদানী সম্প্রাদায়ের মতবাদ। প্রাচীন শাম এবং ইয়েমেনের বহু অধিবাসী এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ইহুদী মতবাদ এবং তারও পরে খ্রীষ্টীয় মতবাদ বিস্তার লাভ করে তখন এ সাবী মতবাদের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ে এবং প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ক্রমান্বয়ে নির্বানোন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও ইরাকে এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ মতবাদের কিছু সংখ্যক অনুসারী থেকে যায়।[1]

ধর্মীয় অবস্থা (الحالة الدينية) ঃ পৌত্তলিকতা, অশীলতা, শিরক, বিদ'আত ও বহুত্ববাদের জমাট অন্ধকার ভেদ করে চির ভাস্বর ও চির জ্যোতির্ময় ইসলাম নামক সূর্য যখন নবায়িত আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখন প্রচলিত সকল বিশ্বাস এবং মতবাদের অনুসারীগণ একদম হতচকিত হয়ে পড়ল। সর্বশেষ আসামানী কেতাব মহাগ্রন্থ আলকোরানের সুললিত শাশ্বত বাণী এবং মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উদাত্ত কণ্ঠের তৌহীদী ঘোষণা সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিমূলক করে তুলল পুকম্পিত। যে সকল মুশরিক ও পুতুল পুজক শির্ক ও পৌত্তলিকতার পাপপংকে নিমজ্জিত থেকেও দাবী করত যে, তাঁরা দ্বীনই ইবরাহীমম (عليه السلام)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে একদম ধ্বংসের সৃষ্টি হয়ে গেল।

ইবরাহীম (عليه السلام) প্রবর্তিত সত্য ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ই-ইবরাহী (عليه السلام)-এর কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁদের চিন্তা চেতনা, ধ্যান-ধারণা এবং নানা প্রকার অশীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীর আলোকে নবী কারীম (ﷺ) যখন আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের শাশ্বতরূপ এবং ইবরাহীম (عليه السلام) প্রবর্তিত দ্বীনের সঙ্গে এর বিভিন্ন সম্পর্কের প্রসঙ্গটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তখন তাঁদের দ্বীন সম্পর্কিত দাবীর অসারতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

ইহুদীবাদের অবস্থাও ছিল ঠিক একইরূপ। অসার বাহ্যাড়ম্বর সর্বস্ব সেচ্ছাচার ছাড়া তেমন আর কিছুই ছিল না ইহুদীদের মধ্যে। ইহুদী পুরোহিতগণ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজেরাই চেয়েছিলেন প্রভূর আসনে সমাসীন হতে। ধর্মের আবরণে তাঁরা চেয়েছিলেন পার্থিব প্রতিষ্ঠা। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁরা চাইতেন সাধারণ মানুষের উপর

---

[1] তারিখে আরযুল কুরআন ২য় খণ্ড ১৯৩-২০৮ পৃঃ।

তাঁদের স্বকীয় মতামত সম্পর্কিততত প্রভাব বিস্তার করতে। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ সংগ্রহ করে সম্পদের পাহাড় রচনা করা। সম্পদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর ধর্ম-কর্ম যদি চূলায় যায় তা যাক, অবিশ্বাস কিংবা অধর্ম যদি বিস্তার লাভ করে তা করুক, তাতে কিছুই আসে যায় না। এ-ই ছিল ইহুদীবাদের সত্যিকার রূপ।

খ্রীষ্টান ধর্মও সত্য বিবর্জিত শির্ক এবং পৌত্তলিকাতয় ভরপুর হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রীত্ববাদের ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল এবং এ ভ্রান্ত ধারণাই আল্লাহ এবং মানবকে এক আজব সংমিশ্রণের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। অধিকন্তু, যে আরববাসীগণ এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর এ ধর্মের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয় নি। কারণ, এর আদর্শের সঙ্গে তাঁদের প্রচলিত জীবন যাত্রা-প্রণালীও পরিত্যাগ করতে পারছিলেন না।

অবশিষ্ট আরবদের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা মুশরিকগণের মতই ছিল। কারণ, তাঁদের অন্তঃকরন একই ছিল, বিশ্বাস সমূহে পরস্পর সাদৃশ্য ছিল এবং রীতিনীতিতে সঙ্গতি ছিল।

صور من المجتمع العربي الجاهلي
জাহেলিয়াত সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার বিবরণাদির পর এ পর্যায়ে তথাকার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলঃ

সামাজিক অবস্থা (الحالة الاجتماعية) ঃ তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন ববসাব করত। অবস্থা এবং অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর পরিবার পুরুষ এবং মহিলাগণের পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা এবং ন্যায়-ভিত্তিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু ব্যাপারে মহিলাদের স্বাধীনতা দেয়া হতো, তাঁদের যুক্তি-সঙ্গত কথাবার্তার যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো এবং তাঁদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দেয়া হতো। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মান সম্মান অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। মহিলাদের মান মর্যাদার ব্যাপারে হানিকর বা অবমাননাকর পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে খুন-খারাবি শুরু হয়ে যেত।

তৎকালীন আরবে প্রচলিত রেওয়াজ মাফিক কোন ব্যক্তি নিজের উদারতা কিংবা বীরত্বের প্রশংসাসূচক কোন কিছু বলতে চাইলে মহিলাদেব সম্বোধন করেই তা বলা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা ইচ্ছা করতে পারত। পক্ষান্তরে পুরুষদের উত্তেজিত ও উদ্বোধিত করে সহজেই যুদ্ধাগ্নিও প্রজ্বলিত করে দিতত পারত।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রধান সমাজ কাঠামোই আরবে প্রচলিত ছিল। পরিবার প্রধান বা পরিবারের পরিচালক হিসেবে পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তঁঅদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হতো। পারিবারিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রী এবং সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতো। বর-কনে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে কণের অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। অভিভাবকগণের আগোচরে ইচ্ছা মাফিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার মহিলাদের ছিল না।

এক দিকে যখন সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবার সমূহের জন্য প্রচলিত ছিল এ ব্যবস্থা অপর পক্ষে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং মেলামেশার ক্ষেত্রে এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা এবং জঘণ্য প্রথা প্রচলিত ছিল যাকে অশীলতা, পাশবিকতা এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলা যেতে পারে না। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত তথ্যাদি সূত্রে জানা যায় যে, অন্ধকারে যুগে আরব সমাজে বিবাহের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তো সেই প্রথা যা বর্তমান যুগেও জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথানাসারে বিভিন্ন দিক বিবেচনার পর একজন তাঁর অধিনস্থ মহিলার জন্য অন্য এক জনের নিকট বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠাতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভের পর বর-কনেকে ধার্য মোহর দিয়ে বিয়ে করত।

নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো 'নেকাহে ইসতেবযা'। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত জ্ঞানী, গুণী ও শক্তিধর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে থাকতেন। তারপর গর্ভ ধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে 'নিয়োগ' বলা হয়।

তথাকথিত 'বিবাহ' নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘন্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে

সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পর সেই মহিলা তাঁর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েদ ছিলেন তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে একত্রিত করতেন। প্রচলিত প্রথায় বাধ্যগতভাবেই সংশিষ্ট সকলকে সেখানে উপস্থিত হতে হতো। সেখানে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অমত করার কোন উপায় থাকতনা। মহিলার আহ্বানে যখন সকলে উপস্থিত হতেন তখন সকলকে লক্ষ্য করে মহিলা বলতেন যে, 'আপনাদের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার ফলেই যে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারটি আপনারা সকলেই অবগত আছেন।'

তারপর সমবেত লোকজনদের মধ্য থেকে এক জনকে লক্ষ্য করে বলতেন 'হে অমুক, আমার গর্ভজাত এ সন্তান হচ্ছে আপনারই সন্তান।' মহিলার ঘোষণাক্রমে সন্তানটি হতো তাঁরই সন্তান এবং সংশিষ্ট সকলেই এর স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

নারী-পুরুষের 'বিবাহ ও মিলন' নাম দিয়ে আরও একটি জঘণ্য রকমের অশীল রেওয়াজা জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে কোন মহিলাকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্রিত হতেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এঁরা হচ্ছেন পতিতা প্রবৃত্তির পেশাবলম্বিনী মহিলা। কাজেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন লোক তাঁদের নিকট আগমন করলে তাঁরা আপত্তি করতেন না। এঁদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে পেশার প্রতীক হিসেবে নিশান দিয়ে রাখা হতো যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় গমনাগমন করতে পারেন। যৌনক্রিয়ার ফলে গর্ভ ধারণের পর যখন কোন মহিলা সন্তান প্রসব করতেন তখন তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী সকল পুরুষকে একত্রিত করা হতো। তারপর যে ব্যক্তি মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে সেখানে আহ্বান জানানো হতো। সেই ব্যক্তি উপস্থিত সকলের অবয়ব নিরীক্ষণান্তে তাঁর বিবেচনা মতো এক জনের সঙ্গে সন্তানটির যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'এ সন্তান আপনার"। যাঁকে লক্ষ্য করে এ রায় দেয়া হতো তিনি তা মানতে বাধ্য থাকতেন। এভাবে নব জাতকটির একজ পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যেত। তিনিও শিশুটিকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলেই মনে করতেন।

যখন আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করলেন তখন জাহেলিয়াত যুগের সর্ব প্রকার অশীল বৈবাহিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। বর্তমানে ইসলামী সমাজে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলে কারীম ﷺ আরব সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করেন।[1]

আরও কোন কোন ক্ষেত্রে আরবের নারী-পুরুষদের অন্য রকম সম্পর্কের কথা জানা যায়। তৎকালে, অর্থাৎ জাহেলিয়াত আমলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বন্ধনের ব্যাপারটি এমন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা তলোয়ারের ধার এবং বলমের ফলার সাহায্যে প্রতিষ্ঠালাভ করত। এতে গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে বিজয়ী গোত্র বিজিত গোত্রের নারীদের আটক রেখে যৌন সম্ভোগে তাদের ব্যবহার করত। এ সকল মহিলারা গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মলাভ করত তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা দেয়া হতো না। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সারা জীবন তাদেরকে খাটো হয়েই থাকতে হতো।

জাহেলিয়াত আমলে একই সঙ্গে একাধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। একই সঙ্গে দু'সহোদরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সংসার করাটা কোন দোষের ব্যাপার ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এবং পিতা কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা বিমাতাকে বিবাহ প্রথাও তৎকালে চালু ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

---

[1] সহীহ বুখারী শরীফ, 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না" অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭৬৯ পৃঃ এবং আবূ দাউদ, নোকাহর পদ্ধতি সমূহ অধ্যায়।

الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا﴾ [سورة النساء: ٢٢، ٢٣]

"যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিয়ে করেছে, সেসব নারীকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অতি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা।

২৩. তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই এবং (তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং এক সঙ্গে দু' বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।' [আন-নিসা (৪) : ২২-২৩]

স্ত্রীকে পুরুষদের তালাক প্রদানের অধিকার ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা ছিল না।[১]

সেই আমলে ব্যভিচারের মতো একটি অতি ঘৃণ্য ও জঘণ্য পাপাচারে লিপ্ত হতে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষকেই দেখা যেত। কোন গোষ্ঠী কিংবা গোত্রের খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এ নরকীয় দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত থাকত। অবশ্য এমন কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষও চোখে পড়ত যাঁদের আভিজাত্যানুভূমি ও সম্ভ্রম বোধ পাপাচারে এ পঙ্কিলতা থেকে তাঁদেরকে বিরত রাখত। অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে নারীদের জীবন যাপন করতে হতো। অবশ্য দাসীদের তুলনায় স্বাধীনাদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল।

সমাজে দাসীগণকে অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হতো। তৎকালীন সামজে এমন মনিবের সংখ্যা খুব কমই ছিল যিনি দাসীদের নিয়ে নানা অনাচার, যথেচ্ছাচার ও পাপাচারে লিপ্ত না হতেন। এ সব অনাচার ও পাপাচারে হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ কিংবা সংশয়ের সৃষ্টি হতো না। যেমন 'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে এক দফা এক ব্যক্তি খাড়া হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ অমুক ব্যক্তি আমার পুত্র। অজ্ঞতার যুগে আমি তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলাম।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইসলামে এমন দাবীর কোন সুযোগ কিংবা মূল্য নেই। অন্ধকার যুগের যাবতীয় প্রথা পদদলিত ও বিলুপ্ত হয়েছে। এখন পুত্র তাঁরই গণ্য হবে যার স্ত্রী আছে অথবা দাসী আছে। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং আবদ ইবনে যাময়ার মধ্যে যাময়ার দাসী পুত্র আব্দুর রহমান বিন যাময়ার ব্যাপারে যে বিবাদ সংঘটিত হয় তা হচ্ছে, একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং এ ব্যাপারটি অবশ্যই অনেকের জানা কথা।[২]

অন্ধকার যুগে পিতা পুত্রের সম্পর্কও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমনটি হয়তো বা বলা সঙ্গত হবে না যে সন্তান বৎসল্যের ব্যাপারে তাদের কিছুটা ঘাটতি ছিল। নীচের কবিতায় চরণটি প্রণিধানযোগ্যঃ

إنمـــا أولادنـــا بيننـــا ** أكبادنا تمشـــي على الأرض

"আমাদের সন্তান আমাদের কলিজার টুকরো, যারা জমিনের উপর চলাফেরা করছে।'

পক্ষান্তরে, কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে নরকীয় দুষ্কর্ম করতে তাঁরা একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। সমাজের লোক লজ্জা ও নিন্দা এবং তাঁদের জন্য ব্যয় নির্বাহের ভয়ে অনটন ও অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের কারণে পুত্র সন্তানদেরও হত্যা করতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

---

1 আবূ দাউদ মোরাযায়াত বাদা ত্বাতালিকাতিস সালাম ৬৫ পৃঃ 'আত্তালাকু মার্রতানে" সংশিষ্ট তাফসীর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

2 সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৯৯৯, ১০৬৫ পৃঃ, আবু দাউদ 'আল আলাদুলিল ফিরাশ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١]

" বল, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই, তা হচ্ছে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে আর তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি, প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করো না। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ কর।' [আল-আন'আম (৬) : ১৫১][1]

কিন্তু পুত্র সন্তান হত্যার ব্যাপারে যে জনশ্রুতি রয়েছে তার যথার্থতা নির্ণয় করা বা প্রত্যয়ণ করা একটি অত্যন্ত মুস্কিল ব্যাপার। কারণ, গোত্রীয় বিরোধ এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় স্বপক্ষকে শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় আপন আপন সন্তানেরাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে প্রামাণিত হতো। এ প্রেক্ষিতে পুত্র সন্তানগণের সংখ্যাধিক্যই আরববাসীগণের কাম্য হওয়া স্বাভাবিক।

অবশ্য এ জনশ্রুতিটি যে কোন ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমনটি বলাও বোধ হয় সমীচীন হবে না। কারণ, ক্ষমতালীপ্সা, গোত্রপতিগণের জন্য পুত্র সন্তানগণের সংখ্যাধিক্য কাম্য হতে পারে। কিন্তু অনাহারী, অর্ধাহারী, নিরীহ গোরেচারা গরীব দুঃখীদের জন্য পুত্র সন্তানের আধিক্য কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ কিংবা দুঃসময়ে পুত্র সন্তান হত্যার ব্যাপারটিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

যতদূর জানা যায় তৎকালীন আরব সমাজে সহোদর ভাই, চাচাতো ভাই এবং গোষ্ঠী ও গোত্রের লোকজনদের পারস্পারিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অত্যান্ত শক্ত ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ হচ্ছে, বহু গোত্রে বিভক্ত এবং গোত্রে গোত্রে রেষারেষিক্লীষ্ট আরব সমাজে গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করেই টিকে থাকতে হতো আরববাসীগণকে গোত্রের মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। গোত্র সমূহের অভ্যন্তরে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার মূলতত্ত্ব গোত্রীয় চেতনা এবং আবেগ ও অনুভূতিকে সজীব ও সক্রিয় রাখার ব্যাপারে সহায়ক হতো। সাম্প্রদায়িকতা এবং আত্মীতাই ছিল গোত্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার উৎস। তাঁরা সেই উদাহরণকে শাব্দিক অর্থে বাস্তবে রূপদান করতেন, যেমন ঃ

(انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)

(নিজ ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত হোক)।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকজনের মধ্যে উৎকট এ গোত্রীয় চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। ইসলাম সেই সকল ধারণার মূলোপটন করেছে। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়কেই সাহায্য করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ হল তাঁকে অন্যায় ও অনাচার থেকে বিরত রাখা। অবশ্য, মর্যাদা এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্বের ব্যাপারে একে অন্যের আগে অগ্রসর হওয়ার যে আকুতি ও আকঙ্খা একই ব্যক্তি কর্তৃক বহুবার তা বাস্তবে পরিণত করতে চাওয়ার কারণেই গোত্র সমূহের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দামামা বেজে উঠত। আওস ও খাযরাজ, আবস ও যুবইয়ান, রকর ও তগলিব এবং অন্যান্য গোত্রের সংঘটিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেমনটি লক্ষ্য করা যায়।

---

[1] কুরআন মাজীদ : ১৬/৫৮, ৫৯, ১৭/৩১, ৮১।

পক্ষান্তরে যতদূর জানা যায়, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠির পারস্পারিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অপেক্ষাকৃত শিথিল বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গোত্রের সকল ক্ষমতাই ব্যয়িত হতো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে। তবে দ্বীনী ব্যবস্থা এবং অশীল কথনের সংমিশ্রণে গঠিত কতিপয় রীতিনীতি ও অভ্যাসের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পারিক লেনদেন, সহযোগিতামূলক কাজকর্ম সংক্রান্ত চূক্তি, প্রতিজ্ঞাপত্র এবং আনুগত্যের বিধি বিধান সমন্বিত ব্যবস্থাধীনে গোত্রগুলো পরস্পর একত্রিত হতেন। সর্বোপরি, হারাম মাসগুলো তাঁদের জীবিকার্জন ও জীবন নির্বাহের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক ছিল।

জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার সারকথা বলতে গেলে শুধু এটুকুই বলতে হয় যে স্থিরতা এবং কূপ মণ্ডকতাই সমাজ জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞতা, অশীলতা, সেচ্ছাচারিতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল সমগ্র সমাজ। অসত্য ও অন্যায়ের নিকট সত্য ও ন্যায় হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত। সাধারণ মানুষকে জীবন যাপন করতে হতো পশুর মত। বাজারের পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হতো মহিলাদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো মাটি ও পাথরের মতো। গোত্র কিংবা রাষ্ট্র যাই বলা হোক না কেন, প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল শক্তিমত্ততা। প্রশাসন পরিচালিত হতো শক্তিধরগণের স্বার্থে। দুর্বলতার শ্রেণীর সাধারণ লোকজনের কল্যাণের কথা কস্মিনকালেও চিন্তা করা হতো না। প্রজাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থসম্পদে কোষাগার ভরে তোলা হতো এবং প্রতিদ্বন্দীগণের বিরুদ্ধে সৈন্যদলের মহড়া এবং যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যেই তা সংরক্ষিত হতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ (الحالة الاقتصادية) :

জাহেলিয়াত যুগের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই সামাজিক অবস্থার চাইতে উন্নত বলা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তেজারত ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল আরব অধিবাসীগণের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু দেশ থেকে দেশান্তরে গমনাগমন, মালপত্র পরিবহন, বাণিজ্যেদ্দেশে ভ্রমণ পর্যটনের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এতই সমস্যা সংকুল ছিল যে, নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ছিল এক দুষ্করব্যাপার। তৎকালে মরুপথে গমনাগমন এবং মালপত্র পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ছিল উট। উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত এবং মালপত্র পরিবহরেন ব্যবস্থাটি ছিল অত্যান্ত সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া, পথও ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। সব দিক দিয়ে সুসজ্জিত বড় বড় কাফেলা ছাড়া পথ চলার কথা চিন্তাই করা যেত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কোন সময় দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত এবং যথা-সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো কাফেলার সকলকে। অবশ্য, হারাম মাসগুলোতে তাঁরা কিছুটা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা ছিল সময়ের একটি সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ। কাজেই, বাণিজ্য-নির্ভর হলেও নানাবিধ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরা তেমন সুবিধা করতে পারতেন না। তবে হারাম মাসগুলোতে 'ওকায, যিলমাজায, মাজিলা এবং আরও কিছু প্রসিদ্ধ মেলায় বেচা-কেনা করে তাঁরা কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারতেন।'

আরব ভূখণ্ডে শিল্পের প্রচলন তেমন এতটা ছিল না। শিল্প কারখানার ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আরব দেশ আজও পিছনে পড়ে রয়েছে তুলনামূলকভাবে সেকালে আরও অনেক বেশী পিছনে পড়ে ছিল। শিল্পের মধ্যে বস্ত্র, চর্ম শিল্প, ধাতব শিল্প, ইত্যাদি শিল্পের প্রচলন চোখে পড়ত। অবশ্য, এ শিল্পগুলো ইয়েমেন, হীরা এবং শামরাজ্যের সন্নিকটস্থ অঞ্চলগুলোতেই প্রসার লাভ করেছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু সুতোকাটার কাজে সকল অঞ্চলের মহিলাদেরই ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত। আরব ভূখণ্ডে অভ্যন্তর ভাগের লোকেরা প্রায় সকলেই পশু পালন কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। মরু প্রান্তরের আনাচে-কানাচে যে সকল স্থানে কৃষির উপযোগ ভূমি পাওয়া যেত সে সকল স্থানে কৃষির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সব চাইতে জটিল ছিল তা হচ্ছে, মানুষের দারিদ্র দূরীকরণ এর মাধ্যম জীবনমান উন্নয়ন, মহামারী ও বোগব্যাধি দূরীকরণ কিংবা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজে অর্থ-সম্পদের খুব সামান্য অংশই ব্যয়িত হতো। সম্পদের সিংহ ভাগই

ব্যয়িত হতো যুদ্ধবিগ্রহের কাজে। কাজেই, জনজীবনে সুখ, শান্তি বা সাচ্ছন্দ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের দুবেলা দু মুঠো অন্ন এবং দেহাবরণের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ডর সংস্থানও সম্ভব হতো না।

নীতি-নৈতিকতা (الأخلاق) ঃ মরুচারী আরববাসীগণের নীতি- নৈতিকতা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুইটি ধারার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে লক্ষ্য করা যায় জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, হত্যা, প্রতিহিংসা পরায়নতা ইত্যাদি জঘণ্য মানবেতর ক্রিয়াকলাপ, অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা, অতিথিপরায়নতা প্রতি জ্ঞাপরায়ণতা এবং আরও অনেক উন্নত মানসিক গুণাবলীর সমাবেশ। তাঁদের মানবেতর ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁদের চরিত্রের বিভিন্ন মানবিক দিক এবং সমস্তগুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. দয়া-দাক্ষিণ্য ও উদারতা ঃ অন্ধকার যুগের আরববাসীগণের দয়া-দাক্ষিণ্য সম্পর্কিত জনশ্রুতি ছিল সর্ব যুগের মানুষের গর্ব করার মতো একটি বিষয়। নীতি- নৈতিকতার ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছলেও দয়া-দাক্ষিণ্য কিংবা বদান্যতার ব্যাপারে বিশ্ব মানব গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা ছিলেন সকলের শীর্ষস্থানে। শুধু তাই নয় এ নিয়ে তাঁদের রীতিমত প্রতিযোগিতা চলথ এবং এ ব্যাপারে তাঁরা এ বলে গর্ব করতেন যে, 'আরবের অর্ধভাগ তার জন্য উপহার হয়ে গিয়েছে।' এ গুণকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ নিজের প্রশংসা নিজেই করেছে।

তাঁদের বদান্যতা বাস্তবিক পক্ষে এতই উঁচু মানের ছিল যে তা মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনটিও দেখা গিয়েছে যে, কঠিন শীত কিংবা ক্ষুধার সময়ও কারো বাড়িতে যদি মেহমান আসতেন এবং তাঁর জীবন ও জীবিকার জন্য অপরিহার্য রূপে প্রয়োজনীয় কটি উট ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই, তবুও এমন এক সংকটময় মুহূর্তেও তাঁর উদারতা এবং অতিথিপরায়ণতা তাঁকে এতটা প্রভাবিত করে ফেলত যে, অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে তৎক্ষনাৎ সেই উটটি জবেহ করে মেহমানের মেহামান দারিত্বে তিনি লিপ্ত হয়ে পড়তেন। অধিকন্তু, তাঁদের দয়া-দাক্ষিণ্য এবং উদারতার অন্যন্য চেতনা বড় বড় শোনিত পাতের মূলসূত্র কিংবা তদ্‌সংক্রান্ত আর্থিক দায়-দায়িত্ব অবলীলাক্রমে আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে এমনভাবে মানুষকে ধ্বংস ও রক্তপাতের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করত অন্যান্য নেতা কিংবা দলপতিগণের তুলনায় তা অনেক বেশী গর্বের ব্যাপারে হয়ে দাঁড়াত।

এ প্রসঙ্গে একটি মজার ব্যাপার ছিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের অনন্য উাদাহরণ সৃষ্টি করে তাঁরা যেমন গর্ববোধ করতেন তেমনি মদ্যপান করেও গর্ববোধ করতেন। মদ্যপান একটি গর্বের বিষয় সেই অর্থে মদ্যপান করে তাঁরা গর্ববোধ করতেন না, বরং এ জন্য গর্ববোধ করতেন যে, উদারতার উদবোধক হিসেবে তাদের উপর বিশেষভাবে প্রাধন্য বিস্তার করত যার ফলশ্রুতিতে কোন ত্যাগ স্বীকারকেই তাঁরা বড় মনে করতেন না। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পিছপা হয় না। এজন্য এঁরা আঙ্গুর ফলের বৃক্ষকে 'কারাম' এবং আঙ্গুর রসে তৈরি মদকে 'বিনতুল কারাম' (কারামের কন্যা) বলতেন। জাহেলিয়াত যুগের কবিগণের কাব্যে এ জাতীয় প্রশংসা এবং গৌরব সূচক রচনা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। আনতার বিন সাদ্দাদ আবসী তাঁর নিজ মোয়ালাকায় বলেছেন ঃ

ولقد شَرِبْتُ من الْمُدَامَة بَعْـدَ مـــا ** رَكَد الْهَواجِـرُ بالْمَـشُـوفِ الْمُعْلَـمِ
بزُجَاجَةٍ صـفْـراء ذات أسِـرَّة ** قُرِنَـتْ بأزهـرَ بالشِّمال مُفـدَّمِ
فـإذا شـرِبتُ فإنني مُسْتَهْلِـكٌ ** مالي وعِرْضِي وافِـرٌ لـم يُكْلَـمِ
وإذا صَحَوْتُ فما أُقَصِّرُ عن نَـدَى ** وكـا عَلمـت شمائلـي وتَكَرُّمـي

অর্থ ঃ 'নিদাগের উত্তাপ স্তিমিত হওয়ার পর বাম দিকে রক্ষিত হলুদ বর্ণের এক নকশাদার কাঁচ পাত্র হতে যা ফুটন্ত এবং মোহরকৃত মদপূর্ণ ছিল, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মদ্য আমি পান করলাম এবং যখন আমি তা পান করি তখন নিজের মাল লুটিয়ে দিই, কিন্তু আমার মান-ইজ্জতপূর্ণ মাত্রায় থাকে। এর উপর কোন চোট কিংবা আঘাত

আসে না। তারপর যখন আমি সজ্ঞানে থাকি, কিংবা যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখনো আমি দান করতে কুণ্ঠিত হই না, এবং আমার দয়া-দাক্ষিণ্য যা কিছু সে সব সম্পর্কে তোমরা অবহিত রয়েছ।”

তাঁরা জুয়া খেলতেন এবং মনে করতেন যে, ‘এটাও হচ্ছে তাঁদের দয়া-দাক্ষিণ্যের একটি পথ। কারণ, এর মাধ্যমে তাঁরা যে পরিমাণ উপকৃত হতেন তার অংশ বিশেষ, কিংবা উপকৃত ব্যক্তিদের অংশ থেকে যা অবশিষ্ট থেকে যেত তা অসহায় এবং মিসকীনদের মধ্যে পান করে দিতেন। এ জন্যই কুরআনকারীমেমদ এবং জুয়ার উপকারকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

﴿وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة:٢١٩]

“কিন্তু এ দু’টোর পাপ এ দু’টোর উপকার অপেক্ষা অধিক’।’ (আল-বাক্বারাহ ২ : ২১৯)

২. প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা ঃ অন্ধকার যুগের আরববাসীগণের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল প্রতিজ্ঞা পরায়ণতা। ওয়াদা পালন বা অঙ্গীকার রক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য, কিংবা অন্য কোনভাবে তাঁরা যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকতেন তাঁদের জন্য সন্তানগণের রক্ত প্রবাহিত করা, কিংবা নিজ বাস্তছিটা বিলুপ্ত করার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকেও তাঁরা সামান্য কিছু মনে করতেন। এর যথার্থতা উপলব্ধির জন্য হানি বিন মাসউদ শাইবানী, সামওয়াল বিন আদিয়া এবং হাজের বিন যুরারাহ এর ঘটনাবলীই যথেষ্ট।

৩. ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ ঃ জাহেলিয়াত যুগের আরববাসীগণের অন্যতম ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ছিল পার্থিব সব কিছুর উপর নিজের মান ইজ্জতকে প্রাধান্য দেয়া এবং কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার সহ্য না করা। এর ফলে এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁদের উৎকট অহংবোধ এবং মর্যাদাবোধ সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। বিশেষ কোন কারণে তাঁদের এ অহং ও মর্যাদাবোধ এর উপর সামান্যতম আঘাত কিংবা অপমান এলেও তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়তেন এবং তরাবারি, বর্শা ফলা ইত্যাদি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। এ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে গিয়ে তাঁদের প্রাণহানির ব্যাপারে একানই উৎকণ্ঠা থাকত না। প্রাণের তুলনায় মান-মর্যাদাকেই তাঁরা অধিকতর মূল্যবান মনে করতেন।

৪. সংকল্প বাস্তবায়ন ঃ প্রাক ইসলামি আরববাসীগণের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এ রকম যে, কোন কাজ-কর্মকে মান-সম্মান ও পুরুষের প্রতীক মনে করে যখন তাঁরা সেই কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ হতেন তখন তাঁরা প্রাণ বাজী রেখে সেই কর্ম সম্পাদনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পার্থিব কোন শক্তিই তাঁদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখতে পারত না।

৫. ভদ্রতা, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য ঃ ভদ্রতা-শিষ্টতা ও ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য আরববাসীগণের নিকট খুবই প্রিয় ও প্রশংসনীয় ছিল। এ সকল মানসিক গুণাবলীকে কোন সময়েই তাঁরা খাটো করে দেখতেন না, কিন্তু তাঁদের উগ্র স্বভাব, উৎকট অহংবোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার কারণে খুব কম ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা রক্ষা করতে তাঁরা সক্ষম হতেন।

৬. সরলতা ও অনাড়ম্বরতা ঃ ইসলাম পূর্ব আরববাসীগণের সংস্কৃতি ধারা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁদের জীবন যাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর। তাঁদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ কিংবা জটিলতার লেশমাত্র থাকত না। উদার, উন্মুক্ত অগ্নিক্ষরা মরু প্রকৃতির মতই তাঁদের মন ছিল উন্মুক্ত, কিন্তু মেজাজ ছিল তীক্ষ্ণ। এ কারণে প্রকৃতিগতভাবেই তাঁরা ছিলেন সৎ এবং সততা প্রিয়। ধোঁকাবাজী এবং বিশ্বাস ভঙ্গের মতো কোন ব্যাপার ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। গচ্ছিত ধন বা আমানত বা আমানত রক্ষার ব্যাপারটিকে তাঁদের পবিত্রতম দায়িত্ব হিসেবেই তাঁরা গণ্য করতেন।

আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, এ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আরব ভূমির অবস্থান, আরব ভূমির ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, আরববাসীগণের উদার-উন্মুক্ত মানবিক চেতনা অতিথি পরায়নতা, সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং আমানত গচ্ছিত রাখার অনপনেয় উপযুক্ততার প্রেক্ষাপটে আরব ভূমিকে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু, আরব জাতিকে আল্লাহর পবিত্রতম আমানত ইসলামকে হেফাজত করার উপযুক্ত মানবগোষ্ঠি, আরবী ভাষাকে আল্লাহর বাণী ধারণ ও বহনের উপযুক্ত ভাষা এবং আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিটিকে নবুওয়াত ও রিসালাতের উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষে ইসলামের আয়োজন ও বাস্তবায়ন ধারা সূচিত হয়েছিল।

النسب والمولد والنشأة

পয়গম্বরী বংশাবলী, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সৌভাগ্যময় আবির্ভাব ও তাঁর পবিত্রতম জীবনের চলিশটা বৎসর

পয়মগম্বরী বংশাবলী (نسب النبي ﷺ) **:**

পরস্পরাগত সূত্রে নবী কারীম (ﷺ)-এর বংশাবলীকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এর প্রথম পর্যায় হচ্ছে আদনান পর্যন্ত যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চরিতবেত্তা এবং বংশাবলী বিশেষজ্ঞা বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এর দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে আদনান হতে উপরে ইবরাহীম (عليه السلام) পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চরিতবেত্তা এবং বংশাবলী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে দ্বিমত বা মতান্তর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটিকে কেউ কেউ মুলতুবী রেখেছেন, কেউ কেউ বা আবার কথাবার্তাও বলেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের সময়কাল হচ্ছে ইবরাহীম (عليه السلام) থেকে আদম (عليه السلام) পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হচ্ছে, তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিছুটা ভুলভ্রান্তি রয়েছে। উযরি উল্লেখিত পর্যায় তিনটি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আকারে নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথম পর্যায় ঃ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব (শায়বা) বিন হাশেম (আমর) বিন আবদে মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়েদ) বিন কিলার বিন মুররাহ বিন কা'ব লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ এবং এ সূত্রেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব) বিন মালেক বিন নাযর (কায়েস) বিন কেনানা বিন খোযায়মা বিন মুদরেকাহ (আমের) বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নাযর বিন ময়াদ্দ বিন আদনান।[১]

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ আদনান থেকে উপরের দিক অর্থাৎ আদনান বিন আদ বিন হামিসায় বিন সালামান বিন আওস বিন বুয বিন কামওয়াল বিন উবাই বিন আওয়াস বিন নাশেদ বিন হেযা বিন বালদাস বিন ইয়াদলাফ বিন উবাইদ বিন আদদোয়া বিন হামদান বিন সুনবর বিন ইয়াসরাবী বিন ইয়াহমুন বিন ইয়ালহান বিন আরআওয়া বিন আইয বিন যীশার বিন অইসার বিন আফনাদ বিন আইহাম বিন মুকশের বিন নাহেস বিন যারেহ বিন সুমাই বিন মুযী বিন অওয়াহ বিন এরাম বিন কাইদার বিন ইসামাঈল বিন ইবরাহীম (عليه السلام)[২]

তৃতীয় পর্যায় ঃ ইবরাহীম (عليه السلام) হতে উপরে ইবরাহীম বিন তারেহ (আযর) বিন সারুহ (অথবা সারুগ) বিন রাউ বিন ফালেখ বিন আবের বিন শালেখ বিন আরফাখশাদ বিন শাম বিন নূহ (عليه السلام) বিন লামেক বিন মাতুশলখ বিন আখনুন (কথিত আছে এ নাম ছিল ইদরিস (عليه السلام)-এর নাম বিন ইয়াদ বিন মহ্ লায়েল বিন কায়নার বিন অনুশা বিন শীশ বিন আদম (عليه السلام)।[৩]

পরিবার পরম্পরা (الأسرة النبوية) ঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর পরিবার উপরের দিকে তাঁর প্রপতিমহ হাশেম নিব আবদে মানাফ থেকে পারিবারিক পরিচয় প্রদানের মূলসূত্র ধরার কারণে তা হাশেমী পরিবার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নবী কারীম (ﷺ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য তাঁর পিতামহ, প্রপিতামহ, অর্থাৎ পূর্বতন কয়েক প্রজন্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এ প্রেক্ষিতেই পরবর্তী আলোচনা ঃ

হাশেম ঃ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, যখন বনু আবদে মানাফ এবং বনু আবদুদ্দারের মধ্যে হারামের সঙ্গে সংশিষ্ট পদ সমূহ বন্টনের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তখন আবদে মানাফের সন্তানদের মধ্যে

---

[1] ইবনে ইশাম ১ম খণ্ড ১ ও ২ তালকীহ ফুহুমি আহলিল আসার ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা, রাহমাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ১১-১৪ ও ৫২ পৃষ্ঠা।

[2] খুব সূক্ষ্ণ অনুসন্ধানের পর আলামা মানসুরপুরী বংশাবলীর অংশ কালবী এবং ইবনে সা'দের বর্ণনা দ্বারা একত্রিত করেছেন, দ্রষ্টব্য রহমাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ১৪-১৭ পৃঃ। এ অংশের ঐতিহাসিক সূত্রে মত বিরোধ।

[3] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২-৪ পৃঃ তালকীহুল ফহুম ৬ পৃঃ খোলাসাতুস সিয়র ৬ পৃঃ রহমাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ১৮ পৃঃ কোন কোন না নিয়ে ঐ সুত্রগুলোতে মতভেদ আছে এবং কোন কোন সূত্রে কোন কোন নাম ছুটে গেছে।

হাশেমকেই 'সেকায়া' এবং রেফাদাহ অর্থাৎ হজ্জযাত্রী গণকে পানি পান করানো এবং তাঁদের মেহমানদারী করার **মর্যাদা প্রদান করা হয়।** হাশেমত ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি **'শোরবা'** বা ঝোলের সঙ্গে রুটি মিশ্রিত করে মক্কায় হজ্জযাত্রীগণকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করেন। তাঁর আসল নাম ছিল 'আমর'। কিন্তু শোরবা বা ঝোলের সঙ্গে রুটি ভেঙ্গে মিশ্রিত করার কারণে 'হাশেম' নামে তাকে ডাকা হতে থাকে। কারণ, হাশেম অর্থ হচ্ছে যিনি কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলেন। আবার এ হাশেমই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরাইশদের জন্য গ্রীষ্ম ও শীত কালে ব্যবসা-সংক্রান্ত দুইটি ভ্রমণ-পর্যটনের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন ঃ

عمرو الذي هَشَمَ الثريدَ لقومه ** قَومٍ بمكة مُسْنِتين عِجَافِ

سُنَّتْ إليه الرحلتان كلاهما ** سَفَرُ الشتاء ورحلة الأصياف

অর্থঃ 'এ আমরই এমন ব্যক্তিসত্তা যিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুর্বল স্বজাতির জন্য মক্কায় 'শোরবা বা ঝোলের মধ্যে রুটির টুকরো ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাইয়েছিলেন এবং শীত ও গ্রীষ্মের দিনে ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন।'

তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে সংশিষ্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এটা যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শাম রাজ্যে যাওয়ার পথে যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন সেখানে বনু নাজ্জার গোত্রের সালমা বিনতে আমর নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। তারপর স্বীয় স্ত্রীকে গর্ভবর্তী অবস্থায় তাঁর পিত্রালয় রেখে দিয়ে তিনি শাম রাজ্যে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে ফিলিস্তীনের গায্যাহ শহরে পরলোক গমন করেন।

এদিকে সালমার গর্ভজাত সন্তান যথা সময়ে ভূমিষ্ট হন। বর্ষপঞ্জীর হিসেবে সে বছরটি ছিল ৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। নবজাত শিশুর মাথার চুল ছিল সাদা তাই সালমা তাঁর নাম রাখেন শায়বা।[1] সালমা নিজ পিত্রালয় সযত্নে তাঁর লালন পালন করতে থাকেন। সেদিনের এ শিশুটিই ছিলেন পরবর্তী কালে আখেরী নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পিতামহ এবং অভিভাবক আব্দুল মুত্তালেব। শিশু আব্দুল মুত্তালিব দিনে দিনে শশীকলার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে উঠলেও দীর্ঘময় যাবৎ হাশেম পরিবারের কেউই তাঁর জন্মের কথা জনতে পারনে নি। হাশেম ছিলেন ৯ জন সন্তান-সন্ততির জনক। ৯ জনের মধ্যে ৪ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়ে। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে আসাদ, আবু সাইফী, নাযলাহ, আব্দুল মুত্তালিব এবং শেফা, খালেদাহ, যায়িফাহ, রুকাইয়া ও জন্নাহ।[2]

আব্দুল মুত্তালিব ঃ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বিলক্ষণ অবগত হয়েছি যে, 'সেকায়া' এবং 'রেফাদাহ' সম্পর্কিত পদের দায়িত্ব অর্পিত ছিল হাশেমের উপর। হাশেমের মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ভাই মুত্তালিবের উপর। তিনিও দলের মধ্যে বিভিন্ন সদগুণাবলী এবং মান-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কথা অমান্য করা কিংবা নড়চড় করার ক্ষমতা দলের অন্য কারো ছিল না। বদান্যতার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বদান্যতার কারণেই কুরাইশগণ তাঁর নাম রাখেন 'ফাইয়ায'। যখন শায়বা অর্থাৎ আব্দুল মুত্তালিব দশ বছর বয়সে উপনীত হন তখন মুত্তালিব তাঁর সম্পর্কে অবগত হয়ে নিয়ে আসার জন্য ইয়াসবির গমন করেন। সেখানে পৌঁছার পর যখন তিনি শায়বাকে দেখতে পান তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। তারপর তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে উট পৃষ্ঠে আরোহন করে নেন এবং মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

কিন্তু শায়বা তাঁর মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে মক্কা যেতে অস্বীকার করায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুত্তালিব তাঁর মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থী হন। কিন্তু শায়বার মাতা তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে মুত্তালিব তাঁকে এ কথা বুঝিয়ে বলেন যে, 'এ ছেলে তাঁর পিতার রাজত্বে এবং আল্লাহর হারাম শরীফের দিকে যাচ্ছেন। নিশ্চিতরূপে এ হচ্ছে তাঁর চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

---

[1] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৩৭ পৃঃ রাহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৬ পৃঃ/ ২য় খণ্ড ২৪ পৃঃ।

[2] রাহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ।

এ কথা শ্রবণের পর শায়বাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর আম্মা অনুমতি প্রদান করেন। অনুমতি লাভের পর মুত্তালিব তাঁকে তাঁর উটের পিঠে বসিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। মক্কায় পৌঁছিলে শায়বাকে মুত্তালিবের পাশে দেখে মক্কাবাসীগণ বলেন যে, এ বালক হচ্ছে 'আব্দুল মুত্তালিব' অর্থাৎ মুত্তালিবের দাস। তদুত্তরে মুত্তালিব বলেন, 'না না, এ হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার ভাই হাশেমের ছেলে।' এর পর থেকে মুত্তালিবের নিকট লালিত হতে থাকেন।

শায়বা যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন কোন এক সময় রোমান সাম্রাজ্যের ইয়েমেন মুত্তালিব পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল মুত্তালিব পরিত্যক্ত পদ সমূহের অধিকার লাভ করেন। কালক্রমে আব্দুল মুত্তালিব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মান-মর্যাদা লাভ করেন যে, তাঁর পিতা কিংবা পিতামহ কেউই এত মান-সম্মানের অধিকারী হতে সক্ষম হন নি। একজন গুণী ব্যক্তি হিসেবে কাওমের লোকেরা সকলেই তাঁকে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ভালবাসতেন এবং সমীহ করে চলতেন।[1]

মুত্তালিব যখন পরলোক গমন করেন তখন নাওফাল বল প্রয়োগ করে আব্দুল মুত্তালিব চত্বর দখল করে নেন। আব্দুল মুত্তালিবের একার পক্ষে তাঁর চাচার সঙ্গে মুকাবিলা করা সম্ভব না হওয়ার কারণে কুরাইশ গোত্রের কোন কোন লোকের নিকট তিনি সাহায্য প্রার্থী হন। কিন্তু তাঁরা এ কথা বলে আপত্তি করেন যে, তাঁর এবং তাঁর চাচার বিরোধের ব্যাপারে কোন কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিরূপায় হয়ে আব্দুল মুত্তালিব বনু নাজ্জার গোত্রের তাঁর মামা গোষ্ঠির নিকট কিছু কবিতা লিখে পাঠান যার মধ্যে নিহিত ছিল সাহায্যের করুণ আবেদন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর মামা আবু সা'দ বিন আদী আশি জন অশ্বারোহী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করেন। আব্দুল মুত্তালিব সেখানে গিয়ে তাঁর মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু নাওফালের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত আবূ সা'দ তাঁর গৃহে যেতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে নাওফালের নানার নিকট গিয়ে দাঁড়ান।

নাওফাল তখন হাতীম নামক স্থানে কয়েকজন কুরাইশদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। আবু সা'দ তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললেন, 'এ পবিত্র ঘরের প্রভূর শপথ, তোমরা যদি ভাগ্নেকে তাঁর অধিকার ফিরিয়ে না দাও তাহলে এ তলোয়ার তোমার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করবে।'

কোন ইতস্তত না করে নাওফাল বললেন, 'ঠিক আছে আমি তাঁর অধিকার ফেরত দিলাম।'

এ কথা শ্রবণের পর আবু সা'দ কুরাইশদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকা এবং প্রয়োজনবোধে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তারপর তিনি আব্দুল মুত্তালিবের গৃহে গমন করেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান ও ওমরাহ পালনের পর মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

এ ঘটনার পর নাওফাল বনু হাশেমের বিরুদ্ধে বনু আবদে শামস এর সাথে পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতামূলক এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ দিকে বনু খোযয়া গোত্র যখন লক্ষ্য করলেন যে, বনু নাজ্জার গোত্র আব্দুল মুত্তালিবকে সাহায্য করেছে তখন তাঁরা বললেন যে, 'আব্দুল মুত্তালিব যেমন তোমাদের সন্তান, তেমনি আমাদেরও সন্তান। অতএব, তাঁকে সাহায্য করা অধিকভাবে আমাদেরই কর্তব্য।' কারণ আবদে মানাফের মায়ের সম্পর্ক ছিল খোযয়া গোত্রের সঙ্গে। এ প্রেক্ষিতে বনু খোযয়া গোত্র দারুণ নাদওয়ায় গিয়ে বনু আবদে শামস এবং বনু নাওফালের বিরুদ্ধে বনু হাশেমের সঙ্গে সাহায্য ও সহযোগিতার এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে এমন সব অঙ্গীকার করা হয়েছিল যা পরবর্তী পর্যায়ের ইসলামী যুগে মক্কা বিজয়ের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখিত হবে।[2]

বায়তুলাহর সঙ্গে সংশিষ্ট হওয়ায় আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে দুইটি বিশেষ ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'যমযম' কূপের খনন কাজ সম্পর্কিত ঘটনা এবং অন্যটি হচ্ছে 'হস্তী বাহিনী' সম্পর্কিত ঘটনা। ঘটনা দুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

---

[1] ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৩৭-১৩৮ পৃঃ।

[2] শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ আবুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ) মুখাতাসার সীরাতে রাসূল ৪১-৪২ পৃঃ।

যমযম কূপ খনন ঃ এ ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নযোগে অবগত হন যে, তাঁকে যমযম কূপ খননের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং স্বপ্নযোগে তার স্থানেও নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি খনন কাজ আরম্ভ করে দেন। খনন কাজ চলাকালে কূপ থেকে ঐ সমস্ত জিনিস উত্তোলন করা হয় বনু জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে কূপের মধ্যে যা নিক্ষেপ করেছিলেন। নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের মধ্যে ছিল কিছু সংখ্যক তলোয়ার ও লৌহবর্ম এবং দুইটি সোনার হরিণ। আব্দুল মুত্তালিব তলোয়ারগুলো দ্বারা কা'বা গৃহের দরজা ঢালাই করেন, সোনার হরিণ দুটি দরজার সঙ্গে সন্নিবেশিত করে রাখেন এবং হজ্জযাত্রীগণকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেন।

যমযম কূপ খনন কালে আরও যে ঘটনাটির উদ্ভব হয়েছিল তা হচ্ছে যখন কূপটি প্রকাশিত হয় তখন কুরাইশগণ আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করেন এবং দাবী করেন যে, খনন কাজ তাঁদেরকেও অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে।

আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'যেহেতু এ কূপ খননের জন্য তিনি স্বপ্নযোগে আদীষ্ট হয়েছেন সেহেতু এ খনন কাজ তাঁদের অংশ গ্রহণ করতে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য কুরাইশগণও ছাড়বার পাত্র নন। এ ব্যাপারে মতামত গ্রহণের জন্য তাঁর বনু সা'দ গোত্রের এক মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু পথের মধ্যে তাঁরা এমন কতিপয় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন যাতে তাঁদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যমযম কূপের খনন কাজ আব্দুল মুত্তালিবের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই তাঁরা আর অগ্রসর না হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ প্রেক্ষিতেই আব্দুল মুত্তালিব মানত করেছিলেন যে আল্লাহ তা'আলা যদি অনুগ্রহ করে তাঁকে দশটি পুত্র সন্তান দান করেন এবং সকলেই বয়োপ্রাপ্ত হয়ে জীবনের এ স্তরে গিয়ে পৌঁছে যে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম তাহলে তিনি তাঁর একটি সন্তানকে বায়তুলাহর জন্য উৎসর্গ করবেন।[1]

হস্তী বাহিনীর ঘটনা ঃ দ্বিতীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, আবরাহা সাবাহ হাবশী (তিনি নাজ্জাশী সম্রাট হাবশের পক্ষ হতে ইয়েমেনের গভর্ণর ছিলেন) যখন দেখলেন যে, আরববাসীগণ কা'বা গৃহে হজ্জব্রত পালন করছেন এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন সেখানে আগমন করছেন তখন সানআয় তিনি একটি বিরাট গীর্জা নির্মাণ করলেন এবং আরববাসীগণের হজ্জব্রতকে সেদিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু বনু কেনানা গোত্রের লোকজন যখন এ সংবাদ অবগত হলেন তখন তাঁরা এক রাত্র গোপনে গীর্জায় প্রবেশ করে তার সামনের দিকে মলের প্রলেপন দিয়ে একদম নোংরা করে ফেললেন। এ ঘটনায় আবরাহ ভয়ানক ক্রোধান্বিত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে কা'বা গৃহে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রায় হাজার অস্ত্র সজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি নিজে একটি শক্তিশালী হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। সৈন্যদের নিকট মোট নয়টি অথবা তেরটি হস্তী ছিল।

আবরাহ ইয়েমেন হতে অগ্রসর হয়ে মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌছলেন এবং সেখানে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করে নিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলেন। তারপর যখন মুজদালেফা এবং মীনার মধ্যবর্তী স্থান ওয়াদিয়ে মুহাসাগরে পৌঁছলেন তখন হাতী মাটিতে বসে পড়ল। কা'বা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোন ক্রমেই তাদের উঠানো সম্বব হল না। অথচ উত্তর, দক্ষিন কিংবা পূর্ব মুখে যাওয়ার জন্য উঠানোর চেষ্টা করলে তার তৎক্ষনাৎ উঠে দৌড়াতে শুরু করত। এমন সময়ে আল্লাহ তা'আলা এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখী প্রেরণ করলেন। কুরআন মাজীদে সেই পাখীগুলোকে 'আবাবীল' পাখী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের ছোট ছোট টুকরো এনে সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরো বা কংকর নিয়ে আসত একটি ঠোঁটে এবং দুইটি দু'পায়ে। কংকরগুলোর আকার আয়তন ছিল ছোলার মতো। কিন্তু কংকরগুলো যার যে অঙ্গে লাগত সেই সঙ্গে ফেটে গিয়ে সেখান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে হতে সে মরে যেত।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৪২-১৪৭ পৃঃ।

এ কাঁকর দ্বারা সকলেই যে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এ অলৌকিক ঘটনায় সকলেই ভীষণভাবে আতংকিত হয়ে পড়ল এবং প্রাণভয়ে পলায়নের উদ্দেশ্যে যখন বেপরোয়াভাবে ছুটাছুটি শুরু করল তখন পদতলে পিষ্ট হয়ে অনেকেই প্রাণত্যাগ করল। কংকরাঘাতে ছিন্নভিন্ন এবং পদতলে পিষ্ট হয়ে পলকে বীরপুরুষগণ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়তে লাগল।

এদিকে আবরাহার উপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক মুসিবত প্রেরণ করলেন যে তাঁর আঙ্গুল সমূহের জোড় খুলে গেল এবং সানা নামক স্থানে যেতে না যেতেই তিনি পাখির বাচ্চার মতো হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর বক্ষ-বিদীর্ণ হয়ে হৃদপিণ্ড বেরিয়ে এল এবং তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। মক্কা অভিমুখে আবরাহর অগ্রাভিযানের সংবাদ অবগত হয়ে মক্কাবাসীগণ প্রাণভয়ে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়ন করে পাহাড়ের আড়ালে কিংবা পর্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর যখন তাঁরা অবগত হলেন যে, আবরাহ এবং তাঁর বাহিনী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তখন তাঁরা স্বস্তির নিংশ্বাস ত্যাগ করে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

অধিক সংখ্যক চরিতবেত্তাগণের অভিমত হচ্ছে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মলাভের মাত্র ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পূর্বে মুহারম মাস। অত্র প্রেক্ষিতে এটা ধরে নেয়া যায় যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে কিংবা মার্চ মাসের প্রথম ভাগে। হস্তী বাহিনীর এ ঘটনা ছিল আগামী দিনের নবী ﷺ এবং কা'বা শরীফের জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সাহায্যের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। এর পিছনে আরও যে একটি কারণ ছিল তা হচ্ছে নবী কারীম ﷺ তাঁর আমলেই দেখলেন যে বায়তুল মুকাদ্দেস ছিল মুসলিমদের কেবলাহ এবং সেখানকার অধিবাসীগণও ছিল মুসলিম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উপর আল্লাহর শত্রুদের অর্থাৎ মুশরিকগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বোখতে নাস্সারের আক্রমণ (৫৮৭ খ্রীষ্ট পূর্ব অব্দে) এবং রোমানগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা (৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। পক্ষান্তরে কা'বার উপর খ্রীষ্টনদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যদিও তাঁরা তৎকালে মুসলিম ছিলেন এবং কা'বার অধিবাসীগণ ছিলেন মুশরিক।

অধিকন্তু, এ ঘটনা এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যে, এ সংক্রান্ত সংবাদটি তৎকালীন সভ্য জগতের অধিকাংশ অঞ্চলে (রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য ইত্যাদি) খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, হাবশী এবং রোমীয়গণের মধ্যে গভীর সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অপর দিকে পারস্যবাসীগণের দৃষ্টি রোমীগণের উপর সমভাবে বিদ্যমান ছিল এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, পারস্যবাসীগণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইয়েমেন দখল করে বসে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন রোমান এবং পারস্য এ দুইটি রাষ্ট্রই তৎকালীন পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিনিধিত্ব করত এবং যেহেতু হস্তীবাহিনীর ঘটনাটি এ দু'রাষ্ট্রের সকলের নিকটেই সুবিদিত ছিল। সেহেতু বলা যায় যে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি কা'বা গৃহের অলৌকিকত্বের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে গেল। বায়তুলাহ শরীফের উচ্চ সম্মান ও সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর একথা তাঁদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান লাভ করল যে, এ গৃহকে সংরক্ষণ ও পবিত্রকরণ এবং এর সুমহান মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা এ অলৌকিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। অতএব ভবিষ্যতে এখানকার অধিবাসীগণের মধ্য থেকে কেউ যদি নবুয়ত দাবী করেন তবে সেই ঘটনার প্রেক্ষাপটে তা হবে আইন-সঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয় ব্যাপার এবং তা হবে পার্থিব ব্যবস্থাপনার উর্ধ্বে আল্লাহর রাজত্বের ভিত্তি যা ইমানদারদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হয়েছিল গায়েবী সূত্র থেকে।

আব্দুল মুত্তালিবের ছিল সর্বমোট দশটি সন্তান। তাঁদের নাম ছিল যথাক্রমে ঃ হারেস, জোবায়ের, আবু তালেব, আবদুল্লাহ, হামজাহ, আবুলাহাব, গায়দাক, মুকাওআম, সেফার, এবং আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন যে তাঁর ছিল ১১টি সন্তান, একজনের নাম ছিল কাষম। অন্য কেউ বলেছেন যে, ১৩টি সন্তান ছিল। অন্য দু'জনের নাম হল, 'আব্দুল কা'বা এবং 'হাযাল'। কিন্তু দশ জনের কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা বলেন যে, 'মুকাওআমেরই' অপর নাম ছিল 'আব্দুল কা'বা এবং 'গায়দাকের' অপর নাম ছিল 'হাযাল'। তাঁদের মতে কাষম নামে আব্দুল

---

[১] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৫৬ পৃঃ।

মুত্তালিবের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিল ৬ জন। তাঁদের নামগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ঃ উম্মুল হাকীম (তাঁর অপর নাম বায়যা), বাররাহ, আতেকাহ, সফিয়্যাহ আরওয়া এবং উমাইয়া।[1]

আবদুল্লাহ ঃ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত পিতা। তার (আবদুল্লাহর) মাতার নাম ছিল ফাতেমা। তিনি ছিলেন আমর বিন আয়েয বিন ইমরান মাখযুম বিন ইয়াকযাহ বিন মুররাহর কন্যা। আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ছিলেন সব চাইতে সুন্দর এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন পিতার অত্যান্ত প্রিয় পাত্র। তাঁর লকব বা উপাধি ছিল যবীহ। যে কারণে তাঁকে যবীহ বলা হতো তা হচ্ছে আব্দুল মুত্তালিবের প্রার্থিত পুত্র সংখ্যা যখন ১০ জন হল এবং তাঁরা সকলেই আত্মরক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করলেন তখন আব্দুল মুত্তালিব তাঁদের নিজ মানত সম্পর্কে অবহিত করেন (তাঁদের পক্ষ থেকে এক জনকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করার ব্যাপারে) তাঁরা সকলেই এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেনে।

এরপর আব্দুল মুত্তালিব ভাগ্য-নির্ণক তীরের উপর তাঁদের সকলের নাম লিখেন এবং হোবল মূর্তির সেবায়েত বা তদারককারীগণের পন্থায় চক্রাকারে ঘোরানো ফেরানোর পর নির্বাচনগুটিকা বা লটারীর গুটি বের করেন। লটারীতে আবদুল্লাহর নাম উঠে যায়। আব্দুল মুত্তালিব আবদুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যান কা'বা গৃহের নিকট। তাঁর হাতে ছিল যবেহ কাজে ব্যবহারোপযোগী একটি ধারলো অস্ত্র। কিন্তু কুরাইশগণের মধ্যে বনু মাখযুম অর্থাৎ আবদুল্লাহর নানা গোষ্ঠীর লোকজন এবং আবদুল্লাহর ভাই আবু তালিব এ ব্যাপারে তাঁর বাধা প্রদান করেন। তাঁর মানত পূরণে বাধাপ্রাপ্ত আব্দুল মুত্তালিব বললেন তাহলে মানতের ব্যাপারে তাঁর করণীয় কাজ কি হতে পারে? এতদ্বিবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীনী বা তত্ব বিশারদগণ কোন মহিলার নিকট থেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁরা তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন। আব্দুল মুত্তালিব জনৈক তত্ত্ববিশারদের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবদুল্লাহ এবং ১০ টি উটের মধ্যে লটারী বা নির্বাচনগুটিকা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। নির্বাচনি গুটিকায় যদি আবদুল্লাহর নাম উঠে যায় তাহলে ১০টি উটের সঙ্গে আরও ১০টি উট যোগ করে নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করতে হবে যে পর্যন্ত না আবদুল্লাহর নামের স্থানে 'উট' কথাটি প্রকাশিত হয় সে পর্যন্ত একই ধারায় নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করে যেতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান। তারপর উটের যে সংখ্যা নির্ধারক নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করা হবে সেই সংখ্যক উট আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতে হবে।

সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আব্দুল মুত্তালিব, আবদুল্লাহ ও ১০টি উটের মধ্যে নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করেন। কিন্তু এতে আবদুল্লাহর নামই প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববিশারদের নির্দেশ মুতাবেক দ্বিতীয় দফায় উটের সংখ্যা আরও বেশী বৃদ্ধি করে তিনি নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করেন। কিন্তু এতেও আবদুল্লাহর নামই উঠে যায়। কাজেই পরবর্তী প্রত্যেক দফায় ১০টি উটের সংখা বৃদ্ধি করে তিনি নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করে যেতে থাকেন। এ ধারায় চলতে চলতে যখন একশত উট এবং আবদুল্লাহর নাম নির্বাচনী গুটিকায় ব্যবহার করা হয় তখন উট কথাটি প্রকাশিত হয়। এ প্রেক্ষিতে আব্দুল মুত্তালিব আবদুল্লাহর পরিবর্তে ১০০ টি উট আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস কোন মানুষ কিংবা জীবজন্তুর খাওয়ার ব্যাপারে কনো বাধা-নিষেধ ছিল না। উল্লেখিত ঘটনার পূর্বে আরব এবং কুরাইশগণের মধ্যে শোনিতপাতের খেসারত বা মূল্য ছিল ১০টি উট। কিন্তু এ ঘটনার পর এর বর্ধিত সংখ্যা নির্ধারিত হয় ১০০টি উট। ইসলামও এ সংখ্যাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রিয় নবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, আমি দুই যবীহর সন্তান, 'একজন ইসমাঈল (عليه السلام) এবং অন্য জন হচ্ছেন আমার পিতা আবদুল্লাহ।[2]

---

[1] তালকীহুল ফহুম ৮-৯ পৃঃ এবং রহমাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ৫৬-৬৬ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৫১-১৫৫ পৃঃ রাহমাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ৮৯-৯০ পৃঃ। মোখতাসারে সীরাতে রাসূল শাইখ আবদুল্লাহ নাজদী ১২, ২২, ২৩।

আব্দুল মুত্তালিব স্বীয় সন্তান আবদুল্লাহর বিবাহের জন্য আমিনাকে মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন ওয়াহাব বিন আবদে মানাফ বিন যোহরা বিন কেলাবের কন্যা। বংশ পরস্পরা এবং মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁকে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে উন্নত মানের মহিলা ধরা হতো। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত বনু যোহরা গোত্রের দলপতি। বিবাহের পর আমিনা মক্কায় স্বামী গৃহে আগমন করেন এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন কিন্তু অল্প দিন পরেই আব্দুল মুত্তালিব ব্যবসা উপলক্ষ্যে খেজুর আনয়নের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহকে মদীনা প্রেরণ করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

কোন কোন চরিতবিদ বলেন যে, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ শামদেশে গমন করেছিলেন। এক কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মদীনায় অবতরণ করেন। সেই অসুস্থতার মধ্যেই সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নাবেগা জা'দীর বাড়িতে তাঁর কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫ বছর। অধিক সংখ্যক ইতিহাসবিদদের অভিমত হচ্ছে তিনি পিতার মৃত্যুসময় জন্ম গ্রহণ করেন নি। আর অল্প সংখ্যক ঐতিহাসিসকের অভিমত হচ্ছে, পিতার মৃত্যুর দু'মাস পূর্বেই নবী কারীম ﷺ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।[১] যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ মক্কায় পৌঁছিল তখন আমিনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি শোকগাঁথা আবৃত্তি করেছিলেন। শোক গাথাটি হচ্ছে-

عَفَــا جانبُ البطحــاءِ من ابن هــاشــم ** وجاور لَحْدًا خارجــاً في الغَـمَاغِم

دَعَتْــه المنـــايا دعـــوة فأجــابــهــا ** وما تركتْ في الناس مثل ابن هاشــم

عشيـــة راحـــوا يــحمـــلـــون سريـــره ** تَعَاوَرَهُ أصــحــابـــه في التزاحــم

فإن تــك غــالتــه الــمـــنــايا وريْبَهــا ** فقــد كــان مِعْطــاءً كــثير التراحم

অর্থঃ 'বতহার জমিন হাশেমের পুত্রকে হারালো, সে চিৎকার ও গোলমালের মাঝে সমাধিতে সুখস্বপ্নবৎ পরিতৃপ্তি হয়ে গেল। মৃত্যু মানুষের মধ্যে ইবনে হাশেমের মত কোন ব্যক্তিকে ছাড়ে নাই। (কতই দুঃখ জনক ছিল) যখন সেই সন্ধ্যায় লোকেরা তাঁকে মৃতের খাটে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও মৃত্যু এবং মৃত্যুর ঘটনাবলী তাঁর অস্তিত্বকে শেষ করেছে। তবুও তাঁর উন্নততর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে মুছে ফেলতে পারবে না। তিনি ছিলেন বড়ই দয়াবান এবং কোমল অন্তঃকরণের অধিকারী।[২]

মৃত্যুকালে তিনি যে সব সহায়-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা ছিল যথাক্রমে ৫টি উট, এক পাল ছাগল এবং একটি হাবশী দাসী যার নাম ছিল বরকত ও উপনাম উম্মে আয়মান। এ উম্মে আয়মানই নবী কারীমকে দুগ্ধ খাইয়েছিলেন।[৩]

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৫৬-১৫৮ পৃঃ ফিকহুস সীরাত মুহাম্মাদ গাযালী ৪৫ পৃঃ রহমাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ।

[2] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ।

[3] শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাত ১২ পৃঃ তালকীহুল ফোহম ১৪ পৃঃ সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

المولد وأربعون عامًا قبل النبوة

সৌভাগ্যময় জন্ম এবং পবিত্র জীবনের চলিশ বছর ঃ

সৌভাগ্যময় জন্ম (المولــــد) ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশেম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার দিবস রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদেকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী পঞ্জিকা মতে তারিখাটি ছিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চলিশতম বছর। বিশিষ্ট্য শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ সোলায়মান সালমান সাহেব (রহঃ) এবং মাহমুদ পাশা ফাল্কীর অনুসন্ধানলব্ধ সঠিক অভিমত হচ্ছে এটাই।[1]

ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মা বলেছেন যখন তাঁর জন্ম হয়েছিল তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিল যাতে শামদেশের অট্টালিকাসমূহ আলোকিত হয়েছিল। ইমাম আহমদ (রঃ) ইরবায বিন সারিয়া কর্তৃক অনরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[2] নবী ﷺ-এর জন্মের সময় কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবুওয়াতের পূর্বাভাস স্বরূপ প্রকাশিত হয়। কেসরাপ্রাসাদের সৌধচূড়াগুলো ভেঙ্গে পড়ে, প্রাচীবন পারসীক যাজকমণ্ডলীর উপাসনাগার গুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসা অগ্নিকুণ্ডগুলো নির্বাপিত হয়ে যায়, বাহীরা পাদ্রীগণের সরগম গীর্জাগুলো নিস্তেজ ও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে এবং তাঁদের সুখ-সাচ্ছন্দ বিনষ্ট হয়ে যায়, কাবা গৃহের ৩৬০টি মূর্তি ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এ বর্ণনা হচ্ছে ইমাম বায়হাকীর।[3] কিন্তু মুহাম্মদ গাযালী এ সকল বর্ণনাকে সঠিক বলে স্বীকার করেন নি।[4]

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই বিবি আমিনা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্ম গ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এ শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি আনন্দ উদ্বেল চিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে নয় জাতককে কোলে তুলে নিয়ে কাবগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অপূর্ব সুষমামণ্ডিত এ শিশুর মুখমণ্ডলে আনন্দাশ্রু সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আল্লাহর দরাবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। একান্ত আনন্দ মধুর এ মূহুর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে এ নব জাতকের নামা রাখা হবে মুহাম্মদ। আবরবাসীগণের নামের তালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়।[5]

তাঁর মাতার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্ব প্রথম দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের দাসী সোওয়ায়বা। ঐ সময় তার কোলে যে সন্তান ছিল তাঁর নাম ছিল মাসরুহ। নবী কারীম ﷺ-এর পূর্বে সোওয়ায়বা হামযা বিন আব্দল মুত্তালিবকে এবং পরে আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমীকেও দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন।[6]

বনু সা'দ গোত্রে লালন পালন (في بني سعد) ঃ

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন পালনের ব্যাপারে তৎকালীন নগরবাসী আবরগণের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই প্রথাটি ছিল শহর-নগরের জনাকীর্ণ পরিবেশ জনিত আধি-ব্যাধির কুপ্রভাব থেকে দূরে উন্মুক্ত গ্রামীন পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করার মাধ্যমে তারা, যাতে বলিষ্ঠদেহ এবং মজবুত মাংষপেশীর অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে সক্ষম হয় তদুদ্দেশ্যে দুগ্ধ পানের জন্য বেদুঈন পরিবারের ধাত্রীগণের হাতে শিশুদের সমর্পণ করা। এ প্রথানুযায়ী অব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদ ﷺ- কে দুগ্ধ পান করানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রী

---

[1] মাহমুদ পাশা- তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। মুহাম্মাদ সোলায়মান মুনসুরপুরী, রহমতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৩৮-৩৯ পৃঃ। এপ্রিলের তারীখ সম্পর্কে মতভেদ হচ্ছে খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার গোলমালের ফল।

[2] শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১২ পৃঃ ও ইবনে সা'দ ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ।

[3] মোখতাসারুস সীরাহ ১২ পৃঃ।

[4] মুহাম্মদ গাযালী সীরাত ৪৬ পৃঃ (ইমাম বায়হাকীর মত। কিন্তু মুহাম্মদ গাযালী এটার শুদ্ধতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন।

[5] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৫৯-১৬০ পৃঃ তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ভিন্ন একটি বর্ণানা মতে তিনি খাতনাকৃত অবস্থায়ই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তালকীহুল ফোহুম ৪ পৃঃ কিন্তু ইবনে কাইয়েম বলেন যে, এ ব্যাপারে কোন প্রামান্য হাদীস নেই। যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ।

[6] তালকীহুল ফোহুম ৪ পৃঃ শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১৩ পৃঃ।

অনুসন্ধান করেন এবং শেষ পর্যন্ত হালীমা বিনতে আবু যুয়ায়েবের নিকট তাকে সমার্পণ করেন। এ মহিলা বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের একজন খাতুন ছিলেন। তার স্বামীর নাম ছিল হারেস বিন আব্দুল উয্যা এবং উপনাম ছিল আবু কাবশাহ। তিনিও বনু সা'দ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

বিবি হালীমা ও হারেস দম্পতির কয়েকটি সন্তান ছিল। তার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুগ্ধ সম্পর্কিত ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্মান লাভ করে। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ আবদুল্লাহ আনীসাহ, হোযাফা অথবা জোযামা। হোযাফা শায়মা নামে অধিকতর পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ শায়মাই রাসুলুলাহ ﷺ-এর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা হালীমা সাহায্য করতেন বলে কথিত আছে। অধিকন্তু, তাঁর চাচাতো ভাই আবু সফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিবও বিবি হালীমের সুত্র ধরে দুগ্ধ সম্পর্কিত ভাই ছিলেন। নবী কারীম ﷺ চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবকেও বনু সায়াদ গোত্রের এক মহিলা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। বিবি হালীমা গৃহে থাকা অবস্থায় এ মহিলাও একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে নবী কারীম ﷺ এবং মাহযা (রাঃ) দু'ভাই সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যান। প্রথম সুত্রে সোওয়াইবার সম্পর্কের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় সূত্রে বনু সায়াদ গোত্রে সেই মহিলার মাধ্যমে।[1]

দুগ্ধ পান কালে হালীমা নবী কারীম ﷺ-এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যান্বিত ও হতবাক হয়ে যান। বিবি হালীমার বর্ণনা সূত্রে ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক বলেন যে, বিবি হালীমা এবং তার স্বামী তাদের একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তান সহ বনু সায়াদ গোত্রের এক দল মহিলার সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধপান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কা যান। সেই সময় আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষজনিত দারুন খাদ্য ও অর্থ সংকট বিরাজমান ছিল।

বিবি হালিমা বলেন, 'আমি আমার একটি সাদা মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছিলাম। আমার সঙ্গে উটও ছিল। কিন্তু কি আল্লাহর মহিমা যে, উটের ওলান থেকে এক বিন্দুও দুধ বাহির হচ্ছিলনা। আমার বুকেও শিশুটির জন্য এক বিন্দু দুধ ছিলনা। এ দিকে ক্ষুধার তাড়নায় শিশুরা এতই ছটফট করছিল যে, সারাটি রাত আমরা ঘুমাতে পারি নি। এমতাবস্থায় আমরা বৃষ্টি ও সচ্ছলতার আশা-ভরসা নিয়ে প্রহর গুনছিলাম। কিন্তু অবস্থার তেমন কোন উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় আমারা পথ চলা শুরু করলাম।'

"আমি আমার মাদী গাধাটির উপর সওয়ার হয়ে পথ চলতে থাকলাম। গাধাটি ছিল খুবই দুর্বল তার দুর্বলতা এবং শক্তি হীনতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে চলতে থাকল যে, এতে কাফেলার অন্যেরা অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করতে থাকল। যা হোক, এমনভাবে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যদিয়ে আমার মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর আমাদের দলে এমন কোন মহিলা ছিল না যার নিকট শিশু নবী ﷺ- কে দুগ্ধ পান করানোর প্রস্তাব দেয়া হয় নি। কিন্তু যখনই তারা জানতে পারল যে, শিশুটি পিতৃহীন ইয়াতীম তখনই তারা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। কারণ, দুগ্ধদানের জন্য দুগ্ধপোষ্যের পিতার নিকট থেকে উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশা সকলেরই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। মা বিধবা, দাদা বৃদ্ধ, এ শিশুকে লালন-পালন করে তার বিনিময়ে কীইবা এমন পাওয়ার আশা করা যেতে পারে? ইতস্তত করে এ সব কিছু ভেবে চিন্তে দলের কেউই তা নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল না।'

'এদিকে দলের অন্যান্য মহিলা যারা আমার সঙ্গে এসেছিল তারা সকলেই একটি শিশু সংগ্রহ করে নিল। অবশিষ্ট রইলাম শুধু আমি। আমার পক্ষে কোন শিশু সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। ফিরে যাওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল আমার মনটা ক্রমান্বয়ে ততই যেন কষ্টকর ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকল। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বললাম, 'আমার সঙ্গীনীরা সকলেই দুধপানের জন্য সন্তান নিয়ে ফিরছে আর আমাকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে এ যেন আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তার চাইতে বরং আমি সেই ইয়াতিম ছেলেটিকেই নিয়ে যাই (যা করেন আল্লাহ)।'

---

[1] যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৯ পৃঃ।

স্বামী বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই, তুমি গিয়ে তাকেই নিয়ে এসো। এমনটিও হতে পারে **যে, আল্লাহ এর মধ্যেই** আমাদের জন্য কোন বরকত নিহিত রেখেছেন। এমন এক অবস্থা এবং মন-মানসিকতার **প্রেক্ষাপটে শিশু মুহাম্মদ** ﷺ- কে দুধ পান করানোর জন্য আমি গ্রহণ করলাম।'

তারপর হালীমা বললেন, 'যখন আমি শিশু মুহাম্মদ ﷺ- কে নিয়ে নিজ আস্তানায় ফিরে এলাম এবং তাঁকে আমার কোলে রাখলাম তখন তিনি তাঁর দু'সীনা আমার বক্ষের সঙ্গে মিলিত করে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করলেন। তাঁর দুধভাই অর্থাৎ আমার গর্ভজাত সন্তানটিও পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করল। এরপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। অন্য দিকে আমার স্বামী উট দোহন করতে গিয়ে দেখেন যে, তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি এত বেশী পরিমাণে দুধ দোহন করলেন যে, আমরা উভয়েই তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে তা পান করলাম এবং বড় আরামের সঙ্গে রাত্রি যাপন করলাম। পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাত্রি যাপন শেষে যখন সকাল হল তখন আমার স্বামী বললেন, 'হালীমা! আল্লাহর শপথ, তুমি একজন মহা ভাগ্যবান সন্তানলাভ করেছ।' উত্তরে বললাম, 'অবস্থা দেখে আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে।'

হালীমা আরও বলেন যে, 'এরপর আমাদের দল মক্কা থেকে নিজ নিজ গৃহে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। শিশু মুহাম্মদ ﷺ- কে বুকে নিয়ে আমার সেই দুর্বল এবং নিস্তেজ মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে আমিও তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ আমার সেই দুর্বল গাধাই সকলকে পিছনে ফেলে দ্রুত বেগে সকলের অগ্রভাগে এগিয়ে যেতে থাকল। অন্য কোন গাধাই তার সাথে চলতে পারল না। এমনকি অন্যান্য সঙ্গিনীরা বলতে থাকল, 'ওগো আবু যুওয়াইবের কন্যা! ব্যাপারটি হল কি বল দেখি। আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করো! এটা কি সেই গাধাটি নয় যার উপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, এটা সেই গাধাই যার উপর সওয়ার হয়ে আমি এসেছিলাম।'

তারা বলল, 'নিশ্চয়ই, এর সঙ্গে বিশেষ রহস্যজনক কোন ব্যাপার ঘটেছে।'

এমন এক রহস্যময় অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা বনু সায়াদ গোত্র নিজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। ইতোপূর্বে এ ব্যাপারটি আমার জানা ছিল না যে, আমাদের অঞ্চলের মানুষের চাইতে অন্য কোন অঞ্চলের মানুষ অধিকতর অভাবগ্রস্থ থাকতে পারে আল্লাহর তা'আলার এ জমিনে, কিন্তু আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমার সে ভুলটি ভেঙ্গে গেল।

মক্কা থেকে আমাদের ফিরে আসার পরবর্তী সময়ে আমাদের বকরীগুলো চারণভূমি থেকে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধ পরিপূর্ণ ওলান সহকারে বাড়িতে ফিরে আসত। দুগ্ধবতী বকরীগুলো দোহন করে আমরা তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করতাম। অথচ অন্য লোকেরা দুধ পেত না এক ফোঁটাও। তাদের পশুগুলোর ওলানে কোন দুধই থাকত না। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশুপালের মালিকেরা তাদের রাখালদের বলতেন, 'হতভাগারা যেখানে বনু যুওয়াইবের কন্যার রাখাল পশুপাল নিয়ে যায় তোমরা কি তোমাদের পশুপাল নিয়ে সেই চারণভূমিতে যেতে পার না?'

এ প্রেক্ষিতে আমাদের রাখাল যে চারণভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত অন্যান্য লোকের রাখালরাও সেই ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত ও অভূক্ত অবস্থায় ফিরে আসত। সে সকল পশুর ওলানে দুধও থাকত না। অথচ আমাদের বকরীগুলো পরিতৃপ্তি এবং ওলানে পূর্ণমাত্রায় দুধসহকারে বাড়িতে ফিরত। প্রত্যেকটি কাজে কর্মে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সব কিছুর মধ্যেই আমরা বরকত লাভ করতে থাকলাম।

এভাবে সেই ছেলের পুরো দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং আমি তাঁকে স্তন্য পান করানো বন্ধ করে দিলাম। অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এ শিশুটি এত সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে থাকলেন যে, দু'বছর পুরো হতে না হতেই তাঁর দেহ বেশ শক্ত ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠল। লালন-পালনের মেয়াদ দু'বছর পূর্ণ হওয়ায় আমরা তাঁকে তাঁর মাতার নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাদের সংসার জীবনে সচ্ছলতা ও

বরকতের যে সুফল আমরা ভোগ করে আসছিলাম তাতে আমরা মনের কোণে একটি গোপন ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, তিনি যেন আরও কিছুকাল আমাদের নিকট থাকেন। তাঁর মাতার নিকট আমাদের গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললাম যে, তাঁকে আরও কিছু সময় আমদের সঙ্গে থাকতে দিন যাতে তিনি সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে ওঠেন। অধিকন্তু, মক্কায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কেও আমরা কিছুটা ভয় করছি। আমাদের বারংবার অনুরোধ ও আন্তরিকতায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি মুহাম্মাদ ﷺ- কে পুনরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।[1]

বক্ষ বিদারণ (شق الصدر) ঃ

এভাবে দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক নবী ﷺ বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান করতে থাকলেন। দ্বিতীয় দফায় বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান কালে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম[2] বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। আনাস (رضي الله عنه) হতে সহীহ মুসলিমে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন বালক নবী ﷺ যখন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল (عليه السلام) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল।' তারপর হৃৎপিণ্ডটিকে একটি সোনার তস্তরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গী-সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে দুধমা বিবি হালিমাকে বলল যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হয়েছেন। বিবি হালিমা এবং তাঁর স্বামী এ কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁরা সেবাযত্নে লিপ্ত হলেন।[3]

স্নেহময়ী মাতৃক্রোড়ে (إلى أمه الحنون) ঃ

বালক নবী ﷺ-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনায় দুধমা হালিমা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর মার নিকট ফেরত দেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মা হালিমার ঘরে বড় হন।[4] দুধমা'র ঘর থেকে প্রাণের টুকরো নয়নমণি সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর বিবি আমিনা ইয়াসরেব গিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করার মনস্থ করেন। তারপর শশুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশুপুত্র মুহাম্মদ ﷺ এবং পরিচারিকা উম্মু আয়মনাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদীনা তুলনামূলক কম দূরত্বে অবস্থিত। পথ চলার এমন এক পর্যায়ে বিবি আমিনা হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল তাঁর অসুখ। তারপর তিনি ইয়াতিম শিশু নবী ﷺ এবং আত্মীয়-স্বজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।[5]

পিতামহের স্নেহ-ছায়ার আশ্রয়ে (إلى جده العطوف) :

পিতার মৃত্যুর পর রইলেন স্নেহময়ী মা, মাতার মৃত্যুর পর বেঁচে রইল বৃদ্ধ দাদা। মায়ের মৃত্যুর পর শোকাভিভূত দাদা নিয়ে এলেন পিতা-মাতাহীন পুত্রকে নবুয়ত ও রিসালাতের নিকেতন মক্কায়। প্রাণের চেয়ে বেশী

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৬২-১৬৪ পৃঃ।

[2] এটাই হল সাধারণ চরিতকারকগণের মত। কিন্তু ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, ঘটনাটি হয়েছিল তৃতীয় বছরে। ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ১৬৪-১৬৫ পৃ.।

[3] সহীহ মুসলিম, বাবুল ইসরা, ১ম খণ্ড ৯২ পৃ.।

[4] তালকীহুল ফোহুম, ৭ পৃ. ও ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃ.।

[5] ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ১৬৮ আলকীহুল ফোহুম, ৭ পৃ.। তারীখে খুযরী, ১ম খণ্ড ৬৩ পৃ. ফিকহুস সীরাত, গাযালী ৫০ পৃ.।

প্রিয় পুত্র আব্‌দুল্লাহ'র মৃত্যুতে আব্দুল মুত্তালিব যতটা ব্যাথা অনুভব করেছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশী ব্যাথা অনুভব করলেন পুত্রবধূ আমিনার মৃত্যুতে। কারণ, আব্‌দুল্লাহ'র মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবলম্বন ছিলেন তাঁর মা আমিনা। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর যে আর কোন অবলম্বনই রইল না। এ দুঃখ তাঁর শতগুণে বেড়ে গেল। অন্য দিকে তেমনি আবার ইয়াতিম শিশুটির জন্য তাঁর স্নেহসুধাও শত ধারায় বর্ষিত হতে থাকল। মনে হতো যেন ঔরসজাত সন্তানের চাইতেও বেশী মাত্রায় তিনি তাঁকে স্নেহ করতে লাগলেন।

অবশ্য এটাও সত্য পুত্রবধূ আমিনার মৃত্যুর পূর্বেও তিনি এ শিশুটিকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। শুধু তাই নয়, এ শিশুটিকে তিনি সম্মানের দৃষ্টিতেও দেখতেন। ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে যে, কা'বা ঘরের ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বিশেষ একটি আসন বিছানো থাকত। আব্দুল মুত্তালিব এ আসনে বসতেন এবং সন্তানগণ বসতেন সেই আসনের পার্শ্ববর্তী স্থানে। পিতার সম্মানার্থে তাঁর কোন সন্তান এ আসনে বসতেন না। কিন্তু শিশু নবী ﷺ সেখানে আগমন করে সে আসনেই বসতেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর চাচাগণ তাঁর হাত ধরে তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের উপস্থিতিতে শিশু নবী ﷺ-কে সেই আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করা হলে তিনি বলতেন, 'ওকে তোমরা এ আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করো না, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ, কী যে আল্লাহর মর্যাদা তা তিনিই জানেন, তবে এ শিশুকে সাধারণ শিশু বলে মনে হয় না। ও হচ্ছে ভিন্ন রকমের এক শিশু, অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। অদ্ভূত রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে ওর সব কিছুতে।' তারপর তাঁকে নিজের কাছেই বসিয়ে নিতেন সে আসনে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোহাগ করতেন এবং তাঁর চাল-চলন ও কাজকর্ম দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।[1]

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বয়স যখন আট বছর দু'মাস দশ দিন তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলেন। এভাবে মৃত্যু দাদার স্নেহ-সুশীতল বক্ষ থেকে শিশু নবী ﷺ-কে ছিনিয়ে নিয়ে শোক সাগরে নিমজ্জিত করে। বালক নবী ﷺ এখন ভাবতে শিখেছেন মৃত পিতার কথা, ভাবতে শিখেছেন গর্ভধারীনী স্নেহ মমতার মূর্ত প্রতীক মৃতা মায়ের কথা। অবর্ণনীয় শোক-তাপ ও দুঃখ বেদনার সঙ্গে আবারও তাঁকে ভাবতে হল মৃত দাদার কথা।

নবী ﷺ এ দুঃখ-শোকের মুহুর্তে দুঃখ-বেদনার বোঝা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন চাচা আবু তালিব। হৃষ্টচিত্তে তিনি আপন কাঁধে তুলে নিলেন বালক মুহাম্মদ ﷺ-এর লালন-পালনের সকল দায়িত্ব। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর আগে আবু তালেবকে সেই অসিয়তই করে গিয়েছিলেন।[2]

স্নেহশীল পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে (إلى عمه الشفيق) ঃ

পিতার অন্তিম অসিয়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আবু তালিব অত্যন্ত যত্নসহকারে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভবিষ্যতের নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে লালন-পালন করতে থাকেন। আবু তালিব তাঁকে যে আপন সন্তানাদির অন্যতম হিসেবে লালন-পালন করতে থাকেন তা-ই নয়, বরং নিজ সন্তানের চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতা দিয়েই তাঁকে প্রতিপালন করতে থাকেন। অধিকন্তু, পিতা আব্দুল মুত্তালিবের মতই তিনিও তাঁকে নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। অনাগত জামানার নবী ﷺ শৈশব, বাল্য কিংবা কৈশোরেই যে মান-সম্মান লাভ করতে থাকবেন সে ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা সংশয়ের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থাকেও আমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা বিশেষ একটি নিয়ামত হিসেবে সহজেই ধরে নিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত এভাবে তিনি বিচক্ষণ চাচার অধীনে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তাঁর চাচার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনাবলী প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ।

[2] তলিকীহুল পোহুম ৭ পৃঃ এবং ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃঃ।

চেহারা মুবারক হতে রহমত বর্ষণের অন্বেষণ (يستسقى الغمام بوجهه) :

ইবনে আসাকের, জালহামা বিন আরাফাতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি একবার মক্কায় আগমন করলাম। দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ তখন অত্যন্ত নাজেহাল এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত ছিলেন। কুরাইশগণ আবু তালিবকে বললেন, 'হে আবু তালিব! আরববাসীগণ দুর্ভিক্ষ জনিত চরম আকালের সম্মুখীণ হয়েছেন। চলুন সকলে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকটে দু'আ করি"। এ কথা শ্রবণের পর আবু তালিব এক বালককে (বালক নবী ﷺ)-কে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন। ঐ বালককে আকাশে মেঘাচ্ছন্ন এমন এক সূর্য বলে মনে হচ্ছিল যা থেকে ঘন মেঘমালা যেন এখনই আলাদা হয়ে গেল। সেই বালকের আশপাশে আরও অন্যান্য বালকও ছিল, কিন্তু এ বালকটির মুখমণ্ডল থেকে এ বৈশিষ্ট্য যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

আবু তালিব সে বালককে হাত ধরে কাবা গৃহের নিকট নিয়ে গেলেন এবং কা'বার দেয়ালের সঙ্গে তাঁর পিঠ লাগিয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। বালক তাঁর চাচার হাতের আঙ্গুল ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সে সময় আকাশে এক টুকরো মেঘও ছিল না। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেঁয়ে গিয়ে আঁধার ঘনিয়ে এল এবং মুষল ধারে বৃষ্টিপাত শুরু হল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এত বেশী হল যে উপত্যকায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে গেল এবং এর ফলে শহর ও মরু অঞ্চল পুনরায় সতেজ-সজীব হয়ে উঠল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবু তালিব মুহাম্মদ ﷺ-এর যে প্রশংসা গীতি গেয়েছিলেন তা হচ্ছেঃ

وأبيضَ يُستسقى الغَمَام بوجهه ** ثِمالُ اليتامى عِصْمَةٌ للأرامل

অর্থঃ 'তিনি অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁর চেহারা মুবারক দ্বারা রহমতের অন্বেষণ করা হয়ে থাকে। তিনি ইয়াতিমদের আশ্রয়স্থল এবং স্বামী হারাদের রক্ষক।'[1]

বাহীরা রাহেব (بَحِيرَى الراهب) :

কথিত আছে যে, (এ বর্ণনা সূত্র কিছুটা সন্দেহ যুক্ত) নবী ﷺ-এর বয়স যখন বার বছর (ভিন্ন এক বর্ণনায় বার বছর দু'মাস দশদিন)[2] সেই সময়ে ব্যবসা উপলক্ষে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে তিনি শাম দেশে (সিরিয়া) গমন করেন এবং সফরের এক পর্যায়ে বসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। বসরা ছিল শাম রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত একটি স্থান এবং হুরানের কেন্দ্রীয় শহর। সে সময় তা আরব উপদ্বীপের রোমীয়গণের আয়ত্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এ শহরে জারজিস নামক একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক (রাহেব) বসবাস করতেন। তাঁর উপাধি ছিল বাহীরা এবং এ উপাধিতেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন বসরায় শিবির স্থাপন করেন তখন রাহেব গীর্জা থেকে বেরিয়ে তাঁদের নিকট আগমন করেন এবং আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন। অথচ এর আগে কখনও তিনি এভাবে গীর্জা থেকে বেরিয়ে কোন বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। তিনি কিশোর নবী ﷺ-এর অবয়ব, আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারি আখেরী নবী ﷺ। তারপর কিশোর নবী ﷺ-এর হাত ধরে তিনি বলেন যে, 'ইনি হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ব জাহানের রহমত রূপী রাসূল মনোনীত করবেন।'

আবু তালিব বললেন, 'আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে, তিনিই হবে আখেরী নবী?'

বাহীরা বললেন, 'গিরি পথের ঐ প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হয়ে আসছিল আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোন বৃক্ষ কিংবা প্রস্তরখণ্ড ছিল না যা তাঁকে সিজদা করে নি। এ সকল জিনিস নবী-রাসূল ছাড়া সৃষ্টিরাজির ক্ষেত্রে অন্য কাউকেও কখনো সিজদা করে না। অধিকন্তু, 'মোহরে নবুওয়াত' দেখেও আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। তাঁর কাঁধের নীচে কড়ি হাড্ডির পাশে সেব ফলের আকৃতি বিশিষ্ট একটি দাগ রয়েছে, সেটাই হচ্ছে 'মোহরে নবুওয়াত'। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সূত্রে আমরা এ সব কিছু অবগত হতে পেরেছি।'

---

[1] শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১৫ ও ৬ পৃষ্ঠা।

[2] একথা ইবনে জওযী তালকিহুল ফোহুম ৭ পৃঃ।

এরপর বাহীরা আবু তালিবকে বললেন, 'এঁকে সঙ্গে নিয়ে আর বিদেশ ভ্রমণ করবেন না। শীঘ্রই এঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কারণ, এঁর পরিচয় অবগত হলে ইহুদীগণ এঁকে হত্যা করে ফেলতে পারে।

এ কথা জানার পর আবু তালিব তাঁকে মক্কা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।[1]

ফুজ্জার যুদ্ধ (حرب الفجار) ঃ

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বয়স যখন পনের বছর তখন 'ফুজ্জার যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাঁদের মিত্র বনু কেনানা। বিপক্ষে ছিলেন কায়েস আয়লান। কুরাইশ-কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ, প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কেনানা গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন (প্রথম দিকে কেনানাদের উপর কায়েসদের সমর্থন ছিল বেশী, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কেনানাদেরই সমর্থন হয়ে যায় বেশী)। একে ফুজ্জার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিশোর বালক অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষায় কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[2] ।

হিলফুল ফুযুল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা (حلف الفضول) :

ফুজ্জার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতার সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীগণকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু ইয়াতীম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়াত্তা করা যায় না। ভবিষ্যতে আরববাসীগণকে যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সে জন্য আরবের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আবদুল্লাহ বিন জুদয়ান তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আবদুল্লাহ বিন জুদয়ান ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধণাঢ্য ব্যক্তি। অধিকন্তু, সততা, দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আবরবাসীগণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর বাড়িতেই অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সকল গোত্র আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে বনু হাশেম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন অব্দুল উয্যা, বনু যোহরা বিন কেলাব এব বনু তামীম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তখনকার সময়ে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে তা সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই, এ ধরণের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন:

(ক) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(খ) বিদেশী লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(গ) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

(ঘ) অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

---

[1] মোখতাসারুস সীরাহ ১৬ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৮০-১৮৩ পৃঃ। তিরমিযী ও অন্যান্য বর্ণনায় উলেখ রয়েছে যে বেলাল (রাঃ)-এর সাথে তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তা চিল ভূল। কেন না তখনো বেলালের জন্ম হয়নি। আর জন্ম হয়ে থাকলে আবু তালিব আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন না। যাদুল মায়াদ ১/১৭।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, কালবে জাযীরাতুল আরব ৩২০ পৃঃ এবং তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ।

নবী করিম ﷺ এবং তাঁর চাচা যোবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব এ আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যুবক নবী ﷺ-ই ছিলেন সে কল্যাণমুখী চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবক এবং চাচা যোবায়ের ছিলেন প্রথম সমর্থক। তাঁদের উভয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ক্রমান্বয়ে সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন জুদয়ানের গৃহে বিভিন্ন গোত্রপতিগণের উপস্থিতির সম্মতি সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামা সম্পাদিত হয় এবং তার ভিত্তিতে একটি সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুযুল' বা 'হলফ-উল ফুযুল'।

এ অঙ্গীকারনামার ফলে আরববাসীগণের চিন্তা চেতনায় একটা ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে এবং প্রথমাবস্থায় খুব ভালভাবে কাজকর্ম চলতে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পর কুরাইশগণের মধ্যে কিছুটা বিরূপভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত এর কাযকারিতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। অবশ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অঙ্গীকার নামার কথা কখনই বিস্মৃতি হন নি। বদর যুদ্ধে বন্দীগণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় তিনি এ প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছিলেন। একদা এ প্রসঙ্গের উল্লেখ কালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে, 'হে, ফুযুল অঙ্গীকারনামার ব্যক্তিবৃন্দ! আমি নিশ্চয়ই তার সে আহ্বানে সাড়া দিব। কারণ, ইসলাম তো এসেছে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতাকে সাহায্য করতে।'

অধিকন্তু, এ ব্যাপারে অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আবদুল্লাহ বিন জুদয়ানের বাসভবনে আমি এমন এক অঙ্গীকার নামায় শরীক ছিলাম যার বিনিময়ে আমি আসন্ন প্রসবা উটও পছন্দ করি না এবং যদি ইসলামের যুগে এরূপ অঙ্গীকারের জন্য আমাকে আহ্বান জানানো হয় তাহলেও 'আমি উপস্থিত আছি কিংবা প্রস্তুত আছি' বলতাম।[১]

'হলফ-উল-ফুযুল' প্রতিষ্ঠার অন্য একটি প্রাসঙ্গিক প্রত্যক্ষ পটভূমির কথাও জানা যায় এবং তা হচ্ছে, যোবায়েদ নামক একজন লোক মক্কায় এসেছিলেন কিছু মালপত্র নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। আস বিন ওয়ায়েল তাঁর নিকট থেকে মালপত্র ক্রয় করেন কিন্তু তাঁর প্রাপ্য তাঁকে না দিয়ে তা আটক রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্যের জন্য তিনি আব্দুদ্দার, মাখযুম, জামহ, সাহাম এবং আদী এ সকল গোত্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু আদী এ সকল গোত্রের নিকট সাহয্যের আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনের প্রতি কেউই কর্ণপাত না করায় তিনি জাবালে আবু কুরাইশ পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন যার মধ্যে তাঁর নিজের অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত ছিল। আবৃত্তি শ্রবণ করে জোবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব দৌড়ে গিয়ে বলেন, 'এ লোকটি অসহায় এবং সহায় সম্বল হীন কেন? তাঁরই অর্থাৎ জোবায়েরের প্রচেষ্টায় উপরোক্ত গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরে আস বিন ওয়ায়েলের নিকট থেকে জোবায়েরের পাওনা আদায় করে দেয়া হয়।'[২]

দুঃখময় জীবন যাপন (حياة الكدح) :

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কোন কাজ-কর্মের কথা পাওয়া যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, বনু সা'দ গোত্রে দুধমা'র গৃহে থাকাবস্থায় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ছাগল চরানোর উদ্দ্যেশে মাঠে গমন করতেন।[৩] মক্কাতেও কয়েক কীরাত অর্থের বিনিময়ে তিনি ছাগল চরাতেন।[৪]

অধিকন্তু, কৈশোর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি সিরিয়া গমন করেছিলেন। তারপর যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে গমন করেন। ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বিনতে খোওয়ায়লেদ এক সম্ভ্রান্ত সম্পদশালী ও ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ

---

[১] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৩৩ ও ১৩৫ পৃঃ, মোখতাসারুস সীরাহ ৩০-৩১ পৃঃ।

[২] মোখতাসারুস সীরাহ ৩০-৩১ পৃঃ।

[৩] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ।

[৪] সহীহ বুখারী, আল এজারত্ব বাবু রাইল গানামে আলা কাবারিতা ১ম খণ্ড ৩০১ পৃঃ।

অর্থের বিনিময়ে তিনি ব্যবসায়ীগণের নিকট অর্থলগ্নী করতেন। পুরো কুরাইশ গোত্রই জীবন জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। যখন বিবি খাদীজা রাসূলুল্লাহ -এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং এবং আমানত হেফাজতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি মুহাম্মদ -এর নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করতে পারেন। তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে লভ্যাংশ বা মুনাফা প্রদান করা হয় তাঁকে তার চাইতে অধিকমাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। মুহাম্মাদ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।[১]

খাদীজা -এর সঙ্গে বিবাহ (زواجه بخديجة) :

সিরিয়া থেকে যুবক নবী -এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হল। হিসাব নিকাশ করে আমানত সহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কোন দিনই তা পাননি। এতে খাদীজা -এর অন্তর তৃপ্তির আমোজে ভরে ওঠে। অধিকন্তু, তাঁর দাস মায়াসারার কথাবার্তা থেকে মুহাম্মদ মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং তাঁকে পতি হিসেবে পাওয়ার একটা গোপন বাসনা ক্রমেই তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এর পূর্বে বড় বড় সরদার, নেতা ও প্রধানগণ অনেকেই তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু তিনি কোনটিই মঞ্জুর করেন নি। অথচ মুহাম্মদ -কে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য তিনি যার পরনাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি নিজ অন্তরের গোপন বাসনা ও ব্যাকুলতার কথা তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ এর নিকট ব্যক্ত করলেন এবং বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মদ -এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। নাফীসা বিবি খাদীজা -এর প্রস্তাব সম্পর্কে নবী করীম -এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। নবী করীম এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিষয়টি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবু তালিব এ ব্যাপারে খাদীজা -এর পিতৃব্যের সঙ্গে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক শুভক্ষণে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুইটি প্রাণ বিশ্বমানবের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধদ হয়ে যান। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

নবী করীম এবং বিবি খাদীজা -এর মধ্যে শুভ বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেস থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'মাস পর। তিনি সহধর্মীনী খাদীজাকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। ঐ সময় খাদীজা -এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং নবী কারীম -এর প্রথমা সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই।[২]

রাসূলুল্লাহ -এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদীজা -এর গর্ভজাত সন্তান। নবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই উপনাম হয় 'আবুল কাসেম'। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যয়নব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা ও আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহর উপাধি ছিল 'তাইয়েব' এবং 'তাহের'।

নবী কারীম -এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাতেমা ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। ফাতেমা -এর মৃত্যু হয়েছিল নবী কারীম -এর ছয় মাস পর।[৩]

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৮৭-১৮৮ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৮৯-১৯০ পৃঃ। ফেকহুস সীরাহ ৫৯ পৃঃ ও তালকিহুস ফোহুম ৭ পৃঃ।

[3] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৯০-১৯১ পৃঃ, ফেকহুস সীরাহ ৬০ পৃঃ। ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ১৫০ পৃঃ। তারীখের বই সমূহে কিছু মতভেদের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তবে আমার নিকট যা অধিক গ্রহণযোগ্য তা এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণ এবং হজরে আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা (بناء الكعبة وقضية التحكيم) :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন তখন কুরাইশগণ কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ, কা'বা গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসামাঈল (عليه السلام)-এর আমল হতেই এ ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়াল গুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মূহুর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সেউ বছরেই মক্কা পাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে কা'বামুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ায় কা'বাগৃহের দেওয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে কোন মুহূর্তে তা ধ্বসে পড়ার আশঙ্খা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন কা'বা গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

• কা'বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। সেগুলো হচ্ছে যথাঃ ক্রমে কা'বা গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ-সম্পদ (হালাল) ব্যবহার করা হবে। এতে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা চলবে না। এ সকল নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল।

নতুন ইমারত তৈরির জন্য পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলার কাজে হাত দিতে কারো সাহস হচ্ছে না, অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেন এবং অন্যেরা ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পরও যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁর উপর কোন বিপদ আপদ আসছে না তখন সকলেই ভাঙ্গার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। যখন ইবরাহিম (عليه السلام)-এর ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন নির্মাণ কাজ শুরু হল। প্রত্যেক গোত্র যাতে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করা তজ্জন্য কোন গোত্র কোন অংশ নির্মাণ করবেন পূর্বাহ্নেই তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তর সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বাকুম নামক একজন রুমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল। নিমার্ণ কাজ শুরু হল। কৃষ্ণ প্রস্তরের স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছিল তখন নতুনভাবে এক সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যাটি হল কৃষ্ণ প্রস্তরটি স্থাপন করার মহা গৌরব অর্জন করবেন তা নিয়ে।

সকলেই তিনি বা তাঁর গোত্র কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন করার দাবীতে অনড়। সকলেরই এক কথা, এ কাজটি তাঁরাই করবেন। কেউই সামান্য ছাড় দিতেও তৈরি নন। সকলেরই একই কথা, একই জেদ। জেদ ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হল রেষারেষিতে। রেষারেষির পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে রক্তারক্তি। এ ব্যাপারে রক্তারক্তি করতেও তাঁরা পিছপা হবেন না। সকল গোত্রের মধ্যেই চলছে সাজ সাজ রব। শুরু হয়েছে অস্ত্রের মহড়া। একটু নরমপন্থীগণ সকলেই আতঙ্কিত কখন যে, যুদ্ধ বেধে যায় কে তা জানে।

এমনভাবে বিভীষিকাময় এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ষীয়ান নেতা আবু উমাইয়া মাখযুমী এ সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেলেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করলেন যে, আগমী কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তাঁর উপরেই এ বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা! দেখা গেল সকল আরববাসীর প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আলআমনই সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। নবী কারীম ﷺ-এর এভাবে আসতে দেখে সকলেই চিৎকার করে বলে উঠল :

هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد،

আমাদের বিশ্বাসী, আমরা সকলেই এঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিই মুহাম্মদ ﷺ।

তারপর নবী কারীম ﷺ যখন তাঁদের নিকটবর্তী হলেন তখন ব্যাপারটি সবিস্তারে তাঁর নিকট পেশ করা হল। তখন তিনি এক খানা চাদর চাইলেন। তাঁকে চাদর দেয়া হলে তিনি মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণ প্রস্তরটি তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপতিগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আপনারা সকলে একসঙ্গে মিলে চাদরটি ধরুন এবং কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাস্থানে তা রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিলেন। অত্যন্ত সহজ, সুশৃঙ্খল এবং সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এ দিকে কুরাইশগণের নিকট বৈধ অর্থের ঘাটতি দেখা দিল। এ জন্যই উত্তর দিক হতে কা'বা গৃহের দৈর্ঘ আনুমানিক ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেয়া হল। এ অংশটুকুই 'হিজর' 'হাতীম' নামে প্রসিদ্ধ। এবার কুরাইশগণ কা'বার দরজা ভূমি হতে বিশেষভাবে উঁচু করে দিলেন যেন এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে যাকে তাঁরা অনুমতি দেবেন। যখন দেয়ালগুলো পনের হাত উঁচু হল তখন গৃহের অভ্যন্তর ভাগে ছয়টি পিলার বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হল এবং তার উপর ছাদ দেয়া হল। কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে একটি চতুর্ভূজের রূপ ধারণ করল। বর্তমানে কা'বা গৃহের উচ্চতা হচ্ছে পনের মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর বিশিষ্ট দেয়াল এবং তার সামনের দেয়াল অর্থাঃ দক্ষিন ও উত্তর দিকের দেয়াল হচ্ছে দশ দশ মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর মাতাফের জায়গা হতে দেড় মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দরজা বিশিষ্ট দেয়াল এবং এর সাথে সামনের দেয়াল অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দেয়াল বার মিটার করে। দরজা রয়েছে মেঝে থেকে দু'মিটার উঁচুতে। দেয়ালের পাশেই চতুর্দিকে নীচু জায়গা এক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চেয়ার সমতুল্য অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ ত্রিশ সেন্টিমিটার। একে শাজে বওয়া (চলন্ত দুর্লভ) বলা হয়। এটাও হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বায়তুলার অংশ। কিন্তু কুরাইশগন এটাও ছেড়ে দিলেছিলেন।[১]

পয়গম্বরীর পূর্বের সংক্ষিপ্ত চরিত্র (السيرة الإجمالية قبل النبوة) :

বিভিন্ন মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে যে সকল সদগুণাবলির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে সবগুলোর চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অস্তিত্বের সবটুকু জুড়ে। তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনার যথার্থতা, পারদর্শিতা এবং ন্যায় পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করা হয়েছিল সুষমামণ্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা। তিনি দীর্ঘ সময় যাবৎ নীরবতা অবলম্বনের মাধ্যমে নিরবিছিন্ন ধ্যান ও অনুসন্ধান কাজ রত থাকতে এবং বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের উদঘাটন করতে সক্ষম হতেন। তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিবেচনা এবং নির্ভূল নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা মানব সমাজের প্রকৃত অবস্থা, দল বা গোত্র সমূহের গতিবিধি ও মন-মানসিকতা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতেন। যার ফলে শত অন্যায়, অশ্লীলতা এবং অনাচার পরিবেষ্টিত সমাজে বসবাস করেও তিনি ছিলেন সবকিছুর উর্ধ্বে, সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র। শরাবপায়ীদের সাথে বসবাস করেও কোনদিন তিনি শরাপ স্পর্শ করেন নি, দেবদেবীর আস্তানায় যবেহকৃত পশুর মাংস তিনি কখনো খাননি এবং মূর্তির নামে অনুষ্ঠি কোন প্রকার খেলাদূরায় তিনি কখনো অংশ গ্রহণ করেননি। তিনি মানুষের সর্বপ্রকার সদাচার এবং সৎকর্মে অংশগ্রহণ করতেন, অন্যথায় স্বনির্বাচিত নির্জনতার দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন।

জীবনের প্রথমস্তর থেকেই তিনি তৎকালীন সমাজ প্রচলিত যাবতীয়# মিথ্যা উপাস্যকে ঘৃণা করতেন এবং সে ঘৃণার মাত্রা এতই অধিক ছিল যে, তাঁর দৃষ্টিতে আর অন্য কোন জিনিস এত নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ছিল না। এমনকি লাত ও ওয্যার নামে শপথ করার ব্যাপারটি তাঁর কানে গেলে তিনি তা সহ্য করতেই পারনেতন না।[2]

---

[1] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৯২-১৯৭ পৃঃ ফেকহুস সীরাহ ৬২ পৃঃ সহীহ বোখারী মক্কার ফযীলত অধ্যায় ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ, তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ৬৪-৬৫ পৃঃ।

[2] বোহায্যার ঘটনায় এবং মুদ্রণে বিদ্যমান আছে। দ্রষ্টব্য ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ যে আলাহর খাস রহমত, হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে লালিত পালিত পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, যখনই পার্থিব কোন ফায়দা লাভের দিকে প্রবৃত্তি আকৃষ্ট বা আকর্ষিত হয়েছে অথবা অপছন্দনীয় কিংবা অনুসরণীয় রীতিনীতি অনুসরণের প্রতি আখলাক আকৃষ্ট হয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইবনে আসীরের একটি বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা যে সকল কাজ করেচে দুইবার ছাড়া আর কখনো তা আমার স্মরণ হয় নাই। কিন্তু সেই দু'বারের বেলায় আল্লাহ তা'আলা আমার এবং সেই কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর পর কখনো সে ব্যাপার সম্পর্কে আমাকে কোন ধারণা জন্মে নি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমাকে পয়গম্বরীর মর্যাদা প্রদান করেছেন।

এ ঘটনা ছিল যে বালকের সঙ্গে আমি মক্কার উপরিভাগে ছাগল চরাতাম এক রাত্রে তাকে বললাম, 'তুমি আমার ছাগলগুলো একটু দেখাশোনা করো, আমি মক্কায় যাই এবং সেখানে অন্যান্য যুবকগণের মতো যৌবন সংশিষ্ট আবৃত্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করি।'

সে বলল, 'ঠিক আছে। এর পর আমি বাহির হলাম এবং তখনো মক্কার প্রথম ঘরের নিককেই ছিলাম এমন সময় কিছু বাদ্য যন্ত্রের শব্দ এসে কানে পৌঁছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় থেকে বাদ্যযন্ত্রের এ শব্দ ভেসে আসছে?'

লোকেরা বলল, 'অমুকের বিবাহ হচ্ছে, তারই বাজনা বাজছে"। আমি সেই যন্ত্র সঙ্গীত শ্রবণের জন্য সেখানে বসে পড়লাম। অমনি আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণ আমার শ্রবণ শক্তির উপর আরোপিত হল। তিনি আমার কর্ণের কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং আমি সেখানে শুয়ে পড়লাম। তারপর সূর্যের তাপে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পর আমি আমার সে বন্ধুর নিকট চলে গেলাম এবং তার জিজ্ঞাসার জবাবে ঘটনাটি তার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। এর পর আবার এক রাত্রি আমার বন্ধুর নিকট বসেছিলাম এবং মক্কায় পৌঁছে তদ্রুপ ঘটনার সম্মুখীন হলাম। তদন্তর আর কখনো অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি নাই।[১]

সহীহ বোখারী শরীফে জাবের বিন আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কা'বা গৃহের নিমার্ণ কাজ চলছিল তখন নবী কারীম আব্বাস প্রস্তর বহর করে আনছিলেন। আব্বাস রাসূলুল্লাহ -কে বললেন, 'স্বীয় লুঙ্গি আপন কাঁধে রাখ তাহলে প্রস্তর বহন জানিত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি"। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লুঙ্গি বেঁধে দেয়া হল। অন্য বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, এর পর তার লজ্জাস্থান আর কোন দিনই দেখা যায় নি।[২]

নবী কারীম -এর কাজকর্ম ছিল সব চাইতে আকর্ষণীয়, চরিত্র ছিল সর্বোত্তম এবং মহানুভবতা ছিল সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। তিনি ছিলেন সর্বাধিক শিষ্টাচারী, নম্র-ভদ্র, সদালাপী ও সদাচারী। তিনি ছিলেন সব চাইতে দয়াদ্র চিত্ত, দূরদর্শী সূক্ষ্মদর্শী ও সত্যবাদী। মিথ্যা কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয় ছিলেন যে আরববাসীগণ সকলেই তাঁকে 'আল-আমীন' বলে আহ্বান জানাতেন।

রাসূলুল্লাহ ছিলেন আরববাসীগণের মধ্যে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। খাদীজা সাক্ষ্য দিতেন যে, 'তিনি অভাবগ্রস্থদের বোঝা বহন করতেন, নিঃস্ব ও অসহায়দের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। ন্যায্য দাবীদারদের তিনি সহায়তা করতেন এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য মশহুর ছিলেন।[৩]

---

1 G হাদীসটি হাকেম ও যাহাবী বিশুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর আল বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে ২য় খণ্ড ২৮৭ পৃঃ একে দুর্বল বলেছেন।

2 সহীহ বোখারী কা'বা নির্মাণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪০ পৃঃ।

3 সহীহ বোখারী ১ম খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা।

حياة النبــوة و الرســالة والدعــوة
নবুওতী জীবন, রিসালাত ও দা'ওয়াত

পয়গম্বরী যুগ পবিত্র জীবনের মক্কাবস্থানকাল : দাওয়াতের সময়কাল ও স্তর (النبوة والدعوة – العهد المكـــي) ঃ

আলোচনা ও অনুধাবনের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পয়গম্বরী জীবন কালকে আমরা দুইটি অংশে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কাজকর্মের ধারা প্রক্রিয়া এবং সাফল্য। সাফল্যের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এর এক অংশ থেকে ছিল ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। অংশ দুটি হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১. মক্কায় অবস্থান কাল প্রায় তের বছর।

২. মদীনায় অবস্থান কাল দশ বছর।

তারপর মক্কী ও মাদীনী উভয় জীবনকাল বৈশিষ্ট্য ও কর্ম প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ছিল স্তর ক্রমিক এবং ভিন্নধর্মী। তাঁর পয়গম্বরী জীবনের উভয় পর্যালোচনা এবং পরীক্ষণ করলে অনুক্রমিক স্তরগুলো সমীক্ষা করে দেখা বহুলাংশে সহজতর হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কাবস্থান কাল এবং কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি আনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

১. সর্ব সাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের স্তর (৩য় বছর)।

২. মক্কাবাসীগণের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর (৪র্থ বছর থেকে ১০ম বছরের শেষ নাগাত)।

৩. মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ ও বিস্তৃতির স্তর (১০ম নাবুওয়াতী বর্ষের শেষ ভাগ হতে হিজরত পর্যন্ত)।

মদীনা জীবন এবং মদীনায় অবস্থান কালের স্তর অনুযায়ী বিস্তৃত আলোচনা যথক্রমে সন্নিবেশিত হবে।

পয়গম্বরীত্বের প্রচ্ছায়ায় (في ظلال النبوة والرسالة) :

হেরা গুহার অভ্যন্তরে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চলিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বত গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের একটি গুহা। এর দৈর্ঘ হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশের একত্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরেহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।

তিনি যখন সেখানে গমন করতেন তখন খাদীজাও তাঁর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে যেতেন এবং সন্নিকটস্থ কোন স্থানে অবস্থান করতেন। পুরো রমাযান শরীফ তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুঃস্থ ও অসহায় পথচারীদের খাবার খাওয়াতেনে এবং অবশিষ্ট সময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকনেন। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহুর্তে সকল কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সমগ্র বিশ্বময় সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের এক শাশ্বত ব্যবস্থা বজায় রেখে চলেছেন, সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান সত্ত্বার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। স্বগোত্রীয় লোকদের অর্থহীন বহুত্ববাদী বিশ্বাসও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁর অন্তরে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোন পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হন।[১]

---

[১] আলামা সোলায়মান মানসুরপুরী, রাহমাতুলিল 'আলামীন ১ম খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ২৩৫ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা। ফী যিলালিল কুরআন: ২৯/১৬৬ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্জন প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

এভাবে আল্লাহ তা'আলার ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। যে আত্মার নসীবে নবুয়তরূপী এক মহান আসমানী নেয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিকপত নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মদ (ﷺ)-কে বিশ্বব্যবস্থায় সব চাইতে মর্যাদশীল ও দায়িত্বশীল-আম্যনতদার মনোনীত করে তাঁর কাঁধে দায়িত্বভার অর্পনের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জীবন বিধানের রূপরেখা পরিবর্তন এবং অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে শাশ্বত আদর্শের আঙ্কিকে ইতিহাসের পরিমার্জিত ধারা প্রবর্তন চাইলেন, তখন নবুয়ত প্রদানের প্রাককালে তাঁর জন্য একমাস ব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন যাতে তিনি গভীর ধ্যানের সূত্র ধরে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুকায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন।[১]

জিবরাঈল (ﷺ)-এর আগমন (في غار حراء) :

নবী কারীম (ﷺ)-এর বয়সের ৪০তম বছর যখন পূর্ণ হল- এটাই হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির বয়স এবং বলা হয়েছে যে, এ বয়স হচ্ছে পয়গম্বরগণের নবুয়ত প্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স-তখন নবুওয়তের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন তা প্রতীয়মান হতো সুবহে সাদেকের মত। এমনভাবে এক অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ছয়টি মাস যা ছিল নবুওয়তের সময় সীমার ছয়চলিশতম অংশ এবং নবুওয়তের সময়সীমা ছিল তেইশ বছর। এরপর তিনি যখন হেরাগুহায় নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকল তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করলেন। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিবরাঈল (ﷺ)-এর মাধ্যমে তাঁর কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াত করীমা নাযিল করে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নবুওয়তের মহান মর্যাদা প্রদানে ভূষিত করেন।[২]

বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণাদি গভীরভাবে অনুধাবন করলেই জিবরাঈল (ﷺ) আগমনের প্রকৃত দিন তারিখ ও সময় অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আমাদের সন্ধানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রমাযান মাসে ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে। খ্রীষ্টিয় হিসাব অনুযায়ী দিনটি ছিল ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। চন্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী নবী কারীম (ﷺ)-এর বয়স ছিল চলিশ বছর ছয় মাস বার দিন এব সৌর হিসাব অনুযায়ী ছিল ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।[৩]

---

[1] ফী যিলালিল কুরআনঃ পারা ২৯, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭।

[2] হাফেয ইবনে হাজার বলেন যে, বায়হাকী এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, স্বপ্ন সময় ছয় মাস ছিল। অতএব স্বপ্নের মাধ্যমে নবুওয়তের শুরু চলিশ বছর পূর্ণ হবার পরে রবিউল আওয়াল মাসেই হয়েছিল। যা তাঁর জন্ম মাস ছিল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তাঁর নিকট রমাযান মাসে ওহী আসা আরম্ভ হয়েছিল। ফতহুলবারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা।

[3] **ওহী নাযিল শুরুর মাস দিন এবং তারিখ ঃ** নবী কারীম (ﷺ)-এর ওহী প্রাপ্তি এবং নবুওয়ত লাভের মহান মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার মাস ও দিন তারিখ সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অধিক সংখ্যক চরিতাকরগণ এ ব্যাপারে অভিণ্ন মত পোষণ করে থাকেন যে মাসটি ছিল রবিউল আওয়াল। কিন্তু অন্য এক দল বলেন যে, মাসটি ছিল রমাযানুল মুবারক। কেউ কেউ আবার এ কথাও বলে থাকেন যে মাসটি ছির রজব। (দ্রষ্টব্য- শাইখ আবদুল্লাহ রচিত মোখতাসারুস 'সীরাহ' পৃষ্ঠা ৭৫) দ্বিতীয় দলের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে আমাদের মনে হয়, অর্থাৎ যাঁরা বলেন যে, এটা রমাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল তাঁদের মত কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আসুন, এখন আমরা উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেই। এটা নৈসর্গিক নূর বা আসমানী দীপ্তির মতো এমন এক আলোক রশ্নি ছিল যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হতে থাকে, জীবনের গতিধারা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হতে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি যখন যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাত রশ্মির মতো প্রকাশিত হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হতে থাকলেন। নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকার সুবিধার্থে তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে রাতের পর রাত তিনি এবাদত বন্দেগী এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এ জন্য খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে সব ফুরিয়ে গেলে পুনরায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।

কিন্তু গৃহে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। হেরা গুহায় নির্জনতার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠত তাই পূর্বের মতো খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে পুণরায় তিনি হেরাগুহায় গিয়ে ধ্যান মগ্ন হতেন। ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তিনি হেরাগুহার নির্জনতায় অবস্থান করতে থাকেন।

এমনভাবে একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন আল্লাহর দূত জিবরাঈল (عليه السلام) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, 'তুমি পড়"। তিনি বললেন, 'পড়ার অভ্যাস আমার নেই।' তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়"। তিনি আবারও বললেন, 'আমার পড়ার অভ্যাস নেই"। তারপর তৃতীয় দফায় আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়-

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق: ١ : ٣]

অর্থঃ সেই প্রভূর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিণ্ড থেকে। পড় সেই প্রভূর নামে যিনি তোমাদের জন্য অধিকতর দয়ালু।"[1]

তারপর ওহীর আয়াহগুলো অন্তরে ধারণ করে নবী কারীম ﷺ কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদীজা বিনতে খোওয়ালদেদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।' খাদীজা (রাঃ) তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত কললেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرة : ١٨٥) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر : ١)

দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে নবী কারীম ﷺ রমাযান মাসেই হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং এটাও জানা যায় যে, জিবরাঈল (عليه السلام) সেখানে আগমন করতেন, অধিকান্ত যাঁরা রমাযান মাসে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন কোন তারীখে তা অবতীর্ণ হয়েছিল সে ব্যাপারেও বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন রমাযান মাসের ৭ তারীখে, কেউ বলেছেন ১৭ তারীখে, কেউ বা আবার বলেছেন ১৮ তারীখে তা অবতীর্ণ হয়েছিল (দ্রষ্টব্য- মোখতাসারুস সীরাহ ৭৫ পৃঃ, রাহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ) আলামা খুযরী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, তারীখটি ছিল ১৭ই রমাযান (দৃষ্টব্য- তারীখেই খুযরী ১ম খণ্ড ৬৯ পৃঃ এবং তারীকুত্তাশরীউল ইসলামী ৫-৭ পৃঃ)।
আমার মতে ২১শে রমাযান এ জন্য গ্রহণযোগ্য যে, যদিও এটার স্বপক্ষে কেউ নাই, তবুও অধিক সংখ্যক চরিতকার এ ব্যাপারে এক মত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির দিনটি ছিল সোমবার। এ সমর্থন পাওয়া যায় আবু কাতাদার সেই বর্ণনা থেকে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, 'এ হচ্ছে সেই দিন যেদিন আমি ভূমিষ্ট হয়েছিলাম এবং আমার নিকট ওহী নাযিল করে আমাকে নবুওয়ত প্রদান করা হয়েছিল।"(সহীহ মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ৩৬৮ পৃঃ, মুসনদে আহমদ ২৯৭ পৃঃ, বায়হাকী ৪র্থ খণ্ড ২৮৬ ও ৩০০ পৃঃ, হাকেম ২য় খণ্ড ২৬৬ পৃঃ)। সেই রমাযান মাসে সোমবার হয়েছিল ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তারীখগুলোতে। এ দিকে সহীহ হাদীস সূত্রে এটা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, পবিত্র কদর রাত্রি রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে বিজোড় রাত্রিগুলোকেই ধরা হয়ে থাকে। এখন আমরা এক দিকে কুরআন কারীম থেকে অবগত হচ্ছি যে, আলাহ পাক বলেছেন, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر : ١) তাছাড়া, আবু কাতাদার বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার দিবস নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তৃতীয় সূত্রে পঞ্জিকার হিসেবে জানা যায় যে, ঐ বছর রমাযান মাসে কোন কোন তারীখ সোমবার ছিল। অতএব নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে, নবী কারীম ﷺ নবুওয়তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ২১শে রমাযানের রাত্রিতে। সুতরাং এটা ছিল ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম তারীখ।

[1] عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কোন ভয় করবেন না, আপনি ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্থদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়তাদের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথীদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋনের দায় মোচনে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।'

এরপর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে স্বীয় চাচাত ভাই অরকা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্যার নিটক নিয়ে গেলেন। জাহেলিয়াত আমলে অরকা খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং ইবরাণী ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। এক সময় তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লেখতেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, 'ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তিনি কি যেন সব কথাবার্তা বলছেন এবং অস্থির হয়ে পড়ছেন।'

অরাকা বললেন, 'ভাতিজা, বলতো তুমি কি দেখেছ? কী হয়েছে তোমার?

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হিরাগুহায় যেভাবে যা ঘটেছিল সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন অরাকার নিকট।

আনুপূর্বিখ সব কিছু শ্রবণের পর বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে অরাকা বলে উঠলেন, 'ইনিই তো সেই মানুষ যিনি মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটেও আগমন করেছিলেন।'

তারপর বলতে থাকলেন, 'হায়! হায়! যেদিন আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা আপনার উপর নানাভাবে জুলম অত্যাচার করবে এবং আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম।'

অরাকার মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একী! ওরা আমাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে?'

অরাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তারা অবশ্যই আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে।' তিনি আরও বললেন 'শুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই জনসমাজে সত্যের বার্তা বাহক কোন সাধক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার স্বাগোত্রীয় লোকেরা নানাভাবে তার উপর জুলম, নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে।' তিনি আরও বললেন, 'মনে রাখুন আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্ব প্রকারে আপনাকে সাহায্য করব।' কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওরাকা মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ দিকে ওহী আসাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।'[1]

তারাবী এবং ইবনে হিশামের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, আকস্মিকভাবে ওহী নাযিল হওয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা পর্বতের গুহা হতে বেরিয়ে আসেন। পরে পুনরায় সেখানে ফেরত গিয়ে আরও কিছু সময় অবস্থান করেন। তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। হেরা গুহা থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেরিয়ে আসার কারণ সম্পর্কে তাবরীর বর্ণনায় যে আলোকপাত করা হয়েছে নিম্নে তা লিপিবদ্ধ করা হলঃ

ওহী অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন 'আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টি রাজির মধ্যে কবি এবং পাগলের চাইতে অধিক ঘৃণিত আর অন্য কিছুই ছিল না। (অধিক ঘৃণার কারণে) তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আমি সহ্য করতে পারতাম না। (এখানে যেমনি ওহী অবতীর্ণ হল) আমি বললাম (নিজে নিজেই) এ অকর্মন্য (অর্থাৎ তিনি নিজেই) কি কবি অথবা পাগলঃ যদিও কুরাইশগণ কখনো আমার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করার সাহস পাবে না, তবুও ব্যাপারটি আমাকে খুবই অস্বস্তির মধ্যে নিপতিত করল। আমি মনস্থ করলাম পর্বত চূড়ায় আরোহন করে সেখান থেকে নিজেকে নীচের দিকে গড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে ফেলব। এভাবাবেগ

---

[1] সহীহ বোখারী- ওহী নাযিলের বিবরণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ২ ও ৪৩ পৃষ্ঠা। শব্দের কিছু কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে সহীহ বোখারী কেতাবুত তাফসীর এবং তারিরুর রুইয়া পর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

জনিত অতৃপ্তি ও অস্বস্থির হাত থেকে চিরকালের জন্য নিস্তার পেয়ে যাব। এ চিন্তা করে আমি পর্বতশীর্ষে আরোহনের জন্য উপরে উঠতে থাকলাম। যখন মধ্য ভাগে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আকাশ থেকে একটি কণ্ঠ আমার শ্রুতি গোচর হল, 'ও হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল (عليه السلام) ফেরেশ্‌তা।' আমি আকাশের দিকে চোখ মেলে দেখলাম মানুষের আকৃতি ধারণ করে আকাশ প্রান্তে পা রেখে জিবরাঈল (عليه السلام) দাঁড়িয়ে রয়েছেন ও বলছেন ঃ

"হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি আল্লাহর রাসূর এবং আমি জিবরাঈল (আ) ফেরেশ্‌তা।' তখন আমি এমন এক অবস্থার মুখোমুখি হলাম যে, যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেদিকেই জিবারাঈল (عليه السلام) দৃষ্টি গোচর হতে থাকে। তখন আমি আকাশের সকল প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে, পর্বতশীর্ষ থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে নিজেকে নিঃশেষ করার চিন্তা-ভাবনা চেতনার অন্তরালে নিক্ষেপ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলাম আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচ্ছন্ন অবস্থায়, না পারলাম সামনের দিকে এগিয়ে চলতে, না পারলাম পিছনের দিকে পিছনে যেতে।'

এ দিকে দীর্ঘ সময় যাবৎ গৃহে প্রত্যাবর্তন না করার কারণে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমার তালাশে লোক প্রেরণ করেন। সে মক্কায় আমার তালাশ করে কিন্তু কোন সন্ধান না পেয়ে গৃহে ফিরে আসে। আমিও কিন্তু একই অবস্থায় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর জিবরাঈল (عليه السلام) দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।

বাড়ি ফিরে আমি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উরুর উপর ভর দিয়ে বসে পড়ি। খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আবুল কাসেম, আপনি কোথায় ছিলেন? হায় আল্লাহ! আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়ে ছিলাম। সে মক্কায় আপনার সন্ধান না পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। প্রত্যুত্তরে আমার প্রত্যক্ষকৃত ঘটনাবলীর সব কিছুই সবিস্তারে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম।

তিনি বললেন, 'হে প্রাণাধিক! আপনি আনন্দ বোধ করুন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন। যে মহামিহম সত্ত্বার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ সেই সত্ত্বার শপথ, ঘটনা-প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করছি এবং দৃঢ়ভাব বিশ্বাস করছি যে আপনাকে নবুওয়ত প্রদানের মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহর তরফ থেকে এ সকল অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। এর পর তিনি অরকা নওফলের নিকট গেলেন। তিনি তাঁর নিকট বিস্তারিতভাবে ঘটনা প্রবাহ আবৃতি করলেন। তিনি শুনে বললেন, কুদ্দুস! কুদ্দুস! ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, উনার নিকট ঐ 'মানুষ আকবর' এসেছিলেন, যিনি মুসা (عليه السلام)-এর নিকট আসতেন। উনি এ উম্মতের নবী হবেন। তাঁকে বল, ধৈর্য্যধারণ করবেন। তারপর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ফিরে এসে অরাকার কথাগুলো শোনালেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহার অবস্থান পূর্ণ করে যখন মক্কা ফেরত আসলেন তখন অরাকা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ বাচনিক বিবরণ শুনে বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, আপনি হচ্ছেন এ জাতির নবী। আপনার নিকট ঐ নামূসে আকবার এসেছেন, যিনি মূসা (عليه السلام)-এর নিকট আসতেন।'[1]

ওহী বন্ধ (فَتْرَةُ الْوَحْيِ) :

ইতোপূর্বে ওহী বন্ধ থাকার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন প্রশ্ন হচ্ছে, কত দিন যাবৎ ওহী বন্ধ ছিল সেই ব্যাপারে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কতদিন যাবৎ ওহী বন্ধ ছিল সে ব্যাপারে ইবনে সা'দ ইবনে আব্বাস হতে একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে 'মাত্র কয়েকদিনের জন্য ওহী বন্ধ

---

[1] তাবারী ২য় খণ্ড ২০৭ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৩৭-২৩৮ পৃঃ। শেষে কিছুটা অংশ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এ বর্ণনার বৈধতাকে নিয়ে আমার মনে কিছুটা দ্বিধা আছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনাভঙ্গী এবং তার বিভিন্ন বর্ণনার সমন্বয় সাধনের পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তণ এবং অবাকার সাথে সাক্ষাৎ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর সেদিনই ঘটে ছিল। অবিশষ্ট হেরাগুহার অবস্থান তিনি মক্কা হতে ফিরে গিয়ে পূর্ণ করেছিলেন।

কোন সূত্রে এ কথাটি প্রচারিত হয়ে এসেছে যে, আড়াই কিংবা তিন বছর যাবৎ ওহী অবতীর্ণ বন্ধ ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন সনদ না থাকায় এ বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে নানা প্রশ্ন ওঠে। একটু চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা করলে যে সহজ সত্যটা প্রতিভাত হয়ে ওঠে তা হচ্ছে প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় অপটু নবী ﷺ যখন ওহী লাভ করলেন, তখন তার মনোজগতে এক বিরাট বিপব সূচিত হল। তিনি কতটা যেন হকচকিয়ে উঠলেন। কিছু বিস্ময় কিছু ভয় এবং কৌতুহলের সংমিশ্রনে তিনি যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নবী ﷺ যাতে তাঁর বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী ওহী গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারেন এ উদ্দেশ্যেই সাময়িকভাবে অল্প কয়েক দিনের জন্য ওহী বন্ধ থাকার কথাটি প্রকৃত একটি যুক্তি কথা। কিন্তু আড়াই কিংবা তিন বছর যাবৎ ওহী বন্ধ থাকার কথাটি কোন যুক্তিতেই খাটে না। সেটি সত্য হলে ইসলামের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত পঠিত হতো। যেহেতু এ ক্ষেত্রে প্রমাণাদি নির্ভর আলোচনার অবকাশ খুবই কম সেহেতু তা যুক্তি নির্ভর হওয়া প্রয়োজন।[১]

ওহী বন্ধ থাকার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত বোধ করতেন। সহীহ বুখারী শরীফের তাবীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহী বন্ধ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতই বিচলিত ও বিব্রতবোধ করতেন এবং তাঁর দুশ্চিন্তা ও অশ্বস্তিবোধ এতই অধিক বৃদ্ধি পেত যে, পর্বত শিখর হতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলতেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যখনই তিনি পর্বত শীর্ষে আরোহন করেছেন তখন জিবরাঈল (عليه السلام) তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। জিবরাঈল (عليه السلام) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি আল্লাহর সত্যনবী।' এতশ্রবণে তাঁর প্রাণের অস্বস্তি ভাব স্তিমিত হয়ে আসত, মনে লাভ করতেন অনাবিল শান্তি, তারপর ফিরে আসতেন গৃহে। আবারও কোন সময় কিছু বেশীদিনের জন্য ওহী বন্ধ থাকলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতো।[২]

পুনরায় ওহীসহ জিবরাঈল (عليه السلام)-এর আগমন (جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية) :

হাফেয ইবনে হজর বলেন যে, নবী ﷺ -এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি কিছুটা ভয়-ভীতির সঙ্গে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর মানসিকতার ক্ষেত্রে কিছুটা বিহ্বলতার ভাবও পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিছুদিন ওহী নাযিল বন্ধ রাখেন, যাতে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।[৩] ঠিক তাই হলো, নবী করীম ﷺ প্রথম ওহী নাযিলের অসুবিধা থেকে মুক্ত হয়ে যখন মন মানসিকতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর বার্তা বাহক বা রাসূল মনোনীত হয়েছেন। এবং তাঁর নিকট যিনি ওহী নিয়ে আগমন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আসমানী দূত বা ওহীবাহক। এভাবে রহস্যাবৃত ব্যাপারটি যখন তাঁর নিকট পরিস্কার হয়ে গেল তখনই তিনি পরবর্তী ওহীর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। ওহী গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন, তখন জিবরাঈল (عليه السلام) পুনরায় ওহী আগমন করলেন। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে ওহী নিয়ে আগমন বন্ধের ঘটনা শ্রবণ করেন। ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

(جاورت بحراء شهرًا فلما قضيت جوارى هبطت [فلما استبطنت الوادي] فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئًا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أرشيئًا، فرفعت رأسى فرأيت شيئًا، [فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فَجُئِثْتُ منه رعبًا حتى هويت إلى الأرض] فأتيت خديجة

---

[১] সামান্য কিছু ব্যাখ্যা ১১ নং টীকাতে দ্রষ্টব্য।

[২] সহীহ বুখারী শরীফে তাবীর পর্বে প্রথম প্রথম স্বপ্নযোগে ওহী প্রকাশিত হয় অধ্যায়ে, দ্বিতীয় খণ্ড ১০৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৩] ফতহুলবারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ।

فقلت: [زملوني، زملوني]، دثروني، وصبوا على ماء باردًا)، قال: (فدثروني وصبوا على ماء باردًا، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ١: ٥])

"আমি পথ ধরে চলছিলাম এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ আমার শ্রুতিগোচর হল। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই আমি সেই ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় আগমন করেছিলেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে কুরশীতে উপবিষ্ট ছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে এল। তারপর আমার সহধর্মিণীর নিকট এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। [মুদ্দাস্‌সির (৭৪) : ১–৫] পর্যন্ত ওহী অবতীর্ণ করেন এরপর থেকে অবিরামভাবে ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে।[1]

ওহীর প্রকারভেদ (أقسام الوحى) ঃ এখানে আমরা আলোচনার মূল বিষয়াদি থেকে একটু সরে গিয়ে, অর্থাৎ রেসালাত ও নবুওয়তের বরকতময় বিষয়াদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওহীর প্রকৃতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ, এটাই হচ্ছে রেসালাতের উৎস এবং প্রচারের উপায়। ওহীর প্রকৃতি এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে আলামা ইবনে কাইয়ূম যে আলোচনা করেছেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলঃ

১. **সত্য স্বপ্ন** ঃ স্পপ্নের মাধ্যমে নবী কারীম (ﷺ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়।

২. ফেরেশ্‌তা দেখা না দিয়ে অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থান থেকেই রাসূল (ﷺ)-এর অন্তরে ওহী প্রবেশ করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (ﷺ) যেমনটি ইরশাদ করেছেন ঃ

(إن روح القدس نفث في روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته)

অর্থ ঃ 'জিবরাঈল (عليه السلام) ফেরেশ্‌তা আমার অন্তরে এ কথা নিক্ষেপ করলেন যে, কোন আত্মা সে পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত তার ভাগ্যে যতটুকু খাদ্যের বরাদ্দ রয়েছে পুরোপুরিভাবে তা পেয়ে না যাবে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে সমীহ কর এবং রুজি অন্বেষণের জন্য ভাল পথ অবলম্বন কর। রুজি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় তোমরা আল্লাহর অসন্তোষের পথ অন্বেষণে যেন উদ্বুদ্ধ না হও। কারণ, আল্লাহর নিকট যা কিছু রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ছাড়া পাওয়া দুস্কর।

৩. ফেরেশতা মানুষের আকৃতিধারণ পূর্বক নবী কারীম (ﷺ) সম্বোধন করতেন। তারপর তিনি যা কিছু বলতেন নবী কারীম (ﷺ) তা মুখস্থ করে নিতেন। এ অবস্থায় সাহাবীগণ (রা.)ও ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পেতেন।

---

[1] সহীহ বুখারী শরীফ- 'কেতাবুত তাফসীর, বাবু অর রুজযা ফাহজুর" (অশালীন কাজ পরিহার জরন) অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭৩৩ পৃঃ। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য কিছু অধিক বর্ণিত হয়েছে। নবী (ﷺ) বলেন, 'আমি হেরায় এতেক্বাফ করি। যখন আমার এতেক্বাফ সম্পূর্ণ হয় তখন আমি নীচে অবতরণ করি। সে সময় আমি বাতনে ওয়াদী অতিক্রম করি তখন আমাকে ডাক দেয়া হয়। আমি তাকাই ডানে, বামে, সামনে, পিছনে কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না। এর পর যখন উপরে দৃষ্টিপাত করি তখন এ ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পাই।"

বছর রামাযান মাসে গারে হেরায় এতেক্বাফ করেছিলেন এবং যে রমাযান মাসে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তা ছিল ৩য় রমাযান, অর্থাৎ শেষ রমাযান। তাঁর নিয়ম ছিল যখন তাঁর রমাযান এতেক্বাফ পূর্ণ হত তখন তিনি প্রথম শাওয়ালে প্রত্যূষেই মক্কা প্রত্যাবর্তণ করতেন। উপরি উলেখিত বর্ণনার সঙ্গে এ কথাটি জুড়ে দিলে...এটা দাঁড়ায় যে, ইয়া আইউহাল মোদ্দাসেসর (হে বস্তাবৃত ব্যক্তি) ওহীটি প্রথম ওহী দশ দিন পরে প্রথম শাওয়াল অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ ওহী বন্ধের পূর্ণ সময়কাল কাল ছিল ১০ দিন।

৪. ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী কারীম ﷺ-এর নিকট ঘন্টার টুন টুন ধ্বনির মতো ধ্বনি শোনা যেত। ওহী নাযিলের এটাই ছিল সব চাইতে কঠিন অবস্থা। টুন টুন ধ্বনির সংকেত প্রকাশ করতে করতে ফেরেশ্‌তা ওহী নিয়ে আগমন করতেন এবং নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ওহী নাযিলের সময় কঠিন শীতের দিনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকত। তিনি উষ্ট্রের উপর আরোহণরত অবস্থায় থাকলে উট বসে পড়ত। এক দফা এইভাবে ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উরু যায়েদ বিন সাবেত ﷺ-এর উরুর উপর ছিল। তখন তাঁর উরুতে এতই ভারবোধ হয়েছিল যে মনে হয়েছিল যেন উরু নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. নবী কারীম ﷺ ফেরেশ্‌তাকে কোন কোন সময় নিজস্ব জন্মগত আকৃতিতে প্রত্যক্ষ করতেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁর নিকট ওহী নিয়ে আগমন করতেন। নবী কারীম ﷺ-এর এ রকম অবস্থা দু'বার সংঘটিত হয়েছিল যা আল্লাহ তা'আলা সূরা 'নাজমে' উল্লেখ করেছেন।

৬. পবিত্র মে'রাজ রজণীতে রাসূলুল্লাহর ﷺ যখন আকাশের উপর অবস্থান করছিলেন সেই সময় আল্ল-াহ তা'আলা নামায এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সরাসরি হুকুমের মাধ্যমে ওহীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

৭. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নবী কারীম ﷺ-এর সরাসরি কথোপকথন যেমনটি হয়েছিল, তেমনি মূসা (عليه السلام)-এর সঙ্গে হয়েছিল। মূসা (عليه السلام)-এর সঙ্গে যে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন হয়েছিল কুরআন শরীফে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নবী কারীম ﷺ-এর কথোপকথনের ব্যাপারটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (কুরআন দ্বারা নয়)।

কোন কোন লোক পর্দা বা আবরণ ব্যতিরেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সামনা-সামনি কথোপকথনের মাধ্যমে ওহী নাযিলের অষ্টম রীতির কথা বলেছেন। কিন্তু ইসলামের আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন কালেই এ পদ্ধতিতে ওহী নাযিলের ব্যাপারে মতভেদ চলে আসছে।[1]

[1] **যাদুল** মায়াদি ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ। প্রথম এবং অষ্টম রীতির বর্ণনাতে আসল এবারতের মধ্যে অল্প কটি ছাট।

أمر القيام بالدعوة إلى الله، وموادها

আল্লাহর হুকুম প্রচারের নির্দেশ এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়

সূরায়ে মুদাসসিরের প্রথম আয়াত প্রথম থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত :

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾

[المدثر: ١: ٦]

" ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। ৬. (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশে। ৭. তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য ধর।' (আল-মুদ্দাস্সির ৭৪ : ১–৭)

আয়াতের মধ্যে নবী কারীম ﷺ-কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা আপাতঃদৃষ্টিতে বাহ্যিকভাবে খুবই সংক্ষেপ এবং সরল মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে চরম গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে অনন্ত, অসীম ও চিরঞ্জীব স্রষ্টা প্রতিপালক প্রভূর শাশ্বত উদ্দেশ্যমুখীন এক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নির্দেশনা। এ নির্দেশনার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১. ভয়-ভীতি প্রদর্শণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ পার্থিব জীবনে আল্লাহর ইচ্ছা বা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের প্রতিকূলে যারাই চলতে থাকবে তাদেরকে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করে তোলা। তাছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তার মন ও মস্তিস্কের মধ্যে যাতে হৈ চৈ এবং ওলট-পালট আরম্ভ হয়ে যায় সেটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. প্রভূ প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমান্বিত মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীর মাঝে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোই বড়ত্ব কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব স্থান না পায়। বরং অন্যান্য সকলের অর্থহীন অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

৩. পরিচ্ছদের পবিত্রতা হাসিলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। বাহ্যিক পবিত্রতা বলতে বোঝায় দৈহিক, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সব কিছুর পবিত্রতা। আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলতে বোঝায় আত্মিক পবিত্রতা। যাবতীয় অন্যায়, অনাচার অশ্লীলতা এবং কলুষতা থেকে মন মস্তিস্ক ও অন্তরকে পরিস্কার করে নিয়ে আত্মার পূর্ণ পবিত্রতা হাসিলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। অধিকন্তু, সার্বিক পরিচ্ছন্নতা হাসিলের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠির জন্য এমন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা যাতে স্বচ্ছ সরল অন্তঃকরণের লোকেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সঠিক সত্যের সন্ধান লাভ করে এবং রক্ত বক্র অন্তঃকরণের লোকদের অন্তর ভয়ে ভীত এবং কম্পিত হতে থাকে। এভাবে গোটা বিশ্ব, পক্ষে ও বিপক্ষে সকলেই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে।

৪. উপকার করে তার বিনিময় গ্রহণ না করার প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে স্বীয় পরিশ্রম প্রচেষ্টা বা কাজ কর্মের দ্বারা অন্যের উপকার করার মধ্য দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা কিংবা প্রাধান্য বিস্তার করার প্রতি যেন কোন ক্রমেই গুরুত্ব দেয়া না হয়। বরং পরোপকারের মাধ্যমে নিজেকে বৃহত্তর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া, পরোপকারকে করণীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে অব্যাহতভাবে একের পর এক কাজ করে যাওয়া এবং সর্বপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হবে পরোপকারের প্রধানত উদ্দেশ্য।

৫. শেষ আয়াতটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ আরম্ভ করার পর আপনার ও আপনার সঙ্গী সাথীদের উপর শত্রুদের পক্ষহতে বিরোধীতা, বিদ্রুপ, ঠাট্টা বিদ্রূপ ও নানা প্রকার জুলম, নির্যাতন অব্যাহতভাবে আসতে থাকবে। এমনকি আপনি এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী আপনার সঙ্গী সাথীগণকে হত্যা করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। সেই সকল

বিপদাপদের মুখে আপনাকে শিলাখণ্ডের মতো থাকতে হবে এবং চরম ধৈর্যের পরিচয় প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্বের প্রসঙ্গটি কোন ক্রমেই মনে ঠাঁই পাবে না। পার্থিব কোন লাভালাভের প্রত্যাশাও সেখানে থাকবে না। বরং শুধু প্রভূ পতিপালকের সন্তুষ্টি বিধান এবং তাঁর দ্বীনের উচ্চ মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যেই তা করতে হবে।

আল্লাহ কতই না মহান! এ সকল বিধি-বিধান বাহ্যিক দৃষ্টিতে কতই না সহজ, সরল ও সংক্ষেপ, এর শব্দ সমূহের গাঁথুনী ও ব্যঞ্জনা কতই না শান্তিপ্রদ ও আকর্ষণীয় এর অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ ও ভাষা বৈচিত্র কতই না চিত্তোদ্দীপক! এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং কর্মপ্রক্রিয়ার দিক দিয়ে এ সকল বিধি-বিধান কতই না শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত, অথচ এর বাস্তবায়ণ প্রক্রিয়া কতই না কঠিন, এর ফলাফল কতই না বিচিত্র এবং বহুমুখী। এর প্রবাহ ছড়িয়ে পড়বে গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, জড়িয়ে পড়বে নানা সংঘাত ও সমস্যায় বাতিলের সঙ্গে। অবস্থা হয়ে উঠবে শোচনীয়। শেষ পর্যন্ত বাতিল হবে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত। হকের মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে দিগ্বিদিক।

সংশিষ্ট আয়াত সমূহের দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়াদিও উল্লেখিত হয়েছে। 'এনযার' (ভয় প্রদর্শন করা) শব্দের অর্থ হচ্ছে আদম সন্তানদের কিছু কিছু কাজকর্ম আছে যার পরিণতিত খারাপ এবং সকলেই এটা অবগত আছে যে, এ পৃথিবীতে মানুষকে তাদের সকল কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হয় না। এজন্য 'এনযার' শব্দের ভিন্নতর অর্থ ও আহ্বান হচ্ছে পৃথিবীর দিনগুলো ছাড়া এমন এক ভিন্নধর্মী কর্মফল দিবসের ব্যবস্থা রয়েছে যে দিন প্রতিটি কর্মের বিনিময় যথার্থভাবে দেয়া হবে। সেই দিবসটিই হচ্ছে প্রলয়ফল জীবন যাপন করে থাকি কর্মফল দিবসের মহা সন্ধিক্ষণ থেকে জীবন যাপনের ধারা ভিন্নতর হওয়া প্রয়োজন।

অবশিষ্ট আয়াত সমূহে বান্দাদের নিকট থেকে এ দাবী ও প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছে যে, তারা নির্ভেজাল একত্ববাদের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকবে এবং জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্র ও সকল ব্যাপারে আল্লাহর নিকটে নিজেকে সমর্পণ করে দেবে এবং নিজ নিজ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত নবা হয়ে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী প্রবৃত্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবে।

আলোচ্য বিষয়টির সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে যথাক্রমেঃ

ক. আল্লাহর একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা।

খ. শেষ বিচার দিবস সম্পর্কে অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করা।

গ. আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থাবলম্বন অর্থাৎ মন্দ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন সব অপবিত্র ও অশীল কাজ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং উত্তম চরিত্র ও পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের কাজকর্ম করার ব্যাপারে সর্বদাই সচেষ্ট থাকা।

ঘ. যাবতীয় কাজাকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করা।

ঙ. তারপর এ পদ্ধতির সর্বশেষ এবং বিশেষ বিধান হচ্ছে নবী কারীম ﷺ-এর রেসালত ও নবুওয়তের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রাজ্ঞ পরিচালন, পথ প্রদর্শন ও নির্দেশনাবলীর আলোকে জীবনের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পাদন করা।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের প্রারম্ভিক সুরে মহান আল্লাহ তা'আলার এক উদাত্ত আহ্বান সুস্পষ্ট, যে আহ্বানে নবী কারীম ﷺ-কে নবুওয়তের মহা মর্যাদান্বিত কাজের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হতে এবং ঘুমের আচ্ছাদন ও গুরুত্ব বিছানা পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: ١: ٢]

"ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর।' [আল-মুদ্দাসসির (৭৪) : ১–২]

বলা হয়ে থাকে যে, যে নিজের জন্যই বাঁচতে চায় সে আরাম আয়েশ গা ভাসিয়ে চলতে পারে। কিন্তু আপনাকে এক বিরাট ও মহান দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে তখন ঘুমের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? আরাম

আয়েশের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? আপনার গরম বিছানার কি প্রয়োজন? কী প্রয়োজন আপনার সুখময় জীবন যাপনের? আপনি উঠে পড়ুন এবং ঐ মহানকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন যা আপনার ঘুম এবং আরাম আয়েশের সময় এখন অতিক্রান্ত। এখন আপনাকে অবিরাম পরিশ্রম করে যেতে হবে এবং দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আল্লাহর পথে আহ্বান এবং কালেমার দাওয়াত ও তাবলীগী নেসাবের কাজ হচ্ছে অতীব উঁচু দরের কাজ। কিন্তু এ পথে চলার ব্যাপারটি হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ভীতি জনক এবং বিপদ-সংকুল। এ কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শান্তির নীড় ঘর-বাড়ি, সুখময় পারিবারিক পরিবেশ, আরাম-আয়েশ স্নিগ্ধ শয্যা থেকে টেনে বের করে এনে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং দুঃখ কষ্টের অথৈ সাগরে নিক্ষেপ করে দিল। এনে দাঁড় করিয়ে দিল মানুষের বাহ্যিক পোষাকী আচরণ এবং শঠতাপূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দারুণ টানা-পোড়েনের মাধ্যমে।

তারপর, নবী কারীম ﷺ তাঁর অবস্থা এবং দায়িত্বকর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে গেলেন এবং বিশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ সেই জাগ্রত অবস্থার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করলেন। এ দীর্ঘ কার যাবৎ সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ বলতে তাঁর আর কিছুই রইল না। সব কিছুকেই তিনি করলেন বিসর্জন। তাঁর জীবন নিজের কিংবা পরিবার পরিজনদের জন্য আর রইল না। তাঁর জীবন রইল আল্লাহর কাজের জন্য দায়বদ্ধ। তাঁর কাজ ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানানো। বিশ্বের বুক থেকে সর্বপ্রকার অসত্য অন্যায় ও মিথ্যার মূলোৎপাটন এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে পথ-পদর্শন।

'আল্লাহর পথে আহ্বান' 'সত্যের প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি কথাগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে ততটা কঠিন কিংবা দুঃসাধ্য মনে নাও হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে কঠিন এবং কষ্টসাধ্য কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই হতে পারে না। রেসালাতের আমানত হচ্ছে বিশ্বের বুকে সব চাইতে দায়িত্বপূর্ণ এবং দুর্বহ আমানত। এ আমানত হচ্ছে এক পক্ষে বিশ্বময় মানবের চরম উৎকর্ষ ও বিকাশের আমানত এবং অন্য পক্ষে যাবতীয় বাতিল এবং গায়রুল্লাহর প্রভাব প্রতিহত করে তাকে ধ্বংস করার আমানত। কাজেই তাঁর কাঁধে যে বোঝা চাপান হয়েছিল তা ছিল সমগ্র মানবতার বোঝা। সমস্ত মতবাদের বোঝা এবং ময়দানে ময়দানে জেহাদ ও তা প্রতিহত করার বোঝা। বিশ বছরেরও অধিক কাল যাবৎ অবিরামভাবে তিনি ব্যাপক ও বহুমুখী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। সেই দীর্ঘ কাল যাবৎ, অর্থাৎ যখন তিনি আসমানী আহ্বান শ্রবণের মাধ্যমে অত্যন্ত কঠিন ও কন্টকময় দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন, তখন থেকেই তাঁকে কোন এক অবস্থা অন্য কোন অবস্থা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও গাফেল কিংবা উদাসীন রাখতে পারে নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আমাদের এবং সমগ্র মানবতার পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।[১]

পরবর্তী পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীর্ঘ এবং কঠিন ও কন্টকাকীর্ণ জেহাদের একটি চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

---

[1] ফী- যিলালিল কুরআন (সূরা মোয্যাম্মিল ওমুদ্দাসসির, পারা ২৯, পৃষ্ঠা নং ১৬৮-১৭১।

المرحلة الأولى: من جهاد الدعوة إلى الله
প্রথম ধাপ : ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ

তিন বছর গোপনে প্রচার (ثلاث سنوات من الدعوة السرية) ঃ

এটা সকলেরই একটা জানা বিষয় যে, মক্কা ছিল আরববাসীগণের ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রস্থল। এ মক্কাতেই এক দিকে যেমন ছিলেন কা'বার তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেমগণ, অন্য দিকে তেমনি আবার ছিলেন প্রতিমার তত্ত্বাবধায়কগণও যাঁদেরকে পুরো আরব দেখতেন পবিত্রতার দৃষ্টিতে। এ জন্যই দুরবর্তী স্থানের তুলনায় মক্কায় সংস্কারমুখী কর্মসূচী বাস্তাবায়ণের ব্যাপারটি ছিল অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর। তাই এখানে সংস্কারমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ণের ব্যাপারে এমনই এক সবল ও শক্তিশালী সংকল্পের প্রয়োজন ছিল কর্মপ্রবাহ বন্ধ করে দিতে না পারে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় প্রচার ও তাবলীগের কাজকর্ম সন্তর্পণে ও সেঙ্গাপনে করার প্রয়োজন ছিল যাতে মক্কাবাসীগণের সামনে আকস্মিকভাবে বৈপ্লবিক কিংবা উত্তেজনামূলক কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে না যায় এবং প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণের সঙ্গে অনুরূপ কৌশলেই প্রচার কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল।

ইসলাম কবুলকারী প্রথম দল (الرعيل الأول) :

এটা খুবই স্বাভাবিক এব সঙ্গত কথা যে যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচাইতে কাছের, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে নির্ভযোগ্য ছিলেন সর্ব প্রথম তিনি তাঁদেরই নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ঐ সকল লোককে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যাঁদের মুখমণ্ডলে কমনীয়তা এবং সত্য-প্রীতির আভাষ ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া যাঁরা নবী ﷺ-এর সততা, সত্যবাদিতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সুবিদিত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁকে এত বেশী অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, প্রথম আহ্বানেই সাড়া দিয়ে তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং প্রথম মুসলিম হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। এ দলের মধ্যে প্রথম নম্বরে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন নবী- পত্নী খাদীজাতুল কোবরা رضي الله عنها বিনতে খোওয়াইলিদ, তাঁর স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন সাবেত বিন শুরাহবীল কালবী।[1] তাঁর চাচাত ভাই আলী বিন আবু তালিব যিনি তখনো তাঁর লালন-পালনাধীন শিশু ছিলেন এবং তাঁর পরে শূরের সফর সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه। এঁরা সকলে প্রথম দিনেই মুসলিম হয়েছিলেন।[2]

তারপর আবু বকর رضي الله عنه ইসলামের প্রচার কাজে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কোমল-স্বভাব, পছন্দনীয় অভ্যাসের অধিকারী, সচ্চরিত্র এবং দরাজ দিল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, দূরদর্শিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সৎ সাহচর্যের কারণে তাঁর নিকট লোকজনের গমনাগমন প্রায় সব সময় লেগেই থাকত। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিকট আগমন ও প্রত্যাগমনকারী এবং আশপাশে বসবাসকারীগণের মধ্যে যাঁকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন তাঁর সামনেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওসমান رضي الله عنه, জোবায়ের رضي الله عنه, আব্দুর রহমান رضي الله عنه বিন আওফ, সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه এবং তালহা বিন ওবায়দুলাহ رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণ করেন। এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই হচ্ছে প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠি।

প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন বেলাল হাবশী رضي الله عنه-ও ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভূক্ত। এর পর ইসলাম কবুল করেন, আবু ওবায়দা رضي الله عنه, আমের বিন জাররাহ رضي الله عنه, আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ رضي الله عنه,

---

[1] ইনি যুদ্ধে বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হন। পরে খাদীজা رضي الله عنها তাঁর মালিক হন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দেন। এর পর তাঁর পিতা এবং চাচা তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগমন করেণ। কিন্তু তিনি বাড়ি না গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থাকাকেই বেশী পছন্দ করেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ ﷺ বলে ডাকা হত। পরে সে প্রথার ইসলাম সমাপ্তি ঘোষণা করে।

[2] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা।

আরকান বিন আবিল আরকাম (রাঃ), ওসমান বিন মায়উন (রাঃ), এবং তাঁর দু'ভাই যথাক্রমেঃ কোদমা এবং **আবদুল্লাহ,** ওবায়দা বিন হারেস বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ, সাঈদ বিন যায়েদ এবং তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ ওমরের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব, খাব্বার বিন আরাত (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আরও কয়েক জন মুসলামান হয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কুরাইশ গোত্রের সকল শাখা-প্রশাখার সঙ্গে এঁদের সকলেরই আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিল। ইবনে হিশাম এঁদের সংখ্যা বলেছেন চলিশ জনেরও বেশী (দ্রঃ ১ম খণ্ড ২৪৫-২৬২ পৃঃ)। কিন্তু তাঁদের কিছু সংখ্যক সাহাবীকে প্রথম দলে গণ্য করা চিন্তা-ভাবনার বিষয়।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, এরপর পুরুষ এবং মহিলাগন দলে দলে ইসালামে প্রবেশ করতে থাকেন। এমন কি মক্কায় ক্রমান্বয়ে ইসলামের আলোচনা বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং জনসাধারণের মধ্যেও এর চর্চা শুরু হয়ে যায়।[১]

এঁরা সকলেই গোপনে মুসলিম হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনীয়তার মধ্যেই তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার জন্য একত্রিত হতেন এবং নির্দেশনা প্রদান করতেন। কারণ, তখনো ইসলামের প্রচার কজা ব্যক্তি প্রর্যায়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সঙ্গোপণে হয়ে আসছিল। এ দিকে সূরা মোদসসিরের প্রথম দিকে আয়াত সমূহের পর অবিরামভাবে ওহী নাযিলের ধারা অব্যাহত থাকে। সেই সময় ছোট আকারের আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হচ্ছিল। সে সকল আয়াতের শেষাংশ একই প্রকার আকর্ষণীয় শব্দমালা সমন্বয়ে গঠিত এবং ঝংকার ও শ্রুতি মাধুর্যের দিক দিয়ে ছিল বড়ই তৃপ্তিদায়ক। ভাবধারার দিক দিয়ে আয়াতগুলো ছিল শান্তি সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। অধিকন্তু, আয়াতগুলোতে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রশংসা এবং অশ্লীলতায় মজ্জিতদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে যেন তা চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ আয়াত সমূহ ঈমানদারদের তৎকালীন মানব-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্নতর এক পরিবেশে পরিভ্রমণ করাতে থাকে।

নামায বা প্রার্থনা (الصلاة) :

প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয় তাতে নামাজের নির্দেশেনা বিদ্যমান ছিল। মেকাতেল বিন সোলায়মান বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ফজরের দু'রাকাত এবং মাগরিবের দু'রাকাত নামায ফরয করেছিলেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে,

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ (سورة المؤمن/الغافر : ٥٥)

'তুমি তোমার ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর সকাল-সন্ধ্যা তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা কর।' [আল-মু'মিন/গাফির (৪০): ৫৫]

ইবনে ইজর বলেন যে, নবী কারীম ﷺ এবং তাঁর সাহবাগণ (রাঃ) মি'রাজের ঘটনার পূর্বে সেভাবেই নামায পড়তেন। তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বে নামায ফরজ ছিল কি ছিল না সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, সূর্যের উদয় এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বে একটি করে নামায ফরজ ছিল।

হারেস বিন উসামাহ ইবনে লাহিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা কারীদের মিলিত পরম্পরা সূত্রের বরাতে যায়েদ বিন হারেশাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হল তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁকে অযুর পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। যখন অযুর শেখা সমাপ্ত হল তখন এক চুল পানি লজ্জা স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। ইবনে মাজাও এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বারা বিন আয়েব এবং ইবনে আব্বাস হতেও ঐ ধরণের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হাদীসে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, নাসায প্রাথমিক ফরজকৃত কর্তব্য সমূহের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[২]

---

[1] সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬২ পৃঃ।

[2] শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুসারু সীরাহ পৃঃ ৮৮।

ইবনে হিশামে বর্ণনায় এ কথা রয়েছে যে, নবী কারীম ﷺ এবং সাহাবীগণ (রা.) নামাযের সময় ঘাঁটিতে চলে যেতেন এবং গোত্রীয় লোকজনদের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে নামাজ আদায় করতেন। আবু তালিব এক দফা নবী কারীম ﷺ এবং আলীকে নামায আদায় করতে দেখেন এবং জিজ্ঞাসা করে প্রকৃত বিষয়টি অবগত হলে এর উপর দৃঢ় থাকার পরামর্শ প্রদান করেন।[১]

কুরাইশগণের নিকট সংক্ষিপ্ত খবরাখবর (الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا) :

আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী সূত্রে স্পষ্টতঃ প্রতিয়মান হচ্ছিল যে, সেই সময় যদিও ইসলাম প্রচারের কাজ কর্ম ব্যক্তি পর্যায়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছিল কিন্তু তবুও কুরাইশদের নিকট তা সম্পূর্ণ অজানা ছিল না।

মুহাম্মদ গাযালীর লিখিত বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, যদিও ইসলাম প্রচারের কাজ সঙ্গোপনে চলছিল তবুও এর খবরাদি কুরাইশগণের নিকট পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশগণ এ সব ঘটনার উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। খুব সম্ভব তারা মুহাম্মদ ﷺ-কে সেই ধরণের একজন ধার্মিক ব্যক্তি বলে মনে করেন যিনি দেব এবং দেবত্বের প্রাপ্য সম্পর্কে কথোপকথন করেন। যেমনটি উমাইয়া বিন আবিস সালত, কুস বিন সায়েদা এবং আমমর বিন নুফাইল ও অন্যান্যরা করেছিলেন। অবশ্য নবী ﷺ-এর প্রচার এবং প্রভাব ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় বিস্তার লাভ করতে থাকায় কুরাইশগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি উপলব্ধি করছিলেন এবং সময়ের গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে নবী ﷺ-এর প্রচার কাজ ও তার ফলাফলের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে আসছিল।[২]

তিন বছর পর্যন্ত প্রচারের কর্ম ব্যক্তি পর্যায়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছিল। সেই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যেই ইমানদারগণের এমন একটি ছোট খাটো দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল যাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগীতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আল্লাহর পয়গামকে যথার্থ মর্যাদা প্রদানের জন্য জীবন্ত জীবের হৃৎপিণ্ডের মতো তাঁরা সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতেন। এর পর স্বজাতীয় ও স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য নবী কারীম ﷺ-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হল এবং তাঁদের প্রতিমা পূজার অসারতা এবং প্রতিমার স্বরূপ উদঘাটন করে দিতে বলা হল।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃঃ।

[2] ফেকাহহুসসীরাত পৃঃ ৭৬ ।

المرحلة الثانية

দ্বিতীয় স্তর :

الدعوة جهارًا

প্রকাশ্য প্রচার

প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ (أول أمـــر بإظهار الدعـــوة) :

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অবতীর্ণ :

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:٢١٤]،

" আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।' (আশ-শু'আরা ২৬ : ২১৪)

এটি হচ্ছে সূরা শোরাব আয়াত এবং এ সূরায় সর্ব প্রথমে মূসা (عليه السلام)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মূসা (عليه السلام)-এর নবুওয়তের প্রারম্ভিক কাল কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, বনি ইসরাঈল সহ কিভাবে তিনি হিজরত করে ফেরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন এবং পরিশেষে কিভাবে স্বদল বলে ফেরাউনকে নিমজ্জিত করা হল সেব কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায়, ফেরাউন এবং তাঁর কওমকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতে গিয়ে মূসা (عليه السلام)-কে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল এ ছিল সেই কর্মকাণ্ডের একটি সমন্বিত আলোচনা।

এ ব্যাপারে আমার ধারণা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট দ্বীনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল সেই প্রসঙ্গে মূসা (عليه السلام)-এর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণাদি এ কারণেই তুলে ধরা হল, যাতে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর কিভাবে মিথ্যা এবং বাতিলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হক পন্থীদের কিভাবে অন্যায়-অত্যাচারে সম্মুখীন হতে হয় তার একটি চিত্র নবী কারীম ﷺ এবং সাহাবীগণের (রা.) সম্মুখে বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ এ সূরার মধ্যে নবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতিসমূহ, যথা ঃ ফেরাউন ও তার দল ব্যতীত নূহ (عليه السلام)-এর সম্প্রদায়, আদ, সামুদ, ইবরাহীম (عليه السلام)-এর সম্প্রদায়, লুত (عليه السلام)-এর সম্প্রদায় এবং আসহাবুল আইকার পরিণতির কথাও উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল কওম নবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদের উপর তাদের হঠকারিতার পরিণতি, কি কৌশলে আল্লাহ তাঁদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং ইমানদারগণ অজস্র বিপদাপদ পরিবেষ্টিত থেকেও আল্লাহর রহমতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তা তুলে ধরাই হচ্ছে এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

আত্মীয়-স্বজনদের নিকট প্রচারের নির্দেশ (الدعـــوة في الأقربين) :

যাহোক, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী কারীম ﷺ বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেণ। সেই সম্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফেরও এক দল লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের সংখ্য ছিল পঁয়তালিশ জন। সম্মেলনের শুরুতেই আবু লাহাব আকস্মিকভাবে বলে উঠলেন, 'দেখ এঁরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়- চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি। বাচালতা বাদ দিয়ে এঁদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সঙ্গে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার পিতৃ-পরিবারই যথেষ্ট। তুমি যদি তোমার ধ্যান-ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাক তবে এটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক যে সমগ্র কুরাইশ গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং অন্যান্য আরব গোত্র এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তারপর এটা আমার জানার বিষয় নয় যে, স্বীয় পিতৃপরিবারের আর অন্য কেউ তোমার চাইতে বড় সর্বনাশা হতে পারে। আবু লাহাবের এ জাতীয় অর্থহীন আস্ফালনের প্রেক্ষাপটে নবী কারীম ﷺ সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ঐ নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় সম্মেলন ঃ

এরপর নবী কারীম ﷺ স্বগোত্রীয় লোকজনদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

(الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনারযোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

তারপর তিনি বলেন ঃ

(إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنما الجنة أبدًا أو النار أبدًا)

"কল্যাণকামী পথ-প্রদর্শক স্বীয় আত্মীয়-পরিজনগণের নিকট কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ জানেন, তোমারা সকলেই সেভাবেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে যেমনটি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এবং সেভাবেই পুনরায় উত্থিত হবে যেমনটি তোমরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হও। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সফলতা সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং পূণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাস স্থল জন্নাতে ও পাপাচারের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাব ও দুঃখ কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, (কোন কিছু জিজ্ঞেস করিও না) আমরা কতটুকু তোমার সাহায্য করতে পারব, তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমার কথাবার্তা কতটুকু সত্য বলে আমরা জানব। এখানে সমবেত লোকজন তোমার পিতৃ-পরিবারের সদস্য এবং আমিও অনুরূপ একজন সদস্য। পার্থক্য শুধু এ টুকুই যে, তোমার সহযোগিতার জন্য তাঁদের তুলনায় আমি অগ্রগামী আছি। অতএব, তোমার নিকট যে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে থাক। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরামভাবে তোমার কাজকর্ম দেখাশোনা ও তোমাকে সহানুভূতি করতে থাকব। তবে আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই।

আবু লাহাব বললঃ 'আল্লাহর শপথ, এ হচ্ছে অন্যায় এবং দুষ্টামি-নষ্টামি। এর হাত অন্যদের আগে তোমারাই ধরে নাও।'

আবু লাহাবের মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর আবু তালিব বললেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ আমার দেহ প্রাণ থাকবে আমি তাঁর হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব।[1]

সাফা পর্বতের উপর (على جبل الصفا) ঃ

যখন নবী কারীম ﷺ খুব ভালভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে আবু তালিব তাঁকে সাহায্য করবেন তখন এক দিবস তিনি সাফা পর্বত শিখরে আরোহন করে জন সাধারণকে আহ্বান করলেন, (يا صباحاه) হায়, প্রাতঃকাল[2] বলে শ্রবণ করে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা সেখানে যখন সমবেত হলেন

---

[1] ইবনুল আসিরঃ ফিকহুস সীরাহ পৃঃ ৭৭ ও ৮৮।

[2] তৎকালীন সময়ে আরবের নিয়ম ছিল। ভয়ঙ্কর কোন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে কিংবা কেউ দেশবাসীর নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার কিংবা প্রতিকার প্রার্থী হলে পর্বত শীর্ষে আরোহণ করে (ইয়াসাবাহাহ) হায় প্রাতঃকাল বলে চিৎকার করতে থাকত। এতে লোকজন সেখানে সমবেত হতো।

তখন তিনি সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহর একত্ববাদ, স্বীয় নবুওয়ত এবং পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে আহ্বান জানালেন। এ ঘটনায় এক অংশ সহীহুল বুখারীতে ইবনে আব্বাস কর্তৃক এইভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

যখন ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন নবী কারীম ﷺ সাফা পর্বত শিখরে আরোহন করে কুরাইশ গোত্রের সতলকে লক্ষ্য করে বিশেষ কিছু শব্দ উচ্চারণ করে চিৎকার করতে থাকলেন ঃ

يا بني فهر، يا بني عدى، (يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب)

"ওহে বনু ফিহর! ওহে বনু আদী! (ওহে বনু অমুক, ওহে বনু ওমুক, ওহে বনু আবদে মানাফ, ওহে বনু আবদুল মুত্তালিব)

এ আহ্বান শ্রবণ করে সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেলেন। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর উপস্থিত সম্ভব না হলে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। ফলকথা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের সকললেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবু লাহাবও উপস্থিত ছিলেন।

তারপর নবী কারীম ﷺ বললেন,

(أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادى بسَفْح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟)

"হে কুরাইশ বংশীয়গণ! তোমরা বল, আজ (এ পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে) যদি আমি তোমাদিগকে বলি যে, পর্বতের অন্য দিকে এক প্রবল শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের যথা- সর্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে তোমরা আমার এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে কি?

সকলে সমস্বরে উত্তর করল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই। আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখি নাই।

তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন ,

(إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد، إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل رأي العَدُوّ فانطلق يَرْبَأ أهله)(أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو) (خشى أن يسبقوه فجعل ينادى: يا صباحاه)

"যদি তাহাই হয়, তবে শ্রবণ করুন। আমি আপনাদিগকে (পাপ ও আল্লাহ দ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম ও তজ্জনিত) অবশ্যম্ভাবী কঠোর দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি ....।

এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠলেন, 'তোর সর্বনাশ হোক! এ জন্য কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস? এর ফলশ্রুতিতে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলো :[১]

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [سورة المسد:١]

"আবূ লাহাবের হাত ধ্বংস হোক।' [আল-মাসাদ (১১১) : ১]

এ ঘটনার আর এক অংশ ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, যখন وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চিৎকার করে সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। এ আহ্বান ছিল 'বিশেষ' এবং 'সাধারণ' উভয় ভাবধারার। তিনি চিৎকার করে বললেন 'হে কুরাইশগণ! জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা করো। হে বনু কাব গোত্রের লোকেরা! জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা করো। হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা! জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে আল্লাহর পাকড়াও হতে রক্ষা

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৭০২ ও ৭৪৩ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ১১৪ পৃঃ।

করতে পারব না। তবে তোমাদের সঙ্গে বংশীয় এবং আত্মীয়তার সূত্রে যতটুকু উপকার করা সম্ভব ততটুকু করব।[১]

সত্যের প্রকাশ্য ঘোষণা এবং মুশরিকগণের প্রতিক্রিয়া (الصدع بالحق وردود فعل المشركين) :

উপরি উল্লেখিত আহ্বান তখনো মক্কার আশপাশে শোনা যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হল ঃ

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤]

"কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।' (আল-হিজর ১৫ : ৯৪)

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বহুত্ববাদের অশ্লীলতা এবং মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করে প্রতিমার প্রকৃতি, মর্যাদা এবং মূল্যের অসারতা সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে কথা বলা আরম্ভ করেলেন। এ প্রতিমাগুলোর জড়ত্ব, অসমর্থতা ও অকর্মন্যতা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ তিনি জোরালো কণ্ঠে বলতে থাকলেন এবং যাঁরা এঁদেরকে আল্লাহ এবং নিজের মধ্যে মাধ্যম তৈরি করে নিয়েছেন তাঁরা যে কত ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন তা বলতে থাকলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ প্রচারাভিযান ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং প্রজ্ঞানিষ্ঠ তিনি তাঁর ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের নিকট জোরলো কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে নবুওয়তের বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করবে সঠিক সম্পর্কের ব্যাপারটি যুগ যুগ ধরে গোত্রীয় বা বংশীয় সম্পর্কের যে বন্ধনটি আরবে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে আল্লাহ কর্তৃক ভীতি প্রদর্শনের প্রচণ্ড তাপে বিগলিত হয়ে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মূর্তিপূজক ও মুশরিকগণের বিরুদ্ধে সত্যের এ আপোষহীন ঘোষণা যখন যুগ-যুগান্তরের বুহুত্ববাদী বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে ধ্বস সৃষ্টি করল তখন প্রচণ্ড ক্রোধ ও ক্ষোভে পৌত্তলিক ও উৎকট অহংবাদী মক্কা বাসীগণ এমনভাবে ফেটে পড়ল যেমনটি বাত্যা বিক্ষুব্ধ মেঘমালার বক্ষ-নিঃসৃত বজ্রের ভয়ংকর গর্জন শান্ত পৃথিবীর উর্দ্ধদেশে আকাশ মণ্ডল ফেটে পড়তে চায়। কুরাইশগণ উঠে পড়ে লাগলেন সদ্য অংকুরিত এ একত্ববাদের মুলোৎপাটন করে ফেলার জন্য। কারণ, একত্ববাদের এ ধারণাই যে শেষ পর্যন্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাঁদের ঐতিহ্য ও আকীদাকে একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে সেই রকম একটি আশংকা তাঁদের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একত্বাবাদের ঘোষণায় কুরাইশগণ একদম ক্ষেপে উঠলেন। কারণ, এটা তাঁরা জানতেন যে, একত্ববাদ নবুওয়ত ও পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থই হবে নিঃশর্তভাবে নবী ﷺ-এর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং কোন আপত্তি ছাড়াই তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। অন্যান্য বিষয়ের কথা তো দূরেই থাক এমন কি নিজের প্রাণ এবং ধন-সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইচ্ছানুযায়ী তা করা চলবে না। এর অর্থ দাঁড়াবে যে, ধর্মীয় ব্যাপারে আরববাসীদের উপর মক্কাবসীগণ পৌরহিত্য ও নেতৃত্বের যে মর্যাদা লাভ করে আসিছিলেন তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টির বাইরে নিজ খেয়াল-খুশি মতো কোন কাজ করার অধিকার তাদের থাকবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দুর্বলতর শ্রেণীর লোকজনদের প্রতি তাঁরা যে অন্যায়-অত্যাচার করে এসেছেন এবং সকাল-সন্ধ্যা যে সকল অপকর্মের সঙ্গে সংশিষ্ট থেকেছেন সে সব করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। কুরাইশগণ এ সব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন এবং এ জন্যই তাঁদের দৃষ্টিতে এ অপমান জনক অবস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এ মানসিকতার পেছনে মঙ্গলজনক কিংবা সম্মানজনক বলতে তেমন কিছুই ছিল না। আল্লাহ বলেন :

﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ (سورة القيامة ٧٥ : ٥)

" কিন্তু মানুষ তার আগামী দিনগুলোতেও পাপাচার করতে চায়।" [আল-ক্বিয়ামাহ (৭৫) : ৫]

---

[১] সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ১১৪ পৃঃ। সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৩৮৫ পৃঃ।

আল্লাহর একত্ববাদ এবং দ্বীন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সমস্ত কথা বললেন কুরাইশগণের তার সততা এবং কথাবার্তা উপলব্ধি করলেও মাত্র একটি কারণে তা মেনে নিতে পারলেন না। সে কারণটি হচ্ছে তাঁদের শক্তিমত্তা, যথেচ্ছাচার এবং নেতৃত্বের মোহ। অথচ তাঁকে অস্বীকার করা কিংবা এড়িয়ে চলার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। কারণ, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকারিতা, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, চিরত্রামধূর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সকল মানবিক গুণাবলীর সমন্বয়ে সর্বকালের সকল মানুষের জন্য আদর্শ এবং মহিমান্বিত এমন এক ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন যেমনটি তাঁরা কোন কালেও শোনেন নি কিংবা দেখেন নি। এহেন পরিস্থিতিতে তাঁরা কতটা যেন দিশেহারার মতো হয়ে পড়লেন এবং প্রকৃতই তাঁদের দিশেহারা হওয়ারই কথা ছিল। তাঁদের বংশানুক্রমিক ইতিহাসে তিনি ছিলেন নজিরহীন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব।

অবশেষে অনেক চিন্তা ভাবনার পর তাঁদের ধারণায় তাঁরা একটি পথ খুঁজে পেলেন এবং সেটি হল তাঁরা তাঁর চাচা আবু তালিবের নিকট যাবেন এবং তাঁর নিকটদাবী করবেন যে, তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে এহেন কাজকর্ম থেকে বিরত রাখেন। তাঁদের এ দাবীকে অধিকতর শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের উপাস্য প্রতিমাদরে প্রসঙ্গটি উত্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুহাম্মদ ﷺ তাঁদের প্রতিমাদের সম্পর্কে নানা প্রকার কটুকাটব্য ও অবমাননাকর উক্তি করে তাঁদের উপাসনা না করার কথা বলেছেন, এটা কিছুতেই বরদাস্ত করা যেতে পারে না। পূর্ব পুরুষগণের আমল থেকে বংশপরম্পরায় আমারা যে সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি প্রচলন করে এসেছি আজ তাঁর এক কথায় সবই বাদ দিতে হবে? কেন, কিভাবে তা সম্ভব? আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তা হলে কি মূর্খ ছিলেন? সাত-পাঁচ এ জাতীয় নানা কথা নানা প্রশ্ন এবং নানা যুক্তিতর্কের পসরা নিয়ে তাঁরা আবু তালিবের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আবু তালিব সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি দল (وفد قريش إلى أبي طالب) :

ইবনে ইসহাক বলেন যে, কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একত্র হয়ে আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবু তালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীগণকে গালিগালাজ করছেন, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছেন, আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেকহীন, মূর্খ বলছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রষ্ট বলছেন। অতএব, হয় আপনি তাঁকে এ জাতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখুন নতুবা আমাদের এবং তাঁর মধ্য থেকে আপনি দূরে সরে যান। কারণ, আপনিও আমাদেরই মতই তাঁর বক্তব্য মতে ভিন্নধর্মের অনুসারী। তাঁর ব্যাপারে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট হব।

এর জবাবে আবু তালিব অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে পাঁচরকম কথা বার্তা বলে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করলেন। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা ফের চলে গেলেন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ পূর্ণোদ্যমে তাঁর প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।[1]

হজ্জ যাত্রীগণকে বাধা দেয়ার বৈঠক (المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة) :

যে সময়ের কথা ইতোপূর্বে বলা হল সেই সময়ে কুরাইশগণের সামনে আরও একটি সমস্যা দেখা দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকাশ্য প্রচার অভিযানের কয়েক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই হজ্জের মৌসুম এসে উপস্থিত হল। যেহেতু এ মৌসুমে আরব ভূমির দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন আরম্ভ হয়ে যাবে এবং সেহেতু মুহাম্মদ ﷺ তাঁদের নিকটে প্রচারাভিযান শুরু করবেন সেহেতু তাঁর সম্পর্কে সামগত সকলের নিকট এমন এক কথা বলার প্রয়োজনবোধ করলেন যার ফলে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। এ প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সলাপরামর্শের জন্য তাঁরা অলীদ বিন মুগীরার গৃহে সমবেত হলেন। অলীদ বললেন 'এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত ঠিক কারো যাতে এ নিয়ে তোমাদের পরস্পরের

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৫ পৃঃ।

মধ্যে মতবিরোধ কিংবা মত পার্থক্যের সৃষ্টি না হয় এবং তোমাদের একজনের কথাকে অন্যজন যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে।'

অন্যেরা বললেন, 'আপনি একটা মোক্ষম মন্তব্য ঠিক করে দিন তাহলেই তা আমাদের সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।'

তিনি বললেন, 'না তা হবে না বরং তোমরা বলবে এবং আমি তা শুনব।'

ওলীদের এ কথার পর কয়েকজন সমস্বরে উঠলেন 'আমরা মন্তব্য করব যে, তিনি কাহেন।'

অলীদ বললেন, 'না আল্লাহর শপথ তিনি কাহেন (গণক) নয়।

আমরা অনেক কাহেন দেখেছি। ইনি তো কাহেনদের মতো গুনগুন করে গান গান না। ছন্দাকারে কবিতা আবৃত্তি করেন না কিংবা কবিতা রচনাও করেন না।'

অন্যরা বললেন, 'তাহলে আমরা তাঁকে একজন পাগল বলব।'

অলীদ বললেন, 'না তিনি তো পাগল নন, আমরা পাগল দেখেছি এবং তাঁর রকম সকম সম্পর্কে জানি। এ লোকের মধ্যে পাগলাদের মতো দম বন্ধ করে থাকা, অস্বাভাবিক কোন কাজকর্ম করা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলা কিংবা অনুরূপ কোন কিছুই তো দেখি না।'

অন্যেরা বললেন, 'তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন কবি।'

অলীদ বললেন, 'তাঁর মধ্যে কবির কোন বৈশিষ্ট নেই যে, তাঁকে কবি বলা হবে। আমাদের যুদ্ধকৃত ছন্দ রযম, হাজয, কারীয়, মাকবুয, মাবসুত ইত্যাদি সর্বপ্রকার কাব্যরীতি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। যাহোক তাঁর কথাবার্তাকে কিছুতেই কাব্য বলা যেতে পারে না।'

অন্যেরা বললেন, 'তাহলে আমরা তাঁকে যাদুকর বলব।'

অলীদ বললেন, 'এ ব্যক্তিকে যাদুকরও বলা যেতে পারে না। আমরা যাদুকর এবং যাদু সংক্রান্ত নানা ফন্দি-ফিকির দেখেছি, তারা সত্যমিথ্যা কত কথা বলে, কত অঙ্গ-ভঙ্গি করে কত যে, ঝাড়-ফুঁক করে এবং গিরা দেয় তার ইয়াত্তা থাকেনা। কিন্তু এ ব্যক্তি তো যাদুকরদের মতো সত্য-মিথ্যা কথা বলা, ঝাড়-ফুঁক কিংবা গিরা দেয়া কোন কিছুই করে না।'

অন্যেরা তখন বললেন, 'আমরা তাহলে আর কি বলব।'

অলীদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ তাঁর কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি মধুর, তাঁর ভিত শিকড় বড়ই শক্ত এবং শাখা-প্রশাখা বড়ই মনোমুগ্ধকর। তোমরা তাঁর সম্পর্কে যাই বল না কেন, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকবেন তাঁরা তোমাদের কথাবার্তাকে অবশ্যই মিথ্যা মনে করবেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পুনরায় তিনি বললেন, 'তাঁর সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে খুব জোর যাদুকর বলতে পারো। তাঁর এটা কিছুটা উপযোগী বলে মনে হতে পারে। তিনি এমন সব কথা উত্থাপন করেছেন যা যাদু বলেই মনে হয়। তিনি পিতাপুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে গোত্রে গোত্রে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে যাদুকর বলার সিদ্ধান্তে একমত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।[১]

কোন কোন বর্ণানায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, অলীদ যখন তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন তখন তাঁরা বললেন, 'আপনি তাহলে আপনার গ্রহণযোগ্য অভিমত ব্যক্ত করুন।' প্রত্যুত্তরে অলীদ বললেন, 'আমাকে তবে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিন।' এরপর তিনি বহুক্ষণ ধরে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং উল্লেখিত অভিমত ব্যক্ত করেন।[২]

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৭১ পৃঃ।

[2] ফী যিলালিল কুরআনঃ পারা ২৯, পৃষ্ঠা ১৮৮।

এ ব্যাপারে অলীদ সম্পর্কে সূরা মুদ্দাসসিরের ১৬ টি আয়াত (১১-২৬) অবতীর্ণ হয়েছে :

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ [من ١١ إلى ٢٦]

'১১. ছেড়ে দাও আমাকে (তার সঙ্গে বুঝাপড়া করার জন্য) যাকে আমি এককভাবে সৃষ্টি করেছি। ১২. আর তাকে (ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্কে) দিয়েছি অঢেল ধন-সম্পদ, ১৩. আর অনেক ছেলে যারা সব সময় তার কাছেই থাকে। ১৪. এবং তার জীবনকে করেছি সচ্ছল ও সুগম। ১৫. এর পরও সে লোভ করে যে, আমি তাকে আরো দেই। ১৬. কক্ষনো না, সে ছিল আমার নিদর্শনের বিরুদ্ধাচারী। ১৭. শীঘ্রই আমি তাকে উঠাব শাস্তির পাহাড়ে (অর্থাৎ তাকে দিব বিপদের উপর বিপদ)। ১৮. সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল, ১৯. ধ্বংস হোক সে, কিভাবে সে (কুরআনের অলৌকিকতা স্বীকার করার পরও কেবল অহমিকার বশবর্তী হয়ে নবুওয়াতকে অস্বীকার করার) সিদ্ধান্ত নিল! ২০. আবারো ধ্বংস হোক সে, সে সিদ্ধান্ত নিল কিভাবে! ২১. তারপর সে তাকালো। ২২. তারপর ভ্রূ কুঁচকালো আর মুখ বাঁকালো। ২৩. তারপর সে পিছনে ফিরল আর অহংকার করল। ২৪. তারপর বলল- 'এ তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এ তো পূর্বে থেকেই চলে আসছে। ২৫. এটা তো মানুষের কথা মাত্র।' ২৬. শীঘ্রই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব।' (আল-মুদ্দাসসির ৭৪ : ১১–২৬)

যার মধ্যে কয়েকটি আয়াত তাঁর চিন্তার ধরণ সম্পর্কিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر:١٨: ٢٥]

"১৮. সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল, ১৯. ধ্বংস হোক সে, কিভাবে সে (কুরআনের অলৌকিকতা স্বীকার করার পরও কেবল অহমিকার বশবর্তী হয়ে নবুওয়াতকে অস্বীকার করার) সিদ্ধান্ত নিল! ২০. আবারো ধ্বংস হোক সে, সে সিদ্ধান্ত নিল কিভাবে! ২১. তারপর সে তাকালো। ২২. তারপর ভ্রূ কুঁচকালো আর মুখ বাঁকালো। ২৩. তারপর সে পিছনে ফিরল আর অহংকার করল। ২৪. তারপর বলল- 'এ তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এ তো পূর্বে থেকেই চলে আসছে। ২৫. এটা তো মানুষের কথা মাত্র।' [আল-মুদ্দাসসির (৭৪) : ১৮–২৬]

যা হোক, তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করলেন তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন। কিছু সংখ্যক কাফির মক্কায় আগমনকারী হজ্জযাত্রীগণের পথের পাশে কিংবা পাথের মোড়ে মোড়ে জটলা করে নবী কারীম ﷺ-এর প্রচার এবং তাবলীগের ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই বলে হজ্জযাত্রীগণকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করলেন। নবী কারীম ﷺ সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে তাঁর সম্পর্কে বহু কিছু বলতে থাকলেন।[1] এ সব ব্যাপারে আবদুল্লাহর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

হজের মৌসুমে হজ্ব যাত্রীগণের শিবিরে এবং উকায মাজিন্নাহ ও যুলমাজায বাজারে নবী কারীম ﷺ যখন আল্লাহর একত্ব এবং দ্বীনের তাবলীগ করতেন তখন আবু লাহাব তাঁর পিছন পিছন গিয়ে বলতেন, 'এর কথায় তোমরা কান দিয়ো না। সে মিথ্যুক এবং বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।[2]

এভাবে দৌড় ঝাঁপের ফল হচ্ছে যে, হজ্ব পালনের পর হাজীগণ যখন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাছাড়া তাঁরা এ কথাও

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৭১ পৃঃ।

[2] তিরমিযী মসনাদে আহমদ ৩য় খণ্ড ৪৯২ পৃঃ ও ৪র্থ ৩৪১ পৃঃ।

অবগত হয়ে গেলেন যে মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়ত দাবী করেছেন। এমনভাবে হজ্ব যাত্রীগণের মাধ্যমেই নবী কারীম ﷺ-এর নবুওয়ত এবং ইসলামের প্রাথমিক কথাবার্তা সমগ্র আরব জাহানে বিস্তার লাভ করল।

বিরুদ্ধাচরণের বিভিন্ন পন্থা (أساليب شتى لمجابهة الدعوة) :

কুরাইশগণ যখন দেখলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগ থেকে নিবৃত্ত করার কোন কৌশল কার্যকর হচ্ছে না তখন তাঁরা পুণরায় চিন্তাভাবনা করে তাঁর তাবলীগী কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য নানমুখী পন্থাপ্রক্রিয়া অবলম্বন শুরু করলেন। যে সকল পন্থা তাঁরা অবলম্বন কললেন তা হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১. উপহাস, ঠাট্টা-তামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, মিথ্যাপ্রতিপন্ন, অকারণ হাসাহাসি (السخرية والتحقير، والاستهزاء والتكذيب والتضحيك) :

বিভিন্ন অবমাননাকর উক্তির মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে তাঁরা জর্জরিত এবং অতীষ্ঠ করে তুলতে চাইলেন। এর অন্তর্নিহিতি উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণকে সন্দেহপরায়ন, বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে তাঁদের উদ্যম ও কাজের স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অশালীন অপবাবদ এবং গালিগালাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁরা কখনো তাঁকে পাগল বলেও সম্বোধন করতেন। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر:٦]

" তারা বলে, 'ওহে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো অবশ্যই পাগল।' (আল-হিজর ১৫ : ৬)

কখনো কখনো নবী ﷺ-কে যাদুকর বলত এবং মিথ্যার অপবাদও দিত। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ [ص:٤]

"আর তারা (এ ব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিরগণ বলল– 'এটা একটা যাদুকর, মিথ্যুক।' (স–দ ৩৮ : ৪)

এ কাফিরগণ নবী ﷺ-এর অগ্রভাগে ও পিছনে ক্রোধান্বিত এবং প্রতি হিংসাপরায়ন দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা নিয়ে ঘোরাফেরা করত। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ [القلم:٥١]

"কাফিররা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, 'সে তো অবশ্যই পাগল।' (আল-ক্বলাম ৬৮ : ৫১)

অধিকন্তু, নবী করীম ﷺ যখন কোথাও গমন করতেন এবং তাঁর দুর্বল ও মজলুম সাহাবীগণ (রা.) তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেন তখন এঁদের লক্ষ্য করে মুশরিকগণ উপহাস করে বলত ঃ

﴿مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام:٥٣]

"এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের সম্পর্কে অধিক অবগত নন?' (আল-আন'আম ৬ : ৫৩)

সাধারণত ঃ মুশরিকগণের অবস্থা তাই ছিল যার চিত্র নীচের আয়াত সমূহে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ [المطففين: ٢٩: ٣٣]

“পাপাচারী লোকেরা (দুনিয়ায়) মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। -আর তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন পরস্পরে চোখ টিপাটিপি করে ইশারা করত। - আর তারা যখন তাদের আপন জনদের কাছে ফিরে আসত, তখন (মু'মিনদেরকে ঠাট্টা ক'রে আসার কারণে) ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। - আর তারা যখন মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত, ‘এরা তো একেবারে গুমরাহ্।’ - তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাযাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।’ [আল-মুত্বাফফিফীন (৮৩) : ২৯-৩৩]

২. সংশয় সন্দেহের উসকানী ও মিথ্যা দাওয়াতের মুখোশ উন্মোচন (إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة)ঃ

নবী ﷺ-এর শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়াদির বিকৃত করে দেখানো, নবী ﷺ-এর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা এবং মিথ্যা ও অপপ্রচার করা, নবী ﷺ-এর শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সব কিছুকে অর্থহীন ও আজেবাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করা, এ সবগুলো অনবরত এত অধিক পরিমাণে করা যাতে জনসাধারণ তাঁর দ্বীন প্রচারের দিকে ধীর স্থিরভাবে মনযোগ দেয়া কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না পায়। মুশরিকগণ যেমন কুরআন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ [الفرقان: ٥]

“ তারা বলে- ‘এগুলো পূর্ব যুগের কাহিনী যা সে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ) লিখিয়ে নিয়েছে আর এগুলোই তার কাছে সকাল-সন্ধ্যা শোনানো হয়।’ (আল-ফুরক্বান ২৫ : ৫)

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤]

“ কাফিররা বলে- ‘এটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়, সে তা (অর্থাৎ কুরআন) উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন জাতির লোক এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে।’ (আল-ফুরক্বান ২৫ : ৪)

তারা আরও বলত :

﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [سورة النحل : ١٠٣]

“‘এক মানুষ তাকে [মুহাম্মাদ ﷺ-কে] শিখিয়ে দেয়।’ (আন-নাহ্‌ল ১৬ : ১০৩)

তারা রসূল ﷺ সম্পর্কে বলত :

﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧]

“এ কেমন রসূল যে খাবার খায়, আর হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে?’ (আল-ফুরক্বান ২৫ : ৭)

আল-কুরআনের বহু স্থানে এর ধরনের অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। তবে কোথাও তাদের অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে আর কোথাও অভিযোগ উল্লেখ করা হয়নি।

৩. অতীতকালের ঘটনাবলী এবং উপাখ্যান সমূহ এবং কুরআন কারীমে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে অর্থহীন বাগড়া বা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে জনমনে ধাঁধার সৃষ্টি করা এবং মুক্ত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না দেয় (الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن، ومعارضته بأساطير الأولين) :

প্রসঙ্গক্রমে এখানে নাযর বিন হারেসের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদিন তিনি কুরাইশগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, ‘ওহে কুরাইশ ভাইগণ! আল্লাহর শপথ তোমাদের সম্মুখে এক মহা দুর্যোগপূর্ণ সময় উপস্থিত হয়েছে, অথচ তোমরা আজ পর্যন্ত এর কোন প্রতিকার কিংবা প্রতিবাদ কোনটাই করতে পার নি। মুহাম্মদ ﷺ যখন তোমাদের মধ্যে যুবক ছিল, তখন সকলের প্রিয় পাত্র ছিল। সবার চাইতে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ছিল। এখন যখন তার কান ও মাথার মধ্যেকার চুল সাদা হতে চলল (অর্থাৎ বয়সবৃদ্ধি পেয়ে মধ্য বয়সে পৌঁছিল) এবং তোমাদের নিকট কিছু বাণী ও বক্তব্য উপস্থাপন করল তখন তোমরা

বলছ যে, সে একজন যাদুকর। না, আল্লাহর শপথ যে যাদুকর নয়। আমরা যাদুকর দেখেছি তাদের ঝাড় ফুঁক ও গিরাবন্দিরও দেখেছি, কিন্তু এর মধ্যে সে রকম কোন কিছুই দেখছিনা।'

তোমরা বলছ যে, সে একজন কাহেন।•

কিন্তু তাকে তো কাহেন বলেও মনে হয় না। আমরা কাহেন দেখেছি, দেখেছি তাদের অসার বাগাড়ম্বরতা, উল্টোপাল্টা কাজ কর্ম এবং বাক চাতুর্য। কিন্তু এঁর মধ্যেও তেমন কিছুই দেখিনা।

তোমরা বলছ, সে করি, কিন্তু তাঁকে কবি বলেও তো মনে হয় না। আমরা কবি দেখেছি এবং কাব্যধারা হাজয, রাজয ইত্যাদিও শুনেছি। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যা শুনেছি, কোনদিন কারো কাছেই তা শুনিনি। তার কাছে যা শুনোছি তা তো অদ্ভূদ জিনিস।

তোমরা তাকে বলছ পাগল! কিন্তু তাকে পাগল বলার কোন হেতুই তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা তো অনেক পাগলের পাগলামী দেখেছি, দেখেছি তাদের উল্টোপাল্টা কাজকর্ম, শুনেছি তাদের অসংলগ্ন ও অশীল কথাবার্তা এবং আরও কত কিছু। কিন্তু এর মধ্যেও তেমন কোন ঘটনাই কোন দিন দেখিনি। ওহে কুরাইশগণ! আল্লাহর শপথ, তোমরা খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছ। খুব ভাল চিন্তা-ভাবনা করে পরিত্রাণের পথ খোঁজ করো।

এর পর নাযর বিন হারেস হীরা চলে গেলেন। সেখানে রাজা-বাদশাহদের ঘটনাবলী, ইরানের বিখ্যাত বীর রুস্তম ও প্রাচীন গ্রীক সম্রাট আলেক জান্ডারের কাহিনী শিখলেন। এ সব শেখার পর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলুলাহ ﷺ যখন কোন জায়গায় আল্লাহর নির্দেশাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন তখন সেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতেন, 'আমার কথার চাইতে মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা উত্তম নয়।' এরপর তিনি পারস্য সম্রাটদের, রুস্তম এবং সেকান্দার বাদশাহর (আলেকজান্ডার) কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতেন এবং বলতেন, 'বল, কোনদিক দিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা আমার কথার চাইতে উত্তম।'[1]

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে এটাও জানা যায় যে, ইসলাম বৈরীতার চরম পর্যায়ের ব্যবস্থা হিসেবে নাযর একাধিক ক্রীতদাসী রেখেছিলেন। যখন তিনি জানতে পারতেন যে, কোন লোক নবী করীম ﷺ-এর দ্বীন তাবলীগের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন তখন সেই লোকের প্রতি এক ক্রীতদাসীকে নিয়োজিত করে দিতেন। ক্রীতদাসী তাকে খাওয়া দাওয়া করত এবং তার মনোরঞ্জনের জন্য গীত, বাদ্য এবং অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করত। নবী ﷺ-এর প্রতি তার আকর্ষণ হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত ঐ ধারায় কাজ চলত।[2] এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]

'কিছু মানুষ আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে আর আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।' [লুক্বমান (৩১): ৬]

৪. এ পন্থার মূল কথাছিল কিছু কিছু গ্রহণ ও কিছু কিছু বর্জনের মাধ্যমে মুসলিম ও মুশরিকগণের মধ্যে একটি আপোষরফার ব্যবস্থা। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নবী ﷺ এবং মুসলিমগণ যদি মুশরিকগণের উপাসনা। পদ্ধতির কিছু কিছু অংশ মেনে নেন তা হলে তাঁরাও মুহাম্মদ ﷺ প্রচারিত ইসলামী বিধি-বিধানের কিছু কিছু অংশ মেনে নেবেন। আল-কুরআনুল কারীমে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [سورة القلم : ٩]

" তারা চায় যে, তুমি যদি নমনীয় হও, তবে তারাও নমনীয় হবে।' (আল-ক্বলাম ৬৮ : ৯)

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৯৯-৩০০ পৃঃ, ৩৫৮ পৃঃ। শাইখ আবদুল্লাহ মুখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১১৭-১১৮।

[2] ফতহুল কাদীর, ইমাম শাওকানী, ৪র্থ খণ্ড ২৩৬ পৃঃ ও অন্যান্য তফসীর গ্রন্থসমূহ।

যেমনটি ইবনে জারীর এবং তাবারানীর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মুশরিকগণ নবী কারীম -এর নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, যদি তিনি এক বছর যাবৎ তাঁদের মা'বূদের (প্রভূর) পূজা অর্চনা করেন তাহলে তাঁরা নবী -এর প্রভূ প্রতিপালকের ইবাদত (উপাসনা) করবে। আবদ বিন হোমায়েদ হতে একটি বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে, মুশরিকগণ প্রস্তাব করল যে, যদি আপনি আমাদের মাবূদকে গ্রহণ করেন তবে আমরাও আপনার আল্লাহর ইবাদত করব।[১]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ কা'বা গৃহ তাওয়াফ করছিলেন এমতাবস্থায় আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদ বিন আব্দুল ওয্যা, অলীদ বিন মুগীরা, উমাইয়া বিন খালফ এবং আস বিন ওয়ায়েল সাহমী তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন নিজ নিজ গোত্রের প্রধান। তাঁরা বললেন, 'হে মুহাম্মদ ! এসো! তুমি যে মা'বূদের উপাসনা কর আমরাও সে মা'বূদের উপাসনা করি এবং আমরা যে মা'বূদের উপাসনা করি তোমরাও সে মা'বূদের উপাসনা কর। এরপর দেখা যাবে, যদি তোমাদের মা'বূদ কোন অংশে আমাদের মা'বূদ চাইতে উন্নত হয় তাহলে আমরা সেই অংশ গ্রহণ করব, আর যদি আমাদের মা'বূদ কোন অংশে তোমার মা'বূদ চাইতে উন্নত হয় তাহলে সেই অংশ গ্রহণ করবে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা সূরা কূল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ করেন। যার মধ্যে জলদগম্ভীর সূরে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ – لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [سورة الكافرون : ١-٢]

" বল, 'হে কাফিররা!' ২. তোমরা যার 'ইবাদাত কর, আমি তার 'ইবাদাত করি না।' [আল-কাফিরূন (১০৯) : ১-২][২]

এ অকাট্য সিদ্ধান্তসূচক উত্তরে তাদের হাস্যকর আপোষ সংক্রান্ত কথাবার্তা এবং কাজ কর্মের চূড়ান্ত অবসান ঘটল।

অন্যায় অত্যাচার (الاضطهادات) :

নবুওয়তের চতুর্থ বছরে যখন প্রথমবার সর্ব সাধারণের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হল, তখন মুশরিকগণ তা প্রতিহত করার কৌশল হিসেবে ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কৌশল কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁরা ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করে অল্প অল্প করে অগ্রসর হতে থাকেন এবং এভাবে এক মাসের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করেন নি। কিন্তু তাঁরা যখন এটা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের ঐ কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপ্তিলাভের পথে তেমন কার্যকর হচ্ছে না তখন তাঁরা সকলে পুনরায় এক আলোচনা চক্রে মিলিত হন এবং পঁচিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। সাধারণত গোত্রীয় প্রধানদের নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির অধিনায়ক ছিলেন নবী করীম -এর চাচা আবু লাহাব। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সদস্যগণ পরস্পর আলাপ আলোচনা ও যুক্তি পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেন যে, মুহাম্মদ -কে ইসলাম প্রচার থেকে নিবৃত্ত করা এবং মুসলমাগণকে ইসলামের আওতা থেকে বের করে আনার লক্ষে অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতনের কঠোরতম ব্যবস্থাবলম্বনে তাঁরা কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ করবেন না।[৩]

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুশরিকগণ কৃতসংকল্প হন। মুসলিম এবং বিশেষ করে দুর্বলতর শ্রেণীর মুসলিমদের নিয়ে মুশরিকগণের তেমন কোন সমস্যাই ছিলনা। তাঁদের প্রকৃত সমস্যা ছিল রাসূলুল্লাহ -কে নিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন। বংশ মর্যাদার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শত্রু-মিত্র পক্ষের কেউ তাঁর নিকট আগমন করলে তাঁকে মান-মর্যাদা বা

---

[1] ফতহুল কাদীর, ইমাম শাওকানী, ৫ম খণ্ড ৫০৮ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৬২ পৃঃ।

[3] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৯-৬০ পৃঃ।

ইজ্জতের ভূষণে ভূষিত হয়েই তাঁকে সেখানে আগমন করতে হতো। কোন দুষ্টদুরাচার কিংবা অনাচারীর পক্ষে তাঁর সম্মুখে কোন অশ্লীল বা জঘণ্য কাজ কাজ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন কখনই সম্ভব হতো না।

নবী কারীম ﷺ-এর উপরোক্ত গুণাবলী এবং ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রসূত প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হল চাচা আবু তালিবের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই আবু তালিব এত মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, তাঁর কথা অমান্য করা কিংবা তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করার মতো দুঃসাহসিকতা কারোরই ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অন্যান্য কুরাইশগণকে কঠিন দুশ্চিন্তা, এবং টানা পোড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হল। কিন্তু তাঁদের সামনে যে প্রশ্নটি সব চাইতে কঠিন ছিল তা হচ্ছে প্রতিমা ও পুরোহিতগণের মান-মর্যাদা এবং তাঁদের সামাজিক মান-মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব সংকটের প্রশ্নটি। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাঁদের এ সব যে সম্পূর্ণরূপে ভূলুণ্ঠিত ও বিধ্বংস হয়ে যাবে সে ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই উপায়ন্তর না দেখে তাঁরা একদম মরিয়া হয়ে উঠলেন এবং আবু লাহাবের পরিচালনা ও নেতৃত্বাধীনে মুসলিমদের ও নবী কারীম ﷺ-এর উপর নির্যাতন শুরু করে দিলেন।

প্রকৃত পক্ষে প্রথম থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আবু লাহাবের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। এমনকি অন্যান্য কুরাইশগণ যখন ঘুর্ণাক্ষরেও নবী কারীম ﷺ-কে নির্যাতন করার চিন্তা-ভাবনা করেন নি তখনো আবু লাহাবের আচরণ ছিল অত্যন্ত মারমুখী। বনু হাশেমের বৈঠকে এবং সাফা পর্বতের নিকট তিনি যা কিছু করেছিলেন তা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, সাফা পর্বতের উপর নবী কারীম ﷺ-কে আঘাত করার জন্য তিনি একখণ্ড পাথর হাতে উঠিয়েছিলেন।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আবু লাহাব যে কত পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেছিলেন তার আরও বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁর ছেলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ের মধ্যকার বিবাহ সম্পর্কোচ্ছেদ। নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'মেয়ের সঙ্গে আবু লাহাব তাঁর দু'ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু নবুওয়ত প্রাপ্তির পর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের মাধ্যমে তিনি তাঁর দু'ছেলেরই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।[২]

তাঁর পাশবিকতার আরও একটি ঘটনা হচ্ছে নবী কারীম ﷺ-এর পুত্র আবদুল্লাহ যখন মারা যান তখন তিনি (আবু লাহাব) উলাসে ফেটে পড়েন, টগবগিয়ে দৌঁড়াতে তার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট এ দুঃসংবাদকে শুভ সংবাদরূপে পরিবেশন করেন যে, 'মুহাম্মদ ﷺ-এর লেজকাটা (পুত্রহীন) হয়েছে।[৩]

অধিকন্তু, ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে, হজ্বের মৌসুমে আবু লাহাব নবী কারীম ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বাজার ও গণ জমায়েতে তাঁর পিছনে লেগে থাকতেন এবং জনতার মাঝে অপপ্রচার চালাতেন।

তারেক বিন আবদুল্লাহ মুহারেবীর বর্ণনায় জানা যায় যে, এ ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ-কে শুধু মাত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং কোন কোন সময় তিনি নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করতেন, যার ফলে তাঁর পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যেত।[৪]

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (যার নাম আরওয়া) ছিলেন হারব বিন উমাইয়ার কন্যা আবু সুফিয়ানের বোন। নবী ﷺ-এর প্রতি অত্যাচার ও জুলম ও নির্যাতনে তিনি ছিলেন স্বীমীর যোগ্য অংশিদারিনী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণা মহিলা। এ সকল দুস্কর্মে তিনি স্বামী থেকে পশ্চাদপথ ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলার পথে এবং দরজায় কাঁটা ছড়িয়ে কিংবা পুঁতে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

---

[1] তিরমিযী শরীফ।

[2] ফী যিলালির কুরআন ৩০ খণ্ড ২৮২ পৃঃ, তাফহীন মূল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫২২ পৃঃ।

[3] তাফহীমূল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৯০ পৃঃ।

[4] জামে তিরমিযী।

অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়া, কটুক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি নানাবিধ জঘন্য কাজকর্মে তিনি লিপ্ত থাকতেন। তাছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ফেৎনা ফ্যাসাদের আগুন জালিয়ে দেয়া এবং উস্কানী দিয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টিকরা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই পাক কুরআনুল তাঁকে حمالة الحطب (খড়ির বোঝা বহনকারিনী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যখন তিনি অবগত হলেন তাঁর এবং তাঁর স্বামীর ব্যাপারে নিন্দাসূচক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদুল হারামে কা'বা গৃহের পাশে অবস্থান করছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকও (رضي الله عنه) তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আবু লাহাব পত্নী যখন এক মুষ্ঠি পাথর নিয়ে বায়তুলহারামে (পবিত্র গৃহে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখভাগে এসে দণ্ডায়মান হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা মহিলার দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দেয়ার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন না।

অথচ আবু বকর (رضي الله عنه)-কে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আবু বকর তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, সে নাকি আমাদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ করে আমি যদি এখন তাকে পেতাম তার মুখের উপর এ পাথর ছুঁড়ে মারতাম। দেখ আল্লাহর শপথ! আমি একজন মহিলা কবি।' তারপর সে এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল।[1]

مُذَمَّما عصينا * وأمره أبينا * ودينه قَلَيْنا

অর্থ ঃ আমরা মন্দের অবজ্ঞা করেছি। তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং তাঁর দ্বীনকে (ধর্ম) ঘৃণা এবং নীচু মনে করে ছেড়ে দিয়েছি।

এর পর তিনি সেখান হতে চলে গেলেন। আবু বকর (رضي الله عنه) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি আপনাকে দেখেন নাই?' আল্লাহর নবী বললেন,

(ما رآني، لقد أخذ الله ببصرها عني)

"না, তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আল্লাহ তাঁর দর্শন শক্তিকে আমার থেকে রহিত করে দিয়েছিলেন।[2]

আবু বকর বায্‌যারও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এর সঙ্গে আরও কিছু কথা সংযোজন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবু লাহাব পত্নী আবু বকর (رضي الله عنه)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললন, 'আবু বকর! তোমার সঙ্গী আমার বদনাম করেছে।' আবু বকর (رضي الله عنه) বলেলেন 'না, এ ঘরের প্রভূর শপথ! তিনি কোন কবিতা রচনা কিংবা আবৃত্তি করেন না। আর না, সে সব তিনি মুখেই আনেন।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্যই বলছ।'

এ সব সত্ত্বেও আবু লাহাব সেই সব লোহমর্ষক ঘটনাবলী ঘটিয়ে চলেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচ ও প্রতিবেশী। উভয়ের ঘর ছিল পাশাপাশি এবং লাগালাগি। এভাবেই তাঁর অন্যান্য প্রতিবেশীগণও তাঁর উপর নির্যাতন চালাতেন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, যে সকল লোকজনেরা নবী করীম ﷺ-কে তাঁর বাড়িতে জ্বালা-যন্ত্রণা দিতেন তাদের নেতৃত্ব দিতেন আবু লাহাব, হাকাম বিন আবিল আস বিন উমাইয়া, ওকবা বিন আবি মোয়াইত, আদি বিন হামরা সাকাফ, ইবনুল আস্‌দা' হুযালী এঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। এঁদের মধ্যে হাকাম বিন আবিল আস।[3] ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর তাদের জুলম নির্যাতনের ধার ছিল এরূপ, তিনি যখন নামাযে রত হতেন তখন ছাগলের নাড়ি ভূঁড়িও মলমূত্র এমনভাবে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত তাঁর উপর। উনুনের উপর হাঁড়ি পাতিল চাপিয়ে রান্নাবান্না করার সময় এমনভাবে

[1] মুশরিকগণ ক্রোধান্বিত হয়ে নবী ﷺ-কে মুহাম্মদ নামের পরিবর্তে মুযাম্মাম বলতেন যার অর্থ মুহাম্মদ নামের বিপরীত। মুহাম্মদ ঐ ব্যক্তি যাঁর প্রশংসা করা হয় এবং মুযামমাম ঐ ব্যক্তি যাকে তিরস্কার করা হয়।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৩৫-৩৩৬ পৃঃ।

[3] ইনি উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন হাকামের পিতা ছিলেন।

আবর্জনাদি নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত হাঁড়ি পাতিলের উপর। তাঁদের থেকে নিস্কৃতি লাভের মাধ্যমে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে নামায আদায়ে সক্ষম হন। তদুদ্দেশ্যে তিনি একটি পৃথক মাটির ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন।

যখন তাঁর উপর এ সকল আবর্জনা নিক্ষেপ করা হতো তখন সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে দরজায় খাড়া হতেন এবং তাঁদের ডাক দিয়ে বলতেন,

(يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟)

"ওহে আবদে মানাফ! প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর এ কেমন আচরণ।'

তারপর আবর্জনা স্তুপে নিক্ষেপ করে আসতেন।[1]

ওকবা বিন আবি মোয়াইত আরও দুষ্ট প্রকৃতির এবং প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'একদা নবী কারীম (ﷺ) বায়তুলাহর পাশে নামায আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় আবু জাহল এবং তাঁর বন্ধুবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অন্যদের লক্ষ্য করে বললেন, 'কে এমন আছে যে, অমুকের বাড়ি থেকে উটের ভূঁড়ি আনবে এবং মুহাম্মদ যখন নামায রত অবস্থায় সিজদায় যাবে তখন তার পিঠের উপর ভূঁড়িটি চাপিয়ে দিবে। ঐ সময় আরব বাসীগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি ওকবা বিন আবি মোয়াইত[2] উঠল এবং কথিত ভূঁড়িটি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকল। যখন নবী করীম (ﷺ) সেজদায় গেলেন তখন সেই দুরাচার নরাধম ভূঁড়িটি নিয়ে গিয়ে তাঁর পিঠের উপর চাপিয়ে দিল। আমি সব কিছুই দেখছিলাম, কিন্তু কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। হায় যদি আমার মধ্যে তাঁকে বাঁচানোর কোন ক্ষমতা থাকত।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ আরও বলেন, 'এর পর তারা দানবীয় আনন্দ ও উত্তেজনায় পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলাঢলি, পাড়াপাড়ি করে মাতামাতি শুরু করে দিল। মনে হল ওদের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। হায় আফসোস! যদি তারা একটু বুঝত যে, কী সর্বনাশের পথ তারা বেছে নিয়েছে।'

একদিকে অর্বাচীনের দল যখন দানবীয় আনন্দ ও নরকীয় কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তখন দুনিয়ার সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মান মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) সিজদারত অবস্থায় বেহেশতী আবেহায়াত পানে বিভোর ছিলেন। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য।

নবী তনয়া ফাতেমা (রাঃ) এ দুঃসংবাদপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত সেখানে আগমন করেন এবং ভূঁড়ি সরিয়ে পিতাকে তার নীচ থেকে উর্দ্ধার করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শির উত্তোলন করে তিনবার বললেন ঃ

[اللَّهُمَّ عليك بقريش]

হে আল্লাহ এ কুরাইশদিগকে ধরে ফেল। যখন তিনি আল্লাহর নিকট এ আরয পেশ করলেন তখন তাদের মধ্যে কিছুটা অসুবিধা বোধের সৃষ্টি হল এবং তারা বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, এ শহরের মধ্যে প্রার্থনা কবুল হয়ে থাকে। তারপর তিনি নাম ধরে কয়েক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আরজি পেশ করলেন ঃ

(اللَّهُمَّ عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط)

"হে আল্লাহ! আবু জাহেলকে, উতবা বিন রাবিয়াকে, শায়বা বিন রাবিয়াকে, অলীদ বিন উতবাকে, উমাইয়া বিন খালফ এবং উকবা বিন মোয়াইত কে গ্রেফতার কর।'

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৬ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী এবং অন্য বর্ণনায় এর স্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্রষ্টব্য ১ম ৫৪৩ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ সপ্তম জনের নাম বলেছিলেন কিন্তু বর্ণনা কারীর তা স্মরণ নেই। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেছেন, 'সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাঁদের নামে আরজি পেশ করেছিলেন বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূঁয়োর মধ্যে পতিত অবস্থায় আমি তাদের সকলকেই দেখেছি।'[১]

উমাইয়া বিন খালফের এ রকম এক স্বভাব হয়ে গিয়েছিল যে, যখনই সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখত তখনই তাঁকে ভৎসনা করত এবং অভিশাপ দিত। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারীমা অবতীর্ণ হয় :

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [سورة الهمزة:١]

"প্রত্যেক অভিশাপকারী, ভর্ৎসনাকারী এবং অন্যায়কারীর জন্যই রয়েছে ধ্বংস।' (আল-হুমাযাহ ১০৪ : ১)

ইবনে হিশাম বলেন যে, 'হুমাযাহা' ঐ ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে অশীল বা অশালীন কথাবার্তা বলে ও চক্ষু বাঁকা টেড়া করে ইশারা ইঙ্গিত করে এবং 'লুমাযাহ' ঐ ব্যক্তি যে, অগোচরে লোকের নিন্দা বা বদনাম করে ও তাদের কষ্ট দেয়।[২]

উমাইয়ার ভাই উবাই ইবনে খালফ্ উকবা বিন আবি মোয়াইতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এক দফা ওকবা নবী কারীম ﷺ-এর নিকট বসে কিছু শুরল। উবাই এ কথা জানতে পেরে তাকে খুব ধমকদিল, তার নিন্দা করল। তার নিকট অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে কৈফিয়ত তলব করল এবং বলল যে, তুমি গিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে এস। শেষ পর্যন্ত ওকবা তাই করল। উবাই বিন খালফ্ নিজেই একবার মরা পচা হাড় নিয়ে তা চূর্ণ করে এবং জোরে ফূঁ দিয়ে তার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে উড়িয়ে দেয়।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্যাতনকারী দলের মধ্যে যারা ছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে আখনাস বিন শুরাইক সাকাফী। কুরআন শরীফে তার ৯টি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তার মন মানসিকতা ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ [القلم: ١٠: ١٣].

"তুমি তার অনুসরণ কর না, যে বেশি বেশি কসম খায় আর যে (বার বার মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে মানুষের কাছে) লাঞ্ছিত। ১১. যে পশ্চাতে নিন্দা ক'রে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, ১২. যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, ১৩. কঠোর স্বভাব, তার উপরে আবার কুখ্যাত।' (আল-ক্বলাম ৬৮ : ১০-১৩)

আবু জাহল কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে কুরআন শ্রবণ করত। কিন্তু তার সে শ্রবণ ছিল নেহাৎই একটি মামুলী ব্যাপার। তার এ শ্রবণের মূলে আন্তরিকতা বিশ্বাস, আদব কিংবা আনুগত্যের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেটাকে কিছুটা যেন তার উদ্ভট খেয়াল বলা যেতে পারে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অশীল কিংবা কর্কশ কথাবার্তার মাধ্যমে কষ্ট দিত এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করত। অধিকন্তু, অন্যায় অত্যাচারের ক্ষেত্রে সফলতা হওয়াটাকে গর্বের ব্যাপারে মনে করে গর্ব করতে করতে পথ চলত। মনে হতো সে যেন মহা গুরুত্ব পূর্ণ কোন কাজ সম্পাদন করেছে। কুরআন মাজীদের এ আয়াত তার স্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিল।[৪]

﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾ [القيامة:٣١]

" কিন্তু না, সে বিশ্বাসও করেনি, সলাতও আদায় করেনি।' [আল-ক্বিয়ামাহ (৭৫) : ৩১]

---

[1] সহীহ বুখারী, অযু পর্বের 'যখন কোন নামাযীর উপর আবর্জনা নিক্ষিপ্ত" অধ্যায় ১ম খণ্ড ৩৭ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৫৬ ও ৩৫৭ পৃঃ।

[3] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৬১-৩৬২ পৃঃ।

[4] ফী যিলালির কুরআন ২৯/২১২।

সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রথমদিকে যখন থেকে নামায পড়তে দেখলে তখন থেকে নামায হতে নিবৃত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এ দফা নবী কারীম ﷺ মকামে ইবরাহীমের নিকট নামায পড়ছিলেন এমন সময় সে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখেই সে বলল, 'মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে নামায পড়া থেকে বিরত থাকতে বলিনি? সঙ্গে সঙ্গে সে নবী কারীম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধমকও দিল। নবী করীম ﷺ-ও ধমকের সুরে তাঁর এ কথার কঠোর প্রতিবাদ করলেন। প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ! আমাকে কেন ধমকাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! দেখ এ উপত্যকায় (মক্কায়) আমার বৈঠক সব চাইতে বড়।' তার উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[1]

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ [العلق:١٧].

" কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক।' (আল-'আলাক্ব ৯৬ : ১৭)

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জামার বুকের অংশ ধরে জোরে হেঁচকা একটান দিলেন এবং এ আয়াতে কারীমা পাঠ করলেন ঃ

﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ [القيامة:٣٤، ٣٥]

"দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ, ৩৫. তারপর তোমার জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।' (আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫ : ৩৪-৩৫)

এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর সেই শত্রু বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ। আল্লাহর শপথ, তুমি ও তোমার প্রতিপালক আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি মক্কার পর্বতের মধ্যে বিচরণকারীদের মধ্যে সব চাইতে মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি।[2]

তার এ অসার এবং উৎকট অহমিকা প্রকাশের পরও আবূ জাহাল সেসব থেকে নিবৃত্ত হল না। বরং তার অনাচার ও অন্যায়াচরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলল। যেমনটি সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এক দফা আবু জাহল কুরাইশ প্রধানদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের সম্মুখে মুহাম্মদ ﷺ কি স্বীয় মুখমণ্ডলকে ধূলিস্যাৎ করছে না? প্রত্যুত্তরে বলা হল, 'হ্যাঁ" ।

এরপর সে আস্ফালন করে বলল, 'লাত ও উয্যার কসম, যদি আমি তাকে পুনরায় সেই অবস্থায় (নামাযরত) দেখি তাহলে গ্রীবা পদতলে পিষ্ঠ করে ফেলব এবং মুখমণ্ডল মাটির সঙ্গে আচ্ছা করে ঘর্ষণ দিয়ে মজা দেখিয়ে দিব।'

কিছু দিন পর ঘটনাক্রমে একদিন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে দেখে ফেলে এবং কুরাইশ প্রধানদের নিকট স্বঘোষিত সংকল্প কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু আকস্মিকভাবে পরিলক্ষিত হল যে, অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সে পশ্চাদসরণ শুরু করেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দু'হাত নড়াচড়া করে কি যেন এড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে আবুল হাকাম! তোমার কী এমন হল যে, তুমি অমন ধারা ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ে পড়ল?'

সে উত্তর করল, 'আমার এবং তার মধ্যে আগুণের এক গর্ত রয়েছে, ভয়াবহ বিভীষিকাময় ও ভীতপ্রদ শিকল রয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন 'সে যদি আমার নিকট যেত তবে ফেরেশ্তাগণ তার এক একটা অঙ্গ উঠিয়ে নিয়ে যেতেন।[1]

---

[1] প্রাগুক্ত ৩০ পারা ২০৮।

[2] ফী যিলালি কুরআন ২৯ পারা ৩১২।

মুশরিকগণ নবী কারীম ﷺ-এর উপর এভাবে অবর্ণনীয় অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল। সাধারণ এবং বিশেষ সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট ব্যক্তিগতভাবে মান-মর্যাদার স্বর্ণ সিংহাসনে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও এবং মক্কার সব চাইতে প্রাজ্ঞ, প্রভাবশালী এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আবু তালিবের ছত্রছায়ায় আশ্রিত থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে তাঁকে নিজেই এ রকম জুলম নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছিল সে ক্ষেত্রে গরীব শ্রেণীর সাধারণ মুসলিমদের কথা তো বলাই বাহুল্য। গরীব শ্রেণীর নবদীক্ষিত মুসলিমদেরও এত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নির্যাতন চালানো হতো যে, ভাষার মাধ্যমে তার প্রকৃত বিবরণ পেশ কার কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক গোত্রই গোত্রীয় নও মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাত। কিন্তু যে সকল মুসলিম কোন গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতা না এত অধিকমাত্রায় তাদের উপর নির্যাতন চালানো হতো যে, পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিটিও তা প্রত্যক্ষ করে অস্থির কিংবা বিচলিত না হয়ে পারতেন না।

আবু জাহল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার কথা শুনত তখন সে তাকে ন্যায়-অন্যায় বলে গালি গালাজ করত, অপমান-অপদস্থ করত এবং ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাত। জ্ঞাতি গোষ্ঠীর যদি কোন দুর্বল মুসলিম হতো তাহলে তাকে সে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারধোর করত এবং মারধোর করার জন্য অন্যদের প্ররোচিত করত।[২]

ওসমান বিন আফ্ফানের চাচা তাঁকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে নীচ থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত।[৩]

মুসয়াব বিন উমায়ের (رضي الله عنه)-এর মা যখন তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর পেল তখন সে তার খানা পানি (আহারাদি) বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। প্রথম জীবনে তিনি আরাম আয়েস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে সর্পের গাত্র থেকে খুলে পড়া খোলসের মতো তাঁর শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়ত।[৪]

বেলাল, উমাইয়া বিন খালফ জুমাহীর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উমাইয়া তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে ছোকরাদের হাতে ধরিয়ে দিত। তারা সেই দড়ি ধরে তাঁকে পথে প্রান্তরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াত। এমন কি টানাটানির ফলে তাঁর গলায় দড়ির দাগ বসে যেত। উমাইয়া স্বয়ং হাত পা বেঁধে তাঁকে প্রহার করত এবং প্রখর রোদে বসিয়ে রাখত। তাঁকে খানা পানি না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখত। এ সবের চাইতেও অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর হতো তখন যখন দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের সময় কংকর ও বালি আগুনের মতো উত্তাপ্ত হয়ে উঠত এবং তাঁকে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হতো। তারপর বলত আল্লাহর শপথ! তুই এভাবেই শুয়ে থাকবি। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বি। অথবা মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে কুফরী করবি। বেলাল (رضي الله عنه) ঐ অবস্থাতেই বলতেন, 'আহাদ, আহাদ"। (অর্থ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)। একদিন বেলাল (رضي الله عنه) এমনভাবে এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিলেন তখন আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বেলাল (رضي الله عنه)-কে এক কালোদাসের বিনিময়ে এবং বলা হয়েছে যে, দুইশত দেহরাম (৭৩৫ গ্রাম রূপা) অথবা দু'শ আশি দিরহামের (১ কেজির ও বেশী রূপা) বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।[৫]

আম্মার বিন ইয়াসের বনু মাফযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির এবং মাতার নাম সুমাইয়া। তিনি এবং তাঁর পিতামাতা সকলে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁদের উপর কেয়ামতের আযাব ভেঙ্গে পড়ে। ইয়াসিরের দু'পায়ে দুইটি দড়ি বেঁধে দেয়া হয় এবং দড়ির প্রান্তদয় দুটি উটের

---

[1] সহীহ মুসলিম শরীফ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩২০ পৃঃ।

[3] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৭৫ পৃঃ।

[4] রহামাতুলীল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ ও তালকীহু ফুহুমি আহলিল আসার।

[5] রাহমামুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ এবং তালকীহুল ফোহুম ৬১ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৭-৩১৮ পৃঃ।

পায়ে বেঁধে দিয়ে উট দুটিকে খুব জোর কদমে বিপরীত মুখে খেদানো হয়। এর ফলে তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুমুকে পতিত হন। পাষণ্ড আবু জাহল সুমাইয়ার নারী অঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেন। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সুমাইয়া ছিলেন প্রথম শহীদ।

দুপুর বেলা প্রখর রোদ্র তাপে মরুভূমির বালুকণারাশি এবং কংকর রাশি যখন আগুণের মতো উত্তপ্ত থাকত তখন আবু জাহলের নেতৃত্বে মুশরিকগণ আম্মারকে নিয়ে গিয়ে সেই উত্তপ্ত বালি এবং কংকরের উপর শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। এক দিবস তাঁকে যখন সেভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল এমন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আম্মারকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'হে ইয়াসিরের বংশধর! ধৈর্য্য ধারণ করো, তোমাদের স্থান জান্নাতে।

আম্মারের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। কখনো তাঁকে প্রখর রোদে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকে পাথর চাপা দেয়া হতো, কখনো বা পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেয়া হতো। মুশরিকগণ তাঁকে বলত, 'যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-কে গালমন্দ দেবে এবং আমাদের উপাস্য লাত এবং উয্যা সম্পর্কে উত্তম কথা না বলবে ততক্ষণ তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হবে না।' নেহাৎ নিরূপায় হয়ে আম্মার (রাঃ) তাঁদের কথা মেনে নিলেন।[১] তারপর নাবী করীমের দরবারে উপস্থিত হয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে স্ববিস্তারে ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারীমা অবতীর্ণ হল :

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [سورة النحل : ١٠٦]

"কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে।' (আন-নাহ্‌ল ১৬ : ১০৬)

ফুকাইহা (রাঃ) বনু আব্বাস গোত্রের দাস ছিলেন। তাঁর অপর নাম ছিল আফলাহ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তাঁর মালিক পায়ে দড়ি বেঁধে তাঁকে কংকরময় পথ ও প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়াতেন।[২]

খাব্বাব বিন আরাত্ত খোযায়া গোত্রের উম্মু আনমার নাম্নী এক মহিলার দাস ছিলেন। মুশরিকগণ তাঁর উপর নানাধরণের নির্যাতন চালাতেন। কখনো বা খুব শক্ত হাতে চুল টানাটানি করে নিস্পেষন চালাতেন। কখনো বা আবার খুব শক্ত হাতে তাঁর গ্রীবা ধরে মোচড়ায়ে দিতেন। এক সময় তাঁকে কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হয়েছিল যাতে তিনি উঠতে না পারেন। এতে তাঁর পৃষ্ঠদেশ পুড়ে গিয়ে ধবল কুষ্ঠের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল।[৩]

যিন্নীরাহ[৪], নাহদিয়া এবং তাঁর কন্যা উম্মু উবায়েস সকলেই দাসী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এঁরা সকলেই মুশরিকদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার ফলে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্তণার সম্মুখীন হন। এঁদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বনু আদী গোত্রের এক পরিবার বনু মোয়াম্মেলের এক দাসীর মুসলিম হওয়ার সংবাদে ওমর বিন খাত্তাব তাঁকে এতই প্রহার করেছিলেন যে, তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে এ বলে ক্ষান্ত হয়েছিলেন, 'মানবত্বের কোন কারণে নয় বরং খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে শাস্তি দেয়া থেকে আপাততঃ তোমাকে রেহাই দিলাম।[৫] ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ওমর (রাঃ) ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৯-৩২০ পৃঃ এবং মুহাম্মদ গাজ্জালী রচিত ফিকহুস সীরাহ ৮২ পৃঃ আওফী ইবনে আব্বাস হতে কিছু কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর, উপরিএ আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য।

[2] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ, এ জায়ুততানযীল ৫৩ পৃঃ হতে।

[3] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭পৃঃ তালকীহুল ফোহুম ৬০ পৃঃ।

[4] যিন্নীরাহ মিসকীনার ওযনে অর্থাৎ 'যে' কে যের এবং নূনকে যের এবং তাশদীদ।

[5] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৯ পৃঃ।

অবশেষে আবু বকর (রাঃ) বেলাল এবং আমের বিন ফোহায়রার মতো দাসগুলোকে ও ক্রয় করে নেয়ার পর মুক্ত করে দেন।[১] মুশরিকগণ মুসলিমগণকে শাস্তিদানের আরও যে সকল পন্থা প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ছিলেন তা হচ্ছে কোন কোন সাহাবী (রা.)-কে উট কিংবা গরুর কাঁচা চামাড়ায় জড়িয়ে বা লেপটিয়ে প্রখর রোদ্র তাপের মধ্যে ফেলে রাখত। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার লোহার বর্ম্ম পরিয়ে উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর শুইয়ে রাখত।[২] প্রকৃতই আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষিত ও দ্বীনের অনুসারী অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা ছিল যথেষ্ট লম্বা এবং অত্যাচার ও উৎপীড়নের দৃশ্য বড়ই করুণ লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক। প্রকৃত অবস্থা ছিল মুশরিকগণ যখন কারো মুসলিম হওয়ার সংবাদ পেতেন তখন তাঁদের কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তার উদ্বাহু এবং বদ্ধ পরিকর হয়ে যেতেন।

আরকামের বাড়িতে (دار الأرقم) :

মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিকল্প দাবী ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমদের কথা এবং কাজা উভয় দিক দিয়েই প্রকাশ্যে কিছু করা থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন এবং তাদের সঙ্গে গোপনের একত্রিত হবেন, কারণ, তিনি যদি তাঁদের সঙ্গে একত্রিত হন তাহলে মুশরিকগণ তাঁর আত্মশুদ্ধি এবং কিতাব ও হিকমত শেখার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন এবং এর ফলে মুসলিম ও মুশরিক উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভবনা থাকবে। ঠিক এ রকম এক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল নবুওয়তের চতুর্থ বছরে। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এরূপঃ সাহাবীগণ (রা.) তাঁদের নির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলোতে একত্রিত হয়ে নামায আদায় করতেন। ঘটনাক্রমে এক দিবস কিছু সংখ্যক কাফের কুরাইশ তাঁদের এভাবে নামায পড়তে দেখে ফেলার পর অশীল ভাষায় তাঁদের গালিগালাজ করতে থাকেন এবং আক্রমণ করে বসেন। মুসলিমগণও সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। প্রতিহত করতে গিয়ে সায়াদ বিন ওয়াক্কাস এক ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার করেছিলেন যে তার শরীরের আঘাত প্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ইসলামে এটাই ছিল সর্বপ্রথম রক্তপাত।[৩]

এটা সর্বজনবিদিত বিষয় যে, এভাবে যদি বারংবার মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকত তাহলে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেতেন। অতএব, ইসলামের সর্বপ্রকার কাজকর্ম অত্যন্ত সঙ্গোপনে সম্পন্ন করার দাবী ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিত। এ প্রেক্ষিতে সাধারণ সাহাবীগণ (রা.) তালীম, তাবলীগ, ইবাদত বেন্দগী সম্মেলন ও পারস্পরিক মতো বিনিমিয় ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্ম সঙ্গোপনেই করতে থাকেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর এবাদত-বন্দেগী এবং প্রচারমূলক কাজকর্ম মুশরিকগণের সামনা-সামনি প্রকাশ্যেই করতে থাকেন। তাঁকে কোন কিছুতেই তারা বাধা দেয়ার সাহস পেত না। তবুও মুসলিমগণের কল্যাণের কথা চিন্তা-ভানা করে সঙ্গোপনেই তিনি তাঁদের সঙ্গে একত্রিত হতেন। এ দিকে যেহেতু আরকাম বিন আবিল আরকাম মাখযুমীর বাড়িটি সাফা পর্বতের উপর অত্যাচারীদের দৃষ্টির আড়ালে এবং তাদের সম্মেলন স্থান হতে অন্য জায়গায় অবস্থিত ছিল সেহেতু পঞ্চম নবুওয়ত বর্ষ থেকে সেই বাড়িটিকেই ইসলামের প্রচারকেন্দ্র এবং মুসলিমদের সম্মেলন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে।

আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত (الهجرة الأولى إلى الحبشة) :

অন্যায় অত্যাচারের উল্লেখিত বিভীষিকাময় ধারা-প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সূচিত হয় নবুওয়ত চতুর্থ বর্ষের মধ্যভাগে কিংবা শেষের দিক থেকে। জুলুম নির্যাতনের শুরুতে এর মাত্রা ছিল সামান্য। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকল জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে পেতে পঞ্চম বর্ষের

---

[1] ইবনে হাশিম ১ম খণ্ড ৩১৮-৩১৯ পৃঃ।

[2] রহমাতুলি আলামীন ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ।

[3] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৩ পৃঃ। এবং মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব, মোখতাসারুস সীরাহ ৬০ পৃঃ।

মধ্যভাগে তা চরমে পৌঁছিল এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মক্কায় মুসলিমদের টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই এ বিভীষিকার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাধ্য হলেন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে। অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশার এ ঘোর অন্ধাকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল সূরায়ে কাহাফ। প্রকৃতপক্ষে এ সূরা অবতীর্ণ হয়ে ছিল মুশরিকগণের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে কিন্তু এর মধ্যে যে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সেগুলো ছিল মু'মিন বান্দাদের জন্য তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত স্বরূপ। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে এ শিক্ষা বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে যখন দ্বীন ও ঈমান মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয় তখন কুফর বা অবিশ্বাস এবং অন্যায়-অত্যাচারের কেন্দ্রস্থল থেকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর ভরসা রেখে অন্যত্র হিজরত করে যাওয়া কর্তব্য। ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾ [سورة : الكهف : ١٦]

"এখন যেহেতু তোমরা তাদের থেকে আর তারা আল্লাহ ছাড়া যেগুলোর 'ইবাদাত করে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ, তখন চল, গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক তাঁর কল্যাণ বিস্তার করবেন আর তোমাদের কাজ-কর্মকে ফলদায়ক করে দেবেন।' [আল-কাহ্‌ফ (১৮) : ১৬]

মূসা (ﷺ) এবং খিযির (ﷺ) এর ঘটনাবলী হতে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন কিছুর ফলাফল সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য অবস্থানুযায়ী হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতও হয়ে থাকে। অতএব এ ঘটনায় সেই কথার প্রতিসূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে বর্তমান সময়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে অন্যায় অত্যাচার করা হচ্ছে এর ফল লাভ বৈপরীতের মধ্যেই সম্ভব হবে এবং এ অবাধ্য মুশরিকগণ যদি ইসলাম গ্রগণ না করে তবে ভবিষ্যতে তারা নির্যাতিত ও উৎপীড়িত মুসলিমদের হাতে পরাজিত হবে এবং নমনীয় হয়ে তাদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করতে বাধ্য হবে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে যুল কারনাইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জুল কারনাইনের ঘটনায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১. পৃথিবী- এর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। স্বীয় বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাঁকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন।

২. সফলতা বা কৃতকার্যতা- সফলতা বা কৃতকার্যতার প্রসঙ্গটির মূলসূত্র সংশিষ্ট রয়েছে ঈমান বা বিশ্বাসের সঙ্গে, কুফরী বা অবিশ্বাসের সঙ্গে নয়।

৩. আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণের মধ্য থেকে এমন কতিপয় ব্যক্তিকে ঈমান, আমান ও হিকমত দিয়ে থাকেন যাঁরা নিপীড়িত নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত মানুষকে জমানার ইয়াজুজ মাজুজের কবল থেকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন।

৪. আল্লাহর সৎ এবং সদাচারী বান্দাই পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত।

অনন্তর সূরায়ে কাহাফের পর সূরায়ে যোমার অবতীর্ণ হয়। এতে হিজরতের জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয় যে, 'আল্লাহর জমিন অপ্রশস্ত নয়।'

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায় 'ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।' [আয-যুমার (৩৯) : ১০]

অত্যাচারের মাত্রা যখন ধৈর্য ও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, বিশেষ করে কুরআন শরীফ পড়তে এবং নামায আদায় করতে না দেয়ার মানসিক যন্ত্রণা যখন চরমে পৌঁছিল বা দেশান্তরের কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু

করলেন। তিনি বহু পূর্ব থেকেই আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশীর উদারতা এবং ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু, সেখানে কারো প্রতি যে কোন অন্যায়-অত্যাচার করা হয় না সে কথাও তিনি জানতেন। মুসলিম সেখানে গমন করলে নিরাপদে থাকা এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভ করবে। এ সব কিছু বিচা-বিবেচনা করে তাঁদের জীবন এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণ (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন। আলোচ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সলা-পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত-সিদ্ধান্ত মোতাবেক নবুওয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবীগণের (রা.) প্রথম দলটি মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এ দলে ২২ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা ছিলেন। ওসমান (রাঃ) বিন আফ্‌ফান ছিলেন তাঁদের দলপতি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা রোকইয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সম্পর্কে বলেন যে, ইবরাহীম এবং লূত (عليه السلام)-এর পর এঁরাই হচ্ছেন প্রথম পরিবার যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করলেন।[1]

ইসলামের এ প্রথম মুহাজির দল রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষে অত্যন্ত সঙ্গোপনে নিজ নিজ আবাস স্থল পরিত্যাগ করে রওয়ানা হয়ে গেলেন নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। কুরাইশ কাফেরগণ যাতে এ হিজরত সম্পর্কে কোন কিছু অবগত হতে না পারে তজ্জন্য সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। এ মুহাজির দলের যাত্রা ছিল লোহিত সাগরের বন্দর শোয়ায়বাহ অভিমুখে। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে দুটো ব্যবসায়ী নৌকা উপস্থিত ছিল যে, নৌকায় তাঁরা নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করে হাবশে গিয়ে পৌঁছিলেন। কুরাইশগণ কিছুটা বিলম্বে এ হিজরত সম্পর্কে অবগত হয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত তাঁদের পিছু ধাওয়া করে কিন্তু মুহাজিরগণ তখন তাদের নাগালের বাইরে। কাজেই তারা ব্যর্থমনোরথ হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন।

এ দিকে মুহাজিরগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বসবাস করতে থাকলেন।[2] পূর্বাহ্নেই বলা হয়েছে যে, এ দলটি রজব মাসে মক্কা থেকে হিজরত করেন। কিন্তু সেই বছরটি রমাযান মাসে কাবা শরীফে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়।

মুসলিমদের সঙ্গে কাফিরদের সেজদা ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন (سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين) :

একই বছর রমাযান মাসে নবী করীম ﷺ হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে বের হন। কুরাইশগণের এক বিরাট জনতা সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবী কারীম ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়েই আকস্মিকভাবে সুরায়ে 'নাজাম' পাঠ করতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল লোকেরা ইতোপূর্বে কুরআন শ্রবণ করত না এবং কোথাও কুরআন পাঠ করা হলে তারা শোরগোল করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করত যাতে তা শ্রুতিগোচর না হয়। কারণ, তাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল কুরআন শ্রবণ করলে তারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। কুরআনের ভাষায় ব্যাপারটি ছিল এরূপ ঃ

﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ [فصلت:٢٦]

"এ কুরআন শুনো না, আর তা পড়ার কালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।' [ফুসসিলাত (৪১) : ২৬]

কিন্তু নবী কারীম ﷺ যখন এ সূরাটি পাঠ আরম্ভ করলেন তখন এর অশ্রুত পূর্ব সুললিত বানী, অবর্ণনীয় কমনীয়তা ও অপরূপ মিষ্টতা যখন তাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হল তখন তারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবাবিষ্ট এবং হতচকিত হয়ে পড়লেন। ইতোপূর্বে কুরআন পাঠের সময় তারা যেভাবে গণ্ডগোল করত সে রকম গণ্ডগোল করা

[1] শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ৯২-৯৩, যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ ও রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫১ পৃঃ।

[2] রহামাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড যাদুল মাযাদ ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ।

তো দূরের কথা বরং আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে তারা তার শুনতে থাকল। তাদের অন্তরে ভিন্নমুখী কোন ভাবেরই উদ্রেক হল না। তারপর নবী কারীম ﷺ যখন এ সূরার শেষের আয়াত সমূহ পাঠ করতে থাকলেন তখন তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হতে থাকল। যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ-সম্বলিত শেষের আয়াতটি পাঠ করলেন :

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢]

'তাই, আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সেজদায় পতিত হও আর তাঁর বন্দেগী কর।' [সাজদাহ] [আন-নাজম (৫৩) : ৬২][১]

কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থা থেকে তাঁরা স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, আল্লাহর কুরআনের অলৌকিকত্ব তাদের স্বকীয়তা বিনষ্ট করে দিয়েছে যার ফলে তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অথচ যাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদাহ করেন তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁরা আত্মগ্লানির অনলে দগ্ধীভূত হতে থাকেন। তাঁদের এ শোচনীয় মানসিক অবস্থার আরও একটি ঘটতে থাকে যখন অনুপস্থিত অন্যান্য মুশরিকগণ এ আচরণের জন্য তাঁদের লজ্জা দিতে ও নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকেন।

এ ত্রিশংকু অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা এবং তাঁদের সমালোচনা মুখর মুশরিকগণের দৃষ্টির মোড় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁরা রাসূলুলাাহ ﷺ-এর নামে অপবাদ দিয়ে একটি অপপ্রচার শুরু করলেন। তাঁরা একটি নির্জলা মিথ্যাকে নানা রূপ ও রং দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে প্রচার শুরু করলেন যে, তিনি তাঁদের প্রতিমা সমূহের ইজ্জত ও সম্মানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

(تلك الغرانيـــق العلى، وإن شفاعتهم لترتجى)

অথচ তা ছিল মিথ্যা। নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সিজদাহ করে তাদের ধারণায় তারা যে ভুলটি করেছিলেন তার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই তাঁদের এ অপপ্রচার। নবী ﷺ সম্পর্কে সর্বদাই যাঁরা মিথ্যা কুৎসা রটনা এবং নানা অপপ্রচারে লিপ্ত থাকতেন এ ক্ষেত্রেও যে তাঁরা তা করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, যে কোন সূত্রে যে কোন মুহূর্তে নবী ﷺ-এর নির্মল চরিত্রে কলংক লেপন করতে তারা কখনই কুণ্ঠা বোধ করবেন না।[2]

যা হোক, কুরাইশ মুশরিকগণের সিজদাহ করার খবর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমগণের নিকটও গিয়ে পৌঁছিল। কিন্তু সেই সংবাদের রকম-সকম ছিল ভিন্ন। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যেমন নানা রং-চংয়ের সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে যায় এ ক্ষেত্রেও হল ঠিক তাই। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী মুহাজিরগণ খবর পেলেন যে, মক্কার কুরাইশগণ মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। এ কথা শোনা মাত্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেকেরই মনে ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হল এবং পরবর্তী শওয়াল মাসেই তাঁদের একটি দল মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু মক্কা থেকে তাঁরা এক দিনের পথের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন তখন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ব্যাপারটি যেভাবে তাঁদের নিকট চিত্রিত করা হয়েছে প্রকৃত ঘটনাটি তা নয়। তাই দলের কিছু সংখ্যক লোক আবিসিনিয়ায় অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং কিছু সংখ্যক সঙ্গোপনে কিংবা কুরাইশগণের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।[3]

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় বার হিজরত (الهجرة الثانية إلى الحبشة) :

এর পর মক্কা প্রত্যাগত মুহাজিরগণের উপর বিশেষভাবে এবং অন্যান্য মুসলিমগণের উপর সাধারণভাবে কুরাইশগণের অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। শুধু মুহাজিরগণই নন, এমন কি তাঁদের

---

[1] সহীহ বুখারীতে এ সিজদার ঘটনাটি ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। বাবু সাজাদাতিন্নাজমি এবং বাবু সুজূদিল মুশরিকীন ১ম খণ্ড ১৪৬ পৃঃ ও বাব মালাকিয়্যান নাবিয়্যি ফী অসহাবুহু ১ম খণ্ড ৫৪৩ পৃঃ। দ্রষ্টব্য।

[2] বিশেষজ্ঞগণ এ বর্ণনা সূত্রের সমস্ত পথগুলো যাচাই করার পরে এ ফলাফলের গ্রহণ করেছেন।

[3] যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ এবং ২য় খণ্ড ৪৪পৃঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৬৪ পৃঃ।

পরিবার পরিজনও এ নির্যাতনের হাত থেকে নিস্তার পেল না। এর কারণ হচ্ছে ইতোপূর্বে কুরাইশগণ যখন অবগত হয়েছিলেন যে, আবিসিনিয়ায় মুহাজিরগণের সাথে নাজ্জাশী অত্যন্ত স্বহৃদয়তার সঙ্গে আচরণ করছেন এবং নানাভাবে তাঁদের প্রতি মদদ জুগিয়ে চলেছেন তখন মনে মনে তারা অধিকতর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। মুহাজিরগণ যখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন আপনা থেকেই সে সুযোগ তাঁরা পেয়ে গেলেন।

মুসলিমদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরামর্শ দিলেন পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে। কিন্তু প্রথম হিজরতের তুলনায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় কুরাইশগণ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর মতো এখন তাঁরা সচেতন এবং যে কোন মূল্যে এ ধরণের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের ব্যাপারে কুরাইশগণের তুলনায় মুসলামানদের সচেতনতা ও ঐকান্তিকতার মাত্রা ছিল অনেক গুণে বেশী। উপরন্তু নিরীহ, নির্দোষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতি ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। যার ফলে কুরাইশগণের তরফ থেকে কোন অনিষ্ট কিংবা প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই তাঁরা সহীহ সালামতে গিয়ে পৌঁছিলেন হাবশের সম্রাটের দরবারে।

দ্বিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ জন কিংবা ৮৩ জন পুরুষ হিজরত করেছিলেন (এর মধ্যে আম্মার (رضي الله عنه)-এর হিজরত সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে) এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা ঐ দলে ছিলেন।[1] আলামা সোলাইমান মানসুরপুরী দৃঢ়ভাবে মহিলা মুহাজিরগণের সংখ্যা ১৮ বলেছেন।[2]

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে কুরাইশ ষড়যন্ত্র (مكيدة قريش بمهاجري الحبشة) ঃ

জান-মাল ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমগণ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে সেখানে শান্তি স্বস্তি লাভ করায় কুরাইশগণের দারুণ গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে আমর বিন আস এবং গভীর জ্ঞানগরিমার অধিকারী আবদুল্লাহ বিন রাবিয়াহকে (যিনি তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি) নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করার জন্য দূত মনোনীত করা হয়। তারপর সম্রাট নাজ্জাশী এবং বেতরীকগণের (খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজকদের পুরোহিত) জন্য বহু মূল্যাবান উপঢৌকনসহ দূত দ্বয়কে দৌত্যকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আবিসিনিয়ায় পৌঁছে তারা সর্বপ্রথম বেতরীক পুরোহিতগণের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর তাঁদের নিকট সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপণ করেন যার ভিত্তিতে মুসলিমগণকে হাবশ হতে বাহির করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি সেই সকল বিররণ ও প্রমাণাদির তেমন কোন ভিত্তিই ছিল না, তবুও উপঢৌকনের সুবাদে বেতরীকগণ (প্রাদীগণ) এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, মুসলিমগণকে হাবশ হতে বহিস্কার করার ব্যাপারে সম্রাট নাজ্জাশীকে তাঁরা পরামর্শ দিবেন। বেতরীকগণের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভের আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতেরা সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে আরজি পেশ করেন। তাঁদের আরজির বিবরণ হচ্ছে এরূপ ঃ

"হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অর্বাচির যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ণ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেন নি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এঁরা নাকি একটা নতুন ধর্মমতও আবিস্কার করেছেন। এর চাইতে আজগুবী ব্যাপার আর কি হতে পারে বলুন। আমাদের গোত্রীয় প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ সকল অর্বাচিনের পিতামাত, মুরুব্বী ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে

---

[1] যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪, রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬১ পৃঃ।

[2] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬১পৃঃ।

আমাদের দু'জনকে দূত হিসেবে দরবারে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুণ। আমাদের প্রধানগণ এঁদের সম্পর্কে বেশ উঁচু ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রয়েছেন।'

কুরাইশ দূতেরা সম্রাটের নিকট যখন এ আরজি পেশ করলেন তখন পুরোহিতগণ বললেন, 'মহামান্য সম্রাট! এঁরা উভয়েই খুব যুক্তিসংগত এবং সঠিক কথা বলেছেন। আপনি এঁদের হাতে ঐ দেশত্যাগী যুবকদের সমর্পণ করে দিন। আমাদের মনে হয় এটাই ভাল যে, তাঁরা তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ নিয়ে যান।

কুরাইশ দূতগণের কথাবার্তা শ্রবণের পর সম্রাট নাজ্জাশী গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'আলোচ্য বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বিষয়টির খুঁটি নাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের আহ্বান জানালেন। মুসলিমগণও আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করে বিষয়ের খুঁটি-নাটিসহ সকল কথা সম্রাট সমীপে পেশ করার জন্য উত্তম মানসিক প্রস্তুটি সহকারে সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমন কি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে সে ধর্মটি কোন ধর্ম?'

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জাফর বিন আবু তালিব অকপটে বলে চললেন, 'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধাকরাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্বা জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্ত, মিথ্যা বর্জন করে অটুট রাখা, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু, নামায, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এভাবে জাফর অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপ এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। তারপর আবারও বললেন, 'এই পয়গম্বরকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর (মহিমান্বিত পভূর) পয়গম্বর বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর আনীত দ্বীন এলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলছি। সুতরাং আমরা এক এবং অদ্বিতীয় প্রভূ আল্লাহ ইবাদত ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না এবং বিশ্ব জাহানে কোথাও তাঁর কোন শরীক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। পয়গম্বর যে সব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধজেনে তার সদ্ব্যবহার করছি। এ কারণে আরব সমাজের বিভিন্নগোত্র ও সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা চান এ সত্য, সুন্দর, শাশ্বত ও

সুনির্মল দ্বীপ থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করায় তারা আমাদের উপর নরকীয় নির্যাতন চালিয়েছেন। এক আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত করানোর জন্য আমাদের উপর আঘাতের উপর আঘাত হেনেছে, নিদাঘের উত্তপ্ত কংকর ও বালুকারাশির উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়েছে, পায়ে দড়ি বেঁধে পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি এইভাবে যখন তাঁরা আমাদের উপর অবিরামভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকলেন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহর জমিনকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললেন এবং এমন কি আমাদের ও আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ও প্রাণানাশের হুমকী দিতে থাকলেন তখন আপনার মহানুভবতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার কথা অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের নির্দেশ প্রদান করলেন দেশত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে। হে সম্রাট! আমরা আপনার স্বহৃদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষণ্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজ্জাশী বললেন 'জী হ্যাঁ" ।

নাজ্জাশী বললেন, 'তা হলে আমার সামনে কিছু উপস্থান করুন।

জা'ফর (رضي الله عنه) আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় ভাবগদগদ চিত্তে সুরায়ে মরিয়মের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন :

﴿كهيعص﴾

নাজ্জাশী আল্লাহর বাণীর আসমানী এলহাম এবং আমির ঝংকার ও সুরধারায় এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাঁড়ি ভিজে গেল। জাফরের তেলওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (عليه السلام)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশী আমর বিন আস এবং আবদুল্লাহ বিন রাবিয়াহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমার্পণ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোন কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট থেকে এ নির্দেশ লাভের পর তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁর দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। আদম সন্তানদের গোমরাহ করার ব্যাপারে আযাযীল শয়তান যেমন একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে এরাও তেমনি একটি কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় অন্য কৌশল প্রয়োগের ফন্দি ফিকির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে আমর বিন আস আবদুল্লাহ বিন রাবিয়াকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল এদের সম্পর্কে এমন প্রসঙ্গ নিয়ে আসব যা এদের জীবিত থাকার মূল কর্তন করে ফেলবে। আর না হয়, এদের ব্যাপারে এমন মন্ত্রের অবতারণা করব যাতে এদের মূল কর্তিত হয়ে এবং সজীবতা ও সতেজতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে আবদুল্লাহ বিন রাবিয়া বললেন, 'না-না, এমনটি করা সমীচীন হবে না। কারণ, এরা যদিও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তবুও এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা আমাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোক এবং আত্মীয়-স্বজনও বটে।

কিন্তু আমর বিন আস একথার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে স্বীয় মতের উপর অটল রইলেন।

পরের দিন পুনরায় নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে, আমর বিন আস বললেন, 'হে সম্রাট! এরা ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলেন যা কেউই কোন দিন বলেনি। আপনি ওদের কাছ থেকে এটা জেনে নিয়ে এর প্রতিকার করুন।'

একথা শোনার পর সম্রাট নাজ্জাশী পুনরায় মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে এসে উপস্থিত হলে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলিমগণ কি ধারণা পোষণ করেন তা তিনি জানতে চাইলেন। সম্রাটের মুখ থেকে এ কথা শুনে মুসলিমগণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হলেন। কারণ ঈসা (ﷺ) সম্পর্কে খ্রীষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে তত্ত্বগত মত পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টানগণ বলেন মসীহ (জেসাস) আল্লাহর পুত্র। কিন্তু পার্থক্য হেতু মুসলিমগণ বলেন ঈসা (ﷺ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তত্ত্বগত এ পার্থক্য হেতু মুসলিমদের সংশয় এ কারণে যে, এ কথা বললে সম্রাট নাজ্জাশী যদি বা বীরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহলে মুসলিমদের জন্য তা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেটা ছিল নেহাৎই একটা ক্ষণিকের ব্যাপার। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আস্থাশীল দৃঢ়চিত্তে মুসলিমগণ পরক্ষণেই মনস্থির করে ফেললেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন সেটাই হবে তাঁদের মূলমন্ত্র এবং সেটাই হবে তাঁদের বক্তব্য তাতে ভাগ্যে যা ঘটবে ঘটুক।

নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে জাফর বললেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা (ﷺ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁরা মা বিবি মরিয়ম ছিলেন সতী-সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উঁচু দরজার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কুমারী মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়।'

এ কথা শ্রবনেবর পর নাজ্জাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা (ﷺ)-এর চাইতে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।' এ প্রেক্ষিতে পুরোহিতগণও 'হুঁ' 'হুঁ' বলে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

নাজ্জাশী বললেন, 'হ্যাঁ', এখন তো তোমরা হাঁ হুঁ বলে সমর্থন জ্ঞাপন করবেই।'

তারপর নাজ্জাশী মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা নির্ভয়ে, শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আমার রাজ্যে বসবাস কর। যে কেউ তোমাদের উপর অন্যায় করবে তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।'

এর পর তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এই কুরাইশ দূতদের আনীত উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও। উপঢৌকনে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেন তখন আমার নিকট থেকে উপঢৌকন কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। সে ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে কিভাবে আমি উৎকোচ গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে আমি কোন লোকের কোন কথা গ্রহণ করতে পারি না।'

এ ঘটনার বর্ণনাকারিনী উম্মু সালমা বলেছেন, এরপর প্রত্যাখ্যাত উপঢৌকন সহ কুরাইশ দূতগণ চরম বেইজ্জতির সঙ্গে নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমরা তাঁর ছত্রছায়ায় সম্মানের সঙ্গে তার রাজ্যে অবস্থান করতে থাকলাম।[১]

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন চরিতকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নাজ্জাশীর দরবারে আমর বিন আসের উপস্থিতির ঘটনাটি সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের পর। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আমর বিন আস দু'দফা নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর নাজ্জাশীর দরবারে আমর বিন আসের উপস্থিতি সূত্রে সম্রাট নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথনের উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার হুবহু রয়েছে। অধিকন্তু ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশীর দরবারে আমর বিন আসের উপস্থিতির কথা বলা

---

[১] ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৪-৩৩৮ হতে সংক্ষিপ্ত।

হয়েছে এবং ঐ একই প্রশ্নোত্তরের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কাজেই, উপরিএ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের প্রেক্ষাপটে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিমদের ফেরত আনার জন্য আমর বিন আস মাত্র একবার নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছিলেন এবং ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আবাসিনিয়ায় হিজরতের পর পরই।

যা হোক মুশরিকগণের চাতুর্য শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হল অকৃতকার্যতায় এবং তাঁরা এটাও উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা কিংবা তাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে স্বদেশভূমির বাইরে সাফল্য লাভের কোনই সম্ভবানা নেই। কাজেই তাদের প্রচার-সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ করতে হলে কিংবা শায়েস্তা করতে হলে স্বদেশের সীমনার মধ্যেই তা করতে হবে। অধিকন্তু, মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের মন-মানসিকতা অনেক বেশী মারমুখী হয়ে উঠল। তারা এটাও উপলব্ধি করল যে, দশটি খুব ছোট হলেও কোনক্রমেই এদের অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করা চলবে না। তাছাড়া ষ্ট্রাটেজী বা কর্মকৌশল হিসেবে তাঁরা এটাও স্থির করলেন যে, এদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হলে হয় বল প্রয়োগ করে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রচারাভিযান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে আর না হয় তাঁর অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ, মুহাম্মদ ﷺ-এর অভিভাবক ছিলেন আবু তালিব যিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মুশরিকগণের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন আবু তালিব যিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চূড়ান্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থাবলম্বনের চাইতে আবু তালিবের সঙ্গে কিছু কড়া কথাবার্তা বলার সিদ্ধান্তকেই তাঁরা প্রাধান্য দিলেন।

আবু তালিবের প্রতি কুরাইশগণের ধমক (قريش يهددون أبا طالب) :

আবু তালিবের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কুরাইশ প্রধানগণ আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আবু তালিব! আপনি আমাদের মাঝে মান-মর্যাদার অধিকারী একজন বয়স্ক ব্যক্তি। আমরা ইতোপূর্বে আপনার নিকট আবেদন করেছিলাম যে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে নিন্দাবাদ করা থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু আপনি তা করেন নাই। আপনি মনে রাখবেন, আমরা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনা যে আমাদের পিতা পিতামহ এবং পূর্ব পুরুষদের গালি-গালাজ করা হোক, আমাদের বিবেককে নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করা হোক এবং আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করা হোক। আমরা আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি হয় আপনি তাকে সে সব থেকে নিবৃত্ত রাখুন, নচেৎ আমাদের দু'দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতেই থাকবে।'

কুরাইশ প্রধানগণের এমন কঠোর বাক্য বিনিময় এবং আস্ফালনে আবু তালিব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সেই মুহূর্তে তাঁর কর্তব্য স্থির করতে না পেরে নবী করীম ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন। চাচার আহ্বানে নবী কারীম ﷺ সেখানে উপস্থিত হলে আবু তালিব তাঁর নিকট কুরাইশ প্রধানগণের আলোচনা এবং আচরণ সম্পর্কে স্ববিস্তার বর্ণনা করার পর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বাব! একটু বিচার বিবেচনা করে কাজ করো। যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই সে ভার আমার উপর চাপিয়ে দিও না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ধারণা করলেন, মানবকুলের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সহায় চাচাও বোধ হয় আজ থেকে তাঁর সঙ্গে পরিত্যাড় করলেন এবং তাঁকে সাহায্য দানের ব্যাপারে তিনিও বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। তিনি এটাও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, আজ থেকে তিনি এক নিদারুণ সংকটে নিপতিত হতে চললেন। তবুও আল্লাহ তা'আলার উপর অবিচল আস্থা রেখে তিনি বললেন,

(يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر — حتى يظهره الله أو أهلك فيه — ما تركته)

"চাচাজান, আল্লাহর শপথ! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয়

আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু চাচাজান! আপনি অবশ্যই জানবেন যে, মুহাম্মদ ﷺ কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।'

স্বজাতীয় এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নির্বুদ্ধিতা, হঠকারিতা এবং পাপাচার ব্যথিত-হৃদয় নবী ﷺ-এর নয়নযুগলকে বাষ্পাচ্ছন্ন করে তুলল। তিনি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে ভবিষ্যতের দিনগুলো তাঁর জন্য আরও কঠিন হবে এবং আরও ভয়াবহতা এবং কঠোরতার সঙ্গে তাঁকে জন্য আরও কঠিন হবে এবং আরও ভয়াবহতা এবং কঠোরতার সঙ্গে তাঁকে মোকাবিলা করে চলতে হবে। তাঁর নয়ন যুগলে অশ্রু কিন্তু অন্তরে অদম্য সাহস। এমন এক মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি চাচা আবু তালিবের সম্মুখ থেকে রেরিয়ে এলেন।

তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের এ অসহায়ত্ব ও মানসিক অশান্তিতে আবু তালিবের প্রাণ কেঁদে উঠল। পরক্ষণেই তিনি তাঁকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন। যখন নবী কারীম ﷺ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র! নির্দ্বিধায় নিজ কর্তব্য পালন করে যাও। আল্লাহর দিব্য করে বলছি আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করব না।'[১] তারপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতার চরণগুলো আবৃত্তি করলেন ঃ

والله لن يصـــلوا إليك بجَمْعـــهِم ** حتى أُوَسَّدَ في التـــــراب دفيـــنًا

فاصدع بأمرك ما عليك غَضَاضَة ** وابْشِـــرْ وقَرَّ بذاك منـــك عيـــونًا

অর্থ ঃ 'আল্লাহ চান তো তারা স্বীয় দলবল নিয়ে কখনই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না আমি সমাহিত হয়ে যাব। তুমি তোমার দ্বীনী প্রচার-প্রচারণা কর্মকাণ্ড যথাসাধ্য চালিয়ে যাও তাতে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি আসবে না। তুমি খুশি থাক এবং তোমার চক্ষু পরিতৃপ্তি হোক।'[২]

পুনরায় আবু তালিব সমীপে কুরাইশগণ (قريش بين يدى أبي طالب مرة أخرى) :

বিগত দিবসের চড়া-কড়া কথা সত্ত্বেও কুরাইশগণ যখন দেখল যে মুহাম্মদ ﷺ বিরত থাকা তো দূরের কথা, আরও জোরে সোরে প্রচার-প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন এটা তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে, আবু তালিব মুহাম্মদ ﷺ-কে পরিত্যাগ করবেন না। এ ব্যাপারে তিনি কুরাইশগণ হতে পৃথক হয়ে যেতে এমন কি তাদের শত্রুতা ক্রয় করতেও প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু তবুও ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়। চড়া কড়া কথা বার্তা এবং যুদ্ধের হুমকী দিয়েও যখন তেমন কিছুই হল না তখন একদিন যুক্তি পরামর্শ করে অলীদ বিন মুগীরার সন্তান ওমারকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবু তালিব! এ হচ্ছে কুরাইশগণের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর এবং ধামীন যুবক। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুণ। এর শোনিতপাতের খেসারত এবং সাহয্যের আপনি অধিকারী হবেন। আপনি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিন। এ যুবক আজ হতে আপনার সন্তান বলে গণ্য হবে। এর পরিবর্তে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন। সে আপনার ও আমাদের পিতা, পিতামহদের বিরোধিতা করছে, আমাদের জাতীয় একতা এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে এবং সকলের জ্ঞানবুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতার আবরণে আচ্ছাদিত করছে। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এক ব্যক্তির বিনিময়ে এক ব্যক্তিই যথেষ্ট।'

প্রত্যুত্তরে আবুতালিব বললেন, 'তোমরা যে কথা বললে এর চাইতে জঘন্য এবং অর্থহীন কথা আর কিছু হতে পারে কি? তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে এ উদ্দেশ্যে দিচ্ছ যে আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে লালন-পালন করব আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দিব এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! কখনোই এমনটি হতে পারবে না।'

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৫-২৬৬পৃঃ।

[2] মোখতা সারুস সীরাহ পৃঃ ৬৮।

এ প্রেক্ষিতে নওফাল বিন আবদে মানাফের পুত্র মুতয়েম বিন আদী বলল ঃ 'আল্লাহর কসম হে আবু তালিব! তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোকজন তোমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা সুলভ কথাবার্তা বলছে, কাজকর্মের যে ধারা পদ্ধতি তোমার জন্য বিপজ্জনক তা থেকে তোমাকে রক্ষার প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। কিন্তু আমি যা দেখছি তাতে আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি তাদের কোন কথাকেই তেমন আমল দিতে চাচ্ছনা।'

এর জবাবে আবু তালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা আমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা প্রসূত কোন কথাবার্তাই বলো নাই। বরং তোমরা আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে আমার বিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছ এবং বিরুদ্ধ বাদীদের সাহার্যাথে কোমর বেঁধে লেগেছে। তবে ঠিক আছে তোমাদের যেটা করণীয় মনে করবে তাইত করবে।'[1]

আলোচ্য জীবন চরিতের মূল উৎসবের ভিতরে বিবক্ষমান বিষয় দুটো আলোচনার নির্দিষ্ট সময় পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি সূত্রে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ দুটো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষের মধ্যভাগে এবং উভয় আলোচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল সংক্ষিপ্ত।

নবী কারীম ﷺ হত্যার ষড়যন্ত্র (فكرة الطغاة في إعدام النبي ﷺ) :

উপরি উল্লেখিত দু'দফা আলোচনায় কুরাইশগণের অকৃতকার্যতার কারণে তাঁদের অন্যায় অত্যাচার ও উত্তেজনার মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং অত্যাচারের ধারা ক্রমেই কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকল। সেই সময়ই চরম উগ্রপন্থী কুরাইশগণের কিছু সংখ্যক লোকের মনে একটা নরকীয় চিন্তা ভাবনার সূচনা ও আনাগোনা চলতে থাকল। নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করবে তৌহিদী ধ্যান ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য। কিন্তু এমন এক অত্যন্ত নাজুক এবং বিপজ্জনক সময়ে আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত হিসেবে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং ওমর বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় মুসলিমদের শক্তিবৃদ্ধি পেল অন্যদিকে তেমনি আবার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় মুসলিমদের শক্তিবৃদ্ধি পেল অন্যদিকে তেমনি আবার মুশরিকগণের শক্তিও কিছুটা খর্ব হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অত্যাচারের তীব্রতা প্রশমিত হল না। অত্যাচারে অত্যাচারে কিভাবে তাঁরা মুসলিমদের জর্জরিত এবং অতীষ্ট করে তুলেছিল তার অসংখ্য প্রমাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখিত হল ঃ

একদা আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ আমি ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم:١] ও ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ﴾ [النجم:٨] এ আয়াত দু'টুকে অস্বীকার করছি। এর পরই সে নবী করীম ﷺ-কে কষ্ট দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। সে জামা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলল এবং তাঁর পাক মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রহমতে থুথু সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে নাই। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

(اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا من كِلَابِكَ)

'হে আল্লাহ! তোমরা কুকুরগুলোর মধ্য থেকে এর জন্য একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও।"

নবী করীম ﷺ-এর দোওয়া আল্লাহর সমীপে গৃহীত হল এবং এভাবে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিছু সংখ্যক কুরাইশ লোকজনের সঙ্গে একদফা উতায়বা বিদেশ গেল। যখন তারা শামরাজ্যের জারকা নামক স্থানে শিবিরস্থাপন করল তখন রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে তাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকল। ওকে দেখেই ওতায়বা ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, 'হায়! হায়!, আমার ধ্বংস! আল্লাহর শপথ, সে আমাকে খেয়ে ফেলবে। এ মর্মেই মুহাম্মদ ﷺ আমার ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন। দেখ আমি শাম রাজ্যে অবস্থান করছি অথচ তিনি মক্কা থেকেই আমাকে হত্যা করছেন।'

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৬-২৬৭ পৃঃ।

উতায়বার এ কথা শ্রবণের পর তার সঙ্গী সাথীরা সাবধানতা অবলম্বণের জন্য তাকে তাদের মধ্যস্থানে শুইয়ে দিল যাতে বাঘ এসে সহজে তার নাগাল না পায়। কিন্তু গভীর রাতে সেখানে বাঘ এসে সকলকে পাশ কাটিয়ে সোজা উতায়বার নিকটে যায় এবং তার মাথাটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়।[১]

এক দফা ওকবা বিন আবি মুয়াইত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদারত ছিলেন তখন তাঁর ঘাড় এত জোরে পদতলে পিষ্ঠ করল যে মনে হল তাঁর অক্ষিগোলক দুটো তখনই অক্ষিপট থেকে বেরিয়ে আসবে।[২]

ইবনে ইসহাকের এক দীর্ঘ বর্ণনায় চরমপন্থী কুরাইশগণের এরূপ দুরভিসন্ধির আভাষ পাওয়া যায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এ বর্ণনা সূত্রে বলা হয়েছে যে, কুরাইশগণকে লক্ষ্য করে এক দফা আবু জাহল বলল ঃ

"কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনার সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের ধর্মে কলঙ্ক রটাচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষের নিন্দা করছে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে খাটো বলে রটনা করছে এবং দেবদেবীগণের অবমাননা করছে। এ সব কারণে আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি যে, আমি এক খণ্ড ভারী এবং সহজে উঠানো সম্ভব এমন পাথর নিয়ে বসব এবং মুহাম্মদ ﷺ যখন সেজদায় যাবে তখন সেই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করে ফেলব। এখন এ অবস্থায় তোমরা আমাকে এক অসহায় ছেড়ে দাও, আর না হয় সাহায্য কর। বনু আবদে মানাফ এর পর যা চাই তা করুক।' উপস্থিত লোকেরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি যা করার ইচ্ছা করেছে তার করে ফেল।'

সকাল হলে আবু জাহল তা ঘোষনণার অনুরূপ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যথা নিয়মে আগমন করলেন এবং নামাযে রত হলেন। কুরাইশগণও সেখানে উপস্থিত হয়ে আবু জাহলের কথিত কাণ্ড দেখার জন্য অপেক্ষামান রইল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গমন করলেন তখন আবু জাহল পাথর উঠিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু নিকটে পৌঁছিয়া পরাস্ত সৈনিকের মতো স্ববেগে পশ্চানুপসরণ করল। এ সময় তাকে অত্যন্ত বিবর্ণ এবং ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। তাই দুই হাত পাথরের সঙ্গে শক্তভাবে চিমটিয়ে লেগে গিয়েছিল। পাথরের গা থেকে হাত ছাড়তে তাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে এবং বেগ পেতে হয়েছিল।

এ দিকে কুরাইশগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক দ্রুত তার নিকট এগিয়ে আসে এবং বলতে থাকে, 'আবুল হাকাম! ব্যাপারটি হল কি? কিছুই যেন বুঝে উঠছি না।'

সে বলল, 'আমি রাত্রিবেলা যা বলেছিলাম তা করার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর নিকটে গিয়ে পৌঁছিলাম তখন একটি উট আমার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। হায় আল্লাহ! কখনো আমি এমন মস্তক, এমন ঘাড় এবং এমন দাঁত বিশিষ্ট উট দেখি নি। মনে হল সে যেন আমাকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'উষ্ট্রের রূপ ধারণ করে সেখানে ছিলেন জিবরাঈল (عليه السلام)। আবু জাহল যদি আমার নিকট যেত তাহলে তার উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়ে যেত।[৩]

এর পর আবু জাহল এমন একটি গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলল যা হামযার ইসলাম গ্রহণের মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়াল। ঘটনার বিরবণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

অন্যান্য কুরাইশ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কেও সত্যিকারভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাদের অন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যেমনটি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস হতে ইবনে ইসহাক তাঁর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে,

---

[1] **শায়খ** আবদুল্লাহ, মুখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১৩৫, ইস্তিয়ার, এসাবাহ, দালায়েনুন্নবুয়ত, রওযুল আনাফ।

[2] **প্রাগুক্ত**/ মুখতাসারুস সীরাহ ১১৩ পৃঃ।

[3] **ইবনে** হিলমা ১ম খণ্ড ২৯৮-২৯৯ পৃঃ।

এক দফা কুরাইশ মুশরিকগণ কা'বার 'হাতীমে' সম্মিলিতভাবে অবস্থান করছিল। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। আলোচানার এক পর্যায়ে তারা বলল, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছি তার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতই এর ব্যাপারে আমরা বড়ই ধৈর্য ধারণ করেছি।'

এ ধারায় যখন তাদের কথোপকথন চলছিল তখন কিছুটা যেন অপত্যাশিতভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগমনের পর সর্ব প্রথম তিনি হজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এ সব করতে গিয়ে তাঁকে মুশরিকগণের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হল। এ অবস্থায় কিছু বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে তারা তার প্রতি কটাক্ষ করায় নবী ﷺ-এর মনে যে প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হল তার বহিঃপ্রকাশ তাঁর চেহারা মুবারকে আমি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলাম। এর পর দ্বিতীয় দফায় তিনি যখন সেখানে গেলেন তখনো মুশরিকগণ অনুরূপভাবে তাঁকে বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে ভর্ৎসনা করল। আমি এবারও তাঁর মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তারপর তৃতীয় দফায় তিনি সেখানে গেলে এবারও তারা পূর্বের মতো বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলল। এবার নবী কারীম ﷺ সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন,

(أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ)

"হে কুরাইশগণ! শুনছ? সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি তোমাদের নিকট কুরবাণীর পশু নিয়ে এসেছি।

তাদের প্রতি নবী ﷺ-এর এ সম্বোধন এবং কথাবার্তা তাদেরকে এতই প্রভাবিত করে ফেলল (তাদের উপর মূর্ছা পাওয়ার মতো অবস্থা এসে পড়ল) এবং এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে গেল যে তাঁদের মনে হতে লাগল যেন প্রত্যেকের মাথার উপর চড়ুই বসে রয়েছে। এমন কি ঐ দলের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সব চাইতে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল সেও যেন খুব ভাল হয়ে গেল এবং পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা শুরু করল। অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলতে থাকল, 'আবুল কাশেম! প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কসম! আপনি কখনই জ্ঞানহীন ছিলেন না।'

দ্বিতীয় দিনেও তারা সেখানে একত্রিত হয়ে তাঁর সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় রত ছিল এমন সময় তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এভাবে দেখে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। আমি লক্ষ্য করলাম তাদের মধ্য থেকে একজন তাঁর গলার চাদর ধরে নিল এবং বল প্রয়োগ শুরু করে দিল। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ক্রন্দরত অবস্থায় বলছিলেন,

أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ

অর্থ ঃ তোমরা লোকটিকে কি এ জন্য হত্যা করছো যে, তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ আমার প্রভূ?'

এর পর তারা নবী ﷺ-কে ছেড়ে দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল।

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেছেন যে, 'এটাই ছিল সব চাইতে কঠিন অত্যাচার ও উৎপীড়ন যা আমি কুরাইশগণকে করতে দেখেছি।'[1] (সার সংক্ষেপ শেষ হল)।

সহীহ বুখারী শরীফে উরওয়া বিন জোবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত এক বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন যে,

"আমি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসকে মুশরিকগণ নবী ﷺ-এর উপর সব চাইতে কঠিন যে নিপীড়ন চালিয়েছিল, তা আমার সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, একদা নবী ﷺ কা'বা গৃহের 'হাতীমে' নামায পড়ছিলেন এমন সময় ওকবা বিন আবি মোয়াইত সেখানে আগমন করলেন।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৮৯-২৯০ পৃঃ।

তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েই নিজ কাপড় দ্বারা তাঁর গ্রীবা ধারণ করে অত্যন্ত জোরে চপেটাঘাত করলেন এবং গলা টিপে ধরলেন। এমন সময় আবু বকর সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ওকবার দু'কাঁধ ধরে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন,

أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ

অর্থ ঃ 'তোমরা লোকটিকে এ জন্যই হত্যা করছ যে, তিনি বলেছেন যে, আমার প্রভূ আল্লাহ।'[1]

আসমার বর্ণনায় অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকরের নিকট যখন এ আওয়াজ পৌঁছিল যে, 'আপন বন্ধুকে বাঁচাও' তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে বাহির হলেন। তাঁর মাথার উপর চারটি ঝুঁটি ছিল। যাবার সময় আবু বকর বলতে বলতে গেলেন তা,

أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ

অর্থ ঃ তোমরা লোকটিকে শুধু এ কারণে হত্যা করছ যে, তিনি বলেন যে, 'আমার প্রভূ আল্লাহ।'

এরপর মুশরিকগণ নবী করীম (ﷺ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যখন ফেরৎ আসলেন তখন তাঁর অবস্থাছিল এরূপ যে, আমরা তাঁর চুলের মধ্য থেকে যে ঝুঁটিটাই ধরছিলাম সেটাই আমাদের টানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল।[2]

হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ (إسلام حمزة رضي الله عنه) ঃ

মক্কার বিস্তৃত অঞ্চল অন্যায় ও অত্যাচারে ঘণকৃষ্ণ মেঘমালা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সেই মেঘ মালার মধ্য থেকে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুত চমকিত হওয়ার মজলুমদের পথ আলোকিত হল, হামযা মুসলিম হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত প্রাপ্তি ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষভাগ। সম্ভবতঃ তিনি যিলহজ্জ মাসে মুসলিম হয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা যাঁর উপর রহম করেন তাঁর পক্ষেই ইসলামের অমিয় ধারা থেকে এক আঁজলা পান করা সম্ভব হয়। যদিও হামযার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিও আল্লাহর তা'আলার খাস রহমতেরই ফলশ্রুতি তবুও তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। ঘটনাটি হচ্ছে এরূপ, এক দিবসে আবু জাহল সাফা পর্বতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নবী কারীম (ﷺ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবী (ﷺ)-কে দেখে অনেক কটু কাটব্য করল এবং অপমানসূচক কথাবার্তা বললে নবী কারীম (ﷺ) তার কথাবার্তার কোন উত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ পাথর তুলে নিয়ে নবীজী (ﷺ)-এর মাথায় আঘাত করল। এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকল। তারপর সে কা'বা গৃহের নিকটে কুরাইশগণের বৈঠকে গিয়ে যোগদান করল।

আবদুল্লাহ বিন জুদয়ানের একদাসী নিজগৃহ থেকে সাফা পর্বতের উপর সংঘটিত ঘটনাটি আদ্যপান্ত প্রতক্ষ করছিল। হামযা (রাঃ) মৃগয়া থেকে প্রর্তাবর্তন করা মাত্রই (তখনো তাঁর হাতে তীর ধনুক ছিল এমতাবস্থায় ঃ) সে তাঁকে আবু জাহলের অন্যায় অত্যাচার এবং নবী (ﷺ)-এর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারটি বর্ণনা করে শোনাল। ঘটনা শ্রবণকরা মাত্র তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কুরাইশগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মহাবীর এবং মহাবলশালী এক যুবক। এ মুহূর্তে বিলম্ব না করে তিনি এ সংকল্প বদ্ধ হয়ে ছুটে চললেন যে, যেখানেই আবু জাহলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হবে সেখানেই তিনি তার ভূত ছাড়াবেন। তিনি তার খোঁজ করতে করতে গিয়ে তাকে পেলেন মসজিদুল হারামে। সেখানে তিনি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ও হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ূ নিঃসরণকারী! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তুমি গালি দিয়েছ এবং পাথর দিয়ে আঘাত করেছ। অথচ আমি তার দ্বীনেই আছি।

---

[1] **সহীহ বুখারী** মক্কার মুশরিকগণের নবী (ﷺ)-এর প্রতি উৎপীড়ন অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৪৪।

[2] **শাইখ** আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১১৩।

এরপর তিনি কামানের দ্বারা তার মাথার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন যাতে সে আহত হয়ে গেল। এর ফলে আবু জাহলের বনু মখযুম ও হামযা -এর বনু হাশেম গোত্রদ্বয় এক অপরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আবু জাহল এভাবে সকলকে নিরস্ত করল যে, আবু উমারাকে যেতে দাও। আমি প্রকৃতই তার ভ্রাতুষ্পুত্র কে গালমন্দ এবং আঘাত দিয়েছি।[1]

প্রাথমিক পর্যায়ে হামযার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল কিছুটা যেন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আবেগের উৎস থেকে উৎসারিত। মুশরিকগণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কষ্ট দিত। এটা বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কাজেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো তার দুঃখ কষ্টের কিছু লাঘব হতে পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।[2] পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলাম প্রীতি জোরদার করে দেয়ায় তিনি দ্বীনের রশি মজবুত করে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানদের শক্তি এবং সম্মান দুই-ই বৃদ্ধি পেল।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ (إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه) :

অন্যায় অত্যাচারের বিস্তৃতি পরিমণ্ডলে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার বুক চিরে আরও একটি জ্যোতিষ্মান বিদ্যুতের চমকে আরব গগণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বীপুরুষ ওমর বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয়। নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষে[3] হামযা -এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর। নবী কারীম ওমর -এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ বিন উমর হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারাণী ইবনে মাসউদ এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নবী বলতেন :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلٍ

'হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।'

(আল্লাহ এ প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং ওমর মুসলিম হয়ে গেলেন)। এ দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট ওমর অধিক প্রিয় ছিলেন।[4]

ওমর -এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর অন্তরে ইসলাম ধীরে ধীরে স্থান লাভ করতে থাকে। ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার সংক্ষেপ তুলে ধরার পূর্বে তাঁর মেজাজ এবং আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা সঙ্গত বলে মনে করি।

ওমর তাঁর উগ্র মেজায, রূঢ় প্রকৃতিত এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমগণকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁর হাতে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাষ যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো যে, ভাবাবেগের দু'বিপরীত মুখী শক্তি যেন তাঁর অন্তর রাজ্যে পরস্পর পরস্পরে সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে

---

[1] শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ঃ মোখতারুস সীরাহ পৃঃ ৬৬, আলামা মানসুরপুরী ঃ রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬৮ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৯১-২৯২ পৃঃ।

[2] শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১০১।

[3] ইবনুল জওযী লিখিত তারীখে ওমর বিন খাত্তাব পৃঃ ১১।

[4] তিরমিযী আরওয়াবুল মানাকের আবীহাফস ওমর বিন খাত্তাব ২য় খণ্ড ২০৯ পৃঃ।

তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। অধিকন্তু কোন কোন সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মতো তাঁর মনে তত্ত্ব-চিন্তার উদ্রেকও হতো। তিনি আপন খেয়ালে চিন্তা করতে থাকতেন নানা বিষয়, নানা কথা। কোন কোন সময় এটাও তাঁর মনে হতো যে, ইসলাম যে পথের সন্ধান দিচ্ছে, যে পথের চলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে সম্ভবতঃ সেটাই উত্তম ও পবিত্রতম পথ। এ জন্য প্রায়শঃই তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতেন, কোন কোন সময় বিচলিত বোধ করতেন, কখনো বা নিরুৎসাহিত বোধ করতেন।[1]

ওমর (رضي الله عنه)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার সংক্ষেপ হচ্ছে এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন এবং কা'বা গৃহেরপর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নবী কারীম ﷺ সেই সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরা 'আলহাক্কা" তেলওয়াত করছিলেন। ওমর (رضي الله عنه) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তেলওয়াত শ্রবণ করলেন এবং এর ঝংকার, বাক্য বিন্যাস ও সূর-মাধুর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন।

ওমরের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ [الحاقة: ٤٠، ٤١]

"যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল (আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪০-৪১)

ওমর (رضي الله عنه) বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন একজন মন্ত্রতন্ত্র গনৎকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মদ ﷺ তেলওয়াত করলেন ঃ

﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى آخر السورة [الحاقة: ٤٢، ٤٣]

"এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে সূরার শেষ পর্যন্ত তেলওয়াত করলেন এবং ওমর (رضي الله عنه) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে ওমর (رضي الله عنه) বলেছেন যে, 'সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।[2]

প্রকৃতপক্ষে, ওমর (رضي الله عنه)-এর অন্তর রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতানায় অজ্ঞতা প্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদ্দল প্রস্তরের মতো তাঁর মন-মস্তিষ্ককে এতই প্রভাবিত করে রেখেছিল যে ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। কাজেই, বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা সংস্কারকে জীইয়ে রাখার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি নগ্ন তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজ তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে

---

[1] শাইখ মুহাম্মদ গাযালী ঃ ফেকহুস সীরাহ ৯২-৯৩ পৃঃ। তিনি ওমর (رضي الله عنه)-এর মানসিকতার দু'বিপরীতমুখী ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

[2] ইবনে জাওযী তারীখে ওমর বিন খাত্তাব ৬ পৃঃ। ইবনে ইসহাক আতা এবং মোজাহেদ হতে একই রূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার শেষাংশ এটা হতে কিছুটা ভিন্ন। দ্রষ্টব্য সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৬ ও ৩৪৮ পৃঃ এবং ইবনে জওযী নিজেও যাবের (رضي الله عنه) হতে তাঁর মতই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর শেষাংশেও এ বর্ণনার বিপরীত আছে, দ্রঃ তারীখে ওমর বিন খাত্তাব ৯-১০ পৃঃ।

আকস্মিকভাবে নঈম বিন আবদুল্লাহ নাহহাম আদভী[1] কিংবা বনু যোহরা[2] কিংবা বনু মাখযুমের[3] কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে ওমর! কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।'

লোকটি বলল, 'মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করে বনু হাশেম ও বনু যোহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? ওমর বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ।

লোকটি বলল, 'ওমর! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।'

এ কথা শুনে ওমর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেয়ার মতো ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বার বিন আরাত্ত একটি সহীফার সাহায্যে সূরায়ে ত্ব-হা'র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বার তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বার (রাঃ) যখন ওমর (রাঃ)-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং ওমরের বোন ফাতেমা সহীফা খানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু ওমর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাব্বারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'

তাঁর বোন উত্তর করলেন, 'না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।

ওমর (রাঃ) বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা ওমর! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কি হবে?

এ কথা শোনা মাত্র ওমর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জোর করে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওমর (রাঃ) তাঁর বোনের গণ্ডদেশ এমন এক চপেটাঘাত করলে যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

يا عمر، إن كان الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله

"ওমর! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র ওমর (রাঃ)-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি।

বোন বললেন, 'তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। ওমর গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফা খানা হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম! তারপর সূরায়ে ত্ব-হা হতে পাঠ করলেন :

طه - مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ - إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ - تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى - الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ - لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ - وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ

---

[1] এ বর্ণনা হচ্ছে ইবনে ইসহাকের দ্রঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃঃ।

[2] এ বর্ণনা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত দ্রঃ ইবনে জওযী তারীখে ওমর বিন খাত্তাব পৃঃ ১০ এবং মোখতাসারুস সীরাহ আবদুল্লাহ রচিত ১০৩ পৃঃ।

[3] এ বিষয়টি ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, দ্রঃ মোখতাসারুস সীরাহ ১০২ পৃঃ।

وَأَخْفَى - اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى - إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى - فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى - إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى - إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي -) (سورة طه ١-١٤)

"১. ত্ব-হা-। ২. তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। ৩. বরং তা (নাযিল করেছি) কেবল সতর্কবাণী হিসেবে যে ভয় করে (আল্লাহ্কে)। ৪. যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে তা নাযিল হয়েছে। ৫. 'আরশে দয়াময় সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। ৬. যা আকাশে আছে, যা যমীনে আছে, যা এ দু'য়ের মাঝে আছে আর যা ভূগর্ভে আছে সব তাঁরই। ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল (তাহলে জেনে রেখ) তিনি গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয় জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। ৯. মূসার কাহিনী তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ১০. যখন সে আগুন দেখল (মাদ্ইয়ান থেকে মিসর যাওয়ার পথে), তখন সে তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি তাথেকে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলন্ত আগুন আনতে পারব কিংবা আগুনের নিকট পথের সন্ধান পাব। ১১. তারপর যখন যে আগুনের কাছে আসল, তাকে ডাক দেয়া হল, 'হে মূসা! ১২. বাস্তবিকই আমি তোমার প্রতিপালক, কাজেই তোমার জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছ। ১৩. আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, কাজেই তুমি মনোযোগ দিয়ে শুন যা তোমার প্রতি ওয়াহী করা হচ্ছে। ১৪. প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার 'ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত কায়িম কর'।' [ত্ব-হা (২০) : ১-১৪]

বললেন, 'এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকের মুহাম্মদ ﷺ-এর সন্ধান বল।'

ওমরের এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ওমর! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহল বিন হিশাম এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবুল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতের নিকটস্থ বাসভবনে অবস্থান করেছেন।'

খাব্বার (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর ওমর (রাঃ) তাঁর তরবারি খানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসভবনের পথ ধরে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ার সহ ওমর দণ্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে হামযা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, কি এমন হয়েছে?'

লোকজনেরা উত্তর দিলেন, 'ওমর বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

হামযা বললেন, 'ঠিক আছে। ওমর এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি ওমরের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

(أما أنت منتهيًا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟)

"ওমর! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?'

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

اللَّهُمَّ، هذا عمر بن الخطاب، اللَّهُمَّ أعز الإسلام بعمر بن الخطاب

"হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ ওমর বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুণ।' নবী ﷺ-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর ওমর (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।'

ওমর (রাঃ)-এর মুখ থেকে তৌহিদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থিত লোকজনেরা এত জোরে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন।[১] আরব মুলুকে এটা সর্বজন বিদিত বিষয় ছিল যে, ওমর বিন খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল। ইবনে ইসহাক নিজ সূত্রের ররাতে ওমরের বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন যে, 'যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন চিন্তা-ভাবন করতে থাকলাম যে, মক্কা, কোন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব চাইতে প্রভাবশালী শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে বললাম এ আবু জাহলই হচ্ছে তাঁর সব চাইতে বড় শত্রু। ততক্ষনাৎ তার গৃহে গমন করে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বাহির হয়ে এসে (খুশি আমদেদ, খুশ আমদেদ) বলে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল এবং বলল, 'কিভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?' প্রত্যুত্তরে কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি বললাম, 'তোমাকে আমি এ কথা বলতে এলাম যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র সে স্বশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আল্লাহর তোমার মন্দ করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছ সে সবেরও মন্দ করুন।[২]

ইমাম ইবনে জওযী ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যেত তখনই লোক তার পিছু ধাওয়া করত এবং তাকে মারধর করত। সেও তাদের পাল্টা মারধর করত। এ জন্য যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন আমার মামা আসী বিন হাশেমের নিকটে গেলাম এবং তাঁকে আমার মুসলিম হয়ে যাওয়ার খবর জানালাম। আমার কথা শোনামাত্রই সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারপর কুরাইশের একজন বড় প্রধানের বাড়িতে গেলাম (সম্ভবতঃ আবু জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এবং তাহাকেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করালাম কিন্তু সেও গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।[৩]

---

1 তারীখে ইবনে ওমর পৃঃ ৭, ১০, ১১। শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১০২-১০৩। সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৩-৩৪৬।

2 ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৯-৩৫০।

3 তারীখ ওমর বিন খাত্তাব পৃঃ ৮।

ইবনে হিশাম এবং ইবনে জওযী বর্ণনা করেছেন যে, যখন ওমর মুসলামান হলেন তখন তিনি জামীল বিন মা'মার জুমাহীর নিকট গেলেন। কোন কথা বা প্রচার করা কিংবা ঢোল শোহরত করার ব্যাপারে সে কুরাইশদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। ওমর তাকে বললেন যে, তিনি মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। এ কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে সে ঘোষণঅ করতে থাকল যে, খাত্তাবের পুত্র ওমর বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে। ওমর তাঁর পিছনেই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি এ বলে উত্তর দিলেন যে, 'এ মিথ্যা বলছ। আমি বেদ্বীন হই নি বরং মুসলিম হয়েছি।'

যাহোক, লোকজনেরা তাঁর উপর চড়াও হল এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে জনতা এবং অন্য পক্ষে ওমর মারপিট চলতে থাকল। এত সয় ধরে মারপিট চলতে থাকল যে, সেই অবস্থায় সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে পড়ল। ওমর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। লোকজন তাঁকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওমর বললেন, 'যা খুশী করো। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি সংখ্যায় তিন শত হতাম তাহলে মক্কায় তোমরা অবস্থান করতে না আমরা করতমা তা দেখাদেখি হয়ে যেত।[1]

এ ঘটনার পর মুশরিকগণ আরও ক্রোধান্বিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল এবং ওমর -এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যেমনটি সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে ইবনে ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মুশরিকগণের মনের আশঙ্খায় ওমর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অবস্থান করতেঠিলেন এমন সময় আবু আমর আস বিন ওয়ায়েল সাহমী সেখানে আগমন করল। সে ইয়েমেন দেশের তৈরী নকশাদার জোড়া চাদর এবং রেশম দ্বারা সুসজ্জিত চমকদার জামা পরিহিত অবস্থায় ছিল। তার সম্পর্ক ছিল সাহম গোত্রের সাথে এবং জাহেলিয়াত যুগে এ গোত্র বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্য করবে বরে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার'?

ওমর বললেন, 'আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি এবং এ জন্যই আপনার জাতি আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।

আস বলল, 'তা সম্ভব নয়।'

আসের এ কথা শুনে আমি মনে কিছুটা শান্তি পেলাম, কিছুটা তৃপ্তি অনুভব করলাম।

তারপর আস সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহন করল। তখন জনতার ভিড়ে সমগ্র উপত্যকা গিজ গিজ করছিল।

আমজনতার অগ্রভাগে অবস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোথায় চলেছ?'

উত্তরে তারা বলল, 'আমরা চলেছি খাত্তাবের ছেলের একটা কিছু হাস্তনেস্ত করতে। কারণ, সে বেদ্বীন (বিধর্মী) হয়ে গিয়েছে।'

আস বলল, 'না সে দিকে যাবার কোন পথ নেই।'

এ কথা শুনা মাত্রই জনতা আর অগ্রসর না হয়ে তাদের পূর্বের স্থান অভিমুখে ফিরে গেল।[2]

ওমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকগণের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত হল। অপর পক্ষে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে আঁচ-অনুমান কিংবা কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে এর পাশাপাশি আলোচিত পরের ঘটনাটি থেকে। মুজাহিদ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, আমি ওমর বিন খাত্তাব -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কি কারণে লকব বা উপাধি 'ফারুক' হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমর তিনদিন পূর্বে হামযা মুসলিম হয়ে ছিলেন, তারপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, 'আমি যখন মুসলিম হলাম তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদি জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?

[1] **তারীখ ওমর** বিন খাত্তাব পৃঃ ৮ ও ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৮-৩৪৯ পৃঃ।

[2] **ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড** ৩৪৯ পৃঃ।

নবী (ﷺ) ইরশাদ করলেন, 'আবশ্যই! সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদি জীবিত থাক কিংবা মৃত্যু মুখে পতিত হও হক বা সত্যের উপরেই তোমরা রয়েছ।'

ওমরের বর্ণনা ঃ 'তখন আমি সকলকে লক্ষ্য করে বললাম যে, গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব।

তারপর আমরা দুইটি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুই সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির শিরভাগে ছিলেন হামযা (رضي الله عنه) আর অন্য সারির শিরঃভাগে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় চাকীর আটার মতো হালকা ধূলি কনা উড়ে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম। ওমর (رضي الله عنه) বলেছেন, 'কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযাকে মুসলিমদের সঙ্গে দেখল তখন মনে মনে তার এত আঘাত প্রাপ্ত হল যে, এমন আঘাত ইতোপূর্বে আর কখনো পায়নি। সেই দিনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার উপাধি দিয়েছিলেন 'ফারুক'"[১]

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত ওমর (رضي الله عنه) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ততদিন পর্যন্ত আমরা কা'বাগৃহের নিকট নামায আদায় করতে সাহস করিনি।[২]

সোহাইব বিন সেনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, ওমর (رضي الله عنه) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন থেকে ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ট থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সে দিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের আহ্বান জানানো সম্ভব হল।

পূর্বের সূত্র ধরেই বলা হয়েছে, 'আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বৈঠক করলাম এবং আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করলাম। যারা আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করল আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদও করলাম।[৩]

ইবনে মাসউদের বর্ণনা ঃ 'যখন হতে ওমর (رضي الله عنه) মুসলিম হয়েছিলেন তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসাবাস করতে পেরেছিলাম।[৪]

রাসূলাহ (ﷺ) সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি (ﷺ مثل قريش بين يدي الرسول) ঃ

দু'জন সম্মানিত এবং প্রতাপশালী বীর অর্থাৎ হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং ওমর বিন খাত্তাব (رضي الله عنهما)-এর মুসলিম হওয়ার পর থেকে মুশরিকগণের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং মুসলিমদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে পাশবিকতা ও মাতলামীর স্থলে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর প্রচার এবং তাবলীগের কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতা অবলম্বনের পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে সদাচার করা এবং অর্থ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব, নারী ইত্যাদি যোগান দেয়ার প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁকে প্রচার কাজ থেকে নিবৃত্ত করার এক নয়া কৌশল প্রয়োগের মনস্থ করে। কিন্তু সেই হতভাগ্যেদের জানা ছিল না যে, সমগ্র পৃথিবীর যার উপর সূর্য উদিত হয় দাওয়াত ও তাবলীগের তুলনায় খড় কুটারও মর্যাদা বহন করে না। এ কারণে এ পরিকল্পনায়ও তাদের অকৃতকার্য ও বিফল হতে হয়।

ইবনে ইসহাক ইয়াযিদ বিন যিয়াদের মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন কা'বা কুরাযীর এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, আমাকে বলা হয় যে, উতদাবিন রাবিয়াহ যিনি গোত্রীয় প্রধান ছিলেন, একদিন কুরাইশগণের বৈঠকে বললেন, 'ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসজিদুল হারামের এক জায়গায় একাকী অবস্থান করছিলেন।' আমি তাদের সম্বোধন জানিয়ে বললাম, 'হে কুরাইশগণ! আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে কেনই বা কথোপকথন করব না এবং তাঁর সামনে

---

[1] ইবনে জওযী- তারীখে ওমর বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) ৬-৭ পৃঃ।

[2] শাইখ আবদুল্লাহ - মোখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১০৩।

[3] ইবেন জওযী, তারীখে ওমর বিন খাত্তাব পৃঃ ১৩।

[4] সহীহ বুখারীর ওমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪৫ পৃঃ।

কিছু উপস্থাপন করব না। হতে পারে যে, তিনি আমাদের কোন কিছু গ্রহণ করে নিবেন। তবে যা কিছু তিনি গ্রহণ করবেন তাঁকে তা প্রদান করে আমরা তাঁকে তাঁর প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত করে দেব।' এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন হামজা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবং মুশরিকগণ দেখছে যে, মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুশরিকগণ বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আপনি যান এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলুন। এরপর উতবা সেখান থেকে উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসল এবং বলল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের গোত্রে তোমার মর্যাদা ও স্থান যা আছে এবং বংশীয় যে সম্মান আছে তা তোমার জানা আছে। এখন তুমি নিজ গোত্রের নিকট এক বড় ধরণের ব্যাপার নিয়ে এসেছ যার ফলে গোত্রভূক্ত বিভিন্ন লোকজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ওদের বিবেক-বুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতার সম্মুখীন করে ফেলেছে। তাদের উপাস্য প্রতিমাদের এবং তাদের ধর্মের দোষত্রুটি প্রকাশ করে মৃত পূর্ব পুরুষদের 'কাফের' সাব্যস্ত করছ। এ সব নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমার নিকট কয়েকটি কথা পেশ করছি। তার প্রতি মনোযোগী হও। এমনটি হয়তো বা হতেও পারে যে, কোন কথা তোমার ভাল লাগবে এবং তুমি তা গ্রহণ করবে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আবুল ওয়ালীদ বল আমি তোমার কথায় মনোযোগী হব।'

আবুল ওয়ালীদ বলল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র! এ ব্যাপারে তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ এবং মানুষকে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছ তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, এর মাধ্যমে তুমি কিছু ধন-সম্পদ অর্জণ করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ একত্রিত করে দেব যে, তুমি আমাদের সব চাইতে অধিক ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে, কিংবা যদি তুমি এটা চাও যে, মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমার কাম্য তাহলে আমাদের নেতৃত্ব তোমার হাতে সমর্পন করে দিব এবং তোমাকে ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান কিংবা মীমাংসা আমরা করব না, কিংবা যদি এমনও হয় যে, তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত করে দিচ্ছি। তাছাড়া তোমার নিকট যে আগমন করে সে যদি জিন কিংবা ভূত-প্রেত হয় যাকে তুমি দেখছ অথচ নিজে নিজে তার কুপ্রভাব প্রতিহত করতে পারছ না তাহলে আমার তোমার চিকিৎসর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং তোমার পূর্ণ সুস্থতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন আমরাই তা করতে প্রস্তুত আছি, কেননা কখনো কখনো এমনও হয় যে, জিন-ভূতেরা মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে এবং এ জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনও হয়ে দাঁড়ায়।

উতবা এক নাগাড়ে এ সব কথা বলতে থাকল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে থাকলেন। যখন সে তার কথা বলা শেষ করল তখন নবী কারীম ﷺ বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে? সে বলল, 'হ্যাঁ'

নবী ﷺ বললেন, 'বেশ ভাল, এখন আমার কথ শোন।'

সে বলল, 'ঠিক আছে শুনব।'

নবী ﷺ বললেন,

﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ [فصلت:١: ٥].

অর্থ ঃ হা'মীম, এ বাণী কুরুণাময় দয়ালু (আল্লাহ) এর তরফ থেকে নাযিলকত্, এটা এমন একটি কেতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ কুরআন যা আরবী ভাষায় (অবতারিত), জ্ঞানী লোকদের জন্য (উপকারী)। (এটা) সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক কিন্তু অধিকাংশ লোকই মুখ ফিরিয়ে নিল। সুতরাং তারা শুনেই না। এবং তারা বলে যে, কথার প্রতি আপনি আমাদের ডাকেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত। **[ফুসসিলাত (৪১) : ১-৫]**

রাসূলুল্লাহ ﷺ সহ পাঠ করতে থাকেন এবং উতবা নিজ দু'হাত পশ্চাতে মাটির উপর রাখা অবস্থায় তাতে ভর দিয়ে শ্রবণ করতে থাকে। যখন নবী ﷺ সিজদার আয়াতের নিকট পৌঁছে গেলেন। তখন সিজদা করলেন এবং বললেন, আবুল ওয়ালীদ তোমাকে যা শ্রবণ করানোর প্রয়োজন ছিল তা শ্রবণ করেছ, এখন তুমি জান এবং তোমার কর্ম জান।

উতবা সেখান থেকে উঠে সোজা তার বন্ধুদের নিকট চলে গেল। তাকে আসতে দেখে মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করতে থাকল, আল্লাহর শপথ! আবুল ওয়ালীদ তোমাদের নিকট সেই মুখ দিয়ে আসছে না যে মুখ নিয়ে সে গিয়েছিল, তারপর আব্দুল ওয়ালিদ যখন তাদের নিকট এসে বসল তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'আবুল ওয়ালীদ! পিছনের খবর কি?'

সে বলল, 'পিছনের খবর হচ্ছে আমি এমন এক কথা শুনেছি যা কোনদিনই শুনি নি। আল্লাহর শপথ! সে কথা কবিতা নয়, যাদুও নয়। হে কুরাইশগণ! আমরা কথা মেনে নিয়ে ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। (আমার মত হচ্ছে) ঐ ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সে পৃথক হয়ে থেকে যাক। আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ থেকে যে বাণী শ্রবণ করলাম তদ্বারা অতিশয় কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি তাকে কোন আরবী হত্যা করে ফেলে তবে তো তোমাদের কর্মটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তি যদি আরবীদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রাধন্য বিস্তারে সক্ষম হয় তাহলে এর রাজত্ব পরিচালন প্রকৃত তোমাদেরই রাজত্ব হিসেবে গন্য হবে! এর অস্তিত্ব বা টিকে থাকা সব চাইতে বেশী তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

লোকেরা বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আল্লাহর কসম, তোমার উপরও তার যাদুর প্রভাব কাজ করেছে।'

উতবা বলল, 'তোমরা যাই মনে করনা কেন, তাঁর সম্পর্কে আমার যা অভিমত আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। এখন তোমরা যা ভাল মনে করবে, তাই করবে।[1]

অন্য এক বর্ণনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ যখন তেলাওয়াত আরম্ভ করেছিলেন তখন উতবা নীরবে শুনতে থাকে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ আয়াতে কারীমা পাঠ করেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت:١٣]

"এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল– আমি তোমাদেরকে অকস্মাৎ শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি- 'আদ ও সামূদের (উপর নেমে আসা) অকস্মাৎ-শাস্তির মত।' (ফুসসিলাত ৪১ : ১৩)

এ কথা শোন মাত্রই উতবা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এবং এটা বলে তার হাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখের উপর রাখল যে, আমি আল্লাহর মাধ্যম দিয়া এবং আত্মীয়তার প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়ে কথা বলছি যে, এমনটি যেন না করা হয়। সে এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল যে প্রদর্শিত ভয় যদি এসহে যায়। এরপর সে সমবেত মুশরিকগণের নিকট চলে যায় এবং তাদের সঙ্গে উল্লেখিত আলাপ আলোচনা করে।[2]

বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবকে একত্রী করণে আবু তালিব (أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب) :

অবস্থার গতি ধারায় কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী পরিবেশও পরিবর্তনের আভাস ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু আবু তালিবের ভয়-ভীতি তখনো ছিল প্রকট। মুশরিকগণের পক্ষ থেকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কে বিপদের সম্ভাবনায় তিনি তখনো বিচলিত বোধ করছিলেন। কারণ, মুশরিকগণ ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বাদানুবাদ করার পর চরম ব্যবস্থাবলম্বনের হুমকি দিয়েছিল। অধিকন্তু, উমারাহ বিন ওয়ালীদকে আবু তালিবের হাতে দিয়ে বিনিময়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার এক প্রস্তাবও তারা দিয়েছিল। আবু জাহল একটি বেশ বড় আকারের পাথরের আঘাত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথা চূর্ণ করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। ওকবা বিন আবি মুয়ায়েত তাঁর গলায় চাদর জড়িয়ে গলা টিপে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। খাত্তাবের ছেলে কোষমুক্ত

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৯৩-২৯৪।
[2] তাফসীর ইবনে কাসীর ৬/১৫৯-১৬১।

তরবারী হাতে তাঁকে হত্যা করতে গিয়েছিল। আবু তালিব যখন উল্লেখিত ঘটনাবলী-সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন তখন তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়ে যেত। এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে, মুশরিকগণ তাঁর অঙ্গীকার বিনষ্ট করার এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। ঐ অবস্থায় আল্লাহ না করুন যদি কোন মুশরিক আকস্মিকভাবে নবী ﷺ-কে আক্রমণ করে বসে তাহলে হামযা, ওমর কিংবা অন্য যে কোন ব্যক্তিত্ব হোক না কেন, তারা কি কাজে আসবে?

মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার ব্যাপারে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার কারণে আবু তালিব কখনো বিষয়টিকে হালকাভাবে নিতে পারেন নি। অধিকন্তু, একটি আয়াতে কারীমায় বিষয়টিকে প্রতি ইঙ্গিত থাকায় তিনি এর উপর আরও বেশী গুরুত্বারোপ করতে থাকেন। আয়াত কারীমাটি হচ্ছে,

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ [سورة الزخرف:]

"তারা কি (নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে কোন) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো আমিই নিয়ে থাকি (যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ যা চান তাই শেষে ঘটে)।' (আয-যুখরুফ ৪৩ : ৭৯)

এমন প্রশ্ন ছিল উপরিএ ঘটনাবলী প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবু তালিবের করণীয় কি ছিল?

তিনি যখন দেখলেন যে, কুরাইশগণ সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখন তিনি স্বীয় প্রতিতামহ আবদে মানাফের দু'পুত্র হাশেম ও মুত্তালেব বংশধারার পরিবার বর্গকে একত্রিত করেন। তারপর এ কথা বলে তাদের আহ্বান জানান যে, এতদিন পর্যন্ত তিনি এককভাবেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের দেখাশোনা এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে যেহেতু তাঁর পক্ষে এককভাবে আর সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সেহেতু সম্মিলিতভাবে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানালেন। আবু তালিবের এই অনুরোধ আরবী সম্প্রদায়িকতার আকর্ষণের প্রেক্ষিতে সেই দু'পরিবারের সকলেই তা মেনে নিলেন। কিন্তু আবু তালিবের ভাই আবু লাহাব তা গ্রহণ না করে কুরাইশ মুশরিকগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজকর্ম করা এবং তাদের সাহায্য করার কথা ঘোষণা করলেন।[১]

[১] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৯পৃঃ, শাইখ আবদুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১০৬ পৃঃ।

المقاطعة العامة
পূর্ণাঙ্গ বয়কট

মাত্র চার সপ্তাহ কিংবা তার চাইতেও কম সময়ের মধ্যে মুশরিকগণকে চারদফা প্রবল ঝাঁকুনির এবং ঘটনা প্রবাহে অপ্রত্যাশিত মোড় পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম দফায় হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ, দ্বিতীয় দফায় ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ, তৃতীয় দফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উভয় পক্ষের আংশিক গ্রহণ-বর্জন নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান। চতুর্থ দফায় বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম ও কাফির সকলের সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্যদানের অঙ্গীকার। এ সব কারণে মুশরিকগণ প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল এবং তাদের জন্য সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, তাদের কাছে তখন এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, যদি তার মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয় তবে তাঁর হেফাজতের জন্য মক্কা উপত্যকা মুশরিকগণের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এমন কি তারা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়েও যেতে পারে। এ কারণে তারা হত্যার পরিকল্পনা বর্জন করে উৎপীড়নের এমন এক কৌশল অবলম্বন করল যা ছিল এ পর্যন্ত পরিচালিত নির্যাতনের মধ্যে সব চাইতে লোম-হর্ষক।

অত্যাচার উৎপীড়নের অঙ্গীকার (ميثاق الظلم والعدوان) :

পূর্বোলিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুশরিকগণ 'মোহাসসাব' নামক উপত্যকায় খাইফে বনী কেননার ভিতরে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয় বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কুশলবিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে উঠাবসা, কথোপকথন মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনকিছুই করা চলবে না। হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যতদিন তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

মুশরিকগণ এ বর্জন বা বয়কটের দলিলস্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, তারা কখনো বনু হাশেমের পক্ষ হতে কোন সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে না, যে পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার জন্য মুশরিকগণের হাতে সমর্পন না করবে সে পর্যন্ত এই অঙ্গীকার নামা বলবৎ থাকবে।

ইবনে কাইয়ূমের বর্ণনা সূত্রে বলা হয়েছে যে, এ অঙ্গীকার পত্র খানা লিখেছিলেন মানসুর বিন ইকরামা বিন আমের বিন হাশেম। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেনে যে, এ অঙ্গীকার নামা লিখেছিলেন নাযর বিন হারেস। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এ অঙ্গীকার নামা সঠিক লেখক ছিলেন বোগায়েয বিন আমের বিন হাশেম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি বদ দোওয়া করেছিলেন যার ফলে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।[১]

যাহোক এই অঙ্গীকার স্থিরকৃত হল এবং অঙ্গীকার নামাটি কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হল। যার ফলে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিবের কি কাফের, কি মুসলিম সকলেই আতঙ্কিত হয়ে 'শেয়াবে আবু তালিব' গিরি সংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়ত সপ্তম বর্ষের মুহারম মাসের প্রারম্ভে চাঁদ রাত্রিতে।

তিন বৎসর, 'শেয়াবে আবু তালিব' গিরিসংকটে অন্তরীণাবস্থা (ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب) :

এ বয়কটের ফলে বনু হাশেম বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব-সামগ্রী আমাদানী ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়েছিল। কারণ, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যা মক্কায় আসত মুশরিকগণ তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারণে গিরি

---

[১] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৪৬ পৃঃ।

সংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হতো। উপবাসের অবস্থা এরূপ হয়ে যখন মর্মবিদারক কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকত তখন গিরি সংকটে তাঁদের নিকট জিনিসপত্র পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব পড়েছিল, যা পৌঁছত তাও অতি সঙ্গোপনে। হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাহিরে যেতে পারতেন না। অবশ্য যে সকল কাফেলা মক্কার বাহির থেকে আগমন করত তাদের নিকট থেকে তাঁরা জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু মক্কার ব্যবসায়ীগণ এবং লোকজনেরা সে সব জিনিসের দাম এতই বৃদ্ধি করে দিত যে, গিরিসংকটবাসীগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই তা থেকে যেত।

খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম বিন হেযাম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য গম পাঠিয়ে দিতেন। এক দিবস আবু জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে উদ্যত হল, কিন্তু আবুল বোখতারী এ ব্যাপার হস্তক্ষেপ করল এবং তার ফুফুর নিকট খাদ্য প্রেরণে সাহায্য করল।

এ দিকে আবু তালিব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কিত সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের কারণে লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করত তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিজ শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কেউ যদি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে সে দেখে নিক যে, তিনি কোথায় শয়ন করেন। তারপর যখন লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়ত তিনি তাঁর শয্যাস্থল পরিবর্তন করে দিতেন। নিজ পুত্র, ভাই কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যথেকে এক জনকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন এবং তার পরিত্যাজ্য শয্যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শয়নের ব্যবস্থা করতেন।

এ অবরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও হজ্বের সময় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ গিরি সংকট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন এবং হজ্বব্রত পালনে আগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। সেই সময় আবু লাহাবের কার্যকলাপ যা ছিল সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

অঙ্গীকারনামা বিনষ্ট (نقض صحيفة الميثاق) :

এই রূপ অবর্ণনীয় সংকটময় অবস্থায় দীর্ঘ তিন বছর অতিক্রান্ত হল। এরপর নবুওয়াত ১০ম বর্ষের মুহারম মাসে[1] লিখিত অঙ্গীকারনামাটি ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসমাপ্তিত ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কারণ, প্রথম থেকেই কিছু সংখ্যক ছিল এর বিপক্ষে। যারা এর বিপক্ষে ছিল তারা সব সময় সুযোগের সন্ধানে থাকত একে বাতিল কিংবা বিনষ্ট করার জন্য। অনেক ত্যাগ ও তিতীক্ষার মধ্য দিয়ে বছর দুয়েক অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর রহমতে সেই একরার নামা বিনষ্ট করার মোক্ষম এক সুযোগ এসে যায় অবলীলাক্রমে।

এর প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন বনু আমের বিন লুঈ গোত্রের হেশাম বিন আমর নামক এক ব্যক্তি। রাতের অন্ধকারে এ ব্যক্তি গোপনে গোপনে 'শেয়াবে আবু তালিব' গিরি সংকটের ভিতরে খাদ্য শস্যাদি প্রেরণ করে বনু হাশেমের লোকজনদের সাহায্য সহানুভূতি করতেন। এ ব্যক্তি এক দিন যুহায়ের বিন আবু উমাইয়া মাখযুমীর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। যুহায়ের মাতা আতেকা হলেন আবুল মুত্তালিবের কন্যা এবং আবু তালিবের ভগ্নী। তিনি যুহায়েরকে সম্বোধণ করে বললেন, যুহায়ের! 'তুমি এটা কিভাবে বরদাস্ত করছ যে, আমরা উদর পূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে আহার করছি, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করছিল আর বনু হাশেম খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন যাপন করছে। বর্তমানে তোমার মামা বংশের যে অবস্থা চলছে তা তুমি ভালভাবেই জানো।' বনু হালিমার কথা শুনে ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে যুহায়ের বললেন, 'সব কথাই তো ঠিক, কিন্তু এ ব্যাপারে একা আমি কি

[1] এর প্রমাণ হচ্ছে যে অঙ্গকার নামা ছিঁড়ে ফেলার ছয় মাস পর আবু তালিবের মৃত্যু হয় এবং সঠিক কথা এটাই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল রজম মাসে। যাঁরা একথা বলেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল রমাযান মাসে তাঁরা একথাও বলেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল অঙ্গীকার নাম ছিন্ন করা ছয় মাস পরে নয় বরং আট মাস অথবা আরও কয়েক দিন পরে। উভয় প্রকার হিসেবেই অঙ্গীকারানাম ছিন্ন করার মাস হচ্ছে মুহারম।

করতে পারি? তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যদি কেউ থাকত তাহলে অবশ্যই আমি এ একরারনামা ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম"। হেশাম বলল, 'বে শতো, এ ব্যাপারে আমি আছি তোমার সঙ্গে।' যুহায়ের বলল, বেশ, তাহলে এখন তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো।'

এ প্রেক্ষিতে হেশাম, মুতয়েম বিন আদীর নিকটে গেলেন। মুতয়েম বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের সম্পর্ক সূত্রে আবদে মানাফের সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হেশাম তাঁদের বংশীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাঁকে ভর্ৎসনা করার পর 'বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিবের দারুণ দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'বংশীয় ব্যক্তিদের এত দুঃখ, কষ্টের কথা অবগত হওয়া সত্ত্বও তুমি কিভাবে কুরাইশদের সমর্থন করতে পার?' মুতয়েম বললেন, 'সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু আমি একা কি করতে পারি? 'হেশাম বললেন, 'আরও একজন রয়েছে।' মুতয়েম জিজ্ঞাসা করলেন সে কে? হেশাম বললেন, 'আমি"। মুতয়েম বললেন, 'আচ্ছা তবে তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো' হেশাম বললেন, 'এটাও করেছি।' বললেন, সে কে? উত্তরে বললেন, 'যুহায়ের বিন আবি উমাইয়া।'

মুতয়েম বললেন, 'আচ্ছা তবে এখন চতুর্থ ব্যক্তির অনুসন্ধান করো"। এ প্রেক্ষিতেত হেশাম বিন আমর আবুল বোখতারী বিন হেশামের নিকট গেলেন এবং মুতয়েমের সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গেও ঠিক একইভাবে কথাবার্তা হল।

তিনি বললেন, 'আচ্ছা এর সমর্থক কেউ আছে কি?' হেশাম বললেন হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কে? হেশাম বললেন, 'যুহায়েম বিন আবি উমাইয়া, মুতয়েম বিন আদী এবং আমি।'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এখন ৫ম ব্যক্তির খোঁজ করো। এবাবে হেশাম যামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদের নিকট গেলেন এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন বনু হাশেমের আত্মীয়তা এবং তাদের প্রাপ্য সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, 'আচ্ছা যে কাজের জন্য আমাকে ডাক দিতেছো, সেই ব্যাপারে আরও কি কারো সমর্থন আছে?

হেশাম 'হ্যাঁ', সূচক উত্তর করে সকলের নাম বললেন। তারপর তাঁরা সকলে হাজূনের নিকট একত্রিত হয়ে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, কুরাইশগণের অঙ্গীকার পত্র খানা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। যুহায়ের বললেন, 'এ ব্যাপারে আমিই সর্ব প্রথম মুখ খুলব।'

পূর্বের কথা মতো পর দিন প্রাতে সকলে মজলিসে উপস্থিত হলেন। যুহায়ের শরীরে একজোড়া কাপড় ভালভাবে লাগিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি সাতবার বায়তুলাহ প্রদক্ষিণ করে নিলেন। তারপর সমবেত জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে মক্কাবাসীগণ! আমরা তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করে খাওয়া-দাওয়া করব, উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করব। আর বনু হাশেম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় এবং আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না, যতক্ষণ ঐ অন্যায় ও উৎপীড়মূলক অঙ্গীকারপত্র খানা ছিঁড়ে ফেলা না হচ্ছে।

প্রত্যুত্তরে যাময়া বিন আসওয়াদ বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! তুমি অধিক ভুল বলছ। কিসের অঙ্গীকার পত্র ওটা লিখার ব্যাপারে আমাদের কোন সম্মতি ছিল না। আমরা ওতে সন্তুষ্টও ছিলাম না।"

অন্য দিক থেকে আবুল বোখতারী সহযোগী হয়ে বলে উঠল,

"যাময়া ঠিকই বলেছো। ঐ অঙ্গীকার পত্রে যা লেখা হয়েছিল তাতে আমাদের সম্মতি ছিল না এবং এখনো তা মান্য করতে আমরা বাধ্য নই।'

এর পর মুতয়েম বিন আদী বললেন, 'তোমরা উভয়েই ন্যায্য কথা বলেছো। এর বিপরীতত কথাবার্তা যারা বলেছো তারাই ভুল বলেছো। আমরা এ প্রতিজ্ঞাপত্র এবং ওতে যা কিছু লেখা রয়েছে তা হতে আল্লাহর সমীপে অসন্তোষ প্রকাশ করছি।

ওদের সমর্থনে হেশাম বিন আমরও অনুরূপ কথাবার্তা বললেন।

এদের কথা আলাপ কথাবার্তা শুনে আবু জাহল বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, এ সব কথা আলাপ-আলোচনা করে বিগত রাত্রিতে স্থির করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ এই স্থান বাদ দিয়ে অন্যত্র কোথাও করা হয়েছে।'

ঐ সময় আবু তালিবও পবিত্র হারামের এক প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ অঙ্গীকার পত্র সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, উহার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার কীট প্রেরণ করেছেন যা অন্যায় ও উৎপীড়ন মূলক এবং আত্মীয়ততা বিনষ্টকারী অঙ্গীকার পত্রটির সমস্ত কথা বিনষ্ট করে দিয়েছ। শুধুমাত্র আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। নবী করীম ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবকে এ কথা বলেছিলেন এবং তিনিও কুরাইশগণকে এ কথা বলার জন্য মসজিদুল হারামে আগমন করেছিলেন।

আবু তালিব কুরাইশগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর তরফ থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট সংবাদ এসেছে যে, আপনাদের অঙ্গীকার পত্রটি সমস্ত লেখা আল্লাহ প্রেরিত কীটেরা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু আল্লাহর নামটি বর্তমান আছে। এ সংবাদটি আপনাদের নিকট পৌছানোর জন্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে প্রেরণ করেছেন। যদি তাঁর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর ও আপনাদের মধ্য থেকে আমি সরে দাঁড়াব। তখন আপনাদের যা ইচ্ছে হয় করবেন। কিন্তু তাঁর কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কটদের মাধ্যমে আপনারা আমাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছেন তা থেকে বিরত হতে হবে। এ কথা কুরাইশগণ বললেন, 'আপনি ইনসাফের কথাই বলছেন।'

এ দিকে আবু জাহল এবং লোকজনদের মধ্যে বাকযুদ্ধ ও বচসা শেষ হলে মুতয়েম বিন আদী অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর সেটা হাতে নিয়ে সত্যি সত্যিই দেখা গেল যে, এক প্রকার কীট লেখা গুলোকে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু মাত্র 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি অবশিষ্ট রয়েছে এবং যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম লেখা ছিল শুধু সেই লেখা গুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। কীটে সেগুলো খায়নি।

তারপর অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা হল এবং এর ফলে বয়কটের ও অবসান ঘটল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অন্যান্য সকলে শোয়াবে আবু তালিব থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুশরিকগণ নবী ﷺ-এর নবুওয়তের এক বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে চমৎকৃত হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আচরণের ক্ষেত্রে কোনই পরিবর্তনসূচিত হল না। যার উল্লেখ এই আয়াতে কারীমায় রয়েছে,

﴿وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: ٢]

" কিন্তু তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে- 'এটা তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু'।' (আল-ক্বামার ৫৪ : ২)

তাই মুশরিকগণ বিমুখ হলে গেল এবং স্বীয় কুফরে তারা আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে গেল।[1]

---

[1] বয়কটের এ বিস্তৃত বিবরণাদির নিম্নে উৎস হতে চয়ন ও প্রণয়ন করা হয়েছে। সহীহ বুখারী মক্কায় নববী অবতরণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ২৬১ পৃঃ। বাবু তাকাসোমিল মুশরিকীন আলান্নাবীয়ে ﷺ ১ম খণ্ড ৫৪৮ পৃঃ যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৪৬ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৫০-৩৫১ পৃঃ ও ৩৭৪-৩৭৭ পৃঃ। রাহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬৯-৭০ পৃঃ শাইখ আবদুল্লাহ রচিত 'মুখতাসারুস সীরাহ ১০৬-১১০ পৃঃ। এবং শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রচিত 'মুকাতাসারুস সীরাহ ৬৮-৭৩ পৃঃ। এ উৎস সমূহে কিছু কিছু মত বিরোধ রয়েছে। প্রামণাদির প্রেক্ষিতে আমি অগ্রাধিকার যোগ্য দিকটিই উলেখ করেছি।

آخر وفد قريش إلي أبي طالب

আবু তালিব সমীপে শেষ কুরাইশ প্রতিনিধি দল

গিরি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর পূর্বের মতো আবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। অপরপক্ষে মুশরিকগণ যদিও বয়কট পরিহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তবুও পূর্বের মতই মুসলিমদের উপর চাপসৃষ্টি এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকল। আবু তালিবও পূর্বের মতই জীবন বাজি রেখে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাহায্য করতে থাকলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে থাকলেন। কিন্তু এখন তিনি অশীতিপাত করার ফলে এবং বিশেষ করে গিরি সংকটে তিন বছর যাবৎ অবর্ণনীয় অভাব-অনটনের মধ্যে আবদ্ধ জীবন-যাপন করার ফলে তাঁর শক্তি সামর্থ প্রায় নিঃশোষিত হয়ে পড়েছিল এবং কোমর বক্রাকার ধারণ করেছিল। গিরি সংকটের আবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার পর এ সব কারণে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ সময় মুশরিকগণ চিন্তা-ভাবনা করল যে, যদি আবু তালিবের মৃত্যু হয় এবং তারা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের উপরন অন্যায়-অত্যাচার করে তবে এতে তাদের খুব বড় রকমের বদনাম হয়ে যাবে। এ কারণে আবু তালিবের সামনেই মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে তিনি কিছুটা সুযোগ-সুবিধাও দিতে পারেন আগে কোন দিনই যা দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। এ চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষাপটে একটি কুরাইশ প্রতিনিধি দল আবু তালিবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল এবং এটিই ছিল তাঁর নিকট অনুরূপ শেষ প্রতিনিধি দল।

ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্যদের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, যখন অসুস্থ আবু তালিব শয্যাগত হয়ে পড়লেন এবং দিনে দিনে তাঁর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকল তখন কুরাইশগণ এ মর্মে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল যে, 'হামযা ও ওমর মুসলিম হয়ে গিয়েছে এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্ম বিভিন্ন কুরাইশ গোত্রে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই, চল আমরা আবু তালিবের নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম প্রচার থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে একটি অঙ্গীকার আদায়ের কথা বলি এবং আমাদের পক্ষ থেকেও কোন প্রকার অনিষ্ট না করার ব্যাপারে তাঁর অনুকুলে একটি অঙ্গীকার নামা সম্পাদন করে নেই। কারণ, এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত ভীত এবং আতংকিত যে, এই ধারায় মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রচার অব্যাহত রাখলে লোকজনেরা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে।

অন্য এক বর্ণনায় কুরাইশগণের বক্তব্য এ মর্মে প্রমাণ করা হয়েছে 'আমাদের ভয় হচ্ছে যে, বৃদ্ধ আবু তালিব মৃত্যু বরণ করলে এবং তারপর মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদের নিন্দা করবে এবং বলবে যে, তারা মুহাম্মদ ﷺ-কে ছেঁড়ে দিয়েছিল। (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছুই করতে পারে নাই) কিন্তু যখন তাঁর চাচা মৃত্যু মুখে পতিত হলেন তখন তারা তাঁর উপর আক্রমণ করে বসল।

যাহোক, এ কুরাইশ প্রতিনিধি দল আবু তালিবের নিকট গিয়ে পৌঁছল এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করল। কুরাইশগণের মধ্য থেকে বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এই প্রতিনিধিদ দল গঠিত হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন উতবা বিন রাবিয়া, শায়বা বিন রাবীয়াহ, আবু জাহল বিন হেশাম, উমাইয়া বিন খালফ, এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব। এই প্রতিনিধি দলে ছিল মোট পাঁচ জন সদস্য।

বৃদ্ধ আবু তালিবকে সম্বোধন করে তারা বলল, 'হে আবু তালিব! আমাদের মধ্যে মান-মর্যাদার যে আসনে আপনি সমাসীন রয়েছেন তা সম্যক অবহিত রয়েছেন এবং বর্তমানে যে অবস্থা মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছেন তাও আপনার নিকট সুস্পষ্ট। আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আপনি আপনার জীবনের অন্তিম পর্যায় অতিবাহিত করছেন। এ দিকে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আমাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মতদ্বৈধতা চলে আসছে সেও আপনার অজানা নেই। আমরা চাচ্ছি যে, আপনি তাঁকে ডাকিয়ে নেবেন এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের নিকট থেকে

এবং আমাদের সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য হবে আমরা তাঁর থেকে এবং সে আমাদের থেকে পৃথক থাকবে। অর্থাৎ আমাদের ধর্মৎমতের উপর সে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না এবং আমারও তার ধর্মমতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করব না।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে আবু তালিব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়ে নিলেন এবং বললেন ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এঁরা হচ্ছেন তোমার স্বজাতীয় সম্মানিত ব্যক্তি। তোমার জন্যই এঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন। এঁরা চাচ্ছেন যে, তোমাকে কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করবেন এবং তোমাকেও তাঁদের কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ধর্মমতের ব্যাপারে তাঁরা তোমার প্রতি কোন কটাক্ষ করবেন না এবং তুমিও তাঁদের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ করবে না।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি যদি এমন একটি প্রস্তাব পেশ করি যা মেনে নিলে গোটা আরবের সম্রাট হওয়া যাবে এবং আজম অধিনস্থ হয়ে যাবে তাহলে এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি হতে পারে তা বলুন। কোন কোন বর্ণনায় এমনটিও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবকে সম্বোধনদ করে বলেছেন, চাচা জান! আমি তাঁদের নিকট থেকে এমন এক প্রস্তাবের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন চাই যা মেনে নিলে সমগ্র আরব জাহান তাঁদের অধিনস্থ হয়ে যাবে এবং আজম তাঁদের নিকট কর দিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হবে।

অন্য এক বর্ণনায় কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, নবী ﷺ বললেন, 'চাচাজান! আপনি তাদেরকে এমন কথার প্রতি আহ্বান জানান না কেন যা প্রকৃতই তাদের মঙ্গল জনক।'

তিনি বললেন, তুমি কোন কথার প্রতি তাদের আহ্বান জানাতে বলছ?

নবী ﷺ বললেন, আমি এমন এক কথার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, কথা মেনে নিলে সমগ্র আরব তাদের অধিনস্থ হয়ে যাবে এবং অনারবদের উপর তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইবনে ইসহাকের এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন,

(أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها، ملكتم بها العرب، ودانت لكم بها العجم)

"আপনারা শুধু মাত্র একটি কথা মেনে নিন যার বদৌলতে আপনারা হয়ে যাবেন আরবের সম্রাট এবং আজম হয়ে যাবে আপানাদের অধিনস্থ।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে যখন তার একথা শুনল তখন তার সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে গেল এবং মনে হল যেন তাদের হতবুদ্ধিতায় পেয়ে বসেছে। মুহাম্মদ ﷺ-এর শুধু একটি কথা মেনে নিলে তারা এত বেশী লাভবান হতে পারবে এ চিন্তা তাদের মন মগজকে একদম আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারা মনে মনে বলতে থাকল যে, একটি মাত্র কথাতে যদি এত বড় উপকার হয় তাহলে তা ছেড়ে দেয়া যায় কি করে? আবু জাহল বলল, 'আচ্ছা তুমি বলত ঠিক সে কথাটি কি? তোমার পিতার কসম, কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে একটি কেন দশটি বললেও আমরা মান্য করতে প্রস্তুত আছি।' নবী ﷺ বললেন,

(لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه)

"আপনারা বলুন, লা ইলাহা ইলালাহ এবং আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা করেন তা পরিহার করুন।"

নবী কারীম ﷺ-এর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে তারা হাতে হাত মারতে মারতে এবং তালি দিতে দিতে বলল, 'মুহাম্মদ ﷺ তুমি এটাই চাচ্ছ যে, সকল আল্লাহর জায়গায় মাত্র এক আল্লাহকে আমরা মেনে নেই। বাস্তবিক তোমার ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যজনক!'

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে বলল, 'আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তি তোমাদের একটি কথাও মান্য করার জন্য প্রস্তুত নয়। অতএব, চলো এবং পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশ পরস্পরা সূত্রে প্রাপ্ত দ্বীনের উপরেই অটল থাক যাবৎ আল্লাহ আমাদের এবং তার মধ্যে একটা মীমাংসা করে না দেন। এর পর তারা নিজ নিজ রাস্তায় চলে গেল।

এ ঘটনার পর সেই সব লোকজনকে কেন্দ্র করে কুরআন মাজীদে এ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হল[১] :

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ [ص: ١: ٧]

"সা'দ, নাসীহাতে পূর্ণ কুরআনের শপথ– (এটা সত্য)। কিন্তু কাফিররা আত্মম্ভরিতা আর বিরোধিতায় নিমজ্জিত। তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, অবশেষে তারা (ক্ষমা লাভের জন্য) আর্তচিৎকার করেছিল, কিন্তু তখন পরিত্রাণ লাভের আর কোন অবকাশই ছিল না। আর তারা (এ ব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিরগণ বলল– 'এটা একটা যাদুকর, মিথ্যুক। সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে? এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার তো!' তাদের প্রধানরা প্রস্থান করে এই ব'লে যে, 'তোমরা চলে যাও আর অবিচলিত চিত্তে তোমাদের ইলাহ্‌দের পূজায় লেগে থাক। অবশ্যই এ ব্যাপারটির পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। এমন কথা তো আমাদের নিকট অতীতের মিল্লাতগুলো থেকে শুনিনি। এটা শ্রেফ একটা মন-গড়া কথা।' [স–দ (৩৮) : ১–৭]

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৭-৪১৯ পৃঃ। শাইখ আবদুল্লাহ মুখতাসারুস সীরাহ ৯১ পৃঃ।

عـــام الحـــــزن
শোকের বছর

আবু তালিবের মৃত্যু (وفاة أبي طالب) ঃ বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবু তালিবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু গিরি সংকট অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুওয়ত ১০ম বর্ষের রজব মাসে।[1]

এ ব্যাপারে অন্য একটি মত হচ্ছে তিনি খাদীজা (رضي الله عنها)-এর মৃত্যুর মাত্র তিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

সহীর বুখারী শরীফে মোসাইইব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নবী করীম (ﷺ) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবু জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(أي عم، قل: لا إله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله)

'চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইলালাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।"

আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবু তালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবু তালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।' নবী করীম (ﷺ) বললেন,

(لأستغفرن لك ما لم أنه عنـــه)

"আমি যতক্ষন বাধা প্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।' এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة:١١٣]

"নাবী ও মু'মিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।' (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয় :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦]

" তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।' (আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)

এখানে এ কথা বলা নিস্প্রয়োজন যে, আবু তালিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কি পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। মক্কার অনাচারী মুশরিকগণের আক্রমণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতই তিনি ছিলেন দূর্গ স্বরূপ। কিন্তু আল্লাহর নবী (ﷺ) এবং ইসলামের জন্য এত করেও যেহেতু তিনি বংশপস্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বহুত্ববাদের প্রভাব কাটিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। সে হেতু দোরগোড়ায় আগত কামিয়াবি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার চাচার

---

[1] জীবন চরিত বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মাসে আবু তালিবেরর মৃত্যু মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে চরম মতভেদ আছে। আমি রজব মাসকে এ জন্য অগ্রাধিকার দিলাম যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, তাঁর মৃত্যু আবু তালিব গিরি গুহা হতে মুক্তি লাভের ছয় মাস পরে হয়েছে। অবরোধ শেষ হয়েছিল ৭ম নববীসনের মুহরম মাসের প্রথম তারীখে এ হিসেবে মৃত্যু ১০ম হিজরীর রজবে হয়।

কি উপকারে আসবে? 'কারণ নবী কারীম (ﷺ)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ বললেন,

(هو في ضَحْضَاحِ من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)

"তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করেছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তা হলে তিনি জাহান্নামের অতল ডুবে যেতেন।[1]

আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাঁর চাচা আবু তালিবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, 'সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু'পায়ের গিঁট পৌঁছবে।[2]

আল্লাহর অনন্ত রহমতের পথে খাদীজা (رضي الله عنها) (خديجة إلى رحمة الله) :

আবু তালিবের মৃত্যুর দু'মাস পর (মহান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উম্মুল মো'মেনীন খাদিজাতুল কুবরা (رضي الله عنها) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবরেন ৫০তম বছর।[3]

রস্যূলুলাহ (ﷺ)-এর জীবনে খাদীজা (رضي الله عنها) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নবী (ﷺ)-কে সাহচার্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপাদপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণ ও পরামর্শ দিয়ে ইসলাম বীজের অংকুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজা (رضي الله عنها) সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী করীম (ﷺ) বলেছেন,

(آمنت بى حين كفر بى الناس، وصدقتنى حين كذبني الناس، وأشركتنى في مالها حين حرمنى الناس، ورزقنى الله ولدها وحرم ولد غيرها)

যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি নিটোল বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।[4]

সহীহ বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবারাঈল (عليه السلام) নবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইনি খাদীজা (رضي الله عنها) আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের শুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না।[5]

দুঃখের উপর দুঃখ (تراكم الأحزان) ঃ

প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু এবং প্রাণাধিক প্রিয়া ও সহধর্মিনী উম্মুল মো'মিনীন খাদীজা (رضي الله عنها)-এর মুত্যু এ দুটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ দুটি মৃত্যুর সুদূর

---

[1] সহীহ বুখারী আবু তালিবের ঘটনা অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪৮ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী আবু তালিবের ঘটনা অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪৮।

[3] রমাযান মাসে মুত্যু হওয়ার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ইবনে জওযী তালকীহুল ফহুমে ৭ পৃষ্ঠায় এবং আলামা মানসুরপুরী রহমাতুলিল আলামীন ২য় খণ্ড ১৬৪ পৃঃ।

[4] মুসনদে আহমদ ৬ষ্ঠ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[5] সহীহ বুখারী খাদীজার সাথে নবী (ﷺ)-এর বিবাহ ও তাঁর ফযীলত অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৩৯ পৃঃ।

প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নবী ﷺ-এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুণ শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে। পিতৃব্যের মৃত্যুর ফলে মুশরিকগণের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নবী ﷺ ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যমে তারা শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। একেত প্রিয় পরিজনদের বিয়োগ ব্যাথা, অন্যদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা নির্যাতন-পর্বত সম ধৈর্য্যের অধিকারী হয়েও নবী ﷺ-এর জীবন হয়ে উঠে বিষাদময় ও বিপর্যস্ত, হয়ে উঠে নৈরাশ্যে ভরপুর। নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আশায় বুক বেঁধে অগ্রসর হন তিনি তায়েফের পথে যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কিন্তু সেখানে দাওয়াত কবুল, আশ্রয় কিংবা, সাহায্য প্রদান কোন কিছু তো নয়ই, বরং তাঁর সঙ্গে এতই নির্মম আচরণ করা হল এবং এতই দৈহিক নির্যাতন চালানো হল যে, তা অতীত নির্যাতনের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে গেল (এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করে আরও পরে)।

এ দিকে মক্কার মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের উপর ইতোপূর্বে যেভাবে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল এখনো অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যেতে থাকল। শুধু তাই নায়, বরং নির্যাতনের মাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -এর মতো অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিও অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে উঠলেন এবং উপায়ন্তর না দেখে মক্কা ছেড়ে হাবশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে 'বারকে গামাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে ইবনে দাগানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁকে নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ আশ্রয়ে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে।[১]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবু তালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এত কষ্ট দেন যা আবু তালিবের জীবদ্দশায় কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে পত্যাবর্তনের পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সান্তনা দানের জন্য বললেন,

(لا تبكي يابنية، فإن الله مانع أباك)

"পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাজতকারী।"

ঐ সময় তিনি এ কথাও বলেন যে,

(ما نالت مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب)

"যতদিন আমার চাচা আবু তালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিল।"[২]

এমনভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে নবী কারীম ﷺ সেই বছরটি নাম রাখেন 'আমুলহুযন' অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এই নামেই প্রসিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাওদার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বিবাহ (الزواج بسودة رضي الله عنها) ঃ

নবুওয়ত ১ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওদাবিনতে যাময়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিবাহ করেন। এ মহিলা নবুওয়তের প্রথম অবস্থাতেই মুসলিম হয়েছিলেন। হাবশের (আবিসিনিয়ায়) দ্বিতীয় হিজরতের সময় হিজরতও

---

[1] আকবর শাহ নাজীরাবাদী স্পষ্টভাবে উলেখ করেছেন যে, এ ঘটনা সেই বছরই ঘটেছিল। দ্রঃ তারীখে ইসলাম ১ম খণ্ড ১২০ পৃঃ। মূল ঘটনাসহ বিস্তারিত আলোচনা ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭২ ও ৩৭৪ ও সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫২ ও ৫৫৩ তে উলেখ আছে।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৬ পৃঃ।

করেছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল সাকারাণ বিন আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং সাওদা তাঁর সঙ্গে হাবশ হিজরত করেছিলেন। সাওদার স্বামী হাবশে মৃত্যুবরণ করেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, মক্কায় ফিরে আসার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৈধব্যের পর ইদ্দত পালন শেষ হলে নবী কারীম তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তারপর তাঁরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদীজা -এর পর এই মহিলা ছিলেন রাসূলুল্লাহ -এর প্রথম স্ত্রী (বিবাহ পরম্পরায়) দ্বিতীয় স্ত্রী) কয়েক বছর পর ইনি নিজের পালা আয়েশা -কে দান করে দিয়েছিলেন।[১]

[1] রাহমাতুলিল্ল আলামীন ২য় খণ্ড ১৬৫ পৃঃ। তালকীহুল ফহুম ৬ পৃঃ।

عوامل الصبر والثبات

প্রথম পর্যায়ের মুসলিমগণের ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণ ও প্রেরণ

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম দিকে কয়েক বছরের মধ্যে যাঁরা **মুসলিম হয়েছিলেন তাঁদের যে** অবর্ণনীয় দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা, নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হয়েছিল **এবং যেভাবে তাঁরা অসাধারণ** ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহস, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতা **এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে কোন** কোন ক্ষেত্রে জীবন দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণকে বিপন্ন করে তাঁরা শিশু ইসলামকে **লালন করে তার বিকাশ** ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন তা গভীরভাবে অনুধাবন করে বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত **এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ** একদিকে যেমন বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য হয়ে যান। অন্যদিকে তেমনি সত্যের প্রতি **তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা,** কর্তব্যবোধ, কর্তব্যকর্মে দৃঢ়তা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে তাঁরা চমৎকৃত এবং মুগ্ধ হতে থাকেন। **একই সঙ্গে তাঁদের** মনে এই প্রশ্নেরও উদয় হতে থাকেন যে, কি কারণে, কোন যাদু মন্ত্র বলে এ অসাধ্য তাঁদের **পক্ষে সম্ভব** হয়েছিল। অসংখ্য অগণিত মানুষের এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কি হতে পারে তার প্রতি কিঞ্চিৎ **আলোকপাত করা** প্রয়োজন মনে করেই নিম্নোক্ত আলোচনা পেশ করছি,

১. **(আল্লাহর প্রতি ঈমান) :** উপরিএ প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য উত্তরমালার মধ্যে সর্বপ্রথম এবং **সব চাইতে** গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব জাহানের অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার **প্রতি** প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর অস্তিত্ব, হিকমত এবং কুদরত সম্পর্কে সঠিক এবং সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান। **কারণ,** তৌহিদের সুস্পষ্ট ধারণা এবং তৌহিদী নূরে যখন মু'মিনের অন্তর আলোকিত, উদ্বেলিত ও পুলকিত হয়ে **ওঠে** পর্বত-প্রমাণ প্রতিবন্ধকতাও তখন তাঁর সামনে শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতো তুচ্ছ মনে হয়। যে মু'মিন পরিপক্ক ও **সুদৃঢ়** ঈমান এবং মজবুত ইয়াকীনের অধিকারী হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর সম্মুখে পৃথিবীর যত **প্রকট** সমস্যাই আসুক না কেন, তা যতই ভয়ংকর এবং ভীতিপ্রদই হোক না কেন, তাঁর অটল বিশ্বাসে বলীয়ান চেতনা এবং তৌহিদের অলৌকিক আস্বাদে পরিতৃপ্ত মন এ সব কিছুকে স্যাঁতসেঁতে এঁদো পরিবেশ ভগ্ন ইষ্টকখণ্ডের **উপর** জমে উঠা শেওলার চাইতে অধিক কিছুই মনে করেন না। এ কারণেই ঈমানী সূরার অলৌকিক আস্বাদে পরিতৃপ্তি কোন ঈমানদারের প্রাণের সজীবতা এবং উদার উন্মুক্ত চিত্তের আনন্দানুভূতি মূর্খ ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানব সৃষ্টি দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণাকে কখনো পরোয়া করে না। কুরআন মাজীদে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد:١٧]

"ফেনা খড়কুটোর মত উড়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য উপকারী তা যমীনে স্থিতিশীল হয়।' [আর-রা'আদ : (১৩) : ১৭]

তারপর এ কারণের সূত্র ধরেই অস্তিত্ব লাভ করে অজস্র কারণ যা সেই ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তাকে **আরও** মজবুত করে তোলে।

২. **মহিমান্বিত ও প্রাজ্ঞ পরিচালন** (قيادة تهوى إليها الأفئدة) ঃ

এটা সর্বজনতবিদিত এবং সর্ববাদী সম্মত সত্য যে, নবী কারীম ﷺ ছিলেন বিশেষ করে **মুসলিম উম্মাহ** এবং সাধারণভাবে বিশ্বমানবের জন্য মহিমান্বিত পরিচালক ও প্রাজ্ঞ পথপ্রদর্শক। দেহে, **মন-মানসিকতায়,** নেতৃত্বে, সৌজন্যে, সদাচারে তিনি ছিলেন সর্ব প্রজন্মের সকলের জন্য আদর্শ, অস্পরূপ দৈহিক **সুষমা, আধ্যাত্মিক** পরিপূর্ণতা, মহত্তম চরিত্র, বিনম্র, স্বভাব, উদার-উন্মুক্ত আচরণ, ন্যায়নিষ্ঠ কার্যকলাপ, অসাধারণ **পাণ্ডিত্য বুদ্ধিমত্তা** ও বাগ্মীতা সব কিছুর সমন্বয়ে তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সান্নিধ্য কিংবা **সাহচর্যে মানুষ একবার** এলে **বার** বার ফিরে ফিরে আসার জন্য আপনা থেকেই প্রলুব্ধ হতো এবং তাঁর ﷺ খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে **দেয়ার** জন্য ব্যকুল হয়ে উঠল। তাঁর বিনয়, নম্র আচরণ, সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আমানতকারী, **পরিচ্ছন্ন**তা ইত্যাদি সদগুণাবলীর জন্য বন্ধু-বান্ধব দূরের কথা শত্রুরাও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারতেন না। তাঁর

বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর শত্রুরাও তাঁর কোন উক্তি কিংবা অঙ্গীকারকে যে অবিশ্বাস্য বলে মনে করতে পারতেন না তার বহু প্রমাণ রয়েছে। এখানে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল ঃ

এক দফা কুরাইশগণের এমন তিন ব্যক্তি একত্রিত হয় যারা প্রথক পৃথকভাবে একজন অন্যজনের অগোচরে কুরআন পাঠ শ্রবণ করেছিল। কিন্তু পরে তাদের প্রত্যেকের এ গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই তিন জনের মধ্যে একজন ছিল আবু জাহল। তিন জন যখন একত্রিত হল তখন একজন আবু জাহলকে বলল, 'তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট যা শ্রবণ করেছ সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি তা বল।'

আবু জাহল বলল, 'আমি কি আর এমন শুনেছি। প্রকৃত কথা হচ্ছে আমরা এবং বনু আবদে মানাফ মান-মর্যাদার ব্যাপারে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছি। তার যেমন গরীব-মিসকীনদের খানা খাওয়ায়, আমরাও তেমনি তাদের খানা খাওয়াই। তারা দান-খয়রাত করে আমারও তা করি। তারা জনগণকে বাহন প্রদান করে আমরাও তা করি। এখন আমরা এবং তারা উভয় পক্ষই সর্বক্ষেত্রে একে অন্যের সমকক্ষ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত দুটো ঘোড়ার নায় উর্ধ্বশ্বাসে অবিরাম ছুটে চলেছি। এখন তারা নতুনভাবে বলতে শুরু করেছে যে, তাদের মাঝে একজন নবী আছে যার নিকট আকাশ থেকে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়। আচ্ছা, বলত আমরা তাহলে কিভাবে তাদের নাগাল পেতে পারি? আল্লাহর কসম! আমরা ঐ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং তাঁকে কখনই সত্যবাদী বলনা না' যেমনটি আবু জাহল বলত, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমরা তোমাকে 'মিথ্যুক' বলিতেছিনা কিন্তু তুমি যা নিয়ে এসেছ তা মিথ্যা মনে করছি এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام:٣٣].

"তারা যা বলে তা তোমাকে কষ্ট দেয় এটা আমি অবশ্যই ভালভাবে অবগত, কেননা তারা তো তোমাকে মিথ্যে মনে করে না, প্রকৃতপক্ষে যালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই প্রত্যাখ্যান করে।' (আল-আন'আম ৬ : ৩৩)

এ ঘটনা পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিন কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনবার অভিশাপ দেন। তৃতীয় দফায় নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন,

(يا معشر قريش، جئتكم بالذبح)

"হে কুরাইশগণ! আমি কুরবাণীর পশু নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করছি।"

এ কথা তখন তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব সৃষ্টি করল যে, যে ব্যক্তি শত্রুতায় সকলের চাইতে অগ্রগামী ছিল সেই সর্বোৎকৃষ্ট কথাবার্তা দ্বারা নবী ﷺ-কে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হল।

অনুরূপভাবে একটি ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি ছিল সিজদারত অবস্থায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাড়িভূঁড়ি নিক্ষেপ করা হয় এবং তারপর মাথা উত্তোলন করে তখন তিনি নিক্ষেপকারীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে থাকেন তখন তারা একদম অস্থির হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তার ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকে। তারা আর বাঁচতে পারবে না বলে তাদের মনে স্থির বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

অন্য একটি ঘটনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আবু লাহাবের পুত্র উতায়বার বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলেন, তখন তার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, সে নবী করীম ﷺ-এর বদ দু'আ থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবে না। যেমনটি শাম রাজ্য সফল অবস্থায় ব্যাঘ্র দেখেই বলেছিল, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ মক্কা থেকেই আমাকে হত্যা করল।'

অন্য একটি ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উবাই বিন খালফ নবী কারীম ﷺ-কে হত্যা করার জন্য বারবার হুমকি দিচ্ছিল। এক দফা নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন যে, '(তোমরা নয়) বরং আল্লাহ চানতো আমিই তোমাদের হত্যা করব, ইনশা-আল্লাহ।' এর পর ওহুদের যুদ্ধে নবী কারীম ﷺ যখন উবাইয়ের গলদেশ

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৬ পৃঃ।

বর্শার দ্বারা আঘাত করলেন, তখন যদিও সে আঘাত খুবই সামান্য ছিল তবুও উবাই বারবার এ কথাই বলছিল যে, 'মুহাম্মদ আমাকে মক্কায় বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে হত্যা করব। কাজেই, সে যদি আমার গায়ে থুথুও দিত তাতেও আমার মৃত্যু হয়ে যেত।[১]

এমনভাবে এক দফা সায়াদ বিন মায়ায মক্কায় উমাইয়া বিন খালফকে বলেছিল, 'আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমগণ তোমাদের হত্যা করবে তখন থেকে উমাইয়া ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ভয়-ভীতি তার অন্তরে সর্বক্ষণ বিরাজমান থাকে। তাই সে মনে মনে স্থির করেছিল যে, সে কখনই মক্কার বাইরে যাবে না। কিন্তু বদর যুদ্ধের সময় আবু জাহলের পীড়াপীড়ি এবং চাপের মুখে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য মক্কার বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজন বোধে যাতে দ্রুত পশ্চাদপসরণ সম্ভব হয় সে উদ্দেশ্যে সে মক্কার সব চাইতে দ্রুতগামী উটটি ক্রয় করে নিয়ে তার উপর সওয়াব হয়ে যুদ্ধে যায়।

এ দিকে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করে তার স্ত্রীও তাকে এ বলে বাধা দেয় যে, 'আবু সাফওয়ান! আপনার ইয়াসরেভী ভাই যা বলেছিলেন আপনি কি তা ভুলে গেছেন?' সে উত্তর দিল 'না ভুলি নাই, তবে আল্লাহর শপথ, তাদের সঙ্গে আমি অল্প দূরই যাব।[২]

এইত ছিল নবী শত্রুদের অবস্থা , অন্যদিকে তাঁর সাহাবীগণ (রা.), সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবগণের সকলের কাছে তিনি ছিলেন প্রাণের চাইতেও প্রিয়। তিনি ছিলেন সকলের চিন্তা-চেতনা ও অন্তরের চিকিৎসক। তাঁদের অন্তর থেকে উৎসারিত ভক্তি ও ভাল বাসার ধারা ঠিক সেভাবে নবী -এর দিকে প্রবাহিত হতো যেমনটি জলের ধারা উচ্চ থেকে নিম্নভূমির দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাঁদের সকলের প্রাণ ঠিক সেইভাবে নবী -এর প্রাণের দিকে আকর্ষিত হতে থাকত, যেমনটি সাধারণ লৌহ খণ্ড আকর্ষিত হতে থাকে চুম্বক লৌহের আকর্ষণে।

فصورته هيولى كل جسم ** ومغناطيس أفئـــدة الرجـــــال

অর্থ ঃ 'মুহাম্মাদের ছবি প্রতিটি মানবদেহের জন্য মূল অস্তিত্ব স্বরূপ ছিল এবং তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিটি অন্তরের জন্য চুম্বকের মতো ছিল।'

রাসূলুল্লাহ জন্য সাহাবীগণ -এর অন্তরে প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার যে, বেহেশতী ধারা সর্বক্ষণ প্রবাহিত হতো অখণ্ড মানব জাতির ইতিহাসে কোথাও তার কোন তুলনা মেলে না। সাহাবীগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ -এর জন্য কখনো কোন ত্যাগ স্বীকারকেই বড় বলে মনে করতেন না। এমন কি এ কথাও পছন্দ করতেন না যে, রাসূলুল্লাহ -এর নখে সামান্যতম আঘাত প্রাপ্ত হোক অথবা তাঁর পায়ে কাঁটার আঁচড় লাগুক তার জন্য তাঁদের নিজেদের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে তাঁরা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন।

একদিন আবু বকর সিদ্দীক অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে প্রহৃত হলেন। উতবা বিন রাবীআহ তাঁর নিকটে এসে তালি যুক্ত জুতো দ্বারা প্রহার করতে লাগল। বিশেষ করে চেহারা লক্ষ করে মারতে মারতে তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসল। অবস্থায় তাঁর গোত্র বনু তাইমের লোকজন তাঁকে কাপড়ে জড়ে বাড়ি আনে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আর বাঁচবেন না। কিন্তু দিনের শেষ ভাগে তাঁর কথা বের হল। আর সব কিছু আগে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ -এর অবস্থা কি? এর জন্য বনু তাইমের লোকেরা তাঁকে বকাঝকা করল। তাঁর মা উম্মুল খায়েরকে এ কথা বলে তার ফিরে গেল যে, তাঁকে কিছু পানাহার করাবে। একেবারে একাকী অবস্থায় তিনি আবু বকর -কে কিছু পানাহারের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি এ কথায় বলতে থাকলেন, 'রাসূলুল্লাহ কি অবস্থায়?' পরিশেষে উম্মুল খায়ের বললেন, 'আমি তোমার সাথির সংবাদ জানি না।' আবু বকর বললেন, 'উম্মু জামীল বিনতে খাত্তাবের নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো।' তিনি উম্মু জামীলের নিকটে গিয়ে বললেন, 'আবু বকর

[১] ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ।

[২] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৬৩ পৃঃ।

, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ -কে চিনি না আবু বকর -কে। তবে তুমি যদি চাও তাহলে তোমার সাথে তোমার প্রত্রের নিকট যেতে পারি।'

উম্মুল খায়ের বললেন, 'খু-উ-ব ভালো"।

এরপর উম্মু জামীন তার সঙ্গে এসে দেখলেন আবু বকর চরম শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত অবস্থান পড়ে রয়েছেন। তারপর তাঁর নিকটবর্তী হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'যারা আপনাকে এই দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত করেছে তারা অবশ্যই জঘন্য প্রকৃতির লোক এবং অমানুষ কাফের। আমি আশা করি যে, আল্লাহ আপনার এ অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ -এর কি হয়েছে?

তিনি বললেন, 'আপনার মাত শুনছেন"।

বললেন, 'কোন অসুবিধা নেই'

তিনি বললেন, 'সহীহ সালামতে আছেন।'

"কোথায় আছেন তিনি?'

"ইবনে আরকামের বাড়িতে।'

আবু বকর বললেন, 'যতক্ষণ আমি রাসূলুল্লাহ -এর দরবারে উপস্থিত না হব ততক্ষণ আমি খাদ্য কিংবা পানীয় কোন কিছুই গ্রহণ করব না। এটাই হচ্ছে আল্লাহর জন্য আমার অঙ্গীকার।'

তারপর উম্মুল খায়ের এবং উম্মু জামীল সেখানেই অবস্থান করলেন। লোকদের আগমন এবং প্রত্যাগমন বন্ধ হয়ে যাবার পর যখন নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকল তখন মহিলাদ্বয় আবু বকর -কে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন। তিনি তাদের উপর ভর দিয়ে চলতে থাকলেন এবং এইভাবে তাঁরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ -এর খেদমতে পৌঁছিয়ে দিলেন।[1]

নবী -এর জন্য শ্রদ্ধা, মহব্বত, উৎসর্গীকরণ ও ত্যাগ তিতীক্ষার বিরল ঘটনাবলী এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণিত হবে। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং খোবায়েরের প্রসঙ্গে সেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হবে।

৩. দায়িত্ববোধের অনুভূতি (الشعور بالمسئولية) ঃ সাহাবীগণ (রা.) এটা সুস্পষ্টভাবে অবগত ছিলেন যে, এ একমুষ্টি মাটি যাকে 'মানুষ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর যে বিশাল এবং দুর্বহ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে কোন অবস্থাতেই তা থেকে বিমুখ হওয়া কিংবা তাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। কারণ, দায়িত্ব বিমুখ হলে কিংবা দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে তার ফল যা হবে তা কাফির মুশরিকগণের অন্যায়, অত্যাচার এবং নির্যাতন নিপীড়রেন তুলনায় সাত সহস্র গুণ বেশী ভয়াবহ এবং বিধ্বংসকারী হবে। অধিকাংশ কর্তব্য বিমুখ হলে কিংবা কর্তব্য এড়িয়ে ফেলে নিজের এবং সমগ্র মানবতার যে ক্ষতি হবে এবং এমন সব সমস্যার উদ্ভব হবে যার তুলনায় এ সব দুঃখ কষ্ট এবং ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছুই নয়।

৪. পরকালীন জীবনে বিশ্বাস (الإيمان بالآخرة) ঃ আল্লাহর জমীনে দ্বীন কায়েম করার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের উপর যে, দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তৎসম্পর্কিতবোধকে শক্তিশালী এবং কর্মমুখী করার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে পরকালীন জীবনে বিশ্বাস। সাহাব কিরাম এ কথার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, পরকালীন জীবনে বিচার দিবসে তাদিগকে অবশ্যই রাব্বুল আলামীনের কার্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব দিতে হবে। পূণ্যবানগণ অনন্ত সুখশান্তির চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে চিরকাল মহাসুখে বসবাস করতে থাকবেন। পক্ষান্তরে, পাপীতাপীগণ দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণার আবাস্থল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোড় করতে থাকবে। সর্বক্ষণ কল্যাণমুখী কাজকর্মে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা জান্নাত

[1] আলবেদায়া ওয়ান্নেহায়া ৩য় খণ্ড ৩০ পৃঃ।

লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। অন্যদিকে তেমনি মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি জাহান্নামের আযাবের ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতেন। যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় বর্ণিত হয়েছে।

﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون:٦٠]

" যারা তাদের দানের বস্তু দান করে আর তাদের অন্তর ভীত শংকিত থাকে এ জন্যে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।' (আল-মু'মিনূন ২৩ : ৬০)

এ বিষয়েও তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, বিত্তবৈভব ও ভোগবিলাস, পরলৌকিক জীবনের সে সবের তুলনায় মশার একটি পাখার সমতুল্যও নয়। তাঁদের এ বিশ্বাস এতই দৃঢ়মূল ছিল যে, এর সামনে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা দুঃখ কষ্ট জুলম নির্যাতন সব ছিল অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার। কাজেই জুলম নির্যাতনের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁদের ইয়াকীন (বিশ্বাস) এবং সহনশীলতাও তদোধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা কাফির মুশরিক বিরোধীপক্ষকে হতভম্ব ও হতবাক করে দিয়েছে।

৫. **(আল-কুরআন (القــــــرآن)** : কাফির মুশরিকসৃষ্ট ভয়ঙ্কর বিপদ আপদ ও ঘোর সামাজিক অনাচার এবং অবক্ষয় জনিত অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় এমন সব সূরা ও আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল যার মধ্যে নিবিড় অথচ আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ইসলামের মৌলিক নিয়মকানুনের উপর প্রমাণাদি ও দালায়েল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই সময় উল্লেখিত নিয়ম কানুনের পাশাপাশি দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজও পূর্ণোদ্যমে চলছিল। এ আয়াত সমূহে ইসলামের অনুসারীগণকে এমন সব মৌলিক কাজ কর্ম করতে বলা হচ্ছিল যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলা মানবগোষ্ঠির সবচাইতে উন্নত সমাজ অর্থাৎ ইসলামী সামাজের নির্মাণও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ইঙ্গিত ছিল। উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে মুসলিমগণের আবেগ ও অনুভূতিকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান কল্পে করা হচ্ছিল। আয়াতে কারীমা ঃ

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة:٢١٤]

"তোমরা কি এমন ধারণা পোষণ কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের আগের লোকেদের মত অবস্থা তোমাদের সামনে আসেনি? তাদেরকে অভাবের তীব্র তাড়না এবং মসীবত স্পর্শ করেছিল এবং তারা এতদূর বিকম্পিত হয়েছিল যে, নাবী ও তার সঙ্গের মু'মিনগণ চিৎকার করে বলেছিল– আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।' [আল-বাক্বারাহ (২) : ২১৪]

﴿الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت:١– ٣]

'আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; তারপর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী।' [আল-'আনকাবূত (২৯) : ১–৩]

আর তাদেরই পাশে পাশে এমনও আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হতেছিল যার মধ্যে কাফির ও বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য কোন প্রকার সুযোগ সুবিধার অবকাশই দেয়া হয় নি। অধিকন্তু, তাদেরকে অত্যন্ত সহজ এবং সুস্পষ্টভাবে এটা বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি কেউ আপন ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতায় একগুঁয়েমী ভাব পোষণ করে থাকে তাহলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এর প্রমাণ স্বরূপ বিগত জাতিগুলোর এমন সব ঘটনা এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে যদ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে

গিয়েছে যে, নিজের বন্ধু এবং শত্রুদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতিনীতি এবং ব্যবস্থাদি কি রয়েছে? তারপর ভয় প্রদর্শনের পাশাপাশি করুণা এবং অনুগ্রহের কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া উপদেশ প্রদান ও গ্রহণ এবং আদেশ ও পথ প্রদর্শনের প্রাপ্য ও আদায় করা হয়েছে যেন প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ বিরত হতে চাইলে বিরত হতে পারে।

প্রকৃতই কুরআন মাজীদ মুসলিমগণকে অন্য এক জগতে পরিভ্রমনে রত রেখেছিল এবং তাদিগকে সৃষ্টির বিভিন্ন দৃশ্যপট প্রভূত্বের পরিপাট্য, লিলাহিয়াতের চরমোৎকর্ষ এবং অনুকম্পা অনুগ্রহ, দয়াদাক্ষিণ্য, সন্তুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত এমন সব দ্বীপ্তিময় দৃশ্য প্রদশন করা হচ্ছিল যে, সেগুলোর আকর্ষণ ও মোহের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতাই টিকে থাকতে পারে নি।

উপরন্তু, সে সকল আয়াত মুসলিমগণকে এমন এমন সব সম্বোধন করা হচ্ছিল যার মধ্যে প্রভূ প্রতিপালকের রহমত ও রেযামন্দি (অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি) এবং চিরস্থায়ী সুখ শান্তির আবাসস্থল জান্নাতের শুভ সংবাদ নিহিত ছিল। অপরপক্ষে মুসলিমগণের শত্রু অনাচারী ও অবাধ্য কাফির মুশরিকগণের সেইসব অবস্থার চিত্র অংকন করা হচ্ছিল যা শেষ বিচার দিবসে প্রভূ পরোয়ার দেগার সমীপে পেশ করা হবে। তাদের সৎ এবং মঙ্গলজনক কাজকর্ম বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাদেরকে মুখের ভরে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে এই বলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যে, 'এখন থেকে জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করো।'

৬. সফলতার শুভসংবাদ (البشارات بالنجاح) ঃ উপরি উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও মুসলিমগণ নিপীড়িত নির্যাতিত হওয়ার পূর্ব থেকে বরং বলা যায় যে, বহু পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ স্থায়ী বিবাদে জড়িয়ে পড়া কিংবা বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে ক্ষয়-ক্ষতির শিকারে পরিণত হওয়া নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী দাওয়াত পেশ করার প্রথম দিন থেকেই অজ্ঞদের অজ্ঞতা এবং তাদের অনুসৃত যাবতীয় ভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতির অবসান কল্পে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত পথে অচল অটল থাকা। এ দাওয়াতের আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী বিধি-বিধানের বিস্তরণ এ উদ্দেশ্যে বিশ্ব রাজনৈতিক এমনভাবে প্রভাবিত করা যাতে বিশ্বের জাতিসমূহকে আল্লাহর রেযামন্দি বা সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করা।

কুরআন মাজীদে এ শুভ সংবাদ কখনো আকার ইঙ্গিতে কখনো বা সুস্পষ্ট ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। অথচ গোটা পৃথিবীর উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আভাষ ইঙ্গিত সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মুসলিমগণ যখন এমন এক অবস্থায় নৈরাশ্যের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন অন্য দিকে আবার এমন সব আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিল যার মধ্যে বিগত নবীগণের ঘটনাবলী এবং তাঁদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন কারীগণের বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ ছিল। সে সব আয়াতে যে চিত্র অংকন করা হচ্ছিল তার সঙ্গে মক্কার মুসলিম ও কাফিরগণের অবস্থার হুবহু সাদৃশ্য ছিল। এ সকল ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এ ইঙ্গিতও প্রদান করা হচ্ছিল যে, সেই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যায়-অত্যাচারীগণ কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং আল্লাহর সৎ বান্দাগণ কিভাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এইভাবে সেই সব আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, আগামীতে মক্কাবাসাকারি মুশরিকগণের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ও বিফল হয়ে যাবে এবং মুসলিমগণ ও তাঁদের ইসলামী দাওয়াত পুরোপুরি সফলকাম হয়ে আরব ও আজমের উত্তরাধিকার লাভ করবে। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের মধ্যে এমন আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল যার মধ্যে মুসলিমগণের বিজয়ী হওয়ার শুভ সংবাদ বিদ্যমান ছিল। যেমনটি কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾ [الصافات: ١٧١: ١٧٧]

'আমার প্রেরিত বান্দাহ্দের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই বলা আছে যে, তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। আর আমার সৈন্যরাই বিজয়ী হবে। কাজেই কিছু সময়ের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। আর তাদেরকে দেখতে থাক, তারা শীঘ্রই দেখতে পাবে (ঈমান ও কুফুরীর পরিণাম)। তারা কি আমার শাস্তি তরান্বিত করতে চায়? শাস্তি যখন তাদের উঠানে নেমে আসবে, তখন কতই না মন্দ হবে ঐ লোকেদের সকালটি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল!।' [আস-স-ফফাত (৩৭) : ১৭১-১৭৭]

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر:٤٥]

'এ সংঘবদ্ধ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে আর পিছন ফিরে পালাবে।' (আল-ক্বামার ৫৪ : ৪৫)

﴿جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ﴾ [ص:١١]

'(আরবের কাফিরদের) সম্মিলিত বাহিনীর এই দলটি এখানেই (অর্থাৎ এই মাক্কাহ নগরীতেই একদিন) পরাজিত হবে।' [স-দ (৩৮): ১১]

যারা হাবাশায় হিজরত করেছিলেন তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٤١]

'যারা অত্যাচারিত হওয়ার পরও আল্লাহ্র পথে হিজরাত করেছে, আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই এ দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব, আর আখিরাতের পুরস্কার তো অবশ্যই সবচেয়ে বড়। হায়, তারা যদি জানত!' [আন-নাহ্ল (১৬): ৪১]

এভাবে কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইউসুফ (عليه السلام)-এর ঘটনা জিজ্ঞেস করল, তার উত্তরে আনুষঙ্গিক আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হল ঃ

﴿لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾ [يوسف:٧]

" ইউসুফ আর তার ভাইদের ঘটনায় সত্য সন্ধানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।' (ইউসুফ ১২ : ৭)

অর্থাৎ মক্কাবাসী মুশরিকগণ আজ ইউসুফ (عليه السلام)-এর যে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে এরা নিজেরাও অনুরূপভাবে অকৃতকার্য হবে যেমন ইউসুফ (عليه السلام)-এর ভাইগণ অকৃতকার্য হয়েছিল এবং তাদেরও রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা তাই হবে যা তাদের ভাইগণের হয়েছিল। তাদের ইউসুফ (عليه السلام) এবং তাঁর ভাইদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত উচিত যে, অত্যাচারীদের হার কিভাবে হয়।

পয়গম্বরের কথা উল্লেখ করে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ [إبراهيم:١٣، ١٤].

'কাফিরগণ তাদের রসূলদের বলেছিল, 'আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্য অবশ্যই বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে। এ অবস্থায় রসূলদের প্রতি তাদের প্রতিপালক এ মর্মে ওয়াহী করলেন যে, 'আমি যালিমদেরকে অবশ্য অবশ্যই ধ্বংস করব। আর তাদের পরে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই যমীনে পুনর্বাসিত করব। এ (শুভ) সংবাদ তাদের জন্য যারা আমার সামনে এসে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভয় রাখে আর আমার শাস্তির ভয় দেখানোতে শংকিত হয়।' [ইবরাহীম (১৪) : ১৩-১৪]

অনুরূপভাবে যে সময় পারস্য এবং রোমে যুদ্ধের আগুন জ্বলে রোমীয়গণ জয়ী হোক। কারণ আর যা হোক না কেন, রোমীয়গণ আল্লাহর উপর, পয়গম্বর, ওহী, আসমানী কিতাবসমূহ এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস করার

দাবীদার ছিলেন। কিন্তু পারস্যবাসীগণ যখণ জয়লাভের পথে অনেকটা অগ্রসর হল তখন আল্লাহ তা'আলা এ শুভ সংবাদকে যথেষ্ট মনে না করে তার পাশাপাশি এ শুভ সংবাদটিও প্রদান করেন যে, রোমীয়গণের বিজয়ী হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করবেন যাতে তারা সন্তোষ লাভ করবে। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٤، ٥]

'সেদিন মু'মিনরা আনন্দ করবে। (সে বিজয় অর্জিত হবে) আল্লাহ্র সাহায্যে।' [আর-রূম (৩০) : ৪-৫]

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার এ সাহায্যই বদর যুদ্ধে অর্জিত মহা সাফল্য এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করে। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অনুরূপ শুভ সংবাদ পরিবেশন করে মুসলিমগণকে উৎসাহিত করতেন। যেমন হজ্জের জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য গমন করতেন তখন শুধুমাত্র জান্নাতেরই শুভসংবাদ দিতেন না বরং পরিস্কার ভাষায় ঘোষণাও করতেন,

(يأيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكًا في الجنة)

অর্থ ঃ 'ওগো জনগণ! কালেমা লা ইলাহা ইলালাহ পাঠ করো তাহলে সফলকাম হবে এবং এর ফলে আরবের সম্রাট হতে পারবে ও আজম তোমাদের অধিনস্থ হয়ে যাবে। আবার তোমরা যখন মৃতুর পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখনো তোমরা সেখানে উচ্চ মর্যাদা ও প্রাধান্য লাভ করবে।'[1]

এ ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে যখন উতবা বিন রাবীয়াহ নবী ﷺ-এর নিকট পার্থিব জগতের পণ্য দ্রব্যের প্রস্তাব দিয়ে বিনিময় বা লেনদেন করতে চাইলে এবং তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ হামীম সিজদার আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনালেন তখন উতবার এ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ-ই জয়ী হবেন।

অনুরূপভাবে আবু তালিবের নিকট আগমনকারী কুরাইশগণের শেষ প্রতিনিধিদের সাথে নবী ﷺ-এর যে কথোপকথন হয়েছিল তারও বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। সে সময়ও নবী করীম ﷺ মুশরিকগণকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন যে, তারা যদি তাঁর শুধু একটি কথা মেনে নেয় তাহলে গোটা আরবজাহানে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এবং আজম তাদের অধিনস্থ হয়ে যাবে।

খাব্বার বিন আরত্ত বলেছেন যে, 'এক দফা আমি নবী কারীম ﷺ-এর খেদমতে হাযির ছিলাম। তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় একটি চাদরকে বালিশ করে শুয়েছিলেন। সে সময় আমরা মুশরিকগণের হাতে দারুণভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলাম। আমি বললাম, আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করছেন না কেন? এ কথা শ্রবণ করে নবী কারীম ﷺ-এর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি উম্মার সঙ্গে বললেন,

(لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه،

"যাঁরা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন তাঁদের শরীরের হাড়ে মাংস পর্যন্ত ছিল না। যাঁদের শরীরে মাংস ছিল তাঁদের মাংস পেশীতে লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়ানো হতো। কিন্তু নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হয়েও তাঁরা কোনদিন ধৈর্যচ্যুত হন নাই।

তারপর তিনি বললেন,

وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله — زاد بيان الراوى — والذئب على غنمه)

[1] তিরমিযী শরীফ।

'আল্লাহ এ বিষয়কে অর্থাৎ দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেবেন ইনশা-আল্লাহ। এমনকি সানআ হতে হাজারা মাওত পর্যন্ত একজন আরোহীর যাতায়াত কালে আল্লাহ ছাড়া কারোই ভয় থাকবে না। তবে ছাগলের জন্য বাঘের ভয় থাকবে।[১] অন্য এক বর্ণনায় এটাও আছে যে, (ولكنكم تستعجلون) কিন্তু তোমরা তাড়াতাড়ি করছ।[২]

এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এ শুভ সংবাদের কোন কিছুই গোপন ছিল না। মুসলিমগণের মতো কাফিরগণও এ সব ব্যাপারে সুবিদিত ছিল। তাদের এ সব কিছু অবগতির কারণে যখন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব এবং তার বন্ধুগণ সাহাবীগণ (রা.)-কে দেখতে পেত তখন বিদ্রুপ করে একজন অপরজনকে বলত, 'দেখ দেখ ঐ যে, পৃথিবীর সম্রাট এসে গেছে।'

এরা শীঘ্রই কায়সার ও কেসরা বাদশাহকে পরাজিত করবে। এ সব কথা বলে তার করতালি দিত এবং মুখে বিদ্রুপাত্মক শীষ দিত।[৩]

সে সময় সাহাবীগণের (রা.) বিরুদ্ধে অন্যায় অত্যাচার, উৎপীড়ন নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সবকিছুর ব্যাপ্তি এবং মাত্রা উভয় দিক দিয়েই চরমে পৌঁছেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও জান্নাত লাভের নিশ্চিত আশা, ভরসা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভসংবাদ ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় নিক্ষিপ্ত ও বিতাড়িত মেঘমালার মতো মুসলিমগণকে মানস আকাশ থেকে সব কিছুকে বিতাড়িত ও বিদূরিত করে দিত। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমগণের ঈমানী তালীমের মাধ্যমে অবিরামভাবে আধ্যাত্মিক খোরাক যোগাতেন, কেতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিয়ে আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করতেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সময়োচিত উপশেও নির্দ্দেশনা প্রদান করতেন। তাছাড়া আত্মসম্মানবোধ, দৈহিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা, চরিত্র মাধূর্য ও চারিত্রিক পবিত্রতা সহিষ্ণুতা, সংযম, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অসত্য, অন্যায় ও অবিচারের প্রতি ঘৃণা ও আপোষহীন সংগ্রাম ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সাহাবীগণ (রা.)-কে এমনভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন যেন, তাঁরা প্রয়োজনের মুহূর্তে এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে পারেন।

সর্বোপরি অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে বাহির করে হেদায়েতের আলোকজ্জ্বল প্রান্তরে এনে যখন তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিলেন তখন তাঁদের পূর্বের জীবন ও নতুন জীবনের মধ্যে রাতের অন্ধকার ও দিনের আলোর মতই পার্থক্য সূচিত হয়ে গেল। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল স্রষ্টার অনন্ত মহিমা ও সৃষ্টি দর্শন, সীমাহীন বিশ্বের অন্তহীন বিস্তার ও বৈচিত্র, মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাবনা পথ ও পাথেয় এবং পরলৌকিক জীবনের সাফল্যা-সাফল্য সম্পর্কিত মহাসত্যের উপলব্ধি।

উপরিএ বিষয়াদির আলোকে প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে এমন একটি সমন্বিত চেতানার সৃষ্টি হল যার মাধ্যমে বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, প্রবনতার মোড় পরিবর্তন, আত্মশক্তির উৎকর্ষ সাধন, নিবেদিত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা এমন এক জীবন গঠনে ব্রতী হয়ে গেলেন কোথাও তার কোন তুলনা মিলে না।

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫৪৩ পৃঃ।
[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ।
[3] ফেকহুস সীরাহ ৮৪ পৃঃ।

المرحلة الثالثة:

তৃতীয় স্তর

دعـــوة الإســـلام خـــارج مكـــة

মক্কাভূমির বাইরে ইসলামের দাওয়াত

তায়েফে রাসূল (الرسول ﷺ في الطائف) :

নবুওয়তের দশম বছর শওয়ালমাসে[1] (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে যেম মাসের শেষের দিকে কিংবা জুন মাসের প্রথম দিকে) নবী কারীম তায়েফ গমন করেছিলেন। তায়েফ মক্কা থেকে আনুমানিক ষাট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাতায়াতের এ দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেছিলেন পদব্রজে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসাহ পথ চলাকালে পথিমধ্যে যে কাবিলাহ বা গোত্রের নিকট তিনি উপস্থিত হতেন তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে তাদের পক্ষ থেকে কেউ সাড়া দেয় নি।

তায়েফ গমন করে সাকীফ গোত্রের তিন নেতার সঙ্গে যারা সকলেই সহোদর ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁর নাম ছিল যথাক্রমে আবদেইয়ালাইল, মাসউদও হাবীব। ভ্রাতৃত্রয়ের পিতার নাম ছিল আমর বিন ওমাইর সাকাফী। তাঁদের সঙ্গে (সাক্ষাতের পর মহানবী আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে চলা এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। তদুত্তরে একজন বলেন যে, সে কাবার পর্দা (আবরণ) ফেড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রাসূল করেছেন।[2] দ্বিতীয়জন বললেন, 'নবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পান নি? তৃতীয়জন বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি কোন ক্রমেই কথা বলবনা। প্রকৃতই যদি তুমি নবী হও তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হও তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।' তাঁদের এহেন আচরণ ও কথা বার্তায় তিনি মনঃক্ষুন্ন হলেন এবং সেখান থেকে যাবার প্রাক্কালে শুধু বললেন, 'তোমরা যা করলে এবং বললে তা গোপনেই রাখা।'

রাসূলুল্লাহ তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই 'তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও।' ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়লেন তখন তাঁকে উত্যক্ত অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য শিশু কিশোর ও যুবক দিগকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। ইত্যবসরে পথের দুইপাশ ভিড় জমে গেল। তারা হাত তালি, অশ্রাব্য অশীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ -এর পায়ের গোড়ালীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল।

তায়েফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ -এর উপর প্রস্তরনিক্ষেপ করছিল তখন যায়েদ বিন হারেসাই তাঁকে রক্ষার জন্য ঢালের মতো কাজ করছিলেন। ফলে তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ পথ চলতে থাকেন এবং দুরাচার তায়েফ বাসীগণ তাদের এ অত্যাচার অব্যাহত রাখে। আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত রুধিরাক্ত কলেবরে পথ চলতে গিয়ে নবী করীম খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত এক আঙ্গুর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বাগানটি ছিল রাবীয়ার পুত্র উৎবাও শায়বার। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে দুরাচার তায়েফবাসীগণ গৃহাভিমুখে ফিরে যায়।

---

[1] মাওলানা নাজীব আবাদী 'তারীখে ইসলাম ১ম খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠায় এবং বিশেষণ করেছেন এবং এটাই আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য।

[2] একটি পরিভাষার সঙ্গে এ উক্তির মিল রয়েছে 'তুমি যদি নবী হও তবে আলাহ আমাকে ধ্বংস করুন।" এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে দৃঢ়তার সঙ্গে একথা প্রকাশ করা যে তোমার নবী হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, যেমনটি সম্ভব নয় কাবার পর্দা ফাঁড়ার জন্য হাত বাড়ানো।

এ ব্যাপারটি তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নবী কারীম ﷺ আঙ্গুর গাছের ছায়ায় এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভের পর নবী কারীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন। তাঁর এ দু'আ 'দুর্বলদের দু'আ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর দু'আর এক একটি কথা তেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তায়েফ বাসীগণের দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দু'আ করলেন,

(اللّٰهُمَّ إليك أشكو ضَعْفَ قُوَّتِي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تَكِلُنِي؟ إلى بعيد يَتَجَهَّمُنِي؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سَخَطُك، لك العُتْبَى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك).

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু,তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যাস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাষিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই।

এ দিকে রাবীয়ার পুত্রগণ যখন মহানবী ﷺ-কে এমন এক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত অবস্থায় দেখতে পেল তখন তাদের মধ্যে গোত্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। আদাস নামক তাদের এক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসের হাতে এক গোছা আঙ্গুর তারা নবী কারীম ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিল। সেই ক্রীতদাসটি যখন আঙ্গুলের গাছটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে তুলে দিতে চাইলে তিনি তখন 'বিসমিলাহ' বলে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং খেতে আরম্ভ করলেন।

আদাস বলল, 'এমন কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি কোথায় থাক? তোমার ধর্ম কি?

সে বলল, 'আমি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং নিনওয়ার বাসিন্দা।'

নবী কারীম ﷺ বললেন, 'ভাল, তাহলে সৎ ব্যক্তি ইউনুস বিন মাতাব গ্রামে তুমি বাস কর, তাই না?

সে বলল, 'আপনি ইউনুস বিন মাতাকে কিভাবে চিনলেন?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী"। এ কথা শুনে আদাস নবী কারীম ﷺ-এর দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর মাথা ও হাত-পায়ে চুমু দিল।

এ ব্যাপারে দেখে রাবীয়া পুত্রদ্বয় নিজেদের মধ্যে বলাবলী করতে লাগল, 'দেখ, দেখ, ঐ ব্যক্তি দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়িয়ে দিল।'

এর পর আদাস যখন তাদের নিকট ফিরে গেল তখন ভ্রাতৃদ্বয় তাকে বলল, 'বলত দেখি ব্যাপারটি কী? ঐ ভদ্রলোক দেখছি তোমাকেও বিগড়িয়ে দিল।'

সে বলল, 'হে আমার মনিব! এ ধরাধমে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কেউই নেই। তিনি আমাকে এমন এক কথা বলেছেন যা নবী রাসূল ছাড়া অন্য কেউই জানে না।'

তারা দুজন বলল, 'দেখ আদাস, ঐ ব্যক্তি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।'

কিছুক্ষণ অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগান থেকে বের হয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। তার মিশনের বিফলতা জনিত চিন্তা ও দৈহিক যন্ত্রনার দাপটে হৃদয় মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও বিশ্রান্ত। এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি যখন কারণে মানায়েল নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশে জিবরাঈল (عليه السلام) সেখানে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা মণ্ডলী। আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা এ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিলেন যে, নবী ﷺ যদি ইচ্ছা করেন তা হলে দু'পাহাড়কে একত্রিত করে দুরাচার মক্কাবাসীকে পিশে মারবেন।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফে আয়েশা সিদ্দীকাহ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জীবনে কি এমন কোনদিন এসেছে যা ওহুদের দিন চাইতেও কঠিন ছিল?

তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ", তোমার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আমাকে যে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে কঠিন ছিল ঐ দিনটি যে দিন আমি ঘাঁটিতে বিচলিত ছিলাম, যখন আমি নিজেকে আবদে ইয়ালাইল বিন আবদে কুলালের পুত্রদের নিকট পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করায় দুশ্চিন্তা ও ব্যথায় পরিশ্রান্ত হয়ে আমি পিথে গমন করি। এভাবে চলতে চলতে 'কারনে সায়ালেবে' যখন এসে পৌঁছি তখন আমার চেতনা ফিরে আসে।

এ সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তিবোধের সৃষ্টি হয়। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দান করছে; ব্যাপারটি আরও ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে জিবরাঈল (عليه السلام) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশ্তাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদের কে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর পর্বতের ফেরেশ্তা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মদ ﷺ কথা এটাই আপনি যদি চান যে, এদেরকে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি তাহলে তাই হবে।'[1] নবী করীম ﷺ বললেন, 'না, বরং আমার আশা মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেও তাঁর অংশীদার ভাববে না।[2]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উত্তরে তাঁর অসাধারণ মানবত্ব প্রেমে সমুজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমাশীল অনুপম চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সাত আসমানের উপর হতে আগত এই গায়েবী মদদের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফেরেশ্তাগণ যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেন আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে তিনি সুস্থির চিত্তে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন। এভাবে তাঁর মানসাকাশ থেকে চিন্তা ভাবনার মেঘ দূরীভূত হয়ে যায়।

তারপর তিনি মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে ওয়াদীয়ে নাখলায় অবস্থান করেন। এখানে দুটো জায়গা বসবাসের উপযোগী ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আসসাইলুল কবীর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যায়মা। কেননা, সেখানে পানি ছিল কিছুটা সহজলভ্য এবং জায়গা দুটো ছিল শস্য শ্যামল। কিন্তু তিঁনি ﷺ এই দুটো জায়গার মধ্যে কোথায় অবস্থান করেছিলেন কোন সূত্র থেকেই তার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

---

[1] এ স্থলে সহীহ বুখারী আখশাবাইন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা হচ্ছে মক্কার দুটি প্রসিদ্ধ পাহাড়কে কুরাইশ এবং কাযাইকাযান। এ পাহাড় দুটি যথাক্রমে কাবা শরীফের দক্ষিণ ও উত্তরে পাশে মুখোমুখি অবস্থিত। সে সময় সাধারণ আবাসিক এলাকা ঐ দু'পাহাড়ের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

[2] সহীহ বুখারী কিতাবু বাদইল খালকে ১ম খণ্ড ৪৫৮ পৃঃ, মুসলিম শরীফ, বাবু মালাকেয়ান নাবীউ ﷺ মিন আয়াত মুমরিকীনা আল মুনাফেকীন ২য় খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা।

ওয়াদী নাখলায় তিনি যখন কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট জিনদের একটি দলকে প্রেরণ করেন যার উল্লেখ কুরআন মাজীদের দুটো জায়গায় এসেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সূরা আল-আহক্বাফে এবং অন্যটি সূরা জিনে। সূরা আহ্‌ক্বাফের আয়াতগুলো হচ্ছে,

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ
قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا
دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢٩: ٣١]

"স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হল, তখন তারা পরস্পরে বলল- চুপ করে শুন। পড়া যখন শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ৩০. (ফিরে গিয়ে) তারা বলল– হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব (এর পাঠ) শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পূর্বেকার কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপন্ন করে, সত্যের দিকে আর সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন।' (আল-আহক্বাফ ৪৬ : ২৯–৩১)

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا
أَحَداً - وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً - وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً - وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ
وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً - وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً - وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن
يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً - وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً - وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن
يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً - وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً - وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ
وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً - وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَباً - وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن
يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً - وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً - وَأَمَّا
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [الجن: :].

"১. বল, 'আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে তারপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি - যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। - আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী আর কোন সন্তান। - আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত। - আর আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবে না। - কতিপয় মানুষ কিছু জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। - (জ্বিনেরা বলেছিল) তোমরা (জ্বিনেরা) যেমন ধারণা করতে তেমনি মানুষেরা ধারণা করত যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। - আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ। - আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর

নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে। - আমরা জানি না (এই পরিবর্তিত অবস্থার মাধ্যমে) পৃথিবীবাসীর অকল্যাণই চাওয়া হচ্ছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাতে চান। - আর আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল, আর কতিপয় এমন নয়, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত। - আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না। - আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনতে পেলাম, তখন তার উপর ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি বা যুল্‌মের ভয় থাকবে না। - আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহ্‌র প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। - আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।' [আল-জিন (৭২) : ১-১৫]

এ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ এই আয়াত সমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী ﷺ জিনদের আগমনের কথা জনতেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে জিনদের আগমনের কথা অবহিত করেন এবং তখন তিনি তা জানতে পারেন। এ থেকে এও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এটাই ছিল জিনদের প্রথম আগমন। বিভিন্ন হাদিস সূত্রে জানা যায় যে, এর পর থেকে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে তাদের গমনাগমন চলতে থাকে।

জিনদের আগমন ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দ্বিতীয় সাহায্যমূলক ঘটনা যে, সাহায্য তিনি করেছিলেন তাঁর অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কারোই অবগতি ছিল না। এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাতে নবী করীম ﷺ-এর দাওয়াতের কামিয়াবির সুসংবাদ রয়েছে। অধিকন্তু, এটাও পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে, বিশ্বের কোন শক্তি তাঁর দাওয়াতের কার্যকারিতার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। অতএব ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأحقاف:٣٢]،

" আর যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দিবে না, দুনিয়াতে সে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না, আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নেই তার কোন সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। তারা আছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে।' [আল-আহক্বাফ (৪৬) : ৩২]

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ [الجن:١٢].

" আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না।' [আল-জিন ৭২: ১২]

এই সাহায্য ও সুসংবাদের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর যত প্রকারের চিন্তা ভাবন, দুঃখ-কষ্ট এবং নৈরাশ্য, তায়েফবাসীদের গালি-গালাজ, চাটিমারা ও প্রস্তর নিক্ষেপের কালো মেঘ সব কিছুই মন থেকে মুছে গেল। তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন তাঁকে মক্কায় ফিরে যেতেই হবে এবং নতুনভাবে ইসলামের দাওয়াত ও নবুওয়াতের তাবলীগ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করতে হবে। এটা ছিল ঐ সময়ের কথা যখন যায়েদ বিন হারেসাহ (رضي الله عنه) তাঁকে বলেছিলেন, 'মক্কা বাসীগণ অর্থাৎ কুরাইশগণ যে অবস্থায় আপনাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে সে অবস্থায় কিভাবে আপনি মক্কা প্রত্যাবর্তন করবেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হে যায়েদ! তুমি যে অবস্থা দেখছ এর একটা সুরাহা অবশ্যই হবে এবং আল্লাহ পাক অবশ্যই এ থেকে পরিত্রাণের একটি পথ বের করে দেবেন। তাঁর মনোনীত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং নিজ নবী ﷺ-কে জয়ী করবেন।

নবী করীম ﷺ শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে যাত্রা করলেন এবং মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করলেন। তারপর খোযায়া গোত্রের একজন লোক মারফত আখনাস বিন শুরাইকের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে তিনি যেন নবী কারীম ﷺ-কে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু আখনাস এটা বলে আপত্তি করলেন যে, কুরাইশরা হচ্ছেন তাঁর মিত্র। কাজেই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ﷺ-কে আশ্রয় প্রদান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর তিনি সুহায়েল বিন 'আমর এর নিকট ঐ একই অনুরোধ বার্তা প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনিও এ কথা বলে আপত্তি জানালেন যে, বনী আমেরের আশ্রয় দেয়া বনু কা'বের জন্য (সঙ্গত) হয় না। তারপর এতে সম্মত হয়ে নিজ সন্তানাদি এবং সম্প্রদায়ের লোকজনদের অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়ে কা'বার সন্নিকটে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান সম্মত হয়েছি সেহেতু যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অবশ্যই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণের পর মুতইম নবী করীম ﷺ-এর নিকট খবর পাঠালেন মক্কায় আগমনের জন্য। তিনি খবর পেয়ে যায়িদ বিন হারিসাহকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুতইম বিন আদী আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুতইম বিন আদী আপন বাহনের উপর দৌড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণঅ করলেন যে, 'হে কুরাইশগণ, আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে আশ্রয় প্রদান করেছি, কেউ যেন তাঁকে আর অনর্থক হয়রান না করে।'

এ দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সোজা হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা চুম্বন করেন। তারপর দু'রাকায়াত সালাত আদায় করেন এবং অস্ত্রসজ্জিত মুতইম বিন আদী ও তাঁর লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বলা হয়, এ সময় আবু জাহল মুতইমকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে আশ্রয় দিয়েছ না মুসলিমগণের অনুসারী হয়ে গিয়েছ?' উতরে মুতইম বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।' এর উত্তরে আবু জাহল বলেছিল, 'তুমি যাঁকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিলাম"।[১]

মুতইম বিন আদিরের সৌজন্য ও সহৃদয়তার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ভুলেন নাই। যখন বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের একটি দল বন্দী হয়ে আসে এবং কোন বন্দীর মুক্তির জন্য জুবায়ের বিন মুতইম নবীজী ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন তখন তিনি বললেন,

(لو كان المطعم بن عدى حيًا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له).

অর্থ ঃ যদি মুতইম বিন আদী জীবিত থাকত এবং এই দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুপারিশ করত তাহলে তাঁর খাতিরে ওদেরকে ছেড়ে দিতাম।[2]

---

[1] তায়েফ গমনের বিস্তারিত বর্ণনা ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৯ পৃঃ যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৪৬-৪৭ পৃঃ মোখতাসারুস সীরাহ, শাইখ আবদুল্লাহ ১৪১-১২৪ পৃঃ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ তফসীরে গ্রন্থ সমূহে হতে নেওয়া হয়েছে।

[2] বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৩ পৃঃ।

عرض الإسلام علي القبائل والأفراد

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ঃ

নবুওয়াতের দশম বর্ষের যিলকাদাহ মাসে (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনের শেষ কিংবা জুলাইয়ের প্রথম ভাগে) রাসূলুল্লাহ তায়েফ থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় নতুনভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠি এবং ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া আরম্ভ করেন। যেহেতু তখন সময়টা ছিল হজ্জ্ব মৌসুমের কাছাকাছি সেহেতু নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চললের লোকজনেরার পদব্রজে ও যানবাহনে হজ্জ্ব পালনের জন্য মক্কা শরীফে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। নবী কারীম এই মময়টাকে দাওয়াত দানের জন্য বেশ উপযোগী মনে করে এক এক গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন যা তিনি নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে করে আসছিলেন।

যে সকল গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলম (القبائل التي عرض عليها الإسلام) ঃ

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেছেন নবী কারীম যে যে গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন তাদের মধ্যে নিম্নের গোত্রগুলোর কথা আমাকে বলা হয়েছে। গোত্রগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

বনু আমের বিন সা'সাআহ, মহারেব বিন খাসফাহ, ফাযারাহ, গাস্‌সান, মুররাহ, হানিফাহ, সালীম, আবস, বনু নাসর, বানুল বকা, কালব, হারেস বিন কা'ব, আযরাহ ও হাযারেমা। কিন্তু এদের কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।[১]

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম যুহরী যে সকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের সকলের নিকট একই বছর অথবা একই হজ্জ্বের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়নি। বরং নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে আরম্ভ করে হিজরতের পূর্বের শেষ হজ্জ্ব মৌসুম পর্যন্ত দশ বৎসর সময়ের মধ্যে এ দাওয়াত পেশ করেছিলেন।[২]

ইবনে ইসহাক কোন কোন গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এবং তাদের উত্তরের অবস্থা, রকম, ধরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করা হল ঃ

১. বনু কালব ঃ নবী কারীম বনু কালব এর একটি শাখা বনু আবদুল্লাহর নিকটে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে নিজকে তাদের সম্মুখে পেশ করেন। আলাপ আলোচনা সূত্রে তিনি তাদের বলেন, 'হে বনু আবদুল্লাহ, আল্লাহ পূর্ব পুরুষদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন। তোমাদের উচিত আল্লাহর এ আহ্বান সাড়া দেয়া। কিন্তু এ গোত্র তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন নি।

২. বনু হানীফা ঃ নবী কারীম তাদের তাবুতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর আহ্বান জানিয়ে নিজকে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তারা এমন অশ্রাব্য উত্তর প্রদান করে যা আরবের অন্য কেউই প্রদান করেনি।

৩. আমের বিন সা'সাআহ ঃ রাসূলুল্লাহ এ গোত্রের লোকজনদেরও আল্লাহর পথে আহ্বান জানিয়ে নিজকে তাদের সামনে পেশ করেন। উত্তরে এ গোত্রের বুহায়রাহ বিন ফারাস নামক একটি লোক বলে যে, 'আল্ল-াহর কসম! যদি আমি কুরাইশদের এ যুবককে গ্রহণ করি তবে তাঁর দ্বারা সমগ্র আরবকে খেয়ে ফেলব।' আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বলুন, যদি আমরা আপনার নিকট আপনার এ ধর্মের উপর অনুগত্য স্বীকার করি এবং আল্লাহ আপনাকে বিপক্ষবাদীদের উপর জয়ী করেন তবে আপনার পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব কি আমাদের অর্পিত হবে?'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ বললেন, 'নেতৃত্বের চাবি কাঠিতো আল্লাহর হাতে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি নেতৃত্বের স্তম্ভ স্থাপিত করবেন।'

---

[1] তিরমিযী মুখতাসারুস সিরাত, শাইখ আবদুল্লাহ পৃঃ ১৪৯।

[2] রহমাতুলিত আলামীন ১/৭৪ পৃঃ।

লোকটি বলল, 'ভাল, আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের বক্ষ আপনার প্রতিপক্ষ আরবদের নিশানায় থাকবে, কিন্তু আল্লাহ যখন আপনাকে জয়ী করবেন তখন কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কারও হাতে থাকবে এটা কখনই হতে পারে না। কাজেই আপনার ধর্মের আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই।' মোট কথা তারা তাঁকে অস্বীকার করল।

এর পর যখন বনু আমের গোত্রের লোকজনেরা নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে এক বৃদ্ধাকে যিনি বার্ধক্যের কারণে হজ্জ্ব গমনে সক্ষম হন নি সমস্ত ঘটনা শুনালো এবং বলল যে, 'আমাদের নিকট কুরাইশ খানদারেন বুন আব্দুল মুত্তালিবের এক যুবক এসেছিল। তার ধারণা যে, সে আল্লাহর নবী। সে দাওয়াত দিল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করে যেন তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং আমাদের অঞ্চলে তাঁকে নিয়ে আসি।'

এ কথা শ্রবণে বৃদ্ধ লোকটি দু'হাত দিয়ে মাথা ধরে ফেলল এবং বলল, 'হে বন্ধু আমের! এখন কি এ ভুল সংশোধনের কোন পথ আছে? আর যা হস্তচ্যুত হয়েছে তার কি অনুসন্ধান করা যেতে পারে? সে সত্ত্বার শপথ! যার হাতে উমুকের প্রাণ আছে ইসমাঈল (عليه السلام)-এর গোত্রের কারও পক্ষে এ (নবুওয়াতের) মিথ্যা দাবী করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই সত্য নবী। তোমাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি কি লোপ পেয়েছিল?[1]

ঈমানের শিখা মক্কার বাইরে (المؤمنون من غير أهل مكة) ঃ

যেভাবে মহানবী ﷺ গোত্র ও দল সমূহকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন তেমনভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

এর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে ভাল সাড়া পাওয়া যায়। অধিকন্তু হজ্জ্বে এ মৌসুমের কিছুদিন পর কয়েক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ করা হল :

১. সু'ইদ বিন সামেত ঃ তিনি কবি, গভীর জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী এবং মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপক্কতা, অভিজ্ঞতা, কাব্যচর্চা, সামাজিক মর্যাদা এবং বংশমর্যাদার কারণে জাতি তাঁকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করেন। হজ্জ্ব এবং ওমরা করার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার নিকট যে জিনিস রয়েছে সম্ভবতঃ আপনার নিকটও জিনিস রয়েছে। উত্তরে নবী কারীম ﷺ বললেন 'আপনার নিকট কি কি জিনিস রয়েছে।' সু'ইদ বললেন, 'হিকমতে লোকমান।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তা নিয়ে এসো' এবং তিনি তা নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অবশ্যই একথা ভাল। কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা এ থেকেও উত্তম এবং তা হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ আলকুরআন যা আল্লাহ আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। উহা হেদায়েত ও জ্যোতি।' এর পর নবী কারীম ﷺ তাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'এতো খুব ভালো কথা। তারপর তাঁর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই বুআসের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় এবং সে যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করা হয়।[2] নবুওয়াতের একাদশবর্ষের প্রথম ভাগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[3]

২. ইয়াস বিন মুয়ায ঃ তিনিও মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন নব্য যুবক। নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে বুআ-সের যুদ্ধের কিছু পূর্বে আউস গোত্রের একটি দল খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মিত্রতা ও সাহয়তা লাভের সন্ধানে মক্কা আগমন করেন। ইয়াস বিন মুয়াযও সে দলের সঙ্গে এসেছিলেন। সে সময় ইয়াসরাবে আউসও খাযরাজ এ উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। যুদ্ধে আউসদের তুলনায় কাযরাজদের সংখ্যাধিক্য ছিল। আউসদের মক্কা আগমনের কথা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট গেলেন এবং যুদ্ধের বিভীষিকা ও ক্ষয় ক্ষতির কথা ভেবে তাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'আপনারা যে উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন তার চাইতেও কি উত্তম বস্তু গ্রহণ করতে পারেন?"

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪২৪-৪২৫ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১/৪২৫-৪২৭ রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৭৪ পৃঃ।

[3] তারীখে ইসলাম আকবরশাহ নাজীবাবাদী ১/১২৫।

তাঁরা বললেন, 'উহা কি জিনিস?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে নিজ বান্দার নিকট এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেন তাঁদের এ কথার দাওয়াত দেই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করবে না। আল্লাহ আমার উপর কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তিনি আরও কিছু আলাপ আলোচনা করলেন এবং কুরআন শরীফের কিয়দংশ পাঠ করে শোনালেন।

ইয়াস তিনি বললেন, 'হে আমার গোত্রীয় ভাইয়েরা, আল্লাহর শপথ তোমরা যে জন্য আগমন করেছ, এ হচ্ছে তার তাইতে অনেক বেশী উত্তম।' কিন্তু দলের একজন সদস্য আবুল হায়সার আনাস বিন রাফে' এক মুষ্টি কঙ্কর উঠিয়ে ইয়াসের মুখে মারল এবং বলল, 'এ কথা ছাড়। আমার বয়সের শপথ আমরা এ স্থানে অন্য উদ্দেশ্যে আগমন করেছি।' এ কথা শোনার পর ইয়াস নীরবতা অলম্বন করল। নবী করীম -ও সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। দলটি কুরাইশদের সঙ্গে মিত্রতা ও সহায়তা চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয় নি, তারপর এক রাশ নৈরাশ্য নিয়ে তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

মদিনায় প্রত্যাবর্তনের অল্প দিন পরেই ইয়াস মৃতুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাহলীল (লা ইলাহা ইলাল-াহ), তাকবীর (আল্লাহ আকবর), হামদদ ও তাসবীহ জপতে ছিলেন। এ কারণে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মৃত্যু ইসলামের ঈমানের উপর হয়েছিল।[১]

৩. আবু যার গেফারী ঃ তিনি ইয়াসরিবে বসবাস করতেন। যখন সু'ইদ বিন সামেত ও ইয়াস বিন মুয়ায মারফরত রাসূলুল্লাহ -এর আবির্ভাবের কথা তিনি শ্রবণ করলেন তখন তাঁর কর্ণকূহরে তিনি প্রচণ্ড একটি ধাক্কার মতো অবস্থা করলেন এবং সেটাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়াল।[২]

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস -এর বর্ণনা মতে আবু যার বলেছেন, 'আমি ছিলাম গেফার গোত্রের একজন লোক। আমি জানতে পারলাম যে, মক্কায় এমন একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আপন ভাইকে বললাম তুমি লোকটির নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল এবং খবর নিয়ে এসো। সে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ফিরে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর এনেছ? সে বলল, 'আল্লাহ কসম! আমি এমন মানুষ দেখেছি যিনি ভালোর জন্য আদেশ এবং মন্দের জন্য নিষেধ করছেন। আমি বললাম, তুমি সুন্তোষজনক উত্তর দিলে না। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই কাঁধে খাদ্যের ঝুলি এবং হাতে লাঠি নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌঁছে গেলাম, কিন্তু তাঁকে চিনতাম না। এবং তাঁর সম্পর্কে কাউকেও জিজ্ঞেস করব তাও সাহস পাচ্ছিলাম না।

ফলে আমি যমযমের পানি পান করতাম এবং মসজিদুল হারামে পড়ে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আমার নিকট দিয়ে আলী পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, 'লোকটিকে অপরিচিত মনে হচ্ছে।' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'ভালো কথা, আমার বাসায় চলুন।' আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তাঁর সঙ্গে নেহাৎই মামুলী গোছের কিছু কথাবার্তা হল। তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। যে উদ্দেশ্যে আমার আগমন সে সম্পর্কে আমিও তাঁকে তেমন কিছু বললাম না। এভাবে রাত্রি অতিবাহিত হল।

সকাল হতে না হতেই আমি এ উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামে গেলাম যে, সেখানে নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিল না। যিনি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন। শেষ পর্যন্ত দেখলাম আবাও আলী সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি কিছুটা যেন নিজে নিজেই বললেন, 'এ লোক তো দেখছি এখনো তাঁর ঠিকানা জানতে পারেন নাই।'

---

[1] ইবনে হিশাম ১/৪১৭, ৪২৮ পৃঃ।

[2] এ কথা আকবর শাহ নাজীরাবাদী লিখেছেন তাঁর তারীখে ইসলামে ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ।

আমি বললাম, 'জী না"। তিনি বললেন, 'ভালো, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো আপনার ব্যাপারটি কী? কি উদ্দেশ্যে আপনি এ শহরে এসেছেন?'

আমি বললাম, 'আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি যা বলব আপনি যতি তা গোপন রাখেন তাহলে আমি বলব?'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আমি তাই করব।'

এ প্রেক্ষিতে আমি বললাম, 'আমি জানতে পেরেছি যে, এখানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য, কিন্তু সে ফিরে গিয়ে সন্তোষ জনক কোন কিছুই বলতে সক্ষম হয় নি। এ জন্য আমি ভাবলাম যে, নিজে গিয়েই সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আসি।

আলী (রাঃ) বললেন, 'ভাই তুমি সঠিক জায়গাতেই পৌছেছ। দেখ আমার যাত্রা তাঁর দিকেই। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর যদি এমন কোন লোক দেখি যে, তোমার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে তাহলে আমি তখন কোন প্রাচীরের গায়ে এমনভাবে থাকব যাতে মনে হবে যেন আমি আমার জুতো ঠিক করছি। তুমি কিন্তু তখন পথ চলতেই থাকবে।'

এরপর আলী (রাঃ) যাত্রা শুরু করলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁকে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন।' হৃদয়স্পর্শী ভাব ও ভাষার মাধ্যমে তিনি আমার নিকট ইসলামের মূল বক্তব্য পেশ করলেন। বিষয় ও বক্তব্যে অভিভূত হয়ে আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে আবু যার, এ ব্যাপারটি গোপন রাখো এবং নিজ এলাকায় চলে যাও। যখন আমার বিজয়ের সংবাদ অবগত হবে তখন চলে আসবে। আমি বললাম, 'ঐ মহান সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের বাণী বাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি তাদের মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে এ সত্য প্রচার করব।'

এরপর আমি মসজিদুল হারামে এলাম। কুরাইশ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি তাদের লক্ষ্য করে বললাম,

أشهد أن لا إله إلا الله وأشد أن محمدا عبده ورسوله

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আমার মুখ থেকে তাওহীদ বাণী শ্রবণ করা মাত্র কুরাইশগণ এমনভাবে আমাকে মারপিট শুরু করল যেন, আমি মরে যাই। এমন এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত অবস্থা থেকে আমাকে উর্দ্ধার করলেন আব্বাস (রাঃ) জনতার ভিড়ের মধ্যখানে উঁকি দিয়ে তিনি আমাকে দেখতে পেলেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা ধ্বংস হও। তোমরা গেফার গোত্রের একজন লোককে মারপিট করছ অথচ তোমাদের সফর ও ব্যবসার জন্য যাতায়াতের পথই হচ্ছে গেফার গোত্রের মধ্য দিয়ে। এ কথা শ্রবণের পর তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

দ্বিতীয় দিন সকাল হলে আমি আবারও সেখানে গেলাম এবং গতকাল যা বলেছিলাম আজও তা বললাম। অর্থাৎ উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম তাওহিদ বাণী 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইলালাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু।' আমার উচ্চারিত কালেমা শাহাদাত শ্রবণের পর গতকালের মতই তারা আমাকে মারপিট শুরু করল। আজও আব্বাস (রাঃ) ওদের হাত থেকে উর্দ্ধার করলেন। তিনি আমার প্রতি ঝুঁকে পড়ে কুরাইশদের লক্ষ্য করে আবারও সেই কথাগুলো বললেন যা বলেছিলেন গতকাল।[1]

---

[1] সহীহ বুখারী কিস্‌সাতে ১ম খণ্ড ৪৯৯-৫০০, 'বাবু ইসলামে আবী যার" ১/৫৪৪-৫৪৫।

৪. তোফাইল বিন আমর দাওসী ঃ তিনি দাওস গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি এবং একজন শরীফ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব । তাঁর গোত্রের কোন কোন সদস্য ইয়ামেনের কোন কোন অঞ্চলে রাজত্ব করত। তিনি নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে মক্কা গমন করেন। সেখানে উপনীত পূর্বাহ্নে মক্কাবাসী কাফেরগণ তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় এবং সম্মান প্রদর্শন করে। এরপর তাঁর নিকট এ বলে আরয করে যে, 'হে সম্মানিত মেহমান তোফায়েল! আমাদের শহরে আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু একটি লোকের কারণে আমাদের সব আনন্দ নিরানন্দে পর্যবসিত হচ্ছে। সে নানা ধরণের নতুন নতুন কথাবার্তা বলে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, আমাদের একতা বিনষ্ট করেছে এবং শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। তাঁর কথাবার্তা অনেকের উপর যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করছে সে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই এবং স্বামী-স্ত্রী মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমরা যে বিপদে পড়েছি আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় যেন অনুরূপ বিপদে না পড়েন। অতএব আপনি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বললেন, কিংবা তাঁর কোন কথাও শুনবেন না।'

তোফায়েল যেভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, 'তাঁরা আমাকে বরাবর বুঝতে থাকল। এবং এ প্রেক্ষিতে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমি তাঁর কোন কথা শ্রবণ করব না। তাঁর সঙ্গে কোনরূপ কথাবার্তাও বলব না। এমন কি আমি যখন মসজিদুল হারামে গেলাম তখন কানের ভিতরে খানিকটা তুলো প্রবেশ করিয়ে নিলাম যাতে তাঁর কোন কথা আমাদের কর্ণগোচর না হয়। কিন্তু খুব সম্ভব আল্লাহর ইচ্ছা হয়তো তা ছিল না। হয়তো এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর কথা আমাকে শুনতে হবে। ফলে খুব ভালভাবেই আমি তাঁর কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তারপর আমি মনে মনে বললাম হায়! আমার সর্বনাশ হোক! আমি তো আল্লাহর কৃপায় একজন বুদ্ধিমান মানুষ এবং কবি। আমার নিকট ভালোমন্দ গোপন থাকবে না, তবে কেন আমি সে ব্যক্তির কথা শুনব না? যদি তাঁর কথাবার্তা ভালো হয় তা গ্রহণ করে নিব, যদি মন্দ হয় ছেড়ে দিব। এ সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে আমি থেমে গেলাম এবং যখন তিনি বাসায় ফেরার জন্য পথ ধরলেন তখন আমিও তাঁর পিছনে চললাম।

পথ চলতে চলতে গিয়ে তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমিও প্রবেশ করলাম এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য, কুরাইশগণের আমাকে ভয় দেখানো, তাঁর কথাবার্তা না শোনার জন্য শ্রবণ পথে তুলা দিয়ে রাখা, তা সত্ত্বেও তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার বক্তব্য এখন পেশ করুন।'

তিনি আমার নিকট ইসলামের কথা পেশ করলেন এবং কুরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী আছেন। এর চাইতে উত্তম কথা এবং ইনসাফের বাণী ইতোপূর্বে আমি আর কখনো শ্রবণ করিনি। কুরআনুল মাজীদের বাণী এবং তাঁর বক্তব্যের স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং কালেমা শাহাদাদ উচ্চারন করে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করলাম। তারপর এ কথা বলে তাঁর নিকট আরয করলাম যে, 'আমার সম্প্রদায় আমার কথা মান্য করে। আমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করব। অতএব, আপনি আল্লাহ পাকের দরবার দু'আ করবেন যেন তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে কোন নিদর্শন প্রদান করেন।' এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর বরকতে তোফায়েলকে যে নিদর্শন দেয়া হয়েছিল তা ছিল, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল ছিল প্রদীপের আলোর মতো আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর মানসিক কিংবা অন্য কোন অসুবিধার প্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহর দরবার প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ মুখমণ্ডলের পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে এ নিদর্শন প্রকাশিত হোক। আমার ভয় হয় মানুষ উহাকে বিকৃত বলবে। ফলে এ জ্যোতি তাঁর লাঠিতে প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল। এরপর তিনি তাঁর পিতা এবং স্ত্রীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন এবং উভয়েই তা গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যান। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণে যথেষ্ট বিলম্ব করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এর ফলে দেখা যায় যখন

খন্দকের যুদ্ধের পর[১] হিযরত করেন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের ৭০টি থেকে ৮০টি গোত্রের লোক ছিল। তোফায়েল (রাঃ) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সাধন করে ইয়ামামার যদ্ধে শহীদ হন।[২]

৫. যেশাদ আযদী ঃ তিনি ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী এবং আযদে শানুওয়াহ গোত্রের এক ব্যক্তি। তাঁর কাজ ছিল মানুষের অসুখ বিসুখের ক্ষেত্রে ঝড় ফুঁক করা এবং প্রেতাত্মা দূরীভূত করা। মক্কায় আগমনের পর ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে পরস্পর অবগত হলেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) একজন পাগল। তারা তাঁকে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি এ ভেবে চিন্তা তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি তাঁর হাতে সুস্থ হতেও পারেন। কাজেই তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলুন, 'আমি প্রেতাত্মা ভালো করার জন্য ঝাড়ফুঁক করে থাকি। আপনার কি সেরূপ কোন প্রয়োজন আছে।' উত্তরে তিনি বললেন,

(إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، مَن يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ)

অর্থ ঃ অবশ্যই সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। যাকে আল্লাহ সৎপথ দেখান তিনি পথভ্রষ্ট হন না এবং যাকে তিনি বিপথে চালিত করেন তাকে কেউই সৎপথে চালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনই ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনই অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং বান্দা।

তারপর যেমাদ বললেন, আপনার কথাগুলো পুনরায় বলুন, আমি শুনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় একাদিক্রমে তিন বার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। এ কথা শ্রবণে ভাবগদগদ কণ্ঠে যেমাদ বললেন, 'আমি জ্যোতিষ, যাদুকর এবং কবিদের কথাবার্তা শুনেছি কিন্তু আপনার কথার মতো এত চিত্তোদ্দীপক ও হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা কখনই শুনিনি। গভীরতম সমুদ্রের তলদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহা প্রবাহের মতো এ আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে ভাব ও আবেগ আন্দোলিত এবং উচ্ছ্বসিত করে তুলছে।'

তারপর তিনি নবী কারীম (ﷺ)-এর দিকে অত্যন্ত ভক্তিভরে হাত বাড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আপনি এ হাতে গ্রহণ করে ইসলামের প্রতি আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। যেয়াদ এভাবে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[৩]

ইয়াসরিরের ছয়টি পূণ্যবান আত্মা (ست نسمات طيبة من أهل يثرب) ঃ

একাদশ নবুওয়াত বর্ষে (জুলাই ৬২৩ খৃষ্টাব্দে) হজ্জের মৌসুম ফিরে এলো। ইসলামী দাওয়াতের কয়েকটি কার্যকরী বীজ হস্তগত হল যা দেখতে দেখতে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হল। এর ঘন শাখা-প্রশাখা ও পত্র পলবের সুশীতল ছায়ায় বসে মুসলিমগণ বহু বছরের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের উত্তাপ থেকে কিছুটা আরামও শান্তি পেলেন।

মক্কাবাসী মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং লোকজনকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখার জন্য প্রতিবন্ধকতার যে দেয়াল সৃষ্টি করে রেখেছিল তা এড়িয়ে চলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ট্রাটেজী বা কর্ম কৌশল পরিবর্তন করে নিলেন। মুশরিকরা যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে তদুদ্দেশ্যে দিবা ভাগের পরিবর্তে তিনি রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন।

---

[1] বরং হোদায়াবিয়ার সন্ধির পর। কারণ যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখন নবী (ﷺ) খায়বারে ছিলেন। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৮৫ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৮২-১৮৩ পৃঃ। রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৮১-৮২ পৃঃ, মুখতাসীর সীরাত শাইখ আবদুল্লাহ রচিত ১৪৪ পৃঃ।

[3] সহীহ মুসলিম শরীফ, মিশকাতুল মাসাবীহ, বারো আলামাতেন নবুওয়াত, ২য় খণ্ড পৃঃ।

এ কর্ম কৌশল বা পদ্ধতির অনুসরণে একরাত্রি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (رضي الله عنه) ও আলী (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। বানুযোহাল ও বাণী শায়বান বিন সা'লাবাহগণের বাসস্থানের নিকট দিয়ে যাবার সময় ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন। আলাপ আলোচনার সময় তাদের সাড়া খুব অনুকূল বলে মনে হলেও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মূলক কোন কিছুই তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। এ সময় আবু বকর (رضي الله عنه) ও বনু যোহলের এক ব্যক্তির সঙ্গে বংশ পরস্পরা সম্পর্কে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা হল। উভয়েরই বংশধারা সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।[১]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গীদের নিয়ে মীনার চৌক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় অদূরে কিছু সংখ্যক লোকের কথোপকথন তাঁর শ্রুতিগোচর হল।[২] কাজেই, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি সে দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এ দলে ছিলেন ইয়াসরাবের খাযরাজ গোত্রের ছয় জন যুবক। তাঁদের নাম হল যথাক্রমে ঃ

(১) আসয়াদ বিন যুরারাহ,	(বনু নাজ্জার গোত্রের)
(২) আউন বিন হারেস বিন রেফাআহ (ইবনে আফরা),	(বনু নাজ্জার গোত্রের)
(৩) রাফে বিন মালিক বিন আজলান,	(বনু যুরাইক গোত্রের)
(৪) কুতবা বিন আমের বিন হাদীদাহ,	(বনু সালমা গোত্রের)
(৫) উকবা বিন আমের বিন নাবী,	(বনু হারাম বিন কা'ব গোত্রের)
(৬) হারেস বিন আবদুল্লাহ বিন রেআব।	(বনু উবাইদ বিন গানাম গোত্রের)

এটা ইয়াসরাববাসীগণের সৌভাগ্য যে, তাঁরা তাঁদের মিত্র ইহুদীদের নিকট থেকে অবগত হয়েছিলেন যে, এ যুগে একজন নবী প্রেরিত হবেন এবং শ্রীঘ্রই তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। ইহুদীরা বলতেন যে, 'আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর সঙ্গে তোমাদেরকে এরমের আদদের মতো হত্যা করব।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলতে চলতে গিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা খাযরাজ গোত্রে সঙ্গে সম্পর্কিত।' তিনি বললেন, 'অর্থাৎ ইহুদীদের মিত্র?'

তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ'।

তিনি বললেন, 'আপনারা বসুন না কিছু কথাবার্তা হোক।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শ্রবণের পর তাঁরা বসে পড়লেন। তিনি তাঁদের ইনুখে ইসলামের হকীকত বর্ণনা করার পর কুরআন শরীফ থেকে তেলওয়াত করে শোনালেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে দাওয়াত লাভের পর তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'ইনিতো সেই নবী বলে মনে হচ্ছে যাঁর উল্লেখ করে ইহুদীগণ তোমাদিগকে ধমকাচ্ছে। কাজেই ইহুদীগণ যেন তোমাদেরকে পিছনে ফেলতে না পারে।' এ কথা বলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ইসলামের দাওয়াত কবুল করে মুসলিম হয়ে গেলেন।

এঁরা ইয়াসরিবের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সাম্প্রতিককালে ইয়াসরিবে যে, যুদ্ধ হয়ে গেল এবং যার ধোঁয়া এখনো। ইয়াসরিবের আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, যুদ্ধে তাঁদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে। এ জন্য তাঁরা আশা করেছিলেন যে, ইসলামের এ দাওয়াতই এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর একটা সূত্র হতে পারে। এ জন্য তাঁরা বললেন, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এমন এক অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমনশত্রুতা ও দুষমনীর সৃষ্টি হয়েছে, যার কোন নজির নেই। আশা করি আপনার দাওয়াতই তাদেরকে একত্রিত করে দিবে। আমরা সেখানে ফিরে গিয়ে লোকদের আপনার কাজের প্রতি আহ্বান জানাব এবং আপনার

[1] শাইখ আবদুল্লাহ মুখতাসারুস সীরাহ ১৫০-১৫২ পৃঃ।

[2] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৮৪ পৃঃ।

[3] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫০ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪২৯ ও ৫৪১ পৃঃ।

দাওয়াতের কারণে আল্লাহ তাঁদের একত্রিত করে দেন তবে আপনার চাইতে অধিক আর কেউই সম্মানিত হবে না।

এরপর তাঁরা যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সেই সঙ্গে ইসলামের সংবাদ ও পয়গাম সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যার ফলে সেখানে ঘরে ঘরে রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত প্রসার লাভ করল।[1]

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সঙ্গে বিবাহ (استطراد — زواج رسول الله ﷺ بعائشة) ঃ

এ বছরই অর্থাৎ একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে মনোনীত নয় বছর বয়সে উম্মুলমু'মিনীন আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন।[2] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তম সাহাবী আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নবী ﷺ-এর সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল এ অসম বিবাহের। (অনুবাদক)

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪২৮ ও ৪৩০ পৃঃ।

[2] তালকিহুর পহুম ১০ পৃঃ, সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৫৫০ পৃঃ।

الإســـــراء والمعـــــراج

নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন

নবী কারীম ﷺ-এর তাবলীগ ও দাওয়াতের কৃতকার্যতা এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের মধ্য পর্যায়ে অতিক্রম করে চলছে। সুদূর আকাশের প্রান্তে আশার ক্ষীণ আলো এবং ধূলিযুক্ত ঝলক দৃষ্টি গোচর হতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এমন সময়ে নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমনের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। (একে আরবী ভাষায় বলা হয় মি'রাজ এবং এ নামেই ঘটনাটির সমাধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে)।

মি'রাজের এ বিশ্ববিশ্রুত অলৌকিক ঘটনাটি কোন সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল,

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল সে বছর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (এটা তাবারীর কথা)।

২. নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (ইমাম নববী এবং ইমাম কুরতুবী এ মত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেছেন)।

৩. দশম নবুওয়াত বর্ষের ২৭শে রজব তারীখে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। (আলামা মানসুরপুরী এ মত গ্রহণ করেছেন)।

৪. হিজরতের ষোল মাস পূর্বে, অর্থাৎ নবুওয়াত দ্বাদশ বর্ষের রমযান মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের মুহারম মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৬. হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়া ত্রয়োদশ বর্ষের রবিউল আওয়াল মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি মত এ জন্য সহীহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না যে, উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বে। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে সকলেই এক মত যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে। কাজেই, এ থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর মৃত্যু হয়েছিল মি'রাজের পূর্বে। তাছাড়া, এটাও সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দশম নবুওয়াত বর্ষের রমাযান মাসে। এ প্রেক্ষিতে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মি'রাজের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে, পূর্বে নয়।

অবশিষ্ট থাকে শেষের তিনটি মত। এ তিনটির কোনটিকেই কোনটির উপর অগ্রাধিকার দানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সূরা 'ইসরার' বর্ণনাভঙ্গী থেকে অনুমান করা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা জীবনের শেষ সময়ে।[1]

হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনায় যে, বিস্তারিত রওয়ায়েত প্রদান করেছেন পরবর্তী পঙক্তিগুলোতে তার সার সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

ইবনে কাইয়ূম লিখেছেন প্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বশরীরে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবাঈল (عليه السلام) মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবরতণের পর সেখানে সমাগত নবীগণ (عليهم السلام)-এর জামাতে ইমামতি সহকারে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাঁকে বুরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম আসমানের দরজা

---

[1] বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে দেখুন যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৪৯ পৃঃ মুকতাসারুস সীরাহ শাইখ আবদুল্লাহ পৃঃ ১৪৮-১৪৯। রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৭৬ পৃঃ।

খোলা হয়ে সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম (عليه السلام)-এর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। জিবরাঈল (عليه السلام) এঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, 'ইনি হচ্ছেন আপনার আদি পিতা আদম (عليه السلام)। এঁকে সালাম করুন। এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শ্রদ্ধাভারে সালাম জানান। আদম (عليه السلام) আবেগ আপুত কণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'খোশ আমদেদ!' হে বংশের মধ্যমনি! খোশ আমদেদ! হে আমার বংশের গৌরব!' তারপর তিনি তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাগণের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাগণের আত্মা সমূহ তাঁকে প্রদর্শন করালেন।

এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খোলা হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম (عليه السلام)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় পূর্বের পর তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। উভয়েই সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারাকবাদ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফ (عليه السلام)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদরীস (عليه السلام)-কে দেখেন এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়ারেত স্বীকারোক্তি করেন।

পঞ্চম আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন ইমরান (عليه السلام)-কে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি যথারীতি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

তারপর রাসূলে কারীম ﷺ-কে ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মুসা বিন ইমরান (عليه السلام)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন। মুসা (عليه السلام) সম্ভ্রমের সঙ্গে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ যখন সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, 'আমার পূর্বে এমন এক যুবককে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যাঁর উম্মদগণ আমার উম্মতদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেন।"

অগ্রযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় ইবরাহীম খলীলুলাহ (عليه السلام)-এর সঙ্গে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিও সমম্ভ্রম সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

ইবরাহীম (عليه السلام)-এর সঙ্গে মোলাকাতের পর তাঁর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং তিনি গিয়ে উপস্থিত হন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। এখানে জিব্রাঈল (عليه السلام) যাত্রা বিরতি করলেন। অগ্রযাত্রা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। কাজেই বুরাক পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাসূলুল্লাহ ﷺ একাই চলতে থাকলেন সম্মুখের পানে। চলার শেষ পর্যায়ে তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন বায়তুল মা'মুরের নিকট। এখানে মহানবী ﷺ-এর মহাবাহন বুরাক তার যাত্রা শেষ করল।

তারপর এ বিশ্বের মহা গৌরব, চির আকাঙ্খিত মানব নবী, দোজাহানের মহাসম্মানিত সম্রাট, তাজদারে মদীনা, নবীকূল শিরোমনি, রহমাতুলিল আলামীন, খাতামুন্নাবিয়ীন নীত হলেন অনাদি অনন্ত, অবিনশ্বর, অসীম শক্তি-সামর্থ ও হিকমতের মালিক আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। পর্দার একপাশে চির বিশ্ব জাহানের চির আরাধ্য, চির উপাস্য, অদ্বিতীয় স্রষ্টা প্রতিপালক প্রভূ, অন্যপাশে তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রিয়তমনবী মুহাম্মদ ﷺ, মধ্যখানে রয়েছে দু'ধনুকের জ্যার সমপরিমাণ ব্যবধান কিংবা তার চাইতেও কম। অনুষ্ঠিত হল

স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকার, অশ্রুত পূর্ব সম্মেলন। অত্যন্ত প্রতাপম্বিত স্রষ্টা প্রভূ-এবং মনোনীত প্রিয়তম সৃষ্টির মধ্যে হল আল্লাহর বাণী বিনিময়। তোহফা স্বরূপ বরাদ্দ করা হল পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাত।

এরপর শুরু হল নবীজী ﷺ-এর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তনের পালা। এক পর্যায়ে সাক্ষাৎ হল মুসা (عليه السلام)-এর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে। উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের কথা।

উত্তরে মুসা (عليه السلام) বললেন, 'আপনার উম্মতের পক্ষে সম্ভব হবে না পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। আপনি ফিরে গিয়ে আপনার উম্মতের উপর আরোপিত এ গুরু দায়িত্ব হালকা করে নেয়ার জন্য আল্লাহর সমীপে আবেদন পেশ করুন।

এ কথা শ্রবণের পর জিবরাঈল (عليه السلام)-এর পরামর্শ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জিবরাঈল (عليه السلام) ইঙ্গিত বুঝালেন যে, তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তা করতে পারেন। এরপর জিবরাঈল (عليه السلام) তাঁকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে গেলেন, তিনি নিজ স্থানেই ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় সহীহ বুখারী শরীফে এ কথা আছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নীচে আনা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুসা (عليه السلام)-এর নিকট আগমন করে দশওয়াক্ত কমানোর কথা বললেন, তখন তিনি পুনরায় পরামর্শ দিলেন আল্লাহর সমীপে ফিরে গিয়ে এ গুরুভার আরও লাঘব করার জন্য আরও আবেদন পেশ করতে। শেষমেষ পাঁচওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত মুসা (عليه السلام) এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দু'মঞ্জিলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যাতায়াত অব্যাহত থাকল। শেষ দফায় যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেয়া হল তখনো মুসা (عليه السلام) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন পুনরায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে গিয়ে আরও কিছুটা হালকা করে নেয়ার জন্য। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পুনরায় যেতে আমি খুবই লজ্জাবোধ করছি। অত্যন্ত সন্তুষ্টির সঙ্গে আমি দিন ও রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম।' এ বলে তিনি সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললেন। যখন তিনি বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করলেন তখন নিম্নোক্ত কথাগুলো তাঁর শ্রুতিগোচর হল।

"আমি আমার বান্দাদের জন্য আপন ফরজ জারী করে দিলাম এবং বান্দাদের দায়িত্বভার কিছুটা হালকা করে দিলাম।[1]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন প্রভূকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন কিনা সে ব্যাপারে ইবনে কাইয়ূম মতভেদ বর্ণনা করেছেন। এরপর ইবনে তাইমিয়ার এক সুক্ষ বর্ণনার আলোচনা করেছেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে 'আল্লাহকে চাক্ষুস দেখার কোন প্রমাণ নেই।' কোন সাহাবীও এরকম কোন কথা বলেন নি। আর ইবনে আব্বাস থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখার এবং অন্তর্দৃষ্টি সহকারে দেখার যে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে প্রথম দ্বিতীয়টির বিপরীত নয়।

এরপর ইবনুল কাইয়ূম লিখেছেন, সূরা নাজমে আল্লাহ তা'আলার যে ইরশাদ,

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ﴾ [النجم:٨]

"তারপর সে (নাবীর) নিকটবর্তী হল, তারপর আসল আরো নিকটে,' (আন-নাজ্‌ম ৫৩ : ৮)

'তৎপর সে নিকটে আসল এবং আরও নিকটে আসল।' এটা ঐ নৈকট্য থেকে ভিন্ন যেটা মি'রাজের ঘটনায় ঘটেছিল। কেননা, সূরা নাজমে যে নৈকট্যের উল্লেখ রয়েছে তাতে জিবরাঈল (عليه السلام)-এর নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। যেমনটি আয়শা সিদ্দীকা (رضي الله عنها) এবং ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেছেন এবং বর্ণনা ভঙ্গীতেও এটাই নির্দেশিত

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৪৭-৪৮ পৃঃ।

হচ্ছে। এর বিপরীত মি'রাজের হাদীসে যে নৈকট্য লাভের কথা বলা হয়েছে তাতে সর্বশক্তি মান প্রভূ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সূরা নাজমে একথার কোন উল্লেখনেই। বরং তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূল ﷺ তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট এবং তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুবার তাঁকে তাঁর আসলরূপে দেখেছিলেন। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।[1] এ সম্পর্কে সঠিক কি, সেটা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

এ সময় পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং এ সফরকালে তাঁকে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল। তাঁর সম্মুখে দুধ ও মদ পেশ করা হয়েছিল। তিনি দুধ পচ্ছন্দ করেছিলেন। এতে তাঁকে বলা হয়েছিল 'আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে আপনার উম্মত পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। তিনি জান্নাতে চারটি নদী দেখেছিলেন। এর মধ্যে দুটি প্রকাশ্যে এবং দুটি গোপন। প্রকাশ্য দুটি হচ্ছে নীল ও ফোরাত। সম্ভবতঃ এর তাৎপর্য এই ছিল যে, তাঁর রেসালাত নীল ও ফোরাত নদের শস্য শ্যামল ইসলামের বিস্তৃতি ঘটবে এবং এখানকার মানুষ বংশপরম্পরা সূত্রে মুসলিম হবে। ব্যাপারটি এই নয় যে, এ দু'পানির উৎস জান্নাত থেকে উৎসারিত হচ্ছে। অবশ্য আল্লাহই সব কিছু ভাল জানেন। তিনি জাহান্নামের মালিক এবং দারোগাকেও দেখেছেন। তাঁরা হাসছিলেন না এবং তাঁদের মুখ মণ্ডলে আনন্দ এবং প্রফুলাতাও ছিল না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন।

তিনি তাদেরকেও দেখেছিলেন যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে চলেছে। তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি উটের ঠোঁটের মতো। তারা পাথরের টুকরোর মতো আগুনের ফুলকী মুখের মধ্যে পুরতেছিল এবং সেগুলো গুহ্যদ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে আসছিল।

তিনি সুদখোরদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের পেটগুলো এতই প্রকাণ্ড আকারের ছিল যে, পেটের ভার বহন করা ছিল তাদের জন্য খুবই কষ্টকর ব্যাপার এবং পেটের ভারে এদিক ও দিক নড়াচড়া তাদের পক্ষে ক্রমেই সম্ভব হচ্ছিল না। অধিকন্তু, ফেরাউনের বংশধরগণকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য পেশ করা হচ্ছিল তখন তারা এদেরকে পদদলিত করে অতিক্রম করছিল।

এক পর্যায়ে তিনি ব্যভিচারীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের সম্মুখে টাটকা ও মোটা গোস্তছিল এবং তার পাশে দুঃসহ দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস ছিল। এরা টাটকা ও মোটা গোস্ত বাদ দিয়ে পচা গোস্ত খাচ্ছিল।

তিনি সেই সকল স্ত্রীলোকদিগকেও দেখেছিলেন যারা স্বামীদেরকে অন্যের ঔরষ জাত সন্তান প্রদান। (অর্থাৎ তারা ছিল ব্যভিচারিনী, ব্যভিচারের কারণে তারা পর পুরুষের বীর্যে গর্ভ ধারণ করত কিন্তু স্বামীর অজানতে সে সন্তান স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিত)। তিনি দেখলেন তাদের বক্ষস্থল বড় বড় বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

যাতায়াতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আরববাসীদের এক বণিক দলকেও দেখেছিলেন এবং তাদের এক পলাতক উট দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের পানিও পান করেছিলেন। ঐ পানি একটি পাত্রে ঢাকা ছিল। এ সময়ে বণিকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। পানি পান করার পর পুনরায় তিনি পাত্রটিকে ঢেকে রেখেছিলেন। মি'রাজের রাত্রিশেষে সকাল বেলা এ ঘটনাটি তাঁর ﷺ দাবীর সত্যতা প্রমাণার্থে দলিল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।[2]

ইবনে কাইয়ূম বলেছেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালবেলায় স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত নিদর্শন সমূহের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তারা এ সব কিছুকে মিথ্যা এবং বাজে গল্প বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁর প্রতি যুলম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে নানাভাবে আজমায়েশ পরীক্ষা করতে থাকে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তার বায়তুল মুকাদ্দাস

---

[1] যাদুল মায়দ ২য় খণ্ড ৪৭-৪৮ পৃঃ, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭০, ৪৮১, ৫৪৮, ৫৫০, ২য় খণ্ড ৬৮৪ মসলিম ১ম খণ্ড ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬।

[2] পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি, এ ছাড়া ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৯৭, ৪০২ ও ৪০৬ পৃঃ। তফসীরের কেতাব সমূহের সূরা ইসরার তফসীর দ্রষ্টব্য।

সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে এবং উত্তরে জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। এর ফলে নির্দ্ধিধায় তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তারা তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি।

অধিকন্তু যাতায়াতের সময় তাদের যে কাফেলা তিনি দেখেছিলেন তার আগমনের সময় এবং বিবরণ ও তিনি বর্ণনা করে শোনালেন। এমন কি কাফেলার অগ্রগামী উটের চিহ্ন ও তিনি বলে দিলেন। তাছাড়া কাফেলার যে যা কিছু বলেছিল সবকিছুই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ মুশরিকগণ এ সব কিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইল না।[১]

পক্ষান্তরে আবু বকর (رضي الله عنه) এ সব কথা শোনামাত্র একে সত্য বলে মেনে নেন এবং এর সত্যতার ঘোষণা দিতে থাকেন। এ সময়ে আবু বকর (رضي الله عنه) সিদ্দীক উপাধীতে ভূষিত করা হয়। কারণ, সকলে যখন এ ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল তখন তিনি একে সর্বান্তকরণে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।[২]

মি'রাজের প্রসঙ্গ এবং উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে সব চাইতে সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে,

﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ [الإسراء: ١]

"এই জন্য যে, আমি (আল্লাহ তা'আলা) তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাব।' (আল-ইসরা ১৭ : ১)

নবী (عليه السلام)-দের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এটাই নীতি। সূরা আনআমে বলেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام:٧٥]

" এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।' (আল-আন'আম ৬ : ৭৫)

তারপর আল্লাহ মূসাকে বললেন,

﴿لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه:٢٣]

'যাতে আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনগুলোর কিছু দেখাতে পারি।' (ত্ব-হা ২০ : ২৩)

ফলে যখন আম্বিয়ায়ে কিরামগণের জ্ঞান এভাবে প্রত্যক্ষদর্শীতার সনদ প্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তাঁদের আয়নুল ইয়াকীনের (স্বচক্ষে দর্শনের) ঐ পর্যায় হাসেল হয়ে যায়। যার সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব নয়। যেমন শোনা কি দেখার মতো হয়। আর এই কারণেই নবীগণ (عليهم السلام) আল্লাহর পথে এমন সব দুঃকষ্ট সহ্য করতে পারেন অন্য কেউ তা পারেন না। একারণে ঐ শক্তির পক্ষ থেকে আসা কোন প্রকার কঠোরতা কিংবা দুঃখ কষ্টকে তাঁরা দুঃখ কষ্ট বলে মনেই করতেন না।

এ মি'রাজ ঘটনার অন্তরালে যে সকল বিজ্ঞানময় এবং রহস্যজনক ব্যাপার রয়েছে তার আলোচনার স্থান হচ্ছে শরীয়ত দর্শনের পুস্তকাবলী। কিন্তু এমন কিছু তত্ত্ব রয়েছে যার দ্বারা এ বরকতময় সফরের স্রোতস্বিনী থেকে প্রবাহিত হয়ে নবী (ﷺ)-এর জীবন উদ্যান অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে সে সব সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল,

দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সূরা বনী ইসরাঈলে রাত্রি ভ্রমণের ঘটনা কেবলামাত্র একটি আয়াতে বর্ণনা করে কথার মোড় ইহুদীরের অন্যায় ও পাপকার্যের বর্ণনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাদেরকে অবহিত

---

[1] যা'দুল মাদ ১/৪৮ পৃঃ, এটা ছাড়া সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬৮৪, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১/৪০২-৪০৩ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১/৩৯৯ পৃঃ।

করা হয়েছে যে, এ কুরআন ঐ পথের সন্ধান দেয় যে পথ হচ্ছে সব চাইতে সোজা-সরল ও শুদ্ধ। কুরআন পাঠকেরা হয়তো সন্দেহ করতে পারে যে, কথা দুটির মধ্যে কোন মিল নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা এ বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইহুদীগণকে মানুষের নেতৃত্ব দেয়া থেকে বরখাস্ত করা হবে। কারণ তারা এমন সব অন্যায় করেছে যে, ঐ সকল কর্ম করার পর তাদেরকে ঐ পদে আর অধিষ্ঠিত রাখা সঙ্গত নয়। কাজেই এ পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করা হবে এবং ইবরাহীমী দাওয়াতের দুটি কেন্দ্রকেই তাঁর নেতৃত্বাধীনে স্থাপন করা হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, এখন এমন এক অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে যার ফলে আত্মিক নেতৃত্বের প্রসঙ্গটি এক সম্প্রদায়ের নিকট হতে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হস্তান্তর করা দরকার। অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায় যাদের ইতিহাস বিশ্বাস ঘাতকতা, খেয়ানত, আসাধুতা, অন্যায়, অত্যাচার ও অপকর্মে ভরপুর তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে অন্য এক উম্মত বা সম্প্রদায়কে দায়িত্বভার দেয়া দরকার যাঁরা প্রবাহিত হবেন কল্যাণ ও পুণ্যের প্রস্রবন হয়ে এব যাঁদের নবী ﷺ সর্বাধিক হেদায়েত প্রাপ্ত, সঠিক পথ প্রদর্শক ও কুরআনের আল্লাহর বাণী দ্বারা লাভবান হবেন।

কিন্তু যখন এ উম্মতের রাসূল ﷺ মক্কার পর্বদত শ্রেণীতে মানুষের মাঝে ঠোক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছেন তখন এ প্রত্যাবর্তন কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এটা একটা সে সময়ের প্রশ্নমাত্র, যে সময় এক অন্য রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হচ্ছিল। আর সেই রহস্যটি ছিল, ইসলামী দাওয়াতের একটি পর্যায় শেষ যার ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোন আয়াতে অংশীবাদীদেরকে খোলাখুলি সতর্ক করে ধমক দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦، ١٧]

"আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার 'আযাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই। ১৭. নূহের পর বহু বংশধারাকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, বান্দাহ্দের পাপকাজের খবর রাখা আর লক্ষ্য রাখার জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।' [আল-ইসরা (১৭) : ১৬-১৭]

পক্ষান্তরে এ সকল আয়াতের পাশে পাশে এমন সব আয়াতও রয়েছে যার মাধ্যমে মুসলিমগণকে তাহযীব, তমদ্দুনের এমন সব নিয়ম-কানুন এবং প্রতিরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে নবাগত ইসলামী জিন্দেগীর ভিত্তি নির্মিত, নিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ় হতে পারে। মনে হয় মুসলিমগণ এখন এমন এক সরজমিনের উপর নিজ ঠিকানা বানিয়েছেন সেখানে সকল দিক দিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী আপন হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং সমাজ জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা এমন এক ঐক্যমত গঠনে সক্ষম হয়েছেন যার উপর ভিত্তি করে সমাজের যাঁতা ঘুরছে। অধিকন্তু, এ আয়াতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অচিরেই এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, যা সম্পূর্ণ নিরাপদদ হবে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এই নৈশ্য ভ্রমণ ও মি'রাজ বরকতময় ঘটনার তলদেশে হিকমত ও রহস্য সমূহের মধ্যে এমন একটি হিকমত যা আমাদের বিষয় বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য বর্ণনা উপযোগীমনে করে আমি এখানে তা লিপিবদ্ধ করলাম। এরকম দুটি বিরাট হিকমতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আমি এ ব্যাপারে মতস্থির করেছি যে, এ নৈশ্য ভ্রমণের ঘটনা আকাবার প্রথম বাইআতের ঘটনার কিছু পূর্বের অথবা দু'বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সব চাইতে ভাল জানেন।

আকাবার প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ) (بيعةُ العَقَبَة الأولَى) : [১]

পূর্বে আমি বলেছি যে, একাদমশ নবুওয়াত বর্ষে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিরের ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন যে, 'আমরা নিজ জাতির নিকট গিয়ে আপনার নবুওয়াতের কথা প্রচার করব।'

এর ফল হল যে, পরবর্তী বছর যখন হজ্বের মৌসুম এল (অর্থাৎ দ্বাদশ নবুওয়াত বর্ষের জিলহজ্ব মোতাবেক ৬২১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই) তখন বারোজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে জাবের বিন আবদুল্লাহ বিন রেআব ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচজন তাঁরাই ছিল যাঁরা পুর্বের বছর এসেছিলেন। এছাড়া অন্য সাত জন ছিলেন নতুন। নাম হল যথাক্রমে ঃ

১. মায়ায বিন হারেস ইবনে আফরা	কবীলাহ বনী নাজ্জার	(খাযরাজ)
২. যাকওয়ান বিন আব্দুল কায়েস	,, বনী যুরাইক	(খাযরাজ)
৩. উবাদাবিন সামেত	,, বনী গানাম	(খাযরাজ)
৪. ইয়াযীদবিন সা'লাবা	,, বনী গানামের মিত্র	(খাযরাজ)
৫. আব্বাস বিন ওবাদাহ বিন নাযালাহ	,, বনী সালেম	(খাযরাজ)
৬. আবুল হায়শাম বিন তায়্যে'হান	,, বনী আব্দুল আশহাল	(আউস)
৭. ওয়াইম বিন সায়েদাহ	,, বনী আমর বিন আওফ	(আউস)

এর মধ্যে কেবল শেষের দুজন আউস গোত্রের। তাছাড়া বাকী সকলেই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের।[২] এ লোকগুলো মীনার আকাবার নিকটে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ঐ কথাগুলো সবই পরবর্তীকালে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র এবং মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে গৃহীত অঙ্গীকারনামার অন্তর্ভূক্ত ছিল। আকাবার এ অঙ্গীকার নামার ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এস, আমার নিকট এ কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবেনা, হাত পায়ের মাঝে মন গড়া কোন অপবাদ আনবে না এবং কোন ভাল কথায় আমাকে অমান্য করবে না। যারা এ সকল কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের পুরষ্কার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনটি করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয় তবে সেটা তার মুক্তিলাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ সবের মধ্যে কোন

---

[1] عقبه এর অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ বা সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ। মক্কা থেকে মীনায় যাতায়াতের জন্য মীনার পশ্চিম দিকে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হত। এ সুড়ঙ্গ পথের স্থানটিই আকাবা নামে প্রসিদ্ধ। দশই জিলহজ্জ্ব তারীখে যে জামরাকে (পাথরের মূর্তি) কংকর নিক্ষেপ করা হয় সেটা এ সুড়ঙ্গ পথের মাথায় অবস্থিত বলে একে জামবায়ে আকাবা বলা হয়। এ জামবার দ্বিতীয় নাম জামবায়ে কুবরা। বাকী বাজরা দুটি পূর্ব দিকে অল্প দূরে অবস্থিত। মীনার যে ময়দানের হাজীগণ অবস্থান করেন সেই প্রান্তরটি তিনটি জামরার পূর্বে রয়েছে কাজেই সমস্ত লোকের ঘুরাফিরা ঐ দিকেই হত এবং কাংকর নিক্ষেপের পর এদিকে মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত। একারণে নবী ﷺ শপথ গ্রহণের এ সুড়ঙ্গটিকেই নির্বাচন করেছিলেন। এ কারণেই একে বায়আতে আকাবা বা আকাবার অঙ্গীকার বলা হয়। পাহাড় কেটে এখন প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

[2] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৮৫ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৩১-৪৩৩ পৃঃ।

কিছু করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হবে, চাইলে তিনি শাস্তি দিবেন, নচেৎ ক্ষমা করে দিবেন। উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন এ সব কথার উপরে আমরা নবী ﷺ-এর নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।[1]

মদীনায় ইসলাম প্রচারকের দল (سفير الإسلام في المدينة) ঃ

অঙ্গীকার সম্পাদিত এবং হজ্জ্বব্রত সম্পন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ লোকদের সঙ্গে ইয়াসরিবে প্রথম ধর্ম প্রচারক দল প্রেরণ করলেন। দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে এ প্রচারক দল প্রেরণ করা হয়। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নব দীক্ষিত মুসলিমগণকে ইসলামের আহকাম এবং ধর্মের নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল যারা এখনও শিরকের উপরেই রয়ে গেছে তাদের নিকট ইসলাম প্রচার করা। নবী করীম ﷺ এ প্রবাসের জন্য প্রথমে অগ্রগামীদের মধ্যে স্বনামধন্য এক যুবককে নির্বাচন করেন যার নাম হল মুসআব বিন উমায়ের আবদারী (রাঃ)।

গৌরবময় সফলতা (النجاح المغتبط) ঃ

মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) মদীনায় গিয়ে আসয়াদ বিন যুবারাহ (রাঃ)-এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াসবির বাসীদের নিকট প্রবল উদ্দাম ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রচারণার কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর উত্তম প্রচার কার্য্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'মুকরিউন' উপাধিতে ভূষিত হন।

মুকরিউন অর্থ পাঠদানকারী। সে সময় শিক্ষক বা উস্তাদকে মুকরিউন বলা হতো।

প্রচার কার্যের মধ্যে সবচাইতে সফল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। একদিন আসয়াদ বিন যুরারাহ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বনী আব্দুল আশহাল ও বনী যাফরের মহলায় গমন করলেন এবং সেখানে বনী যাফরের একটি বাগানের মধ্যে 'মরক' নামক এক কূঁয়ার উপরে বসে পড়লেন। সেই সময় তাঁদের নিকট সংখ্যক মুসলিম এসে একত্রিত হলেন। তখন পর্যন্ত বনী আব্দুল আশহালের দু'জন নেতা সায়াদ বিন মুয়ায ও উসাইদ বিন হুযায়ের শিরকের উপরেই ছিলেন অর্থাৎ মুসলিম হন নি।

তাঁরা যখন তাঁদের আগমনের খবর জানতে পারলেন তখন সায়াদ উসাইদকে বললেন, 'একটু যান এবং তাঁদের উভয়কে বলে দিন যাঁরা আমাদের দুর্বল চিত্তের মানুষ গুলোকে বোকা বানাতে এসেছেন তাঁদেরকে সাবধান করে বলে দিন যে, তাঁরা যেন আমাদের মহলায় না আসেন। আসয়াদ বিন যুরারাহ আমার খালাতো ভাই কাজেই আপনাকে পাঠাচ্ছি। অন্যথায় এ কাজ আমি নিজেই সম্পন্ন করতাম।"

উসাইদ (রাঃ) নিজ বর্শা উত্তোলন করে তাঁদের দুজনের নিকট পৌছলেন। আসয়াদ (রাঃ) তাঁদের আসতে দেখে মুসআবকে বললেন, 'ইনি নিজ জাতির সরদার, আপনার কাছে আসছেন। এর জন্য আল্লাহর নিটক দু'আ করুন।' মুসআব বললেন, 'যদি তিনি বসেন তাহলে কথা বলব।' উসাইদ তাঁদের নিটক পৌছারপর দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

বললেন, 'তোমরা দুজন আমাদের এখানে কেন এসছে? আমাদের দুর্বল চিত্তের মানুষকে বোকা বানাচ্ছ? যদি তোমাদের প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের নিকট হতে দূরে যাও।' মুসআব বললেন 'আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসুন এবং কিছু কথাবার্তা শুনন। যদি কোন কথা পছন্দ হয় তা হলে তা গ্রহণ করুন। পছন্দ না হলে বর্জন করুন।'

উসাইদ বললেন, 'কথা তো ন্যায়সঙ্গতই বলছেন।' তারপর তিনি নিজ বর্শা মাটিতে পুঁতে দিয়ে বসে পড়লেন। এ সময় মুসআব ইসলামের কথা বলতে লাগলেন এবং কুরআন তেলওয়াত করলেন। তাঁর বর্ণনায় এ কথা রয়েছে যে, 'উসাইদকে আল্লাহ তা'আলার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর মুখ মণ্ডলে একটা চমকের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে আমাদের ধারণা হল যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন।

---

[1] **সহীহ বুখারী** বাবু বা'দা হালাওয়াতিল ঈমান ১/৭ পৃঃ। বাবু অফ দিল আনসার ১/৫৫০-৫৫১ শব্দ এ বারেরই , বাবু কাওলেহী তা'আলা, ২য় খণ্ড **৭২৭ পৃঃ**। **বাবুল** হদুদে কাফ্ফারাতুন ২/১০০৩ পৃঃ।

এরপর তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন, আপনারা যেসব কথা বলছেন তার চাইতে উত্তম কথা তো আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা যখন কাউকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চান তখন কি করেন?

উত্তরে তাঁরা বললেন, 'আপনি গোসল করুন পাক-সাফ পরিচ্ছদ পরিধান করুন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে দু' রাকায়াত সালাত পড়ুন।' তিনি গোসল করে নিয়ে পাক সাফ পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কালেমা শাহাদত পাঠকরে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে দু' রাকায়াত সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, 'আমার পিছনে আরও একজন আছেন।' যদি তিনি অনুসারী হয়ে যান তা হলে তাঁর সম্প্রাদায়ে কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না। আমি এখনই তাঁকে আপনাদের খেদমতে প্রেরণ করছি।' (তাঁর ইঙ্গিত সায়াদ বিন মুয়াযের প্রতি ছিল)।

এরপর উসাইদ (রাঃ) নিজ বর্শা উত্তোলন করে সায়াদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি তখন তাঁর স্বজাতীয় লোকজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত ছিলেন। উসাইদকে আসতে দেখে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি এ ব্যক্তি তোমাদের নিটক যে, চেহারা নিয়ে আসছেন এটা ঐ চেহারা নয় যা নিয়ে তিনি এখান থেকে প্রস্তান করেছিলেন।' তারপর উসাইদ যখন সভাস্থানে এসে দাঁড়ালেন তখন সায়াদ তাঁকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি করে এলেন?'

তিনি বললেন, 'আমি তাঁদের দুজনের সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু আল্লাহর কসম কোন প্রকার অন্যায় কিংবা অসুবিধা তো আমার নযরে পড়ল না। তবে তাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরাও বলেছেন, 'ঠিক আছে, আপনারা যা চান তা করা হবে।'

অধিকন্তু, আমি জানতে পারলাম যে, বনী হারেসের লোকজন আসয়াদ বিন মুরারাকে (রাঃ) হত্যা করতে গিয়েছে আর এর কারণ হলো তারা জানে যে, আসয়াদ আপনার খালাতো ভাই। কাজেই, তারা চাচ্ছে যে, আপনার সঙ্গে যে, চুক্তি রয়েছে তা ভঙ্গ করে দেবে। এ কথা শুনে সায়াদ (রাঃ) রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং নিজ বর্শা উত্তোলন করে সোজা ঐ দুজনের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁরা নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন। এতে তিনি এ কথা বুঝে গেলেন যে, উসাইদের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি যেন তাদের কথা শোনেন। কিন্তু তাঁদের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কঠোর ভাষায় আসয়াদ বিন যুরারাকে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর শপথ! হে আবু উমামা, আমার ও আপনার মধ্যে যদি আত্মীয়তার বন্ধন না থাকত তবে আপনার কোন দিনই সাহস হতো না যে, আপনি এলাকায় এসে আমার অপছন্দীয় কথাবার্তা বলবেন।'

এ দিকে আসয়াদ (রাঃ) পূর্বেই এ কথা বলেছিলেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার নিকট এমন এক নেতা আসছেন যার পিছনে তাঁর সমস্ত জাতি রয়েছে। যদি তিনি আপনাদের কথা মেনে নেন তাহলে কেউই তারা পিছে থাকবে না। এ জন্য মুসয়াব (রাঃ) সায়াদকে বললেন, আপনি কেন আগমন করবেন না? আর কেনইবা আমাদের কথা শুনবেন না? যদি কোন কথা পছন্দ হয় তবে গ্রহণ করবেন। আর যদি অপছন্দ হয় তাহলে আমরা আপনার অপছন্দীয় কথা থেকে আপনাকে দূরেই রাখব। সায়াদ (রাঃ) বললেম 'ন্যায়সঙ্গত কথাই তো বলছেন।' এর পর তিনি আপন বর্শা পুঁতে দিয়ে বসে পড়লেন। মুসয়াব তার নিকট ইসলাম পেশ করলেন এবং কুরআন পাঠ করলেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, সায়াদের বলার পূর্বেই তাঁর মুখমণ্ডলের জৌলুস দেখে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছিলাম। এর পর তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন, 'আপনারা কিভাবে ইসলামে দীক্ষিত করেন।'

তারা বললেন, 'আপনি গোসল করুন, পাক-সাফ পরিচ্ছদ পরিধান করুন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে দু'রাকয়াত সালাত আদয় করুন। সায়াদ তাই করলেন। এর পর তিনি নিজ বর্শা উত্তোলন করে আপন সম্প্রদায়ের লোকজনদের সভায় গমন করলেন।

তাকে দেখা মাত্রই লোকেরা বললেন, আল্লাহর শপথ! সায়াদ যে মুখমণ্ডল নিয়ে গিয়েছিলেন তার স্থানে অন্য একটি মুখমণ্ডল নিয়ে ফিরে এসেছেন। সায়াদ (রাঃ) যখন সভায় উপস্থিত লোকজনদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে বনী আব্দুল আশহাল! তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর?' তাঁরা বললেন, 'আপনি আমাদের নেতা, অগাধ জ্ঞান গরিমার অধিকারী এবং বরকতময় কাণ্ডারী।'

তিনি বললেন, 'বেশ ভালো, তবে এখন একটা কথা শোন। কথাটা হচ্ছে ঐখন থেকে তোমাদের নারী-পুরুষ সকলের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম, যে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল -এর উপর ঈমান না আনছ।'

তাঁর এ কথার এমন একটি প্রতিক্রিয়া হল যে, সন্ধ্যা হতে না হতেই ঐ গোত্রের এমন একটি পুরুষ কিংবা মাহিলা রইল না যারা ইসলাম গ্রহণ করে নি। কেবলমাত্র একজন লোক সেই সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে নি যাঁর নাম ছিল ইসাইরিম, তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ওহুদের যুদ্ধকাল পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল। ওহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেছিলেন। কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ায় অল্প সময় পরেই শহীদ হন। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সেজদাহ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। এ কারণেই রাসূলুলহ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি অল্প পরিশ্রম করে অধিক পুরস্কার লাভ করলেন।'

মুসয়াব আসয়াদ বিন যুরারাহর বাড়িতে থেকেই ইসলামের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। কেবলমাত্র বনী উমাইয়া বিন যায়েদ, খাতমা ও ওয়ায়েলের বাড়ি ব্যতীত আনাসারদের এমন কোন বাড়ি ছিল না যার পুরুষ ও মহিলাদের কিছু সংখ্যক মুসলিম হন নাই। বিখ্যাত কবি কায়েস বিন আসলাত তাঁদেরই লোক ছিলেন। এঁরা তাঁরই কথা মান্য করতেন। এ কবিই তাঁদেরকে খন্দকের যুদ্ধ (৫ম হিজরী) পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। যাহোক, পরবর্তী হজ্ব মৌসুম পর্যন্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদমশ নবুওয়াত বর্ষের হজ্ব মৌসুম আগমনের পূর্বেই মুসয়াব বিন উমায়ের তাঁর সাফল্যের সুবাদ মক্কায় রাসূলুল্লাহ -এর দরবারে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে ইয়াসরিবের গোত্রগুলোর অবস্থা, তাদের রণকৌশল ও প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতার উৎকর্ষতা সম্পর্কে অবগত করেন।[1]

আকাবার দ্বিতীয় শপথ (بيعة العقبة الثانية) :

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্বের মৌসুমে (জুন, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়াসরিবের সত্তার জনেরও অধিক মুসলিম ফরজ হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিক হজ্বযাত্রীগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইয়াসরিবের মধ্যে কিংবা মক্কার পথে ছিলেন এমন এক পর্যায়ে, তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে থাকলেন, 'আমরা কতদিন আর রাসূলুল্লাহ -কে এভাবে মক্কার পাহাড় সমূহের মধ্যে চক্কর ও ঠোক্কর খেতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফেলে রাখব?'

এ মুসলিমগণ যখন মক্কায় পৌছলেন তখন গোপনে নবী করীম -এর সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্ব সম্মতিক্রমে এ কথার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আইয়ামে তাশরীকের[2] মধ্য দিবসে (১২ই জিলহজ্জ তারীখে) উভয় দল মীনায় জামরাই উলা, অর্থাৎ জামরাই আকাবার নিকটে যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখানে একত্রিত হবেন এবং সে সমাবেশ গোপনে রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হবে। এ ঐতিহাসিক সমাবেশ কিভাবে ইসলাম ও মূর্তিপূজার মধ্যে চলমান সংঘর্ষের মোড় পালটিয়ে দেয় তা একজন আনসার সাহবীর নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণ সূত্রে জানা যায়।

কা'ব বিন মালেক বলেছেন, 'আমরা হজ্জের জন্য বের হলাম। আইয়াম তাশরীকের মধ্যবর্তী দিবাগত রাত্রে রাসূলুল্লাহ -এর সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় উপস্থিত হল। আমাদের সঙ্গে আমাদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা আবদুল্লাহ বিন হারামও উপস্থিত ছিলেন (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি)। মুশরিকগণের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই আমার সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে আগত অন্যান্য মুশরিকদের থেকে আমদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন হারামের সঙ্গে আমাদের

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৩৫-৪৩৮ পৃ, ২য় খণ্ড ৯০ পৃঃ যাদুল মায়াদ, ২চ খণ্ড ৫১ পৃঃ।

[2] জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২, ও ১৩ তারীখের আ্ইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

কথোপকথন ঠিকভাবেই চলছিল। আমরা তাকে বললাম, 'হে আবু জাবের! আপনি আমাদের একজন প্রভাবশালী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতা। আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সূত্রে আমরা আপনাকে বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনতে চাচ্ছি যাতে করে আপনি জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডের ইন্ধন হয়ে না যান। এর পর তাঁকে আমরা ইসলামের দাওয়াত দিলাম এবং বলালাম যে, 'আজ আকাবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথাবার্তা আছে", তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে আকাবায় গমন করলেন। তারপর তিনি আমাদের নেতা নির্বাচিত হলেন।

কা'ব (রাঃ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা এ রাতেও যথারীতি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু যখন রাত্রের তৃতীয় অংশ অতিবাহিত হল তখন আমরা নিজ নিজ তাঁবু থেকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে গেলাম যেমনটি পাখি নিজ বাসা থেকে নিজেকে জড়োসড়ো করে বের হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা সকলে গিঁয়ে আকাবায় একত্রিত হলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট পঁচাত্তর জন। তেহাত্তর জন্য পুরুষ এবং দু'জন মহিলা। মহিলা দু'জনের একজন ছিলেন উম্মু আম্মারা নাসীবা বিনতে কা'ব। তিনি কাবিলা বনু মাযেন বিন নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন উম্মু মানী আসমা বিনতে আমর। তিনি বনু সালমা গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

আমরা সকলে সুড়ঙ্গে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সে আকাঙ্খিত মুহূর্তে এসে পড়ল এবং তিনি তশরীফ আনয়ন করলেন। সঙ্গে ছিলেন তার চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব। যদিও তিনি তখনো নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তবুও তিনি এটা চাচ্ছিলেন যে, আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের সমস্যায় উপস্থিত থাকেন যাতে তাঁর পূর্ণ ইতমেনান হাসেল হয়ে যায়। তিনিই সর্বপ্রথম কথা বলা আরম্ভ করেন।[1]

কথাবার্তার পর্যায় এবং আব্বাস (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে সমস্যার নাজুকতার ব্যাখ্যা (بداية الحادثة وتشريع العباس لخطورة المسئولية) ঃ

সভার প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন হলে ধর্মীয় ও সমারিক সাহায্য কল্পে সন্ধি ও চুক্তির পূর্ণাঙ্গ প্যান তৈরির জন্য কথোপকথন আরম্ভ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) সর্ব প্রথম মুখ খুললেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের সম্পাদিত চুক্তির ফলে তাদের উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য আরোপিত হয়েছে এবং পরিণামে যে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা ব্যাখ্যা করা।

কাজেই তিনি বললেন, 'হে খাযরাজের লোকজন! (আরববাসীগণের নিকট আনসারদের মধ্যে দু'গোত্রের অর্থাৎ খাযরাজ এবং আউস, খাযরাজ নামেই পরিচিত ছিল) আমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে তোমরা সকলেই ওয়াকেবাহল রয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে আমরা যে মনোভাব পোষণ করি আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজনও একই মনোভাব পোষণ করে। আমরা তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধাবাদীদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করে রেখেছি। তিনি এখন আপন অবাসস্থানে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসম্মান শক্তি সামর্থ এবং হেফাজতের সঙ্গেই রয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি তোমাদের সেখানে গিলে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। এ অবস্থায় যদি এমনটি হয় যে, তোমরা তাঁর কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকবে তাহলে সব ঠিক আছে আপত্তির কোন কিছু নেই। তোমরা জিম্মাদারীর যে গুরুভার গ্রহণ করতে যাচ্ছ আশা করি তার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। কিন্তু এমনটি যদি হয় যে, তোমরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে কিংবা প্রয়োজনে তোমরা তাঁর কোন উপকারে আসবে না তাহলে তাঁকে এখনি ছেড়ে দাও। কেননা, তিনি নিজ আবাসিক নগরীতে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে মান-সম্মান ও হেফাজতের সঙ্গেই রয়েছেন।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪০ ও ৪৪১ পৃঃ।

কা'ব বলেছেন যে, 'আব্বাস -কে বললমা, 'আমরা আপনার কথা শুনেছি।' তারপর রাসূলুল্লাহ -কে লক্ষ্য করে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কথাবার্তা বলুন এবং নিজের জন্য ও নিজ প্রভূর জন্য যে সন্ধি ও চুক্তি করতে পছন্দ করেন তা করুন" ।[১]

কা'ব -এর উত্তর থেকে এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, এ বিরাট জিম্মাদারী বহন করা এবং এর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিণতির ব্যাপারে আনসারগণের দৃঢ় সংকল্প, বাহাদুরী, ঈমান, উদ্যম ও খুলুসিয়াত কোন পর্যায়ের ছিল।

এর পর রাসূলুল্লাহ কথাবার্তা বললেন। তিনি প্রথমে কুরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন এবং ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করলেন। এরপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

বাইয়াতের দফাসমূহ (بنود البيعة) :

ইমাম আহমদ জাবের হতে বাইয়াতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেছেন, 'আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আপনার নিকট কোন শপথ গ্রহণ করব?'

তিনি বললেন, 'তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে,

১. সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

২. এভাবে ও স্বচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।

৩. ভাল কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪. আল্লাহর পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনা কারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করবে না।

৫. যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।[২]

কা'ব -এর বর্ণনা সূত্রে ইবনে ইসহাক যে আলোচনা করেছেন তাতে শেষ ধারার (৫) কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ কুরআন তেলওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং ইসলাম গ্রহণের প্রতি অনুপ্রেরণা দানের পর বললে, 'আমি তোমাদের নিকট এ কথার শপথ গ্রহন করছি যে, তোমরা আমাকে ঐ সকল জিনিস থেকে আপন ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করে থাক।' এ কথা বলার পরেই বারা বিন মা'রুব রাসূলুল্লাহ -এর হাত ধরে বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। সুনিশ্চিত আমরা আপনাকে ঐ সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করব, যে সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করি। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধের সন্তান এবং অস্ত্র আমাদের খেলনা। আমাদের এ পদ্ধতি বাপদাদার কাল থেকে চলে আসছে।

কা'ব বলেন যে, বারায়া রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এমন সময় আবুল হায়সাম বিন তায়হান কথার ছেদ কেটে বললেন 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও কিছু মানুষের অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি ও সন্ধির বন্ধন রয়েছে, আর আমরা এখন সে বন্ধন ছিন্ন করছি। তা হলে এ রকম তো হবে না যে, আমরা এরূপ করে ফেলি তারপরে আল্লাহ যখন আপনাকে জয়যুক্ত করবেন, তখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে নিজ জাতির দিকে ফিরে যাবেন।'

---

[1] ইবনে হিশাম ১/ ৪৪২ পৃঃ।

[2] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এটাকে হাসান সনদ বলে উলেখ করেছেন এবং ইমাম হাকেম ও ইবনে হেব্বান সহীহ বলেছেন, শাইখ আবদুল্লাহ নজদী মুখাতসারুস সীরাত ১৫৫ পৃঃ। দ্রষ্টব্য ইবনে ইসাহাক উবাদাহ বিন সামেত থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেচেন অবশ্য তাতে একটি অধিক ধারা রয়েছে, যা হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্ণধারদের সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্য বিবাদ করবে না। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৫৪ পৃঃ।

এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হেসে বললেন, 'না, বরং তোমাদের রক্ত আমার রক্ত এবং তোমাদের ধ্বংস আমার ধ্বংস, আমি তোমাদেরই এবং তোমারও আমারই। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমরা যাদরে সঙ্গে সন্ধি করবে আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব।[১]

বাইআতের বিপজ্জনক দিকগুলোর পুনঃ স্মরণ (التأكيد من خطورة البيعة) ঃ

অঙ্গীকারের শর্তাদি সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা প্রায় সমাপ্তির পথে এবং লোকজনেরা যখন অঙ্গীকার গ্রহণ আরম্ভ করতে যাচ্ছেন এমন সময় প্রথম সারির দুজন মুসলিম যারা একাদশ বা দ্বাদস নবুওয়াত বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা উঠে পড়েন, যাতে মানুষের সামনে তাদের দায়িত্বের নাজুকতা ও ভয়াবহতা অর্থাৎ সম্ভাব্য বিপদাপদের ব্যাপারটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করার প্রেক্ষাপটে সমস্যার সকল দিক ভালভাবে অবহিত হওয়ার পর তারা শপথ গ্রহণ করে। এর পিছনে আরও একটি উদ্দেশ্য ছির তা হচ্ছে এ সকল লোকজন কতটুকু আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত রয়েছে তা অনুধাবন করা।

ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, যখন লোকজন অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য একত্রিত হলেন তখন আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযলাহ বললেন, 'তোমরা কি জানো যে, তাঁর সাথে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিত ছিল) কোন কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচ্ছ?' তাঁরা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'জী হ্যাঁ" ।

আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'লাল ও কালো মানুষের বিরুদ্ধে জান্নাতের বিনিময় যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমরা তাঁর কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচ্ছ। যদি তোমাদের এ রকম ধারণা যে, যখন তোমাদের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের দলের সম্ভ্রান্ত লোকজনকে হত্যা করা হবে তখন তোমরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যাবে তাহলে এখনই ছেড়ে যাও। কেননা , তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও তাহলে ইহ ও পরকালের জন্য তা হবে চরম বেইজ্জতির ব্যাপার। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে যে, তোমাদের ধনমাল ধ্বংসের এবং মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের হত্যা সত্ত্বেও এ চুক্তি সম্পন্ন করবে যার প্রতিত তোমরা তাকে আহ্বান করছ তবে অবশ্যই তা গ্রহণ করবে। কেননা, আল্লাহর শপথ! এতেই ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক জীবনের জন্য মঙ্গল রয়েছে।

এ কথা শ্রবণের পর সকলেই সমবেত কণ্ঠে বললেন, 'ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যার মতো অত্যন্ত বিপদ সংকুল পরিস্থিতির বিনিময়ে এটা আমরা গ্রহণ করছি। তবে হা একটি প্রাসঙ্গিক কথা, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যদি যথাযথভাবে এ অঙ্গীকার পূরন করি তবে প্রতিদান আমাদের জন্য কি পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে?

তিনি বললেন, 'জান্নাত" ।

লোকেরা বললেন, 'আপনার হাত মুবারক প্রশস্ত করুন।'

তিনি হাত প্রসারিত করলে লোকেরা তাঁর হাত ধারণ করে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।[২]

জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনা হচ্ছে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য যে সময় আমরা দাঁড়ালাম সে সময় সত্তর জনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য আসয়াদ বিন যুরারাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধারণ করে বললেন, 'ইয়াসরিবাবাসীরা! একটু থেমে যাও। আমরা উটের কলিজা নষ্ট করে (অর্থাৎ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে) এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তার খিদমতে উপস্থিত হয়েছি যে, তিনি আল্লাহ রাসূল ﷺ। আজ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সমস্ত আরব বাসীর সঙ্গে শত্রুতা, তলোয়ারের আঘাতে তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হত্যা এবং ধন-সম্পদের অসামান্য ক্ষয়-ক্ষতি। অতএব, যদি এ সব সহ্য করতে পার তবে তাকে নিয়ে চল। এ সবের বিনিময়ে আল্লাহর সমীপে তোমাদের জন্য যে মহা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে 'জান্নাত"। আর যদি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে এ সব কিছুই তাঁদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তবে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও। এটাই হবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ওজর বা আপত্তি।[৩]

---

[1] ইবনে হিশাম ১/৪৪২ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৬ পৃঃ।

[3] মুসনদে আমেদ।

বাইআতের পূর্ণতা লাভ (عقد البيعة) ঃ

বাইআতের শর্ত বা দফা সমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ভয়াবহ দিক গুলো সম্পর্কে একবার ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছিল। যখন এ অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হল তখন লোকেরা সমস্বর বলে উঠলেন, 'আসয়াদ বিন যুরারাহ! নিজ হাত হটাও। আল্লাহর কসম! আমরা এ অঙ্গীকার ছাড়তে কিংবা ভঙ্গ করতে পারি না।[১] উপস্থিত জনতার এ উত্তরে আসয়াদ বিন যুরারাহ ভালভাবে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন যে, লোকেরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে আসয়াদ বিন যুরারাহ মুসআব বিন উমায়েরের সাথে একযোগে মদীনায় ইসলাম প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় মুবালেগ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি অঙ্গীকার গ্রহণ কারীদের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। ফলে তিনিই সর্ব প্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, বনু নাজ্জার বলেছেন আবু উমামা আসায়াদ বিন যুরারাহ সর্ব প্রথম মানুষ যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন।[২] এরপর সাধারণ অঙ্গীকার অনুষ্ঠিত হয়। জাবের (رضي الله عنه)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা একে একে দাঁড়ালাম আর নবী করীম ﷺ আমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আর এর বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন।[৩]

অবশিষ্ট রইলেন দুজন মহিলা যাঁরা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন তাঁদের শপথ হল মৌখিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কোন পরস্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করেন নাই।[৪]

বারো জন নকীব (اثنا عشر نقيبًا) ঃ অঙ্গীকার পর্ব সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের মধ্যে থেকে বারোজন নেতা নির্বাচন করলেন। নির্বাচিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গীকারের ধারা সমূহ বাস্তবায়ণের ব্যাপারে জিম্মাদারী ও দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এরূপ ইঙ্গিত ছিল যে, নিজেদের মধ্যে থেকে তাঁরা এমন সব নেতা নির্বাচন করবেন যাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে যথোপযোগী ভূমিকা পালন করবেন। তাঁর ইঙ্গিত তড়িঘড়ি নেতা নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হল। নয়জন খায়রাজ এবং তিন জন আউস গোত্র থেকে মোট বারজন নেতা নির্বাচন করা হল। খায়রাজ গোত্রের নেতাগণের নাম হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

(১) আসয়াদ বিন যুরারাহ বিন আদাস (২) সায়াদ বিন রাবীয়া বিন আমর (৩) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ বিন সা'লাবাহ (৪) রাফে বিন মালেক বিন আজলান (৫) বারা বিন মা'রুব বিন সাখর (৬) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (৭) উবাদা বিন সামেত বিন কায়েস (৮) সা'দ বিন উবাদাহ বিন অইম (৯) মুনয়ের বিন আমর বিন খুনাইস।

আউস গোত্রের নেতাগণ হচ্ছেন, (১) উসাইদরিন হুযাইর বিন সামাক (২) সায়াদ বিন খায়সামা বিন হারেস এবং (৩) রেফায়াহা বিন আব্দুল মুনযের বিন যুবাইর।[৫]

যখন এ সকল নেতার নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হল তখন নবী কারীম ﷺ তাঁদের নিকট থেকে পুণরায় অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, ঈসা (عليه السلام)-এর পক্ষ যেভাবে হাওয়ারীগণের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল

---

[1] প্রাগুক্ত।

[2] ইবনে ইসহাকের ভর্ণনায় রয়েছে যে, বুন আব্দুল্ অশহালেল বলেছেন সর্ব প্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেন আবুল হাইশাম বিন তায়েহোন। কা'বা বিন মালেক বলেচেন যে, বারা বিন মা'রুব প্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ইবানে হিশাম ১/৪৪৭ পৃঃ। আমার ধারনায় সম্ভবতঃ আবুল হাইশাম ও বারার সাথে বাইআতের পূর্বে যে কথাবার্তা হয়েছিল উহাকেই মুানুষ অঙ্গীকার বলে ধরে নিয়েচে। অন্যথায় এ সময় সর্বপ্রথম আগে যাওয়া অধিকতর অধিকার আসয়াদ যুবারাবই বয়েছে। আলাহ ভালই জানেন।

[3] মুসনাদে আহমদ।

[4] সহীহ মুসলিম বাবু কাইফিয়াতে বাইআতনি নেসা ২/ ১৩১ পৃঃ।

[5] কেউ কেউ যুবাইর এর পরিবর্তে যুনাইর বলেছেন। কোন কোন চরিতকার ি

সেভাবে আজ থেকে আপনাদের উপর আপন আপন সম্প্রদায়ের যিম্মাদারী বা দায়িত্ব অর্পিত হল। আর আমার উপর যিম্মাদারী বা দায়িত্ব ভার রইল সমগ্র মুসলিম জাতির। তাঁরা সকলে এক বাক্যে বলে উঠলেন 'জী হ্যাঁ"।[১]

শয়তান চুক্তির কথা ফাঁস করে দিল (شيطان يكتشف المعاهدة) ঃ

অঙ্গীকার সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং লোকজনেরা এখন নিজ নিজ গন্তব্য স্থান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাবেন এমন সময় এক শয়তান ব্যাপারটি জেনে ফেলে। যেহেতু ব্যাপার সে জানতে পারে একেবারে শেষ মুহূর্তে এবং তার হাতে এতটুকু সময় ছিল না যে, সে কুরাইশ মুশরিকদের নিকট এ খবর পাঠিয়ে দেয় এবং তারা আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে এ সুড়ঙ্গের মধ্যেই এদের সকলকে নিঃশেষ করে ফেলে, সেহেতু সে (শয়তান) তাড়াতাড়ি পাহাড়ে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে এমন উচ্চ কণ্ঠে (যা কদাচিৎ কেউ শুনে থাকবে) ডাক দিল, 'হে তাঁবু ওয়ালা! মুহাম্মদ ﷺ-কে দেখ বেদীনেরা এখন তার সঙ্গে রয়েছে। তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তারা এখানে একত্রিত হয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এ হচ্ছে এ সুড়ঙ্গের শয়তান। হে আল্লাহর দুশমন! আমি তোর জন্য অতিসত্ত্বর বেরিয়ে পড়ছি। এরপর তিনি সকলকে বললেন, 'তোমরা সকলে নিজ নিজ আস্তানায় চলে যাও।[২]

কুরাইশদের উপর আক্রমনের জন্য আনসারদের প্রস্তুতি (استعداد الأنصار لضرب قريش) ঃ

শয়তানের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ শ্রবণ করে, আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযলা বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ যিনি ন্যায়ের সঙ্গে আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি চান তাহলে আমরা কালই তরবারী নিয়ে মীনা বাসীর উপর আক্রমণ চালাই। তিনি ﷺ বললেন, 'আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি।' অতএব আপনারা নিজ নিজ আস্তানায় চলে যান।' কাজেই লোকেরা নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এভাবেই সকাল হয়ে গেল।[৩]

ইয়াসরেভী নেতৃবৃন্দের সামনে কুরাইশদের বিক্ষোভ (قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب) ঃ

এ সংবাদ কুরাইশদের কর্ণকুহরে পৌছিবা মাত্র অসহনীয় দুঃখে বেদনা হেতু তাদের মাঝে কলরব শুরু হয়ে গেল। কেননা, মুসলিমগণের এ ধরণের অঙ্গীকার ও চুক্তির সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে তাদের জীবন ও সম্পদের উপরে হবে সেটা ভালভাবেই জানা ছিল। সুতরাং, সকাল হওয়া মাত্র তাদের নেতা ও মাস্তানদের ভারী দল ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর উদ্দেশ্যে মদীনাবাসীদের তাবু অভিমুখে যাত্রা করল এবং এইভাবে আবেদন জানাল,

হে খাযরাজের লোকেরা! আমরা অবগত হলাম যে, আপনারা আমাদের এ মানুষটিকে আমাদের নিকট হতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন ও আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছেন। অথচ আরব গোত্র সমূহের মধ্যে শুধুমাত্র আপনাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের অপছন্দ কাজ।[৪]

কিন্তু যেহেতু এ বাইআত অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাতের অন্ধাকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেহেতু খাযরাজ মুশরিকগণ এ সম্পর্কে মোটেই টের পায় নি। সেজন্য তারা বার বার অনুষ্ঠিত হয় নি। আমরা এ বিষয়ে বিন্দু মাত্র অবগত নই। পরিশেষে বিক্ষোভে শামিল এ দল আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনু সুলূলের নিকট পৌঁছিল। এ বিষয়ে তাঁর নিকট জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে সে বলল 'নিশ্চয় এটা বাজে কথা। এমনটি কিছুতেই হতে পারে না যে, আমার সম্প্রদায় আমাকে এড়িয়ে আমার অগোচরে এ রকম কোন কাজ করতে পারে। আমি ইয়াসরাবে থাকতাম, তাহলেও আমার পরামর্শ ছাড়া আমার সম্প্রদায় এরূপ করতনা।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৩-৪৪৬ পৃঃ।

[2] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫১ পৃঃ।

[3] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৮ পৃঃ।

[4] প্রাগুক্ত।

অবশিষ্ট রইলেন মুসলিমগণ তাঁরা আড় চোখে পরস্পর পরস্পরকে দেখলেন এবং চুপচাপ রইলেন। এমন কি হ্যাঁ কিংবা না বলেও কেউ মুখ খুললেন না। শেষ পর্যন্ত কুরাইশ নেতাদের ধারণা হলো মুশরিকদের কথা সত্য এবং এ কারণে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

সংবাদের সত্যতা ও শপথ কারীদের পশ্চাদ্ধাধাবন (تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين) ঃ

মক্কার কুরাইশ নেতাগণ সম্ভবতঃ দৃঢ়তার সঙ্গে এটা ধরেই নিয়েছিল যে, এ সংবাদ মিথ্যা। কিন্তু এর অনুসন্ধানে সর্বদা লেগেই থাকল এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে আবগত হল যে, অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা সত্য। এ ঘটনাটি অবগত হওয়ার পর তারা অঙ্গীকার গ্রহণকারীদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠে। কিন্তু যখন তারা এ সংবাদটি অবগত হল তখন অঙ্গীকারীবদ্ধ হাজীগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। মক্কাবাসীগণ দ্রুতপদে অগ্রসর হয়েও তাঁদের নাগাল পেলনা। অবশ্য সায়াদ বিন উবাদাহ এবং মুনযির বিন আমরকে দেখে ফেলে এবং তাদেরকে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু মুনযের অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হন। অবশ্য সায়াদ বিন উবাদাহ তাদের হাতে ধরা পড়ে যান। তারা তাঁর হাত দুটো তাঁরই পালানের দড়ি দ্বারা গর্দানের পিছনে বেঁধে দেয়। কষ্ট দিতে দিতে মক্কা পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে মুতয়েম বিন আদী এবং হারেস বিন হারব বিন উমাইয়া এসে তাঁকে ছাড়িয়ে দেন। কারণ, তাদের দুজনের যে, বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পথ দিয়ে যাতায়াত করত তা সায়ানের যে, বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পথদিয়ে যাতায়াত করত তা সায়াদের আশ্রয়েই চলাচল করত। তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়াই আনসারগণ খুবই বিব্রতবোধ করতে থাকেন এবং তাঁকে মুক্ত করার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য সলা পরামর্শ করতে থাকেন। ইতি মধ্যে দেখা গেল যে, বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সঙ্গী সাথীদের নিকট প্রত্যাবর্তনের করেছেন। এরপর সকলেই নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।[1]

এটাই হচ্ছে আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার যাকে আকাবার বড় শপথ বলে অভিহিত করা হয়। এ অঙ্গীকার এমন এক খোলা জায়গায় সম্পাদিত হয়েছিল যা ভালবাসা ও ওয়াদাপালন, সততা, বিচ্ছিন্ন ইমানদারদের মধ্যে সাহায্য, সহযোগীতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, আস্থা ও বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল। ফলে ইমানদার ইয়াসবির বাসীদের অন্তর মক্কার দুর্বল ভাইদের প্রতি দয়ামায়ায় ভরপুর ছিল। মক্কার অধিবাসী ভাইদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনার কমতি ছিল না। অধিকন্তু, তাঁদের প্রতি অত্যাচার কারীদের বিরুদ্ধে দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্রোধছিল। তাঁদের অন্তর এ ভাইদের ভালবাসার ভরপুর ছিল। যাদের না দেখে আল্ল-াহর ওয়াস্তে ভাই নির্ধারণ করেছিল।

আর এ উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুধাবন শুধু একটি কল্পিত আকর্ষণের ফলই ছিল না, যা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে শেষ হয়ে যেত পারে বরং এর উৎস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান ও কিতাবের প্রতি ঈমান। অর্থাৎ যে ঈমান অন্যায় অত্যাচারের বড় থেকে বড় শক্তির কাছেও মাথানত করে না। যে ঈমানেরই বদৌলতে (কারণে) এমন সব যুগান্ত কারী কর্ম ও কীর্তিমালা স্থাপন করেছেন এবং মানবজাতির ইতিহাসে এমন সব অধ্যায় রচনা করেছেন যার তুলনায় অতীত কিংবা বর্তমান কোন কালেই মিলে না। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও মিলবে না।

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫১ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৮-৪৫০ পৃঃ।

طلائـــع الهجـــرة
হিজরতের সর্ব প্রথম বাহিনী

আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার যখন সুসংবাদ ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করল তখন নাস্তিকতা ও মূর্খতার তৃণ শস্য বিহীন মরুভূমিতে ইসলাম মহীরূহের ভিত্তিমূল বহুলাংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। ইসলামী দাওয়াতের জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতটা সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে এটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা। এরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমগণকে এ নতুন দেশে হিজরত করার (দেশত্যাগ করার) অনুমতি প্রদান করেন।

হিজরতের অর্থ ছিল সকল প্রকার সুখ সুবিধা ও আরাম আয়েস ত্যাগ করে এবং ধন দৌলত ও সহায় সম্পদ সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে কেবলমাত্র প্রাণ কক্ষা করা। আর এটা মনে রাখতে হবে যে, মুশরিক বেষ্টিত মুসলিমগণের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। অধিকন্তু পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোন স্থানে বিপদ ঘনিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। আর ভ্রমণ ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতীক। জানা ছিল না আগমীতে কোন ধরণের বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে।

মুসলিমগণ এ সব জেনে শুনে হিজরত আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে মুশরিকরা তাঁদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করে দিল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে, এর মধ্যে বিপদ লুকায়িত রয়েছে। হিজরতের কয়েকটি নমুনা পাঠকগণের খিদমতে পেশ করা হল।

১. সর্ব প্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালমা (রাঃ)। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি আকাবার বড় শপথের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। যখন তিনি মক্কা শরীফ থেকে যাত্রা করতে চাইলেন তখন তাঁর শ্বশুর পক্ষ বলল, 'আপনার নিজ প্রাণের ব্যাপারেত আপনি আমাদের উপর জয়ী হলেন। কিন্তু আমাদের কন্যাকে আপনার সঙ্গে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

এ কথা বলার পর তাঁরা তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। এতে আবু সালমা (রাঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, 'তোমরা যখন এ মহিলাকে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ তখন আমরাও আমাদের সন্তানটিকে কিছুতেই থাকতে দিতে পারি না।'

তারপর সন্তানটিকে নিয়ে উভয় পক্ষ টানাটানির ফলে শিশুটির একটি হাত উপড়ে গেল। এমন এক অবস্থার মধ্যে আবু সালমার আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুটিকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে যান। এ কারণে আবু সালমাকে একাকী মদীনা গমন করতে হয়।

এরপর থেকে উম্মু সালমা (রাঃ)-এর অবস্থা এমনটি হল যে, প্রত্যহ সকালে তিনি আবতাহ (যেখানে এ ঘটনা ঘটেছিল) আসতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকতেন। এ অবস্থায় তাঁর অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় একটি বছর। তাঁর এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আত্মীয়-স্বজনেরা গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁর অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় একটি বছর। তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আত্মীয়-স্বজনেরা গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতে থাকেন। অবশেষে তারা তার স্বামীর নিকট যেতে দিচ্ছ না। অনর্থক কেন তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ?

এ কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়রা তাকে বলল, তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে স্বামীর নিকট যেতে পার। তখন তিনি সন্তান টিকে তার দাদার বাড়ী হতে ফেরত নিয়ে মদীনা চলে গেলেন। আল্লাহ আকবার! সন্তান সহ যখন তিনি তানঈম গিয়ে পৌঁছলেন তখন উসমান বিন আবু তালহার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। অবস্থা অবগত হয়ে সহযাত্রীরূপে মদীনা পৌঁছানোর জন্য নিয়ে গেলেন। যখন জনবসতি দৃষ্টি গোচর হল তখন তিনি বললেন, 'এ গ্রামে তোমার স্বামী আছেন, এ গ্রামে চলে যাও। আল্লাহ বরকতময়, বরকত দিন"। এরপর তিনি মক্কার অভিমুখে অগ্রসর হলেন।[১]

---

[1] ইবনে হিশাম ১/৪৬৮-৪৭০ পৃঃ।

২. সোহাইব (রাঃ) যখন হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন কুরাইশ গোত্রের কাফিরগণ বলল, 'তুমি যখন আমাদের নিকট এসেছিলে তখন নিকৃষ্ট ভিক্ষুক ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন সম্পদ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। এখন তুমি চাচ্ছ যে, তোমার ধনসম্পদ নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। আল্লাহর কসম! এ কিছুতেই হতে পারে না।'

সোহাইব (রাঃ) বললেন, 'ঠিক, আমি আমার ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তবে কি তোমার আমার পথ ছেড়ে দিব?

তারা বলল, 'হ্যাঁ'

সোহাইব বললেন, 'বেশ ঠিক আছে। চলো আমার ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তোমাদেরকে দিয়ে দিই।' (তারপর তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতে তার সমস্ত সম্পদ কাফিরদের হাতে তুলে দিলেন)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন আবেগ আপুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সোহাইব লাভবান হয়েছেন, সোহাইব লাভবান হয়েছেন।[1]

৩. ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আইয়াশ বিন আবী রাবীয়াহ (রাঃ) হিশাম বিন আস বিন অয়েল (রাঃ) নিজেদের মধ্যে এটা স্থির করলেন যে, ওমুক জায়গায় খুব সকালে একত্রিত হয়ে সেখানে থেকে মদীনা হিজরত করা হবে। ওমর (রাঃ) ও আইয়াশ (রাঃ) যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হল না।

এ দিকে ওমর (রাঃ) ও আইয়াশ (রাঃ) যখন মদীনায় গিয়ে 'কুবাতে' অবতরণ করলেন তখন আবু জাহল ও তার ভাই হারেস আইয়াশের নিকট উপস্থিত হল। তারা তিন জন ছিল একই মায়ের একই মায়ের সন্তান। তারা দুজন আইয়াশ (রাঃ) কে বলল, 'তোমার এবং আমাদের মাতা নযর (মানত) মেনেছে যে, যতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত চুল আঁচড়াবে না এবং রোদ ছেড়ে ছায়াতে আশ্রয় নেবে না। এ কথা শ্রবণে আইয়াশ (রাঃ) আপনা মায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত দয়াদ্র হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে ওমর (রাঃ) আইয়াশ (রাঃ)-কে বললেন, 'দেখ আইয়াশ! আল্লাহর কসম! এরা তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে সরিয়ে বিপদে ফেলার জন্য এ কূট কৌশল অবলম্বন করেছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। আল্লাহর কসম! তোমার মাতাকে যদি উকুনে কষ্ট দেয় তবে সে অবশ্যই ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু আইয়াশ সে কথায় কর্ণপাত না করে মাতার কসম পূর্ণ করার জন্য ঐ দুজনের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

ওমর (রাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার মাতার ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে তুমি যখন দৃঢ় সংকল্প তখন তোমার যাতায়াতের সুবিধার্থে আমার উটনীটি নিয়ে যাও। এ হচ্ছে খুবই দ্রুতগামী এবং শান্ত স্বভাবের একে যদি তুমি নিয়ে যাও তাহলে হাতের বাইরে ছেড়ে দেবে না। তাছাড়া মক্কার মুশরিকগণের নিকট হতে কোন প্রকার অনিষ্ট কিংবা অসদারণের আশঙ্খা থাকলে পালিয়ে আসবে।

আইয়াশ (রাঃ) উটনীর উপর আরোহণ করে তাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর এক জয়গায় আবু জাহল বলল, 'ভাই আমার এ উট নিয়ে তো খুব অসুবিধায় পড়তে হল। তুমি কি আমাকে তোমার পশ্চাতে ঐ উটনীর পিঠে বসিয়ে নেবে?'

আইয়াশ বললেন, 'ঠিক আছে' তারপর তিনি উটনীকে বসিয়ে দিলেন।

তারা দুজনে আপন আপন উটকে বসিয়ে দিল যাতে আবু জাহাল তার উটের পিঠ থেকে নেমে গিয়ে আইয়াশ (রাঃ)-এর উটনীর পিঠে গিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তিনজনেই যখন মাটিতে নেমে পড়ল তখন হঠাৎ তারা দুজনে মিলিতভাবে আইয়াশ (রাঃ)-এর উপর আক্রমণ চালাল এবং দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল। তারপরে তাঁকে এ বাঁধা অবস্থাতেই দিবাভাগে মক্কায় নিয়ে এসে মক্কা বাসীকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে মক্কাবাসী! আপনারা আপনাদের অবোধদের সঙ্গে এইরূপ করবেন যেমন আমরা আমাদের অবোধের সঙ্গে করেছি।[2]

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৭৭ পৃঃ।

[2] হিশাম ও আইয়াশ (রাঃ) কাফিরদের বন্দী খানায় পড়ে থাকলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরত করে যাওয়ার পর একদিন বললেন, 'কে এমন আছেন যিনি হিশাম ও আইয়াশকে আমার জন্য ছাড়িয়ে আনবে।" অলীদ বিন অলীদ বললেন, 'আমি তাদেরকে আপনার জন্য ছাড়িয়ে আনার দায়িত্ব

হিজরতের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণকারীদের সম্পর্কে জানতে পেরে মক্কার মুশরিকগণ তাঁদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করত। তার তিনটি নমুনা এখানে পেশ করা হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিজরতের ধারা অব্যাহত থাকল যার ফলে আকাবার বড় অঙ্গীকারের পর মাত্র দু'মাসের বেশী সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ, অবশিষ্ট ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশে এঁরা দুজন মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। অবশ্য আরও এমন কিছু সংখ্যক মুসলিম মক্কায় ছিলেন যাদেরকে মুশরিকগণ বল প্রয়োগের মাধ্যমে আটকে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মাল-সামানা গোছাগাছ করে রেখে যাত্রার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। আবু বকর (রাঃ)-এর প্রবাসের সামগ্রী বাঁধা ছিল। অর্থাৎ তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।[1]

সহীহ বুখারীতে আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মুসলিমগণকে বললেন, 'আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। এটা হচ্ছে লাওয়ার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি খেজুর বাগানের এলাকা। এরপর মুসলিমগণ মদীনার দিকে হিজরত করলেন। হাবশের সাধারণ মোহাজেরগণও মদীনায় হিজরত করলেন। আবু বকর (রাঃ)-ও মদীনায় হিজরতের জন্য জিনিস পত্র গুছিয়ে ফেললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'একটু থেমে যাও। কেননা আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবু বকর বললেন, 'আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আপনার জন্যও কি হিজরতের অনুমতি আশা করতে পারি।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।

এরপর আবু বকর (রাঃ) থেমে গেলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফর করতে পারেন। তাঁর কাছে দুটো উটনী ছিল। তিনি তাদের চার মাস ধরে ভালভাবে বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুললেন যাতে তারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পথ চলতে পারে।[2]

নিলাম।" তারপর অলীদ গোপনে মক্কা গমন করলেন। একজন স্ত্রীলোকের (যেতাদের দুজনের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল) পিছনে পিছনে গিয়ে তাদের ঠিকানা বের করলেন। এঁরা দুজনে একটি ছাদ বিহীন গৃহে বন্দী ছিলেন। রাত্রি হলে অলীদ দেওয়াল ডিঙিয়ে তাঁদের নিকট হাজির হলেন এবং বন্দীগদশা থেকে মুক্ত করে তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় পালিয়ে এলেন। ইবনে হিশাম ১/৪৭৪-৪৭৬ পৃঃ। ওমর (রাঃ) বিশজন সাহাবা'র এক জামায়াতের সঙ্গে হিজরত করেছিলেন সহীহ বুখারী ১/৬৬৮)।

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খন্ড ৫২ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী বাবু হিজবাতিন নবী ﷺ অসহায়বিহী ১ম খণ্ড ৫৫৩ পৃঃ।

في دار الندوة [برلمان قريش]

দারুন নাদওয়াতে (সংসদ ভবনে) কুরাইশদের অধিবেশন

সাহাবীগণ (রা.) নিজ নিজ ধনসম্পদও স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে সঙ্গে নিয়ে যখন আউস ও খাযরাজ গোত্রের আবাসিক এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন মুশরিকদের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। চরম দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় তারা এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, ইতোপূর্বে কোন কারণেই তাদের মধ্যে এত অধিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয় নি। হিজরতের এ ব্যাপারটি ছিল তাদের মূর্তি পূজা, সামাজিক ঐক্যবোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

মুশারিকরা এটা ভালভাবেই অবগত ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে পূর্ণ নেতৃত্বদান ও পথ নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ আকর্ষণীয় শক্তি মওজুদ রয়েছে। সাহাবীগণ (রাঃ) মধ্যে কিরূপ দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগের উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে। তাছাড়া আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে কিরূপ শক্তি সামর্থ এবং যুদ্ধ করার যোগ্যতা রয়েছে এবং ঐ গোত্র দ্বয়ের জ্ঞানীদের মধ্যে সন্ধি ও পরিচ্ছন্নতার কিরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে ও কয়েক বছর ধরে পরিচালিত গৃহযুদ্ধের তিক্ততা আস্বাদনের পর এখন কিভাবে নিজেদের মধ্যকার দুঃকষ্ট ও শত্রুতা দূরীকরণের জন্য আগ্রহী।

তারা এটাও অনুধাবন করে ছিল যে, ইয়ামান হতে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে তাদের যে, ব্যবসার জাতীয় সড়ক (রাজপথ) অতিক্রম করছে। এ জাতীয় সড়কে মদীনার সৈনিক অবস্থান কতবেশী গুরুত্বপূর্ণ এমন এক স্পর্শকাতর অবস্থার সম্মুখীন তারা হল, সে সময় সিরিয়ার সঙ্গে মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ্য দীনার সোনার সমতুল্য। এছাড়া ছিল তায়েফবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে। আর এ সব ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর কর ছিল পথচারী বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তা বিধানের উপর।

এ বর্ণনা মতে এটা অনুমান করা মোটেই কঠিন ছিল না যে, হিজরতকারী মুসলিমগণের মদীনায় আগমনের ফলে ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং মদিনাবাসীগণকে মক্কা বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করাতে সক্ষম হলে, তা হবে মক্কাবাসীদের জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। মুশরিকেরা উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল কাজেই তারা এ চ্যাঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেল। এটা তাদের জানা কথা যে, এ বিপদের মূলসূত্র হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত। যার পতাকাবাহী হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ।

উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আকাবারে দ্বিতীয় অঙ্গীকারের আনুমানিক আড়াইমাস পর চতুর্দশ নবুওয়াত বর্ষের ২৬শে সফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার[1] দিবসের প্রথম ভাগে[2] মক্কার সংবাদ ভবন দারুন নদওয়াতে কুরাইশ মুশরিকগণ ইতিহাসের সব চাইতে ভয়াবহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করে। এতে সকল কুরাইশগোত্রের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে।

আলোচ্য বিষয় ছিল এমন এক অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীকে (নবী ﷺ-কে) হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়।

এ অবস্থায় মারমুখী অধিবেশন যে, সকল গোত্রীয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যথাক্রমে ঃ (১) আবু জাহল বিন হিশাম, বনী মাখযুম গোত্র (২) যুবায়ের বিন মুতয়েম, তুয়াইম বিন আদী এবং হারেশ বিন আমের, বনী নওফাল বিন আবদে মানাফ থেকে (৩) শাইবাহ বিন রাবীয়াহ, উৎব বিন রাবীয়াহ

---

[1] এ দিনক্ষণ বা তারীখ আল্লামা সোলায়মান সালমান মানুসুরপুরী (রহঃ) গবেষণা আলোকে নির্দিষ্ট করা হল। রাহমাতুলিল্লল আলামীন ১/৯৫, ৯৭, ১০২, ২য় খণ্ড ৪৭১ পৃঃ।

[2] ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে বলা হয়েছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) নবী ﷺ-এর নিকট এ সব ভার সংবাদ এনেছিলেন এবং তাঁকে হিজরতের অনুমতি সংবাদ দিলেন। আয়শা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ ঠিক দুপুরে আবু বকরের গৃহে এসে বললেন, হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। পূর্ণ বিবরণ পরে আলে।

এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব, বনী আবদে শামস্ বিন আবদেমানাফ থেকে। (৪) নযর বিন'আসওয়াদ ও হাকীম বিন হেযাম বনী আসাদ বিন আব্দুল উয্যা থেকে। (৬) নবীহ বিন হাজ্জাজ ও মুনাব্বাহ বিন হাজ্জাজ বনী সহম থেকে (৭) উমাইয়া বিন খালফ বনী জুমাহ থেকে।

নির্ধারিত সময়ে যখন এ সব নেতৃবৃন্দ দারুন নদওয়ায় (সংসদভবনে) পৌঁছলেন তখন ইবলীসও সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতের রূপ ধরে অত্যন্ত অভিজাতমানের পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাস্তা ঘিরে দরজার উপর দণ্ডায়মান হল। তাকে দেখে লোক সকলে আপোষে বলাবলি করতে লাগল। 'ইনি কোথাকার শাইখ (পণ্ডিত)"?

ইবলীস বলল, 'ইনি হচ্ছেন নাজদের শাইখ।' আপনাদের প্রোগ্রাম শুনে উপস্থিত হয়েছেন, 'কথাবার্তা শুনতে চান এ সম্ভব হলে প্রয়োজন মাফিক পরামর্শ দান করতে চান।'

লোকেরা বলল, 'বেশ ভাল, আপনি ভিতরে আসুন"।

এ সুযোগ ইবলীশ তাদের সঙ্গে ভিতরে গেল।

সংসদীয় বিতর্ক শেষে সর্ব সম্মতিক্রমে নবী ﷺ-কে অন্যায়ভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي ﷺ) :

গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের আগমনে সভাকক্ষ পরিপূর্ণ হওয়ার পর বিতর্ক পর্বের সূচনা হল। তারপর প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত আকারে বিতর্ক চলতে থাকল। প্রথমে আবুল আসওয়াদ এ প্রস্তাব পেশ করল যে, 'আমরা ঐ লোকটিকে আমাদের ভিতর থেকে বের করে দিই এবং এ শহর থেকে বিতাড়িত করি। সে কোথায় যাবে কিংবা কোথায় থাকবে সে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমাদের আর কোনই সম্পর্ক থাকবে না। এ কারণে আমাদের আর কোন সমস্যা থাকবে না এবং পূর্বের অবস্থা আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু শাইখ নাজদী বলল, 'আল্লাহর কসম! এটা সঠিক প্রস্তাব হল না। তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, ঐ ব্যক্তির কথা কত চমৎকার এবং কথা বলার ধারা কতটা মধুর। তোমরা দেখনা কিভাবে সে মানুষের মন জয় করে চলেছে। আল্লাহ শপথ! তোমরা যদি এটা কর তবে সে কোন আরব গোত্রে গিয়ে আশ্রয় নেবে এবং তাদেরকে নিজ অনুসারী করে নেবে। তারপর তাদের সঙ্গে সখ্যতা করে তোমাদের শহরে আক্রমণ চালিয়ে তোমাদের কোনঠোসা করে ফেলবে এবং যাচ্ছেতাই ব্যবাহার করবে। তোমরা যে সমাধানের কথা বলছ তা বাদ দিয়ে অন্য সমাধানের কথা চিন্তা করো।'

আবুল বুখতারী বলল, 'তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ। বন্দী অবস্থায় তাঁকে ঘরে আবদ্ধ রেখে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দাও এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য (মৃত্যু) অপেক্ষা করতে থাক। যেমনটি ইতোপূর্বে কবিদের বেলায় (যুহাইর, নাবেগা ও অন্যান্য) হয়েছিল।'

শাইখ নাজদী বলল, 'না, আল্লাহর কসম! এ প্রস্তাব তেমন সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা তাকে বন্দী করো যেমনটি তোমরা বলছ তাহলে তাঁর খবর বন্ধ দরজা গিয়েই বের হয়ে তাঁর সঙ্গীদের নিকট পৌঁছে যাবে। আর তখন তাদের পক্ষে হয়তো এটা অসম্ভব হবে না যে, তারা তোমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। এরপর তারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে একদম পর্যুদস্ত করে ফেলবে। অতএব, এ প্রস্তাব ও সমর্থন যোগ্য নয়। অন্য কোন সমাধানের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

এরপর দুটি প্রস্তাবই যখন সংসদ কর্তৃক নাকচ হয়ে গেল তখন পেশ করা হল অন্য একটি প্রস্তাব। এ প্রস্তাবটি পেশ করল মক্কা সব চাইতে কুখ্যাত ব্যক্তি আবু জাহল। সে বলল, 'ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মদ ﷺ) সে সম্পর্কে আমার একটি অভিমত রয়েছে। আমি দেখছি এ যাবৎ তোমরা কেউই সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারনি। লোকেরা বলল, 'আবুল হাকাম! সেটা কী?'

আবু জাহল বলল, 'আমাদের প্রস্তাব হল প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠাম দেহী ও শক্তিশালী যুবক নির্বাচন করা হোক এবং প্রত্যেককে একটি করে ধারালো তরবারী দেয়া হোক। তারপর সকলেই তার দিকে অগ্রসর হোক এবং সকলেই এক সঙ্গে তলোয়ার মেরে তাকে হত্যা করুক। তাহলেই আমরা তার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাব। আর এভাবে হত্যা করার ফল হবে রক্তপাতের দায়িত্বটা সকল গোত্রের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে

পড়বে। এর একটি বিশেষ সুবিধা হবে বুন আবদে মানাফ সকলের সঙ্গে যুদ্ধ। করতে সক্ষম হবে না। ফলে (একটি খুনের বদলে একশত উট প্রদান) দিয়াত গ্রহণে রাজী হয়ে যাবে এবং আমরা তা আদায় করে দেব।[১]

শাইখ নাজদী বলল, 'এ যুবক যে কথা বলল সেটাই কার্যকর থাকল। যদি কোন প্রস্তাব ও সমর্থনের প্রশ্ন আসে তবে এটাই থাকবে, অন্যগুলোর তেমন কোন গুরুত্বই থাকবে না।'

মক্কার সংসদ এমনভাবে এক কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে দিনের মতো মুলতবী হয়ে গেল। আর সদস্যগণ এ সিদ্ধান্ত ত্বরিৎবাস্তাবায়ণে সংকল্পবদ্ধ হয়ে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৪৮০-৪৮২ পৃঃ।

هجــرة النبــي ﷺ
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার পাপময়, ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল তখন জিবরাঈল (ﷺ) মহানও বরকতময় প্রভূর তরফ থেকে আল্লাহর বাণী নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে কুরাইশ মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কথা জনালেন। তিনি বললেন যে, 'আপনার প্রভূ পরওয়ারদেগার মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আপনি এ যাবৎ যে শয্যায় শয়ন করে এসেছেন আজ রাত্রে সে শয্যায় শয়ন করবেন না।' এ কথার মাধ্যমে হিজরত করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হল।[১]

হিজরত সংক্রান্ত আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হওয়ার পর নবী কারীম ﷺ ঠিক দুপুরে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গৃহে তশরীফ আনয়ন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, হিজরতের সময় এবং পন্থা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, 'আমরা আব্বাস (আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর) বাড়ীতে ঠিক দুপুরে বসেছিলাম তখন জনৈক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে, নবী করীম ﷺ মাথা ঢেকে আগমন করছেন। এটা দিবা ভাগের এমন সময় ছিল যে, সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণতঃ কোথাও যেতেন না। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি এ সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য আগমন করেছেন?'

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন, তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, 'আপনার কাছে যে, সকল লোক রয়েছে তাদের সরিয়ে দিন।'

আবু বকর বললেন, 'যথেষ্ট, আপনার গৃহিনী ছাড়া এখানে আর কেউই নেই। আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ।

তিনি বললেন, 'ভাল, হিজরত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

আবু বকর বললেন, 'সাথে... হে আল্লাহর ﷺ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ"।

তারপর হিজরতের সময় সূচী নির্ধারণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাতের আগমনের জন্য প্রতীক্ষারত রইলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ি ঘেরাও (تطويق منزل الرسول ﷺ) :

এক দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন অন্য দিকে মক্কার পাপীষ্ঠরা দারুন করতে থাকল। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্ন তালিকাভূক্ত এগার জন পাপীষ্ঠকে নির্বাচন করা হল। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

(১) আবু জাহল বিন হিশাম, (২) হাকাম বিন আস, (৩) উকবা বিন আবু মুয়াইত, (৪) নাযার বিন হারেস (৫) উমাইয়া বিন খালফ, (৬) যামরাহ বিন আসওয়াদ, (৭) তোয়াইমা বিন আদী, (৮) আবু লাহাব, (৯) উবাহ বিন খালফ, (১০) নুবাইহ বিন হাজ্জাজ এবং তার ভাই (১১) মুনাব্বাহ বিন হাজ্জাজ।[২]

তাদের এ ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ ও কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের অবস্থা এতই দৃঢ় ছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা কেলাহ ফতেহ করে দেবে। আবু জাহল চরম অহংকার, উপহাস ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নবী ﷺ-এর গৃহ ঘেরাওকারী আপন সঙ্গীদের বলল, 'মুহাম্মদ ﷺ বলছে যে, যদি তোমরা তার ধর্মেত প্রবেশ কর তার

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮২ পৃঃ। যা'দুল মাদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ।

[2] যা'দুল মাহদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ।

অনুসরণ কর তাহলে অনারবদের উপর আরবদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরে আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন উরদুনের বাগান সমূহের মতো বাগান দেয়া হবে। আর যদি তোমরা তা না কর তাহলে তার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে। আর এ অবস্থায় মৃত্যুর পর আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানে না কি অনন্ত কাল জাহন্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।[1]

যাহোক, জঘনন্যতম এ পাপাচার অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল রাত দুপুরের পরক্ষণ। এ জন্য তারা রাত জেগে সময় কাটাচ্ছিল এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাই হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তাঁর বিজয়ই হচ্ছে প্রকৃত বিজয়। তাঁরই একক এখতিয়ারে রয়েছে আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র আধিপত্র। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাঁকে বাঁচাতে চান কেউই তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। আবার তিনি যাকে পাকড়াও করতে চান পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতে কারীমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

[الأنفال: ٣٠].

"স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন কাফিরগণ তোমাকে বন্দী করার কিংবা হত্যা করার কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।' (আল-আনফাল ৮ : ৩০)

হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহত্যাগ (الرسول ﷺ يغادر بيته) ঃ

কুরাইশ মুশরিকগণ তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। উন্মত্ত জিঘাংসু শত্রু পরিবেষ্টিত রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কে বললেন, 'তুমি আমার এ সবুজ হাযরামী[2] চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাদর গায়ে দিয়েই শুয়ে থাকতেন।[3]

তারপর নবী করীম ﷺ গৃহের বাহিরে গমন করলেন এবং মুশরিকদের কাতার ফেড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি দরে রাখলেন যার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আর দেখতে পেল না। এ সময় তিনি এ আয়াত করীমাটি পাঠ করছিলেন,

﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩]

"তাদের সামনে আমি একটা (বাধার) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, আর পেছনে একটা প্রাচীর, উপরন্তু তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; কাজেই তারা দেখতে পায় না।' (ইয়া সীন ৩৬ : ৯)

এ সময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না যার মাথায় তিনি মাটি নিক্ষেপ করেন নি। এরপর তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর গৃহে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেন অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁরা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে 'সত্তর' নামক পর্বত গুহায় গিয়ে পৌঁছলেন।[4]

তারা বলল, 'আমরা মুহাম্মদ ﷺ-কে খতম করার অপেক্ষায় রয়েছি।

---

[1] প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ।

[2] হাযমারাউতের (দক্ষিণ ইয়েমেনের) তৈরি চাদরকে হাযরামী চাদর বলা হয়।

[3] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮২-৪৮৩ পৃঃ।

[4] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ। যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ।

সে বলল, 'উদ্দেশ্য সাধনে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছ। আল্লাহর কসম! কিছুক্ষণ পূর্বে মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। যাবার পূর্বে তিনি তোমাদের মাথার উপর এক মুষ্টি মৃত্তিকা ছড়িয়ে গিয়ে গেয়েছেন।'

তারা বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে দেখিনি। এ বলে তারা মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর দারুণ হতাশা ও ক্রোধের সঙ্গে তারা দরজার ফাঁক-ফুকুর দিয়ে গৃহের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকল। চাদর জড়ানো অবস্থায় শায়িত আলী (রাঃ) দৃষ্টি গোচর হলে তারা বলতে লাগল, 'আল্লাহর কসম! এই তো মুহাম্মদ ﷺ শুয়ে আছে।' তিনি শুয়ে আছেন এ ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে সকালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এ দিকে যখন সকাল হল এবং আলী (রাঃ) বিছানা ছেড়ে উঠলেন তখন তারা বুঝতে পারল যে, সত্যি সত্যিই মুহাম্মদ ﷺ-নেই। তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, 'মুহাম্মদ ﷺ কোথায়"?

গৃহ থেকে গুহা পর্যন্ত (من الدار إلى الغار) :

রাসূলুল্লাহ ২৭শে সফর চতুর্দশ নবুওয়াত সাল মোতাবেক ১২/১৩ই সেপ্টেম্বর, ৬২২[1] খ্রিষ্টাব্দ মধ্যরাতের সামান্য কিছু সময় পর নিজ গৃহ থেকে বাহির হয়ে জান-মালের ব্যাপারে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আবু বকর (রাঃ)-এর গৃহে গমন করেছিলেন এবং সেখান থেকে পিছনের একটি জানালা দিয়ে বাহির হয়ে দুজনই পথ বেয়ে অগ্রসর হতে থাকেন যাতে রাতের অন্ধকার থাকতেই তারা মক্কা নগরীর বাহিরে চলে যেতে সক্ষম হন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, কুরাইশগণ তাঁকে দেখতে না পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তার সন্ধানে লেগে পড়বে এবং সর্বপ্রথম যে রাস্তায় দৃষ্টি দেবে তা হচ্ছে মদীনার কর্মব্যস্ত রাস্তা যা উত্তর দিকে গেছে। এ জন্য তাঁরা সেই পথে যেতে থাকলেন যে পথটি ছিল সেই পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। অর্থাৎ ইয়েমেন যাওয়ার পথ যা মক্কার দক্ষিণে দিকে অবস্থিত ছিল। এ পত ধরে পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সুপ্রসিদ্ধ সওর পর্বতের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলেন। এ পর্বতটি ছিল খুব উঁচু, পর্বত শীর্ষে আরোহনের পথে ছিল আঁকা-বাঁকা ও পাক জড়ানো। আরোহনের ব্যাপারটিও ছিল অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। এ পর্বত গোত্রের এখানে-সেখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদযুগলকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। বলা হয়েছে যে, তিনি পদচিহ্ন গোপন করার জন্য আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য তাঁর পা জখম হয়েছিল। যাহোক, আবু বকর (রাঃ)-এর সহায়তায় তিনি পর্বতের সৃঙ্গদেশে অবস্থিত গুহার পাশে গিয়ে পৌঁছলেন। এ গুহাটিই ইতিহাসে 'গারে সওর বা সওর গুহা' নামে পরিচিত।[2]

গুহায় প্রবেশ (إذ هما في الغار) ঃ

গুহার নিকট উপস্থিত হয়ে আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এখন গুহায় প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি প্রবেশ করে দেখি এখানে অসুবিধা জনক কোন কিছু আছে কিনা। যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে প্রথমে তা আমার সম্মুখীন হবে এবং এর ফলে আপনাকে প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। এ কথা বলার পর আবু বকর (রাঃ) গর্তের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং প্রথমে গর্তটি পরিষ্কার করে নিলেন। গর্তের এক পাশে কিছু ছিদ্র ছিল। নিজের কাপড় টুকরো টুকরো করে তিনি ছিদ্রপথের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দুটো ছিদ্র মুখ বন্ধ করা সম্ভব হল না। আবু বকর (রাঃ) ছিদ্র দুটোর মুখে নিজ

---

[1] রাহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ। সফরের এ মাস চতুর্দশ নবুওয়াাত বর্ষের ঐ সময় হবে যখন বৎসর আরম্ভ হবে মুহারম মাসে। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মাসে নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে মাস থেকে বৎসর গণনা করা হয়ে থাকে তাহলে তা ছিল নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের সফর মাসে। সাধারণ ইতিহাস বিদগণ প্রথম হিসাবটি গ্রহণ করেছেন। আর যাঁর দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ঘটনার তরবীরে ভুল করেছেন। আমি মুহারম থেকে বছরের শুরু ধরেছি

[2] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ। শাইখ আবদুল্লাহ মুখাতসারুস ১৬৭ পৃঃ।

পদদ্বয় স্থাপন করার পর ভিতরে আগমনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরয পেশ করলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে আবু বকর (রাঃ)-এর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে ছিদ্র মধস্থিত স্বর্প কিংবা বিচ্ছ কোন কিছুতে দংশন করল। তিনি বিষে কাতর হয়ে উঠলেন অথচ নড়াচড়া করলেন না এ ভয়ে যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। এদিকে বিষের তীব্রতায় তাঁর চক্ষু যুগল থেকে অশ্রু ঝরতে থাকল এবং সেই অশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডলের উপর। এর ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু বকর (রাঃ)! তোমার কি হয়েছে?"

তিনি আরয করলেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, গর্তের ছিদ্র পথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে। এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মুখ থেকে কিছুটা লালা নিয়ে সেই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে আবু বকর (রাঃ)-এর দংশন জনিত বিষব্যাথা দূরীভূত হল।[1] এই পর্বত গুহায় তাঁরা উভয়ে একাদিক্রমে তিন রাত্রি (শুক্র, শনি ও রবিবার রাত্রি) অবস্থান করলেন।[2] আবু বকর (রাঃ)-এর পুত্র আবদুল্লাহও ঐ সময় একই সঙ্গে সেখানে রাত্রি যাপন করতেন। আয়শা (রাঃ)-এর বর্ণনাতে তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও ধীশক্তি সম্পন্ন যুবক। সকলের অগোচরে রাত গভীর হলে তিনি সেখানে যেতেন এবং সাহরী সময়ের পূর্বেই মক্কায় ফিরে এসে মক্কাবাসীগণের সঙ্গে মিলিত হতেন। এতে মনে হতো যেন তিনি মক্কাতেই রাত্রি যাপন করেছেন। গুহায় আত্মগোপনকারীগণের বিরুদ্ধে মুশরিকগণ যে সকল ষড়যন্ত্র করত তা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তিনি তাঁদের নিকট পৌছিয়ে দিতেন।

এদিকে আবু বকর (রাঃ)-এর গোলাম আমের বিন ফুহাইয়া পর্বতের ময়দানে ছাগল চরাত এবং যখন রাত্রির এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যেত তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের নিকটে যেত এবং আত্মগোপনকারী নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীকে (রাঃ) দুগ্ধ পান করাত। আবার প্রভাত হওয়ার প্রাক্কালে সে ছাগলের পাল নিয়ে দূরে চলে যেত। পরপর তিন রাত্রেই সে এরূপ করল।[3] অধিকন্তু, আবদুল্লাহ বিন আবু বকরের গমনাগমন পথে তাঁর পদ চিহ্ন গুলো যাতে মিশে যায় তার জন্য আমের বিন ফুহাইরা সেই পথে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে যেত।[4]

কুরাইশদের প্রচেষ্টা ঃ

এদিকে কুরাইশদের অবস্থা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার উন্মাদনায় উন্মত্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করার পর প্রভাতে যখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারল যে, তিনি তাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তারা একদম দিশেহারা হয়ে পড়ল এবং ক্রোধের আতিশয্যে ফেটে পড়তে চাইল। তাদের ক্রোধের প্রথম শিকার হলেন আলী (রাঃ)। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে কা'বা গৃহ পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং প্রায় এক ঘন্টা কাল যাবৎ তাঁর উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাল যাতে তার নিকট থেকে তাঁদের দুজনের সম্পর্কে খোঁজ খবর কিছুটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।[5] কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদ গ্রহহ করা সম্ভব না হওয়ায় আবু বকর (রাঃ)-এর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং সেখানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করল। দরজার করাঘাত শুনে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বের হলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পিতা কোথায় আছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহই ভাল জানেন, আমি জানি না আব্বা কোথায় আছেন?' এতে কমবখত খবীস আবু জাহল তাঁর গণ্ডদেশে

---

[1] ওমর বিন খাত্তাব থেকে ইমাম রাযীন একথা বর্ণনা করেছেন। এ রেওয়ায়েতে এটা আছে যে, মৃত্যুর প্রাক্তকালে এ বিষ তাঁর দেহে প্রতিক্রিয়া করল এবং এটাই ছিল তাঁর মৃত্যুর প্রতক্ষ্য কারণ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ। বাবু মানাকেরে আবু বকর দ্রঃ।

[2] ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৩৬ পৃঃ।

[3] সহীহ বুকীরী ১ম খণ্ড ৫৫৩-৫৫৪ পৃঃ।

[4] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৬ পৃঃ।

[5] রহমাতুলিল আলামীন ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

এমন জোরে চপেটাঘাত করল যে, সে ব্যাথার চোটে চিৎকার করে উঠল এবং তার কানের বালী খুলে পড়ে গেল।[১]

এরপর কুরাইশগণ একটি তড়িঘড়ি সভা করে সর্ব সম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তাঁদের ধরার জন্য অনতিবিলম্বে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। ফলে মক্কা থেকে বেরিয়ে যে দিকে যত পথ গিয়েছে সকল পথেই অত্যন্ত কড়া সশস্ত্র পাহাড়া বসিয়ে দেয়া হল। অধিকন্তু, সর্বত্র এ ঘোষণাও প্রচার করে দেয়া হল যে, যদি কেউ মুহাম্মদ (ﷺ) এবং আবু বকর (রাঃ)-কে অথবা দুজনের যে কোন একজনকে জীবন্ত কিংবা মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারবে তাকে একশত উষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্ররষ্কার প্রদান করা হবে।[২]

এই প্রচারনার ফলে বিভিন্ন বাহনারোহী, পদাতিক ও পদচিহ্ন বিশারদগণ অত্যন্ত জোরে সোরে অনুসন্ধান কাজ শুরু করে দিল। প্রান্তর, পর্বতমালা, শস্যভূমি, বিরান অঞ্চল সর্বত্রই তারা অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, কিন্তু ফল হল না কিছুই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বকর (রাঃ) যে, পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে ছিলেন অনুসন্ধানকারীগণ সেই গুহার প্রবেশ পথের পার্শ্বদেশে পৌঁছে গেল, কিন্তু আল্লাহ আপন কাজে জয়ী হলেন। সহীহ বুখারী শরীফে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, 'আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে গুহায় থাকা অবস্থায় মাথা তুলে মানুষের পা দেখতে পেলাম।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নাবী (ﷺ) তাদের মধ্যে কেউ যদি শুধু নিজ দৃষ্টি নীচের দিকে নামায় তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে।'

তিনি বললেন, [اسكت يا أبا بكر، اثنان، الله ثالثهما] 'আবু বকর (রাঃ) চুপচাপ থাক। আমরা দুজন, আর তৃতীয় জন আছেন আল্লাহ তা'আলা।' অন্য একটি বর্ণনায় ভাষা এরূপ আছে, [ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما] 'হে আবু বকর (রাঃ) এরূপদুজন লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ।[৩]

প্রকৃত কথা হচ্ছে এটা ছিল একটি মো'জেযা (অলৌকিক ঘটনা) যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ﷺ)-কে প্রদান করেছিলেন। কাজেই অনুসন্ধানকারীগণ সে সময় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল যেখানে তিনি (ﷺ) ও তাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল কয়েক ফুটেরও কম।

মদীনার পথে (في الطريق إلى المدينة) ঃ

তিনদিন যাবৎ নিস্ফল দৌড়ঝাঁপ এবং খোঁজা খুঁজির পর যখন কুরাইশদের আকস্মিক প্রজ্বলি ক্রোধাগ্নি কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় অনুসন্ধান কাজের মাত্রা মন্দীভূত হয়ে এল এবং তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আবু বকর (রাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। আবদুল্লাহ বিন আরীকত লাইসী যিনি সাহারা জনমানব শুন্য পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, মদীনায় পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য পূর্বে তাঁর সঙ্গে চুক্তি ও মজুরী নির্ধারিত হয়েছিল এবং তার নিকট দুটি বাহনও রাখা হয়েছিল। ঐ ব্যক্তি তখনো কুরাইশ মূর্তিপূজকদের দলভূক্ত থাকলেও পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁর উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁর সঙ্গে এ মর্মে কথাবার্তা ছিল যে, তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর চতুর্থ রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে তাকে গারে সওর পৌঁছতে হবে। সেই কথা মোতাবেক সোমবারের দিবাগত রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে উপস্থিত হলেন। সেটি ছিল ১ম হিজরীসনের রবিউল আওয়াল মাসের চাঁদনী রাত (মোতাবেক ১৬ই

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৭ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫৫৪ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫১৬, ৫৫৮ পৃঃ। এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আবু বকর (রাঃ)-এর অস্থিরতার কারণ নিজ প্রাণের ভয় নয় বরং এর একমাত্র কারণ ছিল যা এ রওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখণ আবু বকর (রাঃ)-এর পদরেখা বিশারদগণকে দেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে তাঁর চিন্তা হল। তিনি বললেন, 'আমি যদি মারা যাই তবে কেবলমাত্র আমি একজন লোকই মরব। কিন্তু যদি আপনাকে হত্যা করা হয়, তাহলে পুলো উম্মতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন 'চিন্তা করবেন না। অবশ্যই আলাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। দ্রঃ শেখ আবদুল্লাহ কৃত মুখতাসারুস সীরাহ ১৬৮ পৃঃ।

সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে)। বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার বাহন দুটির মধ্যে একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) সফরের সামগ্রী নিয়ে এলেন কিন্তু তাতে ঝুলানোর জন্য বন্ধনের রশি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন যাত্রার সময় হয়ে এল এবং আসমা (রাঃ) সামগ্রী ঝুলতে গিয়ে দেখলেন তাতে বন্ধন রশি নেই, তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধন খুললেন এবং তার দু ভাগে ভাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর এক অংশের সাহায্যে সামগ্রী ঝুলিয়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশের সাহায্যে কোমর বাধলেন। এ কারণেই তার উপাধি হয়েছিল যাতুন নেতাকাইন।[1]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) উটের পিঠে আরোহণ করলেন। আমর বিন ফুহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। পথ প্রদর্শক আবদুল্লাহ বিন আরীকাত মদীনা যাত্রার সাধারণ পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরলেন। সর্বপ্রথম সওর গুহা হতে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি (পথ প্রদর্শক) ইয়ামেনের পথে যাত্রা করলেন এবং দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তার পরে পশ্চিমদিকে ঘুরে সমুদ্রোপকূলের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপরে এমন এক পথে নিয়ে গেলেন যে, পথের সন্ধান সাধারণ লোকেরা জানত না। এরপর উত্তর দিকে মোড় নিলেন যেপথে লোহিত সাগরের খুব কাছাকাছি ছিল। এপথে খুব অল্প মানুষ চলাচল করত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পথে যে সকল স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন ইবনে ইসহাক তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পথপ্রদর্শক যখন তাদের দুজনকে নিয়ে বের হলেন তখন মক্কার নিম্নভূমি অঞ্চল দিয়ে নিয়ে গেলেন এরপর উপকূল দিয়ে চলতে চলতে আসফানের নিম্নদিয়ে পথকাটলেন। এরপর আমাজের নিম্নদিয়ে এগিয়ে চললেন এবং কুদাইদ পার হয়ে রাস্তা কাটলেন। তারপর সানীয়াতুল মুরবা দিয়ে তারপরে লকফ দিয়ে তার পরে লকফের বিস্তৃতি ভূমি অতিক্রম করেন। তারপর হাজ্জাজের বিস্তীর্ণ ভূমিতে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে মুজাহের মোড় দিয়ে অতিক্রম করেন। তারপর যুলগযওয়াইনের মোড়ের শস্য শ্যামলভূমিতেযান। তারপরে যি কেশরার মাঠে প্রবেশ করে জুদাজাদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজার্দে পৌঁছেন। এরপর তা'হনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাশ দিয়ে যু সালাম অতিক্রম করেন। সেখান থেকে আবাবীদ তাপরে ফাজা অভিমুখে যাত্রাকরেন। তারপরে আজরে অবতরণ করলেন। তারপরে রকুবার ডান পার্শ্ব দিয়ে সানীযাতুল আয়েরে গেলেন এবং রি'ম উপত্যকায় অবতরণ করেন। এরপরই কুবায় গিয়ে পৌঁছলেন।[2] আসুন এখন পথের ঘটনাবলীর কিছু বিবরণ দেয়া যাক।

পথে ঘটিত কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা (وهاك بعض ما وقع في الطريق) :

১. সহীহ বুখারী শরীফে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমরা (গারে সওর থেকে বেরিয়ে) একটানা সারা রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত চলতে থাকলাম। রোদের প্রখরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পথচারীর সংখ্যা কমতে থাকল এবং ঠিক দুপুরে পথ জনশূণ্য হয়ে গেল। আমরা তখন দীর্ঘ বড় পাথর দেখতে পেলাম যার ছায়ায় তখনো রোদ আসেনি। আমরা সেখানে নেমে পড়লাম। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শয়নের জন্য একটি জায়গা সমতল করে দিলাম এবং সেখানে একখানা চাদর পেতে দিয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি এখানে শয়ন করুন আর আমি আপনার আশ-পাশের সব কিছু দেখাশুনা করছি। তিনি শয়ন করলেন এবং আমি সামনেও পেছনের খোঁজ খবর নেওয়া এবং দেখাশোনার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন রাখাল তার ছাগলের পাল নিয়ে পাথরের দিকে চলে আসছে। সেই পাথর থেকে সেও ঐ জিনিসই চাচ্ছে যা আমরা চেয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, 'হে যুবক তুমি কার লোক?'

সে মক্কা অথবা মদীনার কোন লোকের কথা বলল। আমি তাকে বললাম, 'তোমার ছাগীর ওলানে কি কিছু দুধ আছে?' সে বলল, 'হ্যাঁ"। আমি পুনরায় বললাম, 'সেটি কি দোহন করতে পারি?' সে বলল, 'হ্যাঁ"। তারপর সে

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫৫৩-৫৫৫ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৬ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯১-৪৯২ পৃঃ।

একটি ছাগী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, 'মাটি, খড়কুটো এবং লোম থেকে ওলানটা পরিষ্কার করে নাও। পরিষ্কার করে নেয়ার পর একটি পেয়ালায় অল্প কিছুটা দুধ দোহন করল। তারপর দুধটুকু আমি একটি চামড়ার পাত্রে ঢেলে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানি এবং ওযুর জন্য ঐ পাত্রটি আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম।

আমি দুগ্ধ পাত্র হাতে রাসূলুল্লাহর নিকট এসে দেখি তখনো তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছেন। কাজেই, তাকে ঘুম থেকে জগানোর সাহস হল না। তারপর যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন আমি দুধের মধ্যে কিছুটা পানি ঢেলে দিলাম যাতে দুধের তলদেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ দুগ্ধটুকু পান করুন", তিনি পান করলেন। তাকে পান করানোর সুযোগ প্রদানের জন্য আনন্দ উদ্বেল চিত্তে আল্লাহর সমীপে শুকরিয়া আদায় করলাম।

দুগ্ধ পানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এখনো কি যাত্রার সময় হয়নি?'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল কেন হবে না, যাত্রার উপযুক্ত সময় হয়েছে,' তারপর আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম।[1]

২. এই প্রবাস যাত্রাকালে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাদীফ থাকতেন। অর্থাৎ তিনি বাহনে নবী ﷺ-এর পিছনে বসতেন। তিনি পিছনে বসতেন এ কারণে যে, তার মধ্যে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল এবং মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই তার উপরেই পড়তো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে তখনো যৌবনের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল এজন্য তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম যেতো। এর ফল ছিল কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করত আপনার সম্মুখের লোকটি কে? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম উত্তর প্রদান করতেন। বলতেন, 'এই লোকটি আমাকে পথ বলে দিচ্ছেন। এতে লোকেরা সহজভাবে পথের কথাই বুঝতেন। কিন্তু এ কথার মাধ্যমে তিনি কল্যাণের পথকেই বোঝাতে চেয়েছেন।[2]

৩. এই প্রবাস যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ খোযায়া গোত্রের উম্মু মা'বাদের তাঁবুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। ইনি একজন নামকরা স্বাস্থ্যবান মহিলা ছিলেন। হাতে হাঁটু ধারণ করে তাঁবুর অঙ্গনে বসে থাকতেন এবং গমনাগমনকারী দিগকে পানাহার করাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার নিকট কিছু আছে? তিনি বললেন, 'আমার নিকট যদি কিছু থাকত তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের মেহমানদারীতে কোন প্রকার ত্রুটি হতো না। ঘরে তেমন কিছুই নেই, বকরীগুলোও রয়েছে দূরদূরান্তে। সময়টা ছিল দূর্ভিক্ষ কবলিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন তাঁবুর এক কোন একটি বকরী রয়েছে।

তিনি বললেন, 'হে উম্মু মা'বাদ, এটা কেমন বুকরী? মহিলা বললেন ওর দুর্বলতার কারণে ওকে দলের বাহিরে রাখা হয়েছে। নবী ﷺ বললেন ওর ওলানে কি কিছু দুধ আছে? তিনি বললেন, 'দুধ দানের মতো তার কোন শক্তিই নেই।' নবী ﷺ বললেন, 'অনুমতি দিলে আমি তাকে দোহন করি"।

মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ", আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। যদি আপনি ওলানে দুধ দেখতে পান তবে অবশ্যই দোহন করবেন।'

এ কথাবার্তার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীটির ওলানের উপর হাত ফিরালেন, আল্লাহর নাম নিলেন এবং দুয়া করলেন। তারপর বকরীটা তার পেছনের পা দুটি বিস্তার করল এবং তার ওলান দুধে ভরপুর হয়ে উঠল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু মা'বাদের বেশ বড় আকারের একটি পাত্র নিলেন এবং এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে, দুধের ফেনা পাত্রের উপরে উঠে গেল। দুধ দোহনের পর উম্মু মা'বাদকে পান করালেন। তিনি দুগ্ধপানে পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হলেন। তারপর সঙ্গী সাথীদের পান করালেন। পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সকলকে পান করানোর পর তিনি নিজে পান করলেন। দ্বিতীয় বারেও তিনি এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে, পাত্র ভরে গেল। এ দুগ্ধ উম্মু মা'বাদের নিটক রেখে দিয়ে তিনি সঙ্গীদের সহ মদীনার পথে অগ্রসর হলেন।

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী আনাসহেতে ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁর স্বামী আবু মা'বাদ আপন দুর্বল বকরী যা দুর্বলতা হেতু ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটছিল হাঁকাতে হাঁকাতে এসে পৌছিল। পাত্র দুধ দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর সহধর্মিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ তুমি কোথায় পেলে? সে ক্ষেত্রে দুগ্ধবতী বকরীগুলো দূর চারণ ভূমিতে ছিল এবং বাড়িতে কোন দুগ্ধবর্তী বকরীই ছিলনা, সেক্ষেত্রে পাত্রে এত দুধ এল কোতায় থেকে?

স্ত্রী উম্মু মা'বাদ তাঁর স্বামীকে সেই বরকতময় মেহমানের কথা জানালেন যিনি পথ চলার সময় তাঁর গৃহে আগমন করেন এবং যেভাবে যা ঘটেছিল তা স্ববিস্তারে বর্ণনা করলেন। এ সব কথা শ্রবণের পর স্বামী আবু মা'বাদ বললেন, 'এঁকে তো ঠিক সেই লোক বলে মনে হচ্ছে যাঁকে কুরাইশগণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।' আবু মা'বাদ পুনরায় তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'আচ্ছা তাঁর আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা কর দেখি।'

স্বামীর এ কথা শ্রবণের পর উম্মু মা'বাদ অত্যন্ত জীবন্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতার এমন একটি নকসা অংকন করলেন তাতে মনে হল শ্রবণকারীগণ যেন তাঁকে চোখের সম্মুখেই দেখছে (কেতাবের শেষ ভাগে সেই গুণগুলোর কথা উল্লেখিত হবে)। মেহমানের এ সকল গুণের কথা অবগত হয়ে আবু মা'বাদ বললেন, 'ওয়ালাহ! ইনি তো কুরাইশদের সেই সাথী লোকেরা যাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কথা বলছেন। আমার ইচ্ছা তাঁর বন্ধুত্ব গ্রহণ করি এবং যদি কোন পথ পাই তাহলে অবশ্যই তা করব। এদিকে মক্কায় একটি ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যা মানুষ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু বক্তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কথাগুলো ছিল এরূপ :

جزى الله رب العرش خير جزائــه ** رفيقين حَلاَّ خيمـــــتى أم مَعْبَـــدِ

هـــمـــا نزلا بالبِــــرِّ وارتحلا بـــه ** وأفلح من أمسى رفيق محمــــــد

فيا لقُصَيّ مـــــا زَوَى الله عنكـــم ** به من فعال لا يُحَاذى وسُــــؤْدُد

لِيَهْنِ بني كعــب مكـــــان فَتاتِهـــم ** ومقعدُهـــا للمؤمنـــين بَمْرصَـــد

سَلُوا أختكم عن شاتهـــا وإنائهـــا ** فإنكم إن تسألوا الشاة تَشْـــهَـــد

অর্থ ঃ আরশের প্রভূ আল্লাহ ঐ দু'বন্ধুকে উত্তম পুরষ্কার দেন যারা উম্মু মা'বাদের তাবুতে অবতরণ করেছিলেন। তারা দুজনে কল্যাণের সঙ্গে অবতরণ করেছেন এবং কল্যাণের সঙ্গে গমন করেছেন। যিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর বন্ধু হয়েছেন, তিনি সফলকাম হয়েছেন। হায় কুসাই! আল্লাহ তোমাদের থেকে কত নজির বিহীন কার্যকলাপ ও নেতৃত্ব গুটিয়ে নিয়ে তাদেরকে দিয়েছেন, অর্থাৎ বনু কা'বদেরকে' ওদের মহিলা বর্গের অবস্থান স্থল এবং মুনেনদের সেনাচৌকী বরকতময় হোক। তোমরা নিজ ভগ্নিদেরকে তাদের পাত্র এবং বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তুমি যদি স্বয়ং বকরীদেরকেও জিজ্ঞেস কর তবে তারাও সাক্ষ্য দেবে।

আসমা (رضي الله عنها) বলছেন, 'আমরা জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিকে গমন করেছেন। ইতিমধ্যে একজন মক্কার নিম্নভূমি থেকে এ কবিতা পাঠ করতে করতে এল। মানুষ তার পিছনে পিছনে চলছিল, তার কথা শুনছিল, কিন্তু তাকে কেউই দেখতে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে মক্কার উচ্চ ভূমি থেকে বের হয়ে গেল।'

তিনি বলেন, 'আমরা যখন তাঁর কথা শুনলাম তখন বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিকে গমন করেছেন। অর্থাৎ তিনি গমন করেছেন মদীনার দিকে।'[1]

৪. সুরাকা বিন মালেক পথের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছু ধাওয়া করে। এ ঘটনা সুরাকা নিজেই বর্ণনা করেছে। সে বলেছে, 'আমি নিজ সম্প্রদায় বনী মুদলেজের এক সভায় বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে একজন লোক

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৩-৫৪ পৃঃ। বনু খোযয়ার আবাদী অবস্থানের প্রতিদৃষ্টি রেখে এ কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য যে, এ গটনাটি গার থেকে যাত্রা পরে ২য় দিনে সংঘটিত হয়েছিল।

আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সে বলল, 'হে সুরাকা! আমি কিছুক্ষণ পূর্বে উপকূলে কতিপয় লোককে দেখলাম। **আমার ধারণা এঁরা হবেন মুহাম্মদ** ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীগণ।'

সুরাকার বলেন, 'আমি বুঝে গেলাম যে, এঁরা তাঁরাই।' কিন্তু ঐ লোকটির ধারণা পালটিয়ে দেয়ার জন্য তাকে বললাম, 'এরা তারা নয়। বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ যারা আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করল।'

'এরপর সভাস্থানে সামান্য সময় অপেক্ষা করে অন্দর মহলে চলে গেলাম এবং নিজ দাসীকে নির্দেশ দিলাম আস্তাবল থেকে আমার ঘোড়াটি বাহির করে নিয়ে গিয়ে টিপির পিছনে আমার জন্য অপেক্ষা করতে। এদিকে আমি নিজ তীর গ্রহণ করলাম এবং বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে বাহির হলাম। এ সময় আমার হাতের লাঠিটির এক মাথা মাটির সঙ্গে ঘর্ষণ খাচ্ছিল এবং অন্য মাথা নীচু করে রাখা ছিল। এ অবস্থায় আমি নিজ ঘোড়ার নিকট গিয়ে তার উপর আরোহণ করলাম। তারপর লোকটির কথিত দিক লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম।'

"আমি দেখলাম সে আমাকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে ছুটছে। এক পর্যায়ে আমি তাদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম, কিন্তু আকস্মিকভাবে আমাকে সমেত ঘোড়ার পা পিছলিয়ে যাওয়ায় আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তুণীর দিকে হাত বাড়ালাম এবং পাশার তীর বের করে জানতে চাইলাম যে, তাঁকে বিপদে ফেলতে পারব কিনা। কিন্তু যে তীরটি বেরিয়ে আসল সেটা আমার অপছন্দনীয়। কিন্তু আমি তীরের সাংকেতিক অভিব্যক্তি এড়িয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করলাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটতে লাগল এবং এক পর্যায়ে নবী ﷺ-এর কণ্ঠ নিঃসৃত কুরআনের পাঠ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হল। তিনি কোন সময়ের জন্যও পিছনে ফিরে তাকান নি। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) বার বার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

আর সামান্য পথ অতিক্রম হলে তাঁদের পথ রোধ করতে পারি এমন এক অবস্থায় আকস্মিকভাবে আমার ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ঢুকে গেল। এতে আমি তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম। আমি অবস্থাটা সামলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য ঘোড়াটিকে ধমকা-ধমকি শুরু করলাম। আমার ধমক খেয়ে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু সহজে তা পারল না। অবশেষে অনেক কষ্ট করে সে পা টেনে বের করল। কিন্তু সে যখন বহু কষ্টের পর উঠে দাঁড়াল তখন তার পদচিহ্ন থেকে আসমানের দিকে ধোঁয়ার মতো ধূলি প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে ছিল।

আমি আবার পাশার তীর থেকে আমার ভাগ্যান্বেষণের ইঙ্গিত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কিন্তু আবার ঐ তীরটিই বাহির হল, যা আমার অপছন্দনীয় ছিল। এরপর আমি তাঁদের নিরাপত্তা চেয়ে আহ্বান জানালে তাঁরা থেমে গেলেন। আমি ঘোড়া খেদিয়ে তাঁদের নিকট পৌঁছলাম। যখন আমি তাঁদেরকে থামিয়ে ছিলাম তখনই আমার মনে এ কথাটা গেঁথে গিয়েছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন। এজন্য আমি তাকে বললাম যে, 'আপনার সম্প্রদায় আপনার প্রাণের বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে' এবং ঐ কথার সূত্রেই আমি তাঁকে মানুষের মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। অধিকন্তু, কিছু খাদ্য-সামগ্রী এবং আসবাবপত্রেরও ব্যবস্থা করে দিতে চাইলাম। কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করলেন না এবং আমাকে কোন প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু এই টুকুই বললেন যে, 'আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।' আমি আরয করলাম 'আমাকে নিরাপত্তা পরওয়ানা লিখেদিন।' তিনি আমের বিন ফুহাইরাকে তা লিখে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করায়। তিনি এক টুকরো চামড়ার উপর তা লিখে আমার হাতে দিলেন। তারপর নবী ﷺ-এর দল সম্মুখে পানে অগ্রসর হলেন।[1]

এ ঘটনা সম্পর্কে খোদ আবু বকর (রাঃ)-এর এক রওয়ায়েতে এর বর্ণনা রয়েছে যে, 'আমাদের যাত্রা করার পর আমাদের স্বগোত্রীয় লোকজন অনুসন্ধান কাজে তৎপর হয়ে ওঠে কিন্তু সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শুম ছাড়া

---

[1] সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৫৫৪ পৃঃ। বনী মুদলেজদের বাড়ি রাবেগের নিকটবর্তী ছিল সুরাকা সেই সময় নবী ﷺ-এর অনুসন্ধানে রত হয়েছিলেন। যখন তিনি কুদাইদ থেকে উপরে যাচ্ছিলেন। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৩ পৃঃ। এটা অধিক গ্রহণযোগ্য এ কারণে যে, গুহা থেকে যাত্রার তৃতীয় দিবসে পিছু ধাওয়ার এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

যারা নিজ ঘোড়ায় উঠেছিল তার কেউই আমাদের নাগাল পায়নি। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের পিছনে আগমনকারীরা আমাদেরকে পেয়ে যাবে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]

"চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গেই আছেন।(আত্-তাওবাহ ৯ : ৪০)[1]

যাহোক, সুরাকা প্রত্যাবর্তন করে দেখে যে, লোকজন সব হন্যা হয়ে অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সে তাদের বলল, 'এ দিকের খোঁজ খবর আমি নিয়েছি। এদিকে তোমাদের যা কাজ ছিল তা যথারীতি করা হয়েছে। এভাবে সে লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। দিনের প্রথম ভাগে যে ছিল আক্রমণকারী শত্রু দিনের শেষ ভাগে সেই হল জীবন রক্ষাকারী বন্ধু।[2]

৫. পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছোট্ট কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বুরাইদা আসলামীর। সে ছিল নিজ সম্প্রদায়ের নেতা এবং শক্তিমান পুরুষ। কুরাইশ নেতাগণ কর্তৃক ঘোষিত বিরাট অংকের পুরষ্কারের লোভে সে বেরিয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রাঃ)-এর খোঁজে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখীন হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে যখন কিছু কথাবার্তা হল, সরাসরি অন্তর দিয়ে বসল এবং নিজ সম্প্রদায়ের সত্তর লোকসহ সেখানেই মুসলিম হয়ে গেল। আর নিজ পাগড়ি খুলে নিয়ে তা তীরের সঙ্গে বেঁধে নিল যার সাদা ঝালর বাতাসে দোল খাচ্ছিল। সে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছিল যে, শান্তি ও নিরাপত্তার বাদশাহ, সন্ধির সাহায্যকারী, ন্যায় বিচার ও ইনসাফ দ্বারা পৃথিবীকে ভরপুর করনেওয়ালা আগমন করছেন।[3]

৬. পথ চলার পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যোবায়ের বিন আওয়ামের সাক্ষাৎ হয়। মুসলিমগণের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে তিনি সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। যোবায়ের, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) সাদা কাপড় প্রদান করেন।[4]

কুবাতে আগমন (النزول بقباء) ঃ ৮ই রবিউল আওয়াল, ১৪ই নববী সনে, অর্থাৎ ১ম হিজরী সন মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে আগমন করেন।[5]

ওরুয়া বিন যোবায়েরের বর্ণনায় রয়েছে যে, মদীনা বাসী মুসলিমগণ মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ শুনে ছিলেন এজন্য তাঁরা প্রত্যেক দিন সকালে বের হয়ে হাররার দিকে গমন করতেন এবং তার পথ চেয়ে থাকতেন। দুপুরে রোদ যখন অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠত তখন তাঁরা গৃহে ফিরতেন। এক দিবসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর মুসলিমগণ যখন গৃহে ফিরে এলেন তখন একজন ইহুদী তাঁর নিজের কোন কাজে একটা টিপির উপর উঠলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সঙ্গীদের দেখতে পায়। সাদা কাপড়ে আবৃত অবস্থায় তাঁরা যখন আসছিলেন তখন তাঁদের পোষাক হতে যেন চাঁদের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে যেস আত্মহারা হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'ওগো আরবের লোকেরা! তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, তোমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত অতিথি ঐ যে এসে গেছেন।' এ কথা শোন মাত্রই মুসলিমগণ অস্ত্রাগারে দৌড় দিলেন[6] এবং অস্ত্র শয্যায় সজ্জিত হয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে স্বাগত জানানোর জন্য সমবেত হলেন।

---

[1] সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড ৫১৬ পৃঃ।

[2] যা'দুল মাযাদ ২য় খণ্ড ৫৩ পৃঃ।

[3] রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০১ পৃঃ।

[4] সহীহ বুখারী ওরুয়াপুত্র যোবায়ের থেকে ১ম খণ্ড ৫৫৪ পৃঃ।

[5] রহামাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ। এ সময় নবী ﷺ-এর বয়স একেবারে কাঁটাই কাঁটাই ৫০ বছর হয়েছিল। আর যাঁরা তাঁর নবুওয়াত কাল ৯ই রবিউল আওয়াল ৪১ ফীল বর্ষ মানছেন তাঁদের কথা মোতাবেক নবুওয়াতের ঠিক ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছিল। অবশ্য যাঁরা তাঁর নবুওয়াতের সময় কাল রমাযান ১৪ ফীল বর্ষ মানেন তাঁদের কথা মোতাবেক ১২ বছর ৫মাস কিংবা ২২ দিন হয়েছিল।

[6] সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৫৫৫ পৃঃ।

ইবনে কাইয়ূম বলেছেন ঃ এর মধ্যেই বনী আমর বিন আউফ গোত্রের (কুবার বাসিন্দা) লোকজনদের শোরগোল উঁচু হয়ে উঠল এবং তাকবীর ধ্বনি শোনা গেল। মুসলিমগণ নবী কারীম ﷺ-এর আগমনে তাঁকে খুশআমদেদ জানানোর উদ্দেশ্যে হর্ষোৎফুল কণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে সমবেত হতে থাকল। তিনি তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হলে সকরেল সম্মিলিতভাবে তাঁকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং চতুর্দিকে থেকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়ালেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তির আবরণে আচ্ছাদিত ছিলেন এবং আল্লাহ বাণী অবতীর্ণ হচ্ছিল,

﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤]

"তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তার মালিক-মনিব-রক্ষক। আর এ ছাড়াও জিবরীল, নেক্কার মু'মিনগণ আর ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী।' [আত্-তাহরীম (৬৬) : ৪]

'উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে নিয়ে ডানদিকে ফিরলেন এবং 'আমর বিন আওফ গোত্রে গমন করলেন।

রাসূলুল্লাহ কুলসুম বিন হাদাম এবং বলা যায় যে, সায়াদ বিন খায়সামার বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী।

এদিকে আলী (রাঃ) মক্কায় তিন দিন অবস্থানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোকদের গচ্ছিত আমানত আদায় করার পর পদদলে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর মদীনায় পৌছে তিনি কুবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কুলসুম বিন হাদামের বাড়িতেই অবস্থান করলেন।[1]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে চারদিন[2] (সোমবার, মঙ্গলবার, বুধ ও বৃহস্পতিবার) অথবা দশ দিন থেকে বেশী অথবা পৌছা ও যাত্রার দিন ছাড়া চব্বিশ দিন আবস্থান করেন। আর এ সময়ের মধ্যেই মসজিদে কুবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তাতে সালাতও আদায় করেন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর এটা হচ্ছে সর্ব প্রথম মসজিদ যার বুনিয়াদ তাকওয়া (আল্লাহ ভীতির) উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চম দিনে (অথবা দ্বাদশ দিনে অথবা চব্বিশতম দিনে) শুক্রবারে তিনি আল্লাহর নির্দেশে আরোহন করলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁর রাদীফ (পিছনে আরোহণকারী) ছিলেন। তিনি বনু নজ্জার দিগকে (যাঁরা তাঁর মামাগোষ্ঠির ছিলেন) সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। ফলে তাঁরা তরবারী ধারণ করে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের সহ মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। তারপর বনু সালেম বিন আউফের আবাসস্থানে পৌছিলে জুমার সালাতের সময় হয়ে যায়। তিনি এ স্থানে বাতনে অদীতে জুমা পড়লেন। সেখানে এখনো সমজিদ রয়েছে। মোট একশত লোক ছিলেন।[3]

মদীনায় প্রবেশ (الدخول في المدينة) ঃ

জুমাআর সালাত শেষে নবী ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐ দিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিরের পরিবর্তে মদীনাতুররাসূল বা রাসূলের শহর হয়ে যায় সংক্ষেপে একে মদীনা বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলীতে গলিতে সর্বত্র সেদিন তাকদীস ও তাহমীদের (পবিত্রতা ও

---

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৪ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ। রহমতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ।

[2] এটা ইবনে ইসহাকের রেওয়াতে। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯৪ পৃঃ। আল্লামা মানসুরপুরী এটাই গ্রহণ করেছেন। রাহমাতুল্লিল আলামীন **১ম খণ্ড** ১০২ পৃঃ দ্রঃ। কিন্তু সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনা রয়েছেন যে, নবী কারীম ﷺ কুবাতে ২৪ দিন অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু অন্য একটি **বর্ণনায়** আছে দশরাত হতে কয়েকদিন হতে বেশী ১/৫৫৫ অন্য এক (তৃতীয়) বর্ণনায় চৌদ্দ রাত ১/৫৬০ পৃঃ। ইবনে কাইয়ূম শেষ বর্ণনাটিকে **গ্রহণ** করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবী ﷺ কুবাতে সোমবার পৌছেন এবং সেখান থেকে শুক্রবার যাত্রা করেন (যা'দুল **মায়াদ)** ২/৫৪ ও ৫৫ পৃঃ।) আর এটা জানা যায় যে, সোমবার আর জুমা (শুক্রবার) পৃথক পৃথক দু'সপ্তাহের ধরা হলে পৌছা ও যাত্রার দিন দুটি বাদ **দিলে** সর্ব মোট হচ্ছে ১০ দিন আর পদার্পণ ও যাত্রার দিন সহ হচ্ছে ১২ দিন। সর্বমোট চৌদ্দ দিন কিভাবে হবে?

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৪৫৫-৫৬০ পৃঃ। যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৫ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯৪ পৃঃ। রমহাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০২ **পৃঃ।**

প্রশংসার) গুঞ্জণ ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল। আনসারদের ছেলে মেয়েরা আনন্দ উদ্বেলকণ্ঠে নিম্নের কবিতার চরণগুলো সূর ও ঝংকার সহকারে গেয়ে বেড়াচ্ছিল।

طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع
أيها المبعوث فينا ** جئت بالأمر المطاع

"দক্ষিণ পাশের পাহাড় হতে পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে।'

"কি উত্তম ধর্ম ও শিক্ষা! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রতি ওয়াজেব।'

তোমার নির্দেশ অনুসরণ করা ফরয। তোমার প্রেরণকারী হচ্ছেন কিবরিয়া (মহাপ্রভূ)[১]

আনসারগণ যদিও ধনী ছিলেন না, তবুও সকলের আশা ছিল যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার বাসাতেই অবস্থান করুন। ফলে তার উটনী আনসারদের যে বাড়ি কিংবা মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত সেখানকার লোকজন উটনীর লাগাম ধরে নিতেন এবং অনুরোধ করতেন যে, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্রও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, আগমন করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলতেন 'উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদের্শিত রয়েছে। ফলে উটনী একটানা চলতে থাকল এবং ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল যেখানে মসজীদে নববী রয়েছে।

কিন্তু তিনি নীচে অবতরণ করলেন না। তারপর উটনী পুনরায় উঠে দাঁড়াল এবং কিছু দূরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখার পর পূর্বের জাগাতেই এসে বসে পড়ল। এরপর রাসূলুল্লা ﷺ নীচে অবতরণ করলেন। এটা ছিল তাঁর নানীর, অর্থাৎ বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লা। আর উটনীর জন্য ছিল এটা আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন তাঁর ননীর গোত্রে অবস্থান করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করে দিলেন। কিন্তু আবু আইউব আনসারী (রাঃ) উষ্ট্রের পালান উঠিয়ে নিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে লাগলেন মানুষ তার পালানোর সাথে রয়েছে। এদিকে আসয়াদ বনি যুবারাহ (রাঃ) এসে উটনীর লাগাম ধরে নিলেন, ফলে উটনী তার নিকটেই রয়ে গেল।[2]

সহীহ বুখারী শরীফে আদাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোন লোকের বাড়ি আমার থেকে নিকটে"?

আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, 'আমার বাড়ি, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এটা আমার বাড়ি আর এটা আমার দরজ।'

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'যাও এবং আমার বিশ্রামের জায়গা ঠিক কর। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রাঃ) দুজনকেই সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।[৩]

কিছুদিন পর নবী পত্নী উম্মুল মু'মিনীন সওদা (রাঃ) এবং নবী তনয়া ফাতেমা (রাঃ) ও উম্মুল কুলসুম (রাঃ) এবং উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ও উম্মু আয়মান (রাঃ) মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। এদের সকলকে আব্‌দুল্লাহ বিন

---

[1] কবিতার এ অনুবাদটি আল্লামা মানসুরপুরী করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম লিখেছেন যে, এ কবিতাটি তাবুককের যুদ্ধ হতে নবী ﷺ-এর ফেরত আসার সময় পাঠ করা হয়েছিল এবং যাঁরা বলেছেন এটা নবী ﷺ-এর মদীনায় প্রবেশের সময় পাঠ কার হয়েছিল। তাঁদের ভুল হয়েছে। (যা'দুল মায়াদ ৩/১০২ পৃঃ।) কিন্তু আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম ভুল হওয়ার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেন নি। এর বিপরীতে আল্লামা মানসুরপুরী এ কবিতাটি নবী ﷺ-এর মদীনায় প্রবেশের সময় পাঠ করা হয়েছিল বলে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিকট দলীলও রয়েছে। রহমাতুল্লিল আলামীন ১/১০৬ পৃঃ।

[2] যা'দুল মায়াদ ২য়/৫৫ পৃঃ। রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০৬ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ।

আবু বকর আবু বকরের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যাদের মধ্যে আয়শাও ছিলেন। অবশ্য নবীতনয়া যয়নব, আবুল আসের নিকট থেকে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে আসতে দেননি। তিনি বদরের যুদ্ধের পরে এসেছিলেন।[১]

আয়শা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ -এর মদীনায় পৌছার পর আবু বকর ও বেলাল জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আব্বাজান! আপনি কেমন আছেন? তারপরে বেলালকে লক্ষ্য করে বললাম আপনি কেমন আছেন? তিনি অর্থাৎ আয়শা বলেছেন যখন আবু বকর -এর জ্বর আসত তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করতেন,

كل امرئ مُصَبَّحٌ في أهله ** والموت أدنى من شِرَاك نَعْله

অর্থ ঃ প্রতিটি মানুষকে তার আত্মীয়ের মাঝে সুপ্রভাত বলা হয়ে থাকে অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী।

বেলালের অবস্থা যখন একটু সুস্থ থাকত তখন তিনি নিজের দুঃখপূর্ণ স্বর উঁচু করে বলতেনঃ

ألا ليت شِعْرِى هل أبِيتَنَّ ليلة ** بِوَادٍ وحولى إِذْخِرٌ وجَلِيـــلُ
وهل أرِدْنْ يومـــًا ميـــاه مجَنَّة ** وهل يَبْدُوَنْ لى شامة وطَفِيلُ

‘হায় যদি আমি জানতাম যে, আমার কোন একরাত্রি যাপন হবে এক প্রান্তরে (মক্কায়) এবং আমার পাশে ইযখির ও জালীল (ঘাস) থাকবে এবং কোন দিন কি মাজিন্না ঝর্ণাতে অবতরণ করতে পারব এবং আমি সামা ও তোফায়েল পাহাড় দেখতে পাব?’

আয়শা বলেছেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের এ প্রলাপের সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন,

[اللَّهُمَّ حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجُحْفَة].

“হে আল্লাহর আমাদের নিকট মদীনাকে এমন প্রিয় করে দাও যেমন মক্কা প্রিয় ছিল বরং তার চেয়ে অনেক বেশী। মদীনার মাঠ, ঘাট ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী করে দাও এবং উহার ‘সা’ ও ‘মুদ্দে’ (শস্য মাপার পাত্র বিশেষ) বরকত দাও উহার অসুখ প্রত্যাবর্তন করে জোহফায় পৌঁছিয়ে দাও।[২] আল্লাহ তাঁর দু‘আ শুনলেন ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

এখান পর্যন্ত পবিত্র জীবনের এক প্রকার ও ইসলামী দাওয়াতের এক যুগ অর্থাৎ মক্কী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

---

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৫ পৃঃ।
[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫৮৮-৫৮৯ পৃঃ।

الحياة في المدينة

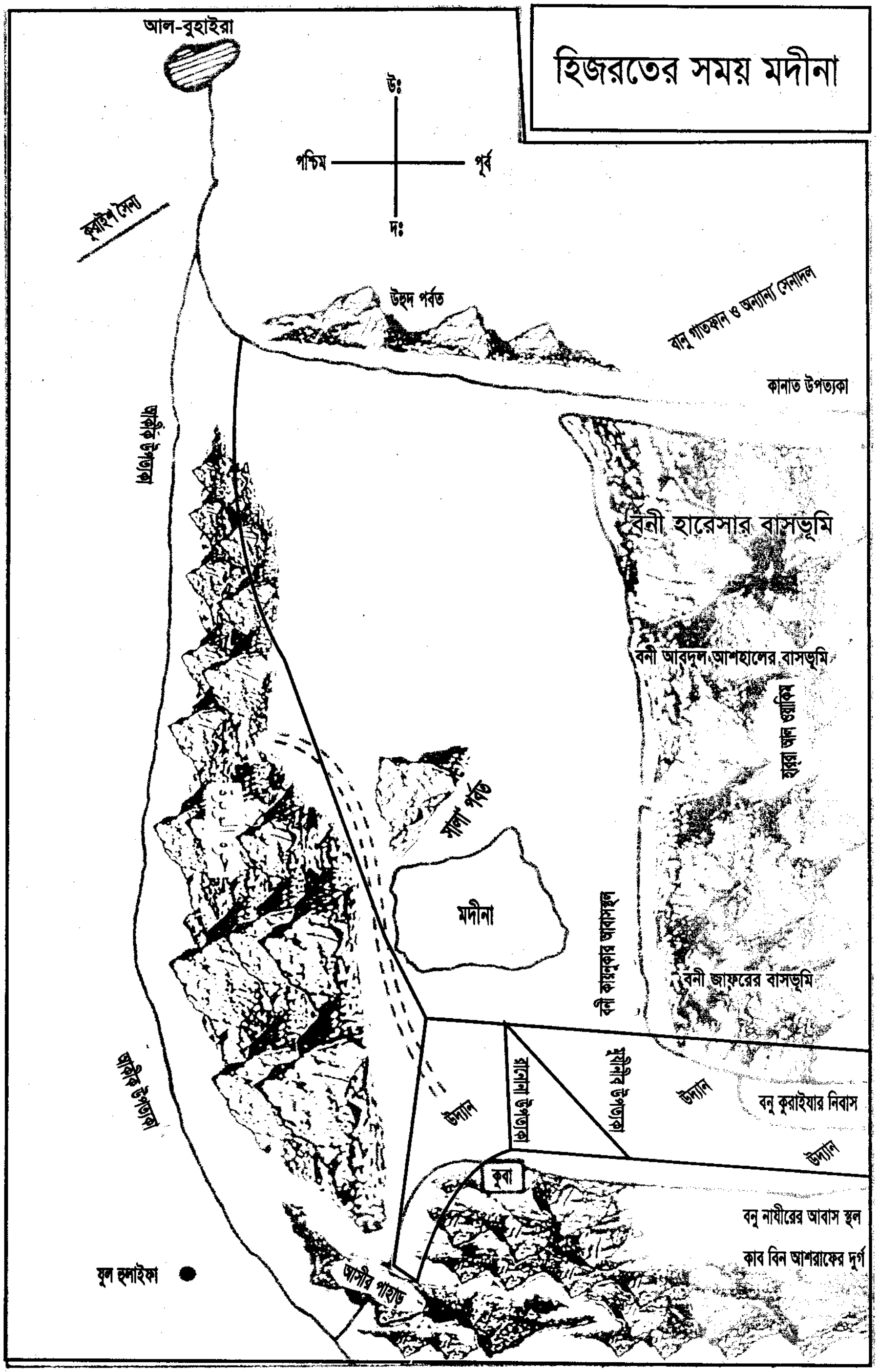
মদীনার জীবন

মদীনার জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. **প্রথম পর্যায় ঃ** যাতে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরের মধ্য হতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাহির থেকে শত্রুতা আক্রমণ চালিয়েছে যাতে মদীনায় ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে ৬ হিজরী সনে যিলকদ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধিতে।

২. **দ্বিতীয় পর্যায় ঃ** এ পর্যায়ে মূর্তি পূজারী নেতাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয় এটার সমাপ্তি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বারা ঘটে। এ পর্যায়কে বিশ্বের রাজন্য বর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণের পর্যায়ও বলা যেতে পারে।

৩. **তৃতীয় পর্যায় ঃ** এ পর্যায়ের বিস্তৃতি ঘটেছিল একাদশহিজরীর রবিউল আওয়াল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত। এ সময়ে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এ পর্যায় বিভিন্ন জাতি ও গোত্র সমূহের মুখপাত্রগণের মদীনায় আগমনের পর্যায়।


হিজরতের সময় মদীনা
আল-বুহাইরা
উঃ
পশ্চিম
পূর্ব
দঃ
কুরাইশ সৈন্য
উহুদ পর্বত
বনু গাতফান ও অন্যান্য সেনাদল
কানাত উপত্যকা
বনী হারেসার বাসভূমি
বনী আবদুল আশহালের বাসভূমি
সালা পর্বত
মদীনা
বনী জাফরের বাসভূমি
উদ্যান
বনু কুরাইযার নিবাস
উদ্যান
কুবা
বনু নাযীরের আবাস স্থল
কাব বিন আশরাফের দুর্গ
যুল হুলাইফা

المرحلة الأولى

প্রথম স্তর

الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة

হিজরতের সময় মদীনায় অবস্থা ঃ

অশান্তি এবং উপহাসের লক্ষ্য বস্তু হওয়া থেকে বিস্কৃতিলাভই শুধু হিজরতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এ উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল যে, এক শান্তিপূর্ণ এলাকায় ইসলামী আন্দোলনেরজন্য শ্বস্তি ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা। এ কারণে সকল সমর্থ মুসলিমগণের জন্য এটা ফরয করে দেয়া হয়েছিল যে, এই নতনি দেশ ও নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণ কাজে তারা সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করবেন এবং একে রক্ষণাবেক্ষণ ও মর্যাদার উচ্চশিখরে সমাসীন করার ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আর এ কথা তো সন্দেহাতীতভাবে সকলেই অবগত আছেন যে, এ মহতী জীবন ধারার রূপকার এবং এ মহান জাতির ইমাম নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিলেন স্বয়ং বিশ্বের সেরা মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

মদীনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন তিনটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কে গড়ে তুলতে হয়েছিল যাদের একগোষ্ঠি থেকে অন্যগোষ্ঠির অবস্থা ছিল ভিন্ন এবং পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল যার ভিন্নতার প্রাধান্যই ছিল বেশী। গোষ্ঠী তিনটির পরিচিতি হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহর মনোনীত রাসূল ﷺ-এর নিকট হতে উত্তম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আল্লাহর পথে ধন প্রাণ উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত সাহাবী (রাঃ)-এর জামাত বা গোষ্ঠী।

২.মদীনার আদি ও মূল বাসিন্দাদের মুশরিক (পৌত্তলিক) গোষ্ঠী যারা তখনো ঈমান আনে নি।

৩. ইহুদীগণ

(ক) সাহাবীগণ (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো তা হচ্ছে- তাদের জন্য মদীনার অবস্থা অবশ্যই মক্কার অবস্থার বিপরীত ছিল। যদিও তাঁদের দ্বীন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা দ্বীনী কাজ কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল কিন্তু মক্কা জীবনে তারা বসবাস করতেন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। আর তাঁরা ছিলেন নিরুপায় পর্যুদস্ত অপমানিত ও দুর্বলতার। তারা আত্মিক ও নৈতিকবলে চরম বলীয়ান হলেও লৌকিক শক্তি সামর্থ কিংবা ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। সকল প্রকার শক্তি ও সম্পদ পুঞ্জিভূত ছিল ধর্মের চির দুশমনদের হাতে। এমনকি মানবিক জীবন যাপনের জন্য সে সকল আসবাবপত্র এবং উপকরণাদির নুন্যতম প্রয়োজন সে সব কিছুই ছিল না মুসলিমগণের হাতে যাকে সম্বল করে তারা নতুনভাবে ইসলামী সমাজ গঠন করতে সক্ষম হবে। কাজেই আমরা দেখতে পাই মক্কী সূরাগুলোতে কেবলমাত্র ইসলামের প্রারম্ভিক বিষয়গুলোরই বর্ণনা রয়েছে এবং ঐ সকল বিষয়ের উপর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যা ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভব। অধিকন্তু এ পর্যায়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূত পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতিও উত্তম চরিত্র গঠনের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অনৈতিক ও অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম থেকে পরহেজ করে চলার জোর তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মদীনা জীবনের প্রথম থেকেই নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের বাগডোর ছিল মুসলিমগণেরই হাতে। মুসলিম ছাড়া মদীনা কিংবা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সকল সম্প্রদায় ছিল, ইসলাম সূর্যের নিকট তাদের নেতৃত্ব ছিল নিস্প্রভ। কাজেই তখন এমন এক সময় ও সুযোগ এসেছিল যাতে মুসলিমগণ তাহযীব, তামাদ্দুন ও স্থাপত্য জীবনধারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই ইসলামের বিধি বিধান ও অনুশীলন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এ ফলে হালাল, হারাম, ইবাদত, আখলাক ইত্যাদি জীবনের সব ব্যাপারে পুরাপুরি মীমাংসা করা সম্ভব হয়।

সময় ও সুযোগ এসেছিল মুসলিমগণের জন্য এমন এক জীবন-ধারা প্রবর্তনের যা ছিল জাহেলিয়াত যুগের জীবন-ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমনকি পৃথিবীর কোথাও এমন কোন জীবন ধারা ছিল না যার সঙ্গে এর কোন

তুলনা করা যেতে পারে। বিগত দশ বছর যাবৎ মুসলিমগণ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে এমন এক জীবন ধারা গড়ে তুলেছিলেন কোন কালে কোথাও যার তুলনা মিলবে না।

এ প্রসঙ্গে যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ তা হচ্ছে এ জাতীয় কোন জীবন ধারার রূপ এক দিনের, এক মাসের কিংবা এক বছরের কাজ হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি দীর্ঘ সময়ের যাতে করে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে এর বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা এবং নীতি-নির্ধারণী কাজের অভ্যাস ও চর্চা এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করা সম্ভব হতে পারে। ইসলাম যে পর্যন্ত বিধি-বিধান প্রদান সংগ্রহ সংরক্ষণের পর্যায়ে ছিল তার জিম্মাদার ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। পক্ষান্তরে, এ সবের বাস্তবায়ন মুসলিমগণের চর্চা ও অভ্যন্তকরণ এবং পথ প্রদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ। ফলে ইরশাদ হয়েছে ,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢].

“ তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে, যে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত।' (আল-জুমু'আহ ৬২ : ২)

এদিকে সাহাবীগণের কিরামগণের (রাঃ) এই অবস্থা ছিল যে, তাঁরা সর্বক্ষণ নবী কারীম ﷺ-এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতেন। যে কোন আহকাম নির্ধারিত হওয়া মাত্র তা কায় মনোবাক্যে গ্রহণ করে নিতেন এবং তা পালন করে আনন্দ লাভ করতেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢].

“আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।' [আল-আনফাল (৮) : ২]

এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় কাজেই এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশটুকু আলোচনা করব।

যাহোক, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মুসলিমগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যার সম্মুখীন হতে হয়ে ছিল, এবং দাওয়াতে ইসলামীয়ার ও রেসালাতে মুহাম্মাদীয়ার এটাই ছিল বড় রকমের উদ্দেশ্য কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা কোন ক্ষণস্থায়ী বিষয় ছিল না। বরং স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থায়ী ব্যাপার ছিল। অবশ্য এ ছাড়া এমন কিছু অন্যান্য বিষয়ও ছিল যা সমাধানের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক মনোযোগের প্রয়োজন ছিল। যার সংক্ষিপ্ত অবস্থা নিম্নরূপ :

মুসলিমগণের মধ্যে দু'শ্রেণীর লোক ছিলেন, প্রথম শ্রেণীভূক্ত হচ্ছেন যাঁরা নিজস্ব জমিজমা, ঘরবাড়ি এবং ধনসম্পত্তির মধ্যে বববাস করতেন। এ সম্পর্কে তাদের অন্য কোন অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছিল না, যা একজন লোককে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শান্তিতে থেকে করতে হয়। এরা হচ্ছেন আনসার গোত্রীয় লোক। এদের মধ্যে বংশানুক্রমে একে অন্যের সঙ্গে প্রবল শত্রুতা ও মত বিরোধ চলে আসছিল। তাঁদের পাশাপাশি অন্য যে দলটি ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মোহাজরে গোত্র। ঐ সকল সুবিধা হতে সম্পূর্ণরূপে এরা বিঞ্চত ছিলেন। লুণ্ঠিত হয়েও মার খেয়ে নিঃস্ব এবং রিক্ত অবস্থায় ভাগ্যের প্রতি ভরসা করে কোনরূপে মদীনায় পৌঁছে ছিলেন।

মদীনায় বসবাসের জন্য মুহাজিরদের জন্য কোন বাসস্থান বা আহার ও পোষাকের জন্য কোন কর্ম সংস্থান ছিল না। অথবা কোন প্রকার ধন ও সম্পদ ছিল না, যার দ্বারা তাঁরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। অথচ এ আশ্রয় প্রার্থী মোহাজিরদের সংখ্যা কম ছিল না। তদুপরি দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল। কারণ, সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন তারা যেন হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। অথচ এটা জানা কথা যে, মদীনাতে সম্পদ বলতে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই ছিল না। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এর ফলে মদীনার অর্থনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ল। ইসলাম বিরোধী চক্র এ বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক বয়কট আরম্ভব

করে দেয় কাজেই আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিমগণের বিরুদ্ধে অন্তরে কোন বিদ্বেষ বিরোধিতা কিংবা শত্রুতার মনোভাব ছিল না।

(খ) **দ্বিতীয় সম্প্রদায় ঃ** মদীনায় মূল পৌত্তলিক (মুশরিক) অধিবাসী এ সম্প্রদায়ভূক্ত। মুসলিমগণের উপর এদের কোন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব ছিল না। কিছু সংখ্যক মুশরিক সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিল এবং পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগের ব্যাপারে সন্দিহান ও অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ বিরোধিতা কিংবা শত্রুতার মনোভাব ছিল না। এ শ্রেণীর মানুষ স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের দলভূক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এমন কিছু সংখ্যক মুশরিক ছিল যারা অন্তরে অন্তরে রাসূলুল্লাহ ও মুসলিমগণের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অন্তরে তাদের যেভাবেই থাক না কেন, প্রকাশ্যে তার মৈত্রী ও বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশ্যে বাধ্য হতো। এদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সেই ব্যক্তি যে বুআসের যুদ্ধের পর আউস ও খাযরাজ গোত্র থেকে নেতা নির্বাচনের সিদ্ধান্তে একমত হয়ে ছিল। অথচ এর পূর্বে এ দু'গোত্র মিলিতভাবে কোন লোককে নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে এক মতো হতে পারে নি। নেতা নির্বাচনের পর তার জন্য মনিমুক্তা খচিত মুকুট তৈরি করা হচ্ছিল। এ মুকুট পরিয়ে দেয়ার পর তাকে মদীনার রাজা হিসেবে অভিষেক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে মদীনায় রাসূলুল্লাহ-এর আগমনের ফলে পট পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ হয়ে উঠেন মদীনা সমাজের মধ্যমণি। এর ফলে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ-এর কারণেই মদীনার রাজ সিংহাসন থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। ফলে অত্যন্ত পাকাপাকিভাবে সে রাসূলুল্লাহ বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ-এর বিরুদ্ধে নানাভাবে নানা চক্রান্তে করেও সে তেমন কোন সুবিধা করতে পারল না। বদরের যুদ্ধের পর যখন দেখল যে, অবস্থা মোটেই তার অনুকূল নয় এবং শিরকের উপর অটল থাকার কারণে তাকে পার্থিব ফায়দা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে তখন সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বসল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কাফেরই ছিল।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শত্রুতার সামান্যতম সুযোগ পেলেও তার সদ্ব্যবহার করতে সে পিছপা হতো না। তার সঙ্গে সাধারণতঃ ঐ সকল নেতার সম্পর্কে ছিল যারা তার রাজত্বে বড় বড় পদ পাওয়ার আশায় আশান্বিত ছিল। কিন্তু মুসলিমগণের প্রাধান্যের ফলে এদেরকে তাদের আকাঙ্খিত পদ ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হল। এ জন্য তাদের আক্ষেপও কম ছিল না। এ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে তারা কোন কোন সময় সরল প্রাণ মুসলিম যুবকদেরকে অস্ত্র হিসেবে চাইত।

(গ) **তৃতীয় সম্প্রদায় ঃ** মদীনার ইহুদীগণ হচ্ছে এ শ্রেণীভূক্ত। এরা অশোরী ও রোমীয়গণের অন্যায় অত্যাচার জর্জরিত হয়ে হেজাযে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইবরাণী (হিব্রু) ভাষাভাষি। কিন্তু হেজাযে বসবাসের পর তাদের চাল চলন ভাষা এবং তাহযীব তামুদ্দুন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরবী রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তাদের গোত্রীয় এবং ব্যক্তিমণ্ডলেও আরবী সংস্কৃতির প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইহুদী এবং আরবদের মধ্যে বিবাহ শাদির সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বংশধারা এবং বংশপরিচয় ঠিকই ছিল। আরবদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় নি। বরং নিজেদেরকে ইহুদী বা ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদের অনুসারী বলে গর্ববোধ করত এবং আরবদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে মনে করত। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে অশিক্ষিত বর্বর হিংস্র নীচ অচ্ছুৎ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতেও ছাড়ত না। তাদের ধারণা ছিল যে, অরবদের সম্পদ তাদের জন্য বৈধ বা হালাল। আরবদের সম্পদ এভাবে যথেচ্ছা ব্যবহার করার ফলে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥].

'আহলে কিতাবের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, যদি তাদের নিকট স্বর্ণের স্তুপ গচ্ছিত রাখ, তবে তোমাকে তা ফেরত দেবে, পক্ষান্তরে তাদের কেউ কেউ এমন যে, একটি দিনারও যদি তাদের নিকট গচ্ছিত রাখ, তার পেছনে লেগে না থাকলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না, এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই'।' (আলু-'ইমরান ৩ : ৭৫)

ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে ইহুদীদের মধ্যে কোন প্রকার সংগ্রামী চেতনা কিংবা উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ত না। ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা যেত তা হল ভালো মন্দ লক্ষণ নির্ধারণ করা, যাদু ও টোনার ঝাঁড়ফুঁক এবং আরও নানা প্রকার তুকতাক করা। এসকল কাজের জন্যই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী গুণী এবং আধ্যাত্মিক ইমাম ও নেতা মনে করত।

অর্থোপার্জনের নানা পন্থা প্রক্রিয়া ও কৌশলাদির ব্যাপারে ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। বিখ্যাত শস্যাদি, খেজুর, মদ এবং বস্ত্র ব্যবসায়ে তারা ছিল সে জমানায় শীর্ষ স্থানীয় । তারা খাদ্যশস্য, বস্ত্র, মদ ইত্যাদি আমদানী করত এবং খেজুর রপ্তানী করত। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজেও তার নিয়োজিত থাকত। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা আরবদের নিকট থেকে অত্যন্ত উচ্চ হারে মুনাফা আদায় করত। শুধু তাই নয়, তারা চড়া সুদে-সুদী কারবারও করত। এ সকল সুদখোর ইহুদীরা আরবের বড় বড় ব্যবসায়ী নেতাদের সুদী ঋণ প্রদান করত। এ সকল ঘাতক ব্যবসায়ী ও নেতাগণ ঋণদাতা ইহুদীগণের প্রশংসা কীর্তনের জন্য এবং প্রশংসা সূচক কাব্য রচনার জন্য কবিদের অর্থ যোগান দিত। ঋণদানের সময় ইহুদীগণ ঋণ পরিশোধের পরবর্তী কালে চড়া সুদের ফলে সুদ আসলে ঋণলব্ধ অংকের অর্থ যখন অতিমাত্রায় ফুলে ফেঁপে উঠত তখন ঋণ গ্রহীতাদের পক্ষে সেই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। ফলে তাদের দায়বদ্ধ সম্পত্তি ইহুদীদের অধিকারে চলে যেত।

এরা কুচক্র, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ও শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। তারা এত সূক্ষ্ম ও কূটকৌশলের সঙ্গে প্রতিবেশী গোত্র সমূহের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করত যে, তারা এ ব্যাপারে কোন আঁচই পেতনা। তাদের কুচক্রীপণার ফল শ্রুতিতে গোত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকত। ঘটনাচক্রে যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা মন্দীভূত হলে তারা পুনরায় কুট-কৌশল প্রয়োগ করে তার তীব্রতা বাড়িয়ে দিত। এক্ষেত্রে সব চাইতে মজার ব্যাপার ছিল গোত্রে গোত্রে যখন ধ্বংসযজ্ঞ চলত তখন আরবদের এ ধ্বংসালীলা যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে না যায় তদুদ্দেশ্যে যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়কে বিশাল বিশাল অংকের ঋণ স্বল্প সুদে প্রদান করত এবং বিনিময়ে তাদের সহায়-সম্পত্তি দায়বদ্ধ করে রাখত। এভাবে কায়দা-কৌশল করে দোধারী অস্ত্রের মতো তারা দ্বিমুখী মুনাফা লুটত। অধিকন্তু এক দিকে তার ইহুদী ঐক্য সংরক্ষিত করার ব্যাপারে যেমন সর্বক্ষণ স্বচেষ্ট থাকত অন্যদিকে তেমনি সুদের বাজার গরম রাখার জন্য সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকত।

ইয়াস রিবের ইহুদী গোত্রগুলোর তিনটি গোত্র ছিল সমাধিক প্রসিদ্ধ। এ গোত্রদ্বয় হচ্ছে ঃ

১. বনু কাইনুকা ঃ এরা ছিল খাযরাজদের মিত্র এবং এদের আবাসস্থল মদীনার মধ্যেই ছিল।

(২) বনু নযীর এবং

(৩) বনু কুরাইযাহ এ গোত্র দুটি ছিল আউসদের মিত্র। এদের বাসস্থান ছিল মদীনার উপকণ্ঠে।

প্রায় এক যুগ যাবৎ এ গোত্রদ্বয় আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল এবং কুআসের যুদ্ধে আপন আপন মিত্র গোত্রের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইসলাম ও মুসলিমগণের সঙ্গে ইহুদীদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এ টুকুই বলা যায় না তারা কখনই মুসলিমগণকে সুনজরে দেখত না। তারা সর্বদাই মুসলিমগণের ব্যাপারে প্রতিহিংসা পরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন থাকত। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাদের গোত্রীয় কিংবা বংশজাত কোন সম্পর্কই ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ যে, তাদের বংশীয় টান তাদের আত্মা ও মন মেজাজের অংশ হিসেবে স্থান লাভ করত এবং এতে তারা প্রচুর আনন্দও পেত।

ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়ার অন্য একটি কারণ ছিল এর দাওয়াত ছিল একটি অত্যন্ত উকৃষ্ট মানের দাওয়াত যা ভাঙ্গা অন্তরকে জোড়া দিয়ে চলছিল, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অগ্নিকে নির্বাপিত

করছিল, সকল লেনদের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন এবং হালাল উপার্জন ও হালাল ভক্ষণের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছিল। এর ফলে ইয়াসরাবের গোত্র সমূহের মধ্যকার শিথিল সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে উঠতে থাকল যা হুদীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া ও আতঙ্কের সৃষ্টি করল। এ ব্যাপারে তাদের আশঙ্কা ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তাদের রমারমা পূর্ণ সুদী কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া, সুদী কারবার সূত্রে কূট-কৌশলের মাধ্যমে মদীনাবাসীগণের যে সকল সম্পদ তারা কুক্ষিগত করে রেখেছিল সে সব কিছুই তাদেরকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হতে হবে।

যখন ইহুদীগণ বুঝতে পারল যে, ইসলামী দাওয়াত ইয়াসরিবের মাটিতে নিজের জন্য স্থান করে নিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন থেকেই তারা এটাকে তাদের জন্য একটি প্রকৃত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে নিল। একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইয়াসরিবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিমগণের সঙ্গে তারা শত্রুতা আরম্ভ করে দিল। অবশ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের এ শত্রুতা গোপনে গোপনেই চলেছিল। তার পর প্রকাশ্যে শত্রুতা করার সৎসাহস তারা অর্জন করে। ইবনে ইসহাক বর্ণিত একটি ঘটনা সূত্রে এই ব্যাপার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায় ঃ

তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আমি উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই বিন আখবার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে এ বর্ণনা প্রাপ্ত হয়েছি যে, তিনি বলেন, 'আমি আমার আব্বা ও চাচাজন আবু ইয়াসেরের নিকট তাদের সন্তানদের মধ্যে সব চাইতে অধিক প্রিয় ছিলাম। তাঁদের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে থেকে আমি যখনই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম তাঁরা সকলের চাইতে আমাকেই অধিক ভালবাসতেরন এবং সকলের আগে আমাকেই কোলে তুলে নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব ও আমার চাচা আবু ইয়াসার অতি প্রত্যুষে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় সূর্যাস্তের সময় টাল খেতে খেতে তারা ফিরছিলেন, আমি উঁকি মেরে তাদের দেখার পর পূর্বের নিয়ম মাফিক দৌড় দিয়ে দিয়ে তাঁদের নিকট গেলাম, কিন্তু আল্লাহর শপথ তাঁরা এত বেশী চিন্তিত ছিলেন যে, আমার প্রতি তারা ফিরেও তাকালেন না। আমি আমার চাচাকে বলতে শুনলাম, তিনি আব্বাকে বলছিলেন, 'ইনিই কি তিনি"? আব্বা বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ!' চাচা পুনরায় বললেন, 'আপনি তাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারছেন তো"?

পিতা বললেন, 'হ্যাঁ"।

তারপর চাচা বললেন, 'তার ব্যাপারে আপনি এখন মনে মনে কি ধারণা পোষণ করছেন?

পিতা বললেন, 'শত্রুতা, আল্লাহর শপথ! যতদিন জীবিত থাকব"।[১]

এর সাক্ষ্য সহীহ বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, যাতে আব্দুল্লাহ বিন সালামের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের একজন উঁচুদূরের আলেম ছিলেন। তিনি যখন অবগত হলেন যে, নবী ﷺ বনী নাজ্জার গোত্রে আগমন করেছেন তখন তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকে কয়েকিট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, যার উত্তর একমাত্র নবীগণ ছাড়া অন্য কেউই দিতে পারেন না। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে প্রশ্ন সমূহের উত্তর পেয়ে গেলেন, তখন তিনি সেখানেই মুসলিম হয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেন যে, ইহুদীরা হচ্ছে মিথ্যা অপবাদকারী এক ঘৃণিত সম্প্রদায়। আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি জানার পর যদি তাদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে তাঁরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিতে থাকবে।

এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এ আহ্বানে তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হল, এদিকে আব্দুল্লাহ বিন সালাম গৃহকোণে আত্মগোপন করে রইলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন সালাম কেমন লোক তা জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে তারা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সব

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫১৮-৫১৯ পৃঃ।

চাইতে বড় আলেম এবং সব চাইতে বড় আলেমের পুত্র, তিনি হচ্ছে আমাদের মধ্যে সব চাইতে ভাল মানুষ এবং সব চাইতে ভাল মানুষের পুত্র।'

অন্য এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, তারা বলল, 'তিনি আমাদের সর্দার এবং সর্দারের ছেলে। আরও এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, তারা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা বলত আব্দুল্লাহ যদি মুসলিম হয়ে যায় তবে?'

ইহুদীগণ দু' কিংবা তিনবার বলল, 'আল্লাহ যেন তাঁকে এ থেকে রক্ষা করেন।' এ কথা শ্রবণান্তে আব্দুল্লাহ বিন সালাম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

অর্থ ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।'

এ কথা শোনা মাত্রই ইহুদীগণ বলে বসল, (এ হচ্ছে আমাদের মধ্যে সব চাইতে খারাপ লোক এবং সব চাইতে খারাপ লোকের সন্তান)। এর পর তারা তার কুৎসা বর্ণনা করতে শুরু করে দিল। একটি বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) এ সময় বললেন, 'হে ইহুদীদের দল! আল্লাহকে ভয় কর। সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তোমরা আরও জান যে, তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন।'

কিন্তু ইহুদীরা বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ"।[১]

এটা ছিল ইহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম অভিজ্ঞতা। আর তা মদীনায় প্রবেশের প্রথম দিনেই অর্জন হয়েছিল।

এ পর্যন্ত যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় প্রবেশ কালীন অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। মদীনার বাইরে মুসলিমগণের সব চাইতে শক্তিশালী শত্রু ছিল কুরাইশ মুশরিকগণ। মুসলিমগণকে দশ বছর যাবৎ তাদের প্রবল চাপ, ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং জুলুম নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমান-আমান সংক্রান্ত সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ, ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং সহিষ্ণুতা ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিমগণের আত্মিক উৎকর্ষতা চরমে পৌঁছেছিল। যার ফলে অনেক অসুবিধার মধ্যে থেকে তাঁদের মনোবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল।

মুসলিমগণ যখন মদীনায় হিজরত করলেন, কুরাইশ মুশরিকগণ তখন তাঁদের বাড়িঘর এবং ধন-সম্পত্তি নিজেদের অধিকারভূক্ত করে নিয়েছিল। শুধু সে সব নিয়েই তারা ক্ষান্ত হল না, মুসলিমগণের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলল, অধিকন্তু, তারা যাকে পেল তাকেই বন্দী করে রাখল এবং তাদের উপর অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকল। কিন্তু এত করেও তারা ক্ষান্ত হল না, আরও চরম ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা এবং তাঁর দাওয়াতকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকল। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ যখন কোনভাবে জীবন রক্ষা করে পাঁচশ' কিলোমিটার দূরত্বে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন কুরাইশগণ সুযোগের সদব্যবহার করে এক রাজনৈতিক কূটকৌশলের প্রয়োগ শুরু করল। যেহেতু তারা ছিল বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতিবেশী, সে কারণে আরব বাসীদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব পার্থিব ঐশ্বর্য ও পদ সমূহ তাদের অধিনস্থ ছিল। এ কারণে তারা আরব উপদ্বীপের মুশরিক অধিবাসীদেরকে মদীনার বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করে ফেলল। যার ফলে মদীনায় জিনিসপত্র আমদানী ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকল। অথচ মুহাজিরদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতেই থাকল। প্রকৃতপক্ষে মক্কার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মদীনার মুসলিমগণের নতুন অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়ে

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৪৫৯, ৫৫৬ ও ৫৬১ পৃঃ।

গেল। যারা সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে এ যুদ্ধের দোষ এবং দায়-দায়িত্ব মুসলিমগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল তাদের সম্পর্কে বুঝতে হবে যে, হয় তারা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে একথা বলছে নতুবা এ ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই।

মুসলিমগণের জন্য এ পর্যায়ে নায্য প্রাপ্য এটাই ছিল যে, যেভাবে তাদের সম্পদ হরণ করা হয়েছে তেমনিভাবে তাঁরাও দুস্কৃতকারীদের সম্পদ হরণ করবেন, যেভাবে তাঁদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন চালানো হয়েছে সেভাবে তাঁরাও অত্যাচারীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, যেভাবে মুসলিমগণের জীবনধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনিভাবে তাঁরাও তাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। মোট কথা, দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নীতি অবলম্বন করে চলবেন যাতে মুসলিমগণের প্রতি তাদের প্রতিহিংসাপরায়নতা এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের ধারণা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ ও সমস্যা সমূহ যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ নবী, রাসূল, হাদী ও নেতা হিসেবে মদীনা আগমনের পর প্রত্যক্ষ করেন, তিনি সে সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন, নবী এবং নেতা সুলভ ভূমিকার মাধ্যমে। যে সম্প্রদায় দয়া পাবার যোগ্য তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং যারা কঠোরতা পাবার যোগ্য তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি এ সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কঠোরতার চাইতে দয়াই তাঁর অধিক কাম্য এবং প্রিয় ছিল। যার ফলে স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলামের চাবিকাঠি মুসলিমগণের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে এ সবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হবে।

بناء مجتمع جديد

নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করে প্রথম হিজরী রবিউল আওয়াল মাসের ১২ই তারীখে জুমআর দিন মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে বনী নাজ্জার গোত্রের আবু আইউব আনসারীর বাড়ির সম্মুখে অবরতণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'ইন-শা-আল্লাহ এটাই হবে আমার অবস্থান।' তারপর তিনি আবু আইউব আনসারীর বাড়িতে স্থানান্তর হয়ে যান।

মসজিদে নববীর নির্মাণ (بناء المسجد النبوي) ঃ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম কাজ হল মসজিদে নববীর নির্মাণ। আর এজন্য ঐ স্থানটিই নির্ধারিত হল যেখানে সর্ব প্রথম তাঁর উটটি বসে পড়েছিল। এ স্থানটির মালিক ছিল দু'জন অনাথ বালক। তিনি ঐ স্থানটি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করলেন এবং স্বশরীরে মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছিলেন,

[اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخرة ** فاغْفِرْ للأنصار والْمُهَاجِرَةْ]

'হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল পরকালেরই জীবন। অতএব আনসার ও মহাজিরদিগকে ক্ষমা করুন।'

অধিকন্তু এ কথাও বলছিলেন,

[هذا الحِمَالُ لا حِمَال خَيْبَر ** هــــذا أبَــــرُّ رَبَّنَا وأطْــهَر]

'এটা খায়বারের বোঝা নয়, এ আমার প্রভূর পক্ষ হতে অধিক পুণ্যময় ও পবিত্র।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মধারা সাহাবীগণ (রা.)-কে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করছিল। কাজে তারাও বলছিলেন,

لئن قَعَـــدْنا والنبي يَعْمَل ** لـــذاك مــــنَّا العَمَــــلُ المُضَلَّل

'যদি আমরা বসে থাকি এবং নবী ﷺ কাজে করেন, তাবে আমাদের এ কাজ হবে পতভ্রষ্টতার"।

এ জমিতে মুশরিকদের কিছু সংখ্যক কবর ছিল। কিছু অংশ পতিত ছিল। তাছাড়া খেজুর ও গারকাদের কয়েকটি গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের কবরগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিলেন, পতিত জায়াগাটা সমতল করলেন এবং খেজুর ও অন্য গাছগুলো কাটিয়ে কেবলার দিকে খাড়া করে দিলেন। সে সময় কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস। দরজার দু'বাহুর স্তম্ভগুলো পাথর দ্বারা এবং দেওয়াল নির্মিত হল কাঁচা ইট দিয়ে। ছাদের উপর খেজুরের ডালপালা চাপিয়ে আবরণ তৈরি করা হল আর খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে থাম তৈরি করা হল। মেঝেতে বিছানো হল বালি ও ছোট ছোট কাঁকর। ঘরের তিন দরজা লাগানো হয়েছিল। কেবলার দেওয়াল হতে পিছনের দেওয়াল পর্যন্ত দৈর্ঘ ছিল ১০০ (একশত) হাত আর প্রস্থও ছিল ঐ পরিমাণ অথবা কিছু কম। ভিতরে গভীরতা ছিল তিন হাত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের পাশে কয়েকটি ঘর তৈরি করিয়ে নিলেন যার দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং ছাদ ছিল খেজুরের গুঁড়ির বর্গা দিয়ে। ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুরের শাখা ও পাতা দিয়ে তৈরি। এগুলো ছিল উম্মাহাতুল মু'মিনীন নবী পত্নীগণের (রাঃ) আবাস কক্ষ। এ কক্ষ গুলোর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর বাসা থেকে এ আবাস্থানে স্থানান্তর হয়ে গিয়েছিলেন।[1]

মসজিদে নববী শুধুমাত্র সালাত আদায়ের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল না, বরং তা ছিল তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল। এ মসজিদেই ছিল মুসলিম সামাজের আদিশিক্ষা কেন্দ্র যেখানে বসে মুসলিমগণ

---

[1] সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৭১, ৫৫৫ ও ৫৬০ পৃঃ। যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৬ পৃঃ।

ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাদিক্ষা এবং হেদায়েতের পাঠ গ্রহণ করতেন, এ মসজিদেই ছিল এমন একটি মিলনকেন্দ্র যেখানে জাহেলিয়াত জীবনের দীর্ঘ কালের বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা হয়েছিল, এ মসজিদেই বসত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার পরামর্শ সভা। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, সৈন্য পরিচালন, সন্ধি স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এ মসজিদে নববী। অধিকন্তু, এ মসজিদেই ছিল অনেক নিবেদিত সাহাবী (رضي الله عنهم)-এর আবাসস্থল, যাঁদের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজন বলতে কিছুই ছিল না।

এ মসজিদে এক দিকে ছিল যেমন মুসলিমগণের শান্তি, স্বস্তি, শক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আল্লাহর প্রেমের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি আবার এ মসজিদেই ছিল কাফির মুশরিকদের জন্য ভয়-ভীতির উৎস। হিজরতের প্রথম দিকেই আযান প্রথা প্রচলিত হয়। এটা এমন এক সুরেলা স্বর্গীয় সঙ্গীত এবং সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমনের জন্য এমন মনোজ্ঞ আহ্বান যা প্রত্যহ পাঁচবার প্রচারিত হয় মসজিদের মিনার থেকে। মসজিদে নববীতে যখন আযান দেয়া হতো এবং আযানের গুরু গম্ভীর আওয়াজ যখন আকাশের দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকত, তখন এদদিকে আল্লাহ প্রেমিক মুসলিমদের অন্তর ভালবাসায়, ভক্তিতে, আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠত, অন্যদিকে কাফির মুশরিকদের অন্তর ভয়-ভীতিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠত। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আবদে রব্বিহী'র (رضي الله عنه) স্বপ্নের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে (বিস্তারিত অবগতির জন্য জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনে খুযায়মায় দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।)

মুসলিমগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন (المؤاخاة بين المسلمين) ঃ

মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমগণ যেভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহায্য সহযোগিত এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তেমনভাবে মুসলিমগণের মধ্যে এমন অপূর্ব এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন যার তুলনা মানব জাতির ইতিহাসে কোথাও মিলে না। মুসলিমগণের এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে 'মুহাজির ও আনসারগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনে কাইয়ূম লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আনাস বিন মালেকের গৃহে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন। এ সভায় সর্বশেষ নব্বই জন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন, অর্ধেক সংখ্যক ছিলেন মুহাজির এবং অর্ধেক সংখ্যক আনাসার। 'মুহাজির আনসার ভ্রাতৃত্বের' মূলনীতি গুলো ছিল, 'একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবেন এবং মৃত্যুর পর নিজ আত্মীয়ের মতো একে অন্যের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী হবেন। ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর যখন এ আয়াতে শরীফা,

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]

"কিন্তু আল্লাহ্র বিধানে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অগ্রগণ্য।' (আল-আনফাল ৮ : ৭৫)

বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবলমাত্র মুহাজিরীনদের মধ্যে আরও এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রথম মতটিই অধিক প্রামন্য ও গ্রহণযোগ্য। কেননা, মুহাজিরীনগণ এমনিতেই পরস্পর ইসলামী ভ্রাতৃত্বে, দেশীয় ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই তাঁদের মধ্যে নতুন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আনসারদের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন।[1]

এ ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহাম্মদ গাযালী লিখেছেন যে, 'এ ছিল মূর্খতার যুগের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী। আত্মীয়তা বা অনাত্মীয়তার সম্পর্ক যা কিছু হবে তা হবে ইসলামের জন্য। এরপর থেকে মানুষে মানুষে বংশ, বর্ণ ও দেশের সম্পর্ক মুছে যাবে। উঁচু, নীচু ও মানবত্বের মাপকাঠি হবে কেবলমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে, অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে নয়।

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৬ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শুধুমাত্র ফাঁকা বুলির পোষাক পরে ক্ষান্ত হন নি, বরং এ ছিল এমন এক কার্যকর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি যা রক্ত ও ধন-সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এটা শুধু ফাঁকা বুলি এবং গতানুগতিক সালাম ও মবারকবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ছিল সমবেদনা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রন। আর এ কারণেই তাঁর পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত এ নবতর জীবনধারা মানব জাতির ইতিহাসে এমন এক অধ্যায় রচনা করেছিল কোন কালেই যার কোন তুলনা মিলে না।[1]

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুর রহমান বিন আউফ (رضي الله عنه) এবং সায়াদ বিন রাবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনে করিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর সায়াদ (رضي الله عنه) আব্দুর রহমানকে (رضي الله عنه) বললেন, 'আনসারদের আমি সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদ দু'ভাগে ভাগ করে অর্ধেক গ্রহণ করুন। তাছাড়া, আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। দুজনের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ হয় আমাকে বলুন, আমি তাকে তালাক দিব। ইদ্দত পালনের পর তাকে বিবাহ করবেন।'

আব্দুর রহমান (رضي الله عنه) বললেন, 'আল্লাহ আপনার ধনজন ও মালমাত্তায় বরকত দিন। আপনাদের বাজার কোথায়?' তাঁকে বনু কাইনুকায়ার বাজার দেখিয়ে দেয়া হল। তিনি যখন বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর নিকট অতিরিক্ত কিছু পনির ও ঘি ছিল। এরপর তিনি প্রত্যহ বাজার যেতে থাকলেন। তারপর একদিন যখন তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' তিনি বললেন, 'আমি বিবাহ করেছি।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'স্ত্রীকে মোহর দিয়েছ তো?' তিনি বললেন, 'একটি খেজুরের বীচি পরিমাণ স্বর্ণ (অর্থাৎ সোয়া ভরি) দিয়েছি।[2]

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা এসেছে যে, আনাসারগণ রাসূলুল্লাহ (رضي الله عنه)-এর নিকট এ বলে আবেদন পেশ করলেন যে, 'আপনি আমাদের এবং মুহাজিরীন ভাইদের মধ্যে আমদের খেজুর বাগান গুলো ভাগ বন্টন করে দিন"। তিনি বললেন, 'না"।

আনসারগণ বললেন, 'তবে আপনারা অর্থাৎ মুহাজিরগণ আমাদের কাজ করে দেবেন এবং তাদেরকে আমরা ফলের অংশ দিব।

তারা বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা কথা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।[3]

এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, আনাসারগণ কিভাবে আন্তরিকতা ও আগ্রহের সঙ্গে আগু বেড়ে মুহাজির ভাইদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছিলেন এবং কতটুকু মহব্বত, খলুসিয়াত ও আত্মত্যাগের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। অধিকন্তু, মুহাজিরগণও তাঁদের আনসার ভাইদের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল, সহমর্মী ও আত্মসচেতন ছিলেন তা এ ঘটনা থেকেই প্রামণিত হয়ে যায়। আনসারগণের আত্মত্যাগের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সুযোগের অপব্যবহার কখনই করেন নি। তাঁদের ভেঙ্গে যাওয়া জীবনধারাকে নূন্যতম প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সচল করে তোলার জন্য যতটুকু গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল তাঁরা ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সত্য কথা এবং এর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে বলতে গেলে কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ভিত্তি ছিল অভাবিত ও পূর্ব এ আল্লাহ দর্শন এবং বিজ্ঞান যে দর্শন ও বিজ্ঞানের উর্বর পলল ভূমিতে উপ্ত হয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বীজ যার ফলে মুসলিমগণের সম্মুখে সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল সর্বোত্তম পন্থায়।

---

[1] ফিকহুস সীরাহ ১৪০ ও ১৪১ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী বাবু এখাইন নবী (ﷺ) বায়নাল মুহাজিরীনা আল আনসার, ১ম খণ্ড ৩৫৫ পৃঃ।

[3] প্রাগুক্ত বাবু ইয়াকলা আকফেনী মোউনাতান নাখলে ১ম খণ্ড ৩১২ পৃঃ।

পরস্পরে ইসলামী সাহায্যের অঙ্গীকার (ميثاق التحالف الإسلامي) ঃ

উপরি উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মতই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমগণের মধ্যে আরও একটি অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন করেছিলেন যদ্দ্বারা জাহেলিয়াত যুগের সকল গোত্রীয় গণ্ডগোলের মূলোৎপাটন এবং যাবতীয় কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের বিলোপ সাধন ঘটে। এ অঙ্গীকারনামার দফাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল যার রূপ ছিল এ ধরণের ঃ

এটা লিখিত হচ্ছে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কুরাইশ, ইয়াসরেবী এবং তাঁদের অনুসারী ও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণের জন্য ঃ

১. এঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মানব থেকে ভিন্ন একটি গোষ্ঠি।

২. কুরাইশ মুহাজিরগণ নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত (হত্যার বিনিময়) দেবেন এবং মু'মিনদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে বন্দীদের মুক্তিপণ প্রদান করবেন। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত প্রদান করবেন এবং তাঁদের সকল দল ঈমানদারদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আপন বন্দীদের জন্য মুক্তিপন প্রদান করবেন।

৩. ঈমানদারগণ কোন সহায় সম্পদহীন (অনাথ) কে মুক্তিপণ ও দিয়াত প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পন্থা মোতাবেক প্রদান এবং সম্মান করা থেকে বিমুখু করবেন না।

৪. সকল ধর্মপ্রাণ মু'মিন ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন যারা তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে অথবা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও গণ্ডগোলের পথ বেছে নেবে।

৫. মু'মিনগণ তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন যদিও তাদের মধ্যে কেউ আপন পুত্রও হয়।

৬. কোন কাফিরের বদলে কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে হত্যা করবেন না।

৭. কোন মু'মিন কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবেন না।

৮. আল্লাহর যিম্মা (অঙ্গীকার) একই হবে। একজন সাধারণ মানুষের প্রদানকৃত যিম্মা সকল মুসলমানের জন্য সমানভাবে পালনযোগ্য হবে।

৯. যে সকল ইহুদী মুসলিমগণের অনুগামী হবে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে এবং তারা অন্য মুসলিমগণের মতো হয়ে যাবে। তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা যাবে না। কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করা যাবে না।

১০. মুসলিমগণের সম্পাদিত সন্ধি হবে একই। কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সন্ধি করবেন না, বরং সকলে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই তা করবেন।

১১. মুসলিমগণ ঐ রক্তপাতের ব্যাপারে সমান অধিকার রক্ষা করবেন যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হবে।

১২. কোন কুরাইশ মুশরিককে আশ্রয় দেবে না, তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করবে না, আর কোন মু'মিনের হেফাজতের ব্যাপারে মুশরিকদেরকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবে না।

১৩. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানেক হত্যা করবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করা হবে যদি নিহতের অভিভাবক রাজী থাকেন।

১৪. যে সকল মু'মিন এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য এছাড়া আর কিছু হালাল হবে না যে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন, তাঁরা বিরুদ্ধাচারীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন।

১৫. কোন মু'মিনের জন্য এটা সঙ্গত হবে না যে, যারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে (বিদ'আতী) তাদের কার্যকলাপে সাহায্য করে অথবা তাকে আশ্রয় দেয়, কিংবা যে তাকে সাহায্য করে তাকে আশ্রয় দেয়। যে এরূপ করবে কিয়ামতের দিন সে অভিশাপ এবং গযবে নিপতিত হবে এবং তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই কবুল হবে না।

১৬. তোমাদের মধ্যে যখনই যে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হবে তখনই তা আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ-এর বিধি-বিধান মতো ফয়সালার ব্যবস্থা করবে।[1]

জীবনধারায় বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন ঃ

ইসলামী রাষ্ট্র ও মহা বিজ্ঞানময় মুসলিম সমাজের এ ক্রান্তি লগ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নতুন জীবনধারার ভিত্তি স্থাপন করেন। এ জীবনধারার বাহ্যিকতা প্রকৃতপক্ষে ঐ আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতারই প্রতিবিম্ব (রশ্মি) ছিল যাকে নবী ﷺ-এর সঙ্গ ও সাহচর্যের বদৌলতে অভাবনীয় এক সম্মানের আসনে সমাসীন করা সম্ভব হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শিষ্যদের দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করতেন এবং অবিরামভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

তিনি তাঁর শিষ্যগণকে সদা-সর্বতা ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা, সম্মান সম্ভ্রম এবং উপাসনা, আনুগত্য ও আদবকায়দার তালীম দিতেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা মেনে চলার জন্য প্রেরণা ও পরামর্শ দান করতেন।

একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন,

أي الإسلام خير

'কোন ইসলাম উত্তম? অর্থাৎ ইসলামের কোন আচার-আচরণটি উৎকৃষ্ট?' তিনি বললেন,

[تطعم الطعام، وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف]

'তুমি খাদ্য খাওয়াও এবং চেনা-অচেনা (লোককে) সালাম দাও"।[2]

আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করলাম যে, এ কমনীয়, রমণীয়, সুষমাস্নিগ্ধ ও উজ্জ্বলতামণ্ডিত মুখমণ্ডলটি কোন মিথ্যুক মানুষের হতেই পারে না (এবং তার মুখ নিঃসৃত যে প্রথম বাণীটি শ্রবণ করেছিলাম তা ছিল,

[يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام]

'হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সালাম দেয়ার রেওয়াজ প্রবর্তন কর, খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় কর এবং রাত্রি বেলা মানুষ যখন নিদ্রাসুখে মগ্ন থাকবে তখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাক। (তবে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[3]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

[لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه] :

"ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদে না থাকে।[4] তিনি আরও বলেছেন,

[المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده]

"(প্রকৃত) মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।[5]

তিনি আরও বলেছেন,

[لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه]

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫০২-৫০৩ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৬ ও ৯ পৃঃ।

[3] তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমি, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃঃ।

[4] সহীহ মুসলিম, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ।

[5] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৬ পৃঃ।

'তোমাদের মধ্যে কেউই (প্রকৃত) মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অপর ভাইয়ের জন্য ঐ সকল জিনিস পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'[১]

তিনি আরও বলেছেন,

[المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله]

"সকল মু'মিন একটি মানব দেহের মত, যদি তার চোখে ব্যথা হয় তাহলে সমগ্র দেহেই ব্যথা অনুভূত হবে, আর যদি মাথায় ব্যথা হয় তাহলে তার সমগ্র শরীরেই ব্যথা অনুভূত হবে।[২]

তিনি আরও বলেছেন,

[المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً]

"মু'মিন মু'মিনের জন্য একটি দালান ঘরের মতো, একাংশ অপর অংশকে শক্তি দান করে।[৩]

তিনি আরও বলেছেন,

[لا تباغضوا، ولا تحاسدون، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام]

"নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না, রাগ করবে না, একে অপর থেকে মুখ ফিরাবে না, আল্লাহর বান্দা ও আপোষের মধ্যে ভাই ভাই হয়ে থাকবে। কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তিন দিনের বেশী তার ভাইয়ের সাথে ক্রোধবশত কথা বার্তা বলবে না।[৪]

তিনি আরও বলেছেন,

[المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة]

'মুসলিম মুসলমানের ভাই, না তার প্রতি অন্যায় করবে আর তাকে শত্রুর হাতে অর্পণ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাতে থাকবেন। কোন মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। আর কেনা মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।'[৫]

আরও বলেছেন,

[ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء]

'তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি সদয় হও, আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।'[৬]

তিনি আরও বলেছেন,

[ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه]

'ঐ ব্যক্তি মুসলিম নহে, যে পেট পুরে খায় অথচ তার পাশেই প্রতিবেশী অনাহারে কালাতিপাত করে।'[৭]

---

1 সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৬ পৃঃ।
2 সহীহ মুসলিম, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ।
3 মুত্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ, সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯০ পৃঃ।
4 সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯৬ পৃঃ।
5 মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ।
6 সুনানে আবু দাউদ ২য় খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ, জামে তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৪ পৃঃ।
7 বাইহাকী, শোআবুল ঈমান, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২৪ পৃঃ।

আরও বলেছেন,

[سِباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر]

'মুসলিমগণকে গালি দেয়া ফিসক (পাপ) তাদের হত্যা করা কুফুরী কাজ (অবিশ্বাসের কর্ম)।'[1]

এভাবে তিনি রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু দূরীভূত করাকে সদকা বলে গণ্য করতেন এবং এটাকে ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখা বলে গণ্য করতেন।[2]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দান-খয়রাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং এ সবের এমন এমন ফযীলত বর্ণনা করতেন যেদিকে মন এমনিতেই আকৃষ্ট হতো। তিনি বলতেন যে, সদকা এবং দান-খয়রাত পাপকে এমনভাবে মুছে ফেলে যে, যেমন পানি আগুনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।[3]

তিনি আরো বলেছেন,

[أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرى كساه الله من خُضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيم المختوم]

"কোন মুসলিম যদি কোন নগ্ন মুসলিমকে কাপড় পরিয়ে দেয় তা হলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিয়ে দিবেন এবং কোন মুসলিম যদি ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাদ্য খাওয়ায় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন এবং কোন মুসলিম যদি কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করায় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে মোহরকৃত পবিত্র শরাব পান করাবেন।[4] তিনি বলেছেন,

[اتقوا الناء ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة]

"আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো যদিও খেজুরের অর্ধাংশ দিয়েও হয়, তাও যদি না পাও তা হলে কমপক্ষে ভাল কথার দ্বারা ভিখারীকে তুষ্ট করো।[5]

অথচ ভিক্ষা বৃত্তি হতে বিরত থাকার জন্য চরমভাবে নিষেধ করেছেন, ধৈর্যধারণ এবং অল্পতে সন্তুষ্ট হওয়ার ফযীলত শুনাতেন, ভিক্ষুকগণের ভিক্ষাবৃত্তিকে তাদের মুখমণ্ডলে আঁচড়, পাচড়াও ক্ষত আখ্যায়িত করেছেন।[6] অবশ্য সীমাতিরিক্ত নিরূপায় হয়ে যারা ভিক্ষা করে তাদের কে এর বাইরে রেখেছেন।

কোন ইবাদতের কি ফযীলত এবং আল্লাহর নিকট তার কি সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে সে সবও তিনি আলোচনা করতেন। উপরন্তু, তাঁর নিকট যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হতো মুসলিমগণকে তার সঙ্গে শক্তভাবে জড়িয়ে রাখতেন। সেই সকল আয়াত তিনি মুসলিমগণকে পড়ে শোনাতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের তা পড়ে শোনাতে বলতেন। উদ্দেশ্য ছিল এ কাজের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে বুঝ-সমঝ ও চিন্তাভাবনার উদ্রেক এবং দাওয়াতের যোগ্যতা, পয়গম্বয়ত্বের অনুভূতি ও সচেনতার সৃষ্টি করা।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণের সুপ্ত সম্ভাবনা সমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবত্বের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁদের উন্নীত করেন এবং জাগতিক ও পারত্রিক ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে আল্লাহর চেতনা ও ন্যায়-নীতির প্রতি নিবেদিত ও সমর্পিত এমন এক মানবগোষ্ঠির গোড়াপত্তন করেছিলেন ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। এ মানবগোষ্ঠির মধ্যে তার সাক্ষাৎ শিষ্যদের বলা হতো সাহাবী (رضي الله عنهم)। মান-মর্যাদা এবং মানবত্বের

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯৩ পৃঃ।

[2] মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ১ম খণ্ড ১২ ও ১৬৭ পৃঃ।

[3] আহমদ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৪ পৃঃ।

[4] সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৬৯ পৃঃ।

[5] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ ২য় খণ্ড ৮৯০ পৃঃ।

[6] দ্রষ্টব্য, আবু দাইদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দাবেমী, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃঃ।

উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের স্থান ছিল নবী রাসূলগণের পরেই। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, 'যার অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে সে অতীত মানবগোষ্ঠির অনুসরণ করুক কেন না, জীবিতদের ব্যাপারে ফিৎনার ভয় রয়েছে।'

'অতীত মানবগোষ্ঠি' বলতে তিনি সাহাবীগণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা নবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। নবী (সা.)-এর এই উম্মত-গোষ্ঠিত ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানব, সব চাইতে পুণ্যবানা, সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সব চাইতে নিবেদিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিজ নবী (সা.)-এর বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান-ব্রতে শরীক হওয়ার দুর্লভ সুযোগ দানে ধন্য ও সম্মানিত করেছেন। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে তাঁদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। কারণ, তাঁরা ছিলেন হিদায়েত প্রাপ্তির উজ্জ্বলতার দৃষ্টান্ত।[১]

অন্যদিকে আবার, আমাদের পয়গম্বর রহাবারে আযম (সা.) সেরা পথপ্রদর্শক নিজেও এরূপ মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি, আল্লাহ প্রদত্ত পয়গম্বরত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, মান-মর্যাদা মহানচরিত্র এবং সুন্দর সুন্দর কাজ-কর্মের অধিকারী ছিলেন যে, তার সংস্পর্শে এলে মন এমনিতেই তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ত। ফলে তাঁর মুখ থেকে যখনই কোন কথা বের হতো তখনই সাহাবীগণ (রা.) তা বাস্তবায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। হিদায়েতের যে সকল কথা তিনি বলতেন জীবন-মরণ পণ করে সাহাবীগণ (রা.) তা সর্বাগ্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যেতেন।

আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক চেতনায় উজ্জীবিত প্রেরণাবোধ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে নবী কারীম (সা.) মদীনার সমাজ জীবনে এমন এক জীবনধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন অখণ্ড মানব জাতির ইতিহাসে যা ছিল সর্বোচ্চ মানের এবং সর্বাধিক পূর্ণত্বপ্রাপ্ত। এ জীবনধারায় তিনি এমন সব নিয়মনীতি এবং আচার-আচরণ প্রবর্তন করলেন যা যুগ-যুগান্তর দরে অব্যাহত থাকা শোষণ, শাসন ও নিষ্পেষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানব জীবনকে শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তির আস্বাদে ভরপুর করে তুলে এ জীবনধারার উপাদানগুলোকে এমন উঁচু মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করা হয়েছিল যে, যুদ্ধ এবং শান্তি সকল অবস্থার সঙ্গেই সর্বাধিক যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা কর যে কোন পরিস্থিতির মোড় নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার মতো যোগ্যতা মুসলিমগণ অর্জন করেছিলেন। মুসলিমগণের এহেন পরিবর্তিত জীবনধারা কিছুটা যেন আকস্মিকভাবেই ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দেয়।

---

[১] রাযীন, মিশকাত ১ম খণ্ড ৩২ পৃঃ।

معاهدة مع اليهود

ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদীনার মুসলিম সমাজকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং পরিচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে নবী কারীম ﷺ যখন সক্ষম হলেন তখন মদীনার অমুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমঝোতা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখী, সমৃদ্ধ ও বরকতময় জীবনের পথ প্রশস্তকরণ, মদীনবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি ও একতার বন্ধন সুদৃঢ় করণ। এ লক্ষ্যে উদার উন্মুক্ত মনমানসিকতা নিয়ে এমন সব নিয়ম নীতি ও কার্যক্রম তিনি অবলম্বন করলেন যে, ধর্মান্ধতা ও স্বার্থান্ধতা-ক্লীষ্ট সম সাময়িক সমাজে যা ছিল একটি কল্পনাতীত ব্যাপার।

মদীনার মুসলিমগণের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল ইহুদীগণ। মদীনায় মহানবী ﷺ-এর হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণের সুশৃঙ্খল সমাজ সংগঠন ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি সামর্থের ব্যাপারে তারা সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিমগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করলেও প্রকাশ্য কলহ কিংবা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার হাবভাবও প্রকাশ করে নি। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন অনুভব করে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে তাদেরকে জানমালের সাধারণ নিরাপত্তা এবং ধর্মকর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাতে দেশত্যাগ, মালক্রোক এবং ঝগড়া ফাসাদের ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

এ চুক্তি ঐ চুক্তির সঙ্গেই হয়েছিল যা মুসলিমদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল যা উল্লেখ কিছু পূর্বে করা হয়েছে। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য ধারা সমূহ আলোচনা করা হল ঃ

এ চুক্তির ধারাসমূহ (بنود المعاهدة) ঃ

১. বনু আওফের ইহুদীগণ মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে একই উম্মতের মতো থাকবে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। এটা তাদের নিজেদের অধিকার হিসেবে যেমন গণ্য হবে ঠিক তেমনিভাবে তাদের সঙ্গে যার সম্পর্কিত তাদের এবং তাদের দাসদাসীদের বেলায়ও গণ্য হবে। বনু আউফ ছাড়া অন্যান্য ইহুদীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

২. মুসলিম এবং ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ আয়-উপার্জনের যিম্মাদার থাকবে।

৩. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের সঙ্গে অন্য কোন শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তিভূক্ত পক্ষগুলো সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৪. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে কাজ করে যাবে, কোন অন্যায়-অনাচার কিংবা পাপাচারের ভিত্তিতে নয়।

৫. মিত্র পক্ষের অন্যায়-অনাচারের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৬. কেউ কারো উপর জুলুম করলে মজলুমকে সাহায্য করা হবে।

৭. চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যত দিন চলতে থাকবে ততদিন ইহুদীদেরকেও মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বহন করতে হবে।

৮. এ চুক্তিভূক্ত সকলের জন্যই মদীনায় কোন প্রকার হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কিংবা রক্তপাত ঘটানো হারাম হবে।

৯. চুক্তিভূক্ত পক্ষগুলো কোন নতুন সমস্যা কিংবা ঝগড়া ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলে এর মীমাংসা করবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ।

১০. কুরাইশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেয়া চলবে না।

১১. ইয়াসরিবের উপর কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে থেকে তা প্রতিহত করতে হবে।

১২. কোন অন্যায়কারী কিংবা পাপীর জন্য এ চুক্তি সহায়ক হবে না।[১]

এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে মদীনা এবং সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ এক শান্তি-স্বস্তিময় সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে যার রাজধানী ছিল মদীনা এবং সর্বময় নেতৃত্ব ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ সাম্রজ্য পরিচালনের ভিত্তি ছিল ইসলামী বিধি-বিধান এবং পরিচালন ভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ছিলেন মুসলিম। প্রকৃতপক্ষে এভাবে মদীনা ইসলামী হুকুমতের রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়।

সুশৃঙ্খল এবং শান্তি-স্বস্তিময় অঞ্চলের সীমারেখা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করেন। সে সব চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

---

[1] দ্রষ্টব্য- ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫০৩-৫০৪ পৃঃ।

الكفاح الدامي
অস্ত্রের ঝনাঝনানি

হিজরতের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সংঘাতময় কর্মসূচী এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপ ঃ

মক্কার কুরাইশ মুশরিকগণ মুসলিমদের উপর কিরূপ অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে ছিল এবং যখন তারা মদীনায় হিজরত শুরু করেন তখন তার তাদের বিরুদ্ধে কি ধরণের বিদ্বেষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যার ফলে তাদের ধনমাল ছিনিয়ে নেয়ার এবং সাধারণভাবে তারা হত্যার নির্দেশ প্রদানেরযোগ্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপরও তাদের অন্যায় আচরণ হঠকারিতামূলক কার্য-কলাপ বন্ধ হল না এবং তার সে সব থেকে বিরত ও থাকল না। পক্ষান্তরে, মুসলিমগণ তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়ে মদীনায় একটা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে এবং ধীরে ধীরে সুসংগঠিত ও শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। এটা প্রত্যক্ষ করে তাদের ক্রোধাগ্নি অতি মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাই তারা আনসারদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে প্রকাশ্য হুমকি সহকারে একটি পত্র লিখল যদিও তিনি তখন পর্যন্ত খোলাখুলি অভিন্ন মত পোষণ করছিল। তখন মদীনাবাসীগণের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সংঘটিত না হলে তারা তাকেই মুকুট পরিয়ে তাদের বাদশাহ নির্বাচিত করত। মুশরিকদের এ পত্রের সার সংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ :

'তোমরা আমাদের কিছু সংখ্যক বিপথগামী লোককে আশ্রয় দিয়েছ এজন্য আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, হয় তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাদের দেশ থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে দেবে অন্যথায় সদল বলে তোমাদের উপর ভীষণভাবে আক্রমণ পরিচালিত করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা এবং মহিলাদের মান হানি করব।'[১]

এ পত্র পাওয়া মাত্রই আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার ঐ মক্কাবাসী মুশরিক ভাইদের দির্দেশ পালনার্থে উঠে পড়ে লেগে গেল। যেহেতু তার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের কারণেই তাকে মদীনার বাদশাহী থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে সেহেতু পূর্ব থেকেই সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছিল। এ কারণে কাল বিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে সে তার মুশরিক ভাইদের একত্রিত করে ফেলল।

এর সংবাদ অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট আগমন করলেন এবং তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি দেখছি যে, কুরাইশদের হুমকি তোমাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। কিন্তু এটা তোমাদের অনুধাবন করা উচিত যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছ কুরাইশরা কোনক্রমেই তোমাদের সেই পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। তোমরা কি তোমাদের পুত্র ও ভ্রাতাদের সঙ্গে নিজেরাই যুদ্ধ করতে চাও?'

নবী কারীম ﷺ-এর এ কথা শ্রবণ করে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।[২] কাজেই, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে তার প্রতিহিংসা জনিত যুদ্ধের সংকল্প থেকে তখনকার মতো বিরত থাকতে হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় তার সঙ্গী সাথীদের যুদ্ধ স্পৃহা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশদের সঙ্গে তার গোপন যোগযোগ চলতে থাকে। কারণ, মুসলিমও কাফিরদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বাধিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ হাতছাড়া করার ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না। তাছাড়া ইহুদীদের সঙ্গেও সে যোগাযোগ রাখতে থাকে যাতে প্রয়োজন হলে তাদের কাছ থেকেও সাহায্য লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়োচিত ও বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনার ফলে ঝগড়া বিবাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা ক্রমান্বয়ে প্রশমিত হতে থাকে।[৩]

---

[1] সুনানে আবু দাউদ, বাবু খাববিন নাযীর।

[2] সুনানে আবু দাউদ, বাবু খাবারিন নাযীর।

[3] এ সম্পর্কে সহীহুল বুখারীর ২য় খণ্ড ৬৫৫, ৬৫৬, ৯১৬ ও ৯২৪ পৃঃ।

মুসমানদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা (إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام) ঃ

এরপর সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) উমারাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন এবং উমাইয়া ইবনু খালফের অতিথি হন। তিনি উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমার জন্য এমন এক সময়ের ব্যবস্থা করে দাও যখন আমি নির্জনে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারি। সেই মোতাবেক উমাইয়া খরতপ্ত দুপুরে তাকে নিয়ে পথে বের হলে পথে আবু জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলে, 'হে আবু সাফওয়ান তোমার সঙ্গে ঐ লোকটি কে?'

উত্তরে উমাইয়া বলল, 'এ হচ্ছে সা'দ (রাঃ)।

আবু জাহল তখন সা'দ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি দেখছি দেখছি যে, তুমি বড় নিরাপদে তওয়াফ করতে রয়েছ, অথচ তোমরা বিদ্বীনদেরকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদেরকে সাহায্য করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আল্লাহর কসম! যদি তুমি আবু সাফওয়ানের সঙ্গে না থাকতে তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।

তার একথা শুনে সা'দ (রাঃ) উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'দেখো আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর তবে তোমার এমন কাজে আমি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব যা তোমাদের জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা হবে মদীনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথটি।[১]

মুহাজিরদেরকে কুরাইশদের ধমক প্রদান (قريش تهدد المهاجرين) ঃ

কুরাইশ মুশরিকগণ মদীনার মুহাজিরদেরকে ধমকের সূরে বলে পাঠাল, 'মক্কা হতে তোমরা নিরাপদে ইয়াসরিবে পালিয়ে যেতে পেরেছ বলে অহংকারে ফেটে পোড় না যেন। এটুকু জেনে রেখ যে, ইয়াসরবে চড়াও হয়েই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।[২]

তাদের এ ধমক শুধু যে, কথাবার্তা মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং এ ব্যাপারে তারা গোপনে গোপনে তৎপরও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র থেকে অবগত হয়েছিলেন যে, তিনি সতর্কতা অবলম্বন না করে পারেন নি। নিরাপত্তার খাতিরে হয় জাগ্রত অবস্থায় তিনি রাত্রির যাপন করতেন, নতুবা সাহবীদের প্রহারাধীনে ঘুমোতেন। যেমনটি সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম শরীফে আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'মদীনায় আগমনের পর একদা রাত্রি বেলায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন এবং আকাঙ্খা পোষণ করছিলেন যে, আজ রাত্রে যদি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি এখানে এসে পাহারা দিতেন (তাহলে কতই না ভাল হতো)।

আমরা ঐ অবস্থাতেই ছিলাম এমন সময় আকস্মাৎ অস্ত্রের ঝনাঝনানি আমাদের কর্ণগোচর হল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করলেন, 'কে'? উত্তরে শ্রুত হল। 'আমি সা'দ ইবনু আবী আক্কাস' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গভীর রাত্রে তোমার এখানে আগমনের কারণ কী' জবাবে তিনি বললেন, 'আপনার সম্পর্কে আমার মনে বিপদের আশঙ্কা উদ্রেক হওয়ায় আপনাকে পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।' তার একথা শুনে তিনি তার জন্য দু'আ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।[৩]

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাহারা দেয়ার ব্যাপারটি শুধু কয়েকটি রাত্রির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং এটা ছিল পর্যায়ক্রমিক এবং স্থায়ী ব্যবস্থা। আয়শা (রাঃ) হতে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাহারা দেয়া হতো। তারপর নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ঃ

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]،

---

[১] সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী ৫৬৩ পৃঃ।

[২] রহমাতুল্লিল আলামীন প্রথম খণ্ড ১১৬ পৃঃ।

[৩] সহীহ মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড, বাবু ফাযালি সা'দ ইবনু আবী আক্কাস (রাঃ) ২৮০ পৃঃ এবং সহীহ বুখারী বাবুল হারাসাতে ফিল গাযভে ফী সাবীলিল্লাহ ১ম খণ্ড ৪০৪ পৃঃ।

"(হে রসূল!) মানুষ হতে আল্লাহ্ই তোমাকে রক্ষা করবেন।' (আল-মায়িদাহ ৫ : ৬৭)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুব্বা (ঘর বিশেষ) থেকে মাথা বের করে বললেন,

(يا أيها الناس، انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل)

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা ফিরে যাও। মহামহিমান্বিত প্রভূ পরওয়ার দেগার আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।"[1]

আরব মুশরিকদের শত্রুতা জনিত এ বিপদ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা মুসলিম সমাজের সকল সদস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেমনটি উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (রা.) মদীনা আগমন করেন এবং আনসারগণ তাদের আশ্রয় দান করেন, তখন আরব মুশরিকগণ তাঁদেরকে একই কামান দ্বারা আক্রমন করে। তাই না তাঁরা অস্ত্র ছাড়া রাত্রি যাপন করতেন, না অস্ত্র ছাড়া সকাল বেলা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন।

যুদ্ধের অনুমতি (الإذان بالقتال) ঃ

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় যা মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যদ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কুরাইশরা কোনক্রমেই তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ও এক গুঁয়েমী পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয় নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে আয়াত নাযিল করলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩].

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।' (আল-হাজ্জ ২২ : ৩৯)

তারপর এ ধরণের আরো বহু আয়াত অবতীর্ণ হয় সেগুলোতে বলে দেয়অ হয় যে, যুদ্ধের এ অনুমতি যুদ্ধ হিসেবে নয় বরং এ উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিলের বিলোপ সাধন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করণ। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

[الحج: ٤١]

"(এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ।' [আল-হাজ্জ (২২) : ৪১]

সঠিক কথা যা না মেনে উপায় নেই তা হচ্ছে এ অনুমতি সম্পর্কিত আয়াত হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়, মক্কায় অবতীর্ণ হয়নি। তবে অবতীর্ণ হওয়ার সময় নিশ্চিতরূপে নির্দিষ্ট করা নিঃসন্দেহে মুশকিল।

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হল, কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হল ওটা যেহেতু শুধু কুরাইশদেরই শক্তিমত্ততা ও একগুঁয়েমীর ফল ছিল সেহেতু এটাই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কাজ যে মুসলিমগণ নিজেদের দখল সীমা কুরাইশদের ঐ বাণিজ্য পথ পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেবে যা মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত চালু ছিল। এ কারণেই দখল সীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা দুটি হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

---

[1] জামীউত তিরমিযী, আবওয়াবুত তাফসীর ২য় খণ্ড ১৩ পৃঃ।

১. যে সকল গোত্র এ রাজপথের আশপাশে কিংবা এ রাজপথ হতে মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিল তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন।

২. এ রাজপথের উপর টহলদারী দল প্রেরণ।

প্রথম পরিকল্পনা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ঐ ঘটনাটি যা পূর্বে ইহুদীদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল এবং যে চুক্তিটির বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। সামরিক তৎপরতা শুরু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে জুহাইনা গোত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও পনস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। মদীনা থেকে তিন মনজিলের অধিক, অর্থাৎ ৪০ থেকে ৫০ মাইলের ব্যবধানে তাদের আবসস্থল অবস্থিত ছিল। টহলদারী সৈন্যদের পরিভ্রমণ কালে লোকজনদের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন যার আলোচনা পরে আসছে। দ্বিতীয় পকিল্পনাটি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বদরযুদ্ধের পূর্বেকার সারিয়্যাহ ও গাযওয়াহ সমূহ (الغزوات والسرايا قبل بدر) :[1]

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ায় এ দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মুসলিমদের সামরিক তৎপরতায় কাজ শুরু হয়ে যায়। পরিভ্রমণকারী প্রহরীরূপে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা এবং তৎসলগ্ন এলাকাগুলোতে টহল দিতে শুরু করেন, যেমনটি ইতোপূর্বে আভাষ প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের এ টহলদারীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশ-পাশের পথ সমূহের উপর সাধারণভাবে এবং মক্কা থেকে আগত পথগুলোর উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। এভাবে বিভিন্ন পথের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করে যাওয়া এবং একই সঙ্গে এ সকল পথের আশে পাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করা। অধিকন্তু, এ সুসংগঠিত টহলদারীর অন্য যে একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হচ্ছে ইয়াসরিবের ইহুদী, মুশরিক এবং বেদুঈনদের অন্তরে এ ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল যে, মুসলিমগণ এখন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং পূর্বের নাজুক অবস্থাকে পেছনে ফেলে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাছাড়া কুরাইশ মুশরিকগণকে তাদের অর্থহীণ ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়াবেগের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যাতে এখনো তারা তাদের নির্বুদ্ধিতার অন্ধকূপে যে পতিত অবস্থায় রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনার আলোকজ্জ্বল পথে পদচারণ শুরুর মাধ্যমে নিজেদের আয় উপার্জন ও জীবন-জীবিকার পথে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে সন্ধির কথাটা সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে এবং মুসলিমদের আবাসস্থানে উপর চড়াও হয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলার যে চরম হঠকারী সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে, আল্লাহর দ্বীনের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে ও মক্কার মুসলিমদের উপর যে, অমানবিক নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে সে সব থেকে বিরত থাকে। সর্বোপরি, মুসলিমগণ যাতে আরব উপদ্বীপে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কর্মপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন সেটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

সারিয়্যাহ ও গায্ওয়াহ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

মদীনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল সারিয়্যাহ ও গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

১। সারিয়্যাতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপ কূলের প্রেরিত বাহিনী[2]

হিজরী ১ম বর্ষ রমাযান মাস মুতাবিক মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাহ্ বিন আবুল মুত্তালিবকে এ অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে ৩০ জন মুহাজির সৈন্য দিয়ে তাদেরকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিন শত সদস্য বিশিষ্ট এ

---

[1] ঐতিহাসিক পরিভাষায় যে, যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন তাকে বলা হয় গাযওয়াহ এবং যাতে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন নি তাকে বলা হয় সাবিয়্যাহ।

[2] সীনে জের দিয়ে পড়া হয়েছে যার অর্থ সমুদ্রোপকূল।

কুরাইশ কাফেলার অন্যতম সদস্য ছিল আবু জাহল। মুসলিম বাহিনী **'ঈস'**[1] নামক জায়গার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রোপকূলের নিকট পৌঁছিলে ঐ কাফেলার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখী হলে এক পর্যায়ে উভয় দলই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদী ইবনু আমর যিনি উভয় দলেরই মিত্র ছিলেন। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে উভয় দলকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরস্ত করেন।

হামযাহ্ (রাঃ)-এর এটা ছিল প্রথম পতাকা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় মুবারক হাত দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন। এর বহনকারী ছিলেন আবু মার্সাদ কিনায ইবনু হাসীন গানাভী (রাঃ)।

২. সারিয়্যাতু রাবেগ বা রাবেগ অভিযান ঃ এ অভিযান পরিচালিত হয় হিজরী ১ম বর্ষের শাওয়াল মাস মুতাবিক এপ্রিল, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাইদাহ ইবনু হারিস ইবনু মুত্তালিবকে ৬০ জন মুহাজিরের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এ অভিযান তাঁরা রাবেগ উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের সম্মুখীন পরস্পর পরস্পরের উপর কিছু সংখ্যক তীর নিক্ষেপ করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করেনি, যার ফলে বড় আকারের কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি।

এ অভিযান কালে মক্কা বাহিনী থেকে দু'জন মুসলিম এসে যোগদান করেন মুসলিম বাহিনীতে। এঁদের একজন হচ্ছেন মিকদাদ বিন আমরুল বাহরানী এবং অন্যজন হচ্ছেন উৎবাহ বিন গাযওয়ান মাযেনী (রাঃ), উভয়েই মুসলিম ছিলেন। তাঁরা কাফিরদের সঙ্গে এ উদ্দেশ্যে বাহির হয়েছিলেন যে, সামনে গিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যাবেন। আবু ওবায়দার (রাঃ) পতাকা ছিল সাদা এবং উহার বহনকারী ছিলেন মিসতাহ বিন আসাসাহ বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ।

৩. সারীয়্যায়ে খার্‌রার[2] **ঃ** এ অভিযান হিজরী ১ম বর্ষের যিলকদ মাস মুতাবিক মে ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু আবী আক্কাস (রাঃ)-কে এ সারিয়্যাহর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বিশ জন যোদ্ধার সমন্বয়ে এক বাহিনী গঠন করে একটি কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাদেরকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তারা যেন খার্রার হতে সামনের দিকে আর অগ্রসর না হন। এ বাহিনী পদব্রজে পথ চলতেন। তারা দিবাভাগে নিজেদের গোপন করে রাখতেন এবং রাতের বেলা পথ চলতেন। পঞ্চম দিবস সকালে তারা খার্রারে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, একদিন পুর্বেই সেই কাফেলা সে স্থান অতিক্রম করে গিয়েছে। এ সারিয়্যাহর পতাকা ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন মিকদাদ ইবনু আমর (রাঃ)।

৪. গাযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান[3] **ঃ** এ গাযওয়ার সময় ছিল হিজরী ২য় বর্ষের সফর মাস মুতাবিক আগষ্ট, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ। ৭০ জন মুহাজির যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ গাযওয়ায় যাত্রার প্রাক্কালে সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত রূপে নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একটি কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা তাদের অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে তিনি অদ্দানে গিয়ে পৌঁছেন।

কিন্তু সংঘাতমূলক কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি। এ গাযওয়া অভিযান কালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু যমরাহ গোত্রের তৎকালীন সরদার আমর ইবনু মুখশী যমরীর সঙ্গে মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির কথাগুলো নিম্নরূপ ঃ

---

[1] আইন এ জের দিয়ে পড়তে হবে। এটা লোহিত সাগর এলাকার ইয়ামবু এবং মারওয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গা।

[2] খার্রার যোহফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

[3] অদ্দান হচ্ছে মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটা রাবেগ মতে মদীনা যাওয়ার পথে ২৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আবওয়া হচ্ছে অদ্দানেরই নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

"এটা হচ্ছে বনু যমরাহর জন্য মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দলীল। এ গোত্রের লোকজনেরা লাভ করবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা। তারা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা হবে, যদি তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। পক্ষান্তরে, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁরা সাহায্যের প্রয়োজন তাদেরকে আহ্বান জানাবেন তখনই তাঁর সাহায্যার্থে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।[1]

"এটা ছিল প্রথম সৈন্য পরিচালন যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ অভিযানে ১৫ দিন যাবৎ মদীনার বাইরে থাকার পর তিনি মদীনা ফিরে আসেন। এ অভিযানের পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (রা.)।

৫. গাযওয়ায়ে বুওয়াত বা বুওয়াতের অভিযান : এ অভিযান সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবিউল আওয়াল মুতাবিক সেপ্টেম্বর, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। দু'শ জন সাহাবী সমভিব্যাহার রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অভিযানে বহির্গত হন। এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। উমাইয়া ইবনু খালফ সহ একশ জন কুরাইশ এবং আড়াই হাজার উট ছিল এ কাফেলার মুসলিম বাহিনী রাযওয়ার পার্শ্ববর্তী বুওয়াত[2] নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কোন সংঘর্ষ বাধেনি। এ গাযওয়ায় গমনকালে সা'দ ইবনু মুআয (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়। এ গাযওয়ার পতাকা ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন সা'দ ইবনু আবী আক্কাস (রা.)।

৬. গাযওয়ায়ে সাফওয়ান : এ গাযওয়া সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবীউল আওয়াল মাস মুতাবিক সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এ গাযওয়ার কারণ ছিল কুরয ইবনু জারির ফাহরী মুশরিকদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদীনার চারণভূমির উপর আক্রমণ চালায় এবং কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্তর জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু কুরয এবং তার সঙ্গীরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীসহ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ গাযওয়ান শত্রু পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগই সৃষ্টি হয় নি। কেউ কেউ এ গাযওয়াকে গাযওয়ায়ে বদরে উলা বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন।

এ গাযওয়ায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনু হারিসাহকে মদীনায় আমীর নিযুক্ত করেন। এ গাযওয়ান পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন আলী (রা.)।

৭. গাযওয়ায়ে যিল উশাইরাহ : এ গাযওয়া সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের জামাদিউল উলা ও জামাদিউল উখরা মুতাবিক নভেম্বর ও ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এ অভিযান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন দেড়শ কিংবা দুইশ মুহাজির সাহাবী। অবশ্য এ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে কাউকেই তিনি বাধ্য করেন নি। সওয়ারীর জন্য উট ছিল মাত্র ত্রিশটি এ কারণে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া অভিমুখে এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। জানা গিয়েছিল যে, এ কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। এ কাফেলার সঙ্গে কুরাইশদের বহু সুন্দর সুন্দর মূল্যবান মালপত্র ছিল। এ কাফেলার সন্ধানে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাহিনীসহ যুল উশাইরাহ[3] পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তার সেখানে পৌঁছার কয়েক দিন পূর্বেই কুরাইশ কাফেলা সে স্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছিল। এটা ছিল ঐ যাত্রী দল সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন। ঐ যাত্রীদল তার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এর ফলে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল বদর যুদ্ধের। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়েছিলেন জামাদিউল উলার শেষ ভাগে এবং মদীনায় ফিরে এসেছিলেন জামাদিউল উখরায়। সম্ভবতঃ এ

---

[1] আল মাওাহিবর লাদুন্নিয়্যাহ ১ম খণ্ড ৭৫ পৃঃ যুরকানীর শারহ সহ।

[2] বুওয়াত ও রাযওয়া জুহাইনার পাহাড়গুলোর মধ্যে দুটি পাহাড় যা প্রকৃতপক্ষে একটি পাহাড়েরই দুটি শাখা। এটা মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথের সাথে মিলিত হয়েছে। এ পাহাড় দুটি মদীনা থেকে ৪৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

[3] উশাইরাহ ইয়ামবুহর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম। উশায় বাহকে উশায়বাহকে উশায়বাহকে উশায়রাহ অথবা উসাইরাহ বলা হয়।

কারণেই এ গাযওয়ায় মাস নির্ধারণে নবী ﷺ-এর জীবনী লেখকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ গাযওয়া কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু মুদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু যমরাহর সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন করেন।

এ অভিযানের দিন গুলোতে আবু সালমা ইবনু আব্দুল আসাদ মাখযুমী (رضي الله عنه) মদীনার শাসন পরিচালনের দায়িত্ব পালন কনের। এবারের পতাকাও ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামাযাহ (رضي الله عنه)।

৮. সারিয়্যাতু নাখলা ঃ এ অভিযানের সময় ছিল হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রজব মাস মুতাবিক জানুয়ারী ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে বারো জন মুহাজির সাহবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর বাহন ছিল প্রতি দুজনের জন্য একটি উট। একই উটের উপর তার যথাক্রমে আরোহন করতেন। বাহিনী প্রধানের হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পত্র দিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন যে, দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন এ পত্র পাঠ করা হয়। সুতরাং দুদিন পথ চলার পর আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) পত্রটি পাঠ করেন। পত্রে লিখিত ছিল 'আমার এ পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনে দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থানে অবস্থিত নাখলায় অবরতণ করবে। এক কুরাইশ কাফেলার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা সেখানে ওঁৎ পেতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশ পালনের জন্য আব্দুল্লাহ দ্বিধাহীন চিত্তে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার পর তাঁর সঙ্গীদের নিকটে পত্রের বিষয়টি প্রকাশ করে বললেন, 'আমি কারো উপর জোর জবরদস্তি করতে চাই না। তোমাদের মধ্যে যে শাহাদত পছন্দনীয় নয় সে প্রত্যাবর্তন করবে। শাহাদাতই আমার কাম্য।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর সঙ্গীরা সকলেই সম্মুখে পানে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর সা'দ ইবনু আবী আক্কাস (رضي الله عنه) এবং উৎবাহ ইবনু গাযওয়ানের উটটি হারিয়ে যায়। এ উটটিই ছিল তাঁদের উভয়ের বাহন। উট হারিয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা পিছনে থেকে যেতে বাধ্য হন।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (رضي الله عنه) এবং তার সঙ্গীগণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর নাখলায় অবতরণ করেন। সেই সময় একটি কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বাণিজ্য সামগ্রী ছিল কিশমিশ, চামড়া এবং আরও অনেক সামগ্রী। ঐ কাফেলায় ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরার দু'পুত্র ওসমান ও নওফাল এবং মুগীরার মুক্ত দাস আমর ইবনু হাযরামী ও হাকীম ইবনু কায়সান। শত্রুপক্ষ নাগালের মধ্যে, অথচ দিনটি ছিল হারাম মাস রজবের শেষ দিন। এ দিনেয় মুসলিম বাহিনীর মনে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করতে থাকলেন। যদি তারা এ দিনে যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহলে হারাম মাসের অসম্মান করা হবে। পক্ষান্তরে রাত্রি পযন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকলে ঐ কাফেলা আরও অগ্রসর হয়ে হারাম সীমার মধ্যে প্রবেশ করবে। উভয় সংকট জনিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম বাহিনী অবশেষে এ কুরাইশ কাফেলাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আক্রমণের সূচনাতে মুসলিম বাহিনী আমর ইবনু হাযরামীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরবিদ্ধ হাযরামী ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। তারপর তারা ওসমান এবং হাকীমকে বন্দী করে ফেললেন। কিন্তু পলায়ন পর নওফাল নাগালের বাইরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হল। বন্দী দুজন এবং মাতলপত্র সহ মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা গণীমতের মাল হতে এক পঞ্চামাংশ বের করেও নিয়েছিলেন।[1]

হারাম মাসে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি তো তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার হুকুম দেই নি।' এ অভিযানের গণীমত এবং যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি।

---

[1] চরিতকারগণের বর্ণনা হচ্ছে এটাই, তবে যাতে জটিলতা রয়েছে এবং তা হচ্ছে এক পঞ্চামাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াত বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এর শানে নযুলের যে ব্যাখ্যা তাফসীর কিতাবসমূহে দেয়া হয়েছে তাতে জানা যায় যে, এর আগ পর্যন্ত মুসলিমগণ পঞ্চামাংশের হুকম সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন।

সারিয়্যাতু নাখলার ঘটনার ফলে মুশরিকেরা এ রটনা রটানোর সুযোগ পায় যে, মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত মাসে যুদ্ধ এবং নরহত্যা করে 'হারাম' বিধান লঙ্ঘন করেছে এবং তার অমর্যাদা করেছে। এর ফলে দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। ওহীর মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করেন যে, মুশরিকেরা যে সকল কাজকর্ম করেছে তা মুসলিমদের এ কাজের তুলনায় বহুগুণে অপরাধজনক। কালাম পাকে - হয়েছে ঃ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

" পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র পথ হতে বাধা দান, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফুরী, কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তাথেকে তার বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহ্‌র নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়।' [আল-বাক্বারাহ (২) : ২১৭]

এ ওহী নাযিল হওয়ার ফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলিম মুজাহিদের সম্পর্কে মুশরিকেরা যে অপবাদ রটাচ্ছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা, কুরাইশ মুশরিকগণ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যায় অনাচার ও জুলুম নির্যাতন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে নি কিংবা নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নি। যখন হিজরতকারী মুসলিমদের ধনমাল তারা ছিনিয়ে নেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকত এবং এমন কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তখন হারাম মাস কিংবা হারাম সীমার (মক্কা) প্রতি তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি। অথচ, কি কারণে হঠাৎ করে তারা এ পবিত্র মাসগুলোর পবিত্রতার ব্যাপারে এত সচেতন হয়ে উঠল এবং এগুলোর পবিত্রতা নষ্ট করা দোষণীয় বলে এত সোচ্চার হয়ে উঠল? অবশ্যই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকেরা যে গুজব রটিয়েছে এবং হৈ চৈ শুরু করেছে তা প্রকাশ্য বিদ্বেষ ও সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার উপর প্রতিষ্ঠিত্র।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দী দুজনকে মুক্ত করে দেন এবং নিহত ব্যক্তিটির অভিবাবককে রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[1]

এগুলো হচ্ছে বদর যুদ্ধের পূর্বেকার সারিয়্যাহ ও গাযওয়া। এগুলোর কোনটাতেই সুস্পষ্ট ও হত্যার তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যে পর্যন্ত না কুরয ইবনু জাবির ফাহরীর নেতৃত্বে মুশরিকরা মদীনার সন্নিকটস্থ চারণ ভূমি থেকে কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এর সূচনাও মুশরিকদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। ইতোপূর্বে তারা যেমন বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছিল, গবাদি পশু লুট কারার ঘটনাটিও ছিল অনুরূপ একটি ঘটনা।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়্যার পর কুরাইশ মুশরিকদের মধ্যে কিছুটা ভয়-ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হল এবং তারা সুস্পষ্টভাবে এটা উপলব্ধি করল যে, তাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা, ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। যে ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা তারা এতদিন করে আসছিল শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁদেই তাদের পতিত হতে হল। এ বিষয়টিও তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনার মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর রয়েছে এবং কুরাইমশদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছে। তারা এটাও বুঝল যে, মুসলিমগণ এখন ইচ্ছা করলে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে, লোকজনদের বন্দী করে নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এটাও তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিরিয়ামুখী ব্যবসা-বাণিজ্য

---

[1] ঐ সকল সারিয়্যাহ এবং গাযওয়ার বিস্তারিত নিম্নলিখিত পুস্তকাদি থেকে গৃহীত হয়েছে , যা'দুল মা'দ ২য় খণ্ড ৮৩-৮৫ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫৯১-৬০৫ পৃঃ, রাহমাতুল্লিল আলামীন ১/১১৫-১১৬ পৃঃ, ২য় খণ্ড ২১৫-২১৬ ও ৪৬৮ থেকে ৪৭০ পৃঃ। এ গাযওয়া এবং সারিয়্যাহ সম্পর্কে যেখান থেকে তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা এবং উহাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আমি আল্লামা ইবনে কাইয়ূম এবং আল্লরাম মানসুরপুরীর গ্রহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেছি।

এখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মূর্খতা এবং উদ্বত আঁচরণ থেকে বিরত রইল না। তারা জুহাইনা এবং বনু যমরাহ গোত্রদ্বয়ের মতো সন্ধির পথ অবলম্বনের পরিবর্তে ক্রোধ, হিংসা ও শত্রুতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল যে, মুসলিমদের আবাসস্থানে আক্রমণ চালিয়ে তারা তাদের একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ লক্ষ্যে এক সুসজ্জিত যোদ্ধা বাহিনীসহ তারা বদর প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হল।

এখন মুসলিমদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়্যার পর দ্বিতীয় হিজরী সনে শা'বান মাসে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেন এবং এ সম্পর্কীয় কয়েকটি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হলো ঃ

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠- ١٩٣]

"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না। ১৯১. তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর, এটাই কাফিরদের প্রতিদান। ১৯২. তারপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। ১৯৩. ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের উপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জায়িয হবে না।'

[আল-বাক্বারাহ (২) : ১৯০–১৯৩]

এরপর অতি সত্বরই অন্য প্রকারের আয়াত অবতীর্ণ হলো যাতে যুদ্ধের নিয়ম কানুন বর্ণিত হলো। ইরশাদ হলো ঃ

﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٤- ٧]

"তারপর যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হল। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন আর তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। তারপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল

করবেন যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তোমাদের পদগুলোকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।' [মুহাম্মাদ (৪৭) : ৪-৭]

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদের নিন্দা করেছেন যুদ্ধের হুকুম শুনে যাদের হৃৎকম্পন শুরু হয়েছিল। ইরশাদ হলো ঃ

﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠]

"তারপর যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরাহ্ অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য।' [মুহাম্মাদ (৪৭) : ৪-৭]

বস্তুতঃ যুদ্ধ ফরজ করা, তার প্রতি উৎসাহ দান করা এবং তার প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান ছিল পরিস্থিতির প্রয়োজন। এমন কি পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপনরত কোন সেনাধিনায়ক থাকলে তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনীকে সর্ব প্রকারের সংঘাতময় পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন। তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেবহাল তিনি কেন এরূপ নির্দেশ প্রদান করবেন না? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির একান্ত আকাঙ্খিত ছিল 'হক' ও 'বাতিলের' মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের অভিযান পরবর্তী পরিস্থিতির যা মুশরিকদের মর্যাদা ও আমিত্বের উপর ছিল কঠিন আঘাত স্বরূপ এবং যা তাদেরকে যন্ত্রণায় ফেলে রেখেছিল।

যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিতদ পূর্বাপর আয়াতগুলো দ্বারা অনুমতি হচ্ছিল যে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় আসন্ন প্রায় এবং এতে মুসলিমদের বিজয়ও সুনিশ্চিত। এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের নির্দেশ দিচ্ছেন, 'যেখান থেকে মুশরিকরা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমারও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।' আর কিভাবে তিনি বন্দীদেরকে বেঁধে ফেলার এবং বিরোধীদেরকে পিষ্ট করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর হিদায়াত দিয়েছেন যা একটি বিজয়ী কাহিনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হচ্ছিল যে, মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত।

কিন্তু এটা গোপনীয়তার সঙ্গে এবং আভাষ ইঙ্গিতেই বলা হয়েছে যাতে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য যতটা আগ্রহী ও উন্মুখ থাকে কার্যতঃ তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

তারপর ঐ সময়েই অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাস মুতাবিক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা গৃহকে কিবলাহ বলে ঘোষণা করলেন এবং নামাযে ঐ দিক মুখ ফিরানোর নির্দেশ প্রদান করলেন। এর ফলে যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণ বিশেষভাবে উপকৃত হলেন তা হচ্ছে যে, সকল মুনাফিক ইহুদী মুসলিমদের মধ্যে শুধু ফাটল ধরানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমদের সারিতে এসে দাঁড়াত তাদের মুখোশ খুলে গেল। তারা এখন মুসলিমদের মধ্যে থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজেদের আসল অবস্থানে ফিরে গেল। আর এভাবে মুসলিমদের সারিগুলো বিশ্বাসঘাতক ও কপটদের বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতার দূষণ থেকে পবিত্র হয়ে গেল।

এ সময় কিবলাহ পরিবর্তনের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত ছিল তা হচ্ছে এখন থেকে এমন একটি নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে যা এ কিবলাহর উপর মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা, এটা বড়ই বিস্ময়কর এবং অধিকারে থাকবে। আর যদি তা সেভাবে থাকে তাহলে এটা খুবই জরুরী যে, তাদের শত্রুদের অধিকার থেকে মুক্ত করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ দির্দেশাবলী ও ইঙ্গিত সমূহ প্রকাশের পর মুসলিমদের আনন্দানুভূতি ও আবেগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল এবং আল্লাহর পথে তাঁদের যুদ্ধ করার উন্মাদনা এবং শত্রুদের সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্খা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

غزوة بدر الكبرى
গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা

أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة
ইসলামের প্রথম ফায়সালাকারী যুদ্ধ ঃ

যুদ্ধের কারণ (سبب الغزوة) ঃ গাযওয়ায়ে উশায়রার আলোচনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, একটি কুরাইশ কাফেলা মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাকড়াও হতে বেঁচে গিয়েছিল। এ কাফেলাটি যখন সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল তখন নবী করীম ﷺ তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ (رضي الله عنه) এবং সাইদ ইবনু যায়েদ (رضي الله عنه) তাদের অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। এ সাহবীদ্বয় (رضي الله عنهما) 'হাওরা' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন এবং সেখানে অপেক্ষামন থাকেন। আবু সুফিয়ান যখন কাফেলাটির নিয়ে ঐ স্থানটি অতিক্রম করছিলেন তখন সাহবীদ্বয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করেন।

এ কাফেলায় মক্কাবাসীদের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। এক হাজার উট ছিল এবং এ উটগুলো কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মালপত্র বহন করছিল। শুধুমাত্র এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাফেলার সঙ্গে চল্লিশ জন কর্মী ছিল।

মদীনাবাসীদের ধনদৌলত লাভের জন্য এটা ছিল অপূর্ব এক সুযোগ। পক্ষান্তরে এ বিশাল পরিমাণ ধনমাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি ছিল মক্কাবাসীদের জন্য সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, 'সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী এক কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে প্রচুর ধনমাল রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর জন্য কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে প্রচুর ধনমাল রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর জন্য বেরিয়ে পড়। হয়ত আল্লাহ পাক গণীমত হিসেবে এ সকল মালপত্র তোমাদের হাতে দিয়ে দিবেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উদ্দেশ্যে গমন করো উপর জরুরী বলে উল্লেখ করেননি। বরং এটাকে তিনি জনগণের ইচ্ছা এবং আগ্রহের উপর ছেড়ে দেন। কেননা এ ঘোষণার সময় এটা মোটেই ধারণা করা হয়নি যে, এ কাফেলার সঙ্গে যুঝাযুঝিল পরিবর্তে শক্তিশালী কুরাইশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বদর প্রান্তরে ভয়াবহ এক রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষের মোকাবেলা করতে হবে। আর এ কারণেই বহু সাহাবী মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। তাদের অভিযানগুলোর মতই সাধারণ একটা কিছু হবে। আর এ কারণেই যারা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও উত্থাপিত হয় নি।

মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ও তাঁদের নেতৃত্বের বিন্যাস (مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات) ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তিন শতাধিক সাহাবী (رضي الله عنهم)। তিন শতাধিক বলতে সে সংখ্যাটি হতে পারে ৩১৩, ৩১৪ কিংবা ৩১৭ যাদের মধ্যে ৮২, ৮৩ কিংবা ৮৬ জন ছিলেন মহাজির এবং অন্যেরা ছিলেন আনসার। আনসারদের মধ্যে আবার ৬১ জন ছিলেন আউস গোত্রের এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীর যে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন এ রকম কোন প্রস্তুতিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহিনী ছিল না। এমন কি যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তিন শতাধিক লোক বিশিষ্ট এ বাহিনীর জন্য মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। যুবাইর ইবনু আওয়াম (رضي الله عنه)-এর ছিল একটি এবং মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ বিনদী (رضي الله عنه)-এর ছিল অপরটি। উট ছিল সত্তরটি এক এক উটের উপর পালাক্রমে আরোহণ করতেন দুই কিংবা তিন জন লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ, আলী (رضي الله عنه) এবং মার্সাদ ইবনু আবী মার্সাদ গানাভী (رضي الله عنه)-এর জন্য বরাদ্দ ছিল একটি উট। তাঁরা তিন জন পালাক্রমে আরোহণ করতেন সেই উটটির উপর।

মদীনায় ব্যবস্থাপনা ও সালাতে ইমামতি করার দায়িত্ব প্রথমে অর্পণ করা হয়েছিল ইবনু উম্মু মাকতুম (রাঃ)-এর উপর। কিন্তু 'রাওহা' নামক স্থানে পৌছার পর নবী করীম (ﷺ) আবু লুবাবাহ ইবনু আবদিল মুনযির (রাঃ)-কে মদীনার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন।

এরপর আসে যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুসলিম বাহিনীকে দুটি দলে বিভক্ত করেন :

১। মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় আলী ইবনু আবী (রাঃ) তালেবকে।

২। আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ)-কে।

সার্বিক নেতৃত্বের পতাকা প্রদান করা হয় মুসআব ইবনু উমায়ের (রাঃ)-কে। এ পতাকার রঙ ছিল সাদা। সেনাবাহিনীর ডান দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় যুবায়ের ইবনু আওয়াম (রাঃ)-কে এবং বাম দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় মিকদাদ ইবনু আমর (রাঃ)-কে। কারণ, সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র এ দুজনই ছিলেন অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের দলপতি নিযুক্ত হন কায়েস ইবনু আবী সা'সাহ (রাঃ) আর প্রধান সেনাপতি হিসেবে সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।

বদর অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা (الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر) ঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তম প্রস্তুতিবিহীন সেনাবাহিনী নিয়েই অগ্রযাত্রা শুরু করেন। তার বাহিনী মদীনার মুখ হতে বের হয়ে মক্কাগামী সাধারণ রাজপথ ধরে চলতে থাকেন এবং 'বি'রে রাওহা' গিয়ে পৌছেন। অতঃপর সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে বাম কিকে মক্কাগমী রাজপথ ছেড়ে দেন এবং ডান দিকের পথ ধরে চলতে থাকেন। চলার এক পর্যায় 'নাযিয়াহ' নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন (গন্তব্য স্থল ছিল বদর)। তারপর নাযিয়ার এক প্রান্ত দিয়ে অগ্রসর হয়ে 'রাহকান' উপত্যকা অতিক্রম করেন। এটা হচ্ছে 'নাযিয়াহ' ও 'দাররায়ে সাফরা' দিয়ে গমণ করেন। তারপর 'দাররাহ' থেকে নেমে সাফরার নিকট গিয়ে পৌছেন। সেখান হতে 'জুহাইনা' গোত্রের দুজন লোককে যথা বাবীস ইবনু উমার ও আদী ইবনু আবী যাগবাকে কুরাইশ কাফেলার অবস্থা ও অবস্থান লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে প্রেরণ করা হয়।

মক্কার বিপদের ঘোষণা (النذير في مكة) ঃ

পক্ষান্তরে কুরাইমশ কাফেলার অবস্থা এই ছিল যে, এর নেতা আবু সুফিয়ান ছিলেন সুচতুর সতর্ক এবং অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি। এ প্রেক্ষিতে তিনি অব্যাহতভাবে পথের খবরাখবর নিতেই থাকতেন পথে যে কাফেলার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হতো তাদের সকলকেই তিনি পথের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সুতরাং বিভিন্ন সূত্রে তিনি অবগত হতে সক্ষম হন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর সাহাবীদেরকে কাফেলার উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি যমযম ইবনু আমর গিফারীকে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময় মক্কা পাঠিয়ে দেন এবং তার মাধ্যমে এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, 'কাফেলা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন, হিফাযতের জন্য সাহায্যের আশু প্রয়োজন।' যমযম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মক্কায় আসে এবং আরব সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের নাক চাপড়ালো, হওদা উলটালো, জামা ছিড়ে ফেলল, মক্কা উপত্যাকায় উটের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকল, 'হে কুরাইশগণ! কাফেলা (আক্রান্ত কাফেলা (আক্রান্ত আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তোমাদের ধনমাল রয়েছে, তার উপর আক্রমণ চালানোর জন্য মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তার সাহাবীরাা উদ্যত হয়েছেন। সুতরাং আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা যে, তোমরা তা পাবে। অতএব, সাহায্যের জন্য এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।'

মক্কাবাসীগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি (أهل مكة يتجهزون للغزو) ঃ

কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শ্রবণে সমগ্র মক্কা উপত্যকায় একদম হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে সকলে দৌড়ে এসে বলতে থাকল, 'মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তার সঙ্গী সাথীরা কি মনে করেছে যে, এ কাফেলাও ইবনু হাযরামীর কাফেলারম মতই? না, না, কখনই না। আল্লাহর শপথ! এ কখনই সেরূপ নয়। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে যে, আমাদের ব্যাপারটি অন্য রকম।'

সমগ্র মক্কা শহরে তখন দু'শ্রেণীর লোক চোখে পড়ছিল। এক শ্রেণীর লোক যুদ্ধ প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধ গমন করছিল এবং অন্যদল নিজের পরিবর্তে অন্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করছিল। আর এভাবে প্রায় সবাই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে মক্কার সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেউই পিছনে ছিলেন না। শুধু আবু লাহাব নিজে না এসে তার একজন ঋণী ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। আশে-পাশে অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকেও তারা দিজেদের দলভূক্ত করে নিল। কুরাইশ গোত্র সমূহের মধ্যে একমাত্র বনু আদী ছাড়া আর কোন গোত্রই পিছনে রইল না। বনু আদী গোত্রের কোন লোকই এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল না।

মক্কা সেনাবাহিনীর সংখ্যা (قوام الجيش المكي) ঃ

প্রথমাবস্থায় মক্কা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তের শত। তাদের কাছে ছিল একশ ঘোড়া এবং ছয়শ লৌহবর্ম। উটের সংখ্য এত বেশী ছিল যে, তার কোন হিসাব কিতাবই ছিল না। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল আবু জাহল ইবনু হিশাম। এ বাহিনীর রসদ পত্রের দায়িত্বে ছিল নয় জন সম্ভ্রান্ত কুরাইশ। কোন দিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি এভাবে প্রতিদিন উটজবেহ করা হতো।

বনু বকর গোত্রের সমস্যা (مشكلة قبائل بني بكر) ঃ

সর্বাত্মক প্রস্তুতি সহকারে মক্কা সেনাবাহিনী যখন অগ্রগমনে উদ্যত এমতাবস্থায় কুরাইশদের মনে পড়ে গেল বনু বকর গোত্রের কথা। বনু বকর গোত্রের সঙ্গে তখন তারা ছিল যুদ্ধরত। এ কারণে তাদের আশঙ্কা হল যে, হয়ত বনু বকর পিছনে থেকে তাদের আক্রমণ করবে এবং ফলে দুই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তাদের নিপতিত হতে হবে। এ ধারণা তাদেরকে যুদ্ধের সংকল্পা থেকে বিরত রাখার মতো মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। কিন্তু এমন সময়ে অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান বনু কিনানাহ গোত্রের নেতা সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম মুদলিজীর রূপ ধরে প্রকাশিত হল এবং বলল, 'আমিও তোমাদের বন্ধু এবং আমি তোমাদের নিকট এ বিষয়ের জামিন হচ্ছি যে, বনু কিনানাহ তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না কিংবা কোন অশোভনীয় কাজও করবে না।'

মক্কা সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা (جيش مكة يتحرك) ঃ

সুরাকা ইবনু মারিকরূপী অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান বনু কিনানাহর ব্যাপারে জামিন হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় কুরাইশগণ আশঙ্কামুক্ত হয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা যেমনটি বলেন,

﴿بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال:٤٧]

"তারা শক্তিমত্তায় গর্বিত হয়ে জনগণকে (নিজেদের শক্তিমত্তা) দেখাতে দেখাতে আল্লাহর পথে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হলো।' [আল-আনফাল (৮) : ৪৭]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমনটি বলেছেন, 'নিজেদের ক্ষুরধার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকটে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার ও আত্ম-অহমিকার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এ বলে যুদ্ধে বেরিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীগণ মক্কাবাসীগণের ব্যবসায়ী দলের উপর চক্ষুত্তোলনের হিম্মত পেল কোথায় থেকে?'

মক্কা বাহিনী খুব দ্রুত গতিতে উত্তর মুখে বদর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে তারা উসফানও কুদায়েদ উপত্যকা অতিক্রম করে যখন জুহফা নামক স্থানে উপস্থিত হল তখন আবু সফিয়ানের লোক এসে সংবাদ দিল যে, 'কাফেলা নিরাপদে চলে এসেছে সুতরাং সামনে আর অগ্রসর না হয়ে এখন ফিরে যাওয়ার পালা।'

কাফেলার নিরাপদ অগ্রযাত্রা (العير تفلت) ঃ

আবু সুফিয়ানের কাফেলার নিরাপদে অগ্রযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এ কাফেলা সিরিয়া হতে রাজপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল বটে, কিন্তু আবু সুফিয়ান অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলছিলেন। পথ চলার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ক্রমাগত খবরাখবর নিতেই থাকছিলেন। বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী হয়ে তিনি কাফেলাকে থামালেন এবং

নিজেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মাজদী ইবনু আমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে মদীনায় সেনাবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মাজাদী বলল, 'এ রকম কোন সেনাবাহিনী তো আমি দেখিনি, তবে দু'জন উটারোহীকে দেখেছি যারা টিলার পাশে তাদের উটকে বসিয়ে নিজেদের মশকে পানি ভর্তি করে নিয়ে চলে গেছে।'

এ কথা শুনেই আবু সুফিয়ান অত্যন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে সেই স্থানে গিয়ে পৌছলেন এবং তাদের উটের গোবর ভেঙ্গে দেখলেন। তখন ঐ গোবরের মধ্যে থেকে খেজুরের আটি বেরিয়ে পড়ল। এ দেখে তিনি বলে উঠলেন আল্লাহর কসম! এটা হচ্ছে ইয়াসরিবেরই (মদীনার) খেজুরের আটি। তারপর তিনি দ্রুতগতিতে কাফেলার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাদেরকে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। বদর অভিমুখী পথ বাম দিকে ছেড়ে দিয়ে কাফেলাকে উপকূল অভিমুখে অগ্রসর হতে বললেন। এভাবে কাফেলাকে তিনি মদীনা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করলেন। একই সঙ্গে মক্কা বাহিনীর নিকট কাফেলার নিরাপদ থাকার সংবাদ পাঠিয়ে বাহিনীকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। জুহফায় অবস্থানকালে মক্কা বাহিনী এ সংবাদ পেয়েছিল।

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে মক্কা বাহিনীর মধ্যে মতভেদ (هَمَّ الجيش المكي بالرجوع، ووقوع الانشقاق فيه) ঃ

আবু সুফিয়ানের পয়গাম প্রাপ্ত হয়ে মক্কা বাহিনীর প্রায় সকল সদস্যই মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। কিন্তু কুরাইশ নেতা ও মক্কা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু জাহল অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা এখানে থেকে ফিরে যাব না। বরং আমরা বদর যাব, সেখানে তিন দিন অবস্থান করব এবং এ তিন দিন যাবৎ উট জবেহ করব, পানভোজন ও আমোদ আহ্লাদ করব। এর ফলে সমগ্র আরব জাতি আমাদের শক্তি সামর্থের কথা অবগত হবে, আর এভাবে চিরদিনের জন্য তাদের উপর আমাদের প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

আবু জাহলের এ কথার পরেও আখনাস ইবনু শুরায়েক ফিরে যাবারই পরামর্শ দিল। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকই তার কথায় কান দিল না। তাই, সে বনু যুহরার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। কেননা, সে ছিল বুন যুহরা গোত্রের মিত্র এবং বাহিনীতে সে ছিল তাদের নেতা। তাদের কোন লোকই বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি। পরবর্তীতে বনু যুহরা গোত্রের লোকেরা আখনাস ইবনু শুরাযেকের এ সিদ্ধান্তের কারণে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং তাদের অন্তরে তার প্রতি শ্রদ্ধা চির দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিন শত।

বনু যুহরার মতো বনু হাশিমও মক্কায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু আবু জাহল অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করায় তাদের পক্ষে মক্কায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। সে কঠোর কণ্ঠে বলল, আমরা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এ দলটি আমাদের থেকে পৃথক হতে পারবে না। মোট কথা, ঐ বাহিনী তাদের সফরসূচী বহাল রাখল। বনু যুহরা গোত্রের লোকজনদের মক্কা প্রত্যাবর্তনের ফলে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারে এবং তারা ছিল বদর অভিমুখী। বদরের নিকটবর্তী হয়ে তারা একটি টিলার পিছনে শিবির স্থাপন করে। এ টিলাটি বদর উপত্যকার সীমান্তের উপর দক্ষিণমুখে অবস্থিত।

মুসলিম বাহিনীর স্পর্শকাতর অবস্থা (موقف الجيش الإسلامي في ضيق وحرج) ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ পথিমধ্যেই ছিলেন এমতাবস্থায় তিনি আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা এবং মক্কা সেনাবাহিনী সম্পর্কে অবহিত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আসন্ন প্রায় সমস্যাটির খুটিনাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এখন একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন এমনভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন যা দুর্দমনীয় সাহস, বীরত্ব এবং নির্ভীকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কারণ, এটা নিশ্চিত সত্য যে, মক্কা বাহিনীকে যদি এ এলাকায় যথেচ্ছা চলতে ফিরতে দেয়া হয় তাহলে তাদের সামরিক মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে এর ফলে মুসলিমদের শক্তি হ্রাস পাবে এবং আঞ্চলিক সুযোগ সুবিধাও সীমিত হয়ে পড়বে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামী দাওয়াতকে একটি নিষ্প্রাণ আদর্শ মনে করে যাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা রয়েছে এরূপ প্রত্যেক লোক ইসলামের ক্ষতি সাধনে উঠে পড়ে লেগে যাবে। এ ছাড়াও মক্কা বাহিনীর মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে এ যুদ্ধকে মদীনার চার প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে মুসলিমগণকে যে তাদের আবাসস্থানেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সাহস ও চেষ্টা করবে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। 'জী হ্যাঁ'

মুসলিম সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যদি সামান্য পরিমাণও অবহেলা, আলস্য কিংবা কাপুরুষত্ব প্রদর্শিত হতো তাহলে এ সবের যথেষ্ট সম্ভাবনা ও আশঙ্কা ছিল। আর যদি এরূপ নাও হতো তাহলেও মুসলিমদের সামরিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সুখ্যাতির উপর যে এ সবের একটি মন্দ ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

পরামর্শ সভার বৈঠক (المجلس الاستشاري) ঃ

অবস্থার এ আকস্মিক ভয়াবহ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ পর্যায়ের এক সামারিক পরামর্শ সভার আয়োজন করলেন। এ সভায় তিনি বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। অবস্থার এ আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের ফলে আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা অবগত হয়ে একটি দলের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। এ দলটি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন,

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾ [الأنفال:٥، ٦]

'(তারা যেমন প্রকৃত মু'মিন) ঠিক তেমনি প্রকৃতভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার ঘর হতে বের করে এনেছিলেন যদিও মু'মিনদের একদল তা পছন্দ করে নি। ৬. সত্য স্পষ্ট করে দেয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল, (তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল) তারা যেন চেয়ে চেয়ে দেখছিল যে, তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে।' [আল-আনফাল (৮) : ৫-৬]

কিন্তু সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে আবু বকর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং অতি চমৎকার কথা বললেন। তারপর ওমর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন সে পথে আপনি চলতে থাকুন। আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরার আপনাকে ঐ কথা বলব না, যে কথা ইসরাঈল মুসা (عليه السلام)-কে বলেছিল তা হল ঃ

﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة:٢٤]

"কাজেই তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও আর যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে রইলাম।' [আল-মায়িদাহ (৫) : ২৪]

কিন্তু আমাদের ব্যাপারে ভিন্ন। আমরা বরং বলব, 'আপনি ও আপনার প্রভূ যুদ্ধ করুন, আমরা সর্বাবস্থায় আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। যিনি আপনাকে এক মহা সত্য প্রেরণ করেছেন তার শপথ! যদি আপনি আমাদেরকে বারকে গিমাদ পর্যন্ত নিয়ে যান তবুও আমরা পথরোধকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আপনার সঙ্গে সেখানেও গমন করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন, এবং তাদের জন্য দুআ করলেন। এ তিনজন নেতাই ছিলেন মুহাজির। সেনাবাহিনীতে আনসারদের তুলনায় মুহাজির সৈন্যের সংখ্যা ছিল অনেক কম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদেরও মতামত জানার প্রয়োজন বোধ করলেন। কেননা, সেনাবাহিনীতে সংখ্যায় তাঁরাই ছিলেন অধিক এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের চাপও ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উপরেই বেশী। অবশ্য, আকাবা'র বাইআতের স্বীকৃতি মোতাবেক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল না। এ প্রেক্ষিতে তিনি উপরিএ তিন মহান নেতার বক্তব্য শোনার পর পুনরায় বললেন, উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।'

আনসারদের উদ্দেশ্যেই তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন। আনসার অধিনায়ক ও পতাকাবাহক সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মনে হয় আপনি আমাদের মতামতই জানতে চাচ্ছেন।'

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ"।

তখন তিনি বললেন, 'আমরা তো আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার সত্যতা স্বীকার করেছি এবং এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই সত্য এবং ওগুলো শোনা ও মান্য করার পর আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি যা ইচ্ছা করেছেন তা পূরণার্থে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যান। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আপনি আদেশ করলে আমরা উত্তাল সাগরেও ঝাঁপ দিতে পারি। জগতের দুর্গমতম স্থানকেও পদদলিত করতে পারি, ইনশাআল্লাহ! আমাদের একজন লোকও পিছনে থাকবে না। যুদ্ধ বিগ্রহে আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ করবেন সাহসী ও নির্ভীক বীর পুরুষের ভূমিকায়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের মাঝে এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করাবেন যা প্রত্যক্ষ করে আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যাবে। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাজেকর্মে বরকত দান করুন।'

অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, সা'দ ইবনু মুআয (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরয করেন, 'আপনি হয়ত আশঙ্কা করছেন যে, আনাসারগণ তাঁদের শহরে থেকেই শুধু আপনাকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করছেন। এ কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকে বলছি এবং তাঁদের পক্ষ থেকেই উত্তর দিচ্ছি যে, আপনার যেখানে ইচ্ছা হয় চলুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক ঠিক রাখুন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আমাদের ধন-সম্পদ হতে যে পরিমাণ ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছা ছেড়ে দিন। তবে যেটুকু আপনি গ্রহণ করবেন তা আমাদের নিকট যেটুকু ছেড়ে দেবেন তার চাইতে অধিক পছন্দনীয় হবে। আর এ ব্যাপারে আপনি যে ফায়সালাই করবেন, আমাদের ফায়সালা তারই অনুসারী হবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি অগ্রসর হয়ে বারকে গিমাদ পর্যন্ত চলে যান তাহলেও আমরা আপনার সঙ্গেই যাব। আর যদি আপনি আমাদের নিয়ে ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান তবে আমরাও এতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

সা'দের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

(سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم).

"চলো এবং আনন্দিত চিত্তে চলো। আল্লাহ আমার সঙ্গে দুটি দলের মধ্য হতে একটিরও ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এসময় (কাফির) সম্প্রদায়ের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।

মুসলিম বাহিনীর পরবর্তী অগ্রযাত্রা (الجيش الإسلامي يواصل سيره) ঃ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যাফরান হতে সামনে অগ্রসর হন এবং কয়েকটি পাহাড়ী মোড় অতিক্রম করেন যেগুলোকে আসাফির বলা হয়। সেখান থেকে আরও অগ্রসর হয়ে 'দিয়াত' নামক এক জনপদে অবতরণ করেন। তারপর 'হিনান' নামক পাহাড়কে ডান দিকে ছেড়ে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে বদরের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন।

তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা (الرسول ﷺ يقوم بعملية الاستكشاف) ঃ

এখানে পৌঁছিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার 'সওর' গুহা সঙ্গী ও সব চাইতে ঘনিষ্ট বন্ধু আবু বকর (رضي الله عنه)-কে সঙ্গে নিয়ে শত্রু বাহিনীর সন্ধান নেয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। দুর হতে তাঁরা মক্কা বাহিনীর শিবির এবং অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষারত ছিলেন। এমন সময় একজন বৃদ্ধ আরবকে তাঁরা পেয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ বৃদ্ধকে কুরাইশ বাহিনী এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দু'বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে ছিল যেন সে তাঁকে চিনতে না পারে। বৃদ্ধ বললেন, 'আপনারা কোন কওমের সম্পর্ক যুক্ত তা না জানালে আমি কিছুই বলব না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঠিক আছে, 'আপনি বলে দিলে আমরাও বলে দিব।'

সে বলল, 'এটা ওটার বিনিমিয় তো?'

তিনি উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ'

সে তখন বলল, 'আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীরা অমুক দিন মদীনা থেকে বের হয়েছেন। সংবাদ দাতা, আমাকে সঠিক বলে থাকলে আজ তারা অমুক জায়গায় রয়েছেন।

সে ঠিক ঐ জায়গাটিরই নাম ঠিকানা বলে দিল যেখানে ঐ সময় মুসলিম বাহিনী অবস্থান করছিলেন।

তারপর সে বলল, আমি এটাও অবগত হয়েছিল যে, কুরাইশ বাহিনী অমুক দিন মক্কা থেকে বের হয়েছে সংবাদ দাতা আমাকে সঠিক সংবাদ বলে থাকলে তারা আজ অমুক জায়গায় অবস্থান করছে।'

সে ঠিক ঐ জায়গারই নাম বলল, যেখানে ঐ সময় কুরাইশ বাহিনী অবস্থান করছিল।

বৃদ্ধ নিজের কথা শেষ করে বলল, 'আচ্ছা তবে এখন বলুন, আপনারা কোন সম্প্রদায়ভূক্ত।'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমরা এক পানি হতেই (উদ্ভূত)।'

এ কথা বলেই তিনি ফিরে চললেন। আর বক্ বক্ করতেই থাকল, কোন পানি হতে? ইরাকের পানি হতে কি?

মক্কা বাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যলাভ (الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي) ঃ

ঐ দিনই সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নতুনভাবে এক গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনীর ব্যবস্থাপনার জন্য আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ), যুবায়ের ইবনু আওয়াম (রাঃ) এবং সা'দ ইবনু আক্কাস (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। এ গোয়েন্দা বাহিনী সরাসরি বদরের প্রস্রবণে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে দুজন গোলাম মক্কা বাহিনীর জন্য পানির পাত্র পূর্ণ করছিল। মুসলিম গোয়েন্দা বাহিনী এ দুজন পানি বাহককে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির করেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতরত ছিলেন। উপস্থিত সাহাবীগণ ঐ গোলামদ্বয়কে বিভিন্ন ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। উত্তরে তারা বলল যে, 'আমরা কুরাইশদের পানি বাহক। পাত্রে পানি ভর্তি করে আনার জন্য তারা আমাদের পাঠিয়েছিল।

তাদের এ জবাবে সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাদের আশা ছিল যে, এরা দুজন হবে আবু সুফিয়ানের লোক। কেননা, তাদের অন্তরে তখনো এ ক্ষীণ আশা বিরাজমান ছিল যে, তারা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার উপর জয়যুক্ত হবেন। সুতরাং তারা ঐ গোলামদ্বয়কে কিছু মারপিটও করেন। তারা তখন বাধ্য হয়ে বলল যে, তারা আবু সুফিয়ানের কাফেলার লোক। এ কথা বলার পর তাদের মারপিট বন্ধ করা হয়।

ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায় শেষ করেছেন। সাহাবীগণের এহেন আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'গোলামদ্বয় যখন সত্য কথা বলল, তখন তোমরা তাদের মারপিট করলে, অথচ যখন মিথ্যা কথা বলল তখন তাদের ছেড়ে দিলে। আল্লাহর কসম! তারা দুজন সঠিক কথাই বলেছিল যে, তারা কুরাইশের লোক।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ গোলাম দ্বয়কে বললেন, আচ্ছা এখন আমাকে কুরাইশদের সম্পর্কে খবর দাও।'

তারা বলল, 'ঐ যে টিলাটি, যা উপত্যকার শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, কুরাইশরা তারই অবস্থান করছে।'

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তারা কতজন আছে"? উত্তরে তারা বলল, 'অনেক'।

তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সংখ্যা কত?' 'আমাদের তা জানা নেই।'

তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'প্রত্যহ কটি উট জবেহ করা হয়?'

তারা জবাব দিল, 'একদিন নয়টি এবং দশটি"। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্তব্য করলেন, 'তাহলে তো তাদের সংখ্যা নয়শ ও এক হাজারের মাঝামাঝি হবে।'

তারপর তিনি তাদেরকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তাদের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের কে কে আছে"?

উত্তরে তারা বলল, 'রাবীয়ার দু'পুত্র উৎবা ও শায়বা আবুল বাখতারী ইবনু হিশাম, হাকীম ইবনু হিযাম, নাওফাল ইবনু খুওয়াইলিদ, হারিস ইবনু আমির, তোআইমাহ ইবনু আদী, নাযর ইবনু হারিস, যামআহ ইবনু আসওয়াদ, আবু জাহল ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালফ এবং আরও অনেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরো গুলোকে তোমাদের পাশে এনে নিক্ষেপ করেছে।'

রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ (نزول المطر) ঃ

মহা মহিমান্বিত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাত্রেই বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। মক্কা বাহিনীর উপর বর্ষিত হল সেই বৃষ্টির ধারা মুষল ধারে। প্রবল বৃষ্টির কারণে মক্কা বাহিনীর অগ্রগমন কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর উপর তা বর্ষিত হল আল্লাহ পাকের বিশেষ এক রহমত রূপে। আল্লাহর রহমতের এ বৃষ্টি শয়তানের সৃষ্ট অপবিত্রতা থেকে মুসলিমদের পবিত্র করে এবং ভূমিকে সমতল ও মসৃন করে। এর ফলে বেশ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। পদচারণার ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি কারণে তাদের অন্তরেও দৃঢ়তার ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়।

গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রস্থলের দিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগমন
(الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية) ঃ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত পথে চলার নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা মুশরিক বাহিনীর পূর্বেই বদরের প্রস্রবণের নিকট পৌঁছে যান এবং প্রস্রবণের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মুশরিক বাহিনী যাতে কোনভাবেই প্রস্রবণের উপর অধিকার লাভ করতে না পারে সেটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে তিনি এবং তাঁর বাহিনী এশার সময় বদরের নিকট অবতরণ করেন। এ সময় হাব্বাব ইবনু মুনযির (رضي الله عنه) একজন অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রশ্ন করলেন। 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ স্থানে আপনি আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে অবতরণ করেছেন, না শুধু যুদ্ধের কৌশল হিসেবেই আপনি এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। 'কেননা এর অগ্র কিংবা পশ্চাদগমনের আমাদের কোন সুযোগ নেই"?

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শুধু যুদ্ধের কৌশল হিসেবেই আমি এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি।'

এ কথা শুনে হাব্বাব (رضي الله عنه) বললেন, 'এটা উপযুক্ত স্থান নয়। আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলুন এবং কুরাইশ বাহিনীর সব চাইতে নিকটে যে প্রস্রবণ রয়েছে সেখানে শিবির স্থাপন করুন। তারপর অন্যান্য সব প্রস্রবণ বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের প্রস্রবণের উপর চৌবাচ্চা তৈরি করে তাতে পানি ভর্তি করে নেব। এরপর কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে আমরা পানি পাব কিন্তু তারা তা পাবে না।

তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীকে অগ্রগমনের নির্দেশ প্রদান করলেন এবং অর্ধেক রাত যেতে না যেতেই কুরাইশ বাহিনীর সব চাইতে নিকটবর্তী প্রস্রবণের নিকট পৌঁছে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। তারপর সেখানে একটি চৌবাচ্চা বা জলাধর তৈরি করে নিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত প্রস্রবণ বন্ধ করে দিলেন।

নেতৃত্বের কেন্দ্র (مقر القيادة) ঃ

প্রস্রবণের উপর মুসলিম বাহিনীর যখন শিবির স্থাপন কাজ সম্পন্ন হল তখন সা'দ ইবনু মুআয (رضي الله عنه) প্রস্তাব করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৈন্য পরিচালনা বা নেতৃত্ব প্রদানের কেন্দ্রস্থল রূপে একটি ছাউনী নির্মাণ করে দেয়া হোক, যেখানে তিনি অবস্থান করবেন। আল্লাহ না করুন বিজয়ের পরিবর্তে আমাদেরকে যদি পরাজিত হতে হয় কিংবা অন্য কোন অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে পূর্ব থেকেই তাঁর নিরাপত্তার জন্য আমরা যেন প্রস্তুত থাকতে পারি। তাঁর এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হলো তারপর তাঁরা আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা আপনার জন্য একটি বস্ত্রের ছাউনী নির্মাণ করার মনস্থ করেছি। আপনি ওর মধ্যে অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলো পাশে তৈরি অবস্থায় থাকবে। তারপর আমরা শত্রুদের সঙ্গে মোকাবেলা করব। যদি আল্লাহ পাক আমাদের মান মর্যাদা রক্ষা করে শত্রুদের উপর বিজয় দান করেন তবে সেটা তো হবে আমাদের একান্ত আকাঙ্খিত ও পছন্দনীয়। আর আল্লাহ না করুন যদি আমরা অন্য অবস্থার সম্মুখীন হই তবে আপনি সওয়ারীর উপর আরোহন করে আমাদের কওমের ঐ সকল লোকের নিকট চলে যাবেন যারা পিছনে রয়ে গেছেন। হে আল্লাহর নবী ﷺ! প্রকৃতপক্ষে আপনার পিছনে এরূপ লোকেরা রয়েছেন যাঁদের তুলনায় আপনার প্রতি আমাদের ভালবাসা বেশী নয়। যদি তারা অনুমান করতে পারতেন যে, আপনি যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে

পড়বেন তবে কখনই তারা পিছনে থাকতেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে আপনাকে হিফাযত করবেন। তাঁরা আপনার শুভাকাঙ্খী এবং তাঁরা আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করবেন।'

তাঁদের এ কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশী হলেন ও তাদের প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের কল্যাণের জন্যে দুআ করলেন।

সাহাবীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তর পূর্বে একটি উঁচু টিলার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আরীশ (তাবু) নির্মাণ করলেন যেখান থেকে পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রটি দৃষ্টি গোচর হতো। তারপর তাঁর ঐ আরীশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সা'দ ইবনু মুআয (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্ব আনসারী যুবকদের একটি বাহিনী নির্বাচন করা হলো।

সেনা বিন্যাস ও রাত্রি যাপন (تعبئة الجيش وقضاء الليل) ঃ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করেন[1] এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা ইশারা করে করে যাচ্ছিলেন, 'এটা হবে ভাবীকাল ইনশাআল্লাহ[2] অমুকের বধ্যভূমি এবং এটা আগামী কাল হলে ইনশাআল্লাহ অমুকের বধ্যভূমি।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি গাছের মূলের পাশে রাত্রি যাপন করেন এবং মুসলিমরাও পূর্ণ শান্তিতে রাত্রি অতিবাহিত করেন। তাঁদের অন্তর আল্লাহর উপর ভরসায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁদের এ আশা ছিল যে, প্রত্যুষেই তাঁরা স্বচক্ষে প্রতিপালকের শুভ সংবারে বাণী দেখতে পাবেন। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال:١١].

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তাঁর নিকট হতে প্রশান্তি ধারা হিসেবে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছিলেন, আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছিলেন তোমাদেরকে তা দিয়ে পবিত্র করার জন্য। তোমাদের থেকে শায়ত্বনী পংকিলতা দূর করার জন্য, তোমাদের দিলকে মজবুত করার জন্য আর তা দিয়ে তোমাদের পায়ের ভিত শক্ত করার জন্য।' (আল-আনফাল ৮ : ১১)

এ রাতটি ছিল হিজরী ২য় সনের ১৭ই রমাযানের জুমঅর রাত। ঐ মাসেরই ৮ই অথবা ১২ই তারীখে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে মক্কা সৈন্যদের আগমন এবং তাদের পারস্পারিক মতানৈক্য

(الجيش المكي في عرصة القتال، ووقوع الانشقاق فيه) ঃ

অপরপক্ষে কুরাইশরা উপত্যকার বাইরে দিকে তাদের শিবিরে রাত্রি যাপন করে। আর প্রত্যুষে পুরো বাহিনী সহ টিলা হতে অবতরণ করে বদরের দিকে রওয়ান হয়। একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউযের দিকে অগ্রসর হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাদেরকে ছেড়ে দাও।' তাদের মধ্যে যেই পানি পান করেছিল সেই এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। শুধু হাকীম ইবনু হিযামের প্রাণ বেঁচেছিল। সে পরে মুসলিম হয়েছিল এবং পাকা মুসলিমই হয়েছিল। তার নিয়ম ছিল যে, যখন সে দৃঢ় শপথ করত তখন বলত ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আমাকে বদরের দিন হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

ওদিকে কুরাইশ সৈন্যদলে মহা কোলাহল শুরু হয়েছে। কেউ অহংকার ভরে চিৎকার করছে এবং কেউ ক্রোধভরে মাটিতে পদাঘাত করছে। এ সময় কুরাইশ দলপতির আদেশক্রমে উমায়ের ইবনু অহাব নামক এক ব্যক্তি মুসলিমদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য অশ্বরোহণে তাদের চারদিক প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। স্বদলে ফিরে এসে উমায়ের বলতে শুরু করে।' মুসলিমদের সংখ্যা তিনশর দিকে হবে না এবং তাদের পশ্চাতে সাহায্য করারও

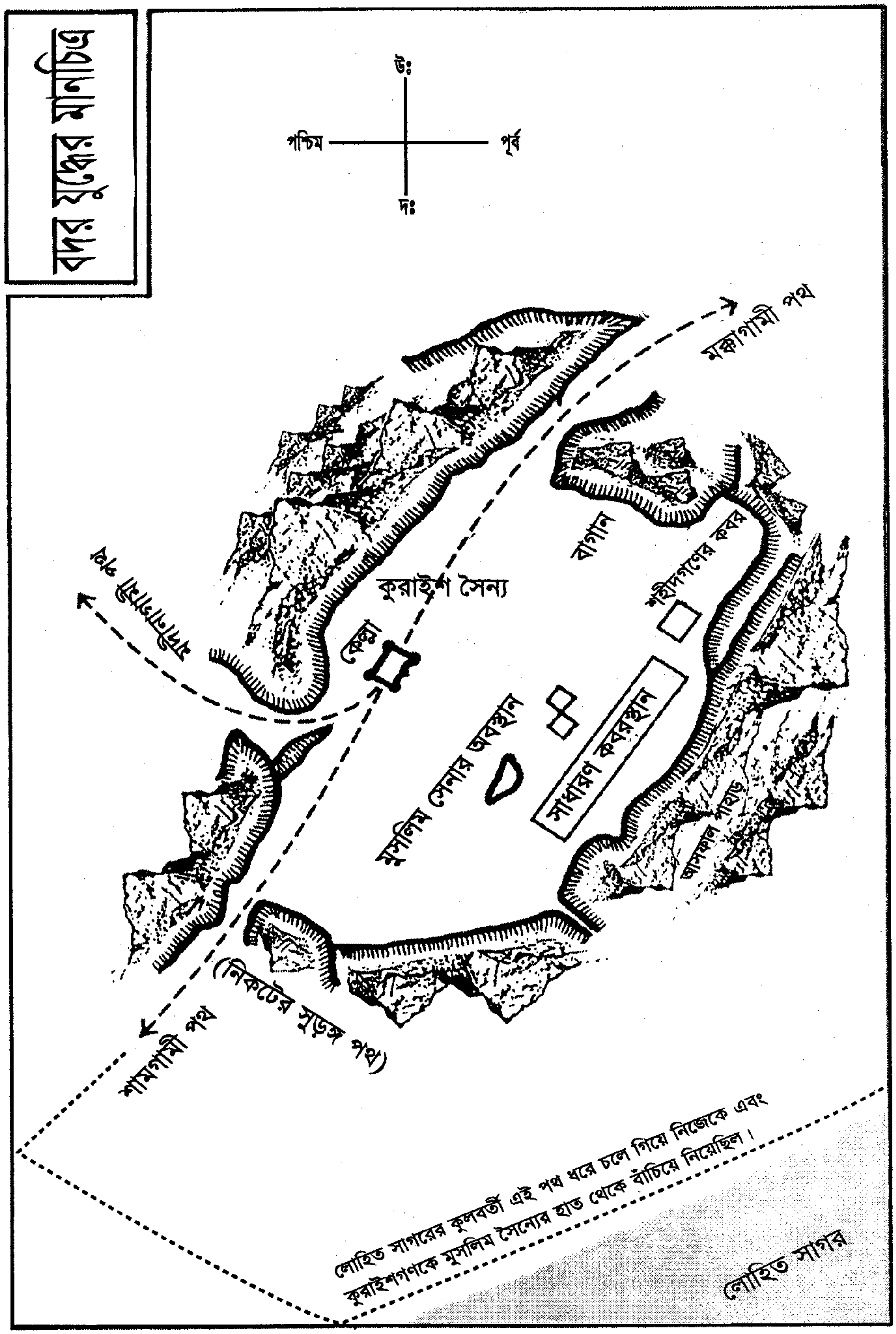
[1] জামে তিরমিযী ১ম খণ্ড আবওয়াবুল জিহাদ, বাবু মা জাআ ফিস সাফফে ওয়াত তা'বিয়াতে ১ম খণ্ড ২০১ পৃঃ।

[2] মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আনাস (رضي الله عنه) হতে, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৪৩ পৃঃ।

কেউ নেই। তরবারী ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে কোন উপকরণ তাদের সাথে নেই, এটাও আমি উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তারা এমন সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি হয়ে আছে যে, আমরা আমাদের একটি প্রাণের বিনিময় ছাড়া তাদের একটি প্রাণনাশ করতে পারবো না। কাজেই এ যুদ্ধে আমাদের পক্ষের অন্তত তিনশত প্রাণ উৎসর্গ না করে আমরা কোন ক্রমেই বিজয় লাভে সক্ষম হব না। যদি তারা আমাদের বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে হত্যা করে ফেলে তবে এর পরে বেঁচে থাকার সাধ আর কি থাকতে পারে? অতএব, আমাদের কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।'

উমায়েরের এ কথা শুনে হাকীম ইবনু হিযাম নামক কুরাইশ দলপতির চৈতন্যোদয় হলো। তিনি দাঁড়য়ে এক নীতি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং সকলকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এ অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনই কারণ নেই, তিনিশত প্রাণ বলি দিয়ে এ যুদ্ধে বিজয় লাভের সার্থকতাও কিছুই নেই। হাকীম বক্তৃতা দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি উৎবাহ ইবনু রাবীআহ নামক কুরাইশ দলপতির নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের মনোভাব কাছে ব্যক্ত করলেন। উৎবাহ হাকীমের কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারল না। হাকীম তখন আশান্বিত হয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনি ধনে মানে কুরাইশের একজন বরেণ্য ব্যক্তি। সুতরাং আপনি একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করে এ অন্যায় যুদ্ধ হতে স্বজাতিকে বিরত রাখুন, তাহলে আরবের ইতিহাসে আপনার নাম চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' উৎবাহ উত্তরে বলল, 'আমি তো প্রস্তুত আছি। এক আমর বিন হাযরামীর (যে সারিয়্যায়ে নাখালাতে মারা গিয়েছিল) রক্তপণ, সেটাও আমি নিজে পরিশোধ করে দিতে পারি। কিন্তু হানযালিয়ার পুত্রকে (আবু জাহল) কোন যুক্তির দ্বারাই বিরত রাখা সম্ভব নয়। যাহোক, তুমি তার কাছে গিয়ে চেষ্টা করে দেখো, তোমার প্রস্তাবে আমার সম্মতি রয়েছে।'

তারপর উৎবাহ দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে লাগল। বলল, 'হে কুরাইশগণ! তোমরা মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ করে কোন বাহাদুরী করবেনা। আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা তাঁদেরকে হত্যা করে ফেল তাহলে এমন চেহেরা সমূহ দেখতে পাওয়া যাবে যেগুলোকে দেখা পছন্দনীয় হবে না। কেননা এ যুদ্ধে হয় চাচাতো ভাই নিহত হবে নতুবা খালাতো ভাই কিংবা নিজের গোত্রেরই লোক নিহত হবে। সুতরাং ফিরে চল এবং মুহাম্মদ ﷺ ও গোটা আরব দুনিয়াকে ছেড়ে দাও। যদি আরবের অন্য লোকেরা মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করে ফেলে তাহলে তো সেটা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত কাজই হবে। অন্যথা মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবেন যে, তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের করণীয় কাজটি করো নি।


বদর যুদ্ধের মানচিত্র
উঃ
পশ্চিম
পূর্ব
দঃ
মক্কাগামী পথ
বাগান
শহীদগণের কবর
কুরাইশ সৈন্য
কেল্লা
মুসলিম সেনার অবস্থান
সাধারণ কবরস্থান
আসফার পাহাড়
(নিকটের সুড়ঙ্গ পথ)
শামগামী পথ
লোহিত সাগরের কুলবর্তী এই পথ ধরে চলে গিয়ে নিজেকে এবং
কুরাইশগণকে মুসলিম সৈন্যের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল।
লোহিত সাগর

এদিকে হাকীম আবু জাহলের নিকট হাযির হয়ে নিজের ও উৎবার মতামত ব্যক্ত করলেন। হাকীমের কথা শুণে আবু জাহলের আপদমস্তক জ্বলে উঠল। সে ক্রোধম্পিত স্বরে বলতে লাগল 'মুহাম্মদ ﷺ-এর যাদু উৎবার উপর বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। ভীরু, কাপুরুষ কুরাইশের কলঙ্ক, আজ যুদ্ধের নামে ভীত হয়ে প্রাণরক্ষার বাহানা খুঁজছে। না, না এতক্ষণ বুঝতে পেরেছি, উৎবার পুত্র মুহাম্মদ ﷺ-এর দলভুক্ত (উৎবার পুত্র আবু হুযাইফা (রাঃ) প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন)। সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত। তার নিহত হওয়ার আশঙ্খায় নরাধম এমন বিচলিত হয়ে পড়েছে। ধিক্ শতধিক তাকে।'

হাকীম তখন আবু জাহলকে সেখানে রেখে উৎবার নিকট গমন করে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। ক্রোধ, অভিমান ও অহংকারে উৎবাহ একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লো। সে বলে উঠল, কি, আমি ভীরু? আমি কাপুরুষ? পুত্রের মায়ায় আমি বীরধর্মে জলাঞ্জলি দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আরববাসী দেখুক, জগদ্বাসী দেখুক যে, কে বীর পুরুষ, আমি ততক্ষণ ফিরব না যতক্ষণ না মুহাম্মাদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়। এ বলে সে স্বদল বলে সমরাঙ্গনে এগিয়ে চলল। আর ওদিকে আবু জাহল ছুটে গিয়ে আমের ইবনু হযরামীকে বলল, 'দেখছ কি, তোমার ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ আর সম্ভব হবে না। কাপুরুষ উৎবাহ স্বদল বলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। শীঘ্র উঠে আর্তনাদ করতে শুরু কর।'

আবু জাহলের কথা শেষ হতে না হতেই আমের তার সকল অঙ্গে ধূলো বালি মাখতে মাখতে এবং গায়ের কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিহত ভ্রাতার নাম নিয়ে আর্তনাদ করে বেড়াতে লাগল। আর যায় কোথায় মুহূর্তের মধ্যে হাকীমের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই রণ পিপাসু মুশরিক বাহিনীর বীভৎস চিৎকার দিগ্বিদিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত এবং রণাঙ্গ প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

মুশরিক ও মুসলিম বাহিনী পরস্পর মুখোমুখী (الجيشان يترآان) ঃ

রণোম্মাদ মুশরিক বাহিনী যখন দৃষ্টি গোচর হল এবং উভয় বাহিনী একে অপরের মুখোমুখী হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(اللَّهُمَّ هذه قريش قد أقبلت بخُيَلائها وفَخْرها تُحَادُّك وتكذب رسولك، اللّٰهُمَّ فنصرك الذي وعدتني، اللّٰهُمَّ أحْنِهُم

[الغداة]

"হে আল্লাহ এ মুশরিক কুরাইশগণ ভীষণ গর্বভরে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করতে করতে এবং তোমার রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে করতে এগিয়ে আসছে। হে আল্লাহ আমরা তোমার সাহায্যপ্রার্থী। হে আল্লাহ তোমার এ দ্বীন দাসদের প্রতি তোমার যে ওয়াদা রয়েছে তা আজ পূর্ণ করে দেখিয়ে দাও।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎবা ইবনু রাবীয়াহকে তার একটি লাল উটের উপর দেখে বললেন,

(إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يَرْشُدُوا)

কওমের মধ্যে কারো কাছে কল্যাণ থাকলে লাল উটের মালিকের কাছে রয়েছে। জনগণ তার কথা মেনে নিলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।'

এ স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সারিগুলো ঠিক করলেন। সারি ঠিক করা অবস্থায় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটি তীর ছিল যা দ্বারা তিনি সারি ঠিক করছিলেন। ঐ সময় সাওয়াদ ইবনু গাযিয়্যাহ সারি হতে কিছু আগে বেড়েছিলেন। তার পেটের উপর তিনি তীরের ছোয়া দিয়ে বললেন, 'হে সাওয়াদ সমান হযে যাও। তখন সাওয়াদ (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে আপনি কষ্ট দিয়েছেন, সুতরাং প্রতিশোধ প্রদান করুন।' তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পেট খুলে দিয়ে বললেন, 'প্রতিশোধ নিয়ে নাও।' সাওয়াদ (রাঃ) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পেটে চম্বুন দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, 'হে সাওয়াদ (রাঃ) তোমার এরূপ করার কারণ কি?' সাওয়াদ (রাঃ) উত্তরে বললেন, 'হে

আল্লাহর রাসূল ﷺ যা কিছু সামনে আছে তা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি চেয়েছি যে, এ স্থানে আপনার সাথে আমার শেষ আদান প্রদান যেন এটাই হয়, অর্থাৎ আমার দেহের চামড়া আপনার দেহের চামড়াকে স্পর্শ করে।' তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যে কল্যাণের দুআ করলেন। সারি সমূহ ঠিক ঠাক হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন যে, তিনি তাদেরকে শেষ নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত যেন তারা যুদ্ধ শুরু না করেন। তারপর তিনি যুদ্ধনীতির ব্যাপারে বিশেষ একটি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'মুশরিকরা যখন সংখ্যা বহুলরূপে তোমাদের নিকট এসে পড়বে তখন তাদের প্রতি তীর চালাবে এবং নিজেদের তীর বাচাবার চেষ্টা করবে' (অর্থাৎ প্রথম থেকেই অযথা তীরন্দাজী করে তীর নষ্ট করবে না।) আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর ছেয়ে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তরবারী উত্তোলন করবে না।[2]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রাঃ) ছাউনির দিকে ফিরে গেলেন এবং সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ) তার রক্ষকবাহিনীকে নিয়ে ছাউনির দরজার উপর নিযুক্ত হয়ে গেলেন।

অপর পক্ষে মুশরিকদের অবস্থা এই ছিল যে, আবু জাহল আল্লাহ তা'আলার নিকট ফায়সালার দুআ করল। সে বলল, 'হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে দলটি আত্মীয়তার বন্ধন বেশী ছিন্নকারী ও ভুল পন্থা অবলম্বনকারী ঐ দলকে তুমি আজ ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল তোমার নিকট বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় আজ তুমি ঐ দলকে সাহায্য কর।' পরবর্তীতে এ কথারই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال:١٩]

"(ওহে কাফিরগণ!) তোমরা মীমাংসা চাচ্ছিলে, মীমাংসা তো তোমাদের কাছে এসে গেছে; আর যদি তোমরা (অন্যায় থেকে) বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর, তোমরা যদি আবার (অন্যায়) কর, আমিও আবার শাস্তি দিব, তোমাদের দল-বাহিনী সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না এবং আল্লাহ তো মু'মিনদের সঙ্গে আছেন।' (আল-আনফাল ৮ : ১৯)

শেষ মুহূর্ত ও যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন (ساعة الصفر وأول وقود المعركة) ঃ

এ যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন ছিল আসওয়াদ ইবনু আবুল আসাদ মাখযুমী। এ লোকটি ছিল বড়ই হঠকারী ও দুশ্চরিত্র। সে একথা বলতে বলতে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে আসলো 'আমি এদের হাউযের পানি পান করব অথবা একে ভেঙে ফেলব নতুবা এজন্যে জীবন দিয়ে দিব।' এ কথা বলে যখন সে ওদিক থেকে বেরিয়ে আসলো তখন এদিক থেকে হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) এগিয়ে আসলেন। হাউযের পাড়েই দুজনের দেখাদেখি হলো। হামযাহ (রাঃ) তাকে এমনভাবে তরবারী দ্বারা আঘাত করলেন যে, তার পা অর্ধ পদনালী হতে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সে পৃষ্ঠভাবে পড়ে গেল। তার পা হতে রক্তের ফোয়ারা ছুটছিল যার গতি তার সঙ্গীদের দিকে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাঁটুর ভরে ছেচড়িয়ে চলে হাউযের দিকে অগ্রসর হলো এবং তাতে প্রবেশ করতেই চাচ্ছিল যাতে তার কসম পুরো হয়ে যায়। ইতোমধ্যে হামযাহ (রাঃ) দ্বিতীয়বার তার উপর তরবারী চালালেন এবং সে হাউযের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

যুদ্ধের সূত্রপাত (المبـــــارزة) ঃ

এটা ছিল এ যুদ্ধের প্রথম হত্যা। এর ফলে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তখন নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যেক পক্ষের বিখ্যাত বীর পুরুষরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে অন্যপক্ষকে স্বমরে আহ্বান করত। তখন ঐ

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৬৮ পৃঃ।

[2] সুনানে আবু দাউদ, বাবু ফী সাল্লিম সুযুফে ইনদাল্লিকা ২/১৩ পৃঃ।

পক্ষের নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা বীর এ আহ্বানের উত্তর প্রদানের জন্যে বীরদর্পে অগ্রসর হতো। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। অভিযান ক্ষুব্ধ উৎবাহ ও তার সহোদর শায়বাহ ও পুত্র ওয়ালীদসহ চীৎকার করতে লাগল। 'কে আসবি আয়, আমাদের তরবারীর খেলা দেখে যা।' তার এ আহ্বান শুনে তিনজন আনসার বীর উলঙ্গ তরবারী হাতে সেই দিকে ধাবিত হলেন। তারা হলেন আউয (رضي الله عنه), মুআব্বিয (رضي الله عنه), এরা দুজন হারিসের পুত্র ছিলেন এবং তাদের মাতার নাম ছিল আফরা। তৃতীয় জন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। কুরাইশরা তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? তাঁরা বললেন, 'আমরা আনসার' তখন তারা বলল, 'আপনাদের আমরা চাচ্ছি না। আমরা আমাদের চাচাতো ভাইদের চাচ্ছি এবং একজন চিৎকার করে বলতে লাগল 'হে মুহাম্মদ ﷺ মদীনার এ চাষাগুলোর সাথে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অসম্মান জনক। আমাদের যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও। তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ এ তিনজন আনসার বীরকে তাদের স্ব- স্ব স্থানে ফিরে যেতে বললেন। তারপর তিনি নিজের পরমাত্মীয়দের মধ্যে হতে হামযাহ (رضي الله عنه), উবাইদাহ বিন হারিস (رضي الله عنه) ও আলী (رضي الله عنه)-কে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা তাদের মোকাবেলায় অগ্রসর হও। এরা অগ্রসর হলে কুরাইশগণ বলল, 'তোমরা কে?' তাঁরা তাদের পরিচয় দান করলেন। কাফিররা তাদেরকে আক্রমণ করল। ওয়ালীদের সাথে আলী (رضي الله عنه)-কে, শায়বার সাথে হামযার (رضي الله عنه) এবং উৎবাহর সাথে উবাইদাহ (رضي الله عنه)-এর যুদ্ধ বেধে গেল। মুহূর্তের মধ্যে শায়বাহ ও ওয়ালীদের মস্তক ভূলণ্ঠিত হয়ে পড়লো। উবাইদাহ (رضي الله عنه) ছিলেন তখন সবার চেয়ে বৃদ্ধ। তিনি ও উৎবাহ পরস্পরে তরবারীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে আলী ও হামযাহ (رضي الله عنهما) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে এসে উৎবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা কাজ শেষ করেন ও উবাইদাহকে তুলে আনলেন। তার মুখে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছিল এবং ক্রমাগতভাবে বন্ধই থাকল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ৪র্থ বা ৫ম দিন যখন মুসলিমরা মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে সাফরা নাম উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন ঐ সময় উবাইদাহ (رضي الله عنه) মৃত্যুবরণ করেন।

আলী (رضي الله عنه) আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, 'এ আয়াতটি আমাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়,

﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ الآية [الحج:١٩].

"এরা বিবাদের দু'টি পক্ষ, (মু'মিনরা একটি পক্ষ, আর সমস্ত কাফিররা আরেকটি পক্ষ) এরা এদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে।' (আল-হাজ্জ ২২ : ১৯)

সাধারণ আক্রমণ (الهجوم العام) ঃ

এ মল্ল যুদ্ধের পরিণাম মুশরিকদের জন্য খুবই মন্দ সূচনা ছিল। তারা একটি মাত্র লম্ফনে তাদের তিন জন বিখ্যাত অশ্বরোহী নেতাকে হারিয়ে বসেছিল। এ জন্যে তাঁরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে একত্রিতভাবে মুসলিমগণকে আক্রমণ করল।

অপর দিকে মুসলিমরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করার পর স্ব স্ব স্থানে অটল থাকলেন এবং প্রতিহত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা মুশরিকদের একাদিক্রমিক আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন এবং তাঁদের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে চললেন। তাদের মুখে আহাদ আহাদ শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকুল প্রার্থনা (الرسول ﷺ يناشد ربه) ঃ

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস কাজ শেষ করে ফিরে এসই স্বীয় মহান প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের ওয়াদ পূরণের প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনা ছিল,

(اللَّهُمَّ أنجز لي ما وعدتني، اللَّهُمَّ إني أنشدك عهدك ووعدك)،

তারপর যখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন তিনি এ প্রার্থনা করলেন।

(اللَّهُمَّ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللَّهُمَّ إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا)

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করলেন এবং তিনি এমন আত্মভোলা হয়ে পড়লেন যে, তাঁর চাদর খানা তাঁর কাঁধ হতে পড়ে গেল। তখনও তিনি পূর্ববত তন্ময়ভাবে প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকলেন। এ দৃশ্য দেখে ভক্ত প্রবর আবু বকর (رضي الله عنه) দ্রুত ছুটে আসলেন এবং চাদরখানা দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত ক'রে তাকে আলিঙ্গন করে বলতে লগালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ যথেষ্ট হয়েছে। বড়ই কাতর কণ্ঠে আপনি প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছেন। এ প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। শীঘ্রই তিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করবেন।' এদিকে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদেরকে ওহী করলেন,

﴿أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ [الأنفال: ١٢]

'স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি; অতএব মু'মিনদেরকে তোমরা দৃঢ়পদ রেখ। অচিরেই আমি কাফিরদের দিলে ভীতি সঞ্চার করব, কাজেই তাদের স্কন্ধে আঘাত হান, আঘাত হান প্রত্যেকটি আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে।' [আল-আনফাল (৮) : ১২]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন,

﴿أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال:٩]

'আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব যারা পর পর আসবে।' [আল-আনফাল (৮) : ৯]

ফেরেশ্তাদের আবতরণ (نزول الملائكة) ঃ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটু তন্দ্রা আসলো। তারপর তিনি স্বীয় মস্তক মুবারক উঠিয়ে বললেন,

(أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثَنَايَاه النَّقْعُ)

'আবু বকর (رضي الله عنه) খুশী হও। ইনি জিবরাঈল, (عليه السلام) তার দেহ ধূলো বালিতে ভরপুর।' ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

(أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثناياه النقع)

'আবু বকর (رضي الله عنه) আনন্দিত হও, তোমাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। ইনি জিবরাঈল (عليه السلام), তিনি স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে ওর আগে আগে চলে আসছেন। তারদেহ ধূলো বালিতে পরিপূর্ণ রয়েছে।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাউনির দরজা হতে বাইরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন। পূর্ণ উত্তেজনার সাথে তিনি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেন,

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر:٤٥]

" এ সংঘবদ্ধ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে আর পিছন ফিরে পালাবে।' (আল-ক্বামার ৫৪ : ৪৫)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুষ্টি পাথুরে মাটি নিলেন এবং কুরাইশদের দিকে মুখ করে বললেন, (شاهت الوجوه) 'চেহারাগুলো বিকৃত হকো"। আর একথা বলার সাথে সাথেই ঐ মাটি তাদের চেহারার দিকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর মুশরিকদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যা চক্ষুদ্বয়ে, নাসারন্ধে ও মুখে ঐ এক মুষ্টি মাটির কিছু না কিছু যায় নি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ [الأنفال:١٧].

"তুমি যখন নিক্ষেপ করছিলে তা তো তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।' (আল-আনফাল ৮ : ১৭)

পাল্টা আক্রমণ (الهجوم المضاد) ঃ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

(والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة)

"তোমরা আক্রমণ চালাও। যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ রয়েছে সেই সত্ত্বার শপথ! এদের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধে অটল থেকে যুদ্ধ করাকে সওয়াব বা পুণ্য মনে করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পিছপা না হয়ে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে অবশ্য অবশ্যই জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে গিয়ে আরো বলেন,

(قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض)،

"তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে উঠে যাও যার প্রস্থ আসমান ও যমীনের সমান।'

একথা শুনে উমায়ের ইবনু হাম্মাম (রা.) বললেন, 'খুব ভাল! খুব ভাল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এ কথা কেন বললে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি আশা রাখি যে, আমিও ঐ জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত হবো, এছাড়া অন্য কোন কথা নয়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন 'হ্যাঁ তুমিও ঐ জান্নাতবাসীদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।' তারপর তিনি তার খাদ্য থলে হতে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেণন, 'যদি আমি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে এটাও তো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে।' সুতরাং তিনি তার কাছে যে খেজুরগুলো ছিল সেগুলো ফেলে দিলেন। তারপর মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

এভাবেই খ্যাত নামা মহিলা আফরার (রা.) পুত্র আউফ ইবনু হারিশ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কোন কাজে খুশী হয়ে হেঁসে থাকেন"? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তিনি বান্দার ঐ কাজে খুশী হয়ে হেঁসে থাকেন যে, সে অনাবৃত দেহে (যদ্ধে দেহ রক্ষক পোষাক পরিধান না করেই) স্বীয় হাত শত্রুদের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়' একথা শুনে আউয (রা.) দেহ হতে লৌহবর্ম খুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন এবং তরবারী নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।[1]

যে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে শত্রুদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা হ্রাস পেয়েছিল এবং তাদের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এজন্য এ কৌশলপূর্ণ পরিকল্পনা মুসলিমদের অবস্থান দৃঢ় করতে খুবই ক্রিয়াশীল হয়েছিল কেননা, সাহাবীগণ (রা.) যখন আক্রমণ করার দির্দেশ পেলেন তখন ছিল তাঁদের জিহাদের উত্তেজনার যৌবনকাল। তাই তাঁরা এক দুর্দমনীয় ও ফায়সালাকারী আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তাঁরা শত্রুদের সারিগুলোকে তচনচ ও এলোমেলো করে দিয়ে তাদের গলা কেটে কেটে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বর্ম পরিহিত অবস্থায় লাফাতে লাফাতে আসতে দেখে এবং শ্রীঘ্রই তারা পরাজিত হবে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে, একথা স্পষ্টভাবে বলতে শুনে তাঁদের উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেলো। এ জন্যেই মুসলিমরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন এবং ফেরেশ্‌তারাও তাঁদেরকে সাহায্য করলেন। যেমন ইবনু সা'দের বর্ণনায় ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ দিন মানুষের মস্তক কেটে পড়ত, অথচ কে কেটেছে তা জানা যেত না এবং মানুষের হাত কর্তিত হয়ে পড়ে যেত, অথচ কে কর্তন করেছে তা জানা যেত না।

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন মুসলিম একজন মুশরিককে তাড়া করছিলেন। হঠাৎ ঐ মুশরিকের উপর চাবুক মারার শব্দ শোনা গেল এবং একজন অশ্বরোহীর শব্দ শোনা গেল, যিনি বলছিলেন। 'সম্মুখে অগ্রসর হও।' মুসলিম মুশরিকটিকে তাঁর সামনে দেখলেন যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, তিনি লাফ দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তার নাকের উপর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং অবয়র ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যেন চাবুক দ্বারা আঘাত করা হয়েছে। ঐ আনসারী মুসলিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলেছো। এটা ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায্য।'[2]

---

[1] মুসলিম শরীফ ২/১৩৯ পৃঃ, মিশকাত ২/৩৩১ পৃঃ।

[2] মুসলিম শরীফ ২/৯৩ পৃঃ।

আবু দাউদ মাযেনী বলেন, 'আমি একজন মুশরিককে মারার জন্যে তাড়াতাড়ি করছিলাম। অকস্মাৎ তার মস্ত কটি, আমার তরবারী ওর উপর পৌছার পূর্বে কেটে পড়ে যায়। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, তাকে আমি নই, বরং অন্য কেউ হত্যা করেছে।'

একজন আনাসারী আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তখন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি। আমাকে তো একজন চুলবিহীন মাথাওয়ালা লোক যিনি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর এবং একটি বিচিত্র বর্ণের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন তিনি আমাকে বন্দী করেছিলেন। তাকে এখন আমি লোকজনদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না ।' আনসারী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তাকে আমি বন্দী করেছি।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(اسكت فقد أيدك الله بملك كريم)

"চুপ করো, আল্লাহ এক সম্মানিত ফেরেশ্‌তা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন।'

ময়দান হতে ইবলীসের পলায়ণ (إبليس ينسحب عن ميدان القتال) ঃ

যেমনটি আমরা বলে এসেছি, অভিশপ্ত ইবলিস সোরাকা বিন মালেক বিন জুশুম মুদলিজীর সুরতে এসেছিল এবং এতক্ষণ পর্যন্তও সে মুশরিকগণ হতে পৃথক হয় নাই। কিন্তু যখন সে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশ্‌তাগণের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল তখন সে পিছনে ফিরে পলায়ণ করতে থাকল। কিন্তু হারেস বিন হিশাম তাকে আটকিয়ে রাখল। তার বিশ্বাস যে, সে প্রকৃতই সোরাকা। কিন্তু ইবলীস তার বুকে এত জোরে ঘুষি মারল যে, সে মাটিতে পড়ে গেল। ইত্যবসরে ইবলিস সেখান থেকে পলায়ণ করল। মুশরিকগণ বলতে লাগল, 'সোরাকা কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বল নি যে, তুমি আমাদের সাহায্য করবে এবং কখনই আমাদের থেকে পৃথক হবে না?'

সে বলল,

﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال:٤٨]

"আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছনা। আল্লাহকে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। তিনি কঠিন শাস্তির মালিক।' [আল-আনফাল (৮) : ৪৮]

এরপর পলায়ণ করে সে সমুদ্রের ভিতরে যেতে থাকল।

সাংঘাতিক পরাজয় (الهزيمة الساحقة) ঃ

অল্পক্ষণের মধ্যেই মুশরিকগণের সৈন্য বাহিনীতে অকৃতকার্যতা ও দুর্ভবানার বিভিন্ন লক্ষণ পরিষ্ফুট হয়ে উঠল। মুসলিমদের কঠিন এবং অবিরাম আক্রমনের নির্ধারণের নিকটবর্তী হয়ে আসতে থাকল। এমনকি তারা দৌঁড় দিয়ে পিছু হটতে লাগল। এ সুযোগে মুসলিম বাহিনী তাদের হত্যা জখম ও বন্দী করতে করতে পিছু পিছু ধাওয়া করে চলল। এমনকি দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হল।

আবু জাহলের হঠকারিতা (صمود أبي جهل) ঃ

কিন্তু বড় তাগুত আবু জাহল যখন নিজ সারির সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রত্যক্ষ করল তখনও সে নিজ অবস্থানে সুদৃঢ় থাকার মনস্থ করল। কাজেই সে নিজ দলের সৈন্যগণকে উচ্চ কণ্ঠে এবং আত্মম্ভরিতার সঙ্গে বলতে থাকল যে, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোরাকার সরে পড়ার কারণে তোমরা মনোবল হারিয়ে না যেন, কারণ সে পূর্ব হতেই মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। উৎবাহ, শায়বা এবং ওয়ালীদের হত্যার কারণেও তোমাদের ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাড়াহুড়োর মধ্যে কাজ করতে গিয়েই তাদের এ অবস্থা হয়েছে। লাত ও উয্যার শপথ! তাদেরকে রশি দ্বারা শক্ত করে বেধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা প্রত্যাবর্তন করব না। দেখ, তোমাদের কোন ব্যক্তি তাদের কাউকেও যেন হত্যা না করে। আমরা যেন তাদেরকে অন্যায়ের শাস্তি দিতে পারি এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে ধর এবং বন্দী কর।'

কিন্তু তার এ অসার অহমিকার প্রতিফল শীঘ্রই তাকে **অনুধাবন করতে হল। কারণ** মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিমদের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল এবং **কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের প্রতিরক্ষা** বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল। কিন্তু আবু জাহল তার চতুষ্পাশের একদল জনতাকে **বেশ সংঘবদ্ধ অবস্থাতেই** রেখে ছিল। এ জনতা তার চতুর্দিকে তরবারীর প্লাবন ও বর্শার জঙ্গল সৃষ্টি করে রেখেছিল। **কিন্তু ইসলামী জনতার** প্রলয়ঙ্কারী তুফান তার তরবারীর প্লাবন এবং বর্শার জঙ্গলকে একদম তচনচ করে **ফেলল। তারপর এ বড় তাগুত** মর্দে মু'মিনদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেল। মুসলিম সৈন্যরা দেখতে পেলেন যে, **সে এক ঘোড়ার টিঠে চড়ে** চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে আনসারী যুবকের হাতে তার মৃত্যু রক্ত চুষে নেয়ার অপেক্ষায় **ছিল।**

আবু জাহলের হত্যা (مصرع أبي جهل) ঃ

আব্দুর রহমান বিন আওফ হতে বর্ণিত আছে যে, 'বদরের যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের **সারিতে ছিলাম।** এমতাবস্থায় হঠাৎ ডানে এবং বামে অল্প বয়স্ক দুজন যুবককে দেখতে পেলাম। তাদের উপস্থিতিতে **আমি নিজেকে** নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এমন অবস্থায় ওদের একজন তার সঙ্গীকে এড়িয়ে আমার **কাছে এসে বলল।** 'চাচাজান আবু জাহল কোনটি, আমাকে দেখিয়ে দিন।'

আমি বললাম, 'ভাতিজা, তাকে তোমার কি প্রয়োজন।' সে বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মন্দ বলেছে। সেই সত্তার কসম! যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু পূর্বে অবধারিত হয়েছে সে মৃত্যুবরণ না করবে ততক্ষণ আমার অস্তিত্ব তার অস্তিত্ব থেকে পৃথক হবে না।'

তিনি বলেছেন যে, 'আমি তার এ কথায় একদম অভিভূত হয়ে পড়লাম।'

তিনি আরও বলেছেন যে, 'দ্বিতীয় জনও এসে ইঙ্গিতে আমাকে ঐ একই কথাই বলল। তারপর আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, আবু জাহল লোকজনদের মাঝে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম আরে দেখছ না, ঐ যে, তোমাদের শিকার যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে।'

তিনি বর্ণনা করেছেন যে, 'এ কথা শোনা মাত্র তারা উভয়ে তরবারী নিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে চলল এবং সেই কুখ্যাত নরাধমকে হত্যা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করল।'

নবী কারীম ﷺ বললেন, 'তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ?'

তারা উভয়েই বলল, 'আমি হত্যা করেছি।'

নবী কারীম ﷺ পুনরায় বললেন, 'তোমরা কি নিজ নিজ তরবারী মুছে ফেলেছ?'

তারা বলল, 'না"।

তারপর নবী কারীম ﷺ উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, 'তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।'

অবশ্য আবু জাহলের সামান অর্থাৎ জিনিসপত্রগুলো তিনি মুআয বিন আমর বিন জামুহকে প্রদান করেন। আবু জাহলের এ দু'হত্যকারীর নাম হল, (১) মুআয বিন আমর বিন জামুহ এবং (২) মুআয বিন আফরা।[1]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, মুআয বিন আমর বিন জামুহ বলেছেন, 'আমি মুশরিকদিগকে আবু জাহল সম্পর্কে বলতে শুনলাম যে, সে ঘন গাছগুলোর মতো বর্শা ও তরবারীর ভিড়ের মধ্যে ছিল। তারা একথাও **বলছিল** যে, আবুল হাকাম পর্যন্ত কেউ পৌছিতে পারবে না।'

মুআয বিন আমর আরও বলেছেন যে, 'যখন আমি একথা শুনলাম তখন তাকে আমার লক্ষ্যের **কেন্দ্রবিন্দুতে** নিয়ে নিলাম এবং তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে রাখলাম। তারপর যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম তখনই **আক্রমণ**

---

[1] সহীহ বুখারী ১/৪৪৪ পৃঃ, ২/৫৬৮ পৃঃ, মিশকাত ২/৩৫২ পৃঃ, অন্য বর্ণনায় দ্বিতীয় নাম মোযাওয়ায বিন আফরা বলা হয়েছে। **ইবনে হিশাম ১ম** খণ্ড ৬৩৫ পৃঃ, আবু জাহলের জিনিসপত্র এক জনকে এ কারণে দেয়া হয়েছিল যে, পরে মুআয (মুআওয়ায) সেই যুদ্ধেই শহীদ **হয়েছিলেন। তবে** আবু জাহলের তরবারী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে দেয়া হয়েছিল। কারণ, সেই তার মাথা মরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। **দ্রঃ সুনানে আবু দাউদ,** বাবু মান আজাযা আলা জীবীহিন ২য় খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ।

করে বসলাম এবং এমনভাবে আঘাত করলাম যে, তার পা দ্বিখণ্ডিত হয়ে খুলে পড়ে গেল। আল্লাহর কসম! যখন তার পায়ের অর্ধাংশ খুলে পড়ে গেল তখন আমি তার সাদৃশ্য শুধু ঐ ফলের বীচি দ্বারা বর্ণনা করতে পারি যা হাতুড়ির সাহায্যে আলগা করা হয় এবং এর এক অংশ থেকে অন্য অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, 'এদিকে আমি যখন আবু জাহলকে আঘাত করলাম অন্য দিকে তখন তার ছেলে ইকরামা আমার কাঁধে তরবারীর আঘাত করল এবং তাতে আমার হাত কেটে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে গেল এবং যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আমি তাকে পিছনে টেনে নিয়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ করতে থাকলাম। কিন্তু সে যখন আমাকে খুবই কষ্ট দিতে লাগল তখন আমি তার উপর আমার পা রেখে জোরে টান দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম।[1]

এরপর আবু জাহলের নিকট পৌঁছে যান মুআয বিন আফরা। তিনি তাকে এত জোরে আঘাত করেন যে, তার ফলে সে সেখানেই স্তূপে পরিণত হয়ে যায়। সে সময় শুধু তার শ্বাসঃপ্রশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। এরপর মুআয বিন আফরা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, 'কে আছ এমন যে, দেখে আসবে আবু জাহলের অবস্থা কি হল। এ কথা শুনে সাহাবীগণ (রা.) তার খোঁজে বিক্ষিপ্তভাবে নানাদিকে চলে গেলেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তাকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তখনো তার শ্বাস-প্রশ্বাস যাওয়া আসা করছিল। তিনি তার গ্রীবার উপর পা রেখে মাথা কেটে নেয়ার জন্য দাড়ি ধরলেন এবং বললেন, 'ওহে আল্লাহর শত্রু! শেষে আল্লাহ তোমাকে এভাবে অপমানিত করলেন? সে বলল, 'আমাকে কি প্রকারে লাঞ্ছিত করলেন?' যে ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করছো তার চেয়ে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন লোক কেউ আছে কি? অথবা যে লোকটিকে তোমরা হত্যা করছো তার চেয়ে উঁচু সম্মানের কোন লোক আছে কি?' তারপর সে বলল, 'যদি আমাকে কৃষকরা ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করত তবে কতই না ভাল হতো!' তারপর সে বলল, 'আচ্ছা, আমাকে বলত আজ বিজয় লাভ কার হয়েছে?' আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ এবং তার রাসূল -এর।' তারপর সে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ -কে বলল, যিনি তার গ্রীবার উপর পা রেখে ছিলেন, হে বকরীর রাখাল! তুমি বড়উ উঁচু ও কঠিন জায়গায় চড়ে গিয়েছো। প্রকাশ থাকে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ মক্কায় বকরী চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ তার মস্তক কেটে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ -এর খিদমতে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দিলেন এবং আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল এটা আল্লাহর শত্রু আবু জাহলের মস্তক।' রাসূলুল্লাহ তিনবার বলেলেন,

(الله الذي لا إله إلا هو؟)

"সত্যিই, ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই।' তারপর বললেন,

(الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه)

অর্থ ঃ আল্লাহ সবচেয়ে মহান। ঐ আল্লাহর সমুদ্বয় প্রশংসা যিনি তার ওয়াদাকে সত্য প্রমানিত করেছেন। স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন।'

এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন, 'চলো আমাকে তার মৃত দেহ দেখাও।' (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, 'আমি তাকে নিয়ে গিয়ে তার মৃতদেহ দেখালাম। তিনি বললেন, 'ঐ ব্যক্তি এ উম্মতের ফিরাউন।'

ঈমানের উজ্জ্বলতায় গৌরবোজ্জ্বল চিত্রাবলী (من روائع الإيمان في هذه المعركة) ঃ

উমায়ের ইবনু হাম্মাম এবং আউফ ইবনু হারিস ইবনু আফরা'র ঈমান দীপ্ত চরিত কথার বিষয়াবলী ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এ যুদ্ধে পদে পদে এমন সব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে যেগুলোতে

---

[1] মুআয বিন আমর বিন জামুহ, ওসমান -এর খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ঈমানী শক্তি ও মৌলিক নীতিমালার পরিপক্কতা সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে দল বিভাগ বা শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে, আর মূল নীতির ব্যাপারে মতানৈক্যের কারণে তরবারী কোষমুক্ত হয়েছে। এভাবে অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীরও উপর আঘাত হেনে ক্রোধাগ্নি প্রশমিত করেছে। পরবর্তী আলোচান থেকে এর যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

১. ইবনু ইসহাক ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম ﷺ সাহাবীগণ (রা.)-কে বলেন, (إني قد عرفت أن رجالًا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهًا، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدًا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البَخْتَرِيّ بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرهًا)

'আমি জানি যে, বনু হাশেম এবং আরও কোন কোন গোত্রের কতগুলো লোককে জোর করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনয়ন করা হয়েছে। আমাদের যুদ্ধের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং বনু হাশিমের কোন লোক কারো তরবারীর সামনে পড়ে গেলে সে যেন তাকে হত্যা না কের। আবুল বাখতারী বিন হিশাম কারো সামনে এসে পড়লে তাকে যেন সে হত্যা না করে। আর আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব কারো সামনে পড়ে গেলে তাকেও যেন হত্যা করা না হয়। কেননা তাকে জোর করে এ যুদ্ধে নিয়ে আসা হয়েছে।'

এ কথা শুনে উৎবার পুত্র আবু হুযাইফা (رضي الله عنه) বললেন, 'আমরা কি আমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করব, আর আব্বাস (رضي الله عنه)-কে ছেড়ে দিব? আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমার সামনে পড়ে যান। তবে আমি তাকে তরবারীর লাগাম পরিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি ওমর ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه)-কে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচার চেহারার উপর কি তরবারীর আঘাত করা হবে?' উত্তরে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তরবারী দ্বারা এ ব্যক্তির গর্দনা উড়িয়ে দেই। কেননা, এ ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে গেছে।'

পরবর্তীকালে আবু হুযাইফা (رضي الله عنه) বলতেন, 'ঐ দিন আমি যে কথা বলে ফেলেছিলাম তার কারণে আমি কোন সময় মনে শান্তি পাই না। এ ব্যাপারে বরাবরই আমার মনে ভয় থেকে যায়। এটা হতে মুক্ত হওয়ার একটি মাত্র উপায় হলো আমার শাহাদতের মাধ্যমে এর কাফ্‌ফারা হয়ে যাওয়া।' অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে যান।

২. আবুল বাখতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করার কারণ ছিল এ ব্যক্তি মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া হতে সবচেয়ে বেশী বিরত থেকে ছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন প্রকারের কষ্ট দিত না এবং তার পক্ষ হতে তিনি কখনো কোন অপছন্দনীয় কথা শোনেনি। আর এ ব্যক্তি ঐ লোকাদের একজন ছিল যারা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের বয়কট পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আবুল বাখাতারী শেষে নিহতই হয়েছিল। ঘটনাটি হল মুজায্‌যার ইবনু যিয়াদ বালাভী (رضي الله عنه)-এর সাথে তার লড়াই হয়। তার সাথে তার অন্য এক সঙ্গীও ছিল। দুজন এক সাথে যুদ্ধ করছিল। মুজযির (رضي الله عنه) তাকে বলেন, 'হে আবুল বাখতারী! আপনাকে হত্যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' সে বলে 'আমার সাথীকেও কি?' মুজায্‌যার (رضي الله عنه) উত্তরে বলেন, 'না, আল্লাহর কসম! আপনার সাথীকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।' সে তখন বলল, 'আল্লাহর কসম! তাহলে আমি এবং সে দুজনই মরবো।' এরপর দুজনই যুদ্ধ শুরু করে দেয়। মুজায্‌যার (رضي الله عنه) বাধ্য হয়ে তাকেও হত্যা করেন।

৩. মক্কায় জাহেলিয়াত যুগে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (رضي الله عنه) ও উমাইয়া ইবনু খালফের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ছিল। বদর যুদ্ধের দিন উমাইয়া ইবনু খালফ তার ছেলে আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (رضي الله عنه) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি শত্রুর নিকট হতে কিছু লৌহ বর্ম ছিনিয়ে নিয়ে তা উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উমাইয়া তাঁকে দেখে বলে, 'তুমি আমার কোন প্রয়োজন বোধ কর কি? আমি তোমার এ লৌহ বর্মগুলো হতে উত্তম। আজকের মতো দৃশ্য আমি কোন দিন দেখিনি। তোমার দুধের

কি প্রয়োজন নেই।' সে একথা দ্বারা বুঝতে চেয়েছিল যে, আমাকে বন্দী করবে তাকে মুক্তি পণ হিসেবে বহু দুগ্ধবতী উট প্রদান করব।'

তার এ কথা শুনে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ লৌহবর্মগুলো ফেলে দিয়ে পিতা-পুত্র দুজনকে গ্রেফতার করে সামনে অগ্রসর হলেন।

আব্দুর রহমান বলেন, 'আমি উমাইয়া এবং তার পুত্রের মাঝে হয়ে চলছিলাম এমতাবস্থায় উমাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কে ছিল যে, তার বক্ষে উটপাখির পালক লাগিয়ে রেখে ছিল।' আমি উত্তরে বললাম উনি ছিলেন হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব। সে তখন বলল এ সেই ব্যক্তি যে আমাদের মধ্যে ধ্বংস রচনা করে রেখেছিল।'

আব্দুর রাহমান বলেন আল্লাহর শপথ! আমি দুজনকে নিয়ে চলছিলাম অকস্মাৎ বিলাল উমাইয়াকে আমার সাথে চলতে দেখে নেন। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ উমাইয়া মক্কায় বিলাল-এর উপর অমানুষিক উৎপীড়ন করেছিল। বিলাল বললেন, 'এ হচ্ছে কাফিরদের নেতা উমাইয়া ইবনু খালফ । হয় আমি বাঁচবো না হয় সে বাঁচবে। আমি বললাম হে বিলাল এটা হচ্ছে আমার বন্দী। তিনি আবার বললেন এখন দুনিয়াতে হয় আমি থাকবো, না হয় সে থাকবে।' তারপর তিনি অত্যন্ত উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর আনসারগণ! এ হচ্ছে কুফরে নেতা উমাইয়া ইবনু খালফ। এখন হয় আমি থাকবো অথবা সে থাকবে। আব্দুর রহমান বললেন, 'ইতিমধ্যে জনগণ আমাদেরকে কংকণের মতো বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে নিল। আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু একটি লোক তার পুত্রের পায়ে তরবারীর আঘাত হেনে দিলো। আর সাথে সাথে সে পড়ে গেল। ও দিকে উমাইয়া এত জোরে চিৎকার করলযে, এরূপ চিৎকার আমি কখনই শুনিনি। আমি বললাম, 'পালিয়ে যাও। কিন্তু আজ পালাবার কোন উপায় নেই। আল্লাহর কসম! আজ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবো না।' আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, জনগণ তরবারী দ্বারা তাদের দুজনকে কেটে ফেলে তাদের জীবন লীলা শেষ করে দেয়। এরপর আব্দুর রহমান বলতেন, 'আল্লাহ বিলালের উপর রহম করুন। আমার লৌহবর্মও গেল এবং আমার বন্দীর ব্যাপারে আমাকে ব্যাকুলও হতে হলো।'

যা'দুল মাআ'দ গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম (রঃ) লিকেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ উমাইয়া ইবনু খালফকে বলেন, 'তুমি হাঁটুর ভরে বসে পড়।' সে বসে গেল এবং আব্দুর রহমান তার উপর চড়ে বসলেন। কিন্তু লোকেরা নীচ দিয়ে তরবারী মেরে উমাইয়াকে হত্যা করল।

কোন একটি তরবারীর আঘাতে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ-এর পা আহত হয়েছিল।[১]

৪. ওমর ইবনুল খাত্তাব তার মামা আস ইবনু হিশাম ইবনু মুগীরাহকে হত্যা করেন।

৫. আবু বকর সিদ্দীক স্বীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন যখন সে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল 'ওরে দুরাচার আমার মাল কোথায়"? আব্দুর রহমান উত্তরে বলেছিল :

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ شَكَّةٍ وَيَعْبُوب ** وصَارِمٍ يَقْتُلُ ضُلَّالَ الشَّيَبْ

অর্থাৎ অস্ত্র, সস্ত্র, দ্রুতগামী অশ্ব এবং ঐ তরবারী ছাড়া কিছুই বাকী নেই যা বার্ধক্যের ভ্রষ্টতার সমাপ্তি ঘটিয়ে থাকে।

৬. যখন মুসলিমরা মুশরিকদেরকে গ্রেফতার করতে শুরু করেন তখন রাসূলুল্লাহ ছাউনীর মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং সা'দ ইবনু মুআয তরবারী হাতে দরজার উপর পাহাড়া দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ লক্ষ্য করলেন যে, সা'দ-এর চেহারায় মুসলিমদের এ কার্যকলাপ অপছন্দনীয় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে সা'দ, আল্লাহর কসম! বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলিমদের এ কার্যকলাপ তোমার

[১] যা'দুল মায়া'দ ২য় খণ্ড ৮৯ পৃঃ। সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড ১০৮ পৃঃ। কিতাবুল অকালাহ এর মধ্যে এ ঘটনাটি কিছু বেশী আংশিক ব্যাখ্যা সহ বর্ণিত হয়েছে।

পছন্দ হচ্ছে না, তাই নয় কি? সা'দ (রাঃ) **উত্তরে বললেন, 'জ্বী হ্যাঁ", হে আল্লাহর** রাসূল (সাঃ)! তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! মুশরিকদের সাথে **এটাই প্রথম যুদ্ধ, যার সুযোগ আল্লাহ** তা'আলা আমাদের দান করেছেন। সুতরাং মুশরিকদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে **অধিক সংখ্যায় হত্যা করে ফেলাই** আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়।'

৭. এ যুদ্ধে উকাশাহ ইবনু মুহসিন **আসাদী (রাঃ)-এর তরবারী ভেঙ্গে যায়।** তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) **তাঁকে কাঠের একটা ভাঙ্গা থাম্বা প্রদান করেন** এবং বলেন 'উকাশাহ (রাঃ) তুমি এটা দ্বারাই যুদ্ধ কর' উকাশাহ (রাঃ) **ওটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হতে নিয়ে** নড়ানো মাত্রই একটা লম্বা, শক্ত সাদা চকচকে তরবারীতে পরিবর্তিত হয়। **তারপর তিনি ওটা দ্বারাই যুদ্ধ করেন** এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে বিজয় দান করেন। **ঐ তরবারী খানা স্থায়ীভাবে উকাশাহ (রাঃ)**-এর কাছেই থাকে এবং তিনি ওটাকে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহার করেন। **অবশেষে আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে** ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। ঐ সময়েও **ঐ তরবারীটি তার কাছেই ছিল।**

৮. যুদ্ধ শেষে মুসআ'ব ইবনু উমায়ের আবাদারী (রাঃ) **তার ভাই আবু উযায়ের ইবনু উমায়ের আবদারীর** পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। আবু উযায়ের মুসলিমদের **বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং ঐ সময় একজন আনসারী** সাহাবী তাঁর হাত বাঁধছিলেন। মুসআর (রাঃ) ঐ আনসারীকে **বললেন 'এ ব্যক্তির মাধ্যমে আপনি আপনার হাতকে** দৃঢ় করুন। এর মা খুবই ধনবতী মহিলা। অবশ্যই সে আপনাকে **উত্তম মুক্তিপণ দিবে।' একথা শুনে আবু** উযায়ের তার ভাই মুসআ'ব (রাঃ)-কে বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমার উপদেশ এটাই?' মুসআ'ব (রাঃ) **উত্তরে বললেন**, 'হ্যাঁ, তোমার পরিবর্তে এ আনসারী আমার ভাই।'

৯. মুশরিকদের মৃতদেহগুলোকে যখন কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ **দেয় হলো এবং উৎবাহ** উবনু রাবীআহকে কূপের দিকে ছেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) **তার পুত্র আবু হুযাইফা** (রাঃ)-এর চে০হ০ারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তখন দেখলেন যে, **তিনি দুঃখিত হয়েছেন এবং তার** চেহারা পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেসা করলেন, 'আবু **হুযাইফাহ নিশ্চয়ই তোমার পিতার এ অবস্থা** দেখে তোমার অন্তরে কিছু অনুভূতি জেগেছে, তাই না?' উত্তরে তিনি **বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর** শপথ! আমার পিতার ব্যাপারে এবং তার হত্যার ব্যাপারে আমার অন্তরে **একটুও শিহরণ উঠেনি। তবে অবশ্যই** আমার পিতা সম্পর্কে আমি জানতাম যে, তার মধ্যে বিবেক বুদ্ধি, দূরদর্শিতা **ও ভদ্রতা রয়েছে। এ জন্য** আমি আশা করতাম যে, এ গুণাবলী তাকে ইসলমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। **কিন্তু এখন তার পরিণাম** দেখে এবং আমার আশার বিপরীত কুফরের উপর তার জীবনের সমাপ্তি দেখে আমি দুঃখিত **হয়েছি। তাঁর এ কথা** শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মঙ্গলের জন্যে দুআ করলেন এবং তার সাথে উত্তমরূপে বাক্যলাপ **করলেন।**

উভয় দলের নিহত ব্যক্তিবর্গ (قتلى الفريقين) ঃ

এ যুদ্ধ মুশরিকদের প্রকাশ্য পরাজয় এবং **মুসলিমদের সুস্পষ্ট বিজয়ের উপর সমাপ্ত** হয়। এতে চৌদ্দজন মুসলিম শহীদ হন, ছয় জন মুহাজির এবং আট **জন আনসার। কিন্তু মুশরিকরা চরমভাবে** ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের সত্তরজন নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়। এদের **অধিকাংশই ছিল নেতৃস্থানীয় লোক।**

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিহতদের পাশে **দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমরা তোমাদের** নবী (সাঃ)-এর কতই না নিকৃষ্ট গোষ্ঠী ও গোত্র ছিলে। তোমরা আমাকে **মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। তোমরা** আমাকে বন্ধুহীন ও সহায়কহীণরূপে ছেড়ে দিয়েছো যখন অন্যরা **আমার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তোমরা** আমাকে বের করে দিয়েছ যখন অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ।' এরপর **তাঁর নির্দেশক্রমে** তাদের **টেনে** হেঁচেড়ে বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়।

আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, **নবী (সাঃ)-এর** আদেশক্রমে বদরের দিন কুরাইশদের চব্বিশ জন বড় বড় নেতার মৃত দেহ বদরের একটি নোংরা কূপে **নিক্ষেপ** করা হয়।

তার নিয়ম ছিল যখন তিনি কোন কাওমের উপর বিজয় লাভ করতেন তখন তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই অবস্থান করতেন। সুতরাং যখন বদরে তৃতীয় দিবস সূচিত হল তখন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সওয়ারীর উপর হাওদা উঠিয়ে দেয়া হলো। তারপর তিনি পদব্রজে চলতে থাকলেন এবং তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর সাহাবীগণও চললেন। অবশেষে তিনি কূপের ধারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাদেরকে তাদের নাম ধরে ও তাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। (তিনি বললেন) হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করতে এটা কি তোমাদের জন্য খুশীর বিষয় হতো না। কেননা, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন তা তোমরা সত্যরূপে পেয়োছ কি?' ওমর (রাঃ) তখন আরয করলেন 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি এমন দেহ সমূহের সঙ্গে কথা বলছেন! যে গুলোর আত্মা নেই ব্যাপার কি?' নবী ﷺ উত্তরে বললেন, 'যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! আমি যা কিছু বলছি তা এদের চেয়ে বেশী তোমরা শুনতে পাওনা।' রেওয়াইয়াতে রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা এদের চেয়ে বেশী শুনতে পাওনা। কিন্তু এরা উত্তর দিতে পারে না।'[1]

মক্কায় পরাজয়ের খবর (مكة تتلقى نبأ الهزيمة) ঃ

মুশরিকরা বদর প্রান্তর হতে বিশৃঙ্খল, ছত্রভঙ্গ ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মক্কামুখী হয়। শরম ও সংকোচনের কারণে তাদের ধারণায় আসছিল না যে, কিভাবে তারা মক্কায় প্রবেশ লাভ করবে।

ইবনু ইসহাক বলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কুরাইশদের পরাজয়ের সংবাদ বহন করে মক্কায় পৌঁছেছিল, সে হলো হাইসামান ইবনু আব্দুল্লাহ কুযায়ী। জনগণ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'যুদ্ধের খবর কি?' সে উত্তরে বলল, 'উৎবাহ ইবনু রাবীআহ, শায়বাহ ইবনু রাবীআহ, আবুল হাকাম ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালফ সহ এবং আরো কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে যারা সবাই নিহত হয়েছে। সে যখন নিহতদের তালিকায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের নাম উল্লেখ করতে শুরু করল। তখন হাতীমের উপর উপবিষ্ট সাফওয়াল ইবনু উমাইয়া বলল, 'আল্লাহর কসম! যদি তার স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে থাকে তবে তাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা?' জনগণ তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বলত সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার কি হয়েছে?' সে উত্তরে বলল 'ঐ দেখ, সে হাতীমে উপবিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর কসম! তার পিতা ও ভ্রাতাকে নিহত হতে স্বয়ং আমিই দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আযাদকৃত দাস আবু রাফে (রাঃ) বর্ণনা করেন। 'আমি ঐ সময় আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম ছিলাম। আমাদের বাড়িতে ইসলাম প্রবেশ করেছিল। আব্বাস (রাঃ) মুসলিম হয়েছিল, উম্মুল ফযল (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন এবং আমিও মুসলিম হয়েছিলাম। তবে অবশ্যই আব্বাস (রাঃ) তার ইসলাম গোপন রেখেছিলেন। এদিকে আবু লাহাব বদর যুদ্ধে হাযির হয়নি। যখন কুরাইশদের পরাজয়ের খবর তার কানে পৌঁছল তখন লজ্জায় ও অপমানে তার মুখ কালো হয়ে গেল। পক্ষান্তরে আমরা নিজেদের মধ্যে শক্তি ও সম্মান অনুভব করলাম। আমি দুর্বল মানুষ ছিলাম, তীর বানাতাম এবং যমযম কক্ষে বসে তীরের হাতল ছিলতাম। আল্লাহর কসম! ঐ সময় আমি কক্ষে বসে তীর ছিলছিলাম। উম্মুল ফযল (রাঃ) আমার পাশেই বসেছিলেন এবং যে খবর এসেছিল তাতে আমরা খুশী ও আনন্দিত ছিলাম। ইতিমধ্যে আবু লাহাব জঘন্যভাবে তার পদদ্বয় টেনে টেনে আমাদের কাছে এসে কক্ষপ্রান্তে বসে পড়লো। তার পৃষ্ঠ আমার পৃষ্ঠের দিকে ছিল। হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল, 'আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এসে গেছে।' আবু লাহাব তাকে বলল, 'হে আমার প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র। আমার কাছে এসো। আমার জীবনের শপথ! তোমার নিকট হতে খবর পাওয়া যাবে।' তিনি আবু লাহাবের কাছে বসে পড়লেন। জনগণ দাঁড়িয়ে ছিল। আবু লাহাব বলল, লোকদের কি অবস্থা? 'বল ভাতিজা, যুদ্ধের খবর কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'কিছুই নয়, এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, লোকদের মুসলিমদের সাথে মোকাবেলা হয়েছে এবং আমরা

---

[1] **সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম**। মিশকাত, ২য় খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ।

আমাদের কাঁধগুলো তাদেরকে সোপর্দ করেছি। তারা আমাদের ইচ্ছামত হত্যা করেছে এবং বন্দী করেছে। তা সত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদেরকে তিরস্কার করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মোকাবেলা এমন কতিপয় লোকের সঙ্গে হয়েছিল যারা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থানে সাদাকালো মিশ্রিত ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। আল্লাহর শপথ! না তারা কোন কিছু ছেড়ে দিচ্ছিল, না কোন জিনিস তাদের মোকাবেলা টিকতে পারছিল।'

আবু রাফে (রাঃ) বলেন, আমি স্বীয় হাত দ্বারা তাবুর প্রান্ত উঠালাম, তারপর বললাম, 'আল্লাহর শপথ! তারা ছিলেন ফেরেশ্‌তা' আমার এ কথা শুনে আবু লাহাব তার হাত উঠিয়ে ভীষণ জোরে আমার গালে এক চড় লাগিয়ে দিল। আমি তখন তার সাথে লড়ে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে উঠিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর আমার উপর হাটুর ভরে বসে আমাকে প্রহার করতে লাগল। আমি দুর্বল প্রমাণিত হলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে উম্মুল ফযল উঠে তাবুর একটি খুঁটি নিয়ে তাকে এমনভাবে মারলেন যে, তার মাথায় ভীষণভাবে আঘাত লাগল। আর সাথে সাথে উম্মুল ফযল (রাঃ) বলে উঠলেন, 'তার মনিব নেই বলে তাকে দুর্বল মনে করছো। আবু লাহাব তখন লজ্জিত হয়ে উঠে চলে গেল। এরপর আল্লাহর কসম! মাত্র সাত দিন অতিবাহিত হয়েছে এরই মধ্যে আল্লাহর হুকুমে সে আদাসহ নামক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলো এবং এতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে গেল। আদাসার ফোড়াকে আরবরা বড়ই কুলক্ষণ মনে করত। তাই, তার মৃত্যুর পর তার পুত্ররা তার গোর-কাফন না করে তিন দিন পর্যন্ত তাকে উপরেই রেখে দেয়। কেউই তার নিকটে গেল না এবং তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থাও করলনা। অবশেষে যখন তার পুত্ররা আশঙ্কা করল যে, তাকে এভাবে রেখে দিলে জনগণ তাকে তিরস্কার করবে তখন তারা একটি গর্ত খনন করে ঐ গর্তের মধ্যে তার মৃত দেহকে কাঠ দ্বারা ঢেকে ফেলে দিল এবং দূর থেকেই ঐ গর্তের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে ঢেকে ফেললো।

মোট কথা, এভাবে মক্কাবাসীগণ তাদের লোকদের সুস্পষ্ট পরাজয়ের খবর পেলো এবং তাদের স্বভাবের উপর এর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া হলো। এমনকি তারা নিহতদের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করে দিল যাতে মুসলিমরা তাদের দুঃখে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ না পায়।

এ ব্যাপারে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা রয়েছে। তা হচ্ছে বদরের যুদ্ধে আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের তিনটি পুত্র মারা যায়। তাদের জন্য সে কাঁদতে চাচ্ছিল। সে ছিল অন্ধ লোক। একদা রাত্রে সে এক বিলাপকারীণী মহিলার বিলাপের শব্দ শুনতে পেল। তৎক্ষণাৎ সে তার গোলামকে বলল 'তুমি গিয়ে দেখ তো, বিলাপ করার কি অনুমতি পাওয়া গেছে? কুরাইশরা কি নিহতদের জন্য ক্রন্দন করছে? তাহলে আমিও আমার পুত্র আবু হাকিমের জন্য ক্রন্দন করব। কেননা, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে।' গোলাম ফিরে এসে খবর দিল 'মহিলাটি তো তার এক হারানো উটের জন্য ক্রন্দন করছে।' এ কথা শুনে আসওয়াদ নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। আবেগে সে নিম্নের বিলাপ পূর্ণ কবিতাটি বলে ফেললো ঃ

أتبكي أن يضل لها بـعـيـر ** ويمنعها من النوم السهود

فلا تبكي على بكر ولكـن ** على بدر تقاصرت الجدود

على بدر سراة بني هصيص ** ومخزوم ورهط أبي الوليد

وبكى إن بكيت على عقيل ** وبكى حارثا أسد الأسود

وبكيهم ولا تسمى جميعـا ** وما لأبي حكيمة من نديد

ألا قد ساد بعدهـم رجال ** ولولا يوم بدر لم يسودوا

অর্থ ঃ 'তার উট হারিয়ে গেছে এজন্যে কি সে কাঁদছে? আর ওর জন্যে অনিদ্রা কি তার নিদ্রাকে হারাম করে দিয়েছে। (হে মহিলা) তুমি উটের জন্যে ক্রন্দন করো না, বরং বদরের (নিহদের) জন্যে ক্রন্দন করো, যেখানে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বদরের (বেদনাদায়ক ঘটনার) জন্যে ক্রন্দন করো যেখানে বনু হাসীস, বনু

মাখযূম, আবুল ওয়ালীদ প্রভৃতি গোত্রের অসাধারণ ব্যক্তিবর্গ (সমাধিস্থ) রয়েছে। যদি ক্রন্দন করতেই হয় তবে আকীলের জন্যে ক্রন্দন করো এবং হারিসের জন্যে ক্রন্দন করো যারা ছিল সিংহদের সিংহ। তুমি ঐ লোকদের জন্যে ক্রন্দন করো এবং সবার নাম নিও না। আর আবু হাকীমার তো কোন সমকক্ষই ছিল না। দেখ ওদের পরে এমন লোকেরা নেতা হয়ে গেছে যে, ওরা থাকলে এরা নেতা হতে পারত না।'

মদীনায় বিজয়ের শুভ সংবাদ (المدينة تتلقى أنباء النصر) ঃ

এদিকে মুসলিমদের বিজয় পূর্ণতায় পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীকে অতি শীঘ্র শুভ সংবাদ দেয়ার জন্যে দুজন দূতকে প্রেরণ করেন। একজন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.) যাকে মদীনার উচ্চ ভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং অপর জন যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রা.) যাকে মদীনার নিম্নভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট পাঠানো হয়।

ঐ সময়ে ইয়াহুদী ও মুনফিকরা এ গুজব রটিয়ে দিয়েছিল।

যে মুসলিমরা পরাজিত হয়েছে। এমন কি এ গুজব ও তারা রটিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং একজন মুনাফিক যখন যায়েদ ইবনু হারিস (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উষ্ট্র কাসওয়ার উপর সাওয়ার হয়ে আসতে দেখলো তখন বলে উঠল 'সত্যিই মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়েছেন। দেখ, এটা তো তারই উট। আমরা এটাকে চিনি। আর এ ব্যক্তি হলো যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রা.) পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে এবং সে এত ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে যে, কি বলবে তা বুঝতে পারছে না।' মোট কথা, যখন দুজন দূত মদীনায় পৌঁছিলেন তখন মুসলিমরা তাদেরকে ঘিরে নেন যখন দুজন দূত মদীনায় পৌঁছিলেন তখন মুসলিমরা তাদেরকে ঘিরে নেন এবং তাদের মুখে বিস্তারিত খবর শুনতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, মুসলিমরা বিজয় লাভ করেছেন। এরপর চতুর্দিকে আনন্দের ঢেউ উথলে ওঠে এবং মদীনার আকাশ-বাতাস তকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে। যে সব মর্যাদা সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় সাহাবী মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ প্রকাশ্যে বিজয়ের মুবারকবাদ জানাবার জন্যে বদরের রাস্তার উপর বেরিয়ে পড়েন।

উসামাহ ইবনু যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের নিকট এ সুসংবাদ ঐ সময় পৌঁছে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ও উসামান (রা.)-এর সহধর্মিনী রুকাইয়া (রা.)-কে দাফন করে মাটি বরাবর করা হয়েছিল। তাঁর শুশ্রূষার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উসামান (রা.)-এর সাথে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।

গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সমাধান (الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة) ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ শেষে তিন দিন বদরে অবস্থান করেন এবং তখনও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে যাত্রা শুরু করেন নি এর মধ্যেই গণীমতের মাল নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং এ মতভেদ চরম সীমায় পৌঁছে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যে, যার কাছে যা আছে তা যেন সে তার কাছে জমা দেয়। সাহাবীগণ (রা.) তাঁর এ দির্দেশ পালন করেন এবং এরপর আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন।

উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা হতে যাত্রা শুরু করে বদর প্রান্তরে উপনীত হলাম। লোকদের (মুশরিকদের) সাথে আমাদের যুদ্ধ হলো এবং আল্লাহ তা'আলা শত্রুদেরকে পরাজিত করলেন। তারপর আমাদের মধ্যে একটি দল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলএবং তাদেরকে ধরতে হত্যা করতে লাগল। আর একটি দল গণীমতের মাল লুট করতে ও জমা করতে থাকল। অন্য একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চতুর্দিকে থেকে পরিবেষ্টন করে থাকলেন যাতে শত্রুরা প্রতারণা করে তাকে কোন কষ্ট দিতে না পারে। যখন রাত্রি হলো এবং প্রতিটি দল একে অপরের সাথে মিলিত হলো তখন গণীমত একত্রিত কারীরা বলল, 'আমরা এগুলো জমা করেছি। সতুরাং এতে অন্য কারো কোন অংশ নেই।' শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনকারীরা বলল, 'তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী এর হকদার নও। কেননা, আমরা এ মাল হতে শত্রুদের তাড়ানো ও দূর করানোর কাজ করেছি।' আর যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিফাযতের কাজ করেছিল তারা বলল 'আমরা এ আশঙ্কা

করেছিলাম যে, আমাদের অবহেলার কারণে **শত্রুরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন ক্ষতি সাধন** করতে পারে। এ জন্যে আমরা তার হিফাযতের কাজে নিয়োজিত থেকেছি। **সুতরাং আমরা এর বেশী হকদার।**' তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١]

"তারা তোমাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'যুদ্ধে **প্রাপ্ত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর** রসূলের; কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর নিজেদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু সুন্দর **ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর।** তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।' **(আল-আনফাল ৮ : ১)**

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ গনীমতের মাল মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন।[1]

মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনার পথে (وفود التهنئة) ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিন বদরে অবস্থানের পর মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সাথে **মুশরিক বন্দীরাও** ছিল এবং মুশরিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত গণীমতের মালও ছিল। তিনি তাদের পাহাড়ার দায়িত্ব **আব্দুল্লাহ ইবনু** কা'ব (রাঃ)-এর উপর অর্পণ করেন। যখন তিনি সাফরা উপত্যকায় গিরিপথ হতে বের হয়ে একটি টিলার উপর বিশ্রাম গ্রহণ করেন তখন তিনি সেখানে গণীমাতের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী মাল মুসলিমদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন। আর সাফরা উপত্যকাতেই তিনি নাযর ইবনু হারিসের হত্যার নির্দেশ দেন। এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকা ধরে রেখেছিল এবং সে কুরাইশদের বড় বড় অপরাধীদের একজন ছিল। ইসলামের শত্রুতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট প্রদানে সে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরকুয যাবয়্যাহ নামক স্থানে পৌছে উকবাহ ইবনু আবী মুঈতকে হত্যা করার আদেশ জারী করেন। এ লোকটি যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছিল তার কিছু আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এ সেই ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের অবস্থায় তাঁর পিঠের উপর উটের ভূড়ি চাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং সে তার গলায় চাদর জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করেছিল এবং আবু বকর (রাঃ) সেখানে সময়মত এসে না পড়লে সে তো তাকে গলা টিপে মেরেই ফেলত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন তখন সে বলে ওঠে 'হে মুহাম্মদ ﷺ আমার সন্তানদের জন্য কে আছে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আগুন"। তারপর আসিম ইবনু সাবিত (রাঃ) এবং মতান্তরে আলী (রাঃ) তার গর্দান উড়িয়ে দেন।[2]

সামরিক নীতি অনুযায়ী এ দুরাচার ব্যক্তি দ্বয়ের হত্যা অপরিহার্য ছিল। কেননা, তারা শুধু বন্দী ছিল না, বরং আধুনিক পরিভাষার দিক থেকে যুদ্ধ অপরাধিও ছিল।

অভ্যর্থনাকারী প্রতিনিধিদল (قضية الأسارى) ঃ

এরপর যখন মুসলিম সেনাবাহিনী রাওহা নামক স্থানে পৌছেন তখন ঐ মুসলিম প্রতিনিধি **দলের সাথে** তাদের সাক্ষাৎ হয় যারা দূতদ্বয় মারফত বিজয়ের শুভ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যর্থনার **জন্যে এবং** তাকে বিজয়ের মুবারকবাদ জানাবার জন্যে মদীনা হতে বের হয়ে এসেছিলেন। যখন তারা **মুবারকবাদ পেশ** করলেন তখন সালমাহ ইবনু সালামাহ্ (রাঃ) বললেন, 'আপনারা আমাদেরকে মুবারকবাদ দিচ্ছেন **কেন? আল্লাহর** শপথ! আমাদের মোকাবেলা তো টেকো মাতা বিশিষ্ট বুড়োদের সাথে হয়েছিল, যারা ছিল **উটের মত।' আর এ** কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন, 'ভ্রাতুষ্পুত্র এরাই ছিল কওমের **নেতৃস্থানীয় লোক বা নেতা।'**

---

[1] মুসনাদে আহমদ ৫ম খণ্ড ৩২৩ ও ৩২৪ পৃঃ এবং হাকিম ২য় খণ্ড ৩২৮ পৃঃ।

[2] এ হাদীসটি সহীহ গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত যথা সুনানে আবু দাউদ , অওনুল মা'বুদে ৩য় খণ্ড ১২ পৃঃ।

তারপর উসায়েদ ইবনু হুযায়ের আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আপনাকে সফলতা দান করেছেন এবং আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি একথা মনে করে বদরে গমন হতে পিছনে থাকি নি যে, আপনার মোকাবেলা শত্রুদের সাথে হবে। আমি তো ধারণা করেছিলাম যে, এটা শুধু কাফেলার ব্যাপারে। আমি যদি বুঝতাম যে, শত্রুদের মুখোমুখী হতে হবে তবে আমি কখনো পিছনে থাকতাম না।' রাসূলুল্লাহ তখন তাকে বললেন? তুমি সত্য কথাই বলেছ।

এরপর রাসূলুল্লাহ মদীনা মুনাওরায় বিজয়ীর বেশে এমনভাবে প্রবেশ করলেন যে, মদীনা শহর এবং তাঁর আশপাশের শত্রুদের উপর তাঁর চরম প্রভাব প্রতিফলিত হল। এ বিজয়ের ফলে মদীনার বহু লোক দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ সময়েই আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সঙ্গীরার শুধুলোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ -এর মদীনায় আগমনের এক দিন পর বন্দীদের আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে সাহাবীগণের (রা.) মধ্যে বন্টন করে দেন এবং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। এ পরামর্শের কারণে সাহাবীগণ (রা.) নিজেরা খেজুর খেতেন এবং বন্দীদেরকে রুটি খাওয়াতেন। কেননা মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল বিশেষ মূল্যবান খাদ্য।

বন্দীদের সম্বন্ধে পরামর্শ :

মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাহাবীদের সঙ্গে বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন। আবু বকর নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! এরা সাবই আমাদের চাচাত ভাই, বংশীয় লোক এবং আত্মীয়। আমার মতে মুক্তিপণ হিসেবে কিছু কিছু অর্থ নিয়ে এদেরকে মুক্তি দেয়া উচিত। এতে আমাদের সাধারণ তহবিল যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে অল্প দিনের মধ্যে এদের সবার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করাও সম্ভব হবে। তখন তাদেরকে আমাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারব।

তারপর নবী করীম খাত্তাবের পুত্রকে (ওমর) সম্বোধন করে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র তোমার অভিমত কি? উত্তরে ওমর বললেন, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে আমি আবু বকরের সঙ্গে একমত হতে পারছিনা। আমার মত হচ্ছে যে, অমুককে (যিনি ওমরের আত্মীয় ছিলেন) আমার হাওয়ালা করে দেন, আমি তাকে হত্যা করি। আকীল বিন আবি তালেবকে আলীর হাওয়ালা করে দিন। তিনি তাকে হত্যা করবেন এবং অমুককে (যিনি হামযার ভাই ছিলেন) হামযার হালওয়ালা করে দিন, তিনি তাকে হত্যা করবেন। যাতে করে আল্লাহ এটা বোঝেন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের সম্পর্কে কোন প্রকার দুর্বলতা নেই। আর এরা ছিল মুশরিকদের সার্বক্ষণিক অগ্রণী নেতা। এরা ইসলামের চির শত্রু এবং মুসলিমদের প্রাণের বৈরী। আমাদেরকে নির্যাতিত করতে, আল্লাহর রাসূল -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে এবং আল্লাহর সত্য ধর্মকে জগতের পৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলতে এরা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। এরা অন্যায়, অধর্ম ও অত্যাচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এদেরকে অবিলম্বে হত্যা করে ফেলা হোক। প্রত্যেক মুসলিম উলঙ্গ তরবারী হাতে দণ্ডায়মান হোক এবং নিজ হাতে নিজের আত্মীয় বর্গের মুণ্ডপাত করুক, আমার এটাই মত।'

ওমর বলেন, 'রাসূলুল্লাহ আবু বকর -এর মতকেই পছন্দ করলেন, আমার মতকে পছন্দ করলেন না। সুতরাং বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পরের দিন আমি সকাল সকাল রাসূলুল্লাহ এবং আবু বকর -এর খিদমতে হাযির হলাম। দেখি যে, তাঁরা দুজনই ক্রন্দন করছে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল বলুন, আপনারা কেন কাঁদছেন? যদি ক্রন্দনের কোন কারণ থাকে তাহলে আমিও ক্রন্দন করব। রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেন 'মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে তোমার সঙ্গীদের উপর যে জিনিস পেশ করা হয়েছে সে কারণেই কাঁদছি।' আর তিনি নিকটবর্তী একটি গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমার সামনে তাদের শাস্তিকে এ গাছের চেয়েও বেশী নিকটবর্তীরূপে পেশ করা হয়েছে।' তারপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করেন,

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال:٦٧، ٦٨].

"কোন নাবীর জন্য এটা সঠিক কাজ নয় যে, দেশে (আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে) পুরোমাত্রায় পরাভূত না করা পর্যন্ত তার (হাতে) যুদ্ধ-বন্দী থাকবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও আর আল্লাহ চান আখিরাত (এর সাফল্য), আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী। আল্লাহ্‌র লেখন যদি পূর্বেই লেখা না হত তাহলে তোমরা যা (মুক্তিপণ হিসেবে) গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি পতিত হত।' [আল-আনফাল (৮) : ৬৭-৬৮]

যেহেতু এ বিধান বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেহেতু মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে সাহাবীগণ (রা.)-কে শাস্তি দেয়া হয় নি, বরং তাদেরকে শুধু তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়েছে যে, ভালোভাবে কাফেরদেরকে উত্তম মাধ্যম দেয়ার আগেই বন্দী করে নিয়েছিলেন এবং এ জন্যও যে, তাঁরা এমন যুদ্ধ অপরাধীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলেন যার বড় অপরাধী ছিল, যাদের উপর নতুন আইন ও মুকদ্দমা না চালিয়ে ছাড়ত না এদের মুকদ্দমার ফায়সালাও সাধারণত মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতো।

যা হোক, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল বলে মুশরিকদের নিকট হতে মুক্তিপণ গৃহীত হয়। মুক্তিপণের পরিমাণ চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত ছিল। মক্কাবাসীগণ লেখা পড়াও জানত, পক্ষান্তরে মদীনাবাসীগণ লেখাপড়া জানত না বললেই চলে। এ জন্যে এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল যে, যে মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হবে সে মদীনার দশজন ছেলেকে লেখাপড়া শিখাবে। যখন এ ছেলেগুলো উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখে নিবে তখন এটাই তার মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন বন্দীর উপর অনুগ্রহও করেছেন এবং তাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছেন। এ তালিকায় মুত্তালিব ইবনু হানতাব, সাইফী ইবনু আবী রিফাআহ এবং আবু ইযযাহ জুমাহীর নাম পাওয়া যায়। শেষের দুজনকে উহুদের যুদ্ধে বন্দী ও হত্যা করা হয়। (বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় জামাতা আবুল আসকেও বিনা মুক্তিপণে এ শর্তে ছেড়ে দেন যে, সে তার কন্যা যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পথ রোধ করবে না। এর কারণ এই ছিল যে, যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবুল আসের মুক্তিপণ হিসেবে কিছু মাল পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে একটি হারও ছিল। এ হারটি প্রকৃত পক্ষে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ছিল। যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে আবুল আসের নিকট বিদায় দেয়ার সময় তিনি তাকে এ হারটি প্রদান করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে ভাববেগ সৃষ্টি হয়। তাই, তিনি সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নিকট অনুমতি চান যে, আবুল আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া হোক। সাহাবীগণ সন্তুষ্টচিত্তে এটা মেনে নেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুল আসকে এ শর্তে ছেড়ে দেন যে, সে যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পথরোধ করতে পারবে না। এ শর্তানুসারে আবুল আস তাঁর পথ ছেড়ে দেয় এবং যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং একজন আনসারী সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা বাতনে ইয়াজিজ নামক স্থানে অবস্থান করবেন, যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁরা তাঁর সাথী হয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা দুজন যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে সাথে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হিজরতের ঘটনাটি খুবই দীর্ঘ ও হৃদয়বিদারক।

বন্দীদের মধ্যে সুহায়েল ইবনু আমরও ছিল। সে ছিল বড় বাকপটু ভাল বক্তা। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সুহায়েল ইবনু আমরের সামনের দাঁত দুটি ভেঙ্গে দেয়া হোক, যাতে সে কোন জায়গায় বক্তা হয়ে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে না পারে।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা এটা মুসলাহ (নাক, কান কর্তিত) এর অন্তর্ভূক্ত। যার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পাকড়াও এর আশঙ্কা থাকবে।

সা'দ ইবনু নুমান (রাঃ) উমরাহ করার জন্যে বের হলে আবু সুফিয়ান তাকে বন্দী করে ফেলেন। আবু সুফিয়ানের পুত্র আমরও বদরযুদ্ধে বন্দীদের একজন ছিল। আমরকে আবু সুফিয়ানের নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি সা'দ (রাঃ)-কে ছেড়ে দেন।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের পর্যালোচনা (القرآن يتحدث حول موضوع المعركة) ঃ

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সূরাটি এ যুদ্ধের উপর আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশদ বর্ণনা। আর আল্লাহ পাকের এ বর্ণনা বাদশাহ ও কমাণ্ডারদের বিজয় বর্ণনা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ বিশদ বর্ণনার কয়েকটি কথা হচ্ছে :

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ অসতর্কতা ও চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি যা মোটের উপর তাদের মধ্যে বাকী রয়ে গিয়েছিল। আর যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু এ যুদ্ধে প্রকাশও পেয়ে গিয়েছিল। তাদের এ মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল তারা নিজেদেরকে এ সব দুর্বলতা হতে পবিত্র করে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

এরপর মহান আল্লাহ এ বিজয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও গায়েবী সাহায্যের অন্তর্ভূক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমরা নিজেদের সাহস ও বীরত্বের প্রতারণায় যেন না পড়ে। কেননা, এর ফলে স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয়। বরং তারা যেন আল্লাহ পাকের উপরই নির্ভরশীল হয় এবং তার ও তার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য স্বীকার করে।

তারপর ঐ সব মহৎ উদ্দেশ্যের আলোচনা করা হয়েছে যার জন্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পা রেখেছিলেন এবং এর মধ্যে ঐ চরিত্র ও গুনাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে যা যুদ্ধ সমূহে বিজয়ের কারণ হয়ে থাকে।

তারপর মুশরিক মুনাফিক, ইহুদী এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে এমন মর্মস্পর্শী উপদেশ দেয়া হয় যাতে তারা সত্যের সামনে ঝুঁকে পড়ে এবং ওর অনুসারী হয়ে যায়।

এরপর মুসলিমগণকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে সম্বোধন করে এ বিজয়ের সমুদ্বয় বুনিয়াদী নিয়ম কানুন ও নীতিমালা বুঝানো হয় ও বলে দেয়া হয়।

তারপর এ স্থানে ইসলামী দাওয়াতের জন্যে যুদ্ধ ও সন্ধির যে নীতিমালার প্রয়োজন ছিল ও গুলোর বিশ্লেষণ ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। যাতে মুসলিমদের যুদ্ধ এবং জাহেলিয়াত যুগের যুদ্ধের মধ্যে স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চরিত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিমদের উৎকৃষ্টতা লাভ হয়, আর দুনিয়ার মানুষ উত্তমরূপে জেনে নেয় যে, ইসলাম শুধু মাত্র একটা মতবাদ নয়, বরং সে যে নীতিমালা ও রীতিনীতির প্রতি আহ্বানকারী, স্বীয় অনুসারীদেরকে ওগুলো অনুযায়ী আমল করার শিক্ষাও দিয়ে থাকে।

তারপর ইসলামী হুকুমতের কয়েকটি দফা বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী হুকমতের গণ্ডীর মধ্যে বসবাসকারী মুসলিম ও এর বাইরে বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে কতই না পার্থক্য রয়েছে।

বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী ঃ

হিজরী ২য় সনে রমাযানের রোযা এবং সাদকায়ে ফিরত ফরজ করা হয়, আর যাকাতের বিভিন্ন নিসার ও ধনের পরিমাণ যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়, নির্দিষ্ট করা হয়। সাদকায়ে ফিরত ফরজ ও যাকাতের নিসাব নির্দিষ্ট করণের ফলে ঐ বোঝা ও কষ্ট অনেকাংশ হালকা হয়ে গেল যা বহু সংখ্যক দরিদ্র মুহাজির বহণ করে আসছিলেন। কেননা, তাঁরা জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্টে ঘুরেও জীবিকার ব্যবস্থা করতে অপারগ হচ্ছিলেন্

তারপর অত্যন্ত সুন্দর ও মোক্ষম ব্যবস্থা এই ছিল যে, মুসলিমরা তাদের জীবনে যে প্রথম ঈদ উদ্‌যাপন করেছিলেন তা ছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ঈদ, যা বদর যুদ্ধের প্রকাশ্য বিজয়ের পর হাযির হয়েছিল। কতই না সুন্দর ছিল এ সৌভাগ্যের ঈদ, যে সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মস্তিষ্কে বিজয় ও সম্মানের

মুকুট পরানোর পর দান করেছিলেন। আর কতই না ঈমানের ছিল এ ঈদের সালাতের দৃশ্য যা মুসলিমরা নিজেদের ঘর হতে বের হয়ে তকবীর তাওহীদ ধ্বনিত গগণ পবন মুখরিত মাঠে গিয়ে আদায় করে থাকেন। ঐ সময় অবস্থা ছিল মুসলিমদের অন্তরে ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতরাশি ও তার দেয়া সাহায্যের কারণে তাঁর করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহে উচ্ছসিত এবং বিজয়োন্মাদনার উল্লাসে পরিপূর্ণ। তাদের ললাটগুলো তাঁর প্রতিকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যে ঝুঁকে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামতের বর্ণনা নিম্নের আয়াতে দিয়েছেন।

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال:٢٦].

"স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, দুনিয়াতে তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হত। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, মানুষেরা তোমাদের কখন না হঠাৎ ধরে নিয়ে যায়। এমন অবস্থায় তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করলেন, তোমাদের উত্তম জীবিকা দান করলেন যাতে তোমরা (তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (আল-আনফাল ৮ : ২৬)

النشاط العسكري بين بدر وأحد

বদর পরবর্তী সময়ের তৎপরতা ঃ

বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলিম এবং মুশরিকদের মধ্যে সর্ব প্রথম অস্ত্রের লড়াই এবং মীমাংসা সূচক সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে মুসলিমগণ প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেন এবং সমগ্র আরব তা প্রত্যক্ষ করে। এ যুদ্ধের ফলে যারা সরাসরি চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তারাই মর্মাহত হয়েছিল সব চাইতে বেশী অর্থাৎ মক্কার মুশরিকেরা। তাছাড়া ঐ সকল লোকও যারা মুসলিমদের বিজয় ও সফলতাকে নিজেদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল, অর্থাৎ ইহুদীরা। সুতরাং মুসলিমগণ যখন বদর যুদ্ধে কল্পনাতীতভাবে বিজয় লাভ করলেন তখন এ দুটি দল মুসলিমদের প্রতি ক্রোধ, ক্ষোভ ও মন পীড়ায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। কুরআনুল কারীমে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة:٨٢]

"যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি মানুষের মধ্যে ইয়াহূদ ও মুশরিকদেরকে তুমি অবশ্য সবচেয়ে বেশি শত্রুতাপরায়ণ দেখতে পাবে।' (আল-মায়িদা ৫ : ৮২)

মদীনায় কিছু লোক এ দুটি দলের সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তারা যখন দেখল যে, তাদের মান মর্যাদা সমুন্নত রাখার এখন আর কোন পথ রইল না তখন তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করল।

এটা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার বন্ধু বান্ধবের দল। ইহুদী এবং মুশরিকদের তুলনায় মুসলিমদের প্রতি এরাও কম ক্ষোভ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত না।

এদের ছাড়া চতুর্থ একটি দলও ছিল। অর্থাৎ ঐ সব বেদুঈন যারা মদীনার চতুস্পার্শে বসবাস করত। কুফর কিংবা ঈমান কোন কিছুর প্রতিই তাদের কোন আকর্ষণ কিংবা আবেগের প্রশ্ন জড়িত ছিল না। তারা ছিল লুণ্ঠনকারী দস্যু। এ কারণে বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সাফল্যে তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, মদীনায় একটি শক্তিমালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে তাদের অন্তরেও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা দানা বেঁধে ওঠে। যার ফলে তারাও মুসলিমদের শত্রু দলভূক্ত হয়ে পড়ে।

মুসলিমগণ এভাবে চতুর্দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হন। কিন্তু মুসলিমদের ব্যাপারে প্রত্যেক দলের কর্ম পদ্ধতি ছিল অন্যান্য দলের কর্ম পদ্ধতি হতে পৃথক। প্রত্যেক দল নিজেদের অবস্থার প্রেক্ষাপটে এমন সব পন্থা অবলম্বন করেছিল যা তাদের ধারণায় তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ছিল সহায়ক। সুতরাং মদীনাবাসী মুনাফিকগণ বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়ার পথ অবলম্বন করল। ইহুদীদের একটি দল খোলাখুলিভাবে মুসলিমদের প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতা শুরু করল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে থাকল। তাদের সামরিক তৎপরতা এবং প্রস্তুতি ছিল খোলাখুলি তারা যেন তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলিমগণকে নিম্নরূপ পয়গাম দিচ্ছিল ঃ

ولا بد من يوم أغرّ مُحَجَّل ** يطول استماعي بعده للنوادب

অর্থাৎ এমন এক উজ্জ্বল ও আলোকময় দিনের প্রয়োজন, যার পরে দীর্ঘকাল ধরে বিলাপকারিনীদের বিলাপ শুনতে থাকবো।

আর বছর কাল পরে তারা কার্যতঃ যুদ্ধ করার জন্যে মদীনার উপর চড়াও হল, যা ইতিহাসে উহুদের যুদ্ধ নামে পরিচিত। মুসলিমদের খ্যাতি মর্যাদার উপর এর যথেষ্ট মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল।

এ বিপদের মোকাবেলা করার জন্যে মুসলিমগণ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যোগ্য নেতৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, মদীনার নেতা রাসূলুল্লাহ ﷺ চার পাশের এ সব

বিপদের ব্যাপারে সদা সচেতন ও সতর্ক ছিলেন এবং এগুলো মোকাবেলা করার জন্য যে, ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এখানে তারই একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

কুদর[1] নামক স্থানে গাযওয়ায়ে বনী সুলাইমের যুদ্ধ (غزوة بني سُلَيم بالكُدْر) ঃ

বদর যুদ্ধের পর সর্ব প্রথম মুসলিম গোয়েন্দা বাহিনী সরবরাহ করেন তা ছিল গাতফান গোত্রের শাখা বনু সুলাইমের লোকেরা মদীনার উপর চড়াও হওয়ার জন্যে সৈন্য সমাবেশ করছে। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে নবী কারীম ﷺ দু'শ জন উষ্ট্রারোহীকে সঙ্গে নিয়ে আকস্মিকভাবে তাদের নিজেদের এলাকায় ধাওয়া করেন এবং কুদর নামক স্থানে তাদের মনযিল পর্যন্ত পৌছেন। বনু সুলাইম গোত্র এ আকস্মিক আক্রমণে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং উপায়ন্তর না দেখে উপত্যকার মধ্যে পাঁচশটি উট ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এগুলোর উপর মদীনার মুসলিম সেনাবাহিনী দখলদার হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলোর এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে অবশিষ্ট মাল গণীমত হিসেবে মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন। প্রত্যেকের অংশে দুটি করে উট পড়ে। এ গাযওয়ায় ইয়াসার নামক একটি গোলাম হাতে আসে যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আযাদ করে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু সুলাইমের বাসভূমিতে তিন দিন অবস্থান করার পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এ গাযওয়া হিজরী ২য় সনের শাওয়াল মাসে বদর হতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাত দিন পরে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকালীন সময়ে সাবা ইবনু আরাফাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এবং মতান্তরে ইবনু উম্মু মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।[2]

২. নবী করীম ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র (مؤامرة لاغتيال النبي ﷺ) ঃ

বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুশরিকরা ক্ষোভে ও ক্রোধে অগ্নি শর্মা হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করে বদর যুদ্ধের গ্লানি ও অপমানের প্রহিশোধ গ্রহণের জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, দু' যুবক নিজ ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, দু' যুবক নিজ বুদ্ধিবলে এ সকল মতভেদ ও এখতেলাফের বুনিয়াদ ও বদর যুদ্ধের অবমাননাকর পরিস্থিতির মূলোৎপাটন করবে অর্থাৎ নবী ﷺ-কে হত্যা করবে। ফলে বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা হল উমায়ের ইবনে ওহাব জুমাহী, যে ছিল কুরাইশদের সব চাইতে বড় শয়তান এবং মক্কাতে নবী কারীম ﷺ ও সাহাবীগণ (রা.)-কে যন্ত্রণা দেয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত তার পুত্র ওহাব ইবনে উমায়ের বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। এ উমায়ের এক দিন হাতীমে বসে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সঙ্গে বদরের কূঁয়ায় নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এতে সাফওয়ান বলে উঠল, 'আল্লাহর শপথ! এরপর আমাদের বেঁচে থাকার আর কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না।' উত্তরে উমায়ের বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি সত্যই বলেছ। দেখ, আমার যদি ঋণ না থাকত যা পরিশোধ করার মতো অবস্থা বর্তমান আমার নেই এবং আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যদি না থাকত যা আমার অভাবে বিনষ্ট হওয়ার সম্বাবনা রয়েছে তবে এখনই আমি বাহনে আরোহণ করে মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যেতাম এবং তাকে হত্যা করে ফেলতাম। কেননা, তার কাছে যাওয়ার কারণ আমার মজুদ রয়েছে। আমার পুত্র তার নিকট বন্দী রয়েছে। সাফওয়ান তার এ কথার উত্তরে বলল, বেশ, তোমার সমস্ত ঋণের আমি যিম্মাদার হচ্ছি এবং তোমার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তোমার সন্তানেরা হবে আমার সন্তান।

উমায়ের বলল, 'সাবধান! ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।' সিদ্ধান্ত হল, সে তার বন্দী সন্তানকে মুক্ত করার অজুহাত নিয়ে মদীনায় গমন করবে এবং সুযোগ মতো অতর্কিত রাসূলুল্লাহ উপর তরবারী চালাবে। অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে এ কাজ করতে গিয়ে একাধিক বারে বেশী আঘাত করা হয়ত বা সম্ভব নাও হতে পারে এবং এর

---

[1] কুদর প্রকৃত পক্ষে মেটোখাকীরং এর এক প্রকার পাখী। কিন্তু একানে বানু সুলামের একটি প্রস্রবণ উদ্দেশ্য, এটা নজদের মধ্যে অবস্থিত। মক্কা হতে (নজদের পথে) সিরিয়াগামী রাজপথের উপর অবস্থিত।

[2] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৯০ পৃঃ, ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৪৩-৪৪ পৃঃ, মুখতাসার সীরাহ শায়খ আব্দুল্লাহ প্রণীত ২৩৬।

ফলে নবী ﷺ আহত হয়েও বেঁচে যেতে পারেন। এ সব ভেবে-চিন্তা উমায়েরর তরবারী খানা তীব্র গরলে সিক্ত করা হল। যাতে মুহাম্মদ ﷺ-কে কোন রকমে আঘাত করতে পারলেই তার প্রাণ রক্ষার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসে রয়েছেন। ওমর (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) বাইরে বসে বদর যুদ্ধ। সম্বন্ধে কথোপকথন করছেন, এমন সময় গলায় তরবারী ঝুলিয়ে উমায়ের মসজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হলো। তখন ওমর (রাঃ) তাকে কুরাইশদের অন্যতম শয়তান বলে উল্লেখ করলেন। তার কুটিল চাহনি ও সন্দেহ জনক হাবভাব দেখে ওমর (রাঃ)-এর মনে খটকা লাগল। তিনি সকলকে সতর্ক হতে ইঙ্গিত করলেন এবং কয়েকজন আনসারকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারদিকে উপবেশন করার আদেশ দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে অবস্থা নিবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু মধুর হাস্য করে বললেন, 'বেশ, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' ওমর (রাঃ) তখন উমায়েরের কণ্ঠ বিলম্বিত তরবারী ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে মসজিদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন এবং উমায়েরকে তাঁর কাছে আসতে বললেন। সে নিকটে এসে বলল, 'আপনাদের প্রাতঃকাল শুভহোক।' নবী ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে এর চাইতে অনেক ভাল অভিবাদন দান করেছেন অর্থাৎ সালাম যা হচ্ছে জান্নাতীদের অভিবাদন।'

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমায়েরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উমায়ের, কি মনে করে এসেছো?' সে উত্তরে বলল, 'হুযূর এ বন্দীদের জন্যে আপনি দয়া করুন।' তিনি বললেন, 'এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তু এ তরবারী এনেছো কেন?'

উমায়ের উত্তরে দিলো 'তরবারীর কপাল পুড়ুক, এটা আপনাদের কি ক্ষতি করতে পেরেছে?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনঃ পুনঃ সত্য বলতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সে নানা প্রকার টাল বা হানা করে এ কথাই বলতে থাকল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেঁসে মক্কার গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং সাফওয়ানের সাথে প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সব কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। এমন গোপনীয় পরামর্শ, গুপ্ত ষড়যন্ত্র! তিনি এ সব ব্যাপারে কিরূপে অবগত হলেন? উমায়ের তখন চমকিত চিত্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ মুজিয়ার কথা চিন্তা করতে লাগল। তার বিবেক আর সত্য গোপন করতে পারলো না।

সে ভয়-ভক্তি বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগল 'মুহাম্মদ ﷺ, পূর্বে আপনার কথায় বিশ্বাস করিনি, এখন সে জন্য অনুতপ্ত হচ্ছি। বস্তুতঃ আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ পাকের জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাকে সত্যের জ্যোতি সুদর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেছেন।

এ রূপে প্রাণের বৈরী দু'দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধমাধম সেবকে পরিণত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমাদের এ ধর্ম ভ্রাতাকে উত্তমরূপে ধর্ম ও কুরআন শিক্ষা দাও এবং তার প্রার্থিত বন্দীদের মুক্তি দাও।' কিছুকাল পরে উমায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, 'মহাত্মন! আমি আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত এবং সত্যের সেবকদেরকে নির্যাতিত করতে সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এরূপে যে মহাপাপ আমি সঞ্চয় করেছি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি মক্কায় গিয়ে যথাসাধ্য ইসলাম প্রচার করতে থাকি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ উমায়ের (রাঃ)-কে অনুমতি দিলেন এবং স্পর্শমণির সংশ্রবে নতুন জীবন লাভ করে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এদিকে সাফওয়ান মক্কার লোকদেরকে ইঙ্গিত বলে রেখেছিল, 'দেখে নিয়ো, আমি শীঘ্রই এমন এক শুভ সংবাদ দিতে পারবো যার ফলে তোমরা বদর যুদ্ধের সমস্ত শোক ভুলে যাবে।' কিন্তু উমায়েরকে দেখে সে অবাক হয়ে রইলো। একি! এহেন দুর্ধর্ষ উমায়ের; তার উপরও মুহাম্মদ ﷺ-এর যাদু খেটে গেল, যাহোক, উমায়ের আর কোন দিকে দৃকপাত না করে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে লাগলেন। তার আদর্শে ও প্রচার মাহাত্মে মক্কার বহু সংখ্যক নরনারী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন।[1]

---

[1] ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ৬৬১-৬৬৩ পৃঃ।

৩.গাযওয়ায়ে বনী কাইনুকা বা কাইনুকা অভিযান (غــزوة بني قينقــاع) ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমনের পর ইহুদীদের সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন তার দফা গুলো ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ চেষ্টা ও ইচ্ছা ছিল যে, এ চুক্তি পত্রে যে সব শর্ত আরোপিত হয়েছে সেগুলো যেন পুরোপুরিভাবে পালিত হয়। সুতরাং মুসলিমরা এমন এক পদও অগ্রসর হননি যা এ চুক্তি নামার কোন একটি অক্ষরেরও বিপরীত হয়। কিন্তু ইহুদীদের ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতা, হঠকারিতা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে পরিপূর্ণ। তারা অতি তাড়াতাড়ি তাদের পূর্ব স্বভাবের দিকে ফিরে গেল। তারা মুসলিমদের মধ্যে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টায় লেগে পড়লো। এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে।

ইয়াহুদীদের প্রতারণার একটি নমুনা (نموذج من مكيدة اليهود) ঃ

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, শাশ ইবনু কায়েস নামক একজন বৃদ্ধ ইয়াহুদী ছিল। তার পা যেন কবরে লটকানো ছিল (অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল)। সে মুসলিমদের প্রতি চরম শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করত। সে একদা সাহাবীগণের (রা.) একটি মজলিশের পাশ দিয়ে গমন করছিল যে মজলিসে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রেরই লোকেরা পরস্পর কথোপকথন করছিলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার অন্তর হিংসায় জ্বলে উঠল এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পথ সে অন্বেষণ করতে লাগল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ঐ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী প্রেম প্রীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং এভাবে তাদের দীর্ঘ কালের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়েছিল। সমবেত জনতাকে দেখে সে বলতে লাগল এখানে বনু কাইলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়েছে। আল্লাহর কসম! এ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট দিয়ে আমার গমন সঙ্গত হবে না। তাই সে তার এক যুবক সঙ্গীকে নির্দেশ দিল যে, সে যেন তাদের মজলিসে যায় এবং তাদের সঙ্গে বসে গিয়ে বুআস যুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী অবস্থা আলোচনা করে এবং ঐ সময়ে উভয় পক্ষ হতে যে সকল কবিতা পাঠ করা হয়েছিল ওগুলোর কিছু কিছু পাঠ করে শুনিয়ে দেয়। ঐ যুবক ইহুদীকে যা যা বলা হয়েছিল ঠিক সে ঐ রূপই করল।

ঐ কবিতাগুলো শোনা মাত্রই উভয় গোত্রের লোকদের মধ্যে পুরনো হিংসা বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক বাক বিতণ্ডা হয়ে গেল। যুদ্ধের উন্মাদনা নিয়ে উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ হার্রাহ নামক স্থানে সমবেত হলেন।

এ দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির সাহাবীগণ (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের মাঝে আগমন করে বললেন,

(يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام، وأكرمكم به، وقطع بـــه عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم)

'হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহ ক্ষমা করুন, এ কি হচ্ছে? আমার জীবদ্দশাতেই জাহেলিয়াতের চিৎকার? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে মুসলিম করেছে, ইসলামের দ্বারা জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে তোমাদিগকে কুফর হতে মুক্ত করে তোমাদের পরস্পরের হৃদয়কে এক অপরের সাথে বেঁধে দিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শুনে নিজেরা নিজেদেরকে সামলিয়ে নিলেন এবং অনুধাবন করলেন যে, এটা শয়তানের প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর তাঁরা পরস্পর গলায়-গলায় মিলে ক্রন্দন এবং তওবাহ করলেন। এভাবে শাশ ইবনু কায়েসের প্রতি হিংসার আগুন নির্বাপিত হল।[1]

এটা হচ্ছে কুচক্রীপণা ও গণ্ডগোলের একটা নমুনা যা ইহুদীরা মুসলিমদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকত। এ কাজের জন্যে তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করত এবং মিথ্যা রটনা রটাতে থাকত। তারা সকালে মুসলিম হয়ে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যেত এবং এভাবে সরল প্রাণ মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টায় লেগে থাকত। কোন মুসলমানের সাথে তাদের অর্থের সম্পর্ক থাকলে তারা তার জীবিকার পথ সংকীর্ণ

---

[1] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫৫৫-৫৫৬ পৃঃ।

করে দিত। আর তাদের উপর মুসলিমদের ঋণ থাকলে তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করত না, বরং অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত এবং বলত তোমাদের ঋণ তো আমাদের উপর ঐ সময় ছিল যখন তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের উপর ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা ঐ ধর্ম যখন পরিবর্তন করেছো। তখন আমাদের নিকট হতে ঋণ আদায়ের তোমাদের কোন পথ নেই।[1]

প্রকাশ থাকে যে, ইহুদীরা এ সব কার্যকলাপ বদর যুদ্ধের পূর্বেই শুরু করেছিল এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার সূচনা করে ফেলেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা ইহুদীদের হিদায়াত প্রাপ্তির আশা করে তাদের এ সব কার্যকলাপের উপর ধৈর্য ধারণ করে চলছিলেন। এছাড়া এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, যেন ঐ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

বনু কাইনুকার অঙ্গীকার ভঙ্গ (بنو قَينُقَاع ينقضون العهد) ঃ

ইহুদীরা যখন দেখল যে, আল্লাহ তা'আলা বদর প্রান্তরে মুসলিমগণকে চরমভাবে সাহায্য করে তাদেরকে মর্যাদা মণ্ডিত করলেন এবং দূরবর্তী নিকটবর্তী প্রতিটি স্থানের বাসিন্দাদের অন্তরে তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হল, তখন তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসায় তারা ফেটে পড়ল। প্রকাশ্যভাবে তারা শত্রুতার ভাব প্রদর্শন করতে লাগল এবং খোলাখুলিভাবে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল ও দুঃখ কষ্ট দিবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হিংসুটে ও প্রতিহিংসা পরায়ন ছিল কাব বিন আশরাফ, যার আলোচনা সামনে আসছে। অনুরূপভাবে ইহুদীদের তিনটি গোত্রের মধ্যে সর্বাধিক হিংসুটে ছিল বনু কাইনুকা গোত্রটি। এরা সকলেই মদীনার মধ্যে অবস্থান করত এবং তাদের মহল্লাটি তাদের নামেই কথিত ছিল। পেশার দিকে দিয়ে তার ছিল স্বর্ণকার কর্মকার ও পাত্র নির্মাতা। এ কারণে ওদের প্রত্যেকের নিকটে বহুল পরিমাণে সমরাস্ত্র মওজুদ ছিল। তাদের যোদ্ধার সংখ্যা সাতশত। তারা ছিল মদীনার সবচেয়ে বাহাদুর ইহুদী গোষ্ঠী। তাদের সর্বপ্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ তা'আলা যখন বদর প্রান্তরে মুসলিমগণকে বিজয় দান করলেন তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ চরমে উঠল। তারা তাদের প্রতিহিংসা, অন্যায়াচরণ এবং ঝগড়া বাঁধানোর কার্যকলাপের সীমা আরো বাড়িয়ে দিল। সুতরাং যে মুসলিমই তাদের বাজারে যেতেন তাঁরই তারা ঠাট্টা তামাশা এবং বিদ্রুপাত্মক আচরণ শুরু করে দিত এবং নানাভাবে কষ্ট দিত। এমন কি মুসলিম মহিলাদের নিয়েও তারা উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে কসুর করত না।

এভাবে পরিস্থিতির যখন চরমে পৌঁছল এবং তাদের ঔদ্ধত্যপনা বেড়েই চলল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং বনু কাইনুকার বাজারে উপস্থিত হলেন এবং ইহুদীদেরকে ডেকে নানা প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করলেন। ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্যরা ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর প্রান্তরে কুরাইশদিগকে পরাজিত করে যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন বনু কাইনুকার বাজারে ইহুদীদের একত্রিত করে বললেন, 'হে ইহুদী সমাজ, তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর, অন্যথায় কুরাইশদের মতো তোমাদেরকেও বিপন্ন হতে হবে।'

কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল না। চরম ধৃষ্টতা সহকারে তারা বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ কতিপয় আনাড়ী কুরাইশকে হত্যা করেছ বলে গর্বিত হয়ো না। যুদ্ধ সম্বন্ধে তারা একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হবে তখন বুঝবে যে, ব্যাপারটি কত কঠিন।' তাদের এ সব জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران ١٢، ١٣]

[1] সূরা আল-ইমরান প্রভৃতির তাফসীর, মুফাসসিরগণ ইহুদীদের এ সব কার্যকলাপ বর্ণনা দিয়েছেন।

"যারা কুফরী করে তাদেরকে বলে দাও, 'তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে' আর তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকানো হবে, ওটা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থান'! ১৩. তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে সেই দু'দল সৈন্যের মধ্যে যারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়িয়েছিল (বাদ্‌র প্রান্তরে)। একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছিল এবং অপরদল ছিল কাফির, কাফিররা মুসলিমগণকে প্রকাশ্য চোখে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করে থাকেন, নিশ্চয়ই এতে দৃষ্টিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।' [আলু-'ইমরান (৩) : ১২-১৩]

মোট কথা, বনু কাইনুকা যে জবাব দিয়েছিল তাতে পরিস্কারভাবে যুদ্ধের ঘোষণাই ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রোধ সংবরণ করে ধৈর্য্য ধারণ করেন। অন্যান্য মুসলিমগণও ধৈর্য্য ধারণ করে পরবর্তী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

এদিকে ঐ হিতোপদেশের পর বনু কাইনুকার ইহুদীগণের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যেই তারা মদীনাতে হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে তারা নিজের কবর নিজের হাতেই খনন করে এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তোলে।

আবু আত্তন থেকে ইবনু হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এ সময়ে জনৈকা মুসলিম মহিলা বানুকাইনুকার বাজারে দুধ বিক্রী করে বিশেষ কোন প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসে পড়েন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ইহুদী তাঁর মুখের অবগুণ্ঠন খোলাবার অপচেষ্টা করে, তাতে মহিলাটি অস্বীকার করেন। এ স্বর্ণকার গোপনে মহিলাটির পরিহিত বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পিঠের উপরে গিরা দিয়েছিল, তিনি তা বুঝতেই পারলেন না। তিনি উঠতে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়লেন। এ ভদ্র মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে নর পিশাচের দল হো হো করে হাত তালি দিতে থাকল। মহিলাটি ক্ষোভে ও লজ্জায় মৃত প্রায় হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তা শুনে জনৈক মুসলিম ঐ স্বর্ণকারকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। প্রত্যুত্তোরে ইহুদীগণ মুসলিমটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করে।

এরপর নিহত মুসলিমটির পরিবার বর্গ চিৎকার করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের নিকট ফরিয়াদ করলেন। এর ফলে মুসলিম ও বনু কাইনুকার ইহুদীদের মধ্যে সংঘাত বেঁধে গেল।[1]

অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন (الحصار ثم التسليم ثم الجلاء) :

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লুবাবাহ ইবনু আব্দুল মুনযির (رضي الله عنه)-এর উপর অর্পণ করে স্বয়ং হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (رضي الله عنه)-এর হাতে মুসলিমদের পতাকা প্রদান করে আল্লাহর সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বনু কাইনাকার দিকে ধাবিত হলেন। ইহুদীরা তাদেরকে দেখামাত্র দূর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে দূর্গের দ্বারগুলো উত্তমরূপে বন্ধ করে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিনভাবে তাদের দূর্গ অবরোধ করলেন। এ দিনটি ছিল শুক্রবার, হিজরী ২য় সনের শাওয়াল মাসের ১৫ তারীখে। ১৫ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ যুলকাদার নতুন চাঁদ উদয় হওয়া অবধি অবরোধ জারী থাকল। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের অন্তরে ভীতি ও সন্ত্রস্ত সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর নীতি এটাই যে, যখন তিনি কোন সম্প্রদায়কে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে থাকেন। অবশেষে বনু কাইনুকা আত্মসমর্পণ করল এবং বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জান মাল, সন্তান-সন্ততি এবং নারীদের ব্যাপারে যা ফায়সালা করবেন তারা তা মেনে নিবে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশক্রমে তাদের সকলকে বেঁধে নেয়া হয়।

কিন্তু এ স্থানে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার কপট চাল চালাবার সুযোগ গ্রহণ করল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অত্যন্ত অনুনয় বিণয় করে বলল, 'হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি এদের প্রতি স্বদয় ব্যবহার করুন।' প্রকাশ থাকে যে, বনু কাইনুকা গোত্র খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে বিলম্ব

[1] ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ।

করলেন। সে পীড়াপিড়ি করতে থাকল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু শেষে সে তাঁর ﷺ জামার বুকের অংশ বিশেষ ধরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ বিরক্তি ও ক্রোধ সহকারে পুনঃপুনঃ তাকে ছেড়ে দিতে বললেন, কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও সে পুনঃ পুনঃ উত্তর করতে লাগল 'আমি কোন মতেই ছাড়বো না যে পর্যন্ত না আপনি তাদের উপর দয়া পরবশ হন। চারশ জন খোলা দেহের যুবক এবং তিনশ জন বর্মপরিহিত যুবককে আপনি একই দিনের সকালে কেটে ফেলবেন, অথচ তারা আমাকে কঠিন বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। আল্লাহর কসম! আমি কালচক্রের বিপদের আশঙ্কা করছি।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ধন মাল হস্তগত করলেন যেগুলোর মধ্যে তিনটি কামান, দুটি বর্ম, তিনটি তরবারী এবং তিনটি বর্শা নিজের জন্যে বেছে নেন এবং গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বের করেন। মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) গণীমত একত্রিত করার কাজ সম্পাদন করেন।[1]

৪. গাযওয়ায়ে সাভীক বা ছাতুর যুদ্ধ (غزوة السَّوِيق) ঃ

এদিকে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া ইহুদী এবং মুনাফিকরা নিজ নিজ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, অপরদিকে আবু সুফিয়ানও এমন ব্যবস্থাপনা কার্যকরী করার সুযোগে ছিলেন যাতে কষ্ট কম হয় আর ফল ভাল হয়। তিনি এ ব্যবস্থাপনা তাড়াতাড়ি কার্যকরী করে স্বীয় কওমের মর্যাদা রক্ষা এবং তাদের শক্তি প্রকাশ করার ইচ্ছা করছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অপবিত্রতার কারণে তাঁর মস্তক পানি স্পর্শ করবে না যে, পর্যন্ত না তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। সুতরাং তিনি তাঁর এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্যে দুশ জন অশ্বারোহী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং কানাত উপত্যকার শেষে অবস্থিত নীব নামক এক পর্বত প্রান্তে তাবু স্থাপন করেন। মদীনা হতে এ জায়গাটির দূরত্ব প্রায় বারো মাইল। মদীনার উপর খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করার সাহস তাঁর ছিল না বলে তিনি এমন এক ব্যবস্থা কার্যকরী করলেন যেটাকে ডাকাতি বলা যেতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, তিনি রাত্রির অন্ধকারে মদীনার পার্শবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং হোয়াই ইবনু আখতাবের নিকট গিয়ে তার দরজা খুলিয়ে নেন। কিন্তু হোয়াই পরিণাম চিন্তা করে তাঁকে তার বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। আবু সুফিয়ান তখন সেখান হতে ফিরে গিয়ে বনু নাযীরের সালাম ইবনু মুশকিম নামক আর এক সর্দারের নিকট উপস্থিত হন। সে বনু নাযীর গোত্রের কোষাধ্যাক্ষ ছিল। আবু সুফিয়ান তার বাড়ির ভিতের প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে অনুমতি প্রদান করে। সে তার অতিথি সেবাও করে। খাদ্য ছাড়াও মদ্যও পান করার এবং লোকদের গোপনীয় অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত করে। রাত্রির শেষভাগে আবু সুফিয়ান সেখান হতে বের হয়ে নিজের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হন এবং একটি দল পাঠিয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী আরীয নামক একটি জায়গার উপর হামলা করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন। ঐ দলটি তথাকার কিছু খেজুরের গাছ কর্তন করে এবং জ্বালিয়ে দেয়, আর একজন আনসারী ও তার মিত্রকে তাদের জমিতে পেয়ে হত্যা করে দেয় এবং দ্রুত বেগে পলায়ন করে মক্কার পথে ফিরে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই দ্রুত গতিতে আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু তার আরো দ্রুত গতিতে পলায়ন করে। সুতরাং তাদেরকে ধরা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু তারা বোঝা হালকা করার জন্যে ছাতু, পাথেয় এবং বহু আসবাব পত্র ফেলে দয়ে যা মুসলিমদের হস্তগত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কারকুরাতুল কুদর পর্যণ্ত পশ্চাদ্ধাবন করে ফিরে আসেন। ফিরবার পথে তাঁরা ছাতু ইত্যাদি বোঝাই করে নিয়ে আসেন। এ অভিযানের নাম গাযওয়ায়ে সাভীক রাখা হয়। কারণ আরবী ভাষায় ছাতুকে সাভীক বলা হয়। এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের মাত্র দুমাস পর হিজরী ২য় সনের যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়।[2]

এ যুদ্ধ কালীন সময়ে মদীনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লুবাবাহ ইবনু আব্দুল মুনযির (রাঃ)-এর উপর অর্পণ করা হয়।

---

[1] যা'দুল মাআদ ২য় খণ্ড ৭১ ও ৯১ পৃঃ এবং ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৪৭-৪৯ পৃঃ।

[2] যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯০-৯১ পৃঃ, ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৪৪-৪৫ পৃঃ।

৫. গাযওয়ায়ে যী আমর (غزوة ذي أمر) ঃ

বদর ও উহুদ মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বাধীনে এটাই সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান। এটা তৃতীয় হিজরীর মুহরম মাসে সংঘটিত হয়।

এ অভিযানের কারণ ঃ মদীনার গোয়েন্দা বাহিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর দেন যে, বনু সা'লাবাহ ও মুহারিব গোত্রের এক বিরাট বাহিনী মদীনার উপর আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হচ্ছে। এ খবর শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমগণকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন এবং আরোহী ও পদাতিক মিলে মোট চারশ জন সৈন্যের বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-কে মদীনার নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

পথে সাহাবীগণ বনু সা'লাবাহ গোত্রের জাব্বার নামক এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তিনি তাকে বিলাল (রাঃ)-এর বন্ধুত্বে দিয়ে দেন এবং সে পথ প্রদর্শক রূপে মুসলিমগণকে শত্রুদের অবস্থানস্থল পর্যন্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যায়।

এদিকে শত্রুরা মদীনার সৈন্য বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং আশে পাশের পাহাড় গুলোতে লুকিয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং সেনাবাহিনী সহ ঐ জায়গা পর্যন্ত গমন করেন যে টাকে শত্রুরা নিজেদের দলের একত্রিত হওয়ার স্থান নির্বাচিত করেছিল। এটা ছিল আসলে একটি প্রস্রবণ যা যী আমর নামে পরিচিত ছিল। বেদুইনদের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিমদের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করানোর জন্য তৃতীয় হিজরীর পূর্ণ সফর মাসটি তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন।[1]

৬. কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা (قتل كعب بن الأشرف) ঃ

এ ছিল ইহুদীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করত। সে নবী ﷺ-কে কষ্ট দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বেড়াত 'তাই' গোত্রের শাখা বনু নাবাহানের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। আর তার মাতা বনু নাযীর গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সে ছিল বড় ধনী ও পুঁজিপতি। আরবে তার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। সে একজন খ্যাত নামা কবিও ছিল। তার দূর্গটি মদীনার দক্ষিণে বনু নাযীর গোত্রের আবাদী ভূমির পিছনে অবস্থিত ছিল।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভ এবং নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের নিহত হওয়ার প্রথম খবর শুনে সে অকস্মাৎ বলে ওঠে 'সত্যিই কি ঘটনা এটাই? এরা ছিল আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং জনগণের বাদশাহ। যদি মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে হত্যা করে থাকে তবে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ ওর উপরিভাগ হতে উত্তম হবে অর্থাৎ আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।

তারপর যখন সে নিশ্চিতরূপে জানতে পারল যে, এটা সত্য খবর তখন আল্লাহর এ শত্রু রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের নিন্দা এবং ইসলামের শত্রুদের প্রশংসা করতে শুরু করল এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। কিন্তু এতেও তার বিদ্বেষ বহ্নি প্রশমিত না হওয়ায় সে অশ্বে আরোহণ করে কুরাইশদের নিকট গমন করল এবং মুত্তালিব ইবনু আবী অদাআ সাহমীর অতিথি হল। তারপর সে কুরাইশদেরকে মর্যাদাবোধে উত্তেজিত করতে, তাদের প্রতিশোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে এবং তাদেরকে নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করতে কবিতা বলে বলে ঐ কুরাইশ নেতাদের জন্য বিলাপ করতে লাগল যাদের বদর প্রান্তরে হত্যা করার পর কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। মক্কায় তার অবস্থান কালে আবু সুফিয়ান ও মুশরিকরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নিকট আমাদের দ্বীন বেশী পছন্দনীয় না মুহাম্মদ ﷺ- ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বীন? আর উভয় দলের

---

[1] ইবুন হিশাম ২য় খণ্ড ৪৬ পৃঃ, যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ, কথিত আছে যে, দা'সুর অথবা গাওরসি মুহারিবী এ যুদ্ধেই নবী ﷺ-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এটা অন্য এক যুদ্ধের ঘটনা। সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ডের ৫৯৩ পৃঃ।

মধ্যে কনো দলটি বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত?' উত্তরে কা'বা ইবনু আশরাফ বলল 'তোমরাই তাদের চেয়ে বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত এবং উত্তম। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: ٥١].

"যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে, সেই লোকেদের প্রতি তুমি কি লক্ষ্য করনি, তারা অমূলক যাদু, প্রতিমা ও তাগূতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং কাফিরদের সম্বন্ধে বলে যে, তারা মু'মিনগণের তুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে।' [আন-নিসা (৪) : ৫১]

কা'ব ইবনু আশরাফ এ সব কিছু করে মদীনায় ফিরে এসে সাহাবীয়ে কেরামের স্ত্রীদের ব্যাপারে বাজে কবিতা বলতে শুরু করে এবং কটূক্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে ভীষণ কষ্ট দিতে থাকে।

তাই এ দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কে এমন আছে যে, কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করতে পারে? কেননা, সে আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ), আব্বাদ ইবনু বিশর (রাঃ), আবু নায়েলাহ (রাঃ) যিনি ছিলেন কা'বের দুধ ভাই, হারিস ইবনু আউস (রাঃ) এবং আবু আবস ইবনু জাবর (রাঃ) এ খিদমতের জন্যে এগিয়ে আসেন। এ সংক্ষিপ্ত বাহিনীর নেতা ছিলেন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ)।

কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যার ব্যাপারে যে সব বর্ণনা রয়েছে ওগুলোর সারমর্ম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বললেন, 'কা'ব ইবনু আশরাফকে কে হত্যা করতে পারে? সে আল্লাহ এবং তার রাসূল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে।' তখন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) উঠে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি প্রস্তুত আছি। আমি তাকে হত্যা করব এটা কি আপনি চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ' তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি আমাকে অস্বাভাবিক কিছু বলার অনুমতি দিচ্ছেন কি?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ' তুমি বলতে পার।'

এরপর মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) কা'ব ইবনু আশরাফের নিকট গমন করলেন এবং তাকে বললেন, 'এ ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে সাদকাহ চাচ্ছে এবং প্রকৃত কথা হচ্ছে সে আমাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

একথা শুনে কা'ব বলল, 'আল্লাহর কসম! তোমাদের আরো বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) বললেন, 'আমরা যখন তার অনুসারী হয়েই গেছি তখন হঠাৎ করে এখনই তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত মনে করছি না। পরিণামে কি হয় দেখাই যাক। আচ্ছা, আমি আপনার কাছে এক অসাক বা'দু অসাক (এক অসাক =১৫০) খাদ্য শস্যের আবেদন করছি?'

কা'ব বলল 'আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখো।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলাম (রাঃ) বললেন, 'আপনি কি জিনিস বন্ধক রাখা পছন্দ করেন?'

কা'ব উত্তরে দিলো, 'তোমাদের নারীদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখো।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলাম (রাঃ) বললেন, 'আপনি আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদর্শন পুরুষ, সুতরাং আমরা আমাদের নারীদেরকে কিরূপে আপনার নিকট বন্ধক রাখতে পারি?'

সে বলল, 'তাহলে তোমাদের পুত্রদেরকে বন্ধক রাখো।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) বললেন, 'আমরা আমাদের পুত্রদেরকে কি করে বন্ধক রাখতে পারি? এরূপ করলে তাদেরকে গালি দেয়া হবে যে, এক অসাক বা দু অসাক খাদ্যের বিনিময়ে তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্যে খুবই লজ্জার কথা হবে। আমরা অবশ্য আপনার কাছে অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি।'

এরপর দুজনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা অস্ত্র নিয়ে তার কাছে আসবেন। এদিকে আবু নায়েলাও অগ্রসর হলেন অর্থাৎ কা'ব ইবনু আশরাফের কাছে আসলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন দিকের কবিতা শোনা ও শোনানোর কাজ চললো। তারপর আবু নায়েলা বললেন, 'ভাই ইবনু আশরাফ! আমি এক প্রয়োজনে এসেছি। এটা আপনাকে আমি বলতি চাচ্ছি এই শর্তে যে, আপনি কারো কাছে এটা প্রকাশ করবেন না।' কা'ব বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাই করব।'

আবু নায়েলাহ বললেন, 'এ ব্যক্তির (মুহাম্মদ -এর) আগমন তো আমাদের জন্যে পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছ। গোটা আরব আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। আমাদের পথ ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে, পরিবার পরিজন ধ্বংস হতে চলেছে। সন্তান-সন্ততির কষ্টে আমরা চৌচির হচ্ছি।' এরপর তিনি ঐ ধরণেরই কিছু আলাপ আলোচনা করলেন, যেমন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা করেছিলেন। কথোপকথনের সময় আবু নায়েলাহ এ কথাও বলেছিলেন আমার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব রয়েছে যাদের চিন্তাধারা ঠিক আমারই মত। আমি তাদরকেও আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। আপনি তাদের হাতেও কিছু বিক্রি করুন এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করুন।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসালাম এবং আবু নায়েলাহ নিজ নিজ কথোপকথনের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হন। কেননা, ঐ কথোপকথনের পরে অস্ত্রসস্ত্র বন্ধু বান্ধবসহ এ দুজনের আগমনের কারণে কা'ব ইবনু আশরাফের সতর্ক হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তারপর হিজরী ৩য় সনের রবিউল আওয়াল মাসের ১৪ তারীখে চাঁদনী রাতে এ ক্ষুদ্র বাহিনী রাসূলুল্লাহ -এর নিকট একত্রিত হন। রাসূলুল্লাহ বাকীয়ে গারকাদ পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করেন। তারপর বলেন, 'আল্লাহর নাম নিয়ে যাও। বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ এদেরকে সাহায্য করুন।' তারপর তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর বাড়িতে তিনি সালাত ও মুনাজাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

এদিকে এ বাহিনী কা'ব ইবনু আশরাফের দুর্গের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাওয়ার পর আবু নায়েলাহ উচ্চস্বরে ডাক দেন। ডাক শুনে কা'ব তাদের নিকট আসার জন্যে উঠলে তার স্ত্রী, যে ছিল নববধূ তাকে বলল, 'এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? আমি এমন শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে, যেন তা হতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।'

স্ত্রীর এ কথা শুনে কা'ব বলল, 'এটা তো আমার ভাই মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নায়েলাহ। সম্ভ্রান্ত লোককে যদি তরবারী যুদ্ধের দিকে আহ্বান করা হয় তবে সে ডাকেও সে সাড়া দিবে।' এরপর সে বাইরে আসল। তার দেহ থেকে সুগন্ধি ছুটছিল এবং তার মাথায় খোশবুর ঢেউ খেলছিল।

আবু নায়েলাহ তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে রেখেছিলেন। 'যখন সে আসবে তখন আমি তার চুল ধরে শুঁকবো। যখন তোমরা দেখবে যে, আমি তার মাথা ধরে তাকে ক্ষমতার মধ্যে পেয়ে গেছি তখন ঐ সুযোগে তোমরা তাকে হত্যা করবে।'

সুতরাং যখন কা'ব আসলো তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা ও গল্পগুজব চললো। তারপর আবু নায়েলাহ বললেন, 'ইবনু আশরাফ! আজুয ঘাঁটি পর্যন্ত চলুন। সেখানে আজ রাতে কথাবার্তা বলাবলি হবে। সে বলল, 'তোমাদের ইচ্ছা হলে চলো।' তারপর তাদের সাথে সে চলল।

পথের মধ্যে আবু নায়েলাহ তাকে বললেন, 'আজকের মতো এমন উত্তম সুগন্ধির সাথে আপনার পরিচয় নেই।' একথা শুনে কা'বের বক্ষ গর্বে ফুলে উঠল। সে বলল, 'আমার পাশে আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক সুগন্ধি ব্যবহার কারিণী মহিলা রয়েছে।' আবু নায়েলাহ বললেন, 'আপনার মাথাটি একটু শুঁকবো এ অনুমতি আছে কি?' সে উত্তরে বলল 'হ্যা, হ্যাঁ' আবু নায়েলাহ তখন কা'বের মাথায় হাত রাখলেন। তারপর তিনি নিজেও তার মাথা শুঁকলেন এবং সঙ্গীদেরকেও শুঁকালেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আবু নায়েলাহ বললেন, 'ভাই আর একবার শুঁকতে পারি কি?' কা'ব উত্তর দিল 'হ্যাঁ হ্যাঁ। কোন আপত্তি নেই।' আবু নায়েলাহ আবার শুঁকলেন। সুতরাং সে নিশ্চিত হয়ে গেল।

আরো কিছু দূর চলার পর আবু নায়েলাহ পুনরায় বললেন, 'ভাই আর একবার শুঁকবো কি?' এবারও কা'ব উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, শুঁকতে পারো।

এবার আবু নায়েলাহ তার মাথায় হাত রেখে ভালভাবে মাথা ধরে নিলেন এবং সঙ্গীদের কে বললেন, 'আল্লাহর এ দুশমনকে হত্যা করে ফেল।' ইতি মধ্যেই তার উপর কয়েকটি তরবারী পতিত হলো, কিন্তু কাজ হলো না। এ দেখে মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা নিজের কোদাল ব্যবহার করে তার দুনিয়ার স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দিলেন। আক্রমণের সময় সে এত জোরে চিৎকার করেছিল যে, চতুর্দিকে তার চিৎকারের শব্দ পৌঁছে গিয়েছিল এবং এমন কোন দূর্গ বাকী ছিল না যেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়নি। কিন্তু ওটা মুসলিমদের ক্ষতির কোন কারণ হয় নি।

কা'বকে আক্রমণ করার সময় হারিস ইবনু আউস -কে তাঁর কোন এক সাথীর তরবারীর কোনার আঘাত লেগেছিল। ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর দেহ হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। কা'বকে হত্যা করে ফিরবার সময় যখন এ ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী হররায়ে আরীয নামক স্থানে পৌঁছেন তখন দেখেন যে, হারিস অনুপস্থিত রয়েছেন। সুতরাং তারা সেখানে থেমে যান। অল্পক্ষণ পরে হারিসও সঙ্গীদের পদচিহ্ন ধরে সেখানে পৌঁছে যান। সেখান হতে তাঁরা তাঁকে উঠিয়ে নেন এবং বাকীয়ে গারকাদে পৌঁছে এমন জোরে তাকবীর ধ্বনি দেন যে, রাসূলুল্লাহ -ও তার শুনতে পান। তিনি বুঝে নেন যে, কা'ব নিহত হয়েছে। সুতরাং তিনিও আল্লাহ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তারপর যখন এ মুসলিম বাহিনী তাঁর খিদমতে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন, 'আফলাহাতিল উজূহু' অর্থাৎ এ চেহারাগুলো সফল থাকুক। তখন তারা বললেন, 'অ অজুহুকা ইয়া রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল আপনার চোহরাও সফলতা লাভ করুক। আর সাথে সাথেই তাঁরা তাগূতের (কা'বের) কর্তিত মস্তক তাঁর সামনে রেখে দেন। তিনি তখন আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেন এবং হারিস -এর ক্ষত স্থানে স্বীয় পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরোগ্য লাভ করেন এবং পরে আর কখনো তিনি কষ্ট অনুভব করে নি।[১]

এদিকে ইহুদীরা যখন কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যার খবর জানতে পারল তখন তাদের শঠতা পূর্ণ অন্তরে ভীতি ও সন্ত্রাসের ঢেউ খেলে গেল। তারা তখন বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ যখন অনুধাবন করবেন যে, শান্তি ভঙ্গকারী, গণ্ডগোল ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদেরকে উপদেশ দিয়ে কোন ফল হচ্ছেনা তখন তিনি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। এ জন্যেই তারা এ তাগূতের হত্যার প্রতিবাদ কোন কিছু করার সাহস করলনা, বরং একেবারে সোজা হয়ে গেল। তারা অঙ্গীকার পূরণের স্বীকৃতি দান করল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণের সাহস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলল।

এভাবে রাসূলুল্লাহ মদীনার বিরুদ্ধে বহিরাক্রমনের মোকাবেলা করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করলেন এবং মুসলিমরা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেলেন যে, গোলযোগের তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন এবং যার গন্ধ তাঁরা মাঝে মাঝে পাচ্ছিলেন।

৭. গাযওয়ায়ে বাহরান (غزوة بُحْران) ঃ

এটা ছিল বড় সামরিক অভিযান যার সৈন্য সংখ্যা ছিল তিনশ জন। এ সেনাদল নিয়ে রাসূলুল্লাহ তৃতীয় হিজরীর রবিউল আখের মাসে বাহরান নামক একটি অঞ্চলের দিকে গমন করেছিলেন। এটা হিজাযের মধ্যে ফারা সীমান্তে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি জায়গা। রাসূলুল্লাহ সেনাবাহিনীর রাবিউল আখের ও জুমাদিউল উলা এ দু'মাস সেখানে অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযানে তাঁদেরকে কোন প্রকার যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়নি।[২]

---

[1] এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫১-৫৭ পৃঃ, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৩৪১-৪২৫ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৫৭৭ পৃঃ, সুনানে আবু দাউদ আউনুল মা'বূদ সহ দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ড ৪২-৪৩ পৃঃ এবং যা'দুল মাআ'দ ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ, এ সব হাদীস গ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে।

[2] ইবুন হিশাম ২য় খণ্ড ৫০-৫১ পৃঃ, যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ। এ গাযওয়ার কারণের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কাথিত আছে, মদীনায় এ খবর পৌঁছে যে, বনু সুলায়েম গোত্র মদীনা ও ওর আশেপাশে আক্রমণ চালাবার জন্যে খুব রকমের সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এটাও কথিত

৮. সারিয়্যাতু যায়েদ ইবনু হারিসাহ (سرية زيد بن حارثة) ঃ

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৩য় হিজরী জুমাদিউল আখের মাসে। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমদের জন্যে এটা ছিল সর্বশেষ এবং সফল জনক অভিযান। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পর হতে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে নিমজ্জিত তো ছিলই, তদুপরি যখন গ্রীষ্মকাল আসলো এবং শাম দেশে বাণিজ্যের সফরের সময় এসে পড়লো তখন তারা আর এক দুশ্চিন্তায় নিপতিত হলো। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, যাকে ঐ বছর শামদেশে গমনকারী কাফেলার আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল, কুরাইশকে বলল 'মুহাম্মদ ﷺ এবং তার সঙ্গীরা আমাদের বাণিজ্য পথ কঠিন করে ফেলেছে। তার সঙ্গীদের সাথে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব তা আমি বুঝতে পারছি না। তারা সমুদ্র উপকূল ছাড়তেই চাচ্ছে না। আর উপকূলের বাসিন্দারা তাদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছে। সাধরাণ লোকেরাও তাদের সাথী হয়ে গেছে। তাই, তখন আমি কোন রাস্তা অবলম্বন করব তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আর যদি আমরা বাড়িতেই বসে থাকি তবে মূলধনও খেয়ে ফেলবো, কিছুই বাকী থাকবে না। কেননা, গ্রীষ্মকাল সিরিয়ার সাথে এবং শীতকালে আবিসিনিয়ায় ব্যবসা করার উপরে আমাদের জীবিকা নির্ভর করছে।'

সাফওয়ানের এ উক্তির পর বিষয়টির পর চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গেল। অবশেষে আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব সাফওয়ানকে বলল, 'তুমি উপকূলের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ইরাকের রাস্তায় সফর কর।' প্রকাশ থাকে যে, এটা খুবই দীর্ঘ রাস্তা। এটা নাজদ হয়ে সিরিয়া চলে গেছে এবং মদীনার পূর্ব দিকে কিছু দূর দিয়ে গিয়েছে। কুরাইশদের নিকট এটা ছিল সম্পূর্ণ অজানা পথ।

এ জন্য আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব সাফওয়ানকে পরামর্শ দিল যে, সে যেন বকর ইবনু ওয়াইলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ফুরাত ইবনু হাইয়ানকে পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নেয়।

এ ব্যবস্থাপনার পর কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলা সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার নেতৃত্বে নতুন পথ ধরে যাত্রা শুরু করল। কিন্তু এ যাত্রীদলের এ পথ যাত্রার খবর ইতি মধ্যেই মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল। ঘটনা হল সালীত ইবনু নুমান যিনি মুসলিম হয়েছিলেন, নাঈম ইবনু মাসউদের সাথে এক মদ্যপানের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নাঈম তখনো মুসলিম হয়নি। এটা মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। যখন নাঈমের উপর নেশা চেপে বসল। তখন সে কুরাইশ কাফেলার সফর এবং তাদের অভিপ্রায়ের কথা পূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিল। সালীত (রাঃ) দ্রুতগতিতে নবী কারীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং একশ জন অশ্বারোহীর একটি বাহিনীকে যায়েদ ইবনু হারিসার নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন। যায়েদ (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করলেন। কুরাইশদের কাফেলা সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় কারদাহ নামক একটি প্রস্রবণের উপর শিবির স্থাপনের নিমিত্ত অবতরণ করছিল, ইত্যবসরে মুসলিম বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পুরো কাফেলার উপর অধিকার লাভ করলেন। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া এবং কাফেলার অন্যান্য রক্ষকদের পলায়ন ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না।

মুসলিমরা কাফেলার পথ প্রদর্শক ফুরাত ইবনু হাইয়ানকে এবং কথিত মতে আরো দুজনকে গ্রেফতার করে নেন। কাফেলার নিকট প্রচুর পরিমাণ রৌপ্য ছিল, যার মূল্য আনুমানিক এক লক্ষ্য দিরহাম হবে, সবগুলোই মুসলিমরা গনীমতরূপে লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকীগুলো মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ফুরাত ইবনু হাইয়ান নবী কারীম ﷺ -এর পবিত্র হাতে ইসলামের দীক্ষাগ্রহণ করেন।[1]

আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের কোন এক যাত্রীদলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। ইবনু হিশাম এ কারণেই বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু কাইয়ূমও এটাই গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি প্রথম কারণটি উল্লেখ করেন নি। এটাই সত্য বলেও মনে হচ্ছে। কেননা, বনু সুলায়েম গোত্র ফারা এলাকায় বসবাসই করেনি বরং তারা নাজদের বাসিন্দা ছিল, যা ফারা হতে বহু দূরে।

[1] ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৫০-৫১ পৃঃ, রহমাতুল্লিল আরামনি ২য় খণ্ড ২১৯ পৃঃ

বদর যুদ্ধের পরে এটাই ছিল কুরাইশদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক ঘটনা, যার ফলে তাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এখন তাদের সামনে দুটি মাত্র পথ ছিল, হয় তারা গর্ব ও অহংকার ত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করবে, না হয় ভীষণ যুদ্ধ করে নিজেদের অতীত গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে এবং মুসলিমদের শক্তি এমনভাবে চূর্ণ করে দিবে যাতে তারা পূনর্বার মাথা চাড়া দিতে না পারে। মক্কাবাসীগণ দ্বিতীয় পথটি বেছে নিল। সুতরাং এ ঘটনার পর কুরাইশদের প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। তার মুসলিমদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য এবং তাদের ঘরে ঢুকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এভাবে পূর্ববর্তী ঘটনাবলী ছাড়া এ ঘটনাটিও উহুদ যুদ্ধের বড় একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

غزوة أحد

উহুদের যুদ্ধঃ

প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের জন্যে কুরাইশদের প্রস্তুতি (استعداد قريش لمعركة ناقمة) :

বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীগণের পরাজয় ও অপমানের যে গ্লানি এবং তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার যে দুঃখভার বহন করতে হয়েছিল তারই কারণে তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধিভূত হচ্ছিল। এমনকি তারা তাদের নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ করতেও নিষেধ করে দিয়েছিল এবং বন্দীদের মুক্তিপণ আদায়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেও নিষেধ করেছিল, যাতে মুসলিমরা তাদের দুঃখ যাতনার কাঠিন্য সম্পর্কে ধারণা করতে না পারে। অধিকন্তু তারা বদর যুদ্ধের পর এ বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল যে, মুসলিমগণের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধ করে নিজেদের কলিজা ঠাণ্ডা করবে এবং নিজেদের ক্রোধ ও প্রতিহিংসার প্রক্ষোভ প্রশমিত করবে। এ প্রেক্ষিতে কালবিলম্ব না করে যুদ্ধেও জন্য তারা সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণও শুরু করে দেয়। এ কাজে কুরাইশ নেতৃবর্গের মধ্যে ইকরামা ইবনু আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু রাবীআহ খুব বেশী উদ্যোগী ও অগ্রগামী ছিল।

তারা এ ব্যাপারে প্রথম যে কাজটি করে, তা হচ্ছে, আবু সুফিয়ানের যে কাফেলা বদর যুদ্ধের কারণ হয়েছিল এবং যেটাকে আবু সুফিয়ান বাঁচিয়ে বের করে নিয়ে যেতে সফলকাম হয়েছিল, তার সমস্ত ধনমাল সামরিক খাতে ব্যয় করার জন্যে আটক করে রাখা। ঐ মালের মালিকদের সম্বোধন করে তারা বলেছিল, 'হে কুরাইশের লোকেরা, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের ভীষণ ক্ষতি সাধন করেছে এবং তোমাদের বিশিষ্ট নেতাদের হত্যা করেছে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এ মালের মাধ্যমে সাহায্য কর। সম্ভবত আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারব।' কুরাইশরা তাঁর এ কথা সমর্থন করে। সুতরাং সমস্ত মাল, যার পরিমাণ ছিল এক হাজার উট এবং পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তা সবই বিক্রয় করে দেয়া হয়।
এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَن سَبِيْلِ اللهِ فَسَيُنفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ﴾ [الأنفال: ٣٦]

'যে সব লোক সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহ্র পথ হতে (লোকেদেরকে) বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর এটাই তাদের দুঃখ ও অনুশোচনার কারণ হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে।' [আল-আনফাল (৮) : ৩৬]

অতঃপর তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এ ঘোষণা দিল, 'যে কোন সেনা 'কেনানাহ' এবং 'তেহামাহ'র অধিবাসীদের মধ্য হতে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে চায়। সে যেন কুরাইশদের পতাকা তুলে সমবেত হয়।'

এ ছাড়া আরবের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বংশ ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগল। এ জন্য তারা মক্কায় দু'জন কবিকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করল। তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল আবু আযযা। এ নরাধম বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণের হাতে বন্দী হয়েছিল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়ায় বিনা মুক্তিপণে মুক্তি পেয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল যে, আর কখনো মুসলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। কিন্তু মক্কায় পৌঁছামাত্র সে খুব জোরালো কণ্ঠে বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ ﷺ-কে কেমন ঠকিয়ে এসেছি।' যা হোক, এ নরাধম কুরাইশের অন্যতম কবি মুসাফে' ইবনু আবদে মানাফ জুমাহির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন গোত্রের আরবদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের দুষ্ট প্রতিভা ও

শয়তানী শক্তির প্রভাবে হেজাযের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারণার আগুন জ্বালিয়ে দিল। এ কাজে উৎসাহিত করার জন্য সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া আবু আয্‌যাহকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে যদি নিরাপদে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয় তাহলে ধন সম্পদ দিয়ে তাকে ধনবান করে দেবে। অন্যথায় তার কন্যাদের লালন-পালনের জামিন হয়ে যাবে।

অধিকন্তু, ধর্মের অপমান, ধর্ম মন্দিরের অপমান, ঠাকুর-দেবতার অপমান ইত্যাদি বিষয়ে মুখরোচক ও অপ-প্রচারণা চালিয়ে সর্বত্র তারা এমনই উত্তেজনা সৃষ্টি করে দিল যে, অল্পকালের মধ্যেই নানা স্থান হতে বহু দুর্ধর্ষ আরব যোদ্ধা এসে মক্কায় সমবেত হল এবং দেখতে দেখতে প্রায় তিন সহস্র সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

এদিকে আবু সুফিয়ান 'গাযওয়ায়ে সাভীক' থেকে অকৃতকার্য হয়ে সমস্ত ধন সম্পদ ফেলে দিয়ে পলায়ন করে এসেছিল। সে সম্পর্কেও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করল।

এ ছাড়াও সারিয়্যায়ে যায়েদ বিন হারিসার ঘটনাটি কুরাইশদের যে আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছিল এবং তাদের যে দুঃখ কষ্টের কারণ হয়েছিল- এ ঘটনাও যেন কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটার মতো হল এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এক ফায়সালাকারী যুদ্ধের শুরু হয়ে গেল।

কুরাইশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম এবং কামান (قوام جيش قريش وقيادته) :

বছর পূর্ণ হতে না হতেই কুরাইশের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীর সঙ্গে ১৫ জন মহিলা গেল। কুরাইশ নেতৃবর্গের ধারণায় মেয়েদেরকে সঙ্গে রাখলে তাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষাহেতু বেশী করে বীরত্ব প্রকাশ করার ও আমরণ লড়ে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করা যাবে। সওয়ারীর জন্য তাদের সঙ্গে ছিল তিন হাজার উট এবং যুদ্ধের জন্য ছিল দু'শটি ঘোড়া।[1] ঘোড়াগুলোকে রাখার জন্য ওগুলোর পিঠে আরোহণ করা হয়নি। প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সাত'শটি ছিল লৌহবর্ম। পুরো বাহিনীর জন্য আবু সুফিয়ানকে সেনাপতি নির্বাচন করা হয় এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদকে ঘোড়সওয়ারী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, আর ইকরামা ইবনু আবু জাহলকে তার সহকারী বানানো হয়। প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পতাকা বনু আবিদ্দার গোত্রের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

মক্কা বাহিনীর যুদ্ধ যাত্রা (جيش مكة يتحرك) :

এরূপ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর মক্কাবাহিনী এমন অবস্থায় মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল যে, মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা তাদের অন্তরে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ছিল, যা অচিরেই এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ইঙ্গিত বহন করছিল।

মদীনায় সংবাদ (حركة العدو) :

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশের এ উদ্দ্যোগ আয়োজন ও যুদ্ধ প্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। সুতরাং তিনি এর বিস্তারিত সংবাদ সম্বলিত একখানা পত্রসহ জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করেন। আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দূত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মদীনার পথে এগিয়ে চললেন। মক্কা হতে মদীনা পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার পথ মাত্র তিন দিনে অতিক্রম করে তিনি ঐ পত্রখানা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে অর্পণ করেন। ঐ সময় তিনি মসজিদে কুবাতে অবস্থান করছিলেন।

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পত্রখানা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পাঠ করে শুনালেন। তিনি এগুলোর গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খুব দ্রুত গতিতে মদীনায় আগমন করে আনসার ও মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সলা-পরমার্শ করেন।

---

[1] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৯২ পৃ: এটাই বিখ্যাত কথা । কিন্তু ফাতাহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠাতে ঘোড়ার সংখ্যা একশ' বলা হয়েছে।

আকস্মিক যুদ্ধাবস্থা মোকাবেলার প্রস্তুতি (استعداد المسلمين للطوارئ) :

এরপর মদীনায় সাধারণ সামরিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। যে কোন আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জনগণ সদাসর্বদা রণসাজে সজ্জিত হয়ে থাকতে লাগলেন। এমনকি সালাতের সময়েও তাঁরা অস্ত্র-শস্ত্র সরিয়ে রাখতেন না।

এদিকে আনাসারদের এক ক্ষুদ্র বাহিনী, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনু মু'আয (رضي الله عنه), উসায়েদ ইবনু হুযায়ের (رضي الله عنه) এবং সা'দ ইবনু উবাদাহ (رضي الله عنه) ছিলেন। এঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাহাড়া দেয়ার কাজে নিয়োজিত হয়ে যান।

তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের দরজার উপর অবস্থান নিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করতেন।

আরো কিছু সংখ্যক বাহিনী মদীনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে নিয়োজিত হয়ে যান এ আশঙ্কায় যে, না জানি অসতর্ক অবস্থায় আকস্মিক কোন আক্রমণের শিকার হতে হয়।

অন্য কিছু সংখ্যক বাহিনী শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে গোয়েন্দাগিরির কাজ শুরু করে দেন।

মদীনার প্রান্তদেশে মক্কা সেনা বাহিনী (الجيش المكي إلى أسوار المدينة) :

এদিকে মক্কা সেনাবাহিনী সুপ্রসিদ্ধ রাজপথ দিয়ে চলতে থাকে। যখন তারা আবওয়া নামক স্থানে পৌছে তখন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উৎবাহ এ প্রস্তাব দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাতার সমাধি উৎপাটন করা হোক। কিন্তু এর দরজা খুলে দেয়ার কঠিন পরিণামের কথা চিন্তা করে সেনাবাহিনীর তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।

এরপর এ সেনাবাহিনী তাদের সফর অব্যাহত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত মদীনার নিকটবর্তী হয়ে প্রথমে 'আকীক, নামক উপত্যকা অতিক্রম করে। তারপর কিছুটা ডান দিকে বাঁকিয়ে উহুদের নিকটবর্তী 'আয়নাইন' নামকস্থানে শিবির স্থাপন করে, যা মদীনার উত্তরে 'কানাত' উপত্যকার ধারে অবস্থিত, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৬ই শাওয়াল, শুক্রবারের ঘটনা।

মদীনার প্রতিরক্ষা হেতু পরামর্শ সভার বৈঠক (المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع) :

মদীনার গোয়েন্দা বাহিনী মক্কা সেনাবাহিনীর এক একটি করে খবর মদীনায় পৌঁছে দিচ্ছিল। এমনকি তাদের শিবির স্থাপন করার শেষ সংবাদটিও তাঁরা পৌঁছে দেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পরামর্শ করার ইচ্ছা করেছিলেন। ঐ সভায় তিনি নিজের দেখা একটি স্বপ্নের কথাও প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

(إني قد رأيت والله خيراً، رأيت بقراً يذبح، ورأيت في ذُبَاب سيفي ثُلْماً، ورأيت أني أدخلــت يــدي في درع حصينة)

'আল্লাহর শপথ আমি একটি ভাল জিনিস দেখেছি। আমি দেখি যে, কতগুলো গাভী যবেহ করা হচ্ছে। আরো দেখি যে, আমার তরবারীর মাথায় কিছু ভঙ্গুরতা রয়েছে। আর এও দেখি যে, আমি আমার হাতখানা একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে ঢুকিয়েছি।' তারপর তিনি গাভীর এ তা'বীর ব্যাখ্যা করেন যে, কিছু সাহাবা (رضي الله عنهم) নিহত হবেন। আর তরবারীর ভঙ্গুরতার এ তা'বীর করেন যে, তার বাড়ির কোন লোক শহীদ হবেন এবং সুরক্ষিত বর্মের এ তা'বীর করেন যে, এর দ্বারা মদীনা শহরকে বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم)-এর সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে এ মত পেশ করেন যে, এবার নগরের বাইরে গমন করা কোন মতেই সঙ্গত হবে না, বরং নগরের অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করাই সঙ্গত হবে। কেননা, মদীনা একটি সুরক্ষিত শহর। সুতরাং শত্রু-সৈন্য নগরের নিকটবর্তী হলে মুসলিমরা সহজেই তাদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে। আর মহিলারা ছাদের উপর থেকে তাদেরকে ইট পাটকেল ছুঁড়বে। এটাই

ছিল সঠিক মত। আর মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইও এ মত সমর্থন করে। সে এ পরামর্শ সভায় কাযরাজ গোত্রের একজন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। সে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মত সমর্থন করেনি, বরং যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কারণ এর ফলে সে যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতেও পারছে, আবার কেউ এর টেরও পাচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন যে, এ লোকটি তার সঙ্গীসাথী সহ সর্ব সম্মুখে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোক এবং তার কপটতার উপর যে পর্দা পড়ে ছিল তা অপসৃত হয়ে যাক। আর মুসলিমরা তাদের চরম বিপদের সময় যেন এটা জানতে পারে যে, তাদের জামার আস্তিনের মধ্যে কত সাপ চলাফেরা করছে।

কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবীগণের একটি দল এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তারা সবিনয় নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমরা এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমাদের মতে, এভাবে নগরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে শত্রুপক্ষের সাহস বেড়ে যাবে। তারা মনে করবে যে, আমরা তাদের বলবিক্রম দর্শনে ভীত হয়ে পড়েছি। আমরা শত্রুপক্ষকে দেখাতে চাই যে, আমরা দুর্বল নই কিংবা কাপুরুষও নই। আজ যদি আমরা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে পারি তবে ভবিষ্যতে মক্কাবাসীগণ আমাদেরকে আক্রমণ করতে এত সহজে সাহসী হতে পারবে না।' এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ তো বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা তো এ দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা আল্লাহর কাছে এ মুহূর্তের জন্যই দু'আ করেছিলাম তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এটাই ময়দানে যাওয়ার উপযুক্ত সময়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃতুল্য বীরকুলকেশরী হামযাহ (رضي الله عنه) এতক্ষণ চুপ করে এ সব আলোচনা শ্রবণ করে যাচ্ছিলেন এতক্ষণে তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, 'এটাই তো কথার মতো কথা। আমরা সত্যের সেবক মুসলিম। সত্যের সেবায় প্রাণ বিলিয়ে দেয়াই আমাদের পার্থিব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে এবং জীবন মরণ তারই অধিকার। এ ধরণের চিন্তা করার কোন দরকার আমাদের নেই। হে আল্লাহর সত্য নাবী ﷺ, যিনি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ। মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ না করে আমি খাবার স্পর্শ করব না।'[১]

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ অধিকাংশের এ মতের সামনে নিজের মত পরিত্যাগ করলেন এবং মদীনার বাইরে গিয়েই শত্রু বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা (تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال) :

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জুম'আর সালাতে ইমামতি করেন। খুতবা দান কালে তিনি জনগণকে উপদেশ দেন, সংগ্রামের প্রতি উৎসাহিত করেন এবং বলেন যে, 'ধৈর্য্য ও স্থিরতার মাধ্যমেই বিজয় লাভ সম্ভব হতে পারে। এছাড়া তিনি তাদেরকে এ নির্দেশও দান করেন যে, তারা যেন মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।' তাঁর এ নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে জনগণের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

অতঃপর আসরের সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যক্ষ করেন যে, লোকেরা জমায়েত হয়েছে এবং আওয়ালীর অধিবাসীগণও এসে পড়েছে। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, তাঁর সাথে আবু বকর (رضي الله عنه) এবং উমারও (رضي الله عنه) ছিলেন। তাঁরা তাঁর মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিলেন ও দেহে পোষাক পরিয়ে দিলেন। তিনি উপরে ও নীচে দুটি লৌহ বর্ম পরিধান করলেন, তরবারী ধারণ করলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জনগণের সামনে আগমন করলেন।

জনগণ তাঁর আগমনের অপেক্ষায় তো ছিলেনই, কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বে সা'দ ইবনু মু'আয (رضي الله عنه) এবং উসায়েদ ইবনু হুযায়ের (رضي الله عنه) জনগণকে বলেন, 'আপনারা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে জোর ময়দানে বের হতে উত্তেজিত করেছেন। সুতরাং এখন ব্যাপারটা তাঁর উপরই ন্যস্ত করুন।' এ কথা শুনে জনগণ লজ্জিত হলেন এবং যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বের হয়ে আসলেন তখন তাঁরা তাঁরা নিকট আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র

---

[1] সীরাতে হালবিয়্যাহ ২য় খণ্ড ১৪ পৃঃ।

রাসূল ﷺ আপনার বিরোধিতা করা আমাদের মোটেই উচিত ছিল না। সুতরাং আপনি যা পছন্দ করেন তাই করুন। যদি মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করাই আপনি পছন্দ করেন তবে সেখানেই অবস্থান করুন, আমরা কোন আপত্তি করব না।' তাঁদের এ কথার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কোন নাবী যখন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে যান তখন তাঁর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলা সমীচীন নয়, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও শত্রুদের মধ্যে ফায়সালা করে না দেন।'[1]

এরপর নাবী করীম ﷺ সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেন :

১. মুহাজিরদের বাহিনী। এর পতাকা মুসআব ইবনু উমায়ের আবদারী (رضي الله عنه)-কে প্রদান করেন।

২. আউস (আনসার) গোত্রের বাহিনী। এর পতাকা উসায়েদ ইবনু হুযাযির (رضي الله عنه)-কে প্রদান করা হয়।

৩. খাযরাজ (আনসার) গোত্রের বাহিনী। এর পতাকা হাব্বাব ইবনু মুনযির (رضي الله عنه)-কে প্রদান করা হয়।

মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার, যাদের মধ্যে একশ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত এবং পঞ্চাশ জন ছিলেন ঘোড়সওয়ারী।[2] আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঘোড়সওয়ারী একজনও ছিল না।

যারা মদীনাতেই রয়ে গেছে সেসব লোকদেরকে সালাত পড়ানোর কাজে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম (رضي الله عنه)-কে নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি সেনাবাহিনীকে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন এবং মুসলিম বাহিনী উত্তর মুখে চলতে শুরু করে। সা'দা ইবনু মুআয (رضي الله عنه) ও সা'দ ইবনু উবাদাহ (رضي الله عنه) বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগে আগে চলছিলেন।

'সানিয়্যাতুর বিদা' হতে সম্মুখে অগ্রসর হলে তাঁরা এমন বাহিনী দেখতে পান, যারা অত্যন্ত উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল এবং পুরো সেনাবাহিনী হতে পৃথক ছিল। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, তারা খাযরাজের মিত্র ইহুদী[3] যারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা মুসলিম হয়েছে কি?' জনগণ উত্তরে বলেন, 'না'। তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য নিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

সৈন্য পর্যবেক্ষণ (استعراض الجيش) :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'শায়খান' নামক স্থানে পৌঁছে সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন। যারা ছোট ও যুদ্ধের উপযুক্ত নয় বলে প্রতীয়মান হল তাদেরকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন। তাদের নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه), উসামাহ ইবনু যায়েদ (رضي الله عنه), উসায়েদ ইবনু যুহায়ের (رضي الله عنه), যায়েদ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه), যায়েদ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه), আরাবাহ ইবনু আউস (رضي الله عنه), আমর ইবনু হাযম (رضي الله عنه), আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه), যায়েদ ইবনু হারিসাহ আনসারী (رضي الله عنه) এবং সা'আদ ইবনু হিব্বাহ (رضي الله عنه)।

এ তালিকাতেই বারা ইবনু আযিব (رضي الله عنه)-এর নামও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সহীহ বুখারীতে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণীত হয় যে, তিনি উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অবশ্যই অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও রাফে ইবনু খাদীজা (رضي الله عنه) এবং সামুরাহ ইবনু জুনদুব (رضي الله عنه) যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি লাভ করেন। এর কারণ ছিল, রাফে ইবনু খাদীজা (رضي الله عنه) বড়ই সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। যখন তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো তখন সামুরাহ ইবনু জুনদুর (رضي الله عنه) বললেন, 'আমি রাফে (رضي الله عنه) অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। আমি তাঁকে কুস্তিতে পরাস্ত করতে পারি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সংবাদ দেয়া হলে তিনি তাদের দুজনকে কুস্তি

---

[1] মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, হা'কিম ও ইবনু ইসহাক।

[2] এ কথাটি ইবনু কাইয়ুম যা'দুল মা'আদ, ২য় খণ্ডের ৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার বলেন, এটা ভুল কথা। মুসা ইবনু উকবা জোর দিয়ে বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের সাথে কোন ঘোড়াই ছিল না। ওয়াকেদী বলেন, শুধু দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এবং আরেকটি চিল আবু বুরদাহ (رضي الله عنه)-এর নিকট। (ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড ৩৫০ পৃ:)

[3] এ ঘটনাটি ইবনু সা'দ বর্ণনা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, তারা বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদী ছিল। (২য় খণ্ড ৩৪ পৃঃ)। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। কেননা বনু কাইনুকা গোত্রকে বদর যুদ্ধের অল্প কিছু দিন পরেই নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

লাগিয়ে দেন এবং সত্যি সত্যিই সামুরাহ (রাঃ) রাফে (রাঃ)-কে পরাস্ত করে দেন। সুতরাং তিনিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি পেয়ে যান।

উহুদ ও মদীনার মধ্যস্থলে রাত্রি যাপন (المبيت بين أحد والمدينة) :

এ জায়গায় পৌঁছে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ স্থানে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেন এবং এখানেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাহাড়ার জন্যে পঞ্চাশ জন সাহাবী (রাঃ)-কে নির্বাচন করেন, যারা শিবিরের চার পাশে টহল দিতেন। তাদের পরিচালক ছিলেন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা আনসারী (রাঃ)। এ ব্যক্তি হচ্ছেন সেই যিনি কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যাকারি দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সাফওয়ান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস (রাঃ) নির্দিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাশে পাহাড়া দিচ্ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সঙ্গীদের শঠতা (تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه) :

ফজর হওয়ার কিছু পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় চলতে শুরু করলেন এবং 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এখন তিনি শত্রুদের নিকটে ছিলেন এবং উভয় সেনাবাহিনী একে অপরকে দেখতে ছিল। এখানে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য (তিনশ জন সৈন্য) নিয়ে এ কথা বলতে বলতে ফিরে গেল যে, অযথা কেন জীবন দিতে যাব? সে এ বিতর্কও উত্থাপন করল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কথা না মেনে অন্যদের কথা মেনে নিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে তার কথা মেনে নেন নি এটা তার মুসলিম বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অবশ্যই কারণ ছিল না। কেননা এ অবস্থায় নাবী (ﷺ)-এর সেনাবাহিনীর সাথে এত দূর পর্যন্ত তার আসার কোন প্রশ্নই উঠত না। বরং সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হওয়ার পূর্বেই তার পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার তা নয় যা সে প্রকাশ করেছিল। বরং প্রকৃত ব্যাপার ছিল, ঐ সংকটময় মুহূর্তে পৃথক হয়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা। যখন শত্রুরা তাদের প্রতিটি কাজ কর্ম লক্ষ্য করছিল। তখন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই ছিল তার মূখ্য উদ্দেশ্য। যাতে একদিকে সাধারণ সৈন্যরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গত্যাগ করে এবং যারা বাকী থাকবে তাদেরও উদ্যম ও মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, পক্ষান্তরে এ দৃশ্য দেখে শত্রুদের সাহস বেড়ে যায়। সুতরাং তার এ ব্যবস্থাপনা ছিল নাবী করীম (ﷺ) এবং তার সঙ্গীদেরকে শেষ করে দেয়ারই এক অপকৌশল। মূলত ঐ মুনাফিকের এ আশা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তার ও তার বন্ধুদের নেতৃত্বের জন্য ময়দান সাফ হয়ে যাবে।

এ মুনাফিকের কোন কোন উদ্দেশ্য সফল হবারও উপক্রম হয়েছিল। কেননা আরো দুটি দলের অর্থাৎ আউস গোত্রের মধ্যে বনু হারিসাহ এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বনু সালমারও পদস্খলন ঘটতে যাচ্ছিল এবং তারা ফিরে যাবার চিন্তা ভাবনা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সহায়তা করেন। ফলে তাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় এবং তারা ফিরে যাবার সংকল্প ত্যাগ করে।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمـران: ١٢٢]

'যখন তোমাদের মধ্যকার দু'দল ভীরুতা প্রকাশ করতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ উভয়ের বন্ধু **ছিলেন,** মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা।' [আলু 'ইমরান (৩) : ১২২]

যাহোক, মুনাফিকরা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সংকটময় সময়ে জাবির (রাঃ)-এর পিতা আব্**দুল্লাহ** ইবনু হারাম (রাঃ) তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন। সুতরাং **তিনি**

তাদেরকে ধমকের সুরে (যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসার উৎসাহ প্রদান করে তাদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' কিন্তু তারা উত্তরে বলল, 'আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা যুদ্ধ করবে তবে আমরা ফিরে যেতাম না।' এ উত্তর শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম (রাঃ) এ কথা বলতে বলতে ফিরে আসলেন, 'ওরে আল্লাহর শত্রুরা তোদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হোক। মনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী (ﷺ)-কে তোদের হতে বেপরোয়া করবেন।' এ সব মুনাফিকের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾

[آل عمران: ١٦٧]

'আর মুনাফিকদেরকেও জেনে নেয়া। তাদেরকে বলা হয়েছিল; এসো, 'আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, কিংবা (কমপক্ষে) নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কর'। তখন তারা বলল, 'যদি আমরা জানতাম যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম'। তারা ঐ দিন ঈমানের চেয়ে কুফরীরই নিকটতম ছিল, তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই, যা কিছু তারা গোপন করে আল্লাহ তা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন।' [আলু 'ইমরান (৩) : ১৬৭]

উহুদ প্রান্তে অবশিষ্ট ইসলামী সেনাবাহিনী (بقية الجيش الإسلامي إلى أحد) :

মুনাফিকদের এ শঠতা ও প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবশিষ্ট সাতশ জন সৈন্য নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে ধাবিত হলেন। শত্রুদের শিবির তাঁর মাঝে ও উহুদের মাঝে কয়েক দিক থেকে বাধা সৃষ্টি করছিল। তাই, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'শত্রুদের পাশ দিয়ে গমন ছাড়াই ভিন্ন কোন পথ দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে এমন কেউ আছে কি?' এ প্রশ্নের জবাবে আবু খাইসামা (রাঃ) আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এ খিদমতের জন্যে আমি হাযির আছি।" অতঃপর তিনি এক সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করলেন, যা মুশরিকদের সেনাবাহিনীকে পশ্চিম দিকে ছেড়ে দিয়ে বনু হারিসা গোত্রের শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল।

এ পথ ধরে যাবার সময় তাদেরকে মারবা ইবনু কাইযীর বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ লোকটি মুনাফিক ছিল এবং অন্ধও ছিল। সে সেনাবাহিনীর আগমন অনুধাবন করে মুসলিমগণের মুখমণ্ডলে ধূলো নিক্ষেপ করল এবং বলতে লাগল, 'আপনি যদি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হন তবে জেনে রাখুন যে, আমার বাগানে আপনার প্রবেশের অনুমতি নেই।"

তার এ কথা শোনা মাত্র মুসলিমরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে বললেন,

(لا تقتلوه، فهذا الأعْمَى أعمى القلب أعمى البصر)

'তাকে হত্যা করো না, সে অন্তর ও চোখের অন্ধ।"

তারপর নাবী করীম (ﷺ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে উপত্যকার শেষ মাথায় অবস্থিত উহুদ পাহাড়ের ঘাটিতে অবতরণ করেন এবং সেখানে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপন করিয়ে নেন। সামনে ছিল মদীনা ও পিছনে হল সুউচ্চ উহুদ পর্বত। এভাবে শত্রুদের বাহিনী মুসলিম ও মদীনার মাঝে পৃথককারী সীমানা হয়ে গেল।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা (خطة الدفاع) :

এখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেনাবাহিনীর শ্রেণী-বিন্যাস করেন এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করে নেন। সুনিপুণ তীরন্দাযদের একটি দলও নির্বাচন করা হয়। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় পঞ্চাশ

জন। আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ইবনু নু'মান আনসারী দাওসী বাদরী (রাঃ) এ দলের অধিনায়ক পদে নিয়োজিত হন। তাঁর দলকে কানাত উপত্যকার দক্ষিণে ইসলামী সৈন্যদের শিবির থেকে পূর্ব-দক্ষিণে একশ পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে একটি ছোট পাহাড়ের ধারে অবস্থান গ্রহণের দির্দেশ দেয়া হয়। ঐ পাহাড়টি এখন 'জবলে রুমাত' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পর্বতমালার মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল। শত্রু সৈন্যরা যাতে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে এ জন্য এ পঞ্চাশ জন তীরন্দাযকে ঐ গিরিপথ রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের অধিনায়ককে সম্বোধন করে বলেন,

(انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك)

'ঘোড়সওয়ারীদেরকে তীর মেরে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখবে। তারা যেন পিছন থেকে কোন ক্রমেই আমাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। সাবধান, আমাদের জয় পরাজয় যাই হোক না কেন, তোমাদের দিক থেকে যেন আক্রমণ না হয়।"[১]

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অধিনায়ককে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা আমাদের পিছন দিক রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখ যে, আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখতে পার যে, আমরা গণীমতের মাল একত্রিত করছি তবে তখনও তোমরা আমাদের সাথে শরীক হবে না।[২] আর সহীহ বুখারীর শব্দ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

(إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأنـــاهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم)

'তোমরা যদি দেখ যে, পাখিগুলো আমাদেরকে ছোঁ মারছে, তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা ছাড়বে না, যে পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই।'

আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, আমরা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেছি এবং তাদেরকে পদদলিত করেছি, তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা হতে সরবে না, যে পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই।[৩]

এ কঠিনতম সামরিক নির্দেশাবলী ও হিদায়াতসহ এ বাহিনীকে তিনি ঐ পাহাড়ের গিরিপথে মোতায়েন করে দেন, যে পথ দিয়ে মুশরিকবাহিনী পিছন দিক থেকে মুসলিমাদেরকে আক্রমণ করার খুবই আশঙ্কা ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট সৈন্যের শ্রেণীবিন্যাস এভাবে করেন যে, দক্ষিণ বাহুর উপর মুনযির ইবনু আমর (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেন এবং বাম বাহুর উপর নিযুক্ত করেন, যুবায়ের ইবনু আওয়াম (রাঃ)-কে আর মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ)-কে তার সহকারীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যুবায়ের (রাঃ)-এর উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তিনি খালিদ ইবনু ওয়ালিদের (যিনি তখনও মুসলিম হন নি) ঘোড়সওয়ারী বাহিনীকে প্রতিরোধ করবেন। এ শ্রেণীবিন্যাস ছাড়াও সারির সম্মুখভাগে এমন বাছাইকৃত মুসলিম বীর মুজাহিদদেরকে নিযুক্ত করা হয় যাদের বীরত্বের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যাদের প্রত্যেককে হাজারের সমান মনে করা হতো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ শ্রেণীবিন্যাস ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কৌশলপূর্ণ এবং এর দ্বারা তাঁর সামরিক দক্ষতা প্রমাণিত হয়। কোন কমাণ্ডার, সে যতই দক্ষ ও যোগ্য হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও নিপুণ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে না। কেননা, দেখা যায় যে, তিনি যদিও শত্রুবাহিনীর পরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, তথাপি তিনি স্বীয় সেনাবাহিনীর জন্যে এমন স্থান নির্বাচন করেছেন যা সামরিক দৃষ্টিকোণ **থেকে**

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৫৩ ও ৬৬ পৃঃ।

[2] মুসনাদে আহমদ, তাবারানী ও হা'কিম, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত , ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৫০ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, কিতাবুল জিহাদ ৪২৬ পৃঃ।

যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে উত্তম স্থান ছিল। অর্থাৎ তিনি পাহাড়কে আড়াল করে নিয়ে পিছন ও দক্ষিণ বাহু রক্ষিত করে নেন এবং যে গিরি পথ দিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল ওটা তিনি তীরন্দাযদের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে নেন। আর শিবির স্থাপনের জন্যে একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন করেন। কারণ, যদি আল্লাহ না করুন পরাজয় বরণ করতে হয় তবে যেন পলায়নের পরিবর্তে শিবিরের মধ্যেই আশ্রয় নিতে পারা যায়। যদি শত্রুরা শিবির দখল করার জন্যে এগিয়ে আসে তবে যেন তাদেরকে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অপর পক্ষে তিনি শত্রু বাহিনীকে তাদের শিবির স্থাপনের জন্যে এমন নীচু জায়গা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন যে, তারা জয় লাভ করলেও যেন তেমন কোন সুবিধা লাভ করতে না পারে। আর যদি মুসলিমরা জয়যুক্ত হন তবে যেন তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারীদের হাত থেকে তার রক্ষা না পায়। এভাবে তিনি বাছাই বীর পুরুষদের একটি দল গঠন করে সামরিক সংখ্যার স্বল্পতা পুরণ করে দেন। এটাই ছিল নাবী কারীম ﷺ-এর সেনাবাহিনীর শ্রেণীবিন্যাস যা তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখের শনিবার কার্যকর হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে বীরত্বের প্রেরণাদান (الرسول ﷺ ينفث روح البسالة في الجيش) :

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন যে, তিনি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। তিনি নীচে ও উপরে দুটি লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে জোর দিয়ে বলেন যে, তারা যেন শত্রুদের সাথে মোকাবেলার সময় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে বীরত্বের প্রেরণা দিয়ে তিনি একখানা অত্যন্ত ধারাল তরবারী হাতে নিয়ে বললেন,

'কে এটা গ্রহণ করবে? কে এর মর্যাদা রক্ষা করবে?"

(من يأخذ هذا السيف بحقه؟)

বলা বাহুল্য যে, ঐ তরবারী খানা গ্রহণের জন্য চারদিক থেকে কয়েক শ' বাহু উর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিল যার মধ্যে আলী ইবনু আবু তালিব, জোবায়ের ইবনু আওয়াম এবং ওমর ইবনু খাত্তাবও ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে অনেকে ওটা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু তা গ্রহণের জন্য আবু দুজানাহ সিমাক ইবনু খারশা (রাঃ) সবার আগে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ তরবারীর হক কী?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني)

'এর দ্বারা তুমি শত্রুদের মুখমণ্ডলে এমন ভাবে মারবে যেন তা বেঁকে যায়।'

তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আমি এর হক আদায় করব।" তখন তলোয়ারটি তাঁর হাতে দিয়ে দেয়া হল।

আবু দুজানা (রাঃ) অত্যন্ত বীর পুরুষ ছিলেন, যুদ্ধের সময় গর্ব ভরে চলাফেরা করতেন। তাঁর নিকট একটি লাল পাগড়ী ছিল যখন তিনি সেটা মাথায় বাঁধতেন তখন উপস্থিত জনতা অনুভব করতেন যে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন।

কাজেই তলোয়ারটি হাতে পেয়ে আবু দুজানাহর গর্ব দেখে কে? তিনি মাথায় লাল রুমালের খুব সুন্দর পাগড়ি বেঁধে নিয়ে হেলতে দুলতে ও নর্তন কুর্দনের ইন্দ্রজাল দৃষ্টি করতে করতে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীর উপর আপতিত হলেন। এ দৃশ্য দেখে করে নাবী কারীম ﷺ বললেন,

(إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن)

'এরূপ চাল- চলন আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে নয়।"

মক্কা বাহিনীর বিন্যাস (تعبئـة الجيش المكي) :

মুশরিকগণও কাতারবন্দী নীতির অনুসরণে নিজেদের সেনা বাহিনীর বিন্যাস সাধন করেছিল। তাদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। সে নিজের কেন্দ্র তৈরি করেছিল সেনা বাহিনীর মধ্যস্থলে। দক্ষিণ বাহুর উপর ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, যিনি তখন পর্যন্ত মুশরিক ছিলেন। বাম বাহুর উপর ছিল ইকরামা ইবনু আবু জাহল। পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি ছিল সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া আর তীরনন্দাজদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু রাবীয়াহ।

তাদের পতাকা ছিল বনু আবদিদ্দারে ছোট একটি দলের হাতে। এ পদ তারা ঐ সময় হতে লাভ করেছিল। যখন বনু আবদি মানাফ কুসাই হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পদসমূহকে পরস্পর বন্টন করে নিয়েছিল। তারপর পূর্বপুরুষ হতে যে প্রথা চলে আসছিল ওটাকে সামনে রেখে কেউ এ পদের ব্যাপারে তাদের সাথে বিতর্কেও লিপ্ত হতে পারত না। কিন্তু সেনাপতি আবু সুফিয়ান তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বদরের যুদ্ধে তাদের পতাকা বাহক নযর ইবনু হারিস বন্দী হলে কুরাইশকে বড়ই দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। এটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই তাদের ক্রোধ বৃদ্ধি করার জন্য বলেন, 'হে বনী আবদিদ্দার গোত্র! বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের পতাকা তোমরা নিয়ে রেখেছিলে। ঐ দিন আমাদেরকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল তা তোমরা অবগত আছ। প্রকৃত পক্ষে সেনাবাহিনীর উপর পতাকার দিক থেকেই বিপদ নেমে আসে। যখন পতাকা পতিত হয় তখন তাদের পা আলগা হয়ে যায়। সুতরাং এবার তোমরা আমাদের পতাকা সঠিকভাবে ধারণ করে থাকবে অথবা আমাদের পতাকা আমাদেরকেই দিয়ে দিবে। আমরা নিজেরাই এর ব্যবস্থা করব।" এ কথায় আবু সুফিয়ানের যে উদ্দেশ্য ছিল তাতে সে সফলকাম হয়। কেননা, এ কথা শুনে বনু আবদিদ্দার ভীষণ চটে যায় এবং ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। তারা বলে ওঠে, 'আমরা আমাদের পতাকা তোমাদেরকে দেব? কারও মোকাবেলা হলে আমরা কি করি তা দেখতে পাবে।" আর বাস্তবিকই যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত এক এক করে সবাই মৃত্যুর কবলে পতিত হল।

কুরাইশের রাজনৈতিক চাল (مناورات سياسية من قبل قريش) :

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে কুরাইশরা মুসলিমগণের সারিতে বিচ্ছিন্ন ও বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান আনসারদের নিকট পয়গাম পাঠায়, 'তোমরা আমাদের স্বগোত্রের লোকগুলোকে পরিত্যাগ করে সরে দাঁড়াও, আমরা তোমাদেরকে কিছুই বলব না, তোমাদের নগর আক্রমণ করব না এবং এখান থেকেই ফিরে যাব।" আবু সুফিয়ান এ জঘন্য প্রস্তাব শ্রবণ করা মাত্রই আনসারগণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং তাকে প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

উভয় সেনাবাহিনী একে অপরের নিকটবর্তী হলে কুরাইশরা তাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে অন্য এক চেষ্টা করল এবং তা হচ্ছে, মদীনার আউস বংশে আবুন আমি নামক একজন যাজক বাস করত, তার নাম ছিল আবদি আমর ইবনু সুফী। ইসলামের পূর্বে সে রাহিব' (বনবাসী) আখ্যায় আখ্যায়িত ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রেখেছিলেন 'ফাসিক' (লম্পট)। অজ্ঞতার যুগে সে আউস গোত্রের সর্দার ছিল। কিন্তু, ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে ওটা তার গলার ফাঁস হয়ে যায় এবং প্রকাশ্যভাবে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শত্রুতায় লেগে পড়ে।

আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা দলে দলে মুসলিম হয়ে যাচ্ছে দেখে সে কতগুলো লোককে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং সেখানে কুরাইশদের সাথে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মদীনার এ প্রবীণ পুরোহিত কতিপয় দুর্ধর্ষ সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বপ্রথমে ময়দানে উপস্থিত হলো এবং আনসারদেরকে সম্বোধন করে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'হে মদীনার আধিবাসীরা। আমাকে চিনতে পারছ কি? আমি তোমাদের পুরোহিত আবু আমির। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-কে ত্যাগ করে আমার সাথে যোগদান কর, তোমাদের কল্যাণ হবে।' কিন্তু আনসারগণ এখন পুরোহিতদের প্রবঞ্চনার অতীত, তারা সমবেত কণ্ঠে উত্তর

দিলেন, 'দুর হ প্রবঞ্চক, তোর পৌরহিত্যের কোন ধার আমরা ধারি না, তোর অভিসন্ধি সিদ্ধ হবে না।" আবু আমির কুরাইশদেরকে আশা দিয়ে বলেছিল, 'আমি মদীনার পুরোহিত, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আমি একবার আহ্বান করলে মদীনাবাসীগণ সবাই আমার দলে যোগদান করবে।" কিন্তু আনসারদের উত্তর শুনে সে বলতে লাগল, 'দেখছি, আমার অবর্তমানে হতভাগারা একেবারে বিগড়ে গেছে। অতঃপর তার পৌরহিত্যের ক্ষুব্ধ অভিমান পুরাতন প্রতিহিংসার সাথে যোগ দিয়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠল এবং এ হতভাগ্যই সর্বপ্রথমে স্বদল বলে প্রস্তর ও বাণ বর্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সূত্রপাত করে দিল এবং শেষে আক্রমণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পেয়ে সরে দাঁড়াল। এভাবে কুরাইশদের পক্ষ হতে মুসলিমগণের কাতারে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি করার দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। সংখ্যার আধিক্য ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মুশরিকগণ মুসলিমগণের ভয়ে কিরূপ ভীত হয়েছিল উপরের ঘটনা দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়।

যুদ্ধোন্মাদোনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কুরাইশ মহিলাদের কর্ম তৎপরতা (جهود نسوة قريش في التحميس) :

এদিকে কুরাইশ মহিলারাও যুদ্ধে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উৎবাহ। এ মহিলারা সারিসমূহে ঘুরে ঘুরে ও দফ্ বাজিয়ে বাজিয়ে লোকদেরকে উত্তেজিত করল। কখনো কখনো তারা পতাকা বাহকদেরকে সম্বোধন করে বলত,

وَيْهًا بَنِي عبد الـــدار **

ويــها حُمَاةَ الأدبـــار **

ضــرباً بكــل بتــــار **

বনু আবদিদ্দার শুনে মোদের বাণী
শুন পশ্চাদ ভাগের রক্ষিবাহিনী
খুব জোরে চালাবে শমশীর খানি

অর্থাৎ 'দেখ, হে বনু আবদিদ্দার! দেখ, হে পশ্চাদ্ভাগের রক্ষকবৃন্দ। তরবারী দ্বারা খুব আঘাত কর।
উত্তজিত করতে গিয়ে কখনো কখনো তারা বলত,

إن تُــقْبِلُــوا نُعَانِـــق **

ونَفــــرِشُ النمـــارق **

أو تُــدْبِــرُوا نُــفَـارِق **

فــــراق غيـــر وَامِـــق **

অর্থ: 'যদি তোমরা অগ্রসর হতে পার তবে আমরা তোমাদেরকে আলিঙ্গন করব ও তোমাদের জন্যে শয্যা রচনা করব। আর যদি তোমরা পশ্চাদপদ হও তবে আমরা রুখে দাঁড়াব এবং তোমাদের হতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।'

যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন (أول وقود المعركة) :

এরপর উভয় দল সম্পূর্ণ মুখোমুখী হয়ে যায় এবং একে অপরের নিকটবর্তী হয় ও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইবনু আবী তালহা আবদারী যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন হয়। এ লোকটি ছিল কুরাইশের বড় বীর পুরুষ এবং ঘোড়সওয়ারী। মুসলিমরা তাকে 'কাবশুল কুতায়বা' (সৈন্যদের ভেড়া) বলতেন। সে উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে বেরিয়ে পড়ল এবং মোকাবেলার জন্য আহ্বান করল। তার অত্যাধিক বীরত্বের কারণে

সাধারণ সাহাবীগণ তার সাথে মোকাবেলা করার সাহস করলেন না। কিন্তু যুবায়ের অগ্রসর হন এবং এক মুহূর্তের অবকাশ না দিয়ে সিংহের মতো লক্ষ দিয়ে উটের উপর চড়ে বসেন এবং তাকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে নেন। অতঃপর ভূমিতে লাফিয়ে পড়ে তাকে তরবারী দ্বারা দু'টুকরো করে দেন।

নাবী এ আশা জনক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তাঁর দেখাদেখি সাহাবীগণও তকবীর পাঠ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ যুবায়ের-এর প্রশংসা করে বলেন,

(إن لكل نبي حوارياً، وحواري الزبير)

'প্রত্যেক নাবীরই একজন সহচর থাকেন আর আমার সহচর হলেন যুবায়ের।'[1]

যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল এবং পতাকাবাহকদের প্রাণনাশ (ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته) :

এরপর চতুর্দিকে হতে যুদ্ধে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং সারাটা ময়দানে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুশরিকদের পতাকা প্রতিষ্ঠিত ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে। বনু আবদিদ্দার নিজেদের কমাণ্ডার তালহা ইবনু আবী তালহার হত্যার পর একের পর এক পতাকাধারণ করে থাকে। কিন্তু তারা সবাই নিহত হয়। সর্বপ্রথম তালহার ভাই উসমান ইবনু আবী তালহা পতাকা উঠিয়ে নেন এবং নিম্নের ছন্দ পাঠ করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয় :

إنَّ على أهْلِ اللوَاء حقـــاً ** أن تُخْضَبَ الصَّعْدَة أو تَنْدَقَّا

অর্থ : 'পতাকাধারীদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, তাদের পতাকা রক্তে রঞ্জিত হবে অথবা ছিঁড়ে যাবে।'

এ ব্যক্তিকে হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব আক্রমণ করেন এবং তাঁর কাঁধে এমন জোরে তরবারীর আঘাত করেন যে, ওটা তার হাতসহ কাঁধ কেটে দেয় এবং দেহ ভেদ করে নাভী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এমন কি ফুসফুসও দেখতে পাওয়া যায়।

এরপর আবু সা'দ ইবনু আবী তালহা ঝাণ্ডা উঠিয়ে নেয়। তার উপর সা'দ ইবনু আবী আক্কাস তীর চালিয়ে দেন এবং ওটা ঠিক তার গলায় লেগে যায়, ফলে তার জিহ্বা বেরিয়ে আসে এবং তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুবরণ করে।

কিন্তু কোন কোন জীবনী লেখকের উক্তি হল, আবু সা'দ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ডাক দেয় এবং আলী অগ্রসর হয়ে তার মোকাবেলা করেন। উভয়ে একে অপরের উপর তরবারীর আঘাত করে। কিন্তু আলী-এর তরবারীর আঘাতে আবু সা'দ নিহত হয়।

এরপর মুসাফে' ইবনু তালহা ইবনু আবী তালহা পতাকা উঠিয়ে ধরে। কিন্তু আ'সিম ইবনু সা'বিত ইবনু আবী আফলাহ তাঁকে তীর মেরে হত্যা করেন। তারপর তার ভাই কিলাব ইবনু তালহা ইবনু আবী তালহা ঝাণ্ডা তুলে ধরে। কিন্তু যুবায়ের ইবনু আওয়াম তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তার প্রাণ নাশ করেন। অতঃপর ঐ দুজনের ভাই জিলাস ইবনু তালহা ইবনু আবী তালহা পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ তীর মেরে তার জীবন শেষ করে দেন। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, আ'সিম ইবনু সাবিত ইবনু আবী আফলাহ তীর মেরে তাকে খতম করে দেন।

এরা একই পরিবারের ছয় ব্যক্তি ছিল। অর্থাৎ সবাই আবু তালহা আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনু আবদিদ্দারের পুত্র অথবা পৌত্র ছিল, যারা মুশরিকদের ঝাণ্ডার হিফাযত করতে গিয়ে মারা পড়ল। এরপর বনু আবদিদ্দার গোত্রের আরতাত ইবনু শুরাহবীল নামক আর একটি লোক পতাকা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু আলী ইবনু আবু তালিব এবং মতান্তরে হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব তাকে হত্যা করেন। অতঃপর শুরাইহ ইবনু কারেয

---

[1] সা'হিরে সীরাত হালাবিয়াহ এটা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসে সসূহে এ বাক্যটি অন্য স্থলে উল্লেখিত আছে।

পতাকা তুলে ধরে। কিন্তু কুযমান তাতে হত্যা করে। কুযমান মুনাফিক ছিল এবং ইসলামের পরিবর্তে গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার উত্তেজনায় যুদ্ধ করতে এসেছিল।

শুরাইহর পর আবু যায়েদ আমর ইবনু আবদি মানাফ আবদারী পতাকা সামলিয়ে নেয়। কিন্তু তাকেও কুযমান হত্যা করে ফেলে। তারপর শুরাহবীল ইবনু হাশিম আবদারীর এক পুত্র ঝাণ্ডা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু কুযমানের হাতে সেও মারা পড়ে।

বনু আবদিদ্দার গোত্রের এ দশ ব্যক্তি, যারা মুশরিকদের পতাকা উঠিয়েছিল, সবাই মারা গেল। এরপর গোত্রের কোন লোকই জীবিত থাকল না, যে পতাকা উঠাতে পারে। কিন্তু ঐ সময় 'সওয়াব' নামক তাদের এক হাবসী গোলাম লাফিয়ে গিয়ে পতাকা উঠিয়ে নেয় এবং তার পরবর্তী পতাকাবাহী মনিবদের চেয়েও বেশী বল বিক্রমে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত এক এক করে তার হাত দু'টি কর্তিত হয়। কিন্তু এর পরেও সে পতাকা পড়তে দেয় নি। বরং নিজের হাঁটুর ভরে বসে বক্ষ ও কাঁধের সাহায্য পতাকা খাড়া করে রাখে। অবশেষে সে কুযমানের হাতে নিহত হয়। ঐ সময়েও সে বলছিল, 'হে আল্লাহ! এখন তো আমি কোন ওযর বাকী রাখি নি!' ঐ গোলাম অর্থাৎ সওয়াব নিহত হওয়ার পর পতাকা ভূমির উপর পড়ে যায় এবং ওটা উঠাতে পারে এমন কেউই বেঁচে রইল না। এ কারণে ওটা পড়েই রইল।

অবশিষ্ট অন্যান্য অংশসমূহে যুদ্ধের অবস্থা (القتال في بقية النقاط) :

একদিকে মুশরিকদের পতাকা, যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, অন্য দিকে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যান্য অংশসমূহেও কঠিন যুদ্ধ চলছিল। মুসলিমগণের সারিসমূহের উপর ঈমানের রূহ ছেয়ে ছিল। এ কারণে তারা মুশরিক ও কাফির সৈন্যদের উপর ঐ জলপ্লাবনের মতো ভেঙ্গে পড়ছিলেন যার সামনে কোন বাঁধ টিকে থাকে না। এ সময় মুসলিমরা 'আমিত', 'আমিত' (মেরে ফেল, মেরে ফেল) বলছিলেন এবং এ যুদ্ধে এটাই তাঁদের নিদর্শনের রীতি ছিল।

এদিকে আবু দুজানা (রাঃ) তার লাল পাগড়ী বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারী উঠিয়ে নেন এবং ওর হক আদায় করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন ও যুদ্ধ করতে করতে বহু দূর পর্যন্ত ঢুকে পড়েন। যে মুশরিকের সাথেই তাঁর মোকাবেলা হতো তাঁকেই তিনি হত্যা করে ফেলতেন। তিনি মুশরিকদের সারিগুলো উলট-পালট করে দেন।

যুবায়ের ইবনু আওয়াম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তরবারী চাই এবং তিনি আমাকে তা না দেন তখন আমার অন্তরে চোট লাগে। আমি মনে মনে চিন্তা করি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু সাফিয়ার পুত্র এবং একজন কুরাইশ। আমি তাঁর নিকট গিয়ে আবু দুজানার (রাঃ) পূর্বেই তরবারী চেয়ে নেই।'

কিন্তু তিনি আমাকে তা না দিয়ে আবু দুজানা (রাঃ)-কে দিয়ে দেন। এ জন্য আমি আল্লাহর নামে শপথ করি যে, আবু দুজানা (রাঃ) তরবারী দ্বারা কি করেন তা আমি অবশ্যই দেখব। সুতরাং আমি তাঁর পিছনে পিছনে থাকতে লাগলাম। দেখি যে, তিনি তার লাল পাগড়ীটি বের করে মাথায় বেঁধে নিলেন। তাঁর এ কাজ দেখে আনসারগণ মন্তব্য করলেন, 'আবু দুজানা (রাঃ) মৃত্যুর পাগড়ী বেঁধেছেন।' অতঃপর তিনি নিম্নের কবিতা বলতে বলতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন :

أنا الذي عاهـــدني خليلي ** ونحـــن بالسَّفح لدى النَّخِيل

ألا أقوم الدَّهْرَ في الكَيول ** أضرِبْ بسَيف الله والرسول

অর্থাৎ 'আমি খেজুর বাগান প্রান্তে আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ অঙ্গীকার করেছি যে, কখনই আমি সারির পিছনে থাকব না, (বরং সামনে অগ্রসর হয়ে) আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ-এর তরবারী চালনা করব।'

এরপর তিনি যাকেই সামনে পেতেন তাকে হত্যা করে ফেলতেন। এ দিকে মুশরিকদের মধ্যেও একজন লোক ছিল যে, আমাদের কোন আহতকে পেলেই তাকে শেষ করে ফেলত। এ দুজন ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হতে

যাচ্ছিল। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলাম যে, যেন তাদের দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যায়। ঘটনা ক্রমে হলোও তাই। উভয়ে একে অপরের উপর আঘাত হানল। কিন্তু আবু দুজানা (রাঃ) এ আক্রমণ ঢাল দ্বারা প্রতিরোধ করলেন এবং মুশরিকের তরবারী ঢালে আটকে থেকে গেল। এররর তিনি ঐ মুশরিকের উপর তরবারীর আক্রমণ চালালেন এবং সেখানেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।[1]

এরপর আবু দুজানা (রাঃ) মুশরিকদের সারিগুলো ছিন্ন-ভিন্ন করতে করতে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কুরাইশী নারীদের নেত্রী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কিন্তু সে যে নারী এটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, 'আমি একটি লোককে দেখলাম যে, সে খুব জোরে শোরে মুশরিক সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করছে। সুতরাং আমি তাকে আমার নিশানার মধ্যে নিয়ে ফেললাম। কিন্তু যখন আমি তাঁকে তরবারী দ্বারা আক্রমণ করার ইচ্ছা করলাম তখন সে হায়! হায়! চিৎকার করে উঠল। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, সে একজন মহিলা। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরবারী দ্বারা একজন মহিলাকে হত্যা করে তা কলংকিত করলাম না।'

এ মহিলাটি ছিল হিন্দা বিনতু উৎবাহ। আমি আবু দুজানা (রাঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি হিন্দা বিনতু উৎবার মাথার মধ্যভাগে তরবারী উঁচু করে ধরলেন এবং পরক্ষণেই সরিয়ে নিলেন। আমি বললাম আল্লাহ এবং তার রাসূলই (ﷺ) ভাল জানেন।[2]

একে হামযাও (রাঃ) সিংহের ন্যায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন এবং মধ্যভাগের সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ছিলেন। তাঁর সামনে মুশরিকদের বড় বড় বীর বাহাদুরেরা টিকতে পারছিল না। কিন্তু বড়ই আফসোসের কথা, এ ক্ষেত্রে তিনিও শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু তাঁকে সামানা সামনি বীর পুরুষের মতো শহীদ করা হয় নি বরং কাপুরুষের মতো গুপ্তভাবে শহীদ করা হয়েছিল।

আল্লাহর সিংহ হামযা (রাঃ)-এর শাহাদত (مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب) :

হামযা (রাঃ)-এর ঘাতকের নাম ছিল অহশী ইবনু হারব। আমরা তার শাহাদতের ঘটনা অহশীর নিজের ভাষাতেই বর্ণনা করছি। সে বর্ণনা করেছে, 'আমি জুবাইর ইবনু মুতইমের গোলাম ছিলাম। তার চাচা তুআইমাহ ইবনু আদী বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। যখন কুরাইশরা উহুদের যুদ্ধে বের হয় তখন জুবাইর ইবনু মুত'ইম আমাকে বলে, 'তুমি যদি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর চাচা হামযাহ (রাঃ)-কে আমার চাচার বিনিময়ে হত্যা কর তবে তোমাকে আযাদ করে দেয়া হবে।' তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমিও লোকদের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। আমি ছিলাম একজন হাবশী লোক এবং হাবশীদের মতো বর্শা নিক্ষেপের কাজে আমি খুব পারদর্শী ছিলাম। আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো খুবই কম। লোকদের মধ্যে যুদ্ধ যখন চরমে পৌঁছে তখন আমি বের হয়ে হামযাহ (রাঃ)-কে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে আমি তাঁকে লোকদের মাঝে দেখতে পাই। তাঁকে ছায়া রং-এর উট বলে মনে হচ্ছিল। তিনি লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে চলছিলেন।

আল্লাহর শপথ! আমি তাঁকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম এবং একটি বৃক্ষ অথবা একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমার নিকটে তাঁর আসার প্রতীক্ষা করছিলাম, ইতিমধ্যে সিবা' ইবনু আবদিল উয্যা আমার আগে গিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে যায়। তিনি তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেন, 'ওরে লজ্জাস্থানের চামড়া কর্তনকারীর পুত্র, মজা দেখ।' এ কথা বলেই তিনি এত জোরে তাকে তরবারীর আঘাত করেন যে, তার মাথা দেহচ্যুত হয়ে যায়।

এর সাথে সাথেই আমি বর্শা উঠিয়ে নেই এবং যখন তিনি আমার আওতার মধ্যে এসে পড়েন তখন আমি তাঁর দিকে ওটা ছুঁড়ে দেই এবং ওটা তাঁর নাভীর নীচে লেগে যায় এবং পদদ্বয়ের মধ্যভাগ দিয়ে পার হয়ে যায়।

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৮-৬৯ পৃঃ।

[2] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৬৯ পৃঃ।

তিনি আমার দিকে ধাওয়া করার ইচ্ছা করেন, কিন্তু অসমর্থ হন। আমি তাঁকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেই। শেষ পর্যন্ত তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। এরপর আমি তাঁর মৃত দেহের নিকট গিয়ে বর্শা বের কের দেই এবং সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ি। (আমার কাজ সমাপ্ত হয়েছিল) তিনি ছাড়া আর কারো সাথে আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আমি শুধু আযাদ হওয়ার জন্যেই তাঁকে হত্যা করেছিলাম। সুতরাং আমি মক্কায় ফিরে গেলে আমাকে আযাদ করে দেয়া হয়।[1]

মুসলিমগণের উচ্চে অবস্থান (السيطرة على الموقف) :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সিংহ হামযা (رضي الله عنه)-এর শাহাদতের ফলে মুসলিমগণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধে মুসলিমগণেরই পাল্লা ভারী থাকে। আবু বকর (رضي الله عنه), উমার (رضي الله عنه), আলী (رضي الله عنه), যুবায়ের (رضي الله عنه), মুসআব ইবনু উমায়ের (رضي الله عنه), তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (رضي الله عنه), আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (رضي الله عنه), সা'দ ইবনু মুআয (رضي الله عنه), সা'দ ইবনু উবাদাহ (رضي الله عنه), সা'দ ইবনু রাবী (رضي الله عنه), নযর ইবনু আনাস (رضي الله عنه), প্রভৃতি মহান ব্যক্তিবর্গ এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন যে, মুশরিকরা হতোদ্যম ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং তাদের দেহের শক্তি হ্রাস পায়।

পত্নীর বক্ষ ছেড়ে তরবারীর ধারের উপর (من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة) :

এদিকে আর এক দৃশ্য চোখে পড়ে। উপরোক্ত আত্মত্যাগীদের মধ্যে আর একজন হচ্ছেন হানযালাতুল গাসীল (رضي الله عنه), যিনি এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিন ঐ আবু আমির রাহিবের পুত্র, যে পরবর্তী কালে ফাসিক নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং যার বর্ণনা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। হানযালা (رضي الله عنه) নব বিবাহিত ছিলেন। যখন যুদ্ধে গমনের জন্য ঘোষণা দেয়া হয় তখন তিনি নববধূকে আলিঙ্গন করছিলেন। যুদ্ধের ঘোষণা শোনা মাত্রই তিনি নববধূর বক্ষ ছেড়ে দিয়ে জিহাদের জন্যে বেরিয়ে পড়েন। যখন উহুদ প্রান্তরে ভীষণ যুদ্ধ চলছে তখন তিনি মুশরিকদের সারিগুলো ভেদ করে তাদের সেনাপতি আবু সুফিয়ান পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং তাকে প্রায় ধরাশায়ী করতেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর ভাগ্যেই শাহাদত লিখে রেখেছিলেন। তাই যেমনই তিনি আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তরবারী উঁচু করে ধরেছেন, তেমনই শাদ্দাদ ইবনু আউস তাঁকে দেখে ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে আক্রমণ করে। ফলে তিনি নিজেই শহীদ হয়ে গেলেন।

তীরন্দাযদের কার্যকলাপ (نصيب فصيلة الرماة في المعركة) :

জাবালে রুমতের উপর যে তীরন্দাযদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মোতায়েন করেছিলেন তাঁরাও যুদ্ধের গতি মুসলিমগণের অনুকূলে আনবার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মক্কার ঘোড়সওয়ারীরা খালিদ ইবনু ওয়ালীদের নেতৃত্বে এবং আবু আমির ফা'সিকের সহায়তায় মুসলিম সৈনিকদের বাম বাহু ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে তিন বার ভীষণ আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুসলিম তীরন্দাযগণ তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে এমনভাবে ঘায়েল করে দেন যে তাদের তিনটি আক্রমণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[2]

মুশরিকদের পরাজয় (الهزيمة تنزل بالمشركين) :

কিছুক্ষণ ধরে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে এবং মুসলিমগণের ক্ষুদ্র বাহিনী যুদ্ধে পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। অবশেষে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তাদের সারিগুলো ডান, বাম, সম্মুখ ও পিছন দিক হতে ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন তিন হাজার মুশরিককে সাতশ নয়, বরং ত্রিশ হাজার মুসলিমগণের সাথে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আর এদিকে মুসলিমরা ঈমান, বিশ্বাস এবং বীরত্বের অত্যন্ত উঁচুমানের মনোবল নিয়ে তরবারী চালনা করছিলেন।

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৯-৭২ পৃ.। সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৩ পৃ.। অহশী তায়েফের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং আবু বকর (رضي الله عنه)-এর খিলাফত কালে তার ঐ বর্শা দিয়েই ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কায্যাব কে (মিথ্যুককে) হত্যা করে। রোমকদের বিরুদ্ধে ইয়াবমুকের যুদ্ধেও সে শরীক হয়।

[2] ফতহুল বারি ৭ম খণ্ড ৩৪৬ পৃঃ।

কুরাইশরা যখন মুসলিমগণের একাধিকবার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও অক্ষমতা অনুভব করল এবং তাদের মনোবল এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ল যে, সওয়ারে হত্যার পর কারো সাহস হল না যে, যুদ্ধ চালু রাখার জন্যে তাদের ভূপতিত পতাকার নিকটবর্তী হয়ে ওটাকে উঁচু করে ধরে, তখন তারা পালিয়ে যাবার পন্থা অবলম্বন করল এবং মুসলিমগণের উপর হতে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেল।

ইবনু ইসহাক বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের উপর স্বীয় সাহায্য নাযিল করেন এবং তাঁদের সাথে কৃত ওয়াদা পুর্ণ করেন। মুসলিমরা মুশরিকদেরকে তরবারী দ্বারা এমনভাবে কর্তন করতে লাগলেন যে, তারা শিবির থেকেও পালিয়ে গেল এবং নিঃসন্দেহে তাদের পরাজয় ঘটে গেল।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ আমি দেখি যে, হিন্দা বিনতু উৎবাহ এবং তার সঙ্গিনীদের পদনালী দেখা যাচ্ছে। তারা কাপড় উপরে উঠিয়ে নিয়ে পলায়ন করছে। তাদের গ্রেফতারীতে কম বেশী কোনই প্রতিবন্ধকতা ছিল না।'[1]

সহীহ বুখারীতে বারা' ইবনু আ'যির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'মুশরিকদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হলে তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, এমনকি আমি নারীদেরকে দেখি যে, তারা পায়ের গোছা হতে কাপড় উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত বেগে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পায়ের অলংকার দেখা যাচ্ছিল।'[2]

আর এ সুযোগে মুসলিমরা মুশরিকদের উপর তরবারী চালাতে চালাতে ও তাদের পরিত্যক্ত মাল জমা করতে করতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন।'

তীরন্দাযদের ভয়ানক ভুল (غلطة الرماة الفظيعة) :

তীরন্দাযবাহিনী এতক্ষণ পর্বতমূলে অবস্থান গ্রহণ ক'রে নিজেদের কর্তব্য পালন করে আসছিলেন। কিন্তু এ আশাতীত জয়ের উল্লাসে এখন তাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে তাঁদেরকে যে কোন অবস্থায় তাঁদের স্থান ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে গণীমত সংগ্রহের জন্য সমরক্ষেত্রের দিক ছুটে যেতে লাগলেন। সে জন্য যুদ্ধের চেহারা বদলে গেল। মুসলিমগণ ভীষণভাবে ক্ষতির স্বীকার হলেন, স্বয়ং নাবী (ﷺ) শহীদ হতে বেঁচে গেলেন!! আর এ কারণেই মুসলিম ভীতি যেটা বদর যুদ্ধের পরিণামে মুশরিকদের হৃদয়ে ঢুঁকে পড়েছিল সেটা অনেকটা দূরভীত হতে লাগল। তার মূল কারণ হচ্ছে দুনিয়া প্রীতি, গণীমতের মালের লোভ। সুতরাং সে সময় তারা এক অপরকে বলছিল, গণীমত.......! গণীমত.......! তোমাদের সঙ্গীগণ জিতে গেছেন........ আর অপেক্ষা কিসের? তাঁদের নায়ক আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) তাঁদেরকে নিবারিত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কঠোর নিষেধের কথা স্মরণ করে দিলেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ সৈনিকগণ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন, 'এখন আমাদের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে, সুতরাং এখন আর এখানে বসে থাকব কিসের জন্য?'[3] এ কথা বলে তাঁদের অধিকাংশ সৈনিকই স্থান ত্যাগ করে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) মাত্র নয়জন লোককে নিয়ে ঐ স্থানে বসে রইলেন। যারা নিজ দায়িত্ব পালনে অটল থাকলেন যে, হয় তাঁদের প্রস্থানের অনুমতি দেওয়া হবে অন্যথা তাঁরা আমৃত্যু সেখানে অবস্থান করবেন।

মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদের কৌশল নির্ধারণ (خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي) :

এরূপ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কঠোর আদেশ এবং সেনাপতির নিষেধ অমান্য করার ফলও ফলতে শুরু হল। আরবের বিখ্যাত বীর এবং রণকুশলী সেনাপতি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ঘোড়সওয়ারী সেনাদল নিয়ে চারদিকে

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৭৭ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৯ পৃঃ।

[3] এ কথা সহীহ বুখারীতে বারা' ইবনু আযের কর্তৃক বর্ণিত আছে ১/৪২৬ পৃঃ।

চক্রাকারে সুযোগের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। সে আর কালবিলম্ব না করে সেই অরক্ষিত পথের দিকে নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন এবং দেখতে দেখতে পশ্চাদদ্দিক দিয়ে মুসলিমগণের মাথার উপর এসে উপস্থিত হ'ল। শ্রেষ্ঠবীর আব্দুল্লাহ তাঁর সহচর কয়েকজনকে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পালন করে চললেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁরা সবাই শাহাদত বরণ করলেন। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা নির্ভাবনায় গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে ব্যাপৃত আছেন। এমন সময় প্রথমে খালিদের ঘোড়সওয়ারী সেনাদল এবং তার পর অন্যান্য ঘোড়সওয়ারী ও পদাতিক সেনাদল অতর্কিত অবস্থায় তাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করল এবং সতর্ক হবার আগেই বহু মুসলিমকে কুরাইশদের হাতে নিহত হতে হল। কুরাইশদের জাতীয় পতাকা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। খালিদের এ আক্রমণ এবং মুসলিমগণের উপস্থিত সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে আমরাহ বিনতু আলকামা নামে জনৈক কুরাইশ বীরঙ্গনা আবার তা তুলে ধরল। সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর ভূলুণ্ঠিত জাতীয় পতাকাকে পুনরায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে উড্ডীয়মান হতে দেখে ছুটে বিক্ষিপ্ত ও পলায়নপর কুরাইশ সৈন্যগণ আবার সেই পতাকার দিকে ছুটে আসল এবং তারা আবার দলবদ্ধভাবে মুসলিমগণকে আক্রমণ করল। এবার মুসলিমরা অগ্রপশ্চাৎ দুই দিক হতে আক্রান্ত হয়ে, যাঁতার মধ্যস্থলে পড়লে যে অবস্থা হয় তাই হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিপদসংকুল ফায়সালা এবং বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق) :

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র নয়জন[১] সাহাবীসহ পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন[২] এবং মুসলিমগণের শৌর্যবীর্য ও মুশরিকদের শোচনীয় অবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ খালিদ ইবনু ওয়ালীদের ঘোড়সওয়ারী সৈন্যগণ তার দৃষ্টি গোচর হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দু'টি পথ ছিল। আর তা হচ্ছে, হয় তিনি তাঁর নয় জন সহচরসহ দ্রুত গতিতে পলায়ন করে কোন এক সুরক্ষিত স্থানে চলে যেতেন এবং স্বীয় সেনা বাহিনীকে যারা ভিড়ের মধ্যে পড়ে যেতে চাচ্ছিলেন, তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতেন, নয়তো নিজের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে স্বীয় সাহাবীদেরকে ডাক দিতেন এবং এক নির্ভরযোগ্য সংখ্যক সাহাবাকে নিজের কাছে একত্রিত করে তাদের মাধ্যমে অবরোধ ভেঙ্গে দিয়ে নিজের সেনাবাহিনীর জন্যে উহুদ পাহাড়ের উপরিভাগের দিকে চলে যাওয়ার পথ করে দিতেন। এ চরম সংকটময় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তুলনাবিহীন বীরত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কেননা তিনি নিজের জীবন রক্ষা করে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নিজের জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর জীবন রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তাই তো তিনি খালিদ ইবনু ওয়ালীদের ঘোড়সওয়ারী সৈন্যদেরকে দেখা মাত্রই উচ্চস্বরে স্বীয় সাহাবীদেরকে ডাক দেন, 'ওরে আল্লাহর বান্দারা এদিকে..........।' অথচ তিনি জানতেন যে, তার ঐ শব্দ মুসলিমগণের পূর্বে মুশরিকদেরই কানে পৌঁছবে। আর হলোও তাই। যেমন দেখা গেল যে, তার ঐ আওয়াজ শুনে মুশরিকরা অবগত হল যে, এ মুহূর্তে তাঁর অবস্থান কোথায় রয়েছে। যার ফলে তাদের একটি বাহিনী মুসলিমগণের পূর্বেই তাঁর নিকটে এসে পড়ে এবং বাকী ঘোড়সওয়ারীরা দ্রুততার সাথে মুসলিমগণকে ঘিরে ফেলতে শুরু করে। এখন দুটি ভিড়ের বিস্তারিত বিবরণ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করছি।

---

[1] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ডের ১০৭ পৃঃ। বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র ৭ জন আনসার ও ২ জন কুরাইশী সাহাবীর মাঝে রয়ে গিয়েছিলেন।

[2] এর দলীয় আল্লাহ তা'আলা এ ইরশাদ {وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ} (١٥٣) سورة آل عمران 'এবং রাসূল ﷺ তোমাদেরকে তোমাদের পিছন হতে আহ্বান করছিলেন।"

মুসলিমগণের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ততা (تبدد المسلمين في الموقف) :

যখন মুসলিমরা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েন তখন একটি দল তো জ্ঞানই হারিয়ে ফেলে। তাদের শুধু নিজেদের জীবনের চিন্তা ছিল। সুতরাং তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দিয়ে পলায়নের পথ ধরল। পিছনে কি ঘটছে তার কোন খবরই তাদের ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো পালিয়ে গিয়ে মদীনায় ঢুকে পড়ে এবং কিছু লোক পাহাড়ের উপর উঠে পড়ে। আর একটি দল পিছনে ফিরল তারা মুশরিকদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। একে অপরকে চিনতে অসমর্থ হয়। এর ফলে মুসলিমগণেরই হাতে কোন কোন মুসলিম নিহত হয়। যেমন সহীহ বুখারীতে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন (প্রথমে) মুশরিকরা পরাজিত হয়। এরপর ইবলীস (সাধারণভাবে) ডাক দিয়ে বলে, 'ওরে আল্লাহর বান্দারা পিছনে (অর্থাৎ পিছনে দিক হতে আক্রমণ কর)।' তার এ কথায় সামনের সারির সৈন্যরা পিছন দিকে ফিরে আসে এবং পিছনের সারির সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দেখেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামানের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি তখন বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইনি যে আমার পিতা।' কিন্তু আল্লাহর শপথ! (মুসলিম) সৈন্যগণ আক্রমণ হতে বিরত হলেন না। শেষ পর্যন্ত আমার পিতা নিহতই হয়ে গেলেন। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করুন।' উরওয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আল্লাহ ঐ কসম! হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মধ্যে সদা-সর্বদা কল্যাণ বিরাজমান ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হন।'[1]

মোট কথা, এ দলের সারিতে কঠিন বিক্ষিপ্ততা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। বহু লোক চিন্তান্বিত ও পেরেশান ছিলেন। তাঁরা কোন দিকে যাবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় কোন ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা গেল যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিহত হয়েছেন। এ ঘোষণা শুনে তারা জ্ঞান হারা হয়ে গেলেন। অধিকাংশ লোকেরই সাহস ও উদ্যম নষ্ট হয়ে গেল। কেউ কেউ যুদ্ধ বন্ধ করে দিল এবং দুঃখিত হয়ে অস্ত্র শস্ত্র ফেলে দিয়ে কেউ কেউ এ চিন্তাও করল যে, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর সাথে মিলিত হয়ে তাকে বলা হোক যে, সে যেন আবু সুফিয়ানের নিকট তাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

কিছুক্ষণ পর ঐ লোকদের পাশ দিয়ে আনাস ইবনু নাযর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গমন করেন। তিনি দেখেন যে, তারা হাতের উপর হাত ধরে পড়ে আছে। তাদেরকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কিসের অপেক্ষা করছ?' তাঁরা উত্তরে বলল, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিহত হয়েছেন।' তাদের এ কথা শুনে আনাস ইবনু নাযর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে বললেন, 'তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তোমরা জীবিত থেকে কি করবে? উঠো, যার উপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন দিয়েছেন তার উপর তোমারও জীবন দিয়ে দাও।' এরপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! ঐ লোকগুলো অর্থাৎ মুসলিমরা যা কিছু করেছে সে জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর ওরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা কিছু করেছে তার সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদ করছি।' এ কথা বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন। সা'দ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে দেখা হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আবু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)! কোথায় যাচ্ছেন?' আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উত্তরে বলেন, 'জান্নাতের সুগন্ধি সম্পর্কে আর কি বলব! হে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)! আমি ওর সুগন্ধি অনুভব করছি।' এরপর তিনি সামনের দিকে গেলেন এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভগ্নী শুধু তাঁর আঙ্গুলগুলোর পোর দেখে তাঁকে চিনতে পারেন। তাঁকে বর্শা, তরবারী এবং তীরের আশিটিরও বেশী আঘাত লেগেছিল।[2]

---

[1] সহীহ বুখারী ১/৫৩৯, ২/৫৮১ ফতহুলাবারী ৭/৩৫১, ৩৬২, ৩৬৩ পৃঃ, বুখারী ছাড়া অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দীয়াত দিতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, আমি তাঁর দীয়াত মুসলিম জাতিকে সদকা করে দিলাম। এ কারনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মঙ্গল বৃদ্ধি পায়। মুখাতাসারুস সীরাহ, শায়খ আব্দুল্লাহ ২৪৬ পৃঃ।

[2] যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯৩ ও ৯৬ পৃঃ, সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৯ পৃঃ।

অনুরূপ সা'বিত ইবনু দাহ্দাহ (রাঃ) স্বীয় কওমকে ডাক দিয়ে বলেন, 'যদি মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়ে থাকেন তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ জীবিত রয়েছেন। তিনি মরতে পারেন না। তোমরা তোমাদের দ্বীনের জন্যে যুদ্ধ করে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন।' তার এ কথা শুনে আনসারের একটি দল উঠে পড়েন এবং সা'বিত (রাঃ) তাদের সহায়তায় খালিদের ঘোড়সওয়ারী বাহিনীর উপর হামলা করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে খালিদের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে যান। তার মতো তার সঙ্গীরাও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত লাভ করেন।'[1]

একজন মুহাজির সাহাবী একজন আনসারী সাহাবীর পাশ দিয়ে গমন করেন। যিনি রক্ত রঞ্জিত ছিলেন। মুহাজির তাঁকে বলেন, 'হে অমুক ভাই! আপনি তো অবগত হয়েছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়েছেন।' তখন ঐ আনসারী বললেন, 'যদি মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন যে, তিনি আল্লাহর দ্বীন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে ঐ দ্বীনের হিফাযতের জন্যে যুদ্ধ করা।'[2]

এরূপ সাহস ও উদ্যম বৃদ্ধিকারী কথায় মুসলিম সৈন্যদের উদ্যম বহাল হয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞান ও চেতনা জাগ্রত হয়। সুতরাং তাঁরা তখন অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দেয়া অথবা ইবনু উবাই এর সাথে মিলিত হয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনার চিন্তার পরিবর্তে অস্ত্রশস্ত্র উঠিয়ে নেন এবং মুশরিকদের সাথে মোকাবেলা করে তাঁদের অবরোধ ভেঙ্গে দেয়া ও তাঁদের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত রাস্তা বানিয়ে নেয়ার চেষ্টায় রত হয়ে যান।

এ সময়েই তাঁরা এটাও অবগত হন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিহত হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর ফলে তাঁদের শক্তি আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁদের উদ্যম ও উদ্দীপনার নাবীনতা এসে যায়। সুতরাং তারা এক কঠিন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর অবরোধ ভেঙ্গে দিয়ে ভিড় হতে বের হওয়া এবং এক মজবুত কেন্দ্রের চতুর্দিকে একত্রিত হওয়াতে সফলকাম হন।

মুসলিম সেনাবাহিনীর তৃতীয় একটি দলের লোক ছিলেন তারা, যারা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কেই চিন্তা করছিলেন। এরা এ ব্যবস্থাপনার কথা অবহিত হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরে আসেন। এদের মধ্যে অগ্রভাগে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) প্রভৃতি মহান ব্যক্তিবর্গ। এরা যোদ্ধাদের প্রথম সারিতেও সকলের অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু যখন নাবী করীম ﷺ-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্যে বিপদের আশংকা দেখা দিল, তখন তাঁর হিফাযত ও প্রতিরোধকারীদের মধ্যেও তাঁরা সকলের অগ্রগামী হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশে পাশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (احتدام القتال حول رسول الله):

মুসলিম সেনাবাহিনী যখন ভীড়ের মধ্যে এসে মুশরিকদের সারিগুলোর দু'টি সারির মাঝে পড়ে যান এবং তাঁদেরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয়, ঠিক সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশে পাশে ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা মুসলিমগণকে যখন ঘিরে ফেলতে শুরু করে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মাত্র নয় জন সাহাবী ছিলেন এবং যখন মুসলিমগণকে (هلموا إلي، أنا رســول الله)، 'আমার দিকে এসো, আমি আল্লাহর রাসূল' এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ ডাক দেন তখন তাঁর ডাক মুশরিকরা শুনে ফেলে এবং তাঁকে চিনে নেয় (কেননা, ঐ সময় তারা মুসলিমগণের চেয়ে বেশী তাঁর নিকটবর্তী ছিল) সুতরাং তাঁরা দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে তাকে আক্রমণ করে বসে এবং কোন মুসলমানের আগমনের পূর্বেই নিজেদের সম্পূর্ণ বোঝা নিক্ষেপ করে। এ আকস্মিক আক্রমণের ফলে ঐ মুশরিকদের ও সেখানে উপস্থিত নয় জন সাহাবীর মধ্যে ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে যায়। এতে নাবীপ্রেম, বীরত্বপনা এবং প্রাণ ত্যাগের অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হয়।

---

[1] আস্‌সীরাতুল হালাবিয়্যিাহ ২য় খণ্ড ২২ পৃঃ।

[2] যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাত জন আনসার ও দুই জন কুরাইশী সাহাবীসহ পৃথক রয়ে গিয়েছিলেন। যখন আক্রমণকারীরা তাঁর একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় তখন তিনি বলেন, (من يردهم عنا وله الجنة ؟) এমন কেউ আছে কি, যে এদেরকে আমার নিকট হতে দূর করে দিতে পারে? তাঁর জন্যে জান্নাত রয়েছে। অথবা বলেন, (هو رفيقي في الجنة ؟) 'সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।'

তাঁর এ কথা শুনে এক জন আনসারী সাহাবী অগ্রসর হন যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। এরপর পুনরায় মুশরিকরা তাঁর একেবারে নিকটে এসে পড়ে এবং এবারও তিনি আগের মতোই কথা বলেন। এভাবে পালাক্রমে সাত জন আনসারী সাহাবী শহীদ হয়ে যান। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় অবশিষ্ট দু'জন সাহাবীকে বলেন, (ما أنصفنا أصحابنا) 'আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে ন্যায় বিচার করলাম না।'[১]

এ সাতজনের মধ্যে শেষের জন ছিলেন আম্মারাহ্ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু সাকান (রাঃ)। তিনি লড়তেই থাকেন, শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে যান।[২]

রাসূল (ﷺ)-এর জীবনে কঠিন সময় (أحرج ساعة في حياة الرسول ﷺ) :

আম্মারাহ (রাঃ) পতিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে মাত্র দুই জন কুরাইশী সাহাবী রয়ে গিয়েছিলেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে যুগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধ করেছেন ঐ যুদ্ধগুলোর কোন একটিতে তাঁর সাথে তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইবনু আবু আক্কাস (রাঃ) ছাড়া আর কেউই ছিল না।[৩] আর এ মুহূর্তটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্যে অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল এবং মুশরিকদের জন্যে ছিল সুবর্ণ সুযোগের মুহূর্ত। প্রকৃত ব্যাপার হল, মুশরিকরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে নি। তারা একাদিক্রমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল এবং তাঁকে দুনিয়ার বুক হতে চিরতরে বিদায় করতে চেয়েছিল। এ আক্রমণেই উৎবাহ ইবনু আবু আক্কাস তাঁকে পাথর মেরেছিল যার ফলে তিনি পার্শ্বদেশের ভরে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ডানদিকের রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল।[৪]

আর তাঁর নীচের ঠোঁটটি আহত হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব যুহরী অগ্রসর হয়ে তাঁর ললাট আহত করে। আব্দুল্লাহ ইবনু কামআহ নামক আর একজন দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ারী লাফিয়ে গিয়ে তাঁর কাঁধের উপর এতো জোরে তরবারীর আঘাত করে যে, তিনি এক মাসেরও বেশী সময় পর্যন্ত ওর ব্যাথা ও কষ্ট অনুভব করতে থাকেন। তবে তাঁর লৌহবর্ম কাটতে পারে নি। এরপর সে আর একবার তাঁকে তরবারীর আঘাত করে, যা তাঁর চক্ষুর নীচের হাড়ের উপর লাগে এবং এর কারণে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া চেহারার মধ্যে ঢুকে যায়।[৫] সাথে সাথে সে বলে ওঠে, 'এটা লও! আমি কাময়া'র (টুকরোকারীর) পুত্র।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চেহারা হতে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন, 'আল্লাহ তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলুন।'[৬]

---

[1] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৭ পৃঃ, বাবু গাযওয়াতে উহুদ ।

[2] কিছুক্ষণ পরে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে পড়েন। তাঁরা কাফিরদেরকে আম্মারাহ (রাঃ) হতে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেন এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিটক নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে নিজের পায়ের উপর ঠেকা লাগিয়ে দেন এবং আম্মারাহ (রাঃ) এ অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন যে, তাঁর গণ্ড দেশ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পায়ের উপর ছিল। (ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৮১ পৃঃ) আকাঙ্খা যেন বাস্তবে রূপায়িত হল। তা হল : 'প্রাণ যেন নির্গত হয় আপনার পায়ের উপর এটাই মনের আকাঙ্ক্ষা।'

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫১৭ পৃঃ এবং ২য় খণ্ড ৫৮১ পৃ।

[4] মুখের সম্পূর্ণ মধ্যে নীচের দুটি ও উপরের দুটি দাঁতকে সুনায়ী বলা হয় এবং ওর ডান দিকের ও বাম দিকের উপর দুটি ও নীচের দুটি দাঁতকে রুবাঈ দাঁত বলা হয়। কুচলী দাঁতের পূর্বে অবস্থিত।

[5] লোহা অথবা পাথরের টুপি। যা যুদ্ধের সময় মাথা এবং মুখমণ্ডল হেফাজতের জন্য ব্যবহার করা হয়।

[6] আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দুয়া কবুল করে নেন। ইবনু কাময়াহ যুদ্ধ হতে বাড়ী ফিরে যাবার পর তার বকরী খুঁজতে বের হয়। তার বকরীগুলো সে পর্বত চূড়ায় দেখতে পায়। সে সেখানে উঠলে এক পাহাড়ী বকরী তার উপর আক্রমণ চালায় এবং শিং দ্বারা গুতো মারতে মারতে তাকে পাহাড়ের উপর হতে নীচে ফেলে দেয় (ফাতহুলবারী, ৭ম খণ্ড ৩৭৩ পৃ.) আর তাবারানীর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পহাড়ী বকরীকে তার উপর নির্দিষ্ট করেন যে, তাকে শিং মেরে মেরে টুকরো টুকরো করে দেয়। (ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৬৬ পৃ.)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং মাথা আহত করা হয়। ঐ সময় তিনি মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেন,

(كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله)

'ঐ কওম কিরূপে কৃতকার্য হতে পারে যারা তাদের নাবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল আহত করেছে এবং তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছিলেন?'

ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন,

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران:١٢٨]

'আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন- এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই। কেননা তারা হচ্ছে যালিম।'।[১]

ত্বাবারানীর বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, (اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله) 'ঐ কওমের উপর আল্লাহর কঠিন শাস্তি হোক যারা তাদের নাবী ﷺ-এর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করুন, তারা জানে না।'[২]

সহীহ মুসলিমের হাদীসেও এটাই আছে যে, তিনি বার বার বলছিলেন,

(رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)

অর্থাৎ 'হে আমার প্রতিপালক! আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন, তারা জানে না।'[৩]

কাযী আইয়াযের 'শিফা' গ্রন্থে নিম্নলিখিত শব্দ রয়েছে, (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون)

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার কওমকে হিদায়াত দান করুন, নিশ্চয় তারা জানে না।'[৪]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দ'জন কুরাইশী সাহাবী অর্থাৎ সা'দ ইবনু আবু আক্কাস (রাঃ) ও তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) অসাধারণ বীরত্ব ও অতুলনীয় বাহাদুরীর সাথে কাজ করে শুধু দু'জনই মুশরিকদের সফলতা অসম্ভব করে দেন। এ দু'ব্যক্তি আরবের সুদক্ষ তীরন্দায ছিলেন। তাঁরা তীর মেরে মেরে আক্রমণকারী মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে দূরে সরিয়ে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু আবী আক্কাস (রাঃ)-এর জন্যে স্বীয় তূণ হতে সমস্ত তীর বের করে ছড়িয়ে দেন এবং তাঁকে বলেন, (ارم فداك أبي وأمي) 'তীর ছুঁড়তে থাক, তোমার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোন।'[৫]

সা'দ (রাঃ)-এর সৌজন্য ও কর্মদক্ষতা এর দ্বারাই অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি ছাড়া আর কারো জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিতামাতা উৎসর্গিত হওয়ার কথা বলেন নি।[৬]

---

1 সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৮২ পৃঃ।, সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

2 ফাতহুলবারী, ৭ম খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ।

3 সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, বাবু গাযওয়াতে উহুদ ১০৮ পৃঃ।

4 কিতাবুশ শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুসতফা ﷺ প্রথম খণ্ড ৮১ পৃঃ।

5 সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৭, ২য় খণ্ড ৫৮০-৫৮১ পৃঃ।

6 সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৭, ২য় খণ্ড ৫৮০-৫৮১ পৃঃ।

তালহা (রাঃ)-এর কর্মদক্ষতা অনুমান করা যেতে পারে সুনানে নাসায়ীর একটি বর্ণনার মাধ্যমে, যাতে জাবির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর মুশরিকদের ঐ সময়ের আক্রমণের উল্লেখ করেছেন যখন তিনি মুষ্টিমেয় আনসারদের সাথে রয়ে গিয়েছিলেন।

জাবির (রাঃ) বলেন যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটবর্তী হয়ে গেলে তিনি বলেন,

(من للقوم ؟) 'এদের সাথে মোকাবেলা করে এমন কেউ আছ কি?'

উত্তরে তালহা (রাঃ) বলেন, 'আমি আছি।' এরপর জাবির (রাঃ) আনসারদের অগ্রসর হওয়া এবং একে একে শহীদ হওয়ার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যা সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি। জাবির (রাঃ) বলেন যে, যখন তাঁরা শহীদ হয়ে যান তখন তালহা (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং এগারো জন লোকের সমান একাই যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতের উপর তরবারীর এমন এক আঘাত লাগে যে, এর ফলে তার হাতের আঙ্গুলিগুলো কেটে যায়। ঐ সময় তার মুখ দিয়ে 'হিস' শব্দ বের হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

(لو قلت: بسم الله، لرفعتك الملائكة والناس ينظرون)

'তুমি যদি বিসমিল্লাহ বলতে তবে তোমাকে ফেরেশ্‌তা উঠিয়ে নিতেন এবং জনগণ দেখতে পেত।'

জাবির (রাঃ) বলেন যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ফিরিয়ে দেন।[1] ইকলীলে হা'কিমের বর্ণনা রয়েছে যে, উহুদের দিন তাঁকে ৩৯টি বা ৩৫টি আঘাত লেগেছিল এবং তাঁর শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলিদ্বয় অকেজো হয়ে গিয়েছিল।[2]

ইমাম বুখারী (রহ.) কায়েস ইবনু আবী হাযিম (রাঃ) হতে বর্ণিত করেছেন যে, তিনি বলেন, 'আমি তালহা (রাঃ)-এর হাত দেখেছি যে, ওটা নিষ্ক্রিয় ছিল। ঐ হাত দ্বারাই তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ)-কে রক্ষা করেছিলেন।'[3]

ইমাম তিরমিযীর (রহ.) বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ দিন তালহা (রাঃ)-এর ব্যাপারে বলেছিলেন,

(من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله)

'কেউ যদি ভূ-পৃষ্ঠে কোন শহীদকে চলতে ফিরতে দেখত চায় তবে সে যেন তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখে নেয়।'[4]

আবু দাঊদ তায়ালেসী (রাঃ) আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত করেছেন যে, আবু বকর (রাঃ) যখন উহুদ যুদ্ধের আলোচনা করতেন তখন বলতেন, 'এ যুদ্ধ সম্পূর্ণটাই তালহা (রাঃ)-এর জন্যে ছিল'[5] (অর্থাৎ এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হিফাযাত করার আসল কাজ তিনিই আনজাম দিয়েছিলেন)। আবু বকর (রাঃ) তাঁর ব্যাপারে নিম্নের কথাও বলেন,

يا طلحة بن عبيد الله قد وَجَبَتْ ** لك الجنان وبُوِّئْتَ المَهَا العِينَا

অর্থাৎ 'হে তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ), তোমার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং তুমি তোমার এখানে আয়তলোচনা হুরদের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছ।'[6]

---

[1] ফাতহুলবারী, ৭ম খণ্ড ৩৬১ পৃ: এবং সুনানে নাসায়ী, ২য় খণ্ড ৫২-৫৩ পৃঃ।
[2] ফাতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৩৬১ পৃঃ।
[3] সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড ৫২৭-৫২৮ পৃঃ।
[4] মিশকাত, ২য় খণ্ড ৫৬৬ পৃ: এবং ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৬ পৃঃ।
[5] ফাতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৩৬১ পৃঃ।
[6] মুখতাসার তারীখে দেমাশক ৭ম খণ্ড ৮২ পৃঃ, 'শারহে শুযুরিয়াহব' এর হাশিয়ার উদ্ধৃতিসহ ১১৪ পৃঃ।

এ সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হতে স্বীয় সাহায্য নাযিল করেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'আমি উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি, তাঁরা তাঁর পক্ষ হতে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। আমি এর পূর্বে এবং পরে এ দু'জন লোককে আর কখনো দেখিনি।' অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা দু'জন ছিলেন জিব্রাঈল (عليه السلام) ও মীকাঈল (عليه السلام)।[1]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সাহাবায়ে কিরামের একত্রিত হওয়ার সূচনা (بداية تجمع الصحابة حول الرسول ﷺ) :

এ সব ঘটনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে অকস্মাৎ এবং অত্যন্ত ত্বড়িৎ গতিতে সংঘটিত হয়ে যায়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাছাইকৃত সাহাবায়ে কেরাম, যারা যুদ্ধ চলাকালে প্রথম সারিতে ছিলেন, যুদ্ধের পট পরিবর্তন হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দ্রুতগতিতে আসেন যাতে তাঁর কোন অঘটন ঘটে না যায়। কিন্তু তাঁরা প্রথম সারিতে থাকার কারণে এ সব খবর জানতে পারেন নি। অতঃপর যখন তাঁদের কানে এ খবর পৌঁছল তখন তাঁরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দৌড়িয়ে আসলেন। কিন্তু যখন তাঁরা তাঁর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি আহত হয়েই গেছেন। ৬ জন আনসারী শহীদ হয়েছেন এবং সপ্তম জন আহত হয়ে পড়ে আছেন। আর সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রাণপণে যুদ্ধ করে শত্রুদেরকে প্রতিহত করছেন। তাঁরা পৌঁছা মাত্রই নিজেদের দেহ ও অস্ত্র দ্বারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চতুর্দিকে বেড়া তৈরি করে দেন এবং শত্রুদের ভীষণ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেন। যুদ্ধের সারি হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যাঁরা ফিরে এসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম ছিলেন তাঁর গুহার বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

ইবনু হিব্বান (রঃ) তার 'সহীহ' গ্রন্থে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন সমস্ত লোব নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে চলে গিয়েছিলেন (অর্থাৎ রক্ষকগণ ছাড়া সমস্ত সাহাবী তাঁকে তাঁর অবস্থানস্থলে রেখে যুদ্ধের জন্যে আগের সারিতে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর কাফিরদের দ্বারা মুসলিম পরিবেষ্ঠিত হওয়ার পর) আমি সর্বপ্রথম তাঁর নিকট ফিরে আসি। দেখি যে, তাঁর সামনে একজন মাত্র লোক রয়েছেন যিনি তাঁর পক্ষ হতে যুদ্ধ করছেন এবং তাঁকে রক্ষা করছেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'তুমি তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ই হবে। তোমার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক! ইতিমধ্যে আবু উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার নিকট এসে পড়েন। তিনি এমনভাবে দৌঁড়াচ্ছিলেন যেন পাখী (উড়ছে), শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সাথে মিলিত হয়ে যান। এখন আমরা দুজন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে দৌড় দেই। তাঁর সামনে তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বললেন,

(دونكم أخـــاكم فقـــد أوجب)

'তোমাদের ভাই তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শুশ্রূষা কর। সে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।'

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারক আহত হয়েছে এবং শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া চক্ষুর নীচে গণ্ডদেশে ঢুকে আছে। আমি কড়া দুটি বের করতে চাইলে আবু উবাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি যে, এ দু'টি আমাকেই বের করতে দিন।' এ কথা বলে তিনি দাঁত দিয়ে একটি কড়া ধরলেন এবং ধীরে ধীরে বের করতে শুরু করলেন, যেন তিনি কষ্ট না পান। শেষ পর্যন্ত তিনি কড়াটি টেনে বের করলেন বটে, কিন্তু তাঁর নীচের একটি দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেল। এখন দ্বিতীয় কড়াটি আমিই বের করতে চাইলাম। কিন্তু এবারও তিনি বললেন, 'আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আপনাকে আমি বলছি যে, এটাও

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮০ পৃঃ।

আমাকেই বের করতে দিন।' এরপর দ্বিতীয়টিও তিনি আস্তে আস্তে টেনে বের করলেন। কিন্তু তাঁর নীচের আর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- বললেন,

(دونكم أخـــاكم فقـــد أوجب)

'তোমাদের ভাই তালহা (রাঃ)-এর শুশ্রুষা কর, সে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।'

আবু বকর (রাঃ) বললেন এখন আমরা তালহা (রাঃ)-এর দিনে মনোযোগ দিলাম এবং তাঁকে সামলিয়ে নিলাম। তাঁর দেহে দশটিরও বেশী যখম হয়েছিল। তালহা (রাঃ) ঐ দিন প্রতিরোধ ও যুদ্ধে কত বীরত্বের সাথে কাজ করেছিলেন এর দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়।[1]

আর এ সংকটময় মুহূর্তেই প্রাণ নিয়ে খেলাকারী সাহাবাদের (রাঃ) একটি দলও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চতুর্দিকে এসে পড়েন। তাঁরা হলেন, আবু দুজানা (রাঃ), আবু মুসআব ইবনু উমায়ের (রাঃ), মালিক ইননু তালিব (রাঃ), সাহল ইবনু হুনায়েফ (রাঃ), মালিক ইবনু সিনান (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা, উম্মু আম্মারা রাহনুসাইবাহ বিনতু কাব মায়িনিয়্যাহ (রাঃ); কাতাদাহ ইবনু নু'মান (রাঃ), উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), হা'তিব ইবনু আবী বলতাআহ (রাঃ) এবং আবু তালহা (রাঃ)।

মুশরিকদের চাপ বৃদ্ধি (تضاعف ضغط المشركين) :

এদিকে মুশরিকদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ফলে তাদের আক্রমণও কঠিন হতে কঠিনতর আকার ধারণ করছিল যার ফলে শুক্তি এবং চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ কতগুলো গর্তের মধ্যে একটি গর্তে পড়ে যান যেগুলো আবু আ'মির ফা'সিক এ প্রকারের অনিষ্টের জন্যেই খনন করে রেখেছিল। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাঁটু মুবারক মচকে যায়। আলী (রাঃ) তাঁর হাত ধরে নেন এবং তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) (যিনি নিজেও চরমভাবে আহত হয়েছিলেন) তাঁকে স্বীয় বক্ষে নিয়ে নেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হন।

না'ফে ইবনু জুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, তিনি একজন মুহাজির সাবাবীকে বলতে শুনেছেন, 'আমি উহুদের যুদ্ধে হাযির ছিলাম। আমি দেখি যে, চতুর্দিক হতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর তীর বর্ষিত হচ্ছে, আর তিনি তীরগুলোর মাঝেই রয়েছেন। কিন্তু সমস্ত তীরই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে (অর্থাৎ তাঁকে বেষ্টনকারী সাহাবীগণ ওগুলো রুখে নিচ্ছেন) আমি আরো দেখি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব যুহরী বলতেছিল, 'মুহাম্মদ (ﷺ) কোথায় আছে তা আমাকে বলে দাও। এখন হয় আমি থাকব না হয় সে থাকবে।' অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বাহুতেই ছিলেন (অর্থৎ তার অতি নিকটে ছিলেন) এবং তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। অতঃপর সে তাঁকে ছেড়ে সামনে এগিয়ে যায়। এ দেখে সাফওয়ান তাকে ভর্ৎসনা করে। জবাবে সে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে দেখতেই পাই নি। আল্লাহর শপথ! আমার নিকট হতে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছে। এরপর আমরা চারজন লোক তাঁকে হত্যা করার প্রতিক্ষা করে বের হই। কিন্তু তাঁর কাছে পৌছতে পারি নি।[2]

অসাধারণ বীরত্বপণা ও প্রাণপণ লড়াই (البطولات النادرة) :

যাহোক এ সময় মুসলিমরা এমনভাবে বীরত্বের সাথে ও জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছেন এবং আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে মিলে না। যেমন আবু তালহা (রাঃ) নিজেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে ঢাল স্বরূপ বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি স্বীয় বক্ষ উপরে উঠিয়ে নিতেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে শত্রুদের

---

[1] যা'দুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৫ পৃঃ।

[2] যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড ৯৭ পৃঃ।

তীর হতে রক্ষা করতে পারেন। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উহুদের দিন লোকেরা (অর্থাৎ সাধারণ মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসার পরিবর্তে এদিক ওদিক পালিয়ে যায়, আর আবু তালহা একটি ঢাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান। তিনি একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি খুব টেনে তীর চালাতেন। ঐ দিন তিনি দু'টি কিংবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে কোন লোক তূণ নিয়ে গমন করলে তিনি বলতেন, (انثرهـا لأبي طلحـة) 'তোমরা তূণের তীরগুলো আবু তালহা (রাঃ)-এর জন্য ছড়িয়ে দাও।'

আর তিনি যখন এক একবার মাথা উঠিয়ে যুদ্ধের অবস্থা দেখতেন তখন আবু তালহা (রাঃ) চমকিত হয়ে বলতেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার পিতামাতা আপনার প্রাণের বিনিময়ে উৎসর্গিত হোক। আমার দেহ আপনার দেহের ঢাল হোক। মাথা বের করবেন না।'[1] এ সময় আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরগুলো নিজের বুক পেতে গ্রহণ করছিলেন।

আনাস (রাঃ) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, আবু তালহা নাবী (ﷺ) সহ একই ঢালের মধ্যে আত্মরক্ষা করছিলেন। আবু তালহা ছিলেন খুব দক্ষ তীরন্দাজ। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নাবী করীম (ﷺ) গর্দান উঠিয়ে দেখতেন যে, তীরটি কোথায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।[2]

আবু দুজানা (রাঃ)-এর বীরত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এ বিপদের মুহূর্তে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং নিজের পিঠকে করলেন ঢাল। ওর উপর তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল অথচ তিনি ছিলেন অনড়।

হা'তিব ইবনু বালতাআহ (রাঃ) উৎবাহ ইবনু আবী আক্কাসের পিছনে ধাওয়া করেন, যে নাবী কারীম (ﷺ)-এর দন্ত মুবারক শহীদ করেছিল। তাকে তিনি ভীষণ জোরে তরবারীর আঘাত করেন। এর ফলে তার মস্তক দেহচ্যুত হয়ে যায়। তারপর তিনি তার ঘোড়া ও তরবারী অধিকার করে নেন। সা'দ ইবনু আবী আক্কাস (রাঃ) তাঁর নিজের ঐ ভাই উৎবাহকে নিজ হাতে হত্যা করার জন্য খুবই আকাঙ্খী ছিলেন। কিন্তু এতে তিনি সফলকাম হননি। বরং এ সৌভাগ্য হা'তিব (রাঃ) লাভ করেন।

সাহল ইবনু হুনায়েফ (রাঃ) একজন সুদক্ষ তীরন্দায ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট মৃত্যুর দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও তীর চালাচ্ছিলেন। যেমন কাতাদাহ ইবনু নু'মান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় ধুনক দ্বারা এতো তীর চালিয়েছিলেন যে, ওর প্রান্ত ভেঙ্গে গিয়েছিল।' অতঃপর ঐ ধনুকটি কাতাদাহ ইবনু নু'মান (রাঃ) নিয়ে নেন এবং ওটা তার কাছেই থাকে। ঐ দিন এ ঘটনাও সংঘটিত হয় যে, কাতাদা (রাঃ)-এর একটি চোখে চোট লেগে ওটা তাঁর চেহারার উপর ঝুলে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ হাতে ওটাকে ওর নিজ স্থানে ঢুকিয়ে দেন। এরপর তাঁর ঐ চক্ষুটিকেই খুব সুন্দর দেখাত এবং ওটারই দৃষ্টি শক্তিও বেশী তীক্ষ্ণ হয়েছিল।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) যুদ্ধ করতে করতে মুখে আঘাত প্রাপ্ত হন, ফলে তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর দেহে বিশটি কিংবা তার চেয়েও বেশী যখম হন। তাঁর পা যখম হয়, ফলে তিনি খোড়া হয়ে যান।

মালিক বিন সানান আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গণ্ডদেশের রক্ত চুষে নিলেন আর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি (ﷺ) বললেন, থুথু ফেলে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি থুথু ফেলব না।

---

[1] সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৯১ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৬ পৃঃ।

তারপর তিনি ফিরে গেলেন ও লড়াইয়ে যোগ দিলেন। তারপর নাবী ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতি কোন ব্যক্তিকে দেখতে চায় সে যেন একে দেখে। তারপর তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

এ যুদ্ধে উম্মু আম্মারাহ নুসাইবাতা বিনতু কাআ'ব (رضي الله عنها) নাম্নী এক অসাধারণ মহিলাও অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বিবি আয়শা (رضي الله عنها) ও অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে শুশ্রূষা কারিনীরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আহত সৈনিকদের পানি সরবরাহ এবং তাদের অন্যান্য প্রকার সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়েছেন এবং কুরাইশ সৈন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। এ সংবাদ শ্রবণ মাত্র উম্মু আম্মারাহ (رضي الله عنها) কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ছুড়ে গেলেন। ঐ সময় মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহ রক্ষা করছিলেন। উম্মু আম্মারাহ (رضي الله عنها) সিংহীর ন্যায় বিক্রম সহকারে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য সহকারে তীর বর্ষণ করে কুরাইশদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন। এক সময় তিনি ইবনু কামআর সামনে পড়ে গেলেন। ইবনু কামআর তার কাঁধের উপর এত জোরে তরবারীর আঘাত করল যে, এর ফলে তার কাঁধ গভীরভাবে যখম হল। তিনিও তার তরবারী দ্বারা ইবনু কামআরকে কয়েকবার আঘাত করলেন। কিন্তু নরাধম দুটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিল বলে বেঁচে গেল। শত্রুদের বর্শা ও তরবারীর আঘাতে তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ বীরঙ্গনা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে লাগলেন। উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা কালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ঐ বিপদের সময় আমি দক্ষিণে বামে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সে দিকেই দেখি যে, উম্মু আম্মারহ (رضي الله عنها) আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন।'

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের জাতীয় পতাকা মুসআব ইবনু উমায়ের (رضي الله عنه)-এর হাতে অর্পিত হয়েছিল। এ পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসআব (رضي الله عنه)-কে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করে আসতে হয়েছিল এবং তীর ও তরবারীর আঘাতে তার আপাদমস্তক একেবারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য বিপদের সময় দুর্ধর্ষ ইবনু কামআহ অগ্রসর হয়ে তাঁর দক্ষিণ বাহুর উপর তরবারীর আঘাত করল। বাহুটি কেটে যাওয়ার সাথে সাথে মুসআব (رضي الله عنه) বাম হাতে পতাকা ধারণ করলেন। কিন্তু অবিলম্বে ইবনু কামআর তরবারীর দ্বিতীয় আঘাতে তাঁর বাম বাহুটিও দেহচ্যুত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের একটি তীর এসে তার জ্ঞান, ভক্তি ও বীরত্বপূর্ণ বক্ষটিভেদ করে চলে গেল এবং তিনি চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে শহীদের অমর জীবন লাভ করলেন। তাঁর আকৃতির সাথে মুসআব (رضي الله عنه)-এর আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং মুসআব (رضي الله عنه)-কে শহীদ করে ইবনু কামআর মুশরিকদের দিকে ফিরে গেল এবং চিৎকার করে করে ঘোষণা করল যে, মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করা হয়েছে।[1]

নাবী ﷺ-এর শহীদ হওয়ার খবর এবং যুদ্ধের উপর এর প্রতিক্রিয়া (إشاعة مقتل النبي ﷺ وأثره على المعركة) :

এ ঘোষণায় নাবী ﷺ-এর শাহাদতের খবর মুসলিম ও মুশরিক উভয় দলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। এ দুঃখ সংবাদ রটনার পর অধিকাংশ মুসলিমই ক্ষণিকের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। একদল মুসলিম ইতিমধ্যেই শাহাদত প্রাপ্ত হয়েছেন, জীবিতদের মধ্যে একদল গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়েছেন শুনে একদল অস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ এমন কি কেউ কেউ মদীনায় পলায়ণ পর্যন্ত করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাহাদতের এ খবরই আবার এদিক দিয়ে কল্যাণকররূপে প্রতিয়মান হয় যে, তারা অনুভব করছিল যে, তাদের শেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং এখন বহু মুশরিক আক্রমণ বন্ধ করে মুসলিম শহীদদের মৃত দেহের মূসলা (নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়ার কাজ) করতে শুরু করে দেয়।

[1] ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৭১-৮৩ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৯৭ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর্যুপরি যুদ্ধ ও অবস্থার উপর আধিপত্য লাভ (الرسول ﷺ يواصل المعركة وينقذ الموقف) :

মুসআব ইবনু উমায়ের (রা)-এর শাহাদতের পর আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা প্রদান করেন। তিনি **প্রাণপণে যুদ্ধ** করে যান। সেখানে উপস্থিত অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামও অতুলনীয় বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ ও **আক্রমণ করেন**। এর দ্বারা অবশেষে এ সম্ভাবনা দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের সারিগুলো ভেদ করে **ভিড়ের মধ্যে** আগত সাহাবায়ে কেরামের দিকে পথ তৈরি করতে পারবেন। তিনি সামনে পা বাড়ালেন এবং **সাহাবায়ে** কেরামের দিকে আসলেন। সর্ব প্রথম তাঁকে চিনতে পারেন কা'ব ইবনু মা'লিক (রা)। তিনি খুশীতে **চিৎকার** করে ওঠেন, 'হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা আনন্দিত হও, এই যে রাসূলুল্লাহ ﷺ! তিনি তাঁকে ইঙ্গিত করেন, 'চুপ থাকো, যাতে মুশরিকরা আমার অবস্থান ও অবস্থানস্থলের টের না পায়।' কিন্তু কা'ব (রা)-এর আওয়ায মুসলিমগণের কানে পৌঁছেই গিয়েছিল। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশ্রয়ে চলে আসতে শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় ত্রিশ জন সাহাবী একত্রিত হয়ে যান।

যখন এ সংখ্যক সাহাবী সমবেত হয়ে যান তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়ের ঘাঁটি অর্থাৎ শিবিরের দিকে যেতে শুরু করেন। কিন্তু এ সরে যাওয়ার অর্থ ছিল, মুশরিক মুসলিমগণকে তাদের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে ফেলার যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিল তা বিফল হয়ে যাবে। তাই, তারা মুসলিমগণের এ প্রত্যাবর্তনকে ব্যর্থ করার মানসে ভীষণ আক্রমণ শুরু করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ আক্রমণকারীদের ভীড় ঠেলে রাস্তা তৈরি করেই ফেলেন এবং ইসলামের সিংহদের বীরত্বের সামনে তাদের কোন ক্ষমতাই টিকল না। এরই মধ্যে উসমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরা নামক মুশরিকদের একজন হঠকারী ঘোড়সওয়ারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হল এবং বলল, 'হয় আমি থাকব, না হয় সে থাকবে।' এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺও তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য থেমে গেলেন। কিন্তু মোকাবেলা করার সুযোগ হল না। কেননা তার ঘোড়াটি একটি গর্তে পড়ে গেল। আর ইতিমধ্যে হারিস ইবনু সম্মাহ (রা) তাঁর নিকট পৌঁছে তার পায়ের উপর এমন জোরে তরবারীর আঘাত করলেন যে, সে ওখানেই বসে পড়ল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তার হাতিয়ার নিয়ে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে গেলেন। কিন্তু এরই মধ্যে আবার আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির নামক আর একজন মক্কার ঘোড়সওয়ার হারিস ইবনু সম্মাহ (রা)-কে আক্রমণ করল এবং তাঁর কাঁধের উপর তরবারীর আঘাত করে যখম করে দিল। কিন্তু মুসলিমরা লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। আর এদিকে মৃত্যুর সঙ্গে ক্রীড়ারত মর্দে মুজাহিদ আবু দুজানা (রা), যিনি আজ লাল পাগড়ী বেঁধে রেখেছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু জাবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁকে এমন জোরে তরবারীর আঘাত করেন যে, তার মাথা উড়ে যায়।

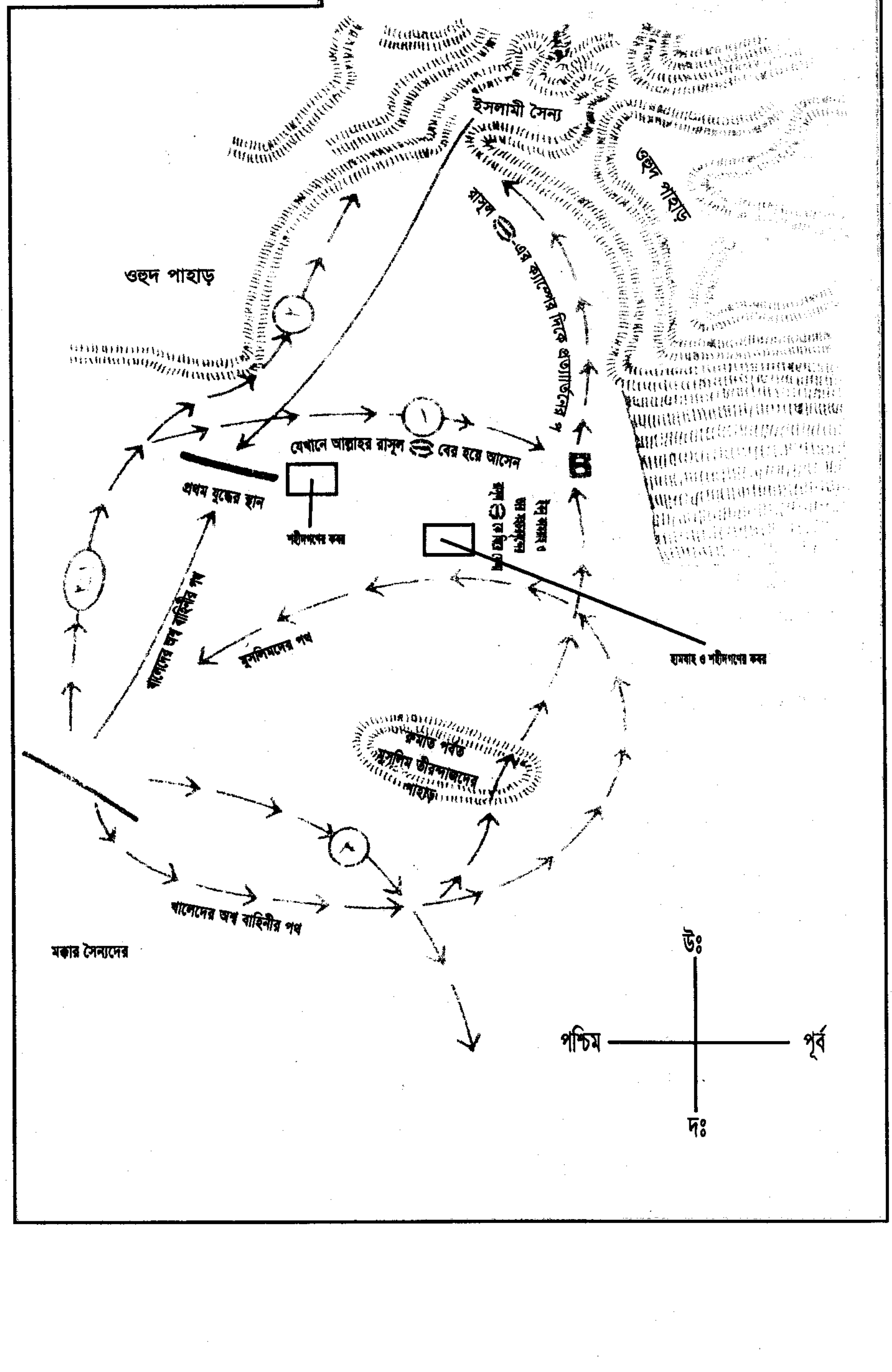
কি স্বর্গীয় মাহাত্ম্য যে, এ রক্তক্ষয়ী চলাকালেই মুসলিমরা তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিশ্রাম ও প্রশান্তি। আবু তালহা (রা) বলেন, 'উহুদের যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। এমনকি, আমার হাত হতে কয়েকবার তরবারী পড়ে যায়। প্রকৃত অবস্থা ছিল এরূপ যে, ওটা পড়ে যাচ্ছিল এবং আমি ধরে নিচ্ছিলাম। আবার পড়ে যাচ্ছিল এবং আবারও আমি ধরে নিচ্ছিলাম।'[1]

সার কথা হল, এভাবে মরণপণ করে এ বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে পিছনে সরতে সরতে পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থিত শিবির পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং বাকী সৈন্যদের জন্যেও এ সুরক্ষিত স্থান পৌঁছার পথ পরিস্কার করে দেন। সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যরাও এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলেন এবং খালিদের বাহিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহিনীর সামনে অকৃতকার্য হয়ে গেল।

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮২ পৃঃ।

ওহুদ যুদ্ধের মানচিত্র



উবাই ইবনু খালফের হত্যা (مقتل أبي بن خلف) :

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘাঁটিতে পৌঁছে যান তখন উবাই ইবনু খালফ এগিয়ে গিয়ে বলে, 'মুহাম্মদ ﷺ কোথায়? হয় আমি থাকব, না হয় সে থাকবে।' তার এ কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের মধ্য হতে কেউ তাঁর উপর আক্রমণ করব কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাঁকে আসতে দাও।' সে নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিস ইবনু সম্মাহ (রাঃ)-এর নিকট হতে একটি ক্ষুদ্র বর্শা চেয়ে নিয়ে নাড়া দেন। তিনি ওটা নাড়া দেয়া মাত্রই জনগণ এমনভাবে এদিকে ওদিক সরে পড়ে যেমনভাবে উট তার শরীর নাড়া দিলে মাছিগুলো উড়ে যায়। এরপর তিনি তাঁর মুখোমুখী হন এবং শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মধ্যস্থলে গলার পার্শ্বে সামান্য জায়গা খোলা দেখে ওটাকেই লক্ষ্য করে এমনভাবে বর্শার আঘাত করেন যে, সে ঘোড়া হতে গড়িয়ে পড়ে যায়। তার ঘাড়ে খুব বড় একটা আচড় ছিল না, রক্ত বন্ধ ছিল, এমতাবস্থায় সে কুরাইশদের নিকট পৌঁছে বলে, 'মুহাম্মদ ﷺ আমাকে হত্যা করে ফেলেছে।' জনগণ তাকে বলে, 'আল্লাহর কসম! তোমার মন দমে গেছে, নচেৎ তোমাকে আঘাত তো তেমন লাগে নি, তথাপি তুমি এত ছটফট করছো কেন?' উত্তরে সে বলে, 'সে মক্কায় আমাকে বলেছিল, আমি তোমাকে হত্যা করব।[১] এ জন্য, আল্লাহর কসম! যদি সে আমাকে থুথু দিত তা হলেও আমার জীবন শেষ হয়ে যেত।' অবশেষে এ শত্রু মক্কা ফিরবার পথে 'সারফ' নামকস্থানে পৌঁছে মৃত্যু বরণ করে।[২] আবুল আসওয়াদ (রাঃ) উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সে বলদের মতো আওয়ায বের করত এবং বলত, 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যে কষ্ট আমি পাচ্ছি, যদি যিল মাজাযের সমস্ত অধিবাসী ঐ কষ্ট পেত তবে তারা সবাই মরে যেত।'[৩]

তালহা (রাঃ) নাবী ﷺ-কে উঠিয়ে নেন (طلحة ينهض بالنبي ﷺ) :

পাহাড়ের দিকে নাবী ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পথে একটি টিলা পড়ে যায়। তিনি ওর উপর আরোহণের চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু সক্ষম হলেন না। কেননা, একে তো তাঁর দেহ ভারী হয়েছিল, দ্বিতীয়ত, তিনি দুটি বর্ম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তাছাড়া, তিনি কঠিনভাবে আঘাত প্রাপ্তও হয়েছিলেন। সুতরাং তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) নীচে বসে পড়েন এবং তাঁকে সওয়ার করিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। এভাবে তিনি টিলার উপর পৌঁছে বলেন,

(أَوْجَبَ طلحةُ) 'তালহা (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে। (রাঃ)।'[৪]

মুশরিকদের শেষ আক্রমণ (آخر هجوم قام به المشركون) :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘাঁটির মধ্যে স্বীয় অবস্থানস্থলে পৌঁছে যান তখন মুশরিকরা মুসলিমগণকে ঘায়েল করার শেষ চেষ্টা করে। ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, যে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘাঁটির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন ঐ সময় আবু সুফিয়ান ও খালিদ ইবনু ওয়ালীদের নেতৃত্ব মুশরিকদের একটি দল পাহাড়ের উপর উঠে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় দু'আ করেন,

(اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا)

---

[1] ঘটনা হচ্ছে মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উবাই এর সাক্ষাৎ হতো তখন সে তাঁকে বলত, 'মুহাম্মদ ﷺ! আমার নিকট 'আউদ' নামক একটি ঘোড়া রয়েছে। আমি দৈনিক তাকে তিন সা' (সাড়ে সাত কিলোগ্রাম) দানা ভক্ষণ করিয়ে থাকি। ওরই উপর আরোহণ করে আমি তোমাকে হত্যা করব।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলতেন, 'ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব।'

[2] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ, যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড ৭ পৃঃ।

[3] মুখতাসার সীরাতুর রাসূল ﷺ শায়খ আবু আব্দুল্লাহ প্রণীত, ২৪০ পৃঃ।

[4] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৬ পৃঃ।

'হে আল্লাহ! এরা যেন আমাদের হতে উপরে যেতে না পারে।' অতঃপর উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) এবং মুহাজিরদের একটি দল যুদ্ধ করে তাদেরকে পাহাড়ের উপর হতে নীচে নামিয়ে দেন।[১]

মাগাযী উমভীর বর্ণনায় রয়েছে যে, মুশরিকরা পাহাড়ের উপর চড়ে বসলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সা'দ (رضي الله عنه)-কে বলেন, (اُجْنُبْهُمْ) 'তাদের উদ্যম নষ্ট করে দাও অর্থাৎ তাদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও।' তিনি উত্তরে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি একাই কিভাবে তাদের উদ্যম নষ্ট করব?' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিন বার এ কথারই পুনারাবৃত্তি করেন। অবশেষে সা'দ (رضي الله عنه) স্বীয় তূণ হতে একটি তীর বের করেন এবং একটি লোকের উপর নিক্ষেপ করেন। লোকটি সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। সা'দ (رضي الله عنه) বলেন, 'পুনরায় আমি আমার তীর গ্রহণ করি। আমি ওটা চিনতাম। ওটা দ্বারা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে মারলাম। সেও মারা গেল। তারপর আমি আবার ঐ তীর গ্রহণ করলাম এবং তাঁরও প্রাণ নির্গত হয়ে গেল। অতঃপর মুশরিকরা নীচে নেমে গেল। আমি বললাম যে, এটা বরকতপূর্ণ তীর। তার পর আমি ঐ তীর আমার তূণের মধ্যে রেখে দিলাম।' এ তীর সারা জীবন সা'দ (رضي الله عنه)-এর কাছেই থাকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের নিকট থাকে।[২]

শহীদগণের মুসলা (অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কর্তন) (تشويه الشهداء) :

এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে শেষ আক্রমণ। যেহেতু মুশরিকদের রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিণাম সম্পর্কে সঠিক অবগতি ছিল না, বরং তাঁর শাহাদত সম্পর্কে তাদের প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ছিল, সেহেতু তারা তাদের শিবিরের দিকে ফিরে গিয়ে মক্কা ফিরে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। মুশরিকদের কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ মুসলিম শহীদের মুসলায় (নাক, কান ইত্যাদি কাটায়) লিপ্ত হয়ে পড়ে। হিন্দ বিনতু উৎবাহ হামাযাহ (رضي الله عنه)-এর কলিজা ফেড়ে দেয় এবং তা মুখে নিয়ে চিবাতে থাকে। সে ওটা গিলে নেয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু গিলতে না পেরে থুথু করে ফেলে দেয়। সে কাটা কান ও নাকের তোড়া ও হার বানিয়ে নেয়।[৩]

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্যে মুসলিমগণের তৎপরতা (مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة) :

অতঃপর এ শেষ সময়ে এমন দুটি ঘটনা সংঘটিত হয় যার দ্বারা এটা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয় যে, ইসলামের এ বীর মুজাহিদেরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্যে কেমন প্রস্তুত ছিলেন এবং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্য কত আকাঙ্খিত ছিলেন।

১. কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন, 'আমি ঐ মুসলিমগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। যাঁরা ঘাঁটি হতে বাইরে এসেছিলেন। আমি দেখি যে, মুশরিকদের হাতে মুসলিম শহীদের নাক, কান ইত্যাদি কাটা হচ্ছে। এ দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। তারপর সামনে এগিয়ে দেখি যে, একজন মুশরিক, যে ভারী বর্ম পরিহিত ছিল, শহীদদের মাঝ হতে গমন করছে এবং বলতে বলতে যাচ্ছে, 'কাটা বকরীদের নরম হাড়ের মতো ঢেরী লেগে গেছে।' আরো দেখি যে, একজন মুসলিম তার পথে ওঁৎ পেতে রয়েছেন। তিনিও বর্ম পরিহিত ছিলেন। আমি আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁর পিছনে রয়ে গেলাম। তারপর দাঁড়িয়ে গিয়ে মুসলিম ও কাফিরটিকে চোখের দৃষ্টিতে ওজন করতে লাগলাম।

এমনিভাবে যতটুকু প্রত্যক্ষ করলাম তাতে ধারণা হল যে, মুশরিকটি দেহের বাঁধন ও সাজসরঞ্জাম উভয় দিক দিয়েই মুসলিমটির উপরে রয়েছে। এ পর্যায়ে আমি দুজনের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে উভয়ের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং মুসলিমটি মুশরিকটিকে তরবারীর এমন আঘাত করলেন

---

[1] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৬ পৃঃ।

[2] যাদুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৫ পৃঃ।

[3] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃঃ।

যে, ওটা তার পা পর্যন্ত কেটে চলে গেল। মুশরিক দু'টুকরা হয়ে পড়ে গেল। তারপর মুসলিমটি নিজের চেহারা খুলে দিলেন এবং বললেন, 'ভাই কা'ব (রাঃ)! কেমন হল? আমি আবু দুজানা (রাঃ)।'[১]

২. যুদ্ধ শেষে কিছু মুসলিম মহিলা জিহাদের ময়দানে পৌঁছেন। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আয়শা বিনতু আবু বকর (রাঃ) এবং উম্মু সুলায়েম (রাঃ)-কে দেখি যে, তাঁরা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে নিয়ে পিঠের উপর পানির মশক বহন করে আনছেন এবং পানি বের করে কওমের (আহতদের) মুখে দিচ্ছেন।'[২] উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'উহুদের দিন উম্মু সালীত (রাঃ) আমাদের জন্যে মুশক ভরে ভরে পানি আনছিলেন।'[৩]

এ মহিলাদের মধ্যে একজন উম্মু আয়মনাও (রাঃ) ছিলেন। তিনি পরাজিত মুসলিমগণকে যখন দেখলেন যে, তাঁরা মদীনায় ঢুকে পড়তে চাচ্ছেন তখন তিনি তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'তোমরা এ সূতা কাটার ফিরকী গ্রহণ কর এবং আমাদেরকে তরবারী দিয়ে দাও।'[৪] এরপর তিনি দ্রুতগতি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেন এবং আহতদেরকে পানি পান করাতে শুরু করেন। তাঁর উপর হিব্বান ইবনু অরকা তীর চালিয়ে দেয়। তিনি পড়ে যান এবং তিনি বিবস্ত্র হয়ে যান এ দেখে আল্লাহর শত্রু হো হো করে হেসে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এটা খুব কঠিন ঠেকে এবং তিনি সা'দ ইবনু আবী আক্কাস (রাঃ)-কে একটি পালকবিহীন তীর দিয়ে বলেন, (ارم به) 'এটা চালাও।' সা'দ (রাঃ) ওটা চালিয়ে দিলে ওটা হিব্বানের গলায় লেগে যায় এবং সে চিৎ হয়ে পড়ে যায় ও সে বিবস্ত্র হয়ে যায়। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন হাসেন যে, তাঁর দাঁত দেখা যায় এবং তিনি বলেন,

(استقاد لها سعد، أجاب الله دعوته)

'সা'দ (রাঃ) উম্মু আয়মান (রাঃ)-এর বদলা নিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করুন।'[৫]

ঘাঁটিতে স্থিতিশীলতার পর (بعد انتهاء الرسول ﷺ إلى الشعب) :

যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘাঁটির মধ্যে স্বীয় অবস্থানস্থলে কিছুটা স্থিতিশীল হন তখন আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) 'মিহরাস' হতে স্বীয় ঢালে করে পানি ভরে আনেন। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, 'মিহরাস' পাথরের তৈরি ঐ গর্তকে বলা হয় যার মধ্যে বেশী পানি আসতে পারে। আবার এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, 'মিহরাস' উহুদের একটি ঝর্ণার নাম। যা হোক, আলী (রাঃ) ঐ পানি নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে পান করার জন্য পেশ করেন। নাবী (ﷺ) কিছুটা অপছন্দনীয় গন্ধ অনুভব করেন। সুতরাং তিনি ঐ পানি পান করলেন না বটে, তবে তা দ্বারা চেহারার রক্ত ধুয়ে ফেললেন এবং মাথায়ও দেন। ঐ সময় তিনি বলছিলেন,

(اشتد غضب الله على من دَمَّى وجه نبيه)

'ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর কঠিন গযব হোক, যে তার নাবী (ﷺ)-এর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে।'[৬]

সাহল (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যখমকে ধুয়েছেন, পানিকে ঢেলে দিয়েছেন এবং প্রতিষেধকরূপে কোন জিনিস প্রয়োগ করা হয়েছে তা আমার বেশ জানা আছে। তাঁর কলিজার টুকরা ফাতিমা (রাঃ) তাঁর যখম

---

[1] আল বিদয়াহ ও য়ান নিহাইয়াহ, ৪র্থ খণ্ড ১৭ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃঃ, ২য় খণ্ড, ৫৮১ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃঃ।

[4] সূতা কাটা আরব মহিলাদের বিশিষ্ট কাজ ছিল। এ জন্য সূতা কাটার ফিরকী আরব মহিলাদের ঐরূপ বিশিষ্ট আসবাব পত্র ছিল যেরূপ আমাদের দেশে চুড়ি। এ স্থলে উল্লেখিত বাকরীতির ভাবার্থ ঠিক ওটাই,

[5] আসসীরাতুল হালবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড ২২ পৃঃ।

[6] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৫ পৃঃ।

ধুচ্ছিলেন, আলী ঢাল হতে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং ফাতিমা যখন দেখেন যে, পানির কারণে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, তখন তিনি চাটাই এর অংশ নিয়ে জ্বালিয়ে দেন এবং ওর ভস্ম নিয়ে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দেন। এর ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।'[১]

এদিকে মুহাম্মদ ইবনু মাসলাম মিষ্ট ও সুস্বাদু পানি নিয়ে আসেন। ঐ পানি নাবী পান করেন এবং কল্যাণের দু'আ করেন।[২] যখমের ব্যাথার কারণে রাসূলুল্লাহ যুহরের সালাত বসে বসে আদায় করেন এবং সাহাবায়ে কিরামও তাঁর পিছনে বসে বসে সালাত আদায় করেন।[৩]

আবু সুফিয়ানের আনন্দ ও উমার -এর সাথে কথোপকথন (شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر) :

মুশরিকরা প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ফেললে আবু সুফিয়ান উহুদ পাহাড়ের উপর প্রতীয়মান হলেন এবং উচ্চস্বরে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ আছে কি?' মুসলিমরা কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বলল, 'তোমাদের মধ্যে আবু কুহাফার পুত্র আবু বকর আছে কি?' তাঁরা এবারও কোন জবাব দিল না। সে পুনরায় প্রশ্ন করে, 'তোমাদের মধ্যে উমার ইবনু খাত্তাব আছে কি?' সাহাবীগণ এবারও উত্তর দিলেন না। কেননা, নাবী তাদেরকে উত্তর দিতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান এ তিন জন ছাড়া আর কারো ব্যাপারে প্রশ্ন করে নি। কেননা, তার ও তার কওমের এটা খুব ভালই জানা ছিল যে, ইসলাম এ তিন জনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মোট কথা, যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না তখন সে বললেন, 'চলো যাই, এ তিন জন হতে অবকাশ লাভ করা গেছে।' এ কথা শুনে উমার আর ধৈর্য্য ধরতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওরে আল্লাহর শত্রু। যাদের তুই নাম নিয়েছিস তাঁরা সবাই জীবিত রয়েছেন এবং এখনো আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করার উৎস বাকী রেখেছেন।' এরপর আবু সুফিয়ান বলল, 'তোমাদের নিহতদের মুসালা করা হয়েছে অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এরূপ করতে আমি হুকুমও করিনি এবং এটাকে খারাপও মনে করিনি।' অতঃপর সে চিৎকার করে বলল, أُعْلُ هُبَلْ 'অর্থাৎ হুবল (ঠাকুর) সুউচ্চ হোক।'

নাবী তখন সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন? তারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি জবাব দিব?' তিনি বললেন, 'তোমরা বল, (قولوا: الله أعلى وأجــل) অর্থাৎ 'আল্লাহ সুউচ্চ ও অতি সম্মানিত।' আবার আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলল, لنا العُزَّى ولا عزى لكم অর্থাৎ আমাদের জন্যে উয্যা (প্রতিমা) রয়েছে, তোমাদের জন্যে উয্যা নেই।'

নাবী পুনরায় সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন?' তারা বললেন, 'কি উত্তর দিব?' তিনি বললেন, 'তোমরা বল, (قولوا:الله مولانا، ولا مولي لكم) অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের মাওলা এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।'

অতঃপর আবু সুফিয়ান বললেন, 'কতই না ভাল কাজ হল! আজকের দিনটি বদর যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ। আর যুদ্ধ হচ্ছে বালতির ন্যায়।'[৪]

উমার এ কথার উত্তরে বলেন, 'সমান নয়। কেননা আমাদের নিহতরা জান্নাতে আছেন, আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে আছে।'

এরপর আবু সুফিয়ান বলল, 'উমার আমার নিকটে এসো।' রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন, 'যাও, দেখা যাক কি বলে?' উমার নিকটে আসলে আবু সুফিয়ান তাঁকে বলে, 'আমি তোমাকে আল্লাহর মাধ্যম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, 'আমরা মুহাম্মদ -কে হত্যা করেছি কি?' জবাবে উমার বলেন, 'আল্লাহর কসম! না,

---

[1] সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৮৪ পৃঃ।

[2] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২য় খণ্ড ৩০ পৃঃ।

[3] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৭ পৃঃ।

[4] অর্থাৎ কখনও একদল জয় যুক্ত হয় এবং কখনও অন্যদল। যেমন বালতি একবার একজন টেনে তোলে, আরেকবার অন্যজন।

বরং এখন তিনি তোমাদের কথা শুনছেন।' আবু সুফিয়ান তখন বলল, 'তুমি আমার নিকট ইবনু কামআর হতে অধিক সত্যবাদী।'[১]

বদরে আরেকবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা (مواعدة التلاقي في بدر) :

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান এবং তাঁর সঙ্গীরা ফিরে যেতে শুরু করলে আবু সুফিয়ান মুসলিমগণকে বলল, 'আগামী বছর বদরে আবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা থাকল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন একজন সাহাবীকে বললেন, (قل: نعم، هو بيننا وبينك موعـــد) 'তুমি তাঁকে বলে দাও ঠিক আছে। এখন আমাদের ও তোমাদের মাঝে এটার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল।'[২]

মুশরিকদের প্রত্যাগমনের সত্যাসত্য যাচাই (التثبت من موقف المشركين) :

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইবনু আবু তালিব (رضي الله عنه)-কে রওয়ান করিয়ে দিয়ে বলেন,

(اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَنَّبُوا الخيل، وامْتَطُوا الإبل، فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة)

'(মুশরিক) কওমের পিছু পিছু যাও, অতঃপর তারা কি করে এবং তাদের উদ্দেশ্য কি তা পর্যবেক্ষণ কর। যদি দেখ যে, তারা ঘোড়াকে পার্শ্বে রেখে উটের উপর সওয়ার হয়ে চলছে, তবে জানবে যে, ফিরে যাওয়াই তাদের উদ্দেশ্য আর যদি দেখ যে, তাঁরা ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবে জানবে যে, মদীনা (আক্রমণ করাই) তাঁদের উদ্দেশ্য।'

তারপর তিনি বলেন, (والذي نفسي بيده، لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزهم)

'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি মদীনা (আক্রমণ করাই) তাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে মদীনা গিয়ে আমি তাদের মোকাবেলা করব।'

আলী (رضي الله عنه) বলেন, 'অতঃপর আমি তাদের পিছনে বের হয়ে দেখি যে, তারা ঘোড়াকে পাশে রেখে উটের উপর সওয়ার হয়ে আছে এবং মক্কামুখী রয়েছে।'[৩]

শহীদ ও আহতদের অনুসন্ধান (تفقد القتلى والجرحى) :

কুরাইশের প্রত্যাবর্তনের পর মুসলিমরা তাঁদের শহীদ ও আহতদের খোঁজ খবর নেয়ার সুযোগ লাভ করেন। যায়েদ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন। 'উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেন যে, আমি যেন সা'দ ইবনু রাবীর (رضي الله عنه) মৃতদেহ অনুসন্ধান করি এবং বলেন,

(إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟)

'যদি তাঁকে জীবিত দেখতে পাও তবে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং আমার কথা বলবে যে, সে নিজেকে কেমন পাচ্ছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চান।' আমি তখন নিহতদের মধ্যে চক্কর দিতে দিতে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। দেখি যে, তাঁর শেষ নিশ্বাস আসা যাওয়া করছে। তিনি বর্শা, তরবারী ও তীরের সত্তরেরও বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে সা'দ (رضي الله عنه)! রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং

---

[1] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯৩-৯৪ পৃঃ, যাদুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৪ পৃ: এবং সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৯ পৃঃ।

[2] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯৪ পৃঃ।

[3] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯৪ পৃঃ, হাফেজ ইবনু হাজর (রঃ) ফাতহুলবারী, সপ্ত খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মুশরিকদের উদ্দেশ্য যাঁচাই করার জন্য সাআ'দ ইবনু আবী আক্কাস (رضي الله عنه) রওয়ানা হয়েছিলেন।

আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন তা জানতে চেয়েছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার সালাম জানাবেন এবং তাঁকে বলবেন যে, আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। আর আপনি আমার কওম আনসারদেরকে বলবেন যে, যদি তাদের একটি চক্ষুও নড়তে থাকে এবং এমতাবস্থায় শত্রু রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের কোন ওযর চলবে না।' আর এ মুহূর্তে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।'[১]

মুসলিমরা আহতদের মধ্যে উসাইরিমকেও দেখতে পান, যার নাম ছিল আমর ইবনু সা'বিত। তাঁর প্রাণ ছিল তখন ওষ্ঠাগত। ইতোপূর্বে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হতো, কিন্তু তিনি কবুল করতেন না। এ জন্য মুসলিমরা (বিস্মিতভাবে) পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করেন, 'এ উসাইরিম কিভাবে এখানে আসল? আমরা তো তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম যে, সে এ দ্বীনের বিরোধী ছিল। তাই, তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উসাইরিম, কোন জিনিস তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তোমার সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উত্তেজনা, না ইসলামের আকর্ষণ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ইসলামের আকর্ষণ। আসলে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে শরীক হয়েছি। তারপর যে অবস্থায় রয়েছি তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।' এ কথা বলার পরই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে যান। মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এ ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বলেন, (هو من أهل الجنة) 'সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হল।'

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'অথচ তিনি আল্লাহর জন্যে এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করেন নি। (কেননা, ইসলাম গ্রহণের পর কোন সালাতের সময় হওয়ার পূর্বেই তিনি শহীদ হয়ে যান)।'[২]

এ আহতদের মধ্যেই কুযমানকেও পাওয়া গেল। সে এ যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব দেখিয়েছিল এবং একাই সাতজন বা আটজন মুশরিককে হত্যা করেছিল। তাকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। মুসলিমরা তাকে উঠিয়ে বনু যফরের মহল্লায় নিয়ে গেলেন এবং সুসংবাদ শুনালেন। সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমার যুদ্ধ তো শুধু আমার কওমের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই ছিল। এটা না থাকলে আমি যুদ্ধই করতাম না।' এরপর যখন তার যখমের কারণে সে অত্যাধিক যন্ত্রণা অনুভব করল তখন সে নিজেকে জবাই করে আত্মহত্যা করল। এরপর যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তার আলোচনা করা হত, তখনই তিনি বলতেন যে, (إنه من أهلِ النار) সে জাহান্নামী[৩] আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্য ছাড়া স্বদেশ বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে যুদ্ধকারীদের পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে, যদিও সে ইসলামের পতাকার নীচে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীদের (রাঃ) সাথে শরীক হয়ে যুদ্ধ করে।

পক্ষান্তরে, নিহতদের মধ্যে বনু সা'লাবার একজন ইহুদীকে পাওয়া যায়। যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল তখন সে তার কওমকে বলেছিল, 'হে ইহুদীদের দল আল্লাহর কসম! তোমরা জান যে, মুহাম্মদ ﷺ-কে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।' তারা উত্তরে বলেছিল, 'কিন্তু আজ তো শনিবার।' সে তখন বলেছিল, 'তোমাদের জন্যে কোন শনিবার নেই।' অতঃপর সে নিজের তরবারী এবং সাজ-সরঞ্জাম উঠিয়ে নেয় এবং বলে, 'আমি যদি নিহত হই তবে আমার মাল মুহাম্মদ ﷺ-এর অধিকারে চলে যাবে। তিনি তা নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবেন।' এরপর ঐ ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যায় এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্তব্য করেন, (مُخَيرِيق خير يهود) 'মুখাইরীক একজন উত্তম ইহুদী ছিল।'[৪]

---

[1] যা'দুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।
[2] যাদু'ল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৪ পৃঃ। ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯০ পৃঃ।
[3] যাদুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৭-৯৮ পৃ: এবং ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৮ পৃঃ।
[4] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৮-৮৯ পৃঃ।

শহীদগণকে একত্রিত করণ ও দাফন (جمع الشهداء ودفنهم) :

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও শহীদদেরকে পরিদর্শন করেন এবং বলেন,

أَنَا أَشْهَدُ عَلَى هَؤُلَاءِ إِنَّهُ مَا مِنْ جَرِيْحٍ يُجْرَحُ فِي اللهِ إِلَّا وَاللهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

'আমি এ লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকব। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উঠাবেন যে, তাঁর ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বইতে থাকবে। রঙ তো রক্তেরই হবে, কিন্তু সুগন্ধি হবে মিশকের মতো।'[১]

কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাঁদের শহীদদেরকে মদীনায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন শহীদদেরকে ফিরিয়ে এনে তাঁদের শাহাদতের স্থানেই দাফন করেন এবং আরো নির্দেশ দেন যে, তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং চর্ম নির্মিত (যুদ্ধের) পোষাক যেন খুলে নেয়া না হয়, আর গোসল দেয়া ছাড়াই যে আবস্থায় তাঁরা রয়েছেন সেই অবস্থাতেই যেন তাঁদেরকে দাফন করে দেয়া হয়। তিনি দু'দুজনকে একই কাপড় জড়াতেন এবং দুই কিংবা তিন শহীদকে একই কবরে দাফন করতেন এবং প্রশ্ন করতেন, (أيهم أكثر أخذًا للقـــرآن؟) 'এদের মধ্যে কুরআন কার বেশী মুখস্থ ছিল?' সাহাবীরা যার দিকে ইশারা করতেন তাকেই তিনি কবরে আগে রাখতেন এবং বলতেন, (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) 'কিয়ামতের দিন আমি এ লোকাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করব।' আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হারাম (রাঃ) এবং আমর ইবনু জমূহ (রাঃ)-কে একই কবরে দাফন করা হয়। কেননা তাঁদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।[২]

হানযালার (রাঃ) মৃতদেহ অদৃশ্য ছিল। অনুসন্ধানের পর এক জায়গায় এমন অবস্থায় দেখা গেল যে, যমীন হতে উপরে রয়েছে এবং ওটা হতে টপ্ টপ্ করে পানি পড়ছে। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে জানালেন যে, 'ফেরেশ্তারা একে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন।' তখন নাবী করীম ﷺ বললেন, (سلوا أهله مـــا شـــأنه؟) 'তাঁর বিবিকে জিজ্ঞাসা কর প্রকৃত ব্যাপারটি কি ছিল?' তাঁর বিবিকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার প্রকৃত ঘটনাটি বলেন। এখান থেকেই হানযালা (রাঃ)-এর নাম غَسِـيْلُ الْمَلَائِكَـةِ (অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত) হয়ে যায়।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা হামযা (রাঃ)-এর অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁর ফুফু সফিয়া (রাঃ) আগমন করেন এবং তিনিও তাঁর ভ্রাতা হামযা (রাঃ)-কে দেখার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র যুবায়ের (রাঃ)-কে বলেন যে, তিনি যেন তাঁর মাতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর ভাইকে দেখতে না দেন।

এ কথা শুনে সফিয়া (রাঃ) বলেন, 'এটা কেন? আমি জানতে পেরেছি যে, আমার ভাই এর নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই আল্লাহর পথে রয়েছে। সুতরাং তার উপর যা কিছু করা হয়েছে তাতে আমি পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট আছি। আমি পূণ্য মনে করে ইনশাআল্লাহ ধৈর্য্য ধারণ করব।' অতঃপর তিনি হামযা (রাঃ)-এর নিকট আসেন, তাঁকে দেখেন, তাঁর জন্যে ইন্নালিল্লাহ পড়েন এবং দুআ করেন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী হামযা (রাঃ)-কে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (রাঃ)-এর সাথে দাফন করা হয়। তিনি হামযা (রাঃ)-এর ভাগিনা এবং দুধভাইও ছিলেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রাঃ)-এর জন্যে যে ভাবে কেঁদেছেন তার চেয়ে বেশী কাঁদতে আমরা তাঁকে কখনো দেখি নি। তিনি তাঁকে কেবলামুখী করে রাখেন। অতঃপর তাঁর জানাযায় দাঁড়িয়ে তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে, শব্দ উঁচু হয়ে যায়।[৪]

---

[1] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯৮ পৃঃ।

[2] যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড ৯৮ পৃঃ, এবং সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৮৪ পৃঃ।

[3] যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড, ৯৪ পৃঃ।

[4] এটা ইবনে শাযানের বর্ণনা। শায়খ আব্দুল্লাহর মুখ তাসারুস সীরাহ এর ২৫৫ পৃঃ দ্রঃ।

প্রকৃতপক্ষে শহীদদের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। খাব্বার ইবনু আরত বর্ণনা করেছেন যে, হামযা (ﷺ)-এর জন্যে কালো প্রান্ত বিশিষ্ট একটি চাদর ছাড়া কোন কাফন পাওয়া যায় নি। ঐ চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করলে পা খোলা থেকে যেত এবং পা আবৃত করলে মাথা খোলা থেকে যেত। অবশেষে মাথা ঢেকে দেয়া হয় এবং পায়ের উপর ইযখির[1] ঘাস চাপিয়ে দেয়া হয়।[2]

আব্দুর রহমান ইবনু আউস (ﷺ) বর্ণনা করেছেন, 'মুসআব ইবনু উমায়ের (ﷺ) শহীদ হন এবং তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাঁকে একটি মাত্র চাদর দ্বারা তাঁর মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকত এবং পা ঢাকলে মাথা খোলা থেকে যেত।' এ অবস্থার কথা খাব্বারও (ﷺ) বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু এটুকু বেশী বলেছেন, '(এ অবস্থা দেখে) নাবী ﷺ আমাদেরকে বলেন, (غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخـــر) তার মাথা ঢেকে দাও, আর তার পায়ের উপর ইযখির (ঘাষ) ফেলে দাও।'[3]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে এবং তার নিকট দুআ করেন (الرسول ﷺ يثني على ربه عز وجل ويدعوه) :

ইমাম আহমদ (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা মক্কার পথে ফিরে যায় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ)-কে বলেন, 'তোমরা সমানভাবে দাঁড়িয়ে যাও, আমি কিছুক্ষণ আমার মহিমান্বিত প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগান করব।' এ আদেশ অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ) তাঁর পিছনে বন্দী হয়ে যান। তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَــدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِــنْ بَرَكَاتِــكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ

'হে আল্লাহ! আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! যে জিনিসকে আপনি প্রশস্ত করেন ওটাকে কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না, আর যে জিনিসকে আপনি সংকীর্ণ করে দেন ওটাকে কেউ প্রশস্ত করতে পারে না। যাকে আপনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না এবং যাকে আপনি পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ প্রথভ্রষ্ট করতে পারে না, যেটা আপনি আটকিয়ে রাখেন ওটা কেউ প্রদান করে না, আর যেটা আপনি প্রদান করেন ওটা কেউ আটকাতে পারে না, যেটাকে আপনি দূর করে দেন ওটাকে কেউ নিটকবর্তী করতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের উপর স্বীয় বরকত, রহমত, অনুগ্রহ এবং রিয্‌ক প্রশস্ত করে দিন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَــا الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন নিয়ামতের জন্যে প্রার্থনা করছি যা স্থায়ী থাকে এবং শেষ হয় না। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দারিদ্রের দিনে সাহায্যের এবং ভয়ের দিনে নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ!

---

[1] এটা মুয়ের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য যুক্ত এক প্রকার সুগন্ধময় ঘাস যা বহু জায়গায় চায়ে ফেলে দিয়ে চা তৈরি করা হয়। আরবে এ ঘাস এক হতে দেড় হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। আর হিন্দুস্তানে এটা এক মিটারের চেয়েও বেশী লম্বা হয়।

[2] মুসনাদে আহমদ, মিশকাত, ১ম খণ্ড ১৪০ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৭৯ ও ৫৮৪ পৃঃ।

আপনি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার অকল্যাণ হতে এবং যা কিছু দেন নি তারও অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং ওটাকে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। আর কুফর, ফিসক ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিন এবং আমাদেরকে হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিম থাকা অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং মুসলিম থাকা অবস্থায় জীবিত রাখুন। আর আমরা লাঞ্ছিত হই এবং ফিৎনায় পতিত হই এবং পূর্বেই আমাদেরকে সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি ঐ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন এবং কঠিন শাস্তি দিন, যারা আপনার নাবীদেরকে অবিশ্বাস করে এবং আপনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। হে আল্লাহ! ঐ কাফিরদেরকেও ধ্বংস করুন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, হে সত্য মা'বূদ।'[1]

মদীনায় প্রত্যাবর্তন এবং প্রেম-প্রীতি ও আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অসাধারণ ঘটনাবলী (الرجوع إلى المدينة، ونوادر الحب والتفاني) ঃ

শহীদদের দাফন কাফন এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহর গুণগান ও তার নিকট দু'আ কাজ শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। যুদ্ধকালে সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) হতে প্রেম ও আত্মত্যাগের অসাধারণ ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক তেমনই পথ চলাকালে মুসলিম মহিলাগণ হতেও সত্যবাদিতা ও আত্মত্যাগের বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছিল।

পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হামনাহ বিনতে জাহশ (رضي الله عنها)-এর সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (رضي الله عنه)-এর শাহাদতের সংবাদ দেয়া হয়। তিনি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেন ও তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। তারপর তাঁর মামা হামযা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (رضي الله عنه)-এর শাহাদতের খবর দেয়া হয়। তিনি আবার ইন্নালিল্লাহ পড়েন ও তাঁর মাগফিরাতের জন্য দুআ করেন। এরপর তাঁকে তাঁর স্বামী মুসআব ইবনু উমায়ের (رضي الله عنه)-এর শাহাদতের সংবাদ দেয়া হয়। এ খবর শুনে তিনি অস্থিরভাবে চিৎকার করে উঠেন এবং হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (إن زوج المرأة منـــها لبِمَكـــان) 'এ মহিলার কাছে তাঁর স্বামীর বিশেষ এক মর্যাদা ছিল।'[2]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু দীনার গোত্রের এক মহিলার পাশ দিয়ে গমন করেন যার স্বামী, ভ্রাতা এবং পিতা এ তিন জন শাহাদতের পিয়ালা পান করেছিলেন। তাঁকে এদের শাহাদতের সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলে ওঠেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খবর কি?' সাহাবীগণ উত্তর দেন, 'হে উম্মু ফুলান তুমি যেমন চাচ্ছ তিনি তেমনই আছেন (অর্থাৎ তিনি বেঁচে আছেন।)।' মহিলাটি বললেন, 'তাঁকে একটু আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি তার দেহ মুবারক একটু দেখতে চাই।' সাহাবীগণ ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়া মাত্রই হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, كل مصـــيبة بعــدك جَلَـــلٌ অর্থাৎ 'আপনাকে পেলে সব বিপদই নগণ্য।'[3]

পথে চলাকালেই সা'দ ইবনু মু'আয (رضي الله عنه)-এর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দৌড়াতে দৌড়াতে আসেন। ঐ সময় সা'দ ইবনু মুআয (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইনি আমার মাতা।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন 'মারহাবা' বলেন। অতঃপর তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে থেমে যান এবং তাঁর পুত্র আমর ইবনু মুআয (رضي الله عنه)-এর শাহাদতের উপর সমবেদনা সূচক কালেমা পাঠ করে তাঁকে সান্তনা দেন এবং ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দেন। তখন তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন আমি নিরাপদ দেখতে পেয়েছি তখন সব বিপদই আমার কাছে অতি নগণ্য।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের জন্যে দু'আ

[1] সহীহ বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ। মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড ৩২৪ পৃঃ।

[2] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃঃ।

[3] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃঃ।

করেন এবং বলেন, (يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً، وقد شفعوا في أهلهم جميعاً)'হে উম্মু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তুমি খুশী হয়ে যাও এবং শহীদদের পরিবারের লোকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাঁদের শহীদরা সবাই এক সাথে জান্নাতে রয়েছে। আর তাঁদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে তাঁদের সবারই শাফাআত কবুল করা হবে।'

সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাতা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্যেও দু'আ করুন।' তিনি বললেন, (اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخَلفَ على من خُلِّفُوا)'হে আল্লাহ! তাঁদের অন্তরের দুঃখ দূর করে দিন, তাঁদের বিপদের বিনিময় প্রদান করুন এবং জীবিত ওয়ারিসদেরকে উত্তমরূপে দেখা শোনা করুন।'[1]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় (الرسول ﷺ في المدينة) ঃ

সেদিন হিজরী তৃতীয় সনের ৭ই শাওয়াল শনিবার সন্ধ্যার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় পৌঁছেন। বাড়িতে তিনি তাঁর নিজের তরবারীটি ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দিয়ে বলেন, 'মা! এর রক্ত ধূয়ে দাও। আল্লাহর কসম! এটা আজ আমার নিকট খুবই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।' তারপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও তাঁর তরবারীখানা ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, (اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم) 'এটারও রক্ত ধূয়ে ফেল। আল্লাহর শপথ! এটাও আজ অত্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।' তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, (لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حُنَيف وأبو دُجَانة) 'তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করে থাক তবে তোমার সাথে সুহায়েল ইবনু হোনায়েফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং দুজানা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে।[2]

শহীদ ও কাফির হত্যা সংখ্যা (قتلى الفريقين) :

অধিকাংশ বর্ণনাকারী একমত যে, মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন, যাঁদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই ছিলেন আনসার, অর্থাৎ তাঁদের পঁয়ষট্টি জন লোক শহীদ হয়েছিলেন, খাযরাজ গোত্রের একচল্লিশ জন এবং আউস গোত্রের চব্বিশ জন। একজন ইহুদী নিহত হয়েছিল এবং মুহাজির শহীদদের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন।

এখন বাকী থাকল কুরাইশদের নিহতদের সংখ্যা নিয়ে কথা। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল বাইশ জন। কিন্তু আসহাবে মাগাযী এবং আহলুসসিয়ার এ যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং যাতে যুদ্ধের বিভিন্ন স্থানে নিহত মুশরিকদের যে আলোচনা এসেছে তাতে গভীরভাবে চিন্তা করে হিসাব করলে এ সংখ্যা বাইশ নয়, বরং সাঁইত্রিশ হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।[3]

মদীনায় উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা (حالة الطوارئ في المدينة) ঃ

মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধ হতে ফিরে এসে (তৃতীয় হিজরী সনের ৮ই শাওয়াল শনিবার ও রবিবার মর্ধবর্তী) রাত্রে উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। যুদ্ধ তাঁদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছিল। তবুও তাঁরা মদীনার পথে ও গমনাগমন স্থলে সারারাত পাহারা দিতে থাকেন এবং তাঁদের প্রধান সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিফাযতের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা, যে কোন দিক থেকেই তাঁর আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্খা ছিল।

হামরাউল-আসাদ অভিযান (غزوة حمراء الأسد) ঃ

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধে সৃষ্ট অবস্থার উপর গভীর চিন্তা করে সারা রাত কাটিয়ে দেন। তাঁর আশঙ্খা ছিল, যদি মুশরিকরা এ চিন্তা করে যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের পাল্লা ভারী থাকা সত্ত্বেও তারা কোন উপকার লাভ

---

[1] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ।

[2] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ।

[3] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ১২২-১২৯ পৃঃ, ফাতহুলবারী, ৭ম খণ্ড, ৩৫ পৃ: এবং মুহাম্মদ আহমদ বাশমীল রচিত 'গাযওয়ায়ে উহুদ ২৭৮, ২৭৯ ও ২৮০ পৃঃ।

করতে পারেনি, তাহলে তারা অবশ্যই লজ্জিত হবে এবং রাস্তা হতে ফিরে এসে মদীনার উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালাবে এ জন্যে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যে প্রকারেই হোক তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে।

আহলে সিয়ারের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর ৮ই শাওয়াল রবিবারে সকালে ঘোষণা করেন যে, শত্রুদের মোকাবেলার জন্যে বের হতে হবে। সাথে সাথে তিনি এ ঘোষণাও দেন যে, (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال) যারা উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিল শুধু তারাই যাবে। এর পরেও আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তাদের সাথে যাবার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন না। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মদীনার মুসলিম পল্লীটি শয্যার উপর লাফিয়ে উঠলেন। সব শোক, সব সন্তাপ, সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা গত কালের রক্ত রঞ্জিত অস্ত্রগুলো তুলে নিলেন হাতে এবং উৎসাহের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে সমবেত হতে লাগলেন। দেখতে দেখতে মুসলিম বাহিনী মদীনা ত্যাগ করে গেলেন।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) যিনি উহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেন নি। এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে আরজ পেশ করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি চাচ্ছি যে, আপনি যে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন আমিও যেন সে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করি। কিন্তু যেহেতু এ যুদ্ধে (উহুদ) আমার পিতা তাঁর সন্তানদের দেখাশোনার জন্য আমাকে বাড়িতে রেখে দেন সেহেতু আমি তাতে শরীক হতে পারিনি। অতএব, আমাকে অভিযানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দান করা হোক।' রাসূল করীম ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের মতো রণসাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অগ্রগামী হয়ে চলতে থাকলেন। আর সবাই চলছিলেন পায়ে হেঁটে। কর্মসূচী অনুযায়ী মদীনা হতে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন।

এখানে অবস্থান কালে মা'বাদ ইবনু আবু মা'বাদ খুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। আবার এটাও কথিত আছে যে, সে শিরকের উপরেই পতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুভাকাঙ্খী ছিল। কেননা, খুযাআহ ও বনু হাশিমের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। যাহোক, সে বলল, 'হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার ও আপনার সহচরদের ক্ষয় ক্ষতিতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। আমি কামনা করছিলাম যে, আল্লাহ আপনাদেরকে নিরাপদে রাখবেন। তার এ সহানুভূতি প্রকাশে খুশী হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি আবু সুফিয়ানের নিকট গমন কর এবং তাকে হতোদ্যম করে দাও।'

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আশঙ্খা করছিলেন যে, মুশরিকরা মদীনার প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা ভাবনা করবে তা ছিল সম্পূর্ণ সত্য।

মুশরিকরা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে 'রওহা' নামক স্থানে পৌঁছে যখন শিবির স্থাপন করল তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, আমরা কোন কাজই করতে পারলাম না এবং আমাদের উদ্দেশ্য সফল হল না। আবু সুফিয়ান, ইকরামা প্রভৃতি দলপতিগণ বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ ﷺ আহত এবং তার অধিক সংখ্যক ভক্তই আঘাতে জর্জরিত, এ অবস্থায় মদীনা আক্রমণ না করে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই যুক্তিসম্মত হচ্ছে না। মুসলিমগণকে সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করার জন্যই আমরা এত উদ্যোগ আয়োজন করলাম এবং সবকিছুই বিধ্বস্ত করে ফেললাম। এখন তার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, অথচ আমরা ফিরে যাচ্ছি, দু'দিন পরেই তারা আবারও সামলিয়ে উঠবে, তখন আমাদের উদ্দেশ্য সহজ সাধ্য হবে না। কেননা, তাদের শান-শওকত ও শক্তি কিছুটা খর্ব হলেও তাদের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেছে যারা আবার তোমাদের মাথাব্যথার কারণ হবে। অতএব, তোমাদের উচিত যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে তাদের মূলোৎপাটন করে ফেলবে।

আবু সুফিয়ান বিভিন্ন গোত্রের যে সমস্ত লোকদেরকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে নিজেদের দলে আনয়ন করেছিলেন তারা বলতে লাগল, 'কি করতে এসেছিলাম আর কি করে যাচ্ছি। মদীনা আক্রমণ করে ধর্মের

শত্রুদেরকে বিধ্বস্ত করে ফেলব, মদীনার সমস্ত ধন-সম্পদ লুটে নিব, তাদের যুবতী ও কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট করব এবং যা খুশী তাই করব। কিন্তু এখন দেখছি এ সব কিছুই হল না। আমাদেরকে উল্টো ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। তাই তারা সিদ্ধান্ত করল যে, মদীনা আক্রমণ করতেই হবে। উমাইয়ার পুত্র সাফওয়ান এর প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু কেউই তার কথা গ্রাহ্য করল না।

কিন্তু এ ধরণের কথাবার্তা থেকে ধারণা করা যায় যে, এটা ছিল মুশরিক কুরাইশদের একটি সাধারণ অভিমত। যারা উভয় পক্ষের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখত না। কিন্তু সাফওয়ান বিন উমাইয়া যিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এরূপ কাজ কর না। আমার ভয় হয় যে, মদীনার যারা উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তোমরা এ অবস্থায় ফিরে চল। এখন বিজয় রয়েছে তোমাদেরই। অন্যথায় আমার ভয় হয় যে, যদি এখন মদীনা আক্রমণ কর তাহলে বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকই এ মত গ্রহণ করল না এবং সিদ্ধান্ত হল যে, মদীনা আক্রমণ করতে হবে।

তখনো তারা শিবির ছেড়ে বের হয়নি এমন সময় মা'বাদ ইবনু আবি মা'বাদ খোযায়ী তথায় গিয়ে হাজির হল। মা'বাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আবু সুফিয়ান কিছুই জানত না। তাই তাকে দেখেই আবু সুফিয়ান সাগ্রহে বলে উঠলেন, 'এ যে, মা'বাদ'। সংবাদ কি? মা'বাদ উত্তর দিল, 'সংবাদ আর কি, এখনই সরে পড়।' আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কি, মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে না কি?' মা'বাদ জবাবে বলল, 'আছে বৈ কি। মুহাম্মদ ﷺ বিপুল আয়োজনে অগ্রসর হচ্ছেন। এবার মদীনার প্রত্যেক মুসলিমই যোগদান করেছে।' এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বললেন, 'আরে সর্বনাশ! তুমি বলছ কি? তাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকু বিনষ্ট করতে, তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে দৃঢ় সংকল্প করে আমরা মদীনার দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ প্রত্যুষে আবার যুদ্ধ যাত্রা করেছে, এটাও কি সম্ভব? তুমি বলছ কি?' মা'বাদ জবাব দিল 'বলছি ভালই, এখনও মানে মানে সরে পড়। মুসলিম বাহিনী এসে পড়তে বেশী দেরী নেই, শীঘ্রই সরে পড়।'

আবু সুফিয়ান তখন সকলকে মক্কার পতে যাত্রা করার আদেশ প্রদান করলেন। কুরাইশ বাহিনী আর কাল বিলম্ব না করে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হল। তবে আবু সুফিয়ান একটা কাজ করল যে, মুহাম্মদ ﷺ যেন মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন না করেন এ জন্যে তাদের পাশ দিয়ে গমনকারী আব্দুল কায়েস গোত্রের এক কাফেলার লোকদেরকে বলেন, 'আপনারা মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের একটি পয়গাম পৌঁছিয়ে দিবেন কি? আমি ওয়াদা করছি যে, আপনারা যখন মক্কা আসবেন তখন আমি এ বিনিময়ে আপনাদের উটগুলো যতো বহন করতে পারে ততো কিশমিস প্রদান করব।'

ঐ লোকগুলো বলল, 'জ্বী হ্যাঁ পারব।'

আবু সুফিয়ান তখন তাদেরকে বললেন, 'মুহাম্মদ ﷺ-কে এ খবর পৌঁছিয়ে দিবেন যে, আমরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে খতম করে দেয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।'

এরপর এ কাফেলা যখন হামরাউল আসাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামের পাশ দিয়ে গমন করে তখন তাদেরকে আবু সুফিয়ানের এ পয়গাম শুনিয়ে দেয় এবং বলে,

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ
مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾[آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক (মুশরিকরা) জামায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর, কিন্তু এটা তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক!' তারপর তাঁরা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিলেন, কোন অনিষ্ট তাঁদেরকে স্পর্শ করে নি, এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট তাঁরা তারই অনুসরণ করেছিলেন এবং আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল [সূরা আল-ইমরান (৩) : ১৭৩-১৭৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ রবিবার হামরাউল আসাদে পৌঁছে ছিলেন এবং সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর ৯ই, ১০ই এবং ১১ই শাওয়াল তথায় অবস্থান করেছিলেন, এরপর মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। ফিরবার পূর্বে আবূ উয্যা জুমহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বন্দী হয়। এ ছিল ঐ ব্যক্তি যে, বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর দারিদ্র ও কন্যার আধিক্যের কারণে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি পেয়েছিল। শর্ত ছিল, সে ভবিষ্যতে কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করবে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে কবিতার মাধ্যমে নাবী ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকে। অতঃপর উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সে নিজেও আগমন করে, তাকে গ্রেফতার করে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খিদমতে হাযির করা হয় তখন সে বলতে শুরু করে 'মুহাম্মদ ﷺ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমার শিশু সন্তানদের খাতিরে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অঙ্গীকার করছি যে, এরূপ অপরাধমূলক কাজ আর কখনও করব না।' নাবী ﷺ উত্তরে বলেন,

(لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمداً مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)

'এখন এটা হতে পারে না যে, মক্কায় ফিরে গিয়ে নিজের কপালে হাত মেরে বলবে, 'আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে দু'দুবার প্রতারিত করেছি। মু'মিনকে এক ছিদ্র হতে দু'বার দংশন করা হয় না।' এরপর তিনি যুবায়ের (রাঃ)-কে অথবা আ'সিম ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরা তাকে হত্যা করেন।

অনুরূপভাবে মক্কার একজন গুপ্তচরও মারা যায়। তার নাম ছিল মুআবিয়া ইবনু মুগীরা ইবনু আবিল আস। সে ছিল আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নানা। উহুদের দিন মুশরিকরা যখন মক্কার দিকে ফিরে যায় তখন সে তার চাচাতো ভাই উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করেন যে, সে যদি মদীনায় তিন দিনের বেশী অবস্থান করে তবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু মদীনা যখন মুসলিম সৈন্য হতে শূন্য হয়ে গেল তখন এ লোকটি কুরাইশের গোয়েন্দাগিরি করার জন্য মদীনায় তিন দিনের বেশী থেকে যায়।

অতঃপর যখন মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনায় ফিরে আসেন তখন সে পালাবার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাঃ) ও আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ঐ ব্যক্তি পিছু নিয়ে তাকে হত্যা করেন।[1]

হামরাউল-আসাদ অভিযানের বর্ণনা পৃথক নামে দেয়া হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা উহুদ যুদ্ধেরই একটা অংশ ও পরিশিষ্ট।

উহুদ যুদ্ধে জয়-পরাজয় পর্যালোচনা (غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها) ঃ

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণ ভীষণভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। মুসলিমারা যে নিজেদের কর্মদোষে এ যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কুরাইশরা যে মুসলিমগণের তুলনায় অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এর কোন প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এ যুদ্ধে মুসলিমগণের পরাজয় হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটাও সমর্থন করা যায় না। কারণ মুসলিমগণকে ধ্বংস না করে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে গেল কেন? দেখা যায় যে, এ ভীষণ পরাজয়, সত্ত্বেও কুরাইশরা একটি মুসলিমকেও বন্দী করতে পারে নি, এমনকি আহত মুসলিম সৈনিকও তাদের হাতে বন্দী হন নি।

যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের বিজয় লাভ ঘটে থাকলে এরূপ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হতো না। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, কুরাইশপক্ষের মাত্র ২৩ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ বর্ণনাটির উপর মোটেই আস্থা

[1] উহুদ যুদ্ধ এবং হামরাউল-আসাদ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড, ৯১-১০৮ পৃঃ, ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬০-১২৯ পৃঃ, ফাতহুলবারী শারাহদ, সহীহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, ৩৪৫-৩৭৭ পৃঃ এবং শায়খ আব্দুল্লাহর মুখতাসারুসীরাহ ২৪২-২৫৭ পৃঃ জমা করা হয়েছে। আরও অন্যান্য সূত্রগুলোর হাওয়ালা সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে দেয়া হয়েছে।

রাখা যায় না। কেননা, তাঁরা নিজ মুখে বলেছেন যে, একা হামযা (رضي الله عنه)-এর হাতে ৩১ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয়েছিল। মুসলিমগণের অনুকূলে কমপক্ষে ৭০ জন বীর প্রাণপণে যুদ্ধ করার পর শাহাদত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মুসলিমগণের হাতে যে কত লোক নিহত হওয়া সম্ভব তারও সহজে অনুমান করা যেতে পারে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মুসলিম বীরদের প্রচণ্ড আক্রমণ তিন হাজার কুরাইশ সৈন্য পলাতে বাধ্য হয়েছিল, তখন শত্রু বিনাশে মুসলিম সৈন্যরা একটুও ত্রুটি করেন নি। সুতরাং এ সময়ও যে বহু সংখ্যক শত্রু সৈন্য হতাহত হয়েছিল তাতে আর বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ থাকতে পারে না।

এরূপ অবস্থায় আমরা এ যুদ্ধকে এক দলের বিজয় ও অন্য দলের পরাজয় না বলে অমীমাংসিত যুদ্ধ বলতে পারি, যাতে উভয় দল নিজ নিজ সফলতা ও ক্ষয়-ক্ষতির অংশ লাভ করেছে। অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন এবং নিজেদের শিবিরকে শত্রুদের অধিকার ছেড়ে দেয়া ছাড়াই যুদ্ধ করা হতে বিরত হয়েছে। আর অমীমাংসিত যুদ্ধ তো এটাকেই বলা হয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করে বলেছেন :

﴿وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]

এ (শত্রু) কওমের পশ্চাদ্ধাবণে দুর্বলতা দেখাবে না, কেননা যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মত তারাও তো কষ্ট পায়, আর তোমরা আল্লাহ হতে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করে না। [আন-নিসা (৪) : ১০৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি সাধনে ও ক্ষতি অনুভব করণে এক সেনা বাহিনীকে অন্য সেনা বাহিনীর সাথে উপমা দিয়েছেন। যার মর্মার্থ হল, দুই পক্ষেরই অবস্থান সমপর্যায়ের ছিল। উভয় পক্ষই এমন অবস্থায় ফিরে এসে যে, কেউ কারোরই উপর জয়ী হতে পারে নি।

এ যুদ্ধের উপর কুরআনের ব্যাখ্যা (القرآن يتحدث حول موضوع المعركة) :

পরবর্তীতে কুরআন নাযিল হলে তাতে এ যুদ্ধের এক একটি মনযিলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং বিষদ ব্যাখ্যা করে ঐ কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলোর ফলে মুসলিমগণকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর এ ধরণের ফায়সালাকৃত সময়ে ঈমানদার এবং এ উম্মতকে (যাকে অন্যান্য উম্মতের মোকাবেলায় শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে) যে সব উঁচু ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে অস্তিত্বে আনা হয়েছে, ওগুলোর দিক দিয়ে এখনও তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে কি কি দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো বলে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তাদের অন্তরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যে শত্রুতা লুকায়িত ছিল তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সরলমনা মুসলিমগণের অন্তরে এ মুনাফিকরা এবং তাদের ভাই ইহুদীরা যে কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে রেখেছিল তা দূরীভূত করা হয়েছে। এ প্রশংসনীয় হিকমত এবং উদ্দেশ্যে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা এ যুদ্ধের ফল ছিল।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আল-ইমরানের ষাটটি আয়াত নাযিল হয়েছে। সর্ব প্রথম যুদ্ধের প্রাথমিক মনযিলের উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: ١٢١]

(স্মরণ কর) যখন তুমি সকাল বেলায় তোমার পরিজন হতে বের হয়ে মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করছিলে। [আলু 'ইমরান (৩) : ১২১]

তারপর শেষে এ যুদ্ধের ফলাফল ও রহস্যের উপর ব্যাপক আলোকপাত করে ইরশাদ হয়েছে,

﴿مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٩]

অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ মু'মিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে গায়িবের বিধান জ্ঞাত করেন না, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নেন, কাজেই তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা ঈমান আন আর তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।' [আলু 'ইমরান (৩) : ১৭৯]

এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সক্রিয় উদ্দেশ্য ও রহস্য (الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة) :

আল্লামা ইবনু কাইয়ূম এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।[1] হাফেয ইবনু হাজার (রঃ) বলেছেন যে, ওলামারা (ইসলামী পণ্ডিতগণ) বলেছেন যে, গাযওয়ায়ে উহুদ ও তার মধ্যে মুসলিমগণের পরাজয় মহান আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও উপকার নিহিত ছিল। যেমন অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত ও বাধা না মানার দুর্বিপাক সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করা, কারণ তীরন্দাযগণকে নিজ স্থানে জয় ও পরাজয় উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে কেন্দ্র পরিত্যাগ করেছিল যার পরিণতি হিসেবে এ পরাজয়। একটি উদ্দেশ্য রাসূলগণের সুন্নাতের প্রকাশ করা, তাঁদেরকে প্রথমে বিপদে ফেলে শেষে বিজয়ী করা হয়। আর তাতে এ রহস্যও লুকায়িত আছে যে, যদি তাঁদেরকে বরাবর বিজয়ী করা হয়, তাহলে মুসলিম সমাজে এমন সব লোকের অনুপ্রবেশ ঘটবে যারা মু'মিন নয়। তখন সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে না। আর যদি বরাবর পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হতো তাহলে নাবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। কাজেই আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জয় পরাজয় দুটিরই প্রয়োজন আছে যাতে সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। কারণ মুনাফিকদের কপটতা মুসলিমগণের নিকট গোপন ছিল। যখন এ ঘটনা সংঘটিত হল তখন মুনাফিকগণ কথা ও কর্মে প্রকাশ করে দিল। আর মুসলিমগণ জানতে পারল যে, তাঁদের মধ্যেই নিজেদের শত্রু বর্তমান। কাজেই মুসলিমগণ তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ও সতর্ক হলেন।

একটা উদ্দেশ্য বা রহস্য এটাও ছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য আসতে বিলম্ব ঘটলে নম্রতার সৃষ্টি হয় ও আত্ম-অহংকার নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই পরীক্ষায় পড়ে যখন মুসলিমগণ বিপন্ন হয়ে পড়লেন তখন তাঁরা ধৈর্য্য অবলম্বন করলেন আর মুনাফিকগণ হা-হুতাশ আরম্ভ করে দিল।

একটা উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীগণের জন্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে (জান্নাত) এমন অনেক মর্যাদা তৈরি করেছেন, যেখানে তাঁদের আমল দ্বারা পৌঁছা সম্ভব নয়। কাজেই বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে এমন অনেক উপায়ন নিহিত রেখেছেন যদ্দারা তাঁরা সেই সব মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন।

আর একটা হিকমত বা রহস্য ছিল, শাহাদত লাভ আওলিয়া কিরামের সর্বাপেক্ষা বড় পদমর্যাদা। কাজেই এ পদমর্যাদ তাঁদের জন্য সরবরাহ করে দেয়া হয়েছিল।

আরও একটি রহস্য নিহিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ শত্রুদিগকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ কুফরী অত্যাচার ও আল্লাহর ওলীগণকে কষ্ট দেওয়াতে সীমাতিরিক্ত অবাধ্যতা (তো পরে এ কাজের পরিণতিতে) ঈমানদারগণকে গোনাহ হতে পাক ও পরিচ্ছন্ন করলেন ও বিধর্মী কাফিরগণকে ধ্বংস ও নিঃশেষ।[2]

---

[1] যায়াদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৯১-১০৮ পৃঃ।

[2] ফতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৩৪৭ পৃঃ।

السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب

উহুদ ও আহযাব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সারিয়া ও অভিযানসমূহ

উহুদের অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক পরিস্থিতি মুসলিমগণের সুখ্যাতি ও শক্তি সামর্থের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে। এতে তাঁদের মনোবলের জোয়ার ধারায় কিছুটা ভাটার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এর ফলে বিরুদ্ধবাদীগণের অন্তর থেকে ক্রমান্বয়ে মুসলিম ভীতি হ্রাস পেতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিমগণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে এবং বিভিন্ন দিক থেকে মদীনার উপর বিপদাপদ ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়। ইহুদী, মুনাফিক এবং বেদুঈনগণ প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং মুসলিমগণকে অপমান করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তাদের এ চক্রান্ত ও শত্রুদের উদ্দেশ্য ছিল এমনভাবে ইসলামের মূলোৎপাটন করে ফেলা যাতে কোনদিনই মুসলিমগণ আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। উহুদের পর দুই মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই এ লক্ষে বনু আসাদ গোত্র মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

অন্যদিকে চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আযল এবং কারাহ গোত্র এমন এক চক্রান্তমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে ১০ জন সাহাবীগণকে শাহাদতের পেয়ালা পান করতে হয়। অধিকন্তু, এ সফর মাসেই বনু আমের প্রধান হীন চক্রান্ত ও শঠতার মাধ্যমে ৭০ জন সাহাবীগণ (ﷺ)-কে শহীদ করে। এ ঘটনাকে 'বীরেমাউনার ঘটনা' বলা হয়। ঐ সময়ে বনু নাজিরও প্রকাশ্যে শত্রুতা আরম্ভ করে দেয়। এমনকি ৪র্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে তারা নাবী করীম (ﷺ)-কে হত্যার জন্যও চেষ্টা করে। এদিকে বনু গাতফানের সাহস এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, চতুর্থ হিজরীর জমাদাল উলা মাসে মদীনা আক্রমণের সময়সূচি নির্ধারণ করে বসে।

মূল কথা হচ্ছে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণের যে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের একের পর এক নানা বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু নাবী করীম (ﷺ) তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা প্রসূত পরিচালনের মাধ্যমে সকল প্রকার চক্রান্ত, শঠতা ও বৈরিতা অতিক্রম করে পুনরায় গৌরব ও মর্যাদার সুউচ্চ আসনে মুসলিমগণকে প্রতিষ্ঠিত করতে পুরোপুরি সক্ষম হন। এ ব্যাপারে নাবী করীম (ﷺ)-এর সর্ব প্রথম পদক্ষেপ ছিল হামরাউল আসাদ পর্যন্ত মুশরিকগণের পশ্চাদ্ধাবন করা। এ পদক্ষেপের ফলে নাবী করীম (ﷺ)-এর সৈন্যদলের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারণ, এ পদক্ষেপ এতই গুরুত্ব ও বীরত্বপূর্ণ ছিল যে, এর ফলে প্রতিপক্ষগণ, অর্থাৎ মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীগণ একদম স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলে কারীম (ﷺ) আরও এমন সব সামারিক পদক্ষেপ অবলম্বন করেছিলেন যা শুধু মুসলিমগণের হৃতগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাহায্যেই করে নি, বরং তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতেও প্রভূত সাহায্য করেছিল। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এ বিষয় সম্পর্কে আলোনা করা হচ্ছে।

(১) আবু সালমার অভিযান (سرية أبي سلمة) ঃ

উহুদ যুদ্ধের পর সর্ব প্রথম মুসলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করে বনু আসাদ বিন খোযায়মা গোত্র। মদীনায় এ মর্মে খবর পৌঁছায় যে, খোওয়াইলদের দুই ছেলে তালহা ও সালমা নিজদলের লোকজন এবং অনুসারীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য বনু আসাদকে আহ্বান জানাচ্ছে। এ সংবাদ অবগত হয়ে নাবী করীম (ﷺ) অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে দেড় শত সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করেন এবং আবু সালমার হস্তে পতাকা প্রদান করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে সেই বাহিনী প্রেরণ করেন। বনু আনসারদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই আবু সালমা (رضي الله عنه) অতর্কিতভাবে তাদের আক্রমণ করেন, যার ফলে তারা হতচকিত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী তাদের পরিত্যক্ত উট ও বকরীর পাল এবং প্রাপ্ত গণীমতের মালামাল সহ নিরাপদে মদীনা ফিরে আসেন। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীকে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় নি।

এ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরী মুহারম মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর। এ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আবু সালমা (রাঃ)-এর উহুদ যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে প্রাপ্ত ব্যথা পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অল্প কালের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।[1]

২. আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রাঃ)-এর অভিযান (بعث عبد الله بن أنيس) :

চতুর্থ হিজরীর মুহারম মাসের ৫ তারীখে এ মর্মে একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে, খালিদ বিন সুফিয়ান হুযালী মুসলিমগণকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ করছে। শত্রুপক্ষের এ দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন।

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রাঃ) মদীনার বাইরে ১৮ দিন অবস্থানের পর মুহারমের ২৩ তারীখে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি খালিদকে হত্যা করে তার মস্তক সঙ্গে নিয়ে আসেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তিন যখন মস্তকটি তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেন তখন তিনি তাঁর হাতে একটি 'আসা' (লাঠি) প্রদান করে বলেন, 'এটা কিয়ামতের দিন আমার ও তোমার মাঝে একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকবর্তী হল এ প্রেক্ষিতে তিনি সেই আসাটিকে তাঁর লাসের সঙ্গে কবরে দেয়ার জন্য অসিয়ত করলেন।[2]

(২) রাযীর ঘটনা (بعث الرَّجِيع) ঃ

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'আযল' এবং 'কারা' গোত্রে কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করে যে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু ইসলামের চর্চা রয়েছে। কাজেই, কুরআন ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য তাদের সঙ্গে কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-কে পাঠালে ভাল হয়। সে মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাকের মতে ছয় জন এবং সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে দশ জন সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। ইবনে ইসহাকের মতে মুরশেদ বিন আবু মুরশেদ গানাভীকে এবং সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে আসেম বিন উমার বিন খাত্তাবের নানা আসেম বিন সাবেতকে এ দলের নেতৃত্বে প্রদান করা হয়। এঁরা যখন রাবেগ এবং জেদ্দাহর মধ্যবর্তী স্থানের হোযাইল গোত্রের 'রাযী' নামক ঝর্ণার নিকটে পৌছান তখন আযল এবং কারার উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ হোযাইল গোত্রের শাখা বানু লেহয়ানকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়।

এ গোত্রের একশত তীরন্দাজ তাঁদের অনুসন্ধান করতে থাকে। পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে গিয়ে নাগালের মধ্যে তাদের পেয়ে যায়। সাহাবগণ একটি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় বনু লেহয়ান তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার পর বলতে থাকে, 'তোমাদের সঙ্গে এ মর্মে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে তোমরা যদি নীচে নেমে আস তাহলে আমরা কাউকেও হত্যা করব না। আসেম তাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের অবিরাম তীর বর্ষণের ফলে ৭ জন শাহাদতবরণ করেন। জীবত রইলেন ৩ জন। তারা হচ্ছেন খোবাইর (রাঃ), যায়েদ বিন দাসেনাহ (রাঃ) এবং আরও একজন। আবাও বনু লেহয়ান তাদের ওয়াদা পুনব্যক্ত করলে তাঁরা নীচে নেমে আসেন।

কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়েই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে ধনুকের ছিলা দ্বারা তাঁদের বেঁধে ফেলে। অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃতীয় সাহাবী তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। তারা তাঁকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে। এদিকে খুবাইব (রাঃ) এবং যায়েদ বিন দাসেনাকে (রাঃ) মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে দেয়। এ সাহাবীদ্বয় বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন।

---

[1] যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

[2] যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬১৯-৬২০ পৃঃ।

খোবাইব (রাঃ) কিছু দিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় মক্কাবাসীদের নিকট থাকেন। অতঃপর মক্কাবাসীগণ তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যায়। তাঁকে শূলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, 'দুই রাকআত সালাত পড়ার জন্য সময় ও সুযোগ আমাকে দেয়া হোক।' তাঁকে সময় দেয়া হলে তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে সালাম ফেরানোর পর তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের এ বলার ভয় না থাকত যে আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরও দীর্ঘ সময় যাবৎ এ সালাত আদায় করতাম।'

এরপর তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا

'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গণ্য করে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।

এ কথার পর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع

إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي

অর্থঃ আমার শত্রুগণ তাদের দলবল ও তাদের গোত্রসমূহকে আমার চারদিকে একত্রিত করেছে এবং তাদের সকলেই এক স্থানে একত্রিত হয়েছে।

তারা আমার হত্যার দৃশ্য অবলোকন করার জন্য তাদের সন্তান-সন্ততি এবং নারীদেরকেও একত্রিত করেছে। আর আমাকে হত্যা করার জন্য প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় এক খেজুর বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হয়েছে।

فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطعمي

وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمع

হে আরশের মালিক (আল্লাহ)! আমাকে হত্যার ব্যাপারে আমার সঙ্গে তারা যা করতে চায় তুমি আমাকে তাতে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দান কর। কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আমার মাংসগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সকল আশা আকাঙ্খার নিরসন ঘটাবে।

আমাকে হত্যার পূর্বে কুফরী গ্রহণ করা কিংবা মৃত্যুবরণ করা এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ তারা দিয়েছিল, কিন্তু কুফরী গ্রহণ না করে ধর্মের পথে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছি। তখন আমার নয়ন যুগল বিনা অস্থিরতায় অশ্রু প্রবাহিত করেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে আমি অস্থির হই নি, বরং তাদের অন্যায় আচরণ ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ক্ষোভে দুঃখে আমার নয়ন যুগল অশ্রু-সিক্ত হয়েছে।

لَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

আমি যখন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর পথে কাফিরদের হাতে নিহত হচ্ছি তখন আমার হত্যা যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন, আমি কোন কিছুকে ভয় করি না।

আমি জানি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমার মৃত্যু হচ্ছে। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার শরীরের বিখণ্ডীকৃত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই বরকত দান করতে পারেন।'

এরপর খোবাইব (রাঃ)-কে আবু সুফিয়ান বলল, 'তোমার নিকট এটা কি পছন্দনীয় যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে আমাদের এখানে পেয়ে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে আর তুমি নিজ আত্মীয় স্বজন সহ জীবিত থাকবে?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এটাই তো সহনীয় নয় যে, আমি আপন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেঁচে থাকি এবং তার পরিবর্তে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে যেখানে তিনি অবস্থান করছেন একটি কাটার আঘাত লেগে যায় এবং সে আঘাতে তিনি ব্যথিত হন।'

এরপর মুশরিকরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করল এবং তাঁর লাশ দেখানোর জন্য লোক নিযুক্ত করে দিল। কিন্তু আমের বিন উমাইয়া যামরী তথায় আগমন করলেন এবং রাত্রিবেলা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাফন-দাফন করলেন। খুবাইব -কে হত্যা করেছিল উকবাহ বিন হারেস। খোবাইব তার পিতা হারেসকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, খোবাইব সর্বপ্রথম সম্মানিত ব্যক্তি যিনি হত্যার মুহূর্তে দুই রাক'আত সালাত আদায় করার প্রথা চালু করেছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল, অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না।

দ্বিতীয় সাহাবী যাকে এ ঘটনায় ধরা হয়েছিল তিনি ছিলেন যায়েদ বিন দাসেনাহ। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে ক্রয় করে নিয়ে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

কুরাইশগণ আসেম -এর দেহের অংশ বিশেষ আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে সনাক্ত করা। কারণ বদর যুদ্ধে তিনি বিশিষ্ট কোন এক কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন এক ভীমরুলের ঝাঁক প্রেরণ করলেন যারা কুরাইশ লোকজনদের দুরভিসন্ধি থেকে এ লাশ হেফাজত করল। কুরাইশদের পক্ষে লাশের কোন অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হল না। আসেম আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মুশরিক স্পর্শ না করেন। ওমর যখন এ ঘটনা অবগত হলেন তখন বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে তাঁর মৃত্যুর পরেও হেফাজত করেন যেমনটি করেন জীবিত অবস্থায়।[১]

(৩) বি'রে মাউনাহর মর্মান্তিক ঘটনা (مأساة بئر مَعُونة) :

যে মাসে রাযী এর ঘটনা সংঘটিত হয় ঠিক সেই মাসেই বি'রে মাউনার বেদনা-দায়ক ঘটনাও সংঘটিত হয়। এ ঘটনা রাযীর ঘটনার চাইতেও কঠিন ও বেদনা দায়ক।

এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, আবু বারায়া আমের বিন মালেক যিনি 'মুলাযেবুল আসিন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (বর্শা নিয়ে যিনি খেলা করেন) এক দফা মদীনায় নাবী করীম -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। নাবী কারীম তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না কিংবা তা থেকে সরেও গেলেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপরিন দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে নাজদবাসীগণের নিকট প্রেরণ করেন তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে বলে আশা করি।'

রাসূলুল্লাহ বললেন, (إِنِّي أخاف عليهم أهل نجـــد) 'নাজদবাসীদের থেকে নিজ সাহাবীগণ সম্পর্কে ভয় আছে।'

আবু বারা' বললেন, 'তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন।'

এ কারণে ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে ৪০ জন এবং সহীহ বুখারীর তথ্য মোতাবেক ৭০ জন সাহাবাকে রাসূলুল্লাহ তাঁর সঙ্গে প্রেরণ। ৭০ জনের সংখ্যাটি সঠিক বলে প্রমাণিত। মুনযির বিন আমিরকে (বনু সায়েদা গোত্রের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল এবং মুতাক লিল মাউত (মৃত্যুর জন্য স্বাধীনকৃত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ সাহাবাবৃন্দ ছিলেন বিজ্ঞ, ক্বারী, এবং শীর্ষ স্থানীয়। তাঁরা দিবা ভাগে জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আহলে সুফ্ফাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন ও কুরআন শিক্ষা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রি বেলা আল্লাহর সমীপে মুনাজাত ও সালাতের জন্য দণ্ডায়মান থাকতেন। এ ধারা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁরা মাউনার কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এ কূপটি বনু আমের এবং হাররাহ বনু সোলাইমের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ১৬৯-১৭৯ পৃঃ। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৯৯ পৃঃ, সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৬৮-৫৬৯, ৫৮৫ পৃঃ।

সেই স্থানে শিবির স্থাপনের পর এ সাহাবীগণ (রাঃ) উম্মু সোলাইমের ভ্রাতা হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্র সহ আল্লাহর শত্রু আমের বিন তোফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা তাই ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি হারামকে পিছনে দিক থেকে এত জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, দেহের অপর দিক দিয়ে ফুটা হয়ে বের হয়ে গেল। বর্শা-বিদ্ধ রক্তাক্তদেহী হারাম বলে উঠলেন, 'আল্লাহর মহান! কাবার প্রভূর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি।'

এরপর পরই আল্লাহর শত্রু আমির অবশিষ্ট সাহাবাদের (রাঃ) আক্রমণ করার জন্য তার গোত্র বনু আমিরকে আহ্বান জানাল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আবু বারায়ার আশ্রয়ে ছিলেন সেহেতু তারা সেই আহ্বানে সাড়া দিল না। এদিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে বনু সোলাইমকে আহ্বান জানাল। বুন সোলাইমের তিনটি গোত্র উমাউয়া, রে'ল এবং যাকওয়ান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন বাদে সকলেই শাহাদতবরণ করলেন। কেবমমাত্র কা'ব বিন যায়েদ (রাঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহীদগণের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

তাছাড়া আরও দুইজন সাহাবী- আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এবং মুনযির বিন উকবা বিন আমির (রাঃ) উট চরাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে তাঁরা পাখী উড়তে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর মুনযের তাঁর বন্ধুগণের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতবরণ করেন। আমর বিন উমাইয়া যামরীকে বন্দী করা হয়। কিন্তু যখন তারা অবগত হয়ে যে, মুযার গোত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে তখন আমির তার কপালের চুল কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ হতে যার উপর একটি দাসকে স্বাধীন করার মানত ছিল তাঁকে মুক্ত করে দেয়।

আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এ বেদনা-দায়ক ঘটনার খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছিলেন। ৭০ জন বিজ্ঞ মুসলিমের এ হৃদয় বিদারক শাহাদত উহুদ যুদ্ধের ক্ষতকে আরও বহুগুণে বর্ধিত করে তোলে। কিন্তু উহুদের তুলনায় এ ঘটনা আরও মর্মান্তিক ছিল এ কারণে যে, এ যুদ্ধে মুসলিমগণ শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখী যদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিমগণ চরম এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) প্রত্যাবর্তন কালে কানাত উপত্যাকার প্রান্তভাবে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌঁছিয়ে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করেন। বনু কেলাব গোত্রের দুই ব্যক্তিও তথায় অবস্থান গ্রহণ করে। তারা উভয়েই যখন ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে তখন আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। তাঁর ধারণা ছিল যে, এদের হত্যা করে তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। অথচ তাদের দুই জনের নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ছিল, কিন্তু আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তা জানতেন না। কাজেই, মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ব্যাপারটি অবহিত করেন তখন তিনি বললেন যে, (لقد قتلت قتيلين لأدينّهما): 'তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ যাদের শোনিত পাতের খেসারত অবশ্যই আমাকে করতে হবে।' এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম এবং তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ইহুদীদের নিকট থেকে শোনিত পাতের খেসারত একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটাই পরিণামে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[1] এর বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

মউনা এবং রাযীর উল্লেখিত বেদনা-দায়ক ঘটনাবলীতে যা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতই ব্যাথিত[2] হয়েছিল এবং এ পরিমাণ চিন্তিত ও মর্মাহত[3] হন যে, যে সকল গোত্র ও সম্প্রদায়

---

[1] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ১৮৩-১৮৫ পৃঃ। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১০৯-১১০ পৃ: এবং সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৪ ও ৪৮৬ পৃঃ।

[2] ইমাম ওয়াকেদী লিখেছেন যে, 'রাযী" এবং 'মউনা' ঘটনার সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট একই রাত্রিতে পৌঁছেছিল।

বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সাহাবীগণকে (رضي الله عنهم) হত্যা করে নাবী করীম ﷺ এক মাস যাবৎ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সমীপে বদ দু'আ করতে থাকেন। তিনি ফজরের সালাতে রে'ল যেকওয়ান, লেহইয়ান এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেন এবং বললেন যে, (عُصَيَّة عَصَتْ الله ورســوله) 'উসাইয়া আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফারমানী করেছে।'

আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে স্বীয় নাবীর উপর আয়াত অবতীর্ণ করেন যা পরবর্তী কালে মানসুখ হয়ে যায়। সেই আয়াত ছিল এইরূপ- (بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنـــه) 'আমার সম্প্রদায়কে এ কথা বলে দাও যে, আমার আপন প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমারও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনুত পাঠ করে ছেড়ে দেন।[2]

(৪) বনু নাযীর যুদ্ধ (غزوة بني النضير) ঃ

ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম এবং মুসলিমগণের নামে 'ইহুদীগণ জ্বলে পুড়ে' যেতে থাকে। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ভীরু ও কারপুরুষ এবং যুদ্ধের ময়দানে পেরে ওঠার ক্ষমতা তাদের ছিল না, সেহেতু তারা শঠতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করত। যুদ্ধের পরিবর্তে তারা ষড়যন্ত্র ও হীন কূটকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার কাজে লিপ্ত থাকত। অবশ্য বনু কায়নুকার দেশত্যাগ এবং কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলের তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের চক্রান্তমূলক কাজকর্ম কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। কিন্তু উহুদের যুদ্ধের পর তাদের পূর্বের আচরণ ধারায় আবার তারা ফিরে আসে, অর্থাৎ চক্রান্তমূলক ক্রিয়াকর্ম পুনরায় শুরু করে দেয়। তারা প্রকাশ্যে শত্রুতা আরম্ভ করে, অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিকদের সাহায্য করতে থাকে।[3]

সব কিছু অবগত হওয়া সত্ত্বেও নাবী করীম ﷺ অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে চলতে থাকেন। কিন্তু রাযী ও মউনার বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মাধ্যমে তারা সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নাবী করীম ﷺ-কে খতম করার এমন এক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা নিম্নে উল্লেখিত হল :

কয়েকজন সাহাবা (رضي الله عنهم)-কে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদীদের নিকট গমন করে বনু কেলার গোত্রের সেই দুই ব্যক্তির শোনিতপাতের খেসারত সম্পর্কে কথোপকথন করছিলেন আমর বিন উমাইয়া যামরী ভুলক্রমে স্বাদের হত্যা করেছিলেন। তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কারণে এ ব্যাপারে সহায়তা করা ছিল আশু কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদের সঙ্গে কথোপকথনরত ছিলেন তারা বলল, 'আবুল কাশেম! আমরা আপনার কথা মতোই কাজ করব। আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমরা আপনার প্রয়োজন পূরণ করছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এক বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসে পড়লেন এবং তাদের ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় রইলেন। নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর (رضي الله عنه), ওমর (رضي الله عنه), আলী (رضي الله عنه), এবং আরও কয়েকজন সাহাবা কেরামের (رضي الله عنهم) একটি দল।

এদিকে ইহুদীগণ গোপনে একত্রিত হলে শয়তান তাদের পেয়ে বসল এবং তাদের ভাগ্য লিখনে যে দুভার্গ্যের প্রসঙ্গটি লিপিবিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে তাকে আরও সুশোভন করে উপস্থাপন করল। এ প্রেক্ষিতে তারা নাবী করীম ﷺ-কে হত্যার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পরস্পর বলাবলি করল, 'কে এমন আছে যে, এই চাকীটা নিয়ে দেয়ালের উপর উঠে যাবে, অতঃপর নাবী করীম ﷺ-এর মাথার উপর তা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করবে?'

---

[1] আনাস (رضي الله عنه) হতে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনায় নাবী করীম ﷺ-কে যে পরিমাণ ব্যথিত ও মর্মাহত হতে দেখা গিয়েছিল অন্য কোন ব্যাপারেই তাঁকে এত অধিক পরিমাণে মর্মাহত হতে দেখি নাই। শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসারুস সীরাহ ২৬০ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৬-৫৮৮।

[3] সুনানে আবু দাঁউদ শারাহ আওনূল মা'বূদ সহ ৩য় খণ্ড ১১৬-১১৭ পৃঃ, 'খবরে নাযীর' অধ্যায়ের বর্ণনা হতে এ কথা গৃহীত হয়েছে। দ্রঃ সুনানে আবু দাউদ।

দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহহাশ বলল, 'আমি'

তাদের মধ্যে থেকে সালাম বিন মুশকিম বলল, 'তোমরা এমন কর না কারণ আল্লাহর কসম! তোমরা যা করতে চাচ্ছ সে সম্পর্কে তাঁকে অবগত করিয়ে দেয়া হবে। অধিকন্তু, আমাদের এবং তাঁদের মধ্য যে অঙ্গীকারনামা রয়েছে, এ কাজ হবে তারও বিপরীত।'

কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত না করে তাদের চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তাবায়নের ব্যাপারে অটল রইল। এদিকে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জিবরাঈল (عليه السلام) আগমন করে নাবী করীম ﷺ-কে ইহুদী চক্রান্তের ব্যাপারটি অবগত করিয়ে দিলেন। তিনি সেখান থেকে দ্রুত গাত্রোত্থান করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। পরে সাহাবাবৃন্দ এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি সেখান থেকে চলে এলেন, অথচ আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদী চক্রান্তের বিষয়টি তখন তাঁদের নিকট ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইহুদীগণ এক ভয়ংকর চক্রান্ত করেছিল যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করেছেন।'

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে মুহাম্মদ বিন মাসলমাকে বনু নাযীরের নিকট এ নির্দেশ সহ প্রেরণ করেন যে, তার যেন অবিলম্বে মদীনা থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যায়। মুসলিমগণের সঙ্গে তারা আর বসবাস করতে পারবে না। মদীনা পরিত্যাগ করে যাওয়ার জন্য তাদের দশ দিন সময় দেয়া হল। এ নির্ধারিত সময়ের পরে তাদের মধ্য থেকে যাকে মদীনায় পাওয়া যাবে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে। এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর মদীনা পরিত্যাগ করে যাওয়া ছাড়া ইহুদীদের আর কোন গত্যন্তর রইল না।

নাবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্তির পর মদীনা পরিত্যাগের জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই মদীনা ত্যাগ না করে আপন আপন স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান করতে থাকার জন্য পরামর্শ দেয়। সে বলে যে, তার নিটক দুই হাজার সাহসী সৈন্য রয়েছে, যারা তাদের দূর্গাভ্যন্তরে থেকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তৈরি থাকবে। অধিকন্তু, যদি তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয় তাহলে তাদের সঙ্গে তারাও দেশত্যাগ করবে, যদি তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় তারা তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের কোন ব্যাপারেই তারা কারো নিকট মাথা নত করবে না। তাছাড়া বনু কোরাইয়া এবং বনু গাতফান যারা তোমাদের 'হালীফ' (সহযোগী) তারাও তাদের সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ﴾

[الحشر: ١١]

'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব, আর তোমাদের ব্যাপারে আমরা কক্ষনো কারো কথা মেনে নেব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' [আল-হাশর (৫৯) : ১১]

আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব পাওয়ার পর ইহুদীদের মনোবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মদীনা পরিত্যাগ না করে বরং মুসলিমগণকে মোকাবেলা করবে। তাদের নেতা হুওয়াই বিন আখতাবের বিশ্বাস ছিল যে, মুনাফিক নেতা যা বলেছে তা সে পূরণ করবে। এ কারণে প্রত্যুত্তরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে পাঠাল যে তারা কিছুতেই তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে যাবে না। তিনি যা করতে চান তা করতে পারেন।

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলিমগণের জন্যে এ পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ, ইতিহাসের সংকটপূর্ণ অধ্যায়ে শত্রুদের সঙ্গে মোকাবেলা করার ব্যাপারটি তেমন আশা কিংবা উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল

না। এর পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তখন সমগ্র আরব জাহান ছিল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এবং মুসলিমগণের দুটি প্রচারক দলকে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছিল। তাছাড়া বনু নাযীরের ইহুদীগণ এতই শক্তিশালী ছিল যে, তাদের হাত হতে অস্ত্রশস্ত্র নামানো মোটেই সহজ সাধ্য ছিল না। অধিকন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারটিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আশঙ্কা মুক্ত ছিল না। কিন্তু 'বীরে মউনার' বেদনাদায়ক ঘটনার পূর্বে ও পরে পরিস্থিতি যে ভাবে মোড় নিয়েছিল যার ফলশ্রুতি ছিল অঙ্গীকার ভঙ্গ ও মুসলিমগণকে নির্মমভাবে হত্যা এবং যা মুসলিমগণের মনে এ সকল অপরাধ সম্পর্কে অভূতপূর্ব এক সচেতনতা ও চৈতন্যের উন্মেষ ঘটিয়েছিল তার ফলে মুসলিমগণের মনে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুভূতি এবং ইচ্ছা ও হয়েছিল তীব্র।

এ কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যেহেতু বনু নাযীর নাবী করীম ﷺ-কে হত্যার এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল সেহেতু যে কোন মূল্যে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাতে ফলাফল যা হোক না কেন।

এমনি এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নাবী করীম ﷺ যখন হুওয়াই বিন আখতাবের নিকট থেকে তার নির্দেশনার প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি এবং তাঁর উপস্থিত সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ফেটে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গলে যুদ্ধ প্রস্তুতি। আব্দুল্লাহ বিন উম্মু মাকতুমের উপর মদীনার প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণের পর বনু নাযীর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন মুসলিম বাহিনী। পতাকা ছিল আলী বিন আবু তালিবের হাতে। বনু নাযীর এলাকায় পৌঁছিয়ে মুসলিম বাহিনী তাদের দূর্গ অবরোধ করেন।

এদিকে বুন নাযীর দূর্গ অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে দূর্গ প্রাচীর থেকে তীর এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। যেহেতু খেজুর বাগানগুলো তাদের ঢাল বা যুদ্ধবরণ হিসেবে বিদ্যমান ছিল সেহেতু সেগুলোকে কেটে ফেলা কিংবা পুড়িয়ে ফেলার জন্য নাবী করীম ﷺ নির্দেশ প্রদান করেন। পরে এর প্রতি ইঙ্গিত করে হাসসান (رضي الله عنه) বলেছেন,

وهان على سَرَاةِ بني لُؤي ** حـــريـــق بالبُوَيْرَةِ مســـتطيـــر

অর্থ: বনু লুওয়াইনের নেতাদের জন্য এটা অতি সাধারণ কথা ছিল যে, বুওয়াইরাতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হবে (বনু নাযীরের খেজুরের বাগানের নাম ছিল বুওয়াইরা) এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন,

﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥].

'তোমরা খেজুরের যে গাছগুলো কেটেছ আর যেগুলোকে তাদের মূলকাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই (করেছ)।' [আল-হাশর (৫৯) : ৫]

যাহোক যখন তাদের অবরোধ করা হল তখন বনু কোরাইয়া তাদের থেকে পৃথক রইল। আব্দুল্লাহ বিন উবাইও প্রতিশ্রুতি পালন করল না। তাছাড়া, তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ গাতফান গোত্রও সাহায্যার্থে এগিয়ে এল না। মোট কথা, তাদের এ সংকট কালে কেউই তাদের কোনভাবেই সাহায্য করল না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ঘটনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আয়াত নাযিল করেন,

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ﴾: [الحشر: ١٦]

'(তাদের মিত্ররা তাদেরকে প্রতারিত করেছে) শয়ত্বানের মত। মানুষকে সে বলে- 'কুফুরী কর'। অতঃপর মানুষ যখন কুফুরী করে তখন শয়ত্বান বলে- 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' [আল-হাশর (৫৯) : ১৬]

অবরোধ বেশী দীর্ঘদিন হয় নি, অবরোধ অব্যাহত ছিল ছয় রাত্রি মতান্তরে পনের রাত্রি। এর মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন। যার ফলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা অস্ত্র সংবরণ

করতে সম্মত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তারা প্রস্তাব করে যে মদীনা পরিত্যাগ করে তারা অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্যান্য যে সব দ্রব্য তারা উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা নিয়ে যাবে। পরিবার পরিজনও তাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

এ স্বীকৃতির পর বনু নাযীর অস্ত্র সমর্পণ করে। অতঃপর গৃহাদির জানালা দরজাগুলো যাতে উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে নিজ হাতে নিজ নিজ ঘরবাড়িগুলো ধ্বংস করে ফেলে। এদের কোন কোন লোককে ছাদের কড়া এবং দেয়ালের খুঁটি নিয়ে যেতেও দেখা যায়। অতঃপর শিশু ও মহিলাদের উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে ছয়শত উটের উপর সব কিছু বোঝাই করে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। অধিক সংখ্যক ইহুদী এবং তাদের প্রধানগণ যেমন হুয়াই বিন আখতাব এবং সালাম বিন আবিল হুকাইক খায়বার অভিমুখে যায়। এক দল যায় সিরিয়া অভিমুখে। শুধু ইয়ামিন বিন আমর এবং আবু সাঈদ বিন ওয়াহাব ইসলাম গ্রহণ করে। কাজে, তাদের মালামালের উপর হাত দেয়া হয় নি।

আরোপিত শর্তাদির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাযীরের অস্ত্রশস্ত্র জমিজমা ও বাড়িঘর নিজ অধিকারভূক্ত করে নেন। অস্ত্রশস্ত্র মধ্যে ছিল ৫০টি লৌহ বর্ম, ৫০টি হেলমেট এবং ৩৪০টি তরবারী।

বনু নাযীরের ঘরবাড়ি জমিজমা ও বাগ বাগীচার উপর একমাত্র নাবী কারীম ﷺ-এর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর এতটুকু স্বাধীনতা ছিল যে ইচ্ছা করলে তিনি সব নিজ অধিকারে রেখে দিতে পারেন, কিংবা যাকে ইচ্ছা দিয়েও দিতে পারেন। ফলে তিনি যুদ্ধ লব্ধ অর্থ সম্পদের ন্যায় এ সবের এক পঞ্চামাংশ বাহির করেন নি। কারণ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'ফাই' (ফাও) সম্পদের ন্যায় সে সব সম্পদ দান করেছিলেন। উট, ঘোড়া কিংবা তরবারী ব্যবহার করে তা জয় করা হয় নি। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিশেষ অধিকার বলে পূর্বে হিজরতকারীগণের মধ্যে সেই সম্পদ বন্টন করে দেন। তবে অভাবগ্রস্থ থাকার কারণে আনসারী সাহাবী আবু দোজানা (রাঃ) এবং সাহল বিন হুনাইফা (রাঃ)-কে কিছু অংশ প্রদান করেন। অধিকন্তু, একটি ছোট অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ করেন যদ্বারা নিজ পবিত্র বিবিগণের পূর্ণ এক বছরের ব্যয় করতেন। অবশিষ্টাংশ যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং অস্ত্র সংগ্রহের কাজে ব্যয় করেন।

বনু নাযীর যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর আওয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা পুরো সূরা হাশর অবতীর্ণ করেন। এতে ইহুদীগণের দেশান্তর পর্বটি চিত্রায়ন করে মুনাফিকগণের শঠতাপূনর্ণ ক্রিয়াকর্মের পর্দা উন্মোচিত হয়েছে এবং লব্ধ সম্পদের হুকুম সমূহ উল্লেখ প্রসঙ্গে মুহাজির ও আনসারগণের প্রশংসা করা হয়েছে। অধিকন্তু, এও বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে শত্রুদের বৃক্ষ কর্তন কিংবা তাতে অগ্নি সংযোগ করে তা জ্বালিয়ে দেয়া যেতে পারে। এরূপ করাকে ভূপৃষ্টে বিপর্যয় সৃষ্টি করা বলা চলে না। অতঃপর ঈমানদারদের জন্য তাকওয়ার অপরিহার্যতা এবং পরকাল প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়াদি বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হামদ ও সানা বর্ণনার পর নিজ নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে সূরাটি সমাপ্ত করেন।

, ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা হাশর সম্পর্কে বলতেন, এ সূরাটিকে সূরায়ে বনী নাযীর বল।[1]

(৫) নাজ্‌দ যুদ্ধ (غزوة نجد) ঃ

কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার ছাড়াই বুন নাযীর যুদ্ধে মুসলিমগণের এক চমৎকার সাফল্য লাভ সম্ভব হয়। এর ফলে মদীনায় বসবাসকারী মুসলিমগণের অবস্থা বেশ মজবুত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে মুনাফিকগণ বহুলাংশে হীনবল হয়ে পড়ে। এরপর থেকে প্রকাশ্যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সাহস তারা হারিয়ে ফেলে। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সকল বেদুঈনের খবরাখবর নেয়ার জন্য উদ্যোগী হন যারা উহুদ যুদ্ধের পর মুসলিমগণকে

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ১৯০-১৯২ পৃঃ। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৭১ ও ১১০ পৃ: এবং সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৪-৫৭৫ পৃঃ।

এক কঠিন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল এবং অত্যন্ত অন্যায় ভাবে ইসলাম প্রচারকদের উপর হামলা চালিয়ে তাঁদের হত্যা করেছিল। এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সাহস এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা মদীনা আক্রমণেরও চিন্তা ভাবনা করছিল।

বনু নাযীর যুদ্ধ হতে মুক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেই ওয়াদাভঙ্গকারী বেদুঈনদের শায়েস্তা করার কথা চিন্তা ভাবনা করছিলেন এমন সময় হঠাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, বুন গাতফানের দুইটি গোত্র বুন মোহারের এবং বনু সালাবাহ মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেদুঈন ও পল্লীবাসীদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাবী কারীম ﷺ নাজ্‌দ আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল সেই সকল পাষাণ হৃদয় বেদুঈনদের মনে এমন ভাবে ভীতির সঞ্চার করা যাতে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে পূর্বের ন্যায় কোন কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি করতে তারা সাহসী না হয়।

এদিকে উদ্ধত বেদুঈনদের মধ্য থেকে যারা লুণ্ঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল মুসলিমগণের আকস্মিক আক্রমণে তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমগণ এ সকল লুণ্ঠনকারী গোত্র সমূহের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর নিরাপদে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

জীবনী লেখকগণ এ সময়ে একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন যা ৪র্থ হিজরীর রবিউল আখের কিংবা জুমাদাল উলা মাসে নাজদে সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা এ যুদ্ধকেই 'যাতুর রিকা' বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ সময় নাজদ ভূমিতে একটি যুদ্ধ যে সংঘটিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, তখন মদীনার পরিস্থিতি ঠিক সেই রূপই ছিল। উহুদ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পরবর্তী বছর মদীনা প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য আবু সুফিয়ান যে আহ্বান জানিয়েছিল এবং মুসলিমরা মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন সেই সময়টা ক্রমেই নিকটবর্তী হয়ে আসছিল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না যে, বেদুঈন ও গ্রামবাসীদেরকে তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে দিয়ে বদরের মতো ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য মদীনাকে মদীনাকে মুজাহিদ শূন্য অবস্থায় রাখা হবে। বরং এটাই অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার ছিল যে, বদর প্রান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই ঐ সকল বেদুঈনের উপর এমনভাবে আঘাত হানা যাতে তারা কোন অবস্থাতেই মদীনামুখী হওয়ার সাহস না পায়।

প্রসঙ্গক্রমে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৪র্থ হিজরীর রবিউল আখের কিংবা জুমাদাল উলা মাসে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাকে যাতুর রেকা যুদ্ধ বলে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে আমার অনুসন্ধান মোতাবেক তা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, যাতুর রেকা যুদ্ধে আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং আবু মুসা আশআরী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) খায়বার যুদ্ধের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ইসলমা গ্রহণের পর খায়বরেই নাবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা যে খায়বার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৪র্থ হিজরীর বেশ কিছু কাল পর যে যাতুর রিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওফের সালাত[1] আদায় করেছিলেন। খাওফের সালাত সর্ব প্রথম আদায় করা হয় গাযওয়ায়ে আসফানে। আর গাযওয়ায়ে আসফান যে খন্দক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর শেষ ভাগে। প্রকৃতপক্ষে গাযওয়ায়ে আসসফান ছিল হুদায়রিয়া সফরের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা। আর হুদায়বিয়া সফর ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগের ঘটনা। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর

---

[1] যুদ্ধাবস্থায় সালাতকে কওফের সালাত বলা হয়। এ সালাতের একটা নিয়ম হচ্ছে অর্ধসংখ্যক সৈন্য অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থাতেই ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবেন আর বাকী অর্ধেক সৈন্য অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় শত্রুদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এক রাকায়াত সালাতের পর দ্বিতীয় অর্ধেক ইমামের পিছনে চলে আসবেন এবং প্রথম অর্ধেক শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য চলে যাবেন। ইমাম দ্বিতীয় রাকায়াত পুরো করে নেবেনে এবং সেনাবাহিনীর উভয় দল নিজ নিজ সালাত পালাক্রমে পুরো করে নেবেন। এর সঙ্গে সঙ্গতিশীল এ সালাতের আরও কয়েকটি নিয়ম রয়েছে যা যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আদায় করা হয়ে থাকে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাদীসের কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। এ সূত্র থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, যাতুর রিকা যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পরেই সংঘটিত হয়েছিল।

(৬) দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ (غزوة بدر الثانية) ঃ

মরুচারী আরবদের প্রভাব প্রতিপত্তির মূল উৎপাটন করা এবং বেদুঈনদের অনিষ্ট থেকে স্বস্তিলাভের পর মুসলিমগণ তাদের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু কুরাইশদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। কারণ বছর দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল এবং উহুদ যুদ্ধ শেষে এক পক্ষের ঘোষিত এবং অন্য পক্ষের সমর্থিত সময় ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য ছিল যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আবু সুফিয়ান এবং কওমের সঙ্গে যুদ্ধে করবেন এবং হিকমত ও কৌশলের সঙ্গে যুদ্ধে যাতা ঘোরাবেন যে, যে দল বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত এবং স্থায়ীত্ব লাভের উপযুক্ত অবস্থার মোড় সঙ্গতভাবে তাদের দিকেই ফিরে যাবে।

সুতরাং ৪র্থ হিজরীর শাবান মোতাবেক ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করে বিঘোষিত বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। তার সঙ্গে ছিলেন দেড় হাজার সাহাবী এবং ঘোড়া ছিল দশটি। তিনি পতাকা প্রদান করেন আলী (রাঃ)-এর হস্তে। অতঃপর বদরে পৌঁছে মুশরিকদের অপেক্ষায় শিবির সন্নিবেশ করেন। অপর দিকে আবু সুফিয়ান পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ারী সহ দুই হাজার মুশরিক সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। অতঃপর মক্কা হতে এক মরহালা দূরত্বে মাবরুয্যাহ্‌রান নামক স্থানে পৌঁছিয়ে মাজিন্নাহ নামক প্রসিদ্ধ ঝর্ণার নিকট শিবির স্থাপন করে কিন্তু মক্কা হতে রওয়ানা হওয়ার পর থেকেই যুদ্ধের ব্যাপারে সে নিরুৎসাহিত বোধ করতে থাকে। মুসলিমগণের সঙ্গে বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কথা চিন্তা করে অন্তকরণ ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকে। মুররুয্যাহ্‌রানে পৌঁছিয়ে সে সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং মক্কা প্রত্যাবর্তনের অজুহাত খুঁজতে থাকে। অবশেষে সে নিজ সঙ্গী সাথীদের বলল, 'হে কুরাইশগণ এ সময়টি যুদ্ধের উপযুক্ত সময় নয়। ঐ সময় হচ্ছে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত যখন ভূমি সজীব থাকবে, জীবজানোয়ার ঘাস খেতে পাবে এবং তোমরাও দুগ্ধ পান করতে পারবে। এখন শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান রয়েছে। অতএব আমি প্রত্যাবর্তন করার মনস্থ করেছি, তোমরাও আমার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন কর।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে সৈন্যদের সকলেই যেন ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছিল। কারণ, কোন প্রকার বিরোধীতা ছাড়াই সকলেই ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করল। সফর অব্যাহত রাখা কিংবা মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কেউই মত দেয়নি।

এদিকে মুসলিমগণ আট দিন পর্যন্ত বদর প্রান্তরে শত্রুদের প্রতীক্ষায় থাকেন এবং এরই মধ্যে ব্যবসায়ের পণ্যাদি বিক্রয় করে এক দিরহামকে দুই দিরহামে পরিণত করতে থাকেন। এরপর অত্যন্ত শান শওকাতের সঙ্গে তাঁরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধকে 'গাওয়ায়ে বদরে মাওউদ (ওয়াদাকৃত বদর যুদ্ধ), বদরে সানিয়াহ (দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ), বদরে আখির (শেষ বদর যুদ্ধ) এবং বদরে সুগরা (ছোট বদর যুদ্ধ) নামে পরিচিত।[1]

গাযওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল (غزوة دُوَمة الجندل) ঃ

বদর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পর চতুর্দিকে শান্তি ও নিরাপত্তার এক সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সমগ্র ইসলামী হুকুমাতের মধ্যে শান্তি স্বস্তির বাসন্তী হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের শেষ সীমা পর্যন্ত মনোযোগ দানের উপযোগী মানসিক প্রশান্তি ও অবকাশ লাভ করেন। পরিস্থিতির উপর মুসলিমগণের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রু-মিত্র সকলেরই তা উপলব্ধি এবং স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষিতে সৃষ্টির কারণে এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল।

---

[1] এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দ্রষ্টব্য,ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২০৯ ও ২১০ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১১২ পৃঃ।

কাজেই দ্বিতীয় বদর যুদ্ধের পর ছয় মাস পর্যন্ত পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি অবগত হন যে, সিরিয়ার নিকটবর্তী জানদাল নামক স্থানের আশপাশ বসবাসরত গোত্রগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গমনাগমনকারী লোকজনদের উপর চড়াও হয়ে তাদের মালপত্রাদি লুটপাট করে নিয়ে যায়। অধিকন্তু তিনি এ সংবাদও অবগত হন যে, মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে তারা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছে।

এ প্রেক্ষিতে সে'বা বিন আরফাতা গেফারী (রাঃ)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে এক হাজার মুসলিম সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনী সহ নাবী করীম ﷺ অকূস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। এটি ছিল ৫ম হিজরী ২৫শে রবিউল আওয়ালের ঘটনা। পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নেয়া হয়েছিল বনু আযরাক গোত্রের মাযকুর নামক এক ব্যক্তিকে।

এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রি বেলায় পথ চলতেন এবং দিবাভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা। তাঁরা যখন লক্ষ্য স্থানের নিকটবর্তী হলেন তখন জানতে পারলেন যে, তারা বাইরে গিয়েছে। কাজেই, তাদের গবাদি পাল ও রাখালদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু সংখ্যক গবাদি পশু হস্তগত করা হয়। অন্যগুলো নিয়ে রাখালেরা পলায়ণ করে।

যতদূর পর্যন্ত দুমাতুল জানদালের অধিবাসীদের সংবাদ জানা গেছে তা হচ্ছে, যে দিকে সুযোগ পেল সে সেইদিকে পলায়ন করল। দুমাতুল জানদাল উপস্থিত হয়ে মুসলিমগণ কাউকেও পেলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে এদিক সেদিক তাদের নাগালের মধ্যে পড়ে নি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযান কালে উয়াইনা বিন হাসানের সহিত সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। দুমাতুল জানদাল হচ্ছে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত একটি শহর। এখান থেকে দামেশকের দূরত্ব পাঁচ রাত্রির পথ এবং মদীনার দূরত্ব পনের রাত্রির পথ।

এ আকস্মিক ও মীমাংসাসূচক অভিযান এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন এর ফলে যুগ প্রবাহের মোড় মুসলিমগণের অনুকূলে পরিবর্তিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বিহরস্থ বিপদাপদের কাঠিন্য, যা তাঁদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মুনাফিকেরা নীরব এবং নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। ইহুদীদের একটি গোত্রকে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়। অন্যান্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বেদুঈন এবং কুরাইশেরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সব কিছুর প্রেক্ষাপটে মুসলিমগণ ইসলাম প্রচার করার এবং রাব্বুল আলামীনের পয়গাম দেশ দেশান্তরে পৌঁছে দেয়ার এক অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।

غزوة الأحزاب

গাযওয়ায়ে আহ্যাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ)

এক বছরের কাল যাবৎ উপর্যুপরি সামরিক অভিযান এবং কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে আরব উপদ্বীপে শান্তি ও স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সর্বত্র সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। কিন্তু যে সকল ইহুদীকে নিজেদের দুষ্কর্ম ও চক্রান্তের কারণে নানা প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনার আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল তখনো তাদের চৈতন্যেদয় হয়নি। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, অঙ্গীকারভঙ্গ, ধোঁকাবাজি, আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্মের অশুভ ফলাফল থেকে কোন শিক্ষাই তাদের হয়নি। কাজেই, মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয়ে খায়বার যাওয়ার পর মুসলিম ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে যা সামরিক টানপোড়েন চলছিল তার ফলাফল কি দাঁড়ায় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তারা অপেক্ষামান থাকে। কিন্তু যখন তারা প্রত্যক্ষ করল যে, পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে যাচ্ছে এবং তাঁদের শাসন ক্ষমতা বহুদুর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে তখন তারা হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। শেষ বারের মতো মুসলিমগণকে এমন এক চরম আঘাত হানার জন্য তারা প্রস্তুতি শুরু করে দিল যাতে তাঁদের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মুসলিমগণের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করার সাহস তাদের ছিল না সেহেতু এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন করল যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল,

বনু নাযীর গোত্রের ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কার কুরাইশগণের নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে এবং যুদ্ধে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যও নিশ্চয়তা প্রদান করে। সেহেতু উহুদ যুদ্ধের দিন কুরাইশরা পুনরায় মুসলিমগণের সঙ্গে বদরে মোকাবেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে যোদ্ধা হিসেবে তাদের যে সুখ্যাতির হানি হয় তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই বনু নাযীরের প্রস্তাব তাদের উৎসাহিত করে এবং তারা তা মেনে নেয়।

এরপর ইহুদীগণের এ দলটি বনু গাতফান গোত্রের নিকট যায় এবং কুরাইশদের মতো তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। অধিকন্তু, এ প্রতিনিধি দলটি আরবের অবশিষ্ট গোত্রগুলোর নিকট ঘোরাফেরা করে তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করতে থাকে। যার ফলে তারা অনেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবে ইহুদীগণ অত্যন্ত কার্যকরভাবে নাবী করীম ﷺ, ইসলামী দাওয়াত এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের বড় বড় গোত্র এবং দলগুলোকে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে নেয়।

অতঃপর নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দক্ষিণদিক হতে কুরাইশ কেনানাহ এবং তেহামায় বসবাসরত দ্বিতীয় হালিফ (চুক্তিবদ্ধ) গোত্র সমূহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এদের সংখ্যা ছিল চার হাজার এবং সার্বিক নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। এ বাহিনী মারয্যাহরান গিয়ে পৌঁছিলে বনু সোলাইম গোত্র এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করে। ঐ সময় পূর্বদিক হতে গাতফানী গোত্র সমূহ ফাযারা, মুররাহ গোত্রের নেতৃত্বে ছিল হারেস বিন আউফ এবং বনু আশজা গোত্রের নেতৃত্বে ছিল মিসআর বিন রাখিলাহ। তাদের নেতৃত্বাধীনে বনু আসাদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোত্রের অনেক লোকজনও এসেছিল।

উল্লেখিত গোত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় এবং নির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে কয়েক দিনের মধ্যেই মদীনার আশপাশে দশ হাজার সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী সমবেত হল। তাঁদের দুরভিসন্ধিমূলক যুদ্ধ প্রস্তুতি পূর্বে তারা এত বেশী সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেছিল যে মদীনার মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকের সমষ্টিগত সংখ্যার চাইতেও তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশী। শত্রুপক্ষের এ সৈন্য সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যদি আকস্মিক ভাবে মদীনার দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যেত তাহলে মুসলিমগণের জন্য তা হতো অত্যন্ত বিপজ্জনক।

তখন এতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই থাকত না যে, মুসলিমগণের মূলোৎপাটন করে তাঁদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হত।

কিন্তু মদীনার নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন মস্তিস্ক প্রসূত এবং পরিচালন ছিল নিচ্ছিদ্র যত্নশীল। তাঁর সচেতন হস্তের আঙ্গুলগুলো সর্বক্ষণ পরিস্থিতির নাড়ির গতির উপর ছিল বিদ্যমান। পরিস্থিতির গতিধারার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ঠিক ঠিক আঁচ অনুমান ও তথ্য পরিবেশন এবং তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ অবলম্বন করে আসছিলেন। কাজেই কাফিরদের বিশাল বাহিনী যখনই মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য সচেষ্ট হল তখনই মদীনার সংবাদ সরবরাহকারীগণ পরিচালকের নিকট ত্বরিৎ সংবাদ পরিবেশন করলেন।

সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণের পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করেন এবং প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে সলা পরামর্শ কনের। শুরার প্রতিনিধিগণ অনেক চিন্তা ভাবনার পর সর্বসম্মতক্রমে সালমান ফারসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সালমান ফারসীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রস্তাবটির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! পারস্যে যখন আমাদেরকে অবরোধ করা হতো তখন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে পরিখা খনন করে নিতাম।'

প্রতিরোধ সংক্রান্ত এ প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। আরববাসীগণ এ প্রস্তাবের হেকমত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বাস্তবায়ণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ অবলম্বন করেন। এতে প্রতি দশ জনের উপর ৪০ (চল্লিশ) হাত পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দায়িত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিখা খননে আত্মনিয়োগ কনের। নাবী করীম ﷺ এ কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে থাকেন এবং নিজেও পুরোপুরিভাবে ওতে অংশগ্রহণ করেন। সাহল বিন সা'দ হতে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা খন্দকে ছিলাম। লোকজনেরা খনন করছিলেন এবং আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন, (اللهم لا عَيشَ إلا عيشُ الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصـــار) **অর্থ:** 'হে আল্লাহ! পরকালীন জীবন তো হচ্ছে প্রকৃত জীবন অতএব মুহাজিরীন এবং আনসারগণকে ক্ষমা করে দাও।'[1]

আনাস হতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খন্দকের দিকে আগমন করলেন তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, এক শীতের সকালে আনসার ও মুহাজিরীনগণ খনন করছেন। তাদের নিকট এমন কোন দাস নেই যে তাদের পরিবর্তে দাসগণ এ কাজ করে দেয়। তাদের কষ্ট এবং ক্ষুধার ভাব দেখে রাসুল্লাহ ﷺ বললেন,

اللهم إن العيش عيش الآخرة ** فاغفـــر للأنصـــار والمهـــاجرة

'হে আল্লাহ! অবশ্যই, পরকালীন জীবনটাই প্রকৃত জীবন। অতএব, আনসার এবং মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।

আনসার এবং মুহাজিরগণ প্রত্যুত্তরে বললেন,

نحـــن الذيـــن بايعـــوا محمـــداً ** على الجهـــاد ما بقيـــنا أبداً

অর্থ: 'আমরা সেই ব্যক্তি যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর হস্তে জিহাদের বাইআত করেছি, আমাদের এ প্রতিজ্ঞা চূড়ান্ত ও স্থায়ী।[2]

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড বাবু গাযওয়াতুল খন্দক ৫৮৮ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৩৯৭ পৃ, ২য় খণ্ড ৫৮৮ পৃঃ ।

সহীহ বুখারীতে বারা বিন আযিব হতে বর্ণিত আছে, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। এ মাটি বহন করার কারণে তাঁর দেহ মুবারক ধূলি ধূসরিত হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় তাঁকে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصـــدقنـــا ولا صلينـــــا

فأنزلن سكينـــــة علينـــا ** وثبت الأقـــدام إن لاقينـــــا

إن الألى رغبوا علينـــا ** وإن أرادوا فتـــنـــة أبينـــــا

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম না, আমরা দান খায়রাত করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। অতএব অমাদের শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মোকাবেলা হয় তাহলে আমাদেরকে ধৈর্য্যদান করিও। তারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করেছে। যদি তারা ফেৎনা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে আমরা কখনই মাথা নত করব না।

বারা' বিন আযেব বলেছেন, 'শেষের শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক টান দিয়ে উচ্চারণ করছিলে, অন্য একটি বর্ণনায় করিতাটির শেষাংশ ছিল নিম্নরূপ :

إن الألى قـــد بغـــوا علينـــا ** وإن أرادوا فـــتـنـــة أبينـــا

অর্থঃ 'তারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে এব তারা যদি আমাদেরকে ফেৎনায় নিক্ষেপ করতে চায়, আমরা কখনই মাথা নত করে তা মেনে নেব না।'[১]

মুসলিমগণ একদিকে এতই আবেগের সঙ্গে কাজ করছিলেন, অপর দিকে তাঁদের ক্ষুধার তাড়না এত অধিক ছিল যে, তা চিন্তা করতে গেলে অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, পরিখা খননরত মুসলিমগণের জন্য যে সামান্য পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আনা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এ দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।[২]

আবু তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমরা ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং নিজ নিজ পেটের আবরণ উন্মোচন করে পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখা পাথর দেখালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন পেটের আবরণ উন্মোচণ করে দেখালেন যে, তাঁর পেটের দুটি পাথর বাঁধা আছে।[৩]

পরিখা খনন কালে নবুওয়াতের কতিপয় নিদর্শনও প্রকাশিত হয়। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, নাবী করীম ﷺ-এর তীব্র ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক সা' (আনুমানিক আড়াই কেজি যব পিসে আটা তৈরি করলেন। অতঃপর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী সহ একান্তে তাঁর বাসায় তশরীফ আনয়নের জন্য নাবী করীম ﷺ-কে অনুরোধ পেশ করলেন। কিন্তু নাবী করীম ﷺ পরিখা খননরত সকল সাহাবী (রাঃ)-কে (যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার) সঙ্গে নিয়ে তাঁর গৃহে গমন করলেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে এ স্বল্প খাদ্যে সাহাবীগণের সকলেই পূর্ণ পরিতৃরি সঙ্গে আহার করলেন অথচ গোশতের পাত্রে সাবেক পরিমাণ গোশত অবশিষ্ট রইল এবং আটার পাত্রেও সাবেক পরিমাণ আটা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় ক্রমাগতভাবে রুটি তৈরি হতে থাকল।[৪]

---

1 সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৯ পৃঃ।

2 সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৮৮ পৃঃ।

3 জামে তিরমিযী, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪৪৮ পৃঃ।

4 এ ঘটনা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে দ্রঃ ২য় খণ্ড ৫৮৮-৫৮৯ পৃঃ।

তাঁর পিতা এবং মামাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নোমান ইবনু বাশীরের বোন অল্প খেজুর সহ খন্দকের নিকট আগমন করলে রাসূলুল্লাহ তা চেয়ে নিয়ে একটি কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দেন। অতঃপর খননরত সাহবীদের দাওয়াত দিয়ে তা খেতে বললেন। সাহাবীগণ খেতে থাকলে খেজুরের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে সকল সাহাবীর খাওয়ার পরেও এ পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল যে, তার কিছু পরিমাণ কাপড়ের বাইরেও পড়েছিল।[১]

খন্দক খনন কালে উপরিএ ঘটনাবলীর চাইতেও উল্লেখযোগ্য আরও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেন, আমরা পরিখা খনন কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। কয়েকজন সাহাবী নাবী করীম -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! একটি অত্যন্ত শক্ত গোছের পাথর আমাদের খনন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।'

নাবী করীম বললেন, 'আমি অবতরণ করছি' অতঃপর তিনি যখন সেখানে তশরীফ আনয়ন করলেন তখনো তাঁর পেটের উপর একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমারাও তিন দিন যাবৎ কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ যখন এ খণ্ডের উপর আঘাত করলেন তখন তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে স্তুপে পরিণত হয়ে গেল।[২]

বারা' বর্ণনা করেছেন, 'খন্দক খনন কালে এক স্থানে একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর দৃষ্টিগোচর হল। এ পাথরটিকে কোঁদাল দ্বারা আঘাত করলে সে আঘাত পাথরটি কিছুই হল না, বরং কোঁদাল প্রত্যাঘাত খেয়ে ফিরে আসতে থাকল। উপায়ন্তর না দেখে নাবী করীম -কে ব্যাপারটি অবহিত করা হল। ব্যাপারটি অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ সেখানে আগমন করলেন এবং কোঁদাল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলার পর পাথরটিকে আঘাত করলেন। এ কোঁদাল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলার পর পাথরটিকে আঘাত করলেন। এ আঘাতের ফলে পাথরের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বললেন,

(الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة)

'আল্লাহ আকবর! আমার হাতে সিরিয়া দেশের চাবি কাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী আছে, সেখানকার লাল দালানগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।'

অতঃপর যখন তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন তখন অন্য একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি বললেন,

(الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن)

'আল্লাহ আকবর! আমাকে পারস্য সাম্রাজ্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এ সময় আমি মাদায়েনের সাদা দালানাগুলো প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর বিসমিল্লাহ্ সহকারে তিনি তৃতীয় বার আঘাত করলেন। তখন পাথরটির অবশিষ্টাংশ ভেঙ্গে পড়ল। এবার তিনি বললেন,

(الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني)

'আল্লাহ আকবর! আমাকে ইয়েমেন রাজ্যের চাবিগুলো প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এখন আমি সানআর সিংহদ্বার প্রত্যক্ষ করছি।[৩] সালমান ফারসী -এর রওয়ায়েত থেকে ইবনু ইসহাক অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন।[৪]

---

1 ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ২১৮ পৃঃ।

2 সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৮ পৃঃ।

3 সুনানে নাসায়ী ২য় খণ্ড, মুসনাদে আহমদ। নাসায়ীতে এ শব্দগুলো নাই এবং নাসায়ীতে জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

4 ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২১৯ পৃঃ।

যেহেতু উত্তর দিক ছাড়া অন্যান্য সব দিক থেকেই মদীনা নগরী পাহাড়, পর্বত এবং খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল সেহেতু একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ সৈনিক হিসেবে যথার্থই তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মদীনার উপর এত বিশাল এক বাহিনীর আক্রমণ একমাত্র উত্তর দিক থেকেই সম্ভব হতে পারে এবং সেই দিকেই তিনি পরিখা খনন করে ছিলেন।

মুসলিমগণ পরিখা খনন কাজ একটানা অব্যাহত রাখেন। দিবা ভাগ তাঁরা খনন কাজ চালিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে যেতেন। এভাবে মদীনার পার্শ্ববর্তী দেয়াল পর্যন্ত কাফিরদের সুসজ্জিত সৈন্যদল পৌঁছাবার পূর্বেই নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খন্দক তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

এদিকে চার হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী রুমাহ, জারফ এবং জাগাবার মধ্যবর্তী মাজমাউল আসয়াল নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। অন্যদিকে গাতফান এবং তাদের নাজদী সঙ্গীরা ছয় হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে উহুদের পূর্ব পাশে যামবে নাকনী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এহেন পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

'মু'মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল– আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়া'দা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আগ্রহই বৃদ্ধি পেল।' [আল-আহযাব (৩৩) : ২২]

কিন্তু মুনাফিক এবং দুর্বল অন্তঃকরণের লোকদের দৃষ্টি যখন সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর পতিত হতো তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢].

আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল– আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়া'দা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।' [আহযাব (৩৩) : ১২]

যাহোক, শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সহ অগ্রসর হলেন এবং সালা পর্বতকে পিছনে রেখে শিবির স্থাপন করলেন, সম্মুখভাগে ছিল খন্দক যা মুসলিম এবং কাফিরদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক প্রাচীর হিসেবে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম প্রতীক চিহ্ন (কোড পরিভাষা) ছিল [حم لا ينصرون] (হামীম, তাদেরকে সাহায্য করা হবে না)। এ সময় মদীনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় ইবনু উম্মু মাকতুমের উপর। মদীনার মহিলা এবং শিশুদেরকে নগরের দূর্গ ও গর্ত সমূহে সুরক্ষিত রাখা হয়।

আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ যখন মদীনার দিকে অগ্রসর হল তখন প্রত্যক্ষ করল যে, একটি প্রশস্ত পরিখা তাদের এবং মুসলিমগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে অবরোধ সৃষ্টির কথা ভাবতে হল অথচ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় এ রকম কোন চিন্তা ভাবনা কিংবা প্রস্তুতি তাদের ছিল না। কারণ প্রতিরোধের এ পরিকল্পনা তাদের নিজেদের কথা অনুযায়ী এমন একটি চাতুর্যপূর্ণ কৌশল যা সম্পর্কে আরবগণের কোন ধারণা ছিল না। কাজেই, এ ধরণের রণ-কৌশল সম্পর্কে তারা চিন্তাই করে নি।

খন্দকের নিকট উপস্থিত হয়ে মুশকিরগণ তাদের ধারণাতীত এ রণ-কৌশল প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চক্কর দিতে থাকল। এ অবস্থায় তারা এমন কোন দুর্বল স্থানের অনুসন্ধান করছিল

যেখান দিয়ে অবতরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। এদিকে মুসলিমগণ তাদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন এবং তারা যাতে খন্দকের নিকটবর্তী হতে সাহস না হয় এ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ করছিলেন। যাতে তারা খন্দকের মধ্যে মধ্যে লাফ দিয়ে পড়তে কিংবা অংশ বিশেষ ভরাট করে ফেলে পথ তৈরি করে নিতে পারে।

এদিকে কুরাইশ আশ্বারোহীগণ এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না যে খন্দকের পাশে অবরোধ সৃষ্টি করে ফলাফলের আশায় অনর্থক অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ তারা বসে থাকবে। এ জাতীয় ব্যবস্থা ছিল তাদের অভ্যাস ও শানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই, তাদের একটি দল যার মধ্যে ছিল আমর বিন আবদে উদ্দ, ইকরামা বিন আবু জাহল এবং যারবার বিন খাত্তাব একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে খন্দক পার হয়ে গেল এবং তাদের ঘোড়াগুলো ও সালায়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর দিতে থাকল। পক্ষান্তরে আলী এবং কয়েকজন সাহাবী খন্দকের যে অংশ দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিল সেখানে অবস্থান নিয়ে তাদের পথ বন্ধ করে দিলেন। এর প্রেক্ষিতে আমর বিন আবদে উদ্দ সামনা সামনি মোকাবেলার জন্য উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানাল। আলী তার সঙ্গে মোকাবেলার জন্যে মুখোমুখী হয়ে এমন এক বাক্য উচ্চারণ করেন যার ফলে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় সে ঘোড়া হতে লাফ দিয়ে অবতরণ করে এবং অশ্বের পদযুগল কর্তন ও অবয়ব বিকৃত করত- সে অন্যতম বীর ও সাহসী মুশরিক ছিল। আলী -এর সম্মুখে এসে পড়ে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে শুরু হল মোকাবেলা। চলল উভয়ের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের পালা। অবশেষে প্রবল আঘাত হেনে আলী তাকে হত্যা করেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য মুশরিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় খন্দক পেরিয়ে পলায়ন করে। তারা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, পলায়নের সময় ইকরামা তার বর্শা ফেলে দিয়ে পলায়ন করে।

মুশরিকগণ কোন কোন সময় খন্দক অতিক্রম করে যাওয়ার কিংবা এর প্রশস্ততা কমিয়ে পথ তৈরি করে নেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু মুসলিমগণ ও খন্দক থেকে তাদের দূরে রাখার লক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেতে থাকেন। তারা অদম্য সাহস এবং দক্ষতার সঙ্গে তীর নিক্ষেপ করে এবং প্রতিপক্ষের তীরন্দাযির মোকাবেলা করে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেন।

শত্রুপক্ষের সঙ্গে অব্যাহত মোকাবেলা করার কারণে রাসূলুল্লাহ এবং সাহাবীগণ -এর পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় নি। যেমনটি সহীহাইনের মধ্যে জাবের হতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন ওমর বিন খাত্তাব আগমণ করেন এবং কাফিরগণ সম্পর্কে কিছু ভালমন্দ কথা বলার পর আরজ করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অদ্য সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় খুব কষ্টে সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ বললেন, (وأنا والله مـا صـليتها) 'আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি এখনো সালাত আদায় করতে পারি নি।'

এরপর আমরা নাবী করীম -এর সঙ্গে বুতহান নাসক স্থানে অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ সেখানে অযু করেন এবং আমরাও অযু করি। অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করেন। এটি ছিল সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পরের কথা। এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করা হয়।[1]

নির্দিষ্ট সময়ে এ সালাত আদায় করতে না পারার কারণে রাসূলুল্লাহ এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি বদ দু'আ করেছিলেন। বুখারী শরীফে আলী -এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ বললেন,

(ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)

[1] সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৯০ পৃ:

'হে আল্লাহ! ঐ সকল মুশরিকের বাড়িঘর ও কবর এমনভাবে আগুণে পরিপূর্ণ করে দাও যেভাবে তারা আমাদেরকে 'সালাতে উস্তা' বা মধ্যবর্তী সলাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে এবং এভাবে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।[1]

মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে শাফেয়ীতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকগণ নাবী করীম ﷺ-কে জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে। এ প্রেক্ষিতে তিনি একত্রে এ সালাত আদায় করেন। ইমাম নববী বলেন, 'উল্লেখিত বর্ণনা সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে সমাধান হবে, খন্দক যুদ্ধের কয়েকদিন পর্যন্ত এ সমস্যা চালু ছিল। কাজেই, কোন দিন এ রকম এবং অন্য দিন ভিন্ন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।[2]

এখান থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকগণের পক্ষ থেকে খন্দক অতিক্রম করার প্রচেষ্টা এবং মুসলিমগণের পক্ষ থেকে অব্যাহত প্রতিরোধ কয়েক দিন পর্যন্ত চালু ছিল একটি বিরাট প্রতিবন্ধক, এই জন্যে সামানাসামনি সংগ্রামের সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। যুদ্ধের গতিধারা তীর নিক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অবশ্য, তীর নিক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষেরই কয়েক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা সম্ভব। মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ছয় জন এবং মুশরিকদের পক্ষে দশ জন। এর মধ্যে এক কিংবা দুই জন তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল।

ঐ দুই প্রতিপক্ষ দলের পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপের এক পর্যায়ে সা'দ বিন মুআয তীরবিদ্ধ হন। তীরের আঘাতে তাঁর হাতের মূল শিরা কর্তিত হয়। হেব্বান বিন আরাক নামক এক কুরাইশীর তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। আহত হওয়ার পর তিনি প্রার্থনা করেন, **'হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, যে সম্প্রদায় তোমার রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাকে দেশ হতে বাহির করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারটি আমার নিকট যত প্রিয়, অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকট ততটা প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, এখন তুমি তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে এখনো যদি কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমাকে তাদের জন্য অবশিষ্ট রেখে দাও যেন আমি তাদের সঙ্গে জিহাদে লিপ্ত হতে পারি। আর যুদি তুমি যুদ্ধ শেষ করে থাক তাহলে এ আঘাতকে বাকী রেখে এটাকে আমার মৃত্যুর কারণ করে দাও।**[3]

যে প্রকারেই হোক এক দিকে মুসলিমগণ শত্রুদের সামানাসামনি হয়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানে তৎপর রয়েছেন, অন্য দিকে ষড়যন্ত্রকারী এবং কপটদের শঠতা স্বর্প আপন গর্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে এবং প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, তারা মুসলিমগণের দেহে গরল ঢেলে দেবে। যেমন বনু নাযীরের বড় অপরাধী হুওয়ায় বিন আখতাব বনু কুরাইযার আবাসস্থলে এসে তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ কোরয়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ কা'ব বিন আসাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বনু কোরাইয়ার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার পালনের অধিকার রাখত এবং যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এ চুক্তি করেছিল যে, যুদ্ধের সময় সে তাঁকে সাহায্য করবে। (যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) হুওয়ায় এসে যখন দরজার কারাঘাত করে তখন সে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু হুওয়ায় তার সঙ্গে এমন এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য সে দরজা খুলে দেয়। হুওয়ায় বলল, 'হে কা'ব! আমি তোমার নিকট যুগের ইজ্জত এবং জোয়ারের সাগর নিয়ে এসেছি। আমি নেতা ও পরিচালকগণসহ মুশরিকদেরকে নিয়ে এসে রুমার মাজমাউল আসয়ালে অবতরণ করিয়েছি। তাছাড়া, বনু গাতফানকে তাদের পরিচালক ও নেতৃবৃন্দ সহ উহুদের নিকট যামবে নাকমীতে শিবির স্থাপন করেছি। তারা আমার সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছে,

---

[1] সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৯ পৃঃ।

[2] শাইখ আবদুল্লাহ রচিত 'মুখতাসারুস" সীরাহ ২৮৭ পৃ: এবং ইমাম নববীর শাবহে মুসলিম ১ম খণ্ড ২২৭ পৃঃ।

[3] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২২৭ পৃঃ।

'মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গী সাথীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তারা এখান থেকে ফিরে যাবে না।'

কা'ব বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি আমার নিটক যুগের অপমান এবং বর্ষণ-মুখর মেঘমালা নিয়ে এসেছ যা শুধু বিজলীর চমক দিচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে ফলোৎপাদক কিছুই নেই। হুওয়াই আমি দুঃখিত আমাকে আমার আপন অবস্থার উপর থাকত দাও। আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে সততা ও বিশ্বাস রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কিছুই দেখি নি।'

কিন্তু হুওয়ায় অনবরত তার চুলের খোপা এবং কাঁধের মধ্যে মোচড় দিতে এবং ফুসলাতে থাকল। এভাবেই তাকে বশীভূত করে ফেলল। অবশ্য এ ব্যাপারে হুওয়ায়কে কা'বের সঙ্গে একটি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয়। অঙ্গীকারটি ছিল এরূপ যে, কুরাইশগণ যদি মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা না করে ফিরে আসার পথ ধরে তাহলে সেও তাদের সঙ্গে তাদের দূর্গে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের অবস্থা যা হবে তারও তাই হবে। উভয়ের এ অঙ্গীকারের ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কা'বের সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং এর ফলে মুসলিমগণের সহযোগী হয়ে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তাদের শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করে।[1]

এরপর বনু কোরাইয়ার ইহুদীগণ প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) হাস্‌সান বিন সাবেত (রাঃ)-এর 'ফারে' নামক দূর্গের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে হাস্‌সানও (রাঃ) সেখানে ছিলেন। সাফিয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে এক জন ইহুদী গমণ করল এবং দূর্গের চারদিকে ঘোরাফেরা করতে থাকল। এটি হচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা যখন বনু কোরাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তির শর্তাবলী থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিল। আর আমাদের এবং তাঁদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে, তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমগণকে নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের নিকট আসতে পারতেন না। এ জন্য আমি বললাম, 'হে হাস্‌সান! আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এ ইহুদী আমাদের দূর্গের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে। আল্লাহর কসম! আমি আশঙ্কা করছি যে, এ ব্যক্তি অন্যান্য ইহুদীদেরকে আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে দেবে। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শত্রুর মোকাবেলায় এতই ব্যস্ত রয়েছেন যে, তাঁরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারবেন না। সুতরাং আপনি গিয়ে তাকে হত্যা করে আসুন।

উত্তরে হাসান (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি জানেন যে, আমি এ কাজের লোক নই।' সাফিয়া বললেন, 'আমি এখন নিজেই কোমর বাঁধলাম। তারপর স্তম্ভের একটি কাঠ নিলাম এবং দূর্গ হতে বের হয়ে ঐ ইহুদীর কাছে গেলাম। অতঃপর ঐ কাঠ দ্বারা আঘাত করে করে তার দফা শেষ করে দিলাম এবং দূর্গে ফিরে এসে হাসান (রাঃ)-কে বললাম, যান, এখন তার অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্রগুলো নিয়ে আসুন। সে পুরুষ লোক বলে আমি তার অস্ত্র খুলিনি। আমার এ কথা শুনে হাসান (রাঃ) বললেন, তার অস্ত্র এবং আসবাবপত্রের আমার কোন প্রয়োজন নেই।[2]

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম শিশু এবং মহিলাগণের হেফাযতের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফুর ঐ ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের অত্যন্ত গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে সাধারণ ইহুদীগণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে এ দূর্গাবাসীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য মোতায়েন রয়েছে এবং এ কারণেই তারা দূর্গের উপর চড়াও হওয়ার সাহস করে নি। অথচ দূর্গের মধ্যে তখন কোন সৈন্যই ছিল না।

তবে মূর্তিপূজক আক্রমণকারীদের সঙ্গে তাদের একান্ততার প্রমাণস্বরূপ তারা তাদের জন্য রসদ সরবরাহ করতে থাকে। ঐ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তাদের রসদবাহী বিশটি উট আটক করেছিলেন। যাহোক, রাসূলুল্লাহ

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২২০-২২১ পৃঃ।

[2] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২২৮ পৃঃ।

ﷺ যখন ইহুদীগণের অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য তৎক্ষণাৎ মনোনিবেশ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বনু কোরাইয়ার মনোভাব অবহিত হওয়ার পর প্রয়োজন বোধে সে আলোকে সামরিক কৌশল পুনর্বিন্যাস করে দেয়া।

কাজেই, এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ বিন মুআয, সা'দ বিন উবাদাহ, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা এবং খাওয়াত বিন জোবায়ের (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। বনু কোরাইয়া সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সঠিক না মিথ্যা সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তিনি তাদের পরামর্শ দেন। যদি সঠিক হয় তাহলে আভাষ ইঙ্গিত শুধু তাঁর কাছেই তা ব্যক্ত করার জন্য পরামর্শ দেন। সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, যদি তারা অঙ্গীকার মান্য করে চলে তাহলে তা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ ও আলোচনা করার জন্য পরামর্শ দান করেন।

যখন তারা বনু কোরাইয়ার নিকট গিয়ে পৌঁছিলেন তখন তাদের চরম বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তারা প্রকাশ্যে গালিগালাজ করল, শত্রুতামূলক কথাবার্তা বলল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অবমাননা সূচক উক্তি করল। তারা এমন সব কথাবার্তাও বলল, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে? আমাদের এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে কোন অঙ্গীকার নেই।'

বনু কোরাইয়া এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর নাবী করীম ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে তাঁরা ইঙ্গিতে বললেন, আযল ও কারাহ। এর অর্থ হল আযল ও কারাহ গোত্র যেমন রাজী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল বনু কোরাইয়ার ইহুদীগণ ও অনুরূপভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলেই ওয়াকেবহাল হয়ে গেলেন এবং এর ফলে আসন্ন এক বিপদের আভাষ ক্রমেই তাদের সামনে প্রকাশ পেতে থাকল। প্রকৃতই মুসলিমগণ সে সময় এক অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পিছনে ছিল বনু কোরাইয়া যাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই মুসলিমগণের ছিল না। সম্মুখভাগে ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মুশরিক বাহিনী যাদের সম্মুখ থেকে সরে আসা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু, মুসলিম শিশু ও মহিলাগণ বিশেষ কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই বিশ্বাসঘাতক ইহুদীগণের সন্নিকটে অবস্থান করছিলেন। বিভিন্ন কারণে মুসলিমগণ দারুণ দূর্ভাবনার মধ্যে নিপতিত হন যার সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١]

' তারা যখন তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপর থেকে আর তোমাদের নীচের দিক থেকে, তখন তোমাদের চক্ষু হয়েছিল বিস্ফারিত আর প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত; আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম (খারাপ) ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে।' [আল-আহযাব (৩৩) : ১০]

এমনি জটিল এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কতগুলো মুনাফিকও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ ﷺ আমাদের সঙ্গে ওয়াদ করতেন যে, আমরা কায়সার ও কিসরার ধন ভাণ্ডার ভোগ করব, অথচ এখন অবস্থা হচ্ছে, প্রস্রাব এবং পায়খানার জন্য বের হলেও জীবনের ভয় রয়েছে। কোন কোন মুনাফিক তাদের সম্প্রদয়ের নিকট এমন কথাও বলল যে, 'আমাদের ঘরবাড়িগুলো শত্রুদের সামনে খোলা পড়ে রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ঘরাবাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক।' সেই সময় পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, বনু সালমা গোত্রের লোকজনদের মন ভেঙ্গে গেল এবং তাঁরা ফিরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতে থাকল। এ সব লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন,

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٢، ١٣].

' আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল– আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়া'দা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৩. স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- হে ইয়াসরিববাসী! তোমরা (শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না, কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল এই বলে নাবীর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই তাদের ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।' [আল-আহযাব (৩৩) : ১২-১৩]

এদিকে সৈন্যদের অবস্থা যখন ছিল এরূপ, অন্যদিকে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু কোরাইয়ার অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ অবগত হওয়ার পর বস্ত্র দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত অবস্থায় দীর্ঘ সময় চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। নাবী করীম ﷺ-এর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে লোকজনদের দুর্ভাবনা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। কিন্তু কিছু সময় পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আল্লাহর আকবার বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

(أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره)

'ওহে মুসলিমগণ সাহায্য এবং তোমাদের বিজয়ের শুভ সংবাদ শুনে নাও।'

অতঃপর উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা লক্ষ্যে নাবী করীম ﷺ এক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন এবং তার ব্যবস্থা হিসেবে মদীনার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেনা বাহিনীর একটি অংশকে সেখানে প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশু ও মহিলাদের অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে কুচক্রী ইহুদীগণ যাতে তাদের আক্রমণ করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করা।

কিন্তু সে সময় এমন এক কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল যার মাধ্যমে শত্রুদের বিভিন্ন দলের ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির মাধ্যমে এক এক দলকে অন্যান্য দল থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়। এ প্রেক্ষিতে নাবী করীম ﷺবনু গাতফান গোত্রের দুই নেতা উয়াইর বিন হিসন এবং হারেস বিন আওফের সঙ্গে মদীনার উৎপাদনের ১/৩ অংশ দেয়ার শর্তে এমন একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মনস্থ করলেন যার ফলে এ দুই নেতা নিজ নিজ গোত্রের লোকজনদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে এবং এ অবস্থায় মুসলিমগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কুরাইশ বাহিনীর উপর প্রবল পরাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

এ কূটনৈতিক কৌশল সম্পর্কে সলা-পরামর্শের এক পর্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহর সঙ্গে আলোচনা করেন তখন তারা উভয়ে এক বাক্যে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আল্লাহর তরফ থেকে এ নিদের্শ লাভ করে তাহলে কোন প্রশ্ন ছাড়াই তা স্বীকৃত হবে, আর যদি আপনি আমাদের জন্যই তা করতে চান তাহলে আমাদের এর কোন প্রয়োজন নেই। যখন এ সকল লোকজন এবং আমরা সকলেই মূর্তিপূজক ছিলাম। তখন এরা অতিথি সেবা এবং ক্রয় বিক্রয় ছাড়া অন্য কোন উপায়ে একটি শষ্য কণারও লোভ করতে পারে নি। আর এখন আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের নূর দ্বারা ধন্য করেছেন এবং আপনার মাধ্যমে ইজ্জত দান করেছেন। আমরা তাদেরকে নিজ সম্পদ দান করব? আল্লাহর শপথ! আমরা তো তাদেরকে শুধু তলোয়ারের আঘাত করব। তাদেরকে অন্য কিছু প্রদান করার জন্য আমরা প্রস্তুত নই। নাবী করীম ﷺ তাদেরকে মতামতকে সঠিক সাব্যস্ত করলেন এবং বললেন, (إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم

(عن قوس واحدة 'সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে বলে শুধু তোমাদের খাতিরেই আমি এরূপ করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যে, শত্রুদের নিজেদের মধ্যেই বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং এর ফলে তাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং প্রখরতা স্তিমিত হয়ে পড়ল। ঘটনাটি হল, বনু গাতফান গোত্রের নুয়াইম ইবনু মাসউদ ইবনু আমের আশজাঈ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি মুসলিম হয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতে পারেনি। সুতরাং আপনি আমাকে কোন আদেশ করুন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (إنما أنت رجل واحد، فخذّل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة) 'ব্যক্তি হিসেবে যেহেতু তুমি নিতান্তই একক সেহেতু কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের ঐক্যে ফাটল ধারানো এবং তাদের মনোবল নষ্ট করার মতো কোন কৌশল তুমি অবলম্বন করতে পার। কারণ, শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার ব্যাপারে এ সব কূটকৌশল অত্যন্ত মূল্যবান। যুদ্ধ অর্থ হচ্ছে কূটকৌশলের খেলা। এ প্রেক্ষিতে নুয়াইম তৎক্ষণাৎ বুন কুরাইযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

জাহেলিয়াত যুগে বনু কোরাইয়ার সঙ্গে নুয়াইমের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, আপনাদের এবং আমার মধ্যে যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, আপনারা অবশ্যই তার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। তারা বলল 'জী হ্যাঁ।'

নুয়াইম বললেন, 'তাহলে আপনারা এ কথাটাও অবশ্যই স্বীকার করবেন যে কুরাইশদের ব্যাপারটা আপনাদের ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ অঞ্চল আপনাদের নিজেদের। এখানে আপনাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ সব কিছুই রয়েছে। আরও রয়েছে পরিবার পরিজন। এ সব কিছু পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কুরাইম ও গাতফান এ দুই গোত্র এসেছে মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আর আপনারা হাত মিলিয়েছেন যুদ্ধ পিপাসু এমন দুই গোত্রের সঙ্গে এখানে যাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ কিংবা পরিবার পরিজন বলতে কিছুই নেই। এ কারণে, এখানে কোন সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকলে তার পদক্ষেপ নেবে, নচেৎ গোলমাল সৃষ্টি করে বিদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, এখানেই আপনাদের থাকতে হবে এবং মুহাম্মদ ﷺ থাকবে। আপনারা যদি তাঁর শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সাহায্য করেন তাহলে যে ভাবেই হোক তিনি অবশ্যই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।' নুয়াইমের মুখে এ কথা শোনা মাত্রই বুন কুরাইয়া সতর্ক হয়ে বলল, 'নুয়াইম! বলুন এখন কি করা যায়?' তিনি বললেন, 'যে পর্যন্ত কুরাইশ তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্ধক হিসেবে আপনাদের জিম্মায় না রাখবে আপনারা তাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না।'

বুন কুরাইযা বলল, 'আপনি অত্যন্ত সঙ্গত কথাই বলেছেন।'

এরপর নুয়াইম সোজা কুরাইশদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর বললেন, 'আপনাদের প্রতি আমার যে ভালবাসা এবং সুদিচ্ছা রয়েছে তা অবশ্যই আপনাদের বোধগম্য রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

তারা বলল, 'জী হ্যাঁ'।

নুয়াইম বললেন, 'বেশ তাহলে শুনুন, 'ইহুদীগণ মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তাদের স্বীকৃতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং এ কারণে তারা লজ্জিতও হয়েছে। বর্তমান তারা এ শর্তে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে যে, বন্ধক হিসেবে তারা আপনাদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক গ্রহণ করার পর মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট সমর্পণ করবে এবং এর মাধ্যমে অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘাটতি পূরণ করে নেবে। কাজেই ইহুদীগণ বন্ধক হিসেবে কুরাইশদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক চাইলেও কিছুতেই তা দেয়া যাবে না। এরপর নুয়াইম গাতফান গোত্রে গিয়ে কুরাইশদের নিকট যা বলেছিলেন তার পুনারাবৃত্তি করলেন। এতে তারাও সজাগ হয়ে উঠল।

এরপর শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাত্রিতে কুরাইশগণ ইহুদীগণের নিকট এ পয়গাম প্রেরণ করে যে, তাদের অবস্থা কোন সুবিধা জনক স্থানে নেই। ঘোড়া এবং উটগুলো মারা যাচ্ছে। অতএব, ওদিক থেকে আপনারা এবং এদিক থেকে আমরা উভয় দল এক সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর আক্রমণ পরিচালনা করি। এর উত্তরে ইহুদীগণ বলল, 'আজ শনিবার এবং আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে যারা এ দিবসে শরীয়তের আদেশ অমান্য করেছিল কিভাবে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের কিছু সংখ্যক লোককে বন্ধক হিসেবে আমাদের নিকট না রাখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব না।।

সংবাদ বাহক যখন ইহুদীদের নিকট থেকে এ উত্তর দিয়ে ফেরৎ এল তখন কুরাইশ এবং গাতফানগণ বলল, 'আল্লাহর কসম! নুয়াইমতো সত্যই বলেছিল।' কাজেই, তারা ইহুদীগণকে এ কথা বলে পাঠাল, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের হাতে কোন লোককে বন্ধক রাখব না। আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন এবং আমরা উভয় পক্ষ এক যোগে দুই দিক থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর বাহিনীকে আক্রমণ করি। এ কথা শুনে বনু কুরাইযার লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে বলল, 'আল্লাহর কসম! নুয়াইম তোমাদেরকে সত্যই বলেছিলেন।' এভাবে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার পথ বন্ধ হয়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে গেল। যার ফলশ্রুতিতে তাদের সাহস এবং মনোবল ভেঙ্গে পড়ল।

এ সময় মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিম্নলিখিত দুয়া করছিলেন :

(اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দোষক্রটি ঢেকে রাখুন এবং আমাদেরকে ভয়ভীতি এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নরূপ দুয়া করেছিলেন :

(اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم)

অর্থ : হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! এ সেনাবাহিনীকে পরাভূত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাভূত করুন এবং প্রকম্পিত করুন।[1]

অবশেষে আল্লাহ আপন রাসূল ﷺ এবং মুসলিমাদের দ'আ কবুল করে মুশরিকদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেন এবং মনোবল ভেঙ্গে দেন। অতঃপর তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ুর তুফান প্রেরণ করেন। যা তাদের তাবু উপড়িয়ে দেয়, মৃত পাত্রসমূহ উলটিয়ে দেয়, তাঁবুর খুঁটি সমূহ উৎপাটন করে ফেলে এবং সব কিছুকে তচনচ করে ফেলে। এর সঙ্গে প্রেরণ করেন ফেরেশ্‌তা বাহিনী যাঁরা তাদের অবস্থানকে নড়চড় করে দেন এবং অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেন।

সেই তীব্র শীতের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হোযায়ফা বিন ইয়ামান (رضي الله عنه)-কে প্রেরণ করেন মুশরিকদের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি যখন তাদের সমাবেম স্থলের নিকট পৌছেন তখন প্রত্যক্ষ করেন যে, প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁদের প্রস্তুতি পর্বপ্রায় সম্পন্ন। হোযায়ফা নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের ফেরৎ যাত্রা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। প্রভাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যক্ষ করেন যে, তাদের প্রত্যাবর্তনের ফলে ময়দান একদম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কোন প্রকার সাফল্য লাভ ছাড়াই গভীর অসন্তোষ এবং ক্রোধসহ মুসলিমগণের শত্রুদের আল্লাহ তা'আলা ফেরৎ পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একাকী যথেষ্ট হয়েছেন। মোট কথা এভাবে আল্লাহ আপন ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং নিজ সৈন্যদের ইজ্জত প্রদান করেছেন। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

---

[1] সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড

বিশুদ্ধ মতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে এবং মুশগিরকগণ আনুমানিক এক মাস যাবৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমগণকে অবরোধ করে রেখেছিল। প্রাপ্ত উৎসগুলোর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা প্রতিয়মান হয় যে, অবরোধ সূচিত হয়েছিল। শাওয়াল মাসে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল জুল কা'দা মাসে। ইতিহাসবিদ ইবনু সায়াদের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দিন খন্দক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সে দিনটি ছিল বুধবার এবং জুল কা'দা মাস শেষ হতে অবশিষ্ট ছিল সাত দিন।

আহযাব যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ ছিল না, বরং সেটা প্রকৃত পক্ষে স্নায়ুযুদ্ধ ছিল। এতে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং সর্ব সমক্ষে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরবের কোন শক্তির পক্ষেই মদীনার মুসলিমগণের ক্রমবিকাশমান এ শক্তিকে নিঃশেষ করা সম্ভব নয়। কারণ, আহযাব যুদ্ধের জন্য বিশাল বাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল এর চাইতে অধিক শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করা আমাদের সম্ভবপর ছিল না। এ জন্য আহযাব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহা ﷺ বলেন,

(الآن نغزوهم، ولا يغزونا، نحن نسير إليهم)

অর্থ : 'এখন থেকে আমরাই তাদের উপর আক্রমণ করব, তারা আমাদের উপর আক্রমণ করবে না। এখন আমাদের সৈন্যরা তাদের দিকে যাবে।' (সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৯০ পৃঃ)

غزوة بني قريظة

বনু কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধ প্রান্তর থেকে যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন সে দিন যোহরের সময় যখন তিনি উম্মু সালামা -এর গৃহে গোসল করছিলেন তখন জিবরাঈল আগমন করলেন এবং বললেন, 'আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন? ফেরেশ্‌তাগণ কিন্তু এখনো অস্ত্রশস্ত্র খোলেন নি। আমিও শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে সরাসরি এখানেই চলে আসছি। উঠুন এবং স্বীয় সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বনু কোরাইয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকুন। আমি অগ্রভাগ গিয়ে তাদের দূর্গসমূহে কম্পন সৃষ্টি করে তাদের অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার করে দিব।' রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সকল কথা বলার পর জিবরাঈল ( ) ফেরেশ্‌তাগণের দলভূক্ত হয়ে যাত্রা করলেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন যে যাঁরা শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর দণ্ডায়মান আছেন। তাঁরা আসরের সালাত পড়বেন বনু কোরায়যায় গিয়ে। এরপর ইবনু উম্মু মাকতুম -এর উপর মদীন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং আলী -এর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে বুন কুরাইযা অভিমুখে প্রেরণ করলেন। যখন তিনি বনু কুরাইযার দূর্গ সমূহের নিকট গিয়ে পৌঁছিলেন তারা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর গালিগালাজের বৃষ্টি বর্ষণ করছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজিরীন ও আনাসারদের একটি সুসংগঠিত দল নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বনু কুরাইযার 'আনা' নামক এক কূপের পাশে গিয়ে স্থাপন করলেন। অন্যান্য সাধারণ মুসলিমগণও যুদ্ধের ঘোষণা শুনে দ্রুতগতিতে বনু কুরাইযা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে আসর সালাতের সময় হয়ে গেল। তখন কেউ কেউ বললেন, 'আমাদের যেভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আমরা সেই ভাবেই কাজ করব। আমরা বনু কুরাইযায় গিয়ে আসর সালাত আদায় করব।' এ কারণে কেউ কেউ এশার পর আসর সালাত আদায় কনের।

কিন্তু কোন কোন সাহাবা এ কথাও বলেন, 'নাবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, সালাতের ব্যাপারে আমরা এই মত কিংবা পথ অবলম্বন করি। বরং তিনি এটাই চেয়েছিলেন যে, বিলম্ব না করে আমরা যেন বনু কুরাইযার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। যাঁরা এ ধারণা পোষণ করেছিলেন তাঁরা পথেই সময় মতো আসর সালাত আদায় করে নিয়েছিলেন। তবে ব্যাপারটি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হয় তখন তিনি এ প্রসঙ্গে কোন পক্ষকেই ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলেন নি।

যে প্রকারেই হোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম সৈন্যদল বনু কুরাইযা ভূমিতে গিয়ে পৌঁছিলেন এবং নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর বনু কুরাইযার দূর্গ সমূহকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং অশ্বের সংখ্যা ছিল ত্রিশটি।

বনু কুরাইযার ইহুদীগণ যখন আঁটষাট অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিপতিত হল তখন ইহুদী নেতা কা'ব বিন আসাদ তাদের সামনে তিনটি পরিবর্তনশীল প্রস্তাব উপস্থাপন করল। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে :

১. হয় ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বীনে প্রবেশ করে স্বীয় জানমাল এবং সন্তান সন্ততিরন ধ্বংস প্রাপ্তি থেকে রক্ষা করবে, এ প্রস্তাব উপস্থাপন কালে কা'ব বিন আসাদ এ কথাও বলেছিল যে, 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন প্রকৃতই একজন নাবী এবং রাসূল। অধিকন্তু তিনি হচ্ছেস সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা স্বীয় আল্লাহর কিতাবে অবগত হয়েছ।'

২. অথবা স্বীয় সন্তান সন্ততিগণকে স্বহস্তে হত্যা করব। অতঃপর তলোয়ার উত্তোলন করে নাবী ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হবে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করবে। পরিণামে হয় আমরা বিজয়ী হব, নতুবা সমূলে নিঃশেষ হয়ে যাব।

৩. অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাব কেরাম (রাঃ)-কে ধোঁকা দিয়ে শনিবার দিবস তাঁদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন যে, এ দিবসে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হবে না।

কিন্তু ইহুদীগণ এ তিনটি প্রস্তাবের একটিও মঞ্জুর করল না। তার ফলে কা'ব বিন আসাদ রাগান্বিত হয়ে বলল, 'মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করার পর তোমরা কেউই একটি রাতও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করনি।

এ প্রস্তাব তিনটি প্রত্যাখ্যানের পর বনু কুরাইযার সামনে শুধুমাত্র যে পথটি অবশিষ্ট রইল তা হল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করে আত্মসমর্পণ করবে এবং আপন ভাগ্য নির্ধাণের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেবে। কিন্তু তারা আরও ভেবে চিন্তে স্থির করল যে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে অর্থাৎ অস্ত্র সমর্পণের পূর্বে তাদের সঙ্গে সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ মুসলিমগণের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে। সম্ভবত এর মাধ্যমে অস্ত্র ত্যাগের ফলাফল সম্পর্কে তারা কিছুটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

এ প্রেক্ষিতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ মর্মে প্রস্তাব পাঠাল যে, 'আবু লুবাবাকে তাদের নিকট প্রেরণ করা হোক।' যেহেতু আবু লুবাবার সঙ্গে তারা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল সেহেতু তার সঙ্গে তাদের পরামর্শ করা প্রয়োজন। অধিকন্তু আবু লুবাবার বাগ-বাগিচা, সন্তান-সন্ততি এবং গোত্রীয় লোকেরা ছিল সেই অঞ্চলেরই বাসিন্দা।

যখন আবু লুবাবা সেখানে উপস্থিত হল তখন পুরুষগণ তাকে দেখে দৌড়ে তার নিকট এল এবং শিশু ও মহিলাগণ করুন কণ্ঠে ক্রন্দন শুরু করল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আবু লুবাবার অন্তরে ভাবাবেগের সৃষ্টি হল। ইহুদীগণ বলল, 'আবু লুবাবা! আপনি কি যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করি?'

বলল, 'হ্যাঁ' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দ্বারা কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করল, যার অর্থ ছিল হত্যা। কিন্তু তাৎক্ষনিকভাবে সে উপলব্ধি করল যে, ব্যাপারটি হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুস্পষ্ট খিয়ানত। এ কারণে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রত্যাবর্তন না করে সরাসরি মসজিদে নববীতে গিয়ে উপস্থিত হল এবং নিজেই নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে শপথ করল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তাকে না খোলা পর্যন্ত সে এ অবস্থাতেই থাকবে এবং আগামীতে কোন দিন বনু কোরাইয়ার ভূমিত প্রবেশ করবে না। এদিকে তার প্রত্যাবর্তনে বিলম্বিত হওয়ার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন। অতঃপর তিনি প্রকৃত ব্যাপারটি অবগত হয়ে বললেন,

(أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه)

'যদি সে আমার নিকট আসত তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কিন্তু যেহেতু সে নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেই এ কাজ করে বসেছে সেহেতু আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ তার তওবা কবুল না করছেন ততক্ষণ আমি তাকে বন্ধন মুক্ত করতে পারব না।'

এদিকে আবু লুবাবার কূটকৌশল জনিত গোপন ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও বনু কুরাইযা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং তিনি যা উপযুক্ত বিবেচনা করবেন না তারা নির্বিবাদে মেনে নেবে বলে স্থির করল। অথচ দীর্ঘকাল যাবৎ এ অবরোধের ধকল সহ্য করার মতো সামর্থ ও সহনশীলতা বুন কুরাইযার ছিল। কারণ এক দিকে যেমন তাদের নিকট প্রচুর খাদ্য ও পানীয় মজুদ ছিল, পানির ঝরণা এবং কূপ ছিল অন্যদিকে তেমনি মজবুত ও সুসংরক্ষিত দূর্গ ও ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমগণকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রক্ত

জমাটকারী শীত ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল এবং খন্দক যুদ্ধের প্রথমাবস্থা থেকেই অবিরাম যুদ্ধ ব্যস্ততার মধ্যে থাকার দরুন ক্লান্তির বিদ্বেষ অন্ত ছিল না। কিন্তু বনু কুরাইযার যুদ্ধ ছিল প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রসূত এক বিরোধ মূলক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন এর ফলে তাদের যুদ্ধোন্মাদনা এবং উদ্যম ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তাদের ক্রমবিলীয়মান এ উদ্যম ঐ সময় শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছিল যখন আলী ইবনু আবু তালিব এবং জোবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) তাদের দূর্গ তোরণের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আলী (রাঃ) বজ্র নিনাদে ঘোষণা করলেন যে, 'আল্লাহর সেনাগণ! আল্লাহ শপথ! আমি হয় সেই অমৃতের পেয়ালা থেকে পান করব যা হামযা করেছে আর না হয় এটা সুনিশ্চিত যে, এ দূর্গ জয় করব।'

আলী (রাঃ)-এর এ প্রাণপণ সংকল্পের কথা অবগত হয়ে বনু কুরাইযা তড়িঘড়ি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সমীপে নিজেদের সমর্পণ করে দিল যাতে তিনি তাদের জন্য যা সঙ্গত বলে বিবেচনা করবেন এরূপ একটি পন্থা অবলম্বন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুরুষদের বন্দী করার নির্দেশ প্রদান করায় মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারীর তত্ত্বাবধানে বনু কুরাইযার সকল পুরুষ লোককে বন্দী করা হল এবং মহিলা, শিশু ও পুরুষদের সযত্নে পৃথকভাবে রাখা হল। আওস গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আবেদন পেশ করল যে, 'বুন কায়নুকা' গোত্রের সঙ্গে আপনি যে আচরণ করেছেন তা আপনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন। আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, 'বনু কায়নুকা' গোত্র আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের হালীফ ছিলেন এবং এ সকল লোকজন আমাদের হালীফ আছেন। অতএব অনুগ্রহ করে তাদের উপর ইহসান করুন।'

নাবী করীম (ﷺ) বললেন,

(ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟)

'আপনারা কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন যে, আপনাদেরই এক ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে মীমাংসা করে দেবেন? তারা জবাব দিল,

(فذاك إلى سعد بن معاذ)

'এমনটি হলে আমাদের সন্তুষ্ট না হওয়ার কোনই কারণ নেই।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'ভালো কথা, এ ব্যাপারটি সা'দ বিন মুআয এর দায়িত্বে রইল।'

আওস গোত্রের লোকজন বলল, 'আমরা এর উপর সন্তুষ্ট আছি।'

অতঃপর সা'দ বিন মু'আযকে ডেকে পাঠানো হল। তিনি তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। সৈন্যদের সঙ্গে বনু কুরাইযায় আগমন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ, খন্দকের যুদ্ধে তাঁর হাতের শিরা কর্তিত হওয়ার ফলে তিনি আহত হয়েছিলেণ। তাঁকে একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির করা হয়। যখন তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছিলেন তখন গোত্রীয় লোকজন চতুর্দিকে থেকে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে থাকলেন, 'হে সা'দ! স্বীয় হালীফদের সাথে উত্তম ও কল্যাণকর মীমাংসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনাকে এ জন্যই বিচারক নির্বাচিত করেছেন যে, আপনি তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন। কিন্তু তিনি তাদের কথার উত্তরে না দিয়ে চুপচাপ রইলেন। কিন্তু লেকাজন এ ব্যাপারে তাঁকে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, 'এখন এমন এক সময় সমাগত যখন সা'দ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোন নিন্দুকের নিন্দার চিন্তা কিংবা ভয় করেন না। এ কথা শোনার পর কিছু লোক মদীনায় আসে এবং বন্দীদের মৃত্যু অনিবার্য বলে ঘোষণা করে।

এরপর সা'দ (রাঃ) যখন নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি ইরশাদ করলেন, (قومـــوا إلى سـيدكم)'স্বীয় নেতাকে এগিয়ে এস।' যখন তাঁকে অবতরণ করিয়ে আনা হল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন, 'হে সা'দ! এ সব লোকজন আপনার মীমাংসার উপর আস্থাশীল হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।'

সা'দ বললেন, 'আমার মীমাংসা কি এদের উপর প্রযোজ্য হবে?'

জবাবে লোকেরা বলল, 'জী হ্যাঁ'।

তিনি বললেন, 'মুসলিমগণের উপরেও কি?'

লোকেরা বলল, 'জী হ্যাঁ'।

তিনি আবারও বললেন, 'এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাদের উপরেও কি তা প্রযোজ্য হবে?' তাঁর ইঙ্গিত ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ অবতরণ স্থানের দিকে কিন্তু সম্মান ও ইজ্জতের কারণে মুখমণ্ডল ছিল অন্যদিকে ফেরানো।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার উপরেও হবে।'

সা'দ বললেন, 'তাহলে তাদের সম্পর্কে আমার বিচারের রায় হচ্ছে এই যে, পুরুষদের হত্যা করা হোক, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হোক এবং সম্পদ সমূহ বন্টন করে দেয়া হোক।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات) 'আপনি তাদের ব্যাপারে ঠিক সেই বিচারই করেছেন যেমনটি করেছেন আল্লাহ তা'আলা সাত আসামানের উপর।'

সা'দের এ বিচার ছিল অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। কারণ, বনু কুরাইযা মুসলিমগণের জীবন মরণের জন্য অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে যা করতে চেয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময়। অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি জঘন্য অপরাধও তারা করেছিল। অধিকন্তু, মুসলিমগণকে নিঃশেষ করে ফেলার জন্য তারা দেড় হাজার তরবারী দুই হাজার বর্শা, যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী তিন শত লৌহবর্ম এবং পাঁচ শত প্রতিরক্ষা ঢাল সংগ্রহ করে রেখেছিল। পরবর্তী কালে সেগুলো মুসলিমগণের অধিকারে আসে।

এ সিদ্ধান্তের পর রাসূলে করীম ﷺ-এর নির্দেশে বনু কুরাইযা গোত্রের লোকজনকে মদীনায় এনে বনু নাজ্জার গোত্রের হারেশের কন্যার বাড়িতে তাদের আবদ্ধ করে রাখা হয়। অতঃপর মদীনার বাজারে একটি পরিখা খনন করে বন্দীদের এক একটি দলকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শিরঃচ্ছেদ করা হয়। এহেন অবস্থায় নিপতিত অবশিষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় বন্দীগনণ যখন স্বীয় নেতা কা'ব বিন আসাদের নিকট জানতে চাইল যে, 'যাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে।'

সে বলল, 'এতটুকু উপলব্ধি করার মতো সাধারণ বোধও কি তোমাদের নেই। তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা আর ফিরে আসছে না। কোন অনুরোধকারীর অনুরোধ রক্ষা করা হচ্ছে না। আল্লাহর শপথ! হত্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই হচ্ছে না।'

এভাবে বন্দীদের সকলের (যাদের সংখ্যা ছয় এবং সাত শতের মধ্যবর্তী ছিল) শিরচ্ছেদ করা হয়।

উল্লেখিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিপক্ক অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করে ফেলা হয়। মুসলিমগণকে নিংশেষ করে ফেলার উদ্দেশ্যে তাঁদের দুঃখ দুর্দশা ও দারুন দুঃসময়ে শত্রুদের সাহায্য দান করে তারা যে জঘন্য যুদ্ধ অপরাধ করেছিল তাতে তারা যথার্থই প্রাণদণ্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

বনু কুরাইযার ন্যায় বনু নাযীর গোত্রের নিকৃষ্ট শয়তান ও আহযাব যুদ্ধের বড় অপরাধী হুয়াই বিন আখতাব ও তার নানা অন্যায় অত্যাচারের কারণে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছিল। এ ব্যক্তি উম্মুল মু'মিনীন কারণে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছিল। এ ব্যক্তি উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়ার (রাঃ)-এর পিতা ছিল। কুরাইশ এবং গাতফানদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন বনু কুরাইযাকে অবরোধ করা হয় এবং তারা দূর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে তখন বনু কুরাইযার সঙ্গে হুয়াই বিন আখতাবও দূর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। কারণ, আহযাব যুদ্ধের সময় এ ব্যক্তি যখন কা'ব বিন আসাদকে বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিল তখন সে অঙ্গীকার করেছিল তখন চলছিল সে অঙ্গীকারেরই বাস্তবায়ন।

তাকে যখন খিদমতে নববীতে নিয়ে আসা হল তখন সে এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রেখেছিল। এ পোষাককে সে নিজেই প্রত্যেক দিক থেকে এক এক আঙ্গুল করে চিরে রেখেছিল যাতে তাকে

লুণ্ঠিত মালামালের মধ্যে গণ্য করা না হয়। তার হাত দুটি গ্রীবার পেছন দিকে দড়ি দ্বারা একত্রে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে রাসূলে করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি আপনার শত্রুতার জন্য নিজে নিজেকে নিন্দা করি নি। কিন্তু যে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পরাজিত হয়।'

অতঃপর লোকজনকে সম্বোধন করে বলল, 'ওহে লোকেরা আল্লাহর ফায়সালায় কোন অসুবিধা নেই। এটাতো ভাগ্যের লিখিত ব্যাপার। এটি হচ্ছে এক বড় হত্যাকণ্ড যা বনু ইসরাইলের উপর আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।' এরপর সে বসে পড়ল এবং তার গলা কেটে দেয়া হল।

এ ঘটনায় বনু কুরাইযার এক মহিলাকেও হত্যা করা হয়। সে খাল্লাদ বিন সোওয়ায়েদ (رضي الله عنه)-এর উপর যাঁতার একটি পাট নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করেছিল। তাই এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিদান হিসেবেই তাকে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ প্রদান করেন যে, যাদের নাভির নিম্নদেশের লোম গজিয়েছে তাদের হত্যা করা হোক । আতিয়া কোরাযীর তখনো সে লোম গজায়নি যার ফলে তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয়। পরবর্তী কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে অন্যতম সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সাবেত বিন কায়েস, যোবায়ের বিন বাতা এবং তার পরিবার বর্গকে তাঁকে হেবা করে (দান) দেওয়ার জন্য আবেদন পেশ করেন। এর কারণ হল, যোবায়ের সাবেতের উপর কিছু ইহসান করেছিল। তার আবেদন মঞ্জুর করে যোবায়ের এবং তার পরিবার বর্গকে তাকে দিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর সাবেত বিন কায়েস যোবায়েরকে বলেন যে, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে এবং তোমার পরিবারবর্গকে আমার অনুরোধ আমাকে দিয়ে দিয়েছেন।

এখন আমি সকলকে তোমার হাওয়ালা বা জিম্মার প্রদান করছি। (অর্থাৎ তুমি তোমার পরিবার পরিজন সহ মুক্ত)। কিন্তু যোবায়ের বিন বাতা যখন জানতে পারল যে তার গোত্রীয় সকলকেই হত্যা করা হয়েছে তখন সে বলল, 'সাবেত তোমার উপর আমি যে ইহসান করেছিলাম তাকেই মাধ্যম করে আমি বলছি যে, তুমিও আমার উপর একটু ইহসান করো অর্থাৎ আমার গোত্রীয় ভাইদের ভাগ্যে যা ঘটেছে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটতে দাও। এ প্রেক্ষিতে তার শিরচ্ছেদ করে তাকেও তার গোত্রীয় ইহুদী ভাইদের দলভূক্ত করে দেয়া হয়। তবে সাবেত যোবায়ের বিন বাতার সন্তান আব্দুর রহমানকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন।

অনুরূপভাবে বনু নাজ্জারের একজন মহিলা উম্মুল মুনযির সালমা বিনতে কায়েস আরজী পেশ করল যে, সামওয়াল কোরাযীর সন্তান রেফায়াকে তাঁর জন্য হেবা করা হোক। তাঁর আরজী গ্রহণ করে রেফায়াকে তাঁর নিকট সমর্পণ করা হয়। এভাবে রেফায়াকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। পরে রেফায়া ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন।

বনু কুরাইযার আরও কিছু সংখ্যক লোক অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপণ ও আত্মসমর্পণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই, তাদের জীবন, ধনসম্পদ ও সন্তানাদি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। এ, রাত্রিতেই আমার নামক এক ব্যক্তি যে বনু কুরাইযার অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ না করে দূর্গ থেকে বাহির হয়ে। প্রহরীদের কমাণ্ডার মুহাম্মদ বিন আসলামা তাকে দেখে চিনতে পারেন এবং ছেড়ে দেন। পরে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

রাসূলে কারীম ﷺ বনু কুরাইযার ধন সম্পদের এ পঞ্চামাংশ বাহির করে নিয়ে বন্টন করে দেন। ঘোড়সওয়ারীদের তিন অংশ প্রদান করেন। এক অংশ আরোহীদের জন্য এবং দুই অংশ ঘোড়াগুলোর জন্য। যাঁরা পদব্রজে গমন করেছিলেন তাঁদের এক অংশ প্রদান করেন। কয়েদী এবং শিশুদেরকে সা'দ বিন যায়েদ আনসারীর তত্ত্বাবধানে নাজ্‌দ দেশে প্রেরণ করে তাদের বিনিময়ে ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে নেয়া হয়।

রাসূলে কারীম ﷺ বনু কুরাইযার মহিলাদের মধ্য থেকে রায়হানা বিনতে আমর বিন খানাফাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা হতে নাবী ﷺ ওফাত প্রাপ্তি পর্যন্ত রায়হানা তাঁর মালিকানাতেই

ছিলেন।[১] **কিন্তু কালবীর** বর্ণনামতে নাবী করীম ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে **আবদ্ধ হয়েছিলেন।** পরে বিদায় হজ্জ্ব পালন শেষে যখন তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জান্নাতুল বাকী নামাক কবরস্থানে কবরস্থ করেন।[২]

বনু কুরাইযা গোত্রের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর যখন চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেল তখন সৎ বান্দা সা'দ বিন মুআযের সে প্রার্থনা আল্লাহর দুরবারে গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশের সময় এসে গেল যার উল্লেখ আহযাব যুদ্ধের আলোচনায় এসেছে। তাই তার ক্ষত বিদীর্ণ হয়ে গেল। ঐ সময় তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। নাবী করীম ﷺ তাঁর জন্য মসজিদেই শিবির স্থাপন করে দিয়েছিলেন যাতে নিকটে থেকেই তাঁর সেবা শুশ্রূষা করা যায়। আয়শা (رضي الله عنها)-এর বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, তাঁর বিদীর্ণ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। মসজিদে বনু গেফার গোত্রের লোকজনের কয়েকটি শিবিরও ছিল। যেহেতু তাদের দিকে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল তারা দেখে বলল, 'ওহে শিবির ওয়ালা! এগুলো কি যা তোমাদের দিকে থেকে আমাদের দিক বয়ে আসছে? তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সা'দের ক্ষতস্থান হতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করলেন,

(اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)

সা'দ বিন মু'আয (رضي الله عنه)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠল।[৪] ইমাম তিরমিযী আনাস হতে **একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যা বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন যে, যখন সা'দ বিন মু'আয** (رضي الله عنه)-এর জানাযা **উঠানো হল তখন মুনাফিকগণ বলল, 'এর লাশ কতই না হালকা।** রাসূল করীম ﷺ বললেন,

(إن الملائكة كانت تحمله)

'আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ তাঁর লাশ উত্তোলন করেছিলেন।[৫]

বনু কুরাইযার অবরোধ কালে একজন মুসলিম শহীদ হন। তাঁর নাম ছিল খাল্লাদ বিন সোয়াইদ। তিনি ছিলেন সে সাহাবী যাঁর উপর বনু উকাশার ভাই আবু সেনান বিন মুহসিন এ অবরোধকালে মৃত্যু বরণ করেন।

যতদূর জানা যায় আবু লুবাবা ছয় রাত্রি পর্যন্ত খুঁটির সঙ্গে বাধা অবস্থায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রত্যেকবার সালাতের সময় তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিত। সালাত শেষে পুনরায় তিনি খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতেন। অতঃপর প্রত্যুষে তাঁর তওবা কবুল সম্পর্কে রাসূলুল্লা ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হয়। সে সময় নাবী করীম ﷺ উম্মু সালমা (رضي الله عنها)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবু লুবাবা বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালমা আপন গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'হে আবু লুবাবা! শুভ সংবাদ, সন্তুষ্ট হয়ে যাও আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। এ কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) তাঁর বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু রাসূল করীম ﷺ ছাড়া অন্য কারো হাতে বাঁধন খুলে নিতে তিনি অস্বীকার করলেন। তাই ফযরের সালাতের জন্য বাহির হয়ে নাবী করীম ﷺ যখন সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বাঁধন খুলে দেন।

এ যুদ্ধ সংঘটিত হল যিলকা'দ মাসে।[১] পঁচিশ দিন পর্যন্ত বনু কুরাইযা অবরোধ স্থায়ী থাকে। সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা খন্দকের যুদ্ধ এবং বনু কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং এ দুই যুদ্ধের

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃঃ।

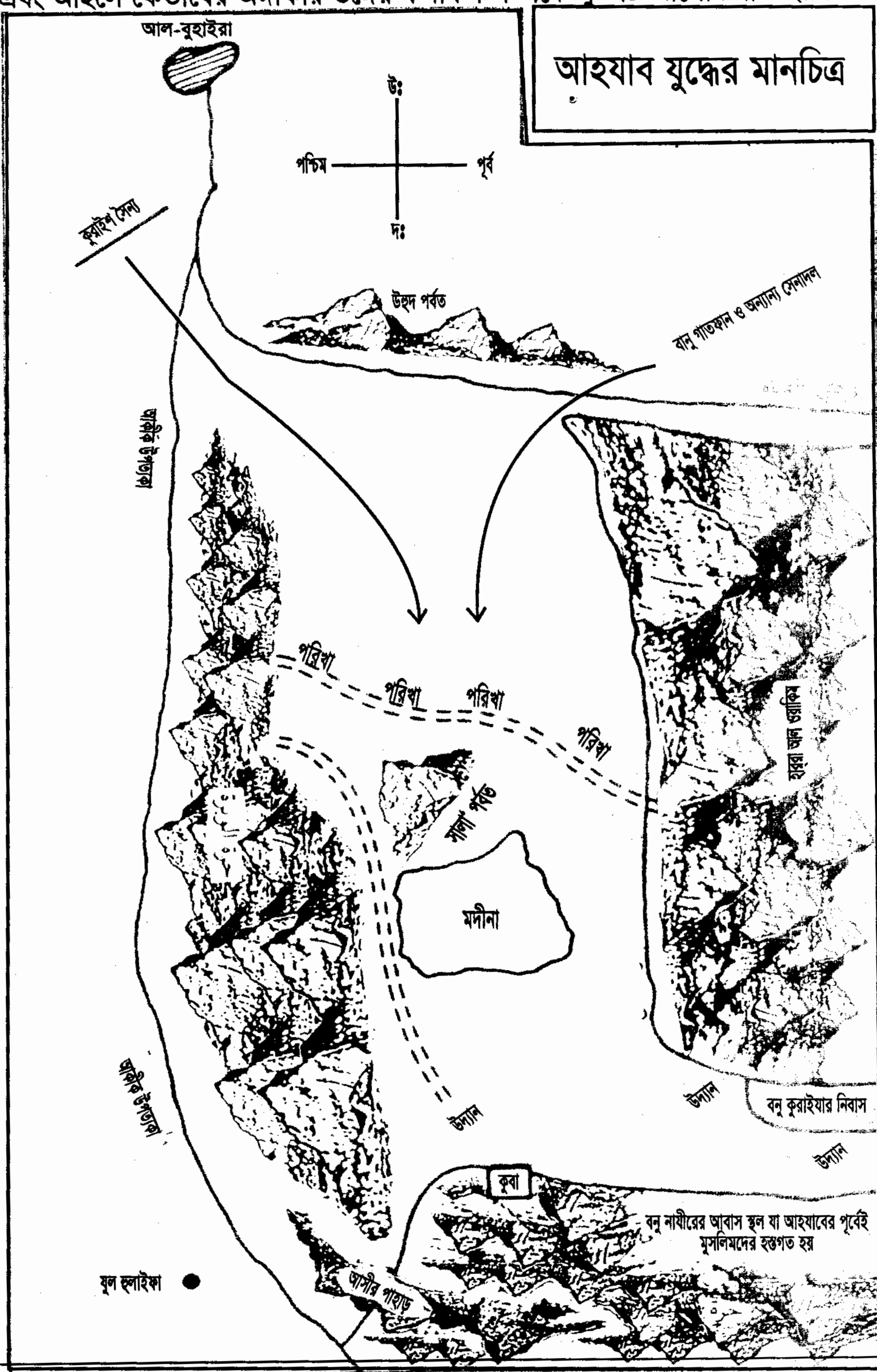
[2] তালকিহুল ফহুম ১২ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৯১ পৃঃ।

[4] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫৩৬ পৃ: সহীহ মসলিম ২য় খণ্ড ২৯৪ পৃঃ, এবং জামে তিরমিযী ২য় খণ্ড ২২৫ পৃঃ।

[5] জামে তিরমিযী ২য় খণ্ড ২২৫ পৃঃ।

বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন। মু'মিন ও মুনাফিকদের বিভিন্ন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এতে পাওয়া যায়। সূরা আহযাবের এ বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারীমা সমূহে শত্রুদের বিভিন্ন দলের ভাঙ্গন ও উদ্যমহীনতা এবং আহলে কেতাবের অঙ্গীকার ভঙ্গের ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়।



[1] ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃঃ, যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দ্রঃ ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৩৬-২৩৭ পৃঃ। সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৯১ পৃঃ, যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড।

النشاط العسكري بعد هذه الغزوة

এ (আহযাব ও কুরাইযা) যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাবলী

(১) সালাম বিন আবিল হুকাইকের হত্যা (مقتل سَلَّام بن أَبِي الْحُقَيْق) :

সালাম বিন আবিল হুকাইকের উপ নাম ছিল আবু রাফে'। ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ইহুদী প্রধানদের সে ছিল অন্যতম ব্যক্তি। মুসলিমগণের বিরুদ্ধে মুশরিকদের প্ররোচিত ও প্রলোভিত করার ব্যাপারে সে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করত এবং ধন সম্পদ ও রসদ সরবরাহ করে তাদের সাহায্য করত।[১] এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সর্বক্ষণ সে উদ্বাহু থাকত। এ কারণে মুসলিমগণ যখন বনু কুরাইযার সমস্যাবলী থেকে মুক্তি হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন তখন খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করার জন্য নাবী করীম ﷺ-এর অনুমতি প্রার্থী হলেন। যেহেতু ইতোপূর্বে আউস গোত্রের কয়েকজন সাহাবা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করেছিলেন সেহেতু খাযরাজ গোত্র ও অনুরূপ একটি দুঃসাহসিক কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁর অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে চাইলেন।

রাসূলে কারীম ﷺ তাঁদের অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, মহিলা এবং শিশুদের যেন হত্যা করা না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি লাভের পর পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল অভীষ্ট গন্তব্য অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। এরা সকলেই ছিলেন। খাযরায গোত্রের শাখা বনু সালমা গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। এঁদের দলনেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আতীক।

এ দলটি সোজা খায়বার অভিমুখে গেলেন। কারণ আবু রাফে'র দূর্গটি তথায় অবস্থিত ছিল। যখন তাঁরা দূর্গের নিকটে গিয়ে পৌঁছিলেন সূর্য তখন অস্তমিত হয়েছিল। লোকজনরা তখন গবাদি পশুর পাল নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল। আব্দুল্লাহ বিন আতীক তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করতে থাকে। আমি দরজার প্রহরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে এমন সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমে হয়তো দূর্গভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ সম্ভব হতে পারে। এরপর তিনি দরাজার নিকট গেলেন এবং মাথায় ঘোমটা টেনে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করলেন যাতে দেখলে মনে হয় যে, কেউ যেন প্রস্রাব কিংবা পায়খানার জন্য বসেছে। প্রহরী সে সময় চিৎকার করে ডাক দিয়ে বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা। যদি ভেতরে আসার প্রয়োজন থাকে তবে এক্ষুনি চলে এসো, নচেৎ আমি দরজা বন্ধ করে দিব।'

আব্দুল্লাহ বিন আতীক বলছেন, 'আমি সে সুযোগ দূর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম এবং নিজেকে গোপন করে রাখলাম। যখন লোকজন সব ভেতরে এসে গেল প্রহরী তখন দরজা বন্ধ করে দিবে চাবির গোছটি একটি খুঁটির উপর ঝুলিয়ে রাখল। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর যখন লক্ষ্য করলাম যে, সমগ্র পরিবেশটি নিশ্চুপ ও নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আমি চাবির গোছটি হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

আবু রাফে' উপর তলায় অবস্থান করছিল। সেখানেই তার পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। বৈঠক শেষে বৈঠককারীগণ যখন নিজ নিজ স্থানে চলে গেল তখন আমি উপর তলায় উঠে গেলাম। আমি যে দরজা খুলতাম ভেতর থেকে তা বন্ধ করে দিতাম। আমি এটা স্থির করে নিলাম যে যদি লোকজনেরা আমার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অবহিত হয়েও যায় তবুও আমার নিকট তাদের পৌঁছিবার পূর্বেই যেন আবু রাফেকে হত্যা করতে পারি। এভাবে আমি তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সে পরিবার পরিজন এবং সন্তানাদি পরিবেষ্টিত অবস্থায় এক অন্ধকার কক্ষে অবস্থান করছিল। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে, সে কক্ষের ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করছে। এ কারণে আমি তার নাম ধরে ডাক দিলাম, 'আবু রাফে'।'

সে উত্তরে বলল, 'কে ডাকে?'

---

[1] ফতুহুলবারী ৭/৩৪৩ পৃঃ।

তৎক্ষণাৎ আমি তার কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করে দ্রুত অগ্রসর হলাম এবং তরবারী দ্বারা জোরে আঘাত করলাম। কিন্তু আমার দৈহিক ও মানসিক বিস্তৃস্ত অবস্থাজনিত বিশৃঙ্খলার কারণে এ আঘাতে কোন ফল হল না বলে মনে হল। এদিকে সে জোরে চিৎকার করে উঠল। কাজেই, আমি দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম এবং অল্প দূরে এসে থেমে গেলাম। অতঃপর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে আবার ডাক দিলাম, 'আবু রাফে, এ কণ্ঠস্বর কেমন?'

সে বলল, 'তোমার মা ধ্বংস হোক। অল্পক্ষণ পূর্বে এ ঘরেই কে আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে।'

আব্দুল্লাহ বিন আতীক বললেন, 'আমি আবার প্রচণ্ড শক্তিতে তরবারী দ্বারা তাকে আঘাত করলাম। তার ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে থাকলাম। কিন্তু এতেও তাকে হত্যা করা সম্ভব হল না। তখন আমি তরবারীর অগ্রভাগে সজোরে তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। তরবারীর অগ্রভাগ তার পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এখন আমি স্থির নিশ্চিত হলাম যে, সে নিহত হয়েছে। তাই আমি একের পর এক দরজা খুলতে খুলতে নীচে নামতে থাকলাম। অতঃপর সিঁড়ির মুখে শেষ ধাপে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমি মাটিতে পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু কিছুটা অসাবধানতার সঙ্গে মাটিতে পা রাখতে গিয়ে আমি নীচে পড়ে গেলাম।

চাঁদের আলোয় আলোকিত ছিল চার দিক। নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের গোড়ালী গেল স্থানচ্যুত হয়ে। মাথার পাগড়ী খুলে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম পায়ের গোড়ালী। অতঃপর দরজা হতে দূরে গিয়ে বসে পড়লাম এবং মনে মনে স্থির করলাম যে, যতক্ষণ না ঘোষণাকারীর মুখ থেকে তার মৃত্যুর ঘোষণা শুনতে পাচ্ছি ততক্ষণ আমি এ স্থান পরিত্যাগ করব না।

মোরগের ডাক শুনে বুঝতে পারলাম, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় দূর্গ শীর্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, 'আমি হেজাযের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু রাফে'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। এ কথা শ্রবণের পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বললাম, 'আল্লাহ তা'আলা আবু রাফে'কে তার মন্দ কথাবার্তা ও মন্দ কাজের চূড়ান্ত বিনিময় প্রদান করেছেন। আবু রাফে' নিহত হয়েছে। চলো আমরা এখন এখান থেকে পলায়ন করি।'

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম এবং ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করলাম। ঘটনাটি অবগত হওয়ার পর তিনি বললেন, 'তোমার পা প্রসারিত কর।' আমার পা প্রসারিত করলে তিনি স্থানচ্যুত গোড়ালীটির উপর তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন। তাঁর হাত পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গেই এটা অনুভূত হল যে, ব্যথাবেদনা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু তাই নয়, ঐ স্থানে যে কোন সময় ব্যথা বেদনা ছিল সে অনুভূতিও যেন তখন ছিল না।[১]

এ হচ্ছে সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনা। ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, আবু রাফে'র ঘরে পাঁচ জন সাহাবীগণই (রাঃ) প্রবেশ করেছিলেন এবং তার হত্যার ব্যাপারে সকলেই সক্রিয় ছিলেন। তবে যে সাহাবী তরবারীর আঘাতে তাকে হত্যা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন উনায়েস।

এ বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাঁরা যখন রাত্রিতে আবু রাফে'কে হত্যা করেন এবং আব্দুল্লাহ বিন আতীকের পায়ের গোড়ালী স্থানচ্যুত হয়ে যায় তখন তাঁকে উঠিয়ে এনে দূর্গের দেয়ালের আড়ালে যেখানে ঝর্ণার নহর ছিল সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন।

এদিকে ইহুদীগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করে চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করে অনুসন্ধান চালাতে থাকল। অনেক অনুসন্ধানের পরও যখন তারা কোন খোঁজ না পেল তখন নিরাশ হয়ে নিহত ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করল। এ সুযোগে সাহাবীগণ আব্দুল্লাহ বিন আতীককে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর খিদমতে হাজির

---

[১] সহীহ বুখারী ২/৫৭৭ পৃঃ।

হলেন।[1] প্রেরিত এ ক্ষুদ্র বাহিনীটির সফল অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর যিকা'দা অথবা যিলহজ্জ মাসে।[2]

রাসূলে করীম ﷺ যখন আহযাব এবং বনু কুরাইযা যুদ্ধ হতে নিস্কৃতি লাভ করলেন এবং যুদ্ধাপরাধীর বিচার কাজ সমাধা করলেন তখন শান্তি শৃঙ্খলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী গোত্র সমূহ এবং বেদুঈনদের বিরুদ্ধে সংশোধীনী আক্রমণ পরিচালনা শুরু করলেন। এ পর্যায়ে তিনি যে সকল অভিযান পরিচালনা এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হল।

২. মুহাম্মদ বিন মাসলামার অভিযান (سرية محمد بن مسلمة) :

আহযাব ও বনু কুরাইযা সময় সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার পর এটাই ছিল প্রথম অভিযান। ত্রিশ জন মর্দে মু'মিনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এ অভিযাত্রী দলটি। এ অভিযান পরিচালনার্থে অভিযাত্রী দলটি প্রেরিত হয়েছিলেন নাজদের অভ্যন্তরে ভাগে বাকারাত অঞ্চলে যারিয়ার পার্শ্ববর্তী 'কারতা' নামক স্থানে। যারিয়া এবং মদীনার অবস্থান ছিল সাত রাত্রি দূরত্বের ব্যবধানে। অভিযাত্রীগণের এ অভিযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর ১০ই মুহার্‌রম। তাদের লক্ষ্যস্থলে ছিল বনু বকর বিন কেলাব গোত্রের একটি শাখা।

মুসলিমগণ অতর্কিত শত্রুদের আক্রমণ করলে তারা হতকচিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পলায়ন করে। তাদের পরিত্যক্ত ধন সম্পদ এবং গবাদি পশু সমূহ মুসলিমগণের হস্তগত হয়। সে সকল ধন সম্পদ এবং গবাদির পাল নিয়ে তাঁরা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা যখন মদীনায় প্রত্যাগমন করেন তখন মুহাররম মাসের মাত্র একদিন অবশিষ্ট ছিল। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা বনু হানীফার সরদার সুমামা বিন আসাল হানাফীকেও বন্দী করে নিয়ে আসেন। সে মোসায়লামা কাজ্জাবের নির্দেশে নাবী করীম ﷺ-কে হত্যা করার জন্য ছদ্মবেশে বাহির হয়েছিল।[3] কিন্তু অভিযানকারী সাহাবীগণ তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন এবং মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন।

এমতাবস্থায় নাবী করীম ﷺ যখন সেখানে আগমন করলেন তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে সুমামা! তোমার নিকট কি আছে?'

প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ ﷺ! আমার নিকট (কল্যাণ) ধন-সম্পদ রয়েছে। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর তবে প্রকৃতই একজন খুনী আসামীকে হত্যা করবে। আর যদি অনুগ্রহ কর তবে প্রকৃতই একজন গুনগ্রাহী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবে। পক্ষান্তরে যদি ধন-সম্পদ চাও তাহলে যা চাবে তাই পাবে।' তার মুখ থেকে এ সব কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ঐ একই অবস্থার মধ্যে রেখে চলে গেলেন।

অতঃপর নাবী করীম ﷺ যখন দ্বিতীয় বার সেখানে এসে উপস্থিত হলেন তখন উপরোক্ত প্রশ্নগুলোই তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরও দিল ঠিক পূর্বের মতোই। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একই অবস্থার মধ্যে রেখে চলে গেলেন। এরপর যখন তিনি তৃতীয় বার আগমন করলেন তখনো ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। সুমামা এবারও একই উত্তর প্রদান করলেন। তৃতীয় বার তার মুখ থেকে উত্তর শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ প্রদান করলেন তাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য।

তাঁরা তাকে মুক্ত করে দিলে সে মসজিদে নববীর নিকট একটি খেজুর বাগানে গেল। সেখানে গোসল করে পাক সাফ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর বলল, 'আল্লাহর শপথ! পৃথিবীর বুকে কোন মুখমুণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের চাইতে অধিক ঘৃনিত ছিল না, কিন্তু এ মুহূর্তে আমার নিকট আপনার মুখমুণ্ডলের চাইতে অধিক প্রিয় মুখমণ্ডল আর পৃথিবীতে নেই। সে আরও বলল, 'আল্লাহর শপথ!

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড, ২৭৪-২৭৫ পৃঃ।

[2] রহমাতুল্লিল আলামীন, ২য় খণ্ড ২২৩ পৃ: এবং আহযাব যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লেখিত অন্যান্য উৎস।

[3] সিরাতে হালবিয়া ২য় খণ্ড ২৯৭ পৃঃ।

ইতোপূর্বে পৃথিবীর বুকে আপনার প্রচারিত দ্বীন ছিল আমার নিকট সব চাইতে ঘৃনিত, কিন্তু এ মুহূর্তে আপনার দ্বীন আমার নিকট সব চাইতে প্রিয় এবং পবিত্র বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ অভিযানে প্রেরিত অভিযাত্রীগণ আমাকে এমন সময় গ্রেফতার করেছিল যখন আমি উমরাহ পালনের জন্য মনস্থির করছিলাম।

রাসূলে করীম ﷺ তাকে উমরাহ পালনের নির্দেশ এবং শুভ সংবাদ প্রদান করলেন। উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যখন সে কুরাইশদের অঞ্চলে পৌঁছিল তখন তারা তাকে বলল, 'হে সোমামা তুমিও বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?'

সোমামা বলল, 'না, বরং আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে বাই'আত হয়ে মুসলিম হয়েছি।' তিনি আরও বললেন, 'জেনে রাখ, আল্লাহর কসম! ইয়ামামা হতে তোমাদের নিকট গমের একটি দানাও আসবে না, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান না করবেন।' ইয়ামামা মক্কা বাসীগণের শস্য ভূমির মর্যাদা রাখত।

সুমামা দেশে ফিরে গিয়ে মক্কা অভিমুখী খাদ্যদ্রব্যের চালান বন্ধ করে দিলেন। এর ফলে মক্কাবাসীগণ খাদ্য সংকটজনিত অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলেন। এ প্রেক্ষিতে আত্মীয়তার সূত্র উল্লেখ করে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যাতে তিনি সুমামাকে খাদ্যদ্রব্য চালান বন্ধ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। রাসূলে করীম ﷺ সোমামাকে খাদ্যদ্রব্যের চালান বন্ধ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।[1]

৩. বনু লেহইয়ান যুদ্ধ (غزوة بني لَحْيَان) :

বুন লেহইয়ান গোত্রের লোকজনেরা প্রতারণার মাধ্যমে রাজী নামক স্থানে ১০ জন সাহাবা (রাঃ)-কে আটক করার পর আটজনকে হত্যা করেছিল এবং অবশিষ্ট দুই জনকে মক্কার মুশরিকগণের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিল। যেখানে কিন্তু তাঁদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অঞ্চলটি হেজাযের অভ্যন্তরে মক্কা সীমানার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল এবং যেহেতু এ মুসলিমগণের সঙ্গে কুরাইশ ও বেদুঈনদের সম্পর্কের একটা কঠিন টানাপোড়নের অবস্থা বিরাজমান ছিল সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ হেজাযের গভীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে বড় শত্রুদের নিকট যাওয়াকে সমীচীন মনে করেন নি।

কিন্তু কাফের মুশরিকগণ যখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং দলে ভাঙ্গন ধরার ফলে তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, রাজী নামক স্থানে লেহইয়ান গোত্রের লোকজনেরা সাহাবীগণকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময় সমাগত। কাজেই ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আওয়াল, মতান্তরে জুমাদালউলা মাসে দুই শত সাহাবী সমভিব্যাহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাযী অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইবনু উম্মু মাকতুমের উপর এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি শাম রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

অগ্রাভিযানের এক পর্যায়ে অভিযাত্রী দলসহ তিনি উমাজ এবং উসফান স্থল দ্বার মধ্যস্থলে অবস্থিত বাতনে গাররান নামক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। এখানেই বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা সাহাবীগণকে হত্যা করেছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি শহীদ সাহাবাগণের (রাঃ) জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে রহমতের প্রার্থনা করলেন। এদিক বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের সংবাদ অবগত হয়ে পর্বতশীর্ষ অতিক্রম করে পলায়ন করল ফলে তাদের কাউকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হল না।

রাসূলে করীম ﷺ তাঁর বাহিনীসহ বনু লেহইয়ান গোত্রের আবসস্থান দুই দিন অবস্থান করলেন, কিন্তু এ গোত্রের কোন লোকজনেরই খোঁজ খবর তিনি পান নি। দ্বিতীয় দিনের পর তিনি সেখান হতে উসফানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। সে স্থানে পৌঁছার পর তিনি দশ জন ঘোড়সওয়ারীকে কোরাউলগমীমেরদিকে প্রেরণ করেন। যাতে কুরাইশগণও নাবী করীম ﷺ-এর অভিযান সম্পর্কে অবগত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন

---

[1] যা'দুল মাআদ, ২য় খণ্ড ১১৯ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ২৯২-২৯৩ পৃঃ।

প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি। এভাবে মোট চৌদ্দ রাত মদীনার বাহিরে অতিবাহিত করার পর তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অব্যাহত সারিয়া ও অভিযানসমূহ (متابعة البعوث والسرايا) :

বনু লেহইয়ান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল ﷺ ক্রমান্বয়ে একের পর এক অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন। পরিচালিত সে সকল অভিযানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল:

গামরের অভিযান (سرية عُكَّاشَة بن مِحْصَن إلى الغَمْـر) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আওয়াল, মতান্তরে রবিউল আখের মাসে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে চল্লিশ জন সাহাবী (رضي الله عنهم)-এর সমন্বয়ে এক বাহিনী গামর অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ হচ্ছে বনু আসাদ গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম। মুসলিম বাহিনীল অগ্রাভিযানের সংবাদ অবগত হয়ে বনু আসাদ গোত্রের লোকজনেরা তাদের গবাদি পাল পেছনে রেখে প্রাণভয়ে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী তাদের পরিত্যক্ত দুই শত উট দিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

যুলকেসসার প্রথম অভিযান (سرية محمد بـن مَسْـلَمَة إلى ذي القَصَّـة) : উল্লেখিত ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আওয়াল কিংবা রবিউল আখের মাসে মুহাম্মদ বিন মাসলাম (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট এক সৈন্যদল জুলকেসসা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। ইহা বনু সা'লাবা নামক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। শত্রুদলের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক শত। শত্রুদল একটি গুপ্তস্থানে আত্মগোপন করে।

কিছুটা অসতর্ক অবস্থায় মুসলিম বাহিনী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন এমন সময় শত্রু বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ পরিচালন করে তাঁদের সকলকে হত্যা করে। শুধুমাত্র মুহাম্মদ বিন মাসলামা (رضي الله عنه) মারাত্মকভাবে আহত হয়ে কোন ভাবে প্রাণে বেঁচে যান।

যুলকেসসার দ্বিতীয় অভিযান (سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة) : বনু সা'লাবা অভিযানে শাহাদত প্রাপ্ত সাহবীগণের এ শোকাবহ ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বনু সা'লাবাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে রবিউল আখের মাসেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দাহ (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে যুলকেসসা অভিমুখে চল্লিশ সদস্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে এ বাহিনী বনু সা'লাবা গোত্রের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে অতর্কিত আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু বনু সা'লাবার লোকজনেরা দ্রুত গতিতে পর্বতশীর্ষে অতিক্রম করে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয় নি। তাঁরা শুধু এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিমগণের দলভূক্ত হয়ে যায়। কাজেই, বনু সা'লাবা গোত্রের পরিত্যক্ত গবাদি পশুর পাল নিয়ে মুসলিম বাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

জুমুম অভিযান (سرية زيد بن حارثة إلى الجَمُوم) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আখের মাসে যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে জমুম অভিমুখে এ বাহিনী প্রেরণ করা হয়। জুমুম হচ্ছে মাররায় যাহরানে (বর্তমান ফাতেমা উপত্যাকা) বুন সোলাইম গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম) যায়েদ (رضي الله عنه) তাঁর বাহিনীসহ সেখানে পৌঁছার পর পরই মুযাইনা গোত্রের হালীমা নাম্নী এক মহিলা তাঁদের হাতে বন্দিনী হয়। এ মহিলার নিটক হতে বনু সোলাইম গোত্রের নির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন তথ্য তাঁরা অবগত হন। বনু সোলাইমের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁরা বহু লোককে বন্দী করেন এবং অনেক গবাদী পশু তাঁদের হস্তগত হয়। যায়েদ এবং তাঁর বাহিনী এ সকল বন্দী ও গবাদি পশুসহ মদীনা প্রত্যবর্তন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মুযাইনী গোত্রীয় বন্দিনী মহিলাকে মুক্ত করার পর তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

ঈস অভিযান (سرية زيد إلى العِـيص) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে যায়েদ বিন হারেসের নেতৃত্বে ঈস অভিমুখে এক বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ বাহিনীতে ছিলেন এক শত সত্তর জন ঘোড়সওয়ারী মর্দে মুজাহিদ। এ অভিযানকালে এক কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার কিছু সম্পদ মুজাহিদ বাহিনীর হস্তগত হয়। এ কুরাইশ বাণিজ্য

কাফেলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা আবুল আসের নেতৃত্বোধীনে ভ্রমণরত ছিল। আবুল আস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

কাফেলার সম্পদসমূহ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হওয়ায় গ্রেফতার এড়ানো এবং মালপত্র ফেরত পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মদীনা অভিমুখে পলায়ন করেন এবং নাবী তনয়া যয়নাবের আশ্রয় গ্রহণ করে কাফেলার সকল সম্পদ যাতে ফেরত দেয়া হয় সে ব্যাপারে তার পিতাকে অনুরোধ করার জন্য তাঁকে বলেন। যয়নব পিতার নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলে কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকেই সকল সম্পদ ফেরত দানের জন্য সাহাবীগণকে নাবী করীম ﷺ নির্দেশ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক সাহাবায়ে কেরাম কাফেলার সকল সম্পদ ফেরত প্রদান করেন। সমস্ত ধন সম্পদসহ আবুল আস মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মালিকগণের নিকট সমস্ত মালামাল প্রত্যাবর্তন করার পর ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেন। পূর্বের বিবাহের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়ে যয়নবকে তার হাতে সমর্পণ করেন। সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।[1]

রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বের বিবাহের ভিত্তিতে এ জন্য তাঁর মেয়ে যয়নবকে সমর্পণ করেছিলেন যে ঐ সময় পর্যন্ত মুসলিম মহিলাদের উপর কাফের স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। অন্য এক হাদীসে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নতুন বিবাহের মাধ্যমে নাবী তনয়া যয়নবকে তাঁর স্বামীর নিকট সমর্পণ করা হয়েছিল। এটা অর্থ ও বর্ণনা পঞ্জী কোন হিসেবে সহীহ নয়।[2] অধিকন্তু এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, ছয় বছর পর তাঁকে সমর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু সনদ কিংবা অর্থগত কোন দিক দিয়েই এ হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয় না। বরং উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এ হাদীস দুর্বল। যাঁরা এ হাদীসের কথা উল্লেখ করেন তাঁরা অদ্ভুত রকমের দুই বিপরীতমুখী কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, ৮ম হিজরীর শেষভাগে মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবুল আস মুসলিম হয়েছিলেন। অথচ কেউ কেউ এ কথাও বলে থাকেন যে, ৮ম হিজরীর প্রথম ভাগে যয়নব মৃত্যুবরণ করেন। অথচ যদি এ কথা দু'টি মেনে নেয়া যায় তাহলে বিপরীতমুখী আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমতাবস্থায় আবুর আসের ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত করে তার মদীনা গমণের সময় যয়নব জীবিত থাকলেন কোথায় যে নতুন ভাবে বিবাহের ব্যবস্থা হবে কিংবা পুরাতন বিবাহের ভিত্তিতেই তাঁকে সমর্পণ করা হবে। এ বিষয়ের উপর আমি বুলুগুম মারাম গ্রন্থের টীকাতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। (ইতহাফুল কিরাম ফীতা'লীকি বুলুগিল হারাম)

বিখ্যাত মাগাযী বিশারদ মুসা বিন উকবাহর ঝোঁক এ দিকেই আছে যে, এ ঘটনা সপ্তম হিজরীতে আবু বাসীর এবং তার বন্ধুদের হাতে ঘটেছিল। কিন্তু এর অনুকূলে কোন বিশুদ্ধ অথবা যঈফ সমর্থন পাওয়া যায় না।

তরফ অথবা তরক অভিযান (سرية زيد أيضاً إلى الطَّـرِف أو الطَّـرِق) : এ অভিযানটিও সংঘটিত হয়েছিল জুমাদাল আখের মাসে। যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ বাহিনীটি প্রেরণ করা হয় তরফ অভিমুখে। এ স্থানটি ছিল বনু সা'লাবা গোত্রের অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর অগ্র যাত্রার সংবাদ অবগত হওয়া মাত্রই বেদুঈনরা সেস্থান থেকে পলায়ন করল। পলায়নরত বেদুঈনদের চারটি উট মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়েছিল। সেখানে চারদিন অবস্থানের পর তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বেদুঈনদের ভয় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই আগমন করছেন।

ওয়াদিল কুরা অভিযান (سرية زيد أيضاً إلى وادي القـري) : যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে এ অভিযানটিও পরিচালিত হয়। ১২ জন সাহাবীর সমন্বয়ে সংগঠিত হয়েছিল এ অভিযাত্রী দল। ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াদিল কুরা অভিযান। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া। কিন্তু

---

[1] সুনানে আবু দাউদ, শারহ আওনুল মাবুদ সহ। স্ত্রীর পরে মুসলিম হলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রত্যাবর্তণ অধ্যায়।

[2] এ দুটি আলোচনা সম্পর্কে তোহাফাতুল আহওয়াযী ২/১৯৫, ১৯৬ পৃঃ।

ওয়াদিল কোরার অধিবাসীগণ আকস্মিকভাবে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে ৯ জন সাহাবীকে হত্যা করে। শুধুমাত্র ৩ জন সাহাবী এ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। এ তিন জনের অন্যতম ছিলেন যায়েদ।[১]

খাবত অভিযান (سـرية الخَـبَط) : এ অভিযানের সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে ৮ম হিজরীর রজব মাস। কিন্তু হিসাব করে দেখা যায় যে এ অভিযান ছিল হোদায়বিয়ার পূর্বের ঘটনা। জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী করীম (ﷺ) এ অভিযানে তিনশত ঘোড়সওয়ারীর এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এ অভিযানের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয় আবু ওবায়দা বিন জারাহর (رضي الله عنه) উপর। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এক কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করা ও খোঁজ খবর সংগ্রহ করা। কথিত আছে যে, এ বাহিনী পরিচালন কালে অভিযাত্রীগণ চরম অনাহারে ও ক্ষুধার মধ্যে নিপতিত হন। খাদ্য সামগ্রীর সংস্থান করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে এক পর্যায়ে এ বাহিনীর সদস্যগণকে ক্ষুধা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে গাছের পাতা ভক্ষণ করতে হয়। এ প্রেক্ষিতেই এ অভিযানের নামকরণ হয়েছিল। 'খাবত অভিযান (ঝরানো পাতা সমূহকে খাবত বলা হয়)। অবশেষে এক ব্যক্তি তিনটি উট যবেহ করেন, অতঃপর তিনটি উট যবেহ করেন, পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় তিনটি উট যবেহ করেন। কিন্তু আরও উট যবেহ করার ব্যাপারে আবু ওবায়দা তাঁকে বাধা প্রদান করেন।

এর পরেই সমুদ্রবক্ষক হতে 'আম্বর' নামক এক জাতীয় একটি বিশালকায় উত্থিত মাছও নিক্ষিপ্ত হয়। অভিযাত্রীদল অর্ধমাস যাবৎ এ মস্য ভক্ষণ এবং এর দেহ নিসৃত তেল ব্যবহার করতে থাকেন। এ মৎস ভক্ষণের ফলে তাদের ঝিমিয়ে পড়া মাংস পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রগুলো পুনরায় সুস্থ ও সতেজ হয়ে ওঠে। আবু ওবায়দা এ মাছের একটি কাঁটা নেন এবং সৈন্যদলের মধ্যে সব চাইতে লম্বা ব্যক্তিটিকে সব চাইতে উঁচু উটটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই কাঁটার ঘোরের মধ্য দিয়ে যেতে বলেন এবং অনায়াসেই তিনি তা করেন। মৎসটির বিশালকায়ত্ব প্রমাণের জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা করেন।

সেই মৎসা দেহের প্রয়োজনারিক্ত অংশ বিশেষ সংরক্ষণ করে তা মদীনা প্রত্যাবগমনের সময় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে সেই মৎস্য বৃত্তান্ত পেশ করা হলে তিনি বলেন,

(هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمة شيء تطعمونا؟)

'এ হচ্ছে তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রদত্ত এক প্রকারের রুজী বা আহার্য। এর গোস্ত তোমাদের নিকট যদি আরও কিছু থাকে তাহলে আমাদেরকেও খেতে দাও। কিছুটা গোস্ত আমরা তার খিদমতে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।[২]

খাবত অভিযানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে। এর কারণ হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর মুসলিমগণ কোন কুরাইশ কাফেলার চলার পথে কোন প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করেন নি।

---

[1] রহামাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২২৬ পৃঃ। যা'দুল মাআদ ২য় খণ্ড ১২০-১২২ পৃঃ এবং তালকিহু ফুহুমি আললিল আসরের টীকা ২৮ ও ২৯ পৃঃ। এ অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬২৫-৬২৬ পৃঃ, সহীহ মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড ১৪৫-১৪৬ পৃঃ।

غزوة بني المُصطلق أو غزوة المريسيع

(في شعبان سنة ٥ أو ٦ هــ)

বানুল মুসতালিক যুদ্ধ বা গাযওয়ায়ে মোরাইসী'

(৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরী)

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে এ যুদ্ধের উল্লেখযোগ্যতা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের বিকাশ বৈশিষ্ট্য এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের কারণে এ যুদ্ধ ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধের ফলে ইসলামী সমাজে দারুণ চাঞ্চল্য এবং বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, মুনাফিকদের যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং অন্য দিকে এমনই শাস্তিমূলক বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ প্রদান করে। প্রথমে আমরা যুদ্ধের প্রসঙ্গ আলোচনা করব এবং পরে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনাবলী উপস্থাপন করব।

যুদ্ধ বিবরণবিদগণের মতে, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে।[1] ঘটনা সূত্রে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবগত হন যে বানুল মুসতালিক এর সর্দার হারেস বিন আবি যারার মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্বগোত্রীয় এবং অন্য আরবীয় লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বোরায়দা বিন হোসাইব আসলমীকে (রাঃ) তথ্যানুসন্ধান ও পরিস্থিতি যাঁচাইয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এ গোত্রে গিয়ে হারেস বিন জার্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করেন। তারপর ফিরে এসে নাবী করীম ﷺ-কে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন।

যখন নাবী করীম ﷺ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন তখন তিনি যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সাহাবীগণ (রাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন এবং অনতিবিলম্বে বাহিনী প্রেরিত হয়ে যায়। এ বাহিনী প্রেরণের দিনটি ছিল ২রা শাবান। এ যুদ্ধে মুসলিম প্রেরিত হয়ে যায়। এ বাহিনী প্রেরণের দিনটি ছিল ২রা শাবান। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে একটি মুনাফিকদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছিল এ ছিল প্রথম। এর পূর্বে আর কখনো মুনাফিক দল মুসলিমগণের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেনি। মদীনার তত্ত্বাবধানের জন্য নাবী করীম ﷺ যায়েদ বিন হারেসার উপর (কেউ কেউ বলেন আবু যারের উপর, অন্য এক দল বলেন নামীলাহ বিন আব্দুল্লাহ লায়সীর উপর) দায়িত্ব অর্পণ করেন। হারেস বিন জার্রার মুসলিম বাহিনীর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য একজন গোয়েন্দা প্রেরণ করেছিল। কিন্তু মুসলিমগণ তাকে গ্রেফতার করার পর হত্যা করেন।

হারেস বিন আবু জার্রার এবং তার বন্ধু ও সহচরগণ যখন অবগত হল যে, মুসলিমগণ তাদের প্রেরিত গোয়েন্দাকে হত্যা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছেন তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। যে সকল বেদুঈন তাদের সঙ্গে ছিল তারাও সকলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। যে সকল বেদুঈন তাদের সঙ্গে

---

[1] কারণ, ইবনু ইসহাকের মতে ইমাম যুহরী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ হতে। আর উৎবাহ বর্ণনা করেছেন আয়শা (রাঃ) হতে। তবে এতে সা'দ বিন মু'আযের পরিবর্তে উসাইদ বিন হুযাইরের উল্লেখ রয়েছে। অতএব ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনু হাযম বলেছেন যে, এটাই হচ্ছে সঠিক এবং সা'দ বিন মু'আযের উল্লেখ হয়েছে ভুলক্রমে। (যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড ১১৫ পৃঃ)।

লেখক বলেছেন যে, যদিও প্রথম পক্ষের দলীল বিশেষ নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে, (আর এ জন্যই প্রথম দিকে আমরাও তাদের সঙ্গে একমত ছিলাম) কিন্তু সুক্ষ্মভাবে চিন্তা ভাবনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এ দলীলের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে 'নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে যয়নব (রাঃ)-এর বিবাহ ৫ম হিজরীর শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয়।" অথচ উহার পক্ষে কতকগুলো প্রতীকি কারণ ছাড়া পূর্ণ কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই।অন্যদিকে ইফকের ঘটনা এবং ইহার পরে সা'দ ইবনু মুআযের (মৃত ৫ম হিজরী) উপস্থিতি যা একাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তাকে ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করা অবশ্যই একটি কঠিন ব্যাপার। এ প্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে বিষয়টি এভাবে সামাঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, যয়নব (রাঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪র্থ হিজরীর শেষভাগে কিংবা ৫ম হিজরীর ১ম ভাগে, যেমনটা কোন বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। আর ইফকের ঘটনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুসতালিক যুদ্ধ ৫ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

ছিল তারাও সকলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুরাইসী,[১] নামক ঝরণা পর্যন্ত যখন অগ্রসর হলেন তখন বনু মোসতালেক গোত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

রাসূলে করীমও ﷺ যুদ্ধ প্রস্তুতি হিসেবে তাঁর সাহাবগণ (رضي الله عنه)-কে সারিবদ্ধ করে নিলেন। পুরো বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এবং আনসারদের বিশেষ পতাকাটি ছিল সা'দ বিন উবাদাহ (رضي الله عنه)-এর হাতে। কিছুক্ষণ উভয় দলের মধ্যে কিছু তীর বিনিময়ে হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালন করে সহজে বিজয় অর্জন করেন। মুশরিকগণ পরাজিত এবং কিছু সংখ্যক নিহত হল। মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হল। ছাগল ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগুলো মুসলিমগণের অধিকারে এল। মুসলিমগণের পক্ষে মাত্র একজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। একজন আনসার সাহাবী ভুলক্রমে তাঁকে শত্রু ভেবে আঘাত করেছিলেন।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে চরিতকারদের বর্ণনা এরূপ। কিন্তু আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম লিখেছেন যে, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ, বনু মুসতালিকের সঙ্গে মুসলিমগণের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। বরং মুসলিম বাহিনী ঝর্ণার ধারে বনু মুসতালিকের উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করে মহিলা ও শিশুদের আটক করেন এবং সম্পদ ও চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম ﷺ তাঁর বাহিনী সহ যখন আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন, তখনও বনু মুসতালিক অসতর্ক অবস্থায় ছিল। হাদীস শেষ পর্যন্ত ।[২]

ধৃত শত্রুদের মধ্যে জোওয়াইরিয়াও (رضي الله عنه) ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেস বিন আবি যার্রারের কন্যা। বন্টনের সময় তিনি সাবেত বিন কাইসের অংশে পড়েন। সাবেত তাঁকে মুকাতিব[৩] হিসেবে চুক্তিতে শর্তারোপ করেন। অতঃপর নাবী করীম ﷺ তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এ বিবাহের ফলশ্রুতিতে মুসলিমগণ বনু মুসতালিক গোত্রের এক শত পরিবারের লোকজনদের মুক্ত করে দেন এঁরা সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে এটা বলা হতে থাকল যে এঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ শশুর বংশের লোক।[৪]

ইহাই ছিল বনু মুসতালিক যুদ্ধের বিবরণ। অবশিষ্ট থাকে আরও কিছু ঘটনাবলী যা সংঘটিত হয়েছিল এ যুদ্ধে। তবে যেহেতু সে সবের মূল হোতা ছিল মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার বন্ধুগণ সেহেতু প্রথমে ইসলামী সমাজের মধ্যে তাদের কার্যকলাপের কিছু কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ এবং পরে সে সবের বিস্তাতি বিবরণ দেয়া হলে তা অর্থহীন কিংবা অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে না।

বনু মুসতালিক যুদ্ধের পূর্বে মুনাফিকদের রীতিনীতি (دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق) ঃ

ইতোপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় সাধারণভাবে মুসলিমগণের এবং বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের ব্যাপারটি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, আউস এবং খাযরাজ এ দুই গোত্রের নেতৃত্বের পদে তাঁকে বরণ করে নেয়ার জন্য যখন মুকুট তৈরি হচ্ছিল এমন এক ক্রান্তি লগ্নে তখন মদীনায় ইসলামের আলোক পৌঁছায় জনগণের মনোযোগ আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হল। এ কারণে এ ধারণাটি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই তাকে তার এ মান-সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন।

---

[1] মুরাইসী' কোদাইদ এর অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলের নিকট বনু মুসতালিক গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম।

[2] দ্রষ্টব্য সহীহ বুখারী, ইত্ক পর্ব ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ। ফতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৪৩১ পৃঃ।

[3] মুকাতির ঐ দাস বিংবা দাসীকে বলা হয় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বীয় মনিবকে দেয়ার চুক্তি সম্পাদান করে এবং এ অর্থ পরিশোধ করার পর স্বাধীন হয়ে যায়।

[4] যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১১২-১১৩ পৃঃ , ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৮৯, ২৯০, ২৯৪ ও ২৯৫ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তার এ বিদ্বেষমূলক মনোভাব এবং মনোকষ্ট হিজরতের প্রথম অবস্থাতেই সূচিত হয় এবং বেশ কিছুকাল যাবৎ তা অব্যাহত থাকে। কারণ, তখনো সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার একটি ঘটনা থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। সা'দ বিন উবাদার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখার জন্য একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় পথ চরছিলেন, এমনি সময়ে আব্‌দুল্লাহ বিন উবাই সহ কতগুলো লোক পথের ধারে আলাপ আলোচনায় রত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পথ চলতে দেখে সে তার নাকে কাপড় চাপা দিয়ে বলল, 'আমাদের উপর ধূলোবালি উড়িয়ো না।'

অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ যখন উপস্থিত লোকজনদের নিকট কুরআন শরীফ থেকে তেলওয়াত করলেন তখন সে বলল, 'আপনি আপন ঘরে বসেই এ সব করুন। এ সবের মধ্যে আমাদের জড়াবেন না।'[1]

কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলিমগণের অসামান্য সাফল্য প্রত্যক্ষ করার পর যখন ব্যাপারটি তার নিকট পরিস্কার হয়ে গেল যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করা খুবই বিপদ জনক হবে তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং মুসলিমগণের শত্রুই রয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল তার একটি বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। গোপনে গোপনে সে ইসলামী সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ইসলামের দাওয়াতী ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। শুধু তাই নয়, ইসলামের শত্রুদের সঙ্গেও সে ঘনিষ্ট সহযোগিতা ও আঁতাত গড়ে তুলতে থাকে। এক্ষেত্রে বনু কায়নুকার ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনু কায়নুকার ব্যাপারে সে অত্যন্ত বিবেকহীনতার পরিচয় দিয়েছিল (ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। একইভাবে সে উহুদের যুদ্ধেও শঠতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাদের কাতারে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ব্যাকুলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল (এ বিষয়টিও পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

এ মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিটি নানা ছল-চাতুরী-প্রতারণা ও ধূর্ততার মাধ্যমে রাসূলুলাহ ﷺ-কে বিরুদ্ধাচরণ করতেই থাকত। প্রত্যেক জুমআর দিনে খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে তিনি যখন আগমন করতেন তখন সে অযাচিতভাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে বলত, 'হে লোক সকল! তোমাদের মাঝে এ ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে মান সম্মান ও ইজ্জত দান করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তোমরা তাঁর হাতকে শক্তিশালী করবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে।' -এ সকল অযাচিত ও অর্থহীন কথাবার্তার পর সে বসে পড়ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পর উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা দান করতেন।

এভাবে তার ঔদ্ধত্য, অন্যায় আচরণ এবং নির্লজ্জতা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌছল উহুদ যুদ্ধের পর যখন জুমু'আর দিন উপস্থিত হল। কেননা, এ যুদ্ধের সময় অনন্ত শঠতা, কপটতা এবং প্রতারণামূলক ভূমিকা পালনের পরেও খুৎবার পূর্বে সে দাঁড়িয়ে সে সব কথার পুনারাবৃত্তি করতে থাকল যা ইতোপূর্বে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছিল। কিন্তু এবার উপস্থিত মুসলিম জনতা নির্বিবাদে তার এ সব কথা মেনে নিতে পারল না। চতুর্দিক থেকে তারা তার কাপড় টেনে ধরে বলল, 'ওহে আল্লাহর শত্রু, বসে পড়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুমি যে ভূমিকা পালন করেছ তারপর তুমি এর যোগ্য নও।'

বিক্ষুব্ধ লোকজনদের প্রতিবাদে সে বকবক করতে করতে মসজিদ পরিত্যাগ করল। মসজিদ পরিত্যাগকালে তার কণ্ঠ-নিঃসৃত এ প্রলাপ বাক্যগুলো সকলের শ্রুতিগোচর হল, 'আমি যেন এখানে কোন অপরাধী এসেছি। আমিতো তাঁরই সমর্থনে বলার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম।'

ভাগ্যক্রমে দরজায় একজন আনসারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক ! ফিরে চল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে দিবেন। সে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমি চাই না যে, তিনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

---

[1] ইবনু হিশম, ১ম খণ্ড, ৫৮৪ ও ৫৮৭ পৃ: সহীহ বুখারী ৯২৪ পৃ: সহীহ মুসলীম ২য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ।

এছাড়াও, ইবনু উবাই বনু নাযীর গোত্রের সঙ্গে ও গোপনে আঁতাতের মাধ্যমে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল।

আল-কুরআনের ভাষায় তাদেরকে বলা হয়েছিল :

﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ﴾ [الحشر: ١١]

'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব, আর তোমাদের ব্যাপারে আমরা কক্ষনো কারো কথা মেনে নেব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' [আল-হাশর (৫৯) : ১১]

অনুরূপভাবে খন্দকের যুদ্ধেও সে মুসলিমগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা চাঞ্চল্য ও ভীতি সঞ্চারের জন্য নানা কূট কৌশল প্রয়োগ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের নিম্ন বর্ণিত আয়াত সমূহে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন :

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً – وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً – وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً – وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً – قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً – قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً – قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً – أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً – يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً – [الأحزاب: ١٢–٢٠]

'আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল– আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়া'দা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- হে ইয়াসরিববাসী! তোমরা (শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না, কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল এই বলে নাবীর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই তাদের ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি শত্রুপক্ষ (মাদীনাহ নগরীর) চারদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করতো, অতঃপর তাদেরকে কুফুরীর আহ্বান করা হত, তবে তারা তাই করে বসত। তাতে তারা মোটেও বিলম্ব করত না। অথচ তারা ইতোপূর্বে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত ওয়া'দা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। বল, পলায়নে তোমাদের কোনই লাভ হবে না, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তাহলে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। বল, তোমাদেরকে আল্লাহ ('র শাস্তি) হতে কে রক্ষে করবে তিনি যদি তোমাদের অকল্যাণ

করতে চান অথবা তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে চান? তারা আল্লাহকে ছাড়া তাদের জন্য না পাবে কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদেরকে নিশ্চিতই জানেন কারা বাধা সৃষ্টিকারী আর কারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে- আমাদের কাছে এসো। যুদ্ধ তারা সামান্যই করে তোমাদের প্রতি কৃপণতার বশবর্তী হয়ে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে। অতঃপর বিপদ যখন কেটে যায় তখন ধনের লালসায় তারা তোমাদেরকে তীক্ষ্ম বাক্য-বাণে বিদ্ধ করে। এরা ঈমান আনেনি। এজন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিস্ফল করে দিয়েছেন, আর তা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। সম্মিলিত বাহিনী যদি আবার এসে যায়, তাহলে তারা কামনা করবে যে, যদি মরুচারীদের মধ্যে থেকে তারা তোমাদের সংবাদ নিতে পারত! তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ সামান্যই করত।' [আল-আহযাব (৩৩) : ১২-২০]

উল্লেখিত আয়াত সমূহে অবস্থা বিশেষ মুনাফিকদের চিন্তা ও ভাবধারা, কার্যকলাপ, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা এবং সুযোগ সন্ধান ও সুবিধা সম্পর্কে একটি পূনাঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে।

এত সব কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইহুদী, মুনাফিক, মুশরিকগণ এক কথায় ইসলামের শত্রুগণ এটা ভালভাবেই ওয়াকেফহাল ছিল যে, মুসলিমগণের বিজয়ের কারণ প্রাকৃতিক প্রাধান্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী কিংবা বাহিনীর লোকজনদের সংখ্যাধিক্য নয় বরং এর প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহর দাসত্বকরণ এবং একনিষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন যার দ্বারা পূর্ণ ইসলামী সমাজ সংগঠন সম্ভব হয়েছিল এবং এর ফলে দ্বীন ইসলামের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন পরিতৃপ্ত ও নিবেদিত। তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান ও মনে করতেন একমাত্র দ্বীনের কারণে। ইসলামের শত্রুগণ এটাও ভালভাবেই জানতে যে মুসলিমগণের উদারতার মূল উৎস ছিল, রাসূলুল্লাহ -এর সত্তা মুবারক যা মুসলিমগণের চরিত্র সম্পদ ও চরিত্র মাধূর্যের অলৌকিকত্বের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে ছিল সব চাইতে বড় আদর্শ।

অধিকন্তু, ইসলাম ও মুসলিমগণের শত্রুরা চার পাঁচ বছর যাবৎ শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সাধ্যমতো সব কিছু করেও যখন তার এটা উপলব্ধি করল যে, এ দ্বীন এবং অনুসারীগণকে অস্ত্রের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয় তখন তারা ভিন্ন পন্থা। অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকল। তাদের এ বিকল্প কৌশল হিসেবে তারা মুসলিমগণের শক্তি এবং শৌর্যবীর্যের প্রধান-চরিত্র সম্পদের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের হীন চক্রান্তের প্রথম লক্ষ্যস্থল নির্বাচন করল আল্লাহর নাবী -কে। কারণ, মুনাফিকরা মুসলিমগণের শ্রেণীতে ছিল পঞ্চম বাহিনী। মদীনায় বসবাস করার ফলে মুসলিমগণের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ তাদের ছিল। এ কারণে কূট কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে সহজভাবে প্রলুব্ধ করার সুযোগ ও তাদের ছিল। তাদের এ জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা শুরু করল ব্যাপক অপপ্রচার। মুনাফিকগণ তাদের এ প্রচারভিযানের দায়িত্ব তারা নিজেই নিয়েছিল অথবা তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আর এর নেতৃত্বের ভার স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন উবাই বহন করছিল।

যখন যায়েদ বিন হারেসা যয়নবকে তালাক প্রদান করেন এবং নাবী করীম তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন মুনাফিকগণ রাসূলুল্লাহর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করা ও অপপ্রচারের একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কারণ, তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথায় পোষ্য পুত্রকে প্রকৃত সন্তানের মর্যাদা ও স্থান দেয়া হতো এবং পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকে প্রকৃত পুত্রের স্ত্রী ন্যায় অবৈধ গণ্য করা হত। এ কারণে, নাবী করীম যখন যয়নবকে বিবাহ করলেন তখন তারা নাবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করে দিল।

এ বিবাহকে কেন্দ্র করে তারা নানা অলীক ও ভিত্তিহীন কাহিনী রচনা করে এবং জোর গুজব ছড়াতে থাকে। লোকে এমনটিও বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ জয়নবকে দেখা মাত্র তাঁর সৌন্দর্য্যে এমনভাবে আকৃষ্ট হল যে, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মন দেয়া নেয়া হয়ে গেল। যায়েদ এ খবর জানতে পাড়ল তখন সে যয়নবকে তালাক দিল।

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিবাহ করার ব্যাপারে মুনাফিকগণ তাদের অপ-প্রচারের আরও যে সূত্রটি আবিস্কার ও ব্যবহার করল তা হচ্ছে তাঁর পঞ্চম পত্নী। তাদের প্রশ্ন ছিল, কোরআন শরীফে যেখানে চারটির অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয় নি। সেক্ষেত্রে এ বিবাহ কিভাবে বৈধ হতে পারে? তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, যয়নব হচ্ছে নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছেলের (পোষ্য পুত্রের স্ত্রী)। তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এ বিবাহ ছিল অবৈধ এবং কঠিন পাপের কাজ।

মুনাফিকগণ এত জোরালোভাবে এ ঘৃণ্য কল্প কাহিনী প্রচার করতে থাকল যে, এর জের হাদীস এবং তফসীর কেতাবে এখন পর্যন্ত চলে আসছে। ঐ সময় এ সমস্ত অপ-প্রচার দুর্বল চিত্ত এবং সরলমন মুসলিমগণের অন্তরকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন। যার মধ্যে সন্দেহ ব্যাধিতে আক্রান্ত অন্তর সমূহের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। প্রাসঙ্গিক আয়াতে কারীমা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ প্রচারের ব্যাপকতা কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সূরা আহযাবের সূচনাই হয়েছিল এ আয়াতে কারীমা দ্বারা :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: ١]

'হে নাবী! আল্লাহ্কে ভয় কর, আর কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য কর না, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, মহাপ্রজ্ঞাময়।'

এ আয়াতে কারীমা ছিল মুনাফিকদের কার্যকলাপ ও কর্মাকাণ্ডের প্রতি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং তাদের চক্রান্তের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্বভাবজাত উদারতা এবং ধৈর্যের সঙ্গে মুনাফিকদের এ সকল অন্যায় আচরণ সহ্য করে আসছিলেন। সাধারণ মুসলিমগণও তাদের প্রতিহিংসা পরায়নতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে চলছিলেন। কারণ, তাঁদের নিকট বহুবার এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, মুনাফিকগণ আল্লাহর তরফ থেকেই মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে আসছে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল মাজীদে ইরশাদ করেছেন:

﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٦]

' তারা কি দেখে না যে, প্রতি বছরই তাদেরকে একবার বা দু'বার পরীক্ষায় ফেলা হয় (তাদের ঈমান আনার দাবী সত্য না মিথ্যা তা দেখার জন্য) তারপরেও তারা তাওবাও করে না, আর শিক্ষাও গ্রহণ করে না।' [আত-তাওবাহ (৯) : ১২৬]

বানুল মুস্তালিক গাযওয়ায় মুনাফিকদের কার্যকলাপ (دور المنافقين في غزوة بني المصطلق) :

যখন বানুল মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুনাফিকগণও এতে অংশ গ্রহণ করে তখন তারা ঠিক উহাই করেছিল নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেনত,

﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ [التوبة: ٤٧]

' তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃংখলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ৪৭]

অতএব, এ যুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দুটি সুযোগ তাদের হাতে আসে। তার ফলশ্রুতিতে তারা মুসলিমগণের মধ্যে বিভিন্ন রকম চঞ্চলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অপ-প্রচার চালাতে থাকে। তাদের প্রাপ্ত সুযোগ দুটির বিবরণ হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নেরূপ :

১. **মদীনা হতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের বহিস্কার প্রসঙ্গ :** বানুল মুস্তালিক গাযওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করতেছিলেন, এমন সময় কতগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে

আগমণ করে। আগমণকারীদের মধ্যে ওমর -এর একজন শ্রমিকও ছিল। তাঁর নাম ছিল জাহজাহ গেফারী। ঝর্ণার নিকট আরও একজন ছিল যার নাম ছিল সেনাম বিন অবর জোহানী। কোন কারণে এ দুজনের মধ্যে বাক বিতণ্ডা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জোহানী চিৎকার শুরু করে দেয়, 'হে আনসারদের দল! (আনসারী লোকজন) সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এস। অপরপক্ষে জাহজাহ্ আহ্বান করতে থাকে, 'ওগো মুহাজরীরেন দল! (মুহাজিরগণ) আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।'

রাসূলুল্লাহ এ সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করলেন এবং বললেন,

(أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها مُنتِنَة)

'আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছি অথচ তোমরা জাহেলী যুগের মত আচরণ করছ। তোমরা এ সব পরিহার করে চল, এ সব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।'

আব্দুল্লাহ বিন উবাই এ ঘটনা অবগত হয়ে ক্রোধে একদম ফেটে পড়ল এবং বলল, 'এর মধ্যেই এরা এ রকম কার্যকলাপ শুরু করেছে? আমাদের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা আমাদের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে এবং আমাদের সমকক্ষ হতে চাচ্ছে? আল্লাহর কসম! আমাদের এবং তাদের উপর সে উদাহরণ প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে যেমনটি পূর্ব যুগের লোকেরা বলেছেন যে, 'নিজের কুকুরকে লালন-পালন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট কর যেন সে তোমাকে ফাড়িয়ে খাইতে পারে।' শোন, আল্লাহর কসম! যদি আমি ফিরে যেতে পারি তাহলে দেখবে যে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিগণই নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের মদীনা থেকে বহিস্কার করেছে।'

অতঃপর উপস্থিত লোকজনদের লক্ষ্য সে বলল, 'এ বিপদ তোমরা নিজেরাই ক্রয় করেছে। তোমরা তাকে নিজ শহরে অবতরণ করেছ এবং আপন সম্পদ বন্টন করে দিয়েছ। দেখ! তোমাদের হাত যা কিছু আছে তা দেয়া যদ্ধি বন্ধ করে দাও তবে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।'

ঐ সময় এ বৈঠকে যায়েদ বিন আরকাম নামক এক যুবক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি মদীনায় ফিরে এসে তাঁর চাচাকে ঐ সমস্ত কথা বলে দেন। তাঁর চাচা তখন রাসূলুল্লাহ -কে সব কিছু অবহিত করেন। ঐ সময় সেখানে ওমর উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হুজুর আব্বাদ বিন বিশরকে নির্দেশ দিন, সে ওকে হত্যা করুক।'

রাসূলুল্লাহ বললেন, (فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا ولكن أَذِّنْ بالرحيل)

'ওমর! একা কি করে সম্ভব? লোকে বলবে যে, মুহাম্মদ নিজের সঙ্গী সাথীদের হত্যা করছে। না তা হতে পারে না তবে তোমরা যাত্রার কথা ঘোষণা করে দাও।'

সময় ও অবস্থাটা তখন এমন ছিল, যে সময়ে রাসূলুল্লাহ স্বস্থান পরিত্যাগ করতেন না। লোকজনেরা যাত্রা শুরু করেছে। এমনি সময়ে ওসাইদ বিন হোযাইর নাবী করীম -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে সালাম জানানোর পর আরজ করলেন, 'অদ্য এমন অসময়ে যাত্রা আরম্ভ করা হল।' নাবী বললেন, (أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟) 'তোমাদের সাথী (অর্থাৎ ইবনু উবাই) যা বলেছে, তার সংবাদ কি তুমি পাওনি? জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী বলেছে?' নাবী বললেন, (زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) 'তার ধারণা হচ্ছে, সে যদি মদীনায় ফিরে এসে তাহলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মদীনা থেকে বহিস্কার করে দেবে।'

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আপনি যদি চান তাহলে তাকে মদীনা থেকে বাহির করে দেয়া হবে। আল্লাহর শপথ! সে নিকৃষ্ট এবং আপনি পরম সম্মানিত।

অতঃপর সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! তার সঙ্গে সহনশীলতা ব্যবহার করুন। কারণ আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আপনাকে আমাদের মাঝে এমন এক সময় নিয়ে আসেন, যখন তার গোত্রীয় লোকেরা তাকে মুকুট

পরানোর জন্য মনিমুক্তা সমূহের মুকুট তৈরি করছিল। এ কারণে এখন সে মনে করছে যে আপনি তার নিকট থেকে তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন।

অতঃপর তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ দিবস এবং সকাল পর্যন্ত পূর্ণ রাত্রি পথ চলতে থাকেন এবং এমন কি পরবর্তী দিবস পূর্বাহ্নে ঐ সময় পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন যখন রৌদ্রের প্রখরতা বেশ কষ্ট দায়ক অনুভূতি হচ্ছিল। এর পর জায়গায় অবতরণ করে শিবির স্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গীগণ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভূমিতে দেহ রাখতে না রাখতেই সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। এ একটানা দীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, লোকজনেরা যেন আরামে বসে গল্প গুজব করার সুযোগ না পায়।

এদিকে আব্‌দুল্লাহ বিন উবাই যখন জানতে পারল যে যায়েদ বিন আরকাম তার সমস্ত কথাবার্তা প্রকাশ করে দিয়েছে তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হল এবং বলল যে, আল্লাহর শপথ! যায়েদ আপনাকে যে সকল কথা বলেছে আমি তা কখনই বলি নি এবং এমন কি মুখেও আনি নি।

ঐ সময় আনসার গোত্রের যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এখন ও নাবালক ছেলেই আছে এবং হয়তো তারই ভুল হয়েছে। সে ব্যক্তি যা বলেছিল হয়তো সে ঠিক ঠিক ভাবে তা স্মরণ রাখতে পারে নি।

এ কারণে নাবী ﷺ ইবনু উবাইয়ের কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'এর পর এ ব্যাপারে আমি এতই দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম যে ইতোপূর্বে আর কখনই কোন ব্যাপারে আমি এতটা দুঃখিত হই নি। সে চিন্তাজনিত দুঃখে আমি বাড়িতেই বসে রইলাম।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সূরা মুনাফিক নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করলেন যার মধ্যে উভয় প্রসঙ্গেরই উল্লেখ রয়েছে :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَكَاذِبُونَ - اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ
كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ - وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ
كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ - وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ - سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - هُمُ
الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ - يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

'মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যেবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আর এ উপায়ে তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা কতই না মন্দ! তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে। আর যখন তারা কথা বলে তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ

ভরে শুন, অথচ তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত (দেখন- সুরত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই না)। কোন শোরগোল হলেই তারা সেটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে (কারণ তাদের অপরাধী মন সব সময়ে শঙ্কিত থাকে- এই বুঝি তাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে গেল)। এরাই শত্রু, কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। এদের উপর আছে আল্লাহ্র গযব, তাদেরকে কিভাবে (সত্য পথ থেকে) ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে! তাদেরকে যখন বলা হয়, 'এসো, আল্লাহ্র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তুমি দেখতে পাও তারা সদম্ভে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কক্ষনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী জাতিকে কক্ষনো সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। তারা বলে- 'রসূলের সঙ্গী সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করো না, শেষে তারা এমনিতেই সরে পড়বে।' আসমান ও যমীনের ধন ভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। তারা বলে- 'আমরা যদি মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সম্মানীরা অবশ্য অবশ্যই হীনদেরকে সেখানে থেকে বহিষ্কার করবে।' কিন্তু সমস্ত মান মর্যাদা তো আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।' [আল-মুনাফিকূন (৬৩) : ১-৮]

যায়েদ বলেছেন, 'এর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং এ আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর বললেন, (إن الله قــد صـــدقك) 'আল্লাহ তা'আলা তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত করেছেন।'[1]

উল্লেখিত মুনাফিকদের সন্তানের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। সন্তান ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত সৎ স্বভাবের মানুষ এবং উত্তম সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পিতার নিকট থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান হলেন মদীনার দরজায়। যখন তার পিতা সেখানে গিয়ে পৌঁছেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনি এখান থেকে আর অগ্রসর হতে পারবেন না যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দিবেন। কারণ নাবী ﷺ প্রিয়, পবিত্র ও সম্মানিত এবং আপনি নিকৃষ্ট।' এরপর নাবী করীম ﷺ যখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন তখন পুত্র পিতার পথ ছেড়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ঐ ছেলেই রাসূল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বলে আরজ করলেন, 'আপনি তাক হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন। আল্লাহর কসম! আমি তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে আপনার খিদমতে এনে হাজির করব।'[2]

মিথ্যা অপবাদের ঘটনা (حـــديث الإفـــك) : উল্লেখিত যুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারটি। এ ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণের মধ্যে লটারী করে নিতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠত তাঁকে তিনি সফরে নিয়ে যেতেন। এ অভিযান কালে লটারীতে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নাম বাহির হয়। তদহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফরে যান।

অভিযান শেষে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করা হয়। শিবিরে থাকা অবস্থায় আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজ প্রয়োজনে শিবিরের বাহির গমন করেন। সফরের উদ্দেশ্যে যে স্বর্ণাহারটি তাঁর বোনের নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন এ সময় তা হারিয়ে যায়। হারানোর সময় হারের কথাটি তাঁর স্মরণেই ছিল না। বাহির থেকে শিবির ফিরে আসার পর হারানোর হারের কথাটি স্মরণ হওয়া মাত্রই তার খোঁজে তিনি পুনরায় পূর্বস্থানে গমন করেন। এ সময়ের মধ্যেই যাঁদের উপর নাবী পত্মির (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাওদা উটের পিটে উঠিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাঁরা হাওদা উঠিয়ে দিলেন। তাদের ধারণা যে, উম্মুল মু'মিনীন হাওদার মধ্যেই রয়েছেন। যেহেতু তাঁর শরীর খুব হালকা ছিল সেহেতু হাওদা হালকা থাকার ব্যাপারটি তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া করে নি। তাছাড়া, হাওদাটি

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ, ২য় খণ্ড ২২৭-২২৯ পৃঃ, ইবনু হিশমা ২য় খণ্ড ২৯০-২৯২ পৃঃ।

[2] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৯০-২৯২ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসারুস সীরাহ ২৭৭ পৃঃ।

দুই জনে উঠালে হয়তো তাদের পক্ষে অনুমান করা সহজ হতো এবং সহজেই ভুল ধরা পড়ত। কিন্তু যেহেতু কয়েক জন মিলে মিশে ধরাধরি করে হাওদাটি উঠিয়ে ছিলেন ব্যাপারটি অনুমান করার ব্যাপারে তাঁরা কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি।

যাহোক, হারানো হারটি প্রাপ্তির পর মা আয়শা আশ্রয়স্থলে ফিরে এসে দেখলেন যে পুরো বাহিনী ইতিমধ্যে সে স্থান পরিত্যাগ করে এগিয়ে গিয়েছেন। প্রান্তরটি ছিল সম্পূর্ণ জনশূণ্য। সেখানে না ছিল কোন আহ্বনাকারী, না ছিল কোন উত্তরদাতা। তিনি এ ধারণায় সেখানে বসে পড়লেন যে, লোকেরা তাঁকে যখন দেখতে না পাবেন তখন তাঁর খোঁজ করতে করতে এখানেই এসে যাবেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিরাজিত প্রজ্ঞাময় প্রভূ আল্লাহ তা'আলা আপন কাজে সদা তৎপর ও প্রভাবশালী। তিনি যে ভাবে যা পরিচালনা করার ইচ্ছা করেন সে ভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব, আল্লাহ তা'আলা বিবি আয়শার চক্ষুদ্বয়কে ঘুমে জড়িয়ে দেয়ায় তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর সফওয়ানি বিন মোয়াত্তাল এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি জাগ্রত হলেন। তিনি বলছিলেন, 'ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, রাসূলে করীম -এর স্ত্রী?'

সফওয়ান সেনাদলের শেষ অংশে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল একটু বেশী ঘুমানো। আয়শা -কে এ অবস্থায় দেখা মাত্রই তিনি চিনতে পারলেন। কারণ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। অতঃপর 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠরত অবস্থায় তিনি আপন সওয়ারীকে নাবী পত্নীর নিকট বসিয়ে দিলেন। আয়শা সওয়ারীর উপর আরোহণ করার পর তিনি তার লাগাম ধরে টানতে টানতে হাঁটতে থাকলেন এবং সর্বক্ষণ মুখে উচ্চারণ করতে থাকলেন ইন্না লিল্লাহি.......... ।

সফওয়ান ইন্নালিল্লাহ... ছাড়া অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করেননি। সাফওয়ান আয়শা -কে সঙ্গে নিয়ে যখন সৈন্যদলে মিলিত হলেন, তখন ছিল ঠিক খরতপ্ত দুপুর। সৈন্যদল শিবির স্থাপন করে বিশ্রামরত ছিলেন। আয়শা -কে এ অবস্থায় আসতে দেখে লোকেরা আপন আপন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নিরীখে ব্যাপারটি আলোচনা পর্যালোচনা করতে থাকলেন। সৎ প্রকৃতির লোকেরা এটাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করল। কিন্তু অসৎ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির লোকেরা এটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চিন্তা করতে থাকল নানা ভাবে। বিশেষ করে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল -এর দুশমন অপবিত্র খবিশ আব্দুল্লাহ বিন উবাই এটিকে পেয়ে বসল তার অপপ্রচারের একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে। সে তার অন্তরে কপটতা, হিংসা বিদ্বেষের যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রেখেছি এ ঘটনা তাকে ঘৃতাহুতির ন্যায় অধিকতর প্রভাবিত ও প্রজ্জ্বলিত করে তুলল। সে এ সামান্য ঘটনাটিকে তার স্বকপোলকল্পিত নানা আকার প্রচার ও রঙচঙে চিত্রিত ও রঞ্জিত করে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার শুরু করে দিল।

পুণ্যের তুলনায় পাপের প্রভাবে মানুষ যে সহজেই প্রভাবিহত হয়ে পড়ে এ সত্যটি আবারও অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এ অপপ্রচারে অনেকেই প্রভাবিত হয়ে পড়ল এবং তারাও অপপ্রচার শুরু করল। এমনি দ্বিধাদ্বন্ধ ও ভারাক্রান্ত মানসিকতা সম্পন্ন বাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। মুনাফিকেরা মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে আরও জোটবদ্ধ হয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিল।

এ অপবাদ ও অপপ্রচারের মুখোমুখী হয়ে রাসূলে করীম ওহীর মাধ্যমে এর সমাধানের আশায় নীরবতা অবলম্বন করলেন।

কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা সত্ত্বেও ওহী নাযিল না হওয়ায় আয়শা হতে পৃথক থাকার ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবা বর্গের সঙ্গে পরামর্শের ব্যবস্থা করলেন। আলী আভাষ ইঙ্গিতে তাঁকে পরামর্শ দিলেন তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য। কিন্তু উসামা ও অন্যান্য সাহাবীগণ শত্রুদের কথায় কান না দিয়ে আয়শা -কে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার পরামর্শ দিলেন।

এরপর আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কপটতা জনিত কষ্ট হতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ মিম্বরে উঠে, এক ভাষনের মাধ্যমে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে সা'দ বিন মোয়ায তাকে হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সা'দ বিন উবাদা (যিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের খাযরাজ গোত্রের নেতা

ছিলেন) গোত্রীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে খুব শক্তভাবে এর বিরোধীতা করার উভয়েরর মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে উভয় গোত্রের লোকেরাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক চেষ্টা করে উভয় গোত্রের লোকজনদের উত্তেজনা প্রশমিত করেন এবং নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক নাগাড়ে এক মাস যাবৎ অসুস্থতায় ভুগতে থাকেন। এ অপবাদ সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু তাঁর অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ কাছ থেকে যে আদর যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা পাওয়ার কথা তা না পাওয়ার তাঁর মনে কিছুটা অস্বস্তি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়ে যায়।

বেশ কিছু দিন যাবত রোগ ভোগের পর ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সুস্থতা লাভের পর পায়াখানা প্রস্রাবের এক রাত্রি তিনি উম্মু মেসতাহর সঙ্গে সন্নিকটস্থ মাঠে গমন করেন। হাঁটদে গিয়ে এক সময় উম্মু মেসতাহ তার চাদরের সঙ্গে জড়ানো অবস্থায় পা পিছলিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এ অবস্থায় সে তাঁর ছেলেকে গালমন্দ দিতে থাকে। আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ছেলেকে গালমন্দ দেয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলায় সে বলেন, আমার ছেলেও সে অপবাদ সম্পর্কিত অপপ্রচারে জড়িত আছে, বলে অপবাদের কথা আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে শোনান। আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা সে অপবাদ ও অপপ্রচার সম্পর্কে জানতে চাইলে উম্মু মেসতাহ তাঁকে সকল কথা খুলে বলেন। এভাবে তিনি অপবাদের কথা জানতে পারেন। এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি পিতা-মাতার নিকট গমন করলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিতরূপ অবগত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিরবচ্ছিন্ন কান্নার মধ্যে তাঁর দুই রাত ও এক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও তাঁর অশ্রুর ধারা বন্ধ হয় নি কিংবা ঘুমও আসেনি। তাঁর এ রকম একটা উপলব্ধি হচ্ছিল যে, কান্নার চোটে তাঁর কলিজা ফেটে যাবে। ঐ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তশরীফ আনয়ন করলেন এবং কালেমা শাহাদত সমন্বয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন,

(أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، ثم تاب إلى الله تاب الله عليه).

'হে আয়শা তোমার সম্পর্কে কিছু জঘণ্য কথাবার্তা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি এ কাজ থেকে পবিত্র থাক তাহলে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ করে এর সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ না করুন, তোমার দ্বারা যদি কোন পাপ কাজ হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহ তা'আলার সমীপে ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তওবা কর। কারণ, পাপ কাজের পর কোন বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে খালেস অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সমীপে তওবা করে তিনি তা কবুল করেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য শোনার পর আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অশ্রুধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর চোখে তখন এক ফোঁটা পানিও যেন অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে বললেন যে, তাঁদেরকে নাবী ﷺ-এর এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু জবাব দেয়ার মতো কোন ভাষাই যেন তাঁরা খুঁজে পেলেন না। পিতা-মাতাকে অত্যন্ত অসহায় ও নির্বাক দেখে আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনারা যে কথা শুনেছেন তা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং আপনারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এ কারণে, আমি যদি বলি যে, আমি সম্পূর্ণ পাক পবিত্র আছি এবং আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি পবিত্র আছি, তবুও আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন না। আর যদি আমি ঐ জঘন্য অপবাদকে সত্য বলে স্বীকার করে নি। অথচ আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, আমি তা থেকে পবিত্র আছি - তবে আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে যা ইউসূফ (عليه السلام)-এর পিতা বলেছিলেন।

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨].

'ধৈর্য ধারণই উত্তম পথ এবং তোমরা যা বলছ তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।' [ইউসুফ (১২) : ১৮]

এরপর আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঐ সময়ই রাসূলে করীম (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল আরম্ভ হয়ে গেল। অতঃপর যখন নাবী করীম (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিলে কঠিন অবস্থা অতিক্রান্ত হল তখন তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। এ সময় তিনি প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, (يا عائشة، أمـــا الله فقـــد بـــرأك) 'হে আয়শা! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর আম্মা বললেন, '(আয়শা!) উঠে দাঁড়াও এবং হুজুরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় সতীত্ব ও রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর ভালবাসার উপর ভরসা করে গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তো তাঁর সামনে দাঁড়াব না, শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করব।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কিত যে আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয় তা ছিল সূরা নূরের দশটি আয়াত।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ - لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ - وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ - يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

'১১. যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহা শাস্তি। তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না আর বলল না, 'এটা তো খোলাখুলি অপবাদ।' তারা চারজন সাক্ষী হাযির করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি সেহেতু আল্লাহ্র নিকট তারাই মিথ্যেবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যাতে তড়িঘড়ি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করত। যখন এটা তোমরা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট তা ছিল গুরুতর ব্যাপার। তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ! আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা আর কখনো এর (অর্থাৎ এ

আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, বড়ই হিকমাতওয়ালা। যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ দয়ার্দ্র, বড়ই দয়াবান।' [আন্-নূর (২৪) ১১-২০]

এরপর মিথ্যা অপবাদের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের অপরাধের দায়ে মিস্তাহ বিন আস্যাস, হাসসান বিন সাবেত এবং হামনা বিনতে জাহশকে আশি (৮০) দোররা কার্যকর করা হল।[1] তবে খবিস আব্দুল্লাহ বিন উবাই এ শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল। অথচ অপবাদ রটানোর কাজে জড়িত জঘন্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল সে প্রথমে এবং এ ব্যাপারে সব চাইতে অগ্রগামী ভূমিকা ছিল তারই। তাকে শাস্তি না দেয়ার কারণ হয়তো এটাই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাকে শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাকে এখন শাস্তি প্রদান করা হলে তার পরকালের শাস্তি হালকা হয়ে যাবে এ ধারণায় শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নি। কিন্তু অন্যান্য যাদের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয় তাদের পরকালীন পাপ ভার হালকা এবং পাপ সমূহের কাফ্ফারা হিসেবেই তা করা হয়। অথবা এমন কোন ব্যাপার এর মধ্যে নিহিত ছিল যে কারণে তাকে হত্যা করা হয় নি।[2]

এভাবে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সন্দেহ, আশঙ্কা, অশান্তি, অশুভ ও ব্যাকুলতার বিষবাষ্প থেকে মদীনার আকাশ বাতাশ পরিস্কার হয়ে উঠল। এর ফলশ্রুতিতে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই এতই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হল যে, সে তার দ্বিতীয়বার মস্তক উত্তোলন করতে সক্ষম হল না। ইবনু ইসহাক বলেছেন যে, এর পর যখনই সে কোন গণ্ডগোল পাকাতে উদ্যত হয় তখনই তার লোকজনেরা তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকত এবং বলপ্রয়োগ করে বসিয়ে দিত। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর (رضي الله عنه)-কে বললেন,

(كيف ترى يا عمر؟ أما والله لوقتلته يوم قلت لي: اقتله، لأرعدت له آنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته)

হে ওমর! এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কী? দেখ আল্লাহর শপথ! যে দিন তুমি আমার নিকট অনুমতি চেয়েছিলে সে দিন যদি আমি অনুমতি দিতাম আর যদি তুমি তাকে হত্যা করতে তাহলে এ জন্য অনেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু আজকে যদি সেই সব লোকদের আদেশ দেয়া হয় তাহলে তারাই তাকে হত্যা করবে।

ওমর (رضي الله عنه) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ভাল ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি যে, রাসূলে করীম ﷺ-এর ব্যাপারে আমার তুলনায় অনেক বেশী বরকতপূর্ণ।[3]

---

[1] ইসলামী শরীয়তে এরূপ বিধান আছে যে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেয় অথচ প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে আশি কোড়া মারতে হবে।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৩৬৪ পৃঃ, ২য় খন্ড ৬৯৬-৬৯৮ পৃঃ, যা'দুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১১৩-১১৫ পৃঃ. ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৯৭-৩০০ পৃঃ।

[3] ইকসু হিশাম ২য় খণ্ড ২৯৩ পৃঃ।

البعوث والسرايا بعد غزوة المُرَيْسِيع

গাযওয়ায়ে মুরাইসীর পরের সামরিক অভিযান সমূহ ঃ

১. দেয়ার বনু কালব অভিযান দুমাতুল জানদাল ক্ষেত্রে (سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدَوْمَـــة الجَنْدَل) :

৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে এ অভিযান প্রেরিত হয়। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দলনেতাকে সামনে বসিয়ে স্বীয় মুবারক হাতে তাঁর পাগড়ি বেঁধে দিয়ে অভিযানে উত্তম পন্থা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দান করেন। তিনি এ বলে তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন যে, (إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم) 'যদি তারা তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তাহলে তুমি তাদের সম্রাটের মেয়েকে বিয়ে করে নেবে। আব্দুর রহমান বিন আওফ গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর একাদিক্রমে তিন দিন যাবত ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন, ইসলামী জীবনধারার অলৌকিক বৈশিষ্ট্যগুলো এবং মুসলিমগণের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা মুসলিম হয়ে যায়। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন আওফ তামাজার বিনতে আসবাগকে বিয়ে করেন। ইনিই ছিলেন আব্দুর রহমানের পুত্র আবু সালামার মাতা। এ মহিলার পিতা স্বজাতির নেতা এবং বাদশাহ ছিলেন।

২. ফেদাক অঞ্চলে দেয়ারে বনু সা'দ অভিযান (سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفَدَك) :

৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানের কারণ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ সূত্রে অবগত হয়েছিলেন যে বনু সা'দ গোত্রের একটি দল ইহুদীদের সাহায্য করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। এর প্রতিকারার্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে দুই শত মর্দে মুজাহিদের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এঁরা রাত্রিতে ভ্রমণ করতেন এবং দিবাভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। অবশেষে শত্রুপক্ষের একজন গোয়েন্দা তাঁদের হাতে ধরা পড়ে। সে স্বীকার করল যে খায়বরের খেজুরের বিনিময়ে তারা সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে এ সংবাদও সংগৃহীত হল যে, বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা কোন জায়গায় অবস্থান করছে। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে মুসলিম বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে পাঁচশত উট ও দুই হাজার ছাগল হস্তগত করেন। তবে শিশু ও মহিলা সহ বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা পলায়ন করে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। তাদের নেতা ছিল অবর বিন আলীম।

৩. ওয়াদিল কোরা অভিযান (سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القري) :

এ অভিযান প্রেরণ করা হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিংবা যায়েদ বিন হারেসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হত্যার জন্য বনু ফাযারা গোত্রের একটি শাখা শঠতা ও চক্রান্তমূলক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের এ জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মুজাহিদ বাহিনীসহ আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সালমান বিন আকওয়ার বিবরণ সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন যে, 'এ অভিযানে আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফজরের সালাত আদায় করার পর তাঁর নির্দেশক্রমে আমরা শ্রক্রপক্ষের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে ঝর্ণার উপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলাম। অধিকার প্রতিষ্ঠার পর শত্রুপক্ষের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হল। এদের অন্য একটি দলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এদের সঙ্গে মহিলা এবং শিশুও ছিল। আমার ভয় হচ্ছিল যে, লোকজন আসার পূর্বে এরা পর্বতের উপর পৌঁছে না যায়। এ জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে তাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম এবং তাদের ও পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি তীর নিক্ষেপ করলাম। তীর দেখে তার থেমে গেল। এ দলের মধ্যে ছিল উম্মু কুরফা নাম্নী এক মহিলঅ যিনি পুরাতন চর্ম নির্মিত পোশাক পরিহিতা ছিলেন। তার সঙ্গে ছিল তার

এক কন্যা। এ কন্যাটি আরবের সুন্দরী মহিলাদের দলভূক্ত ছিল। আমি তাদেরকে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে এলাম। অতঃপর এ কন্যাটিকে আমার নিকট সমর্পণ করা হল। কিন্তু সে যে পোশাকে ছিল সে পোশাকেই রইল। এর মধ্যে তার পোশাক পরিবর্তন করা হয় নি।' পরে রাসূলে করীম (সাঃ) এ মহিলাকে সালমা বিন আকওয়ার নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন এবং বিনিময় কিছু সংখ্যক মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করিয়ে নেন।[১]

উম্মু কুরফা ছিল একজন শয়তান মহিলা। নাবী করীম (সাঃ)-কে হত্যার জন্য সে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং এতদ্দেশ্যে স্বীয় পরিবার থেকে ত্রিশটি সওয়ারীর ব্যবস্থা করেছিল। তার এ ষড়যন্ত্র ও দুষ্কর্মের প্রতিফলস্বরূপ ত্রিশ জন সওয়ারীকেই হত্যা করা হয়েছিল।

৪. উরায়নিয়্যীন অভিযান (سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العُرَنِيِّين) :

৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরয বিন জাবের ফাহরী (রাঃ)-এর[২] নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানের পটভূমি হচ্ছে, উকাল এবং উরাইনার কতগুলো লোক মদীনায় আগমন ক'রে ইসলাম গ্রহণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাঁদের স্বস্থ্যের জন্য অনুকূল না হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কতগুলো উট সহ তাদের চরণ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার পরামর্শ দেন। অতঃপর লোকগুলো যখন সুস্থ হয়ে উঠল তখন একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো খেদিয়ে নিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল। এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় তার কুফুরী অবলম্বন করল। উল্লেখিত কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের খোঁজ করার জন্য কুরয বিন যাবের ফাহরীকে বিশ জন সাহাবা প্রেরণ করেন। এ বাহিনী প্রেরণের সময় নাবী করীম (সাঃ) এ প্রার্থনা করেছিলেন,

(اللّهم أعم عليهم الطريق، واجعلها عليهم أضيق من مَسَك)

'হে আল্লাহ! উরনিয়্যীদের অন্ধকার করে দাও এবং কঙ্কন চাইতেও বেশী খাটো করে দাও। প্রিয় নাবী (সাঃ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ তা'আলা তাদের পথ অন্ধাকার করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে তারা অভিযাত্রী দলের হাতে ধরা পড়ে যায়। মুসলিম রাখালদের সঙ্গে তার যে শঠতামূলক আচরণ করেছিল তার প্রতিফল ও প্রতিশোধস্বরূপ তাদের হাত পা কেটে দেয়া হল, চোখে দাগ দেয়া হল এবং হাররাহ নামক স্থানের এক প্রান্তে তাদের ছেড়ে দেয়া হল। সেখানে তারা মাটি অনুসন্ধান করতে করতে স্বীয় মন্দ কাজের শাস্তি পর্যন্ত পৌঁছে গেল।[৩] তাদের এ ঘটনা সহীহ বুখারী এবং অন্যান্য কেতাবে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।[৪]

চরিতকারগণ এরপর আরও একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এবং সালমা বিন আবি সালাম (রাঃ)-এর এ দুইজনের সমন্বয়ে। এ অভিযান সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে বলা হয়েছে যে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমর ইবনু উমাইয়া মক্কায় গমন করেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান একজন বেদুঈনকে মদীনায় পাঠিয়েছিল। তবে এ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় নি।

এ প্রসঙ্গে চরিতকারগণ আরও বলেছেন যে, এ সফর কালেই আমর বিন উমাইয়া যামরী তিন জন কাফেরকে হত্যা করেছিলেন এবং খুবাইব (রাঃ)-এর লাশ উঠিয়ে এনেছিলেন। অথচ খুবাইবের শাহাদত বরণের ঘটনা

---

1 সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৮ পৃ: বলা হয়েছে এ অভিযান ৭ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

2 কুরয বিন জাবের ফাহরী (রাঃ) ছিলেন সে ব্যক্তি যিনি বদর যুদ্ধের পুর্বে সফওয়অন যুদ্দে মদীনার চতুষ্পদ জন্তুর পালের উপর আকস্মিক ভাবে হামলা চালিয়ে ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় শাহাদত বরণ করেন।

3 যা'দুল মায়দা ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ, কিছূ অতিরিক্ত সহ।

4 সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬২ ও অন্যান্য কিতাব।

সংঘটিত হয়েছিল রাযীর কয়েক দিন কিংবা কয়েকমাস পর এবং তার সংঘটিত হয়েছিল ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে। এ কারণে এটা আমার সঠিক বোধগম্য হচ্ছে না যে, তাহলে কি এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সফরের ঘটনা ছিল? কিন্তু চরিতকারগণ এ দুটি ব্যাপারকে একই সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়ে কেমন যেন একটা গোলমাল করে ফেলেছেন। অথবা এমনটিও হতে পারে, যে ব্যাপারে দুটি একই সফরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু চরিতকারগণ ভুলক্রমে ৪র্থ হিজরীর পরিবর্তে ৬ষ্ঠ হিজরীর উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মানসুরপুরী (রঃ) এ ঘটনাকে যুদ্ধোমহোদ্যম কিংবা অভিযান হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

এগুলোই হচ্ছে ঐ সকল অভিযান বা যুদ্ধ যা আহযাব ও বনু কুরাইযা যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল। ঐ সকল অভিযানে বড় আকারের তেমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি, এ সবের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবের ছোটখাট ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অতএব ঐ সকল অভিযানকে যুদ্ধ না বলে অগ্রগামী সৈনিক প্রহরী দল 'টহলদারী বাহিনী' তথ্যানুসন্ধানীদল ইত্যাদি বলাই শ্রেয়, এ সব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মূর্খ বেদুঈন এবং শত্রুদের অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার করা। পরিবর্তি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহযাব যুদ্ধের পর অবস্থা ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে আসতে থাকে। এর ফলে শত্রুদের মনোবল ও উদ্যম ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ইসলামী দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেয়া কিংবা এর মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করে দেয়ার যে দুঃস্বপ্ন তারা দেখত তার ছিটে ফোঁটা ও তাদের মনে অবশিষ্ট রইল না। পরিস্থিতি যে ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে যাচ্ছিল তা অধিকন্তু সুস্পষ্ট হয়ে উঠল হুদায়বিয়ার চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তির সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আরব মুশকিগণ কর্তৃক ইসলামী শক্তিকে স্বীকৃতি প্রদান এবং একটি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যাপারে আরব মুশরিকগণ কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার অবসান।

وقعة الحديبية

হুদায়বিয়ার ঘটনা

(في ذي القعدة سنة ٦ هـ)

(৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকা'দ মাস)

হুদাবিয়ার উমরার কারণ (سبب عمرة الحديبية) : আরব উপদ্বীপের অবস্থা যখন বহুলাংশে মুসলিমগণের অনুকূলে এসে গেল তখন ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতার ও বৃহত্তম বিজয়ের বিভিন্ন নিদর্শন ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করতে থাকল। মুশরিকগণ ছয় বছর যাবত মসজিদুল হারামে মুসলিমগণের ইবাদত বন্দেগীর ইতিবাচক দাবীর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।

মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হল যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশ লাভ করছেন। তিনি কা'বা গৃহের চাবি গ্রহণ করে সাহাবীগণ সহ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ এবং উমরাহ পালন করছেন। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক মস্তক মুণ্ডন করেছেন এবং কিছু সংখ্যক লোক চুল কর্তন করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলে তাঁরা বড়ই আনন্দিত হন। এর ফলে তাঁরা এটাও ধারণা করতে থাকেন যে, আল্লাহর রহমতে শীঘ্রই তাঁরা মক্কায় প্রবেশাধিকার লাভ করবেন। রাসূলে করীম ﷺ সাহাবীগণকে এ কথাও বললেন যে, তিনি উমরাহ পালনের মনস্থ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন।

মুসলিমগণের (মক্কা) গমনের ঘোষণা (استنفار المسلمين) : তাঁর সঙ্গে মক্কা গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা এবং পার্শ্ববর্তী জনবহুল বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোষণা দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আরবীগণ যাত্রা শুরু করার ব্যাপারে কিছুটা বিলম্ব করে ফেললেন। এদিকে রাসূলে করীম ﷺ স্বীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিস্কার করে নিলেন। অতঃপর মদীনায় ইবনু উম্মু মাকতুম কিংবা নামীলা লাইসীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন এবং কাসওয়া নামক নিজ উটের উপর আরোহণ করে ৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যিলকা'দ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সঙ্গ নিলেন চৌদ্দশত (মতান্তরে পনের শত) সাহাবীগণ। সফররত অবস্থায় অস্ত্র গ্রহণের নিয়মে কোষাবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া পৃথক কোন খোলা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেননি।

মক্কা অভিমুখে মুসলিমগণের অগ্রযাত্রা (المسلمون يتحركون إلى مكة) : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মক্কা অভিমুখে ছিলেন অগ্রসরমান। যখন তাঁরা যুল হোলায়ফায় গিয়ে পৌঁছলেন তখন কুরবানীর পশুকে হার পরিয়ে দিলেন।[1] উটের পিঠের উঁচু জায়গা কেটে চিহ্নিত করলেন এবং ওমরাহর জন্য এহ্রাম বাঁধলেন। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল, লোকজনেরা যেন নিশ্চিন্ত থাকে যে যুদ্ধ করবেন না। কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খোযায়া সম্প্রদায়ের এক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করা হল অগ্রভাগে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দলবলসহ উসফান নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন তখন এ গোয়েন্দা ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলেন যে, মুসলিমগণের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করার জন্য কা'ব বিন লুওয়ায় সাহায্যকারী আহাবীশ (মিত্র) গোত্রকে সংঘবদ্ধ করছে এবং আরও সৈন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং আল্লাহর ঘর থেকে আপনাকে বিরত রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

---

[1] হাদী ঐ পশুকে বলা হয় যা হজ্জ এবং উমরাহ পালনকারীগণ মক্কা অথবা মদীনায় যবেহ করেন। জাহেলিয়াত যুগে আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল যে হাদীর পশু ভেড়া কিংবা বকরী হলে তার গলায় হার দেয়া হত। পক্ষান্তরে তা উট হলে তার পিঠের উঁচু অংশ চিরে কিছুটা রক্ত বের করে দেয়া হত। এ পশুকে কোন ব্যক্তি বাধা দিতে না। শরীয়তে এ বিধান বহাল রয়েছে।

এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে এক পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হলেন এবং ইরশাদ করলেন,

(أترون نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم تريدون أن نؤم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟)

'আপনাদের অভিমত কি এটা যে, যে সকল লোক আমাদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আমরা তাদের পরিবারবর্গের উপর আক্রমণ চালিয়ে সে সব দখল করে নেই। এর পর যদি তারা চুপচাপ বসে পড়ে তাহলে সেটা হবে মঙ্গলজনক। এতে আমরা ধারণা করব যে, যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি, চিন্তা ভাবনা এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেই তারা বসে পড়েছে। আর যদি তারা পলায়ন করে তাতেও তাদের এমন এক অবস্থার মধ্যে দেখব যে আল্লাহ তাদের গর্দান কেটে দিয়েছেন অথবা আপনারা এ অভিমত পোষণ করছেন যে আমরা কা'বা গৃহ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকি। আমাদের যাত্রাপথে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন যে, 'কি করতে হবে তা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ ভাল জানেন, তবে আমরা এসেছি ওমরাহ পালন করতে যুদ্ধ করতে নয়। অবশ্য কেউ যদি আমাদের এবং আল্লাহর ঘরের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হব।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ভাল কথা, চল তোমরা সামনের দিকে অসগ্রসর হতে থাক।' কাজেই সকলে যাত্রা শুরু করলেন।

আল্লাহর ঘর হতে মুসলিমগণকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা (محاولة قريش صد المسلمين عـــن البيـــت) : এদিকে কুরাইশগণ যখন মুসলিমগণের আগমন সম্পর্কে অবহিত হল তখন তারা একটি পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যে প্রকারেই হোক আল্লাহর ঘর হতে মুসলিমগণকে নিবৃত্ত করতেই হবে। এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশগণের সাহায্যকারী লোকজন অধ্যুষিত জনপদের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। এ সময় বনু কা'ব গোত্রের এক লোক এসে নাবী করীম ﷺ-কে অবহিত করল যে, কুরাইশগণ যী'তাওয় নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ দুই শত ঘোড়সওয়ারী সৈন্য দল নিয়ে কোরাউলগামীমে প্রস্তুত রয়েছে। (কোরাউল গামীম মক্কা যাওয়ার পথে মধ্যস্থলে এবং যাতায়াতের মহা সড়কের উপর অবস্থিত।) খালিদ মুসলিমগণকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল।

খালিদ এমন এক স্থানে ঘোড়সওয়ারীদের মোতায়েন করল যেখান থেকে উভয় দলই পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল। যোহর সালাতের সময় খালিদ প্রত্যক্ষ করল যে, মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে রুকু সেজদাহ করছে। এতে তার ধারণা হল যে, সালাতের মধ্যে যখন তারা বহির্জগত সম্পর্কে গাফেল অবস্থায় থাকে তখন আক্রমণ চালালে সহজেই তাদের পরাভূত করা সম্ভব হতে পারে। তার এ ধারণার প্রেক্ষিতে সে স্থির করল যে, আসর সালাতের সময় তার বাহিনী নিয়ে সে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঠিক সেই সময়েই খাওফের সালাতের (যুদ্ধাস্থার বিশেষ সালাত) আয়াত নাযিল করলেন। ফলে খালিদের সে সুযোগ লাভ সম্ভবব হল না।

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর প্রচেষ্টায় পথ পরিবর্তন (تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامي) : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরাউল গামীমের প্রধান পথ পরিহার করে আঁকাবাঁকা অন্য এক পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকলেন। এ পথটি ছিল একটি পাহাড়ী পথ প্রধান সড়কটি বাম পাশে রেখে ডান দিকে ঘুরে হিমসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এমন পথ ধরলেন, যে পথে সানিয়াতুল মারাবের উপর দিয়ে চলে গেছে। সানিয়াতুল মারার হতে হোদায়বিয়াতে নেমেছে। হোদায়বিয়া মক্কার নিম্ন অঞ্চলে অবস্থিত। পরিবর্তিত পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হল, কোরাউল গামীমের সে প্রধান সড়ক যা তানঈম হতে হারাম শরীফ পর্যন্ত গিয়েছে এবং যেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্য

বাহিনী মোতায়েন ছিল তাকে বাম দিকে রেখে এগিয়ে যাওয়ার ফলে সংঘর্ষের ঝুঁকিটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। মুসলিমগণের পথ চলার ফলে বাতাসে যে ধূলোবালির আভাষ প্রকাশ যাচ্ছিল তা প্রত্যক্ষ করে খালিদ এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হল যে, তারা পথ পরিবর্তন করেছে। তখন সে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে কুরাইশগণকে অবহিত করার জন্য তার ঘোড়াকে যতটুকু সম্ভব উত্তেজিত করল এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে মক্কা অভিমুখে ছুটে চলল।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যথারীতি সফর অব্যাহত রাখলেন এবং যখন সানিয়াতুল মারারে এসে পৌঁছল তখন উট বসে পড়ল। লোকজনেরা বললেন, 'বসলে কেন চল।' কিন্তু সে বসেই রইল। লোকেরা বললেন, 'কাসওয়া (হুজুরের ﷺ উটের নাম) বেঁকে বসেছে।'

নাবী করীম ﷺ বললেন, (ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل) 'কাসওয়া থামেনি এবং এটা ছিল তার স্বভাব কিংবা অভ্যাসও নয়। **কিন্তু একে সেই সত্তাই বিরত রেখেছেন যে সত্তা হাতীকে বাধা দিয়ে রেখেছিলেন।**

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, (والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) 'ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে রয়েছে আমার আত্মা, এরা এমন কোন বিষয়ের দাবী করবে না যার মধ্যে আল্লাহর নিষিদ্ধবস্তুর সম্মান প্রদর্শিত এবং আমি অবশ্যই তা স্বীকার করে নিব।

এরপর নাবী ﷺ উটকে ধমক দিলেন। তখন সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাসূলে করীম ﷺ পথের সামান্য পরির্বন করে অগ্রসর হলেন এবং হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে একটি ঝর্ণার নিকট অবতরণ করলেন। সেখানে সামান্য পরিমাণ পানি ছিল এবং লোকেরা অল্প করে তা নিচ্ছিলেন। কাজেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি নিঃশেষ হয়ে গেল।

পিপাসার্ত লোকজন যখন রাসূলে করীম ﷺ-এর খেদমতে পানির জন্য আরয করলেন তখন তিনি শরাধার থেকে একটি শর বা তীর বাহির করে দিয়ে তা তাদের হাতে দিলেন এবং সেটিকে ঝর্ণার নিক্ষেপ করার পরামর্শ দান করলেন। ঝর্ণার তীর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হল যে সকলেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বোদাইল বিন ওয়ারকার মধ্যস্থতা (بُدَيْل يتوسط بين رسول الله ﷺ وقــريش) : রাসূলে করীম ﷺ যখন একটু স্বস্তি বোধ করলেন তখন বোদইল বিন ওয়ারকা (রাঃ) খোযায়ী আপন খোযায়া গোত্রের কয়েক জন লোক সহ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তেহামার অধিবাসীগণের মধ্যে এ গোত্রই (খোযায়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ মঙ্গলকাঙ্খী ছিল। বোদাইল বলল, 'আমি কা'ব বিন লুওয়ায়কে দেখে আসছি যে, সে হুদায়বিয়ার পর্যাপ্ত পানির আশ্রয়ের উপর শিবির স্থাপন করেছে। তাদের সঙ্গে শিশু এবং মহিলাগণও রয়েছে। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং আল্লাহর ঘর হতে আপনাদের নিবৃত্ত রাখার ব্যাপারে তারা বদ্ধ-পরিকর।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهــم، فــإن شــاءوا ماددتهم، ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا ، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره)

'কারো সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আগমন করি নি। অতীতের যুদ্ধ সমূহ কুরাইশগণকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ও তছনছ করে ফেলেছে। এতে তাদের ক্ষতিও হয়েছে অসামান্য। তাই যদি তারা চায় তাহলে আমি তাদের সঙ্গে একটি সময় নির্ধারণ করব যে সময় তারা আমারও বিপক্ষীয় লোকজনের পথ থেকে সরে

দাঁড়াবে। এতে বড় আকারের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে। অন্যথায় যদি তারা যুদ্ধ চায় তাহলে তাদের ঔদ্ধত্য জনিত কৃতকার্যের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

আর যুদ্ধই যদি তাদের একমাত্র কাম্য হয়ে থাকে, তবে সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন আমি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করে যার যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরে আত্মা থাকে, কিংবা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করে না দেন।

বোদাইল বলল, 'আপনি যা বললেন আমি তা কুরাইশগণকে অবহিত করব।'

অতঃপর সে কুরাইশগণের নিকট গিয়ে বলল, 'আমি মদীনার ঐ নাবী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করে এসেছি। আমি তাঁর নিকট একটা কথা শুনেছি, যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের নিকট তা উপস্থাপন করব।'

এ কথার প্রেক্ষিতে নির্বোধ এবং স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা বলল, 'আমাদের এমন কোন প্রয়োজন নেই যে, তুমি কোন কথা আমাদের নিকট বর্ণনা কর।'

কিন্তু যারা বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিল তারা বলল, 'তুমি তাঁর কাছ থেকে কি শুনেছ তা আমাদের শুনতে দাও।'

বোদইলের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল কথা বলেছিলেন সে তাদের নিকট তা বর্ণনা করল। এ প্রেক্ষিতে কুরাইশদের মুকরেয বিন হাফসকে তাঁর নিকট প্রেরণ করল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গকারী।'

কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অগ্রসর হয়ে আলাপ আলোচনা করল তখন তিনি তাকে সেই সব কথাই বললেন যা বোদাইল এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিকট বলেছিলেন। অতঃপর সে মক্কা ফিরে এসে কুরাইশগণকে তার আলাপ আলোচনার বিষয়াদি অবহিত করল।

কুরাইশগণের দূত (رسل قريش) : আলাপ আলোচনার বিষয়াদির অবহিত হয়ে বনু কেনানা গোত্রের হুলাইস বিন আলকামা বলল, 'আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও।' লোকজনেরা বলল, 'বেশ তবে যাও।'

যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হল তখন নাবী করীম ﷺ সাহাবীগণ (رضي الله عنهم)-কে লক্ষ্য করে বললেন, (هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوهـــا) 'এ ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যারা হাদ্য়ীর পশুকে অনেক সম্মান করে। অতএব পশুগুলোকে দাঁড় করে দাও।'

সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) পশুগুলোকে দাঁড় করে দিলেন এবং নিজেরাও লাব্বায়েক বলে তাকে খুশ আহমেদ জানালেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সেই ব্যক্তি আনন্দে বিভোর হয়ে বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! এ সকলে লোককে আল্লাহর ঘর হতে বিরত রাখা কোন মতেই সমীচীন হবে না।' এ কথঅ বলেই সে তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল।

ফিরে গিয়ে সে কুরাইশগণের নিকট বলল, 'আমি হাদয়ীর পশু দেখে এলাম যাদের গলায় হার দেওয়া আছে এবং পৃষ্ঠদেশ চিরে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আল্লাহর ঘর থেকে তাদের নিবৃত্ত রাখা আমি সমীচীন মনে করছি না।' তার এ সকল কথার প্রেক্ষাপটে কুরাইশ লোকজনও তার মধ্যে এমন কিছু বাক্য বিনিময় হয়ে গেল। যার ফলে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এমন সময় উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী হস্তক্ষেপ করল এবং বলল, 'ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মদ ﷺ) তোমাদের নিকট একটি ভাল প্রস্তাব দিয়েছে। তোমরা তাঁর প্রস্তাবে গ্রহণ করে নাও এবং আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও।"

লোকজনেরা তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কথোপকথন আরম্ভ করল। আলোচনায় নাবী করীম ﷺ তাকে সে সব কথাই বললেন, যা তিনি বোদাইলকে বলেছিলেন। প্রত্যুত্তরে উরওয়া বলল, 'হে মুহাম্মদ ﷺ যদি আপনি নিজ জাতিকে নিশ্চিহ্নও করে দেন তবে কি আপনার

পূর্বের কোন আরব সম্পর্কে শুনেছেন যে, সে নিজ জাতিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে? আর যদি দ্বিতীয় অবস্থা ঘটে যায় তবে আল্লাহর কসম! আমি এমন কতগুলো মূর্খ ও লম্পট দেখছি যারা আপনাকে ছেড়ে পলায়ন করবে।'

এ কথা শুনে আবু বকর বললেন, 'লাতের লজ্জাস্থানের ঝুলন্ত চর্ম চুষতে থাক, আমরা নাবী -কে ছেড়ে পলায়ন করব?

উরওয়া বলল, 'এ লোকটি কে?'

লোকজনেরা বলল, 'তিনি আবু বকর।'

সে আবু বকরকে সম্বোধন করে বলল, 'দেখ, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন যদি এমন ব্যাপার না হতো যে, তুমি আমার একটি উপকার করেছিলে এবং আমি তার প্রতিদান দিতে পারি নি, তবে অবশ্যই এর জবাব আমি দিয়ে দিতাম।'

এরপর উরওয়া পুনরায় নাবী করীম -এর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করল এবং আলাপ-আলোচনা চলা অবস্থায় বার বার নাবী করীম -এর দাড়ি মুবারক ধরে নিচ্ছিল। মুগীরা বিন শো'বা নাবী করীম -এর মাথার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি তরবারী। আলোচনার সময় উরওয়া যখন নাবী করীম -এর দাঁড়ি মুবারকের দিকে হাত বাড়াত তখন তিনি তরবারীর হাতল দ্বারা তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, নাবী করীম -এর দাঁড়ি মুবারক হতে হাত দূরে রাখ।'

অবশেষে উরওয়া নিজ মস্তক উত্তোলন করে বলল, 'এ লোকটি কে?'

লোকেরা বলল, 'অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। আমি কি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে ব্যাপারে দৌঁড় ঝাঁপ করছিনা?"

প্রকৃত ঘটনাটি হচ্ছে জাহেলীয়াত যুগে মুগীরা কিছু সংখ্যক লোকের সঙ্গে ছিলেন। কোন এক অবস্থায় তিনি সঙ্গী সাথীদের হত্যা করেন এবং তাদের ধন সম্পদ নিয়ে পলায়ন করেন। অতঃপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাবী করীম বলেছিলেন, (أما الإسلام فأقبلُ، وأما المال فلست منه في شيء) (وكان المغيرة ابن أخــي عــروة) 'তুমি তো ইসলাম গ্রহণ করছ কিন্তু তোমার ধন সম্পদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ ব্যাপারে উরওয়ার দৌঁড় ঝাঁপ করার কারণ ছিল, মুগীরা ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

এরপর উরওয়া নাবী করীম -এর সঙ্গে সাহাবা কেরামের সম্পর্ক সৌকর্যের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকল। অতঃপর সে স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট ফিরে এসে বলল, 'হে গোত্রীয় ভ্রাতৃবর্গ! আল্লাহর কসম! আমি কায়সার ও কেসরা এবং নাজ্জাসীদের মৃত সম্রাটের দরবারে গিয়েছি, আল্লাহর আমি কোন সম্রাটকে দেখি নি যে, তাঁর অনুসারী বা সঙ্গীসাথীগণ তাঁর এতটুকু সম্মান করছে মুহাম্মদ - কে তাঁর সাহাবা বর্গ যত বেশী সম্মান করছে। আল্লাহর কসম! তিনি যখন থু-থু ফেলছেন তখন যে কেউ তা হাতে নিয়ে আপন মুখমণ্ডলে কিংবা শরীরে তা মেখে নিচ্ছেন। যখন তিনি কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করছেন তখন তা বাস্তবায়নের জন্য সকলের মধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়ে যাচ্ছে। যখন তিনি অযু করছেন তখন মনে হচ্ছে যেন তাঁর ব্যবহৃত পানির জন্য লোকেরা যুদ্ধ শুরু করে দেবে। যখন তিনি কোন কথা বলছেন তখন সকলের কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সম্মানের খাতিরে সাহাবীগণ কখনই তাঁর প্রতি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যেই এমন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে যার ফলে সাহাবীগণ তাঁকে এতটা শ্রদ্ধা করছেন। তিনি তোমাদের জন্য একটি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন। তোমাদের উচিত তা গ্রহণ করে নেয়া।'

তিনিই সেই সত্তা যিনি তাদের হাত তোমাদের হতে নিবৃত্ত করলেন (هو الذي كف أيديهم عــنكم) : যখন কুরাইশগণের যুদ্ধকাজ ও যুদ্ধোন্মাদ যুবকগণ দেখল যে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণই তৈরি করল। তারা নেতৃস্থানীয়দের এড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, রাত্রির অন্ধকার এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারা মুসলিমগণের শিবিরে প্রবেশ করবে এবং এমন ভাবে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলবে যাতে আপনা থেকেই যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে।

অতঃপর তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে রাতের আঁধারে সত্তর কিংবা আশি জন যুবক তানঈম পর্বতে অবতরণ করে মুসলিমগণের শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম শিবির প্রহরীদের পরিচালিক মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাদের সকলকে বন্দী করেন। কিন্তু সন্ধিচুক্তির খাতিরে নাবী করীম (ﷺ) সকলকে ক্ষমা প্রদর্শন ক'রে মুক্ত করে দেন। সে সম্পর্কেই আল্লাহর তরফ থেকে তখন আয়াত নাযিল হয় :

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٢٤]

'তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের উপর হতে তাদের হাতকে নিবৃত্ত করলেন মক্কা প্রান্তরে এবং তোমাদের হাতকে তাদের হতে। এর পূর্বেই তিনি তাদেরকে তোমাদের আয়ত্বে এনে দিয়েছিলেন।' [আল-ফাত্হ (৪৮) : ২৪]

ওসামানের দৌতকার্য (عثمان بن عفـــان ســـفيراً إلى قـــريش) : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চিন্তা করলেন যে, এ সময় কুরাইশদের নিকট এমন একজন দূত প্রেরণ করা প্রয়োজন যিনি বর্তমান ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে জোরালো ভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন। রাসূল্লাহ (ﷺ) প্রথম ওমর (রাঃ)-কে এ কাজের জন্য আহ্বান জানালে তিনি এ বলে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে যদি আমাকে কষ্ট দেয় হয় তাহলে মক্কায় বনু কা'ব গোত্রের এমন একজন লোকও নেই যে আমার সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। আপনি বরং ওসমান বিন আফ্ফান (রাঃ)-কে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করুন। তাঁর আত্মীয় এবং গোত্রীয় লোকজনদের অনেকেই এখনো মক্কায় রয়েছেন। তিনি আপনার বার্তা খুব ভালভাবেই পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন।

অতঃপর রাসূলে করীম (ﷺ) ওসমান (রাঃ)-কে আহ্বান জানিয়ে কুরাইশগণের নিকট গমনের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, 'তুমি গিয়ে তাদেরকে বলে দাও যে যুদ্ধ করার জন্য আমরা আসি নি। আমরা এসেছি ওমরাহ পালনের জন্য। তাছাড়া তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ কর।'

অধিকন্তু, তিনি ওসমান (রাঃ)-কে এ নির্দেশ দিলেন যে, 'তুমি মক্কায় ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট গিয়ে অদূর ভবিষ্যতে মুসলিমগণের মক্কা বিজয়ের শুভ সংবাদ শুনিয়ে দেবে এবং এ কথাও বলে দেবে যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে শীঘ্রই মক্কায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করবেন। কাজেই, আল্লাহর দ্বীন বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কাউকেও আত্মগোপন করে থাকার প্রয়োজন হবে না।'

ওসমান (রাঃ) নাবী করীম (ﷺ)-এর বার্তা নিয়ে মক্কা গমন করলেন বালদাহ নামক স্থানে কুরাইশগণের নিকট দিয়ে যখন তিনি পথ চলছিলেন তখন তারা জিজ্ঞেস করল, কি উদ্দেশ্যে কোথায় এ যাত্রা? তিনি বললেন, 'একটি বার্তা সহ আল্লাহর নাবী মুহাম্মদ (ﷺ) আমাকে এ স্থানে প্রেরণ করেছেন।'

তারা বলল, 'আমরা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কথা শুনেছি আপনি নিজ কাজে চলে যান।'

অন্য দিকে সাঈদ বিন আস উঠে এসে 'মারহাবা' বলে তাঁকে খুশ আমদেদ জানালেন। অতঃপর সে নিজ ঘোড়ার উপর জিন চাপিয়ে তাতে আরোহণ করলেন এবং ওসমান (রাঃ)-কে সঙ্গে বসিয়ে নিয়ে মক্কায় নিজ বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ওসমান (রাঃ) নেতৃস্থানীয় কুরাইশগণের নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বার্তা শোনালেন। বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যমে যখন তিনি আরোপিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন। তখন কুরইশগণের প্রস্তাব করল যে, তিনি যেন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর তাওয়াফের পূর্বে তাওয়াফ করা সমীচীন মনে না করায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ওসমানের শাহাদাতের গুজব এবং রিযওয়ান প্রতিজ্ঞা (إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضـــوان) : ওসমান (রাঃ) তাঁর উপর আরোপিত দৌত-মহোদ্যম সম্পূর্ণ করলেন কিন্তু কুরাইশগণ তাঁকে আটকাবস্থায় রাখলেন। সম্ভবত উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারার কারণেই এবং কিছুটা বিলম্বে হলেও তাঁর মাধ্যমে সঠিক রেখেছিল। যেহেতু ব্যাপারটি ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত বিতর্কমূলক এবং এ ব্যাপারে তাদের আরও সলা-পরামর্শের প্রয়োজন ছিল সেহেতু তার ওসমান (রাঃ)-এ প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু ওসমান (রাঃ)-এর পত্যাবর্তনে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার কারণে মুসলিমগণের মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, ওসমান (রাঃ)-কে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এ সংবাদ অবগত হলেন, তখন ঘোষণা দিলেন যে, (لا نبرح حتى نناجز القـــوم) যুদ্ধের মাধ্যমে যতক্ষণ একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এ জায়গা পরিত্যাগ করব না। অতঃপর নাবী করীম (সাঃ) সাহাবীগণকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। সাহাবা কেরামের একটি দলকে কিছুটা ভেঙ্গে পড়ার মতো মনে হল। অবশ্য, তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবেন না। অন্য এক দল মৃত্যুবরণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করতে হলেও তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করবে না। সর্ব প্রথম অঙ্গীকার বদ্ধ হলেন আবু সেনান আসাদী সালাম বিন আকওয়া তিন দফা অঙ্গীকারর করলেন। প্রথম, মধ্যে ও শেষে। রাসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং নিজ হাত ধরে বললেন, (هذه عن عثمان) 'এ হচ্ছে ওসমানের হাত।' ইতিমধ্যে যখন অঙ্গীকার গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়ে গেল তখন ওসমান (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তিনিও অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। এ অঙ্গীকার পর্বে মাত্র একজন অংশ গ্রহণ করে নি। সে ছিল মুনাফিক। তার নাম ছিল জুদ বিন কায়েস।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন একটি বৃক্ষের তলদেশে। ওমর (রাঃ) পবিত্র হাতকে উত্তোলিত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং মাকাল বিন ইয়াসার (রাঃ) বৃক্ষের কতগুলো শাখা ধরে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এ অঙ্গীকারের নাম হচ্ছে বাইয়াত রিযওয়ান। এ বাইয়াত সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الآية [الفتح: ١٨]

'মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়'আত নিল।' [আল-ফাত্হ (৪৮) : ১৮]

সন্ধিচুক্তি এবং চুক্তির দফা সমূহ (إبرام الصـــلح وبنـــوده) : যাহোক, কুরাইশগণ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করল এবং অনতিবিলম্বে সোহাইল বিন আমরকে সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করল। তাকে প্রেরণের সময় এ পরামর্শ দিল যে, সন্ধিচুক্তিতে অবশ্যই এ চুক্তিটি উল্লেখিত হবে যে, এ বছর ওমরাহ্ পালন না করেই তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবেন। মক্কার লোকেরা এমন চিন্তার অবকাশ না পায় যে, নাবী করীম (সাঃ) জোর জবরদস্তি করে আমাদের শহরে প্রবেশ করেছেন। কুরাইশগণের নিকট হতে এ সকল নির্দেশ সহকারে সোহাইল বিন আমর নাবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল। তাকে আসতে দেখে নাবী করীম (সাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে বললেন, (قد سهل لكم أمـــركم) 'তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরাইশগণ সন্ধি চাচ্ছে।' সোহাইল নাবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আগমনের পর বহুক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল এবং অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির দফাসমূহ স্থিরীকৃত হল। চুক্তির দফাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই সঙ্গী সাথীগণসহ মদীনায় ফিরে যাবেন। মুসলিমগণ আগামী বছর মক্কায় আগমন করবেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন। তাঁদের সঙ্গে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকবে এবং তরবারী কোষবদ্ধ থাকবে। তাঁদের আগমনে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।

২. দশ বছর পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যেযুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ সময় লোকজন নিরাপদ থাকবে, কেউ কারো উপর হাত উত্তোলন করবে না।

৩. যে সকল গোত্র কিংবা জনগোষ্ঠি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অঙ্গীকারাঙ্গনে প্রবেশ লাভ করতে চাইবে, প্রবেশ লাভ করতে পারবে। যে গোত্র যে দলে অংশ গ্রহণ করবে তাকে এ দলের অংশ গণ্য করা হবে। এরূপ

ক্ষেত্রে কোন গোত্রের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

৪. কুরাইশদের কোন লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পলায়ন করে মুহাম্মদ ﷺ-এর দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর দলভূক্ত কোন লোক আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে পলায়ন করে কুরাইশদের নিকট গেলে কুরাইশগণ তাকে ফেরত দেবে না।

এরপর নাবী করীম ﷺ আলী ؓ-কে সন্ধির দফাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন লিখ, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

এর প্রেক্ষিতে সোহাইল বলল, 'রহমান' বলতে যে কি বুঝায় আমরা তা জানি না। আপনি এভাবে লিখুন, 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ তোমার নামে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ؓ-কে সে ভাবেই লিখতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সে ভাবেই তা লিখলেন।

অতঃপর নাবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে আলী ؓ লিখলেন, (هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) 'এগুলো হচ্ছে সে সব কথা যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাসূল ﷺ সন্ধি করলেন।"

এ কথার পেক্ষিতে সোহাইল বলল, 'আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে আপনাকে আল্লাহর ঘর হতে বিরত রাখতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধও করতাম না। কাজেই, আপনি লিখুন, 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ।'

নাবী করীম ﷺ বললেন, (إني رسول الله وإن كذبتموني) 'তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও এটা এক মহা সত্য যে, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ।'

অতঃপর 'রাসূলুল্লাহ' কথাটি মুছে ফেলে তার পরিবর্তে 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখার জন্য তিনি আলী ؓ-কে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আলী ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি মুছে ফেলার ব্যাপারটিকে কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছিলেন না। আলী ؓ মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে নাবী করীম ﷺ স্বীয় মুবারক হাত দ্বারাই কথাটি মুছে ফেললেন। তার পর পুরো চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেল।

যখন সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল তখন বুন খোযয়া গোত্র রাসূলে করীম ﷺ-এর অঙ্গীকারাঙ্গনে প্রবেশ করল। এরা প্রকৃতপক্ষে আব্দুল মুত্তালিবের সময় হতেই বনু হাশিমের হালীফ ছিল। যেমনটি পুস্তকের প্রারম্ভে উল্লেখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অঙ্গীকারাঙ্গনে বনু খোযায়ার প্রবেশের ব্যাপারটি ছিল পূর্বতন প্রতিজ্ঞারই ফলশ্রুতি বা পরিপক্ক অবস্থা। অন্যদিকে কুরাইশদের অঙ্গীকারাঙ্গনে প্রবেশ করল বনু বকর গোত্র।

আবু জান্দালের প্রত্যাবর্তন (رد أبي جندل) : সন্ধিপত্র লেখার কাজ তখন চলছিল এমন সময় সোহাইলের পুত্র আবু জান্দাল লৌহ শিকল পরিহিত অবস্থায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে সেখানে উপস্তিত হল। সে মক্কার নিম্নাঞ্চল হতে বাহির হয়ে এসেছিল। সে এখানে পৌঁছে নিজে নিজেই মুসলিমগণের দলের মধ্যে শামিল হল। তার এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সোহাইল বলল, 'এ আবু জান্দালই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যার সম্পর্কে আপনার সঙ্গে মত বিনিময় করেছি যে, আপনি তাকে ফেরত দেবেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (إنا لم نقض الكتاب بعد) 'এখন তো আমাদের সন্ধিপত্র সম্পন্নই হয় নি।'

সে বলল, 'তাহলে আমি সন্ধির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আর কোন আলাপ-আলোচনা করতে রাজি নই।'

নাবী করীম ﷺ বললেন, 'আচ্ছা তাহলে আমার খাতিরে তুমি তাকে ছেড়ে দাও।'

সে বলল, 'আমি আপনার খাতিরেও তাকে ছাড়ব না।'

নাবী করীম বললেন, 'না, না, অন্তত পক্ষে এতটুকু তোমাকে করতেই হবে।'

সে বলল, 'না আমি তা করতে পারি না।'

অতঃপর সোহাইল আবু জান্দালের মুখের উপর চপটাঘাত করল এবং মুশরিকদের নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর গলবস্ত্র ধারণ করে হেঁচড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

আবু জান্দাল তখন জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি কি মুশরিকগণের ফিরে যাব এবং তারা আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে ফেৎনায় নিক্ষেপ করবে?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم)

'আবু জান্দাল! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং একে সওয়াব লাভের উপায় মনে করে নাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং তোমার মতো দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলিমগণের জন্য প্রশস্ত আশ্রয় স্থান তৈরি করে রেখেছেন। আমরা কুরাইশগণের সঙ্গে সন্ধি করেছি এবং আমরা পরস্পরের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। এ কারণে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না।'

এরপর ওমর (رضي الله عنه) বাহির হয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে আবু জান্দালের নিকট গিয়ে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলছিলেন, 'আবু জান্দাল! ধৈর্য্য ধারণ কর। এরা মুশরিক এদের রক্ত তো কুকুরের রক্ত।' সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের হাতলও তিনি তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। ওমর (رضي الله عنه)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, 'আমার আশা ছিল যে, আবু জান্দাল তলোয়ার হাতে নিয়ে তাঁর পিতাকে নিঃশেষ করে ফেলবেন, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার ব্যাপারে কৃপণতা অবলম্বন করলেন এবং সন্ধিচুক্তি কার্যকর হয়ে গেল।'

ওমরাহ হতে হালাল হওয়ার জন্য কুরবানী এবং মাথার চুল কর্তন (النَّحْر والحَلْق للحلّ عن العمــرة) : সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিস্কৃতি লাভের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ পশু কুরবানী করার জন্য সাহাবীগণকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! কেউই আপন স্থান ত্যাগ করলেন না। মনে হল যেন এ কথা তাঁদের কানেই যায় নি।

নাবী করীম ﷺ তিন বার তাঁর উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু কেউই স্থান ত্যাগ করলেন না। তখন তিনি বিবি উম্মু সালমা (رضي الله عنها)-এর নিকট গেলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। উম্মুল মু'মিনীন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি চান যে, সকলে নিজ নিজ পশু কুরবানী করে মস্তক মুণ্ডন করুক তাহলে আর কাউকেও কিছু না বলে নিজ পশু যবেহ করুন এবং হাজ্জামকে (নাপিতকে) ডাকিয়ে নিয়ে নিজ নিজ মস্তক মুণ্ডন করে নিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মু'মিনীনের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন, অর্থাৎ নিজ হাদয়ের পশু যবেহ করলেন এবং হাজ্জামকে ডাকিয়ে নিয়ে নিজ মস্তক মুণ্ডন করিয়ে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করতে দেখে অন্যেরা সকলেই নিজ নিজ পশু যবেহ করলেন এবং একে অন্যের সাহায্য নিয়ে মস্তক মুণ্ডন করে নিলেণ। সমগ্র পরিবেশটা তখন গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং সকলেই এতই চিন্তাযুক্ত ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল অত্যাধিক চিন্তিত থাকার কারণে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে ফেলবে। সে সময় সাত সাত জনের জন্য একটি গরু এবং একটি উট যবেহ করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জাহলের একটি উট যবেহ করেন যার নাকে রূপোর তৈরি একটি নোলক বালি বা বৃত্ত ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে কুরাইশ মুশরিকগণ যেন মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং কাঁচি দ্বারা কেন কর্তনকারীদের জন্য একবার দু'আ করেন। এ সফরে আল্লাহ তা'আলা কা'ব বিন উজরাহ সম্পর্কে এ হুকুম নাযিল করেন যে, যে ব্যক্তি কষ্টের কারণে নিজ মস্তক মুণ্ডণ করবে (ইহরামের অবস্থায়) সে যেন রোযা পালন করে, অথবা সদকা করে কিংবা কোন পশু যবেহ করে তা উৎসর্গ করে।

হিজরতকারিনী মহিলাগণকে ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি (الإباء عـــن رد المهـــاجرات) : এরপর কিছু সংখ্যক মহিলা মুহাজির আগমন করলেন। তাদের অভিভাবকগণ দাবী করল যে, হুদায়াবিয়ার যে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এদের ফেরত প্রদান করা হোক । কিন্তু তাদের এ দাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন যে এ চুক্তির শর্ত সম্পর্কে সন্ধিপত্র যে কথা লিখা হয়েছিল তা ছিল-

(وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا)

'এ শর্ত সাপেক্ষে এ সন্ধি করা হচ্ছে যে, আমাদের যে ব্যক্তি আপনার নিকট চলে যাবে আপনি অবশ্যই তাকে ফেরত পাঠাবেন যদিও সে আপনার দ্বীনের অনুসারী হয়।[1]

অতএব, এ মহিলাগণ সন্ধিচুক্তির শর্তাবলীর আওতাভূক্ত ছিলেন না। অন্য দিকে আবার এ মহিলাগণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে করীমও নাযিল করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾، حـــتى بلـــغ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]

'হে মু'মিনগণ! ঈমানদার নারীরা যখন তোমাদের কাছে হিজরাত করে আসে তখন তাদেরকে পরখ করে দেখ (তারা সত্যিই ঈমান এনেছে কি না)। তাদের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন। অতঃপর তোমরা যদি জানতে পার যে, তারা মু'মিনা, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য হালাল নয়, আর কাফিররাও মু'মিনা নারীদের জন্য হালাল নয়। কাফির স্বামীরা (মাহর স্বরূপ) যা তাদের জন্য খরচ করেছিল তা কাফিরদেরকে ফেরত দিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে মাহ্‌র প্রদান করতঃ বিয়ে করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদেরকে (বিবাহের) বন্ধনে আটকে রেখ না।' [আল-মুমতাহিনাহ (৬০ : ১০]

উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যখনই হওয়ার পর যখনই কোন মহিলা হিজরত করে আসতেন তখন রাসূলে করীম ﷺ আল্লাহর এ নির্দেশের আলোকে তাঁর পরীক্ষা গ্রহণ করতেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٢]

'হে নাবী! যখন মু'মিনা নারীরা তোমার কাছে এসে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শারীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা ক'রে রটাবে না এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না– তাহলে তুমি তাদের বাই'আত (অর্থাৎ তোমার প্রতি আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।' [আল-মুমতাহিনাহ (৬০ : ১২]

এ প্রেক্ষিতে মহিলাগণ এ আয়াত বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করবে বলে যখন অঙ্গীকার করত, নাবী করীম ﷺ তখন তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। অতঃপর তাদরকে আর ফেরত দেয়া হতো না।

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৩৮০ পৃঃ।

এ নির্দেশাবলী পালনার্থে মুসলিমগণ নিজ নিজ কাফেলা স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করেন। ঐ সময় ওমরের দাম্পত্যে দুই অংশীবাদী মহিলা ছিল। তিনি তাদের দুই জনকে তালাক প্রদান করেন। এদের একজনকে বিবাহ করেন মুওয়াবিয়া এবং অন্য জনকে বিবাহ করেন সফওয়ান বিন উমাইয়া।

এ সন্ধির দফাসমূহের সারসংক্ষেপ (ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة) : ইসলামের ইতিহাসে মোড় পরিবর্তনকারী এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি হচ্ছে হুদায়বিয়ার সন্ধি। যে ব্যক্তি এ সন্ধির দফাগুলো এবং পরবর্তী দৃশ্যপট সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন এটা তাঁর নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এ সন্ধি ছিল মুসলিমগণের জন্য একটি বিরাট বিজয় স্বরূপ। কারণ এর পূর্ব পর্যন্ত কুরাইশগণ ইসলামী সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই স্বীকার করত না। এমন কি একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এরা ছিল বদ্ধপরিকর। তারা এ অপেক্ষায় ছিল যে, এক দিন না একদিন এদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। অধিকন্তু, কুরাইশগণ আরব উপদ্বীপে ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং পার্থিব প্রধানের দায়িত্বে সমাসীন থাকার কারণে ইসলামী দাওয়াত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক ছিল।

এর পরবর্তী দৃশ্যপট বিশ্লেষণ করলে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, এ সন্ধিতে আপাত: দৃষ্টিতে মুসলিমগণের কিছুটা নতি স্বীকার করার কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে ছিল মুসলিমগণের শক্তির স্বীকারোক্তি এবং এ সত্যের স্বীকৃতি যে ইসলামী শক্তিকে পিষ্ট কিংবা নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা কুরাইশদের নেই।

তৃতীয় দফার ক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, কুরাইশগণের নিকট পরিবর্তিত পরিস্থিতির ব্যাপারটি তাদের অতীতের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোন সচেতনতা যেন ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের ভূমিকা যে ছিল শীর্ষস্থানে এ কথাটি তারা প্রায় ভুলতেই বসেছিল। অধিকন্তু, আরব উপদ্বীপের সাধারণ মানুষের কথাটাও যেন তাদের চিন্তা ও চেতনার বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আরব উপদ্বীপের সকল সাধারণ মানুষ যদি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তাতেও যেন তাদের মাথা ব্যথার আর তেমন কিছুই ছিল না এবং এ ব্যাপারে তারা আর কোন প্রতিবন্ধকও হবে না। কুরাইশগণের লক্ষ উদ্দেশ্য এবং সংকল্পের প্রেক্ষাপটে এটা কি তাদের জন্য প্রকাশ্য পরাজয় ছিল না? পক্ষান্তরে, মুসলিমগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে এটা কি তাদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় ছিল না?

অবশেষে মুসলিম ও ইসলামের শত্রুদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল এর লক্ষ্য এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কি ছিল যে বিশ্বাস বা দ্বীনের ব্যাপারে জনসাধারণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং ক্ষমতার অধিকারী হবে? অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী যে ব্যক্তি যা ইচ্ছা করবে তাই অবলম্বন করতে পারবে? মুসলিম হতে চাইলে মুসলিম হবে, আর কাফের থাকতে চাইলে কাফের থাকবে। তাদের ইচ্ছা বা আকঙ্খার সামনে কোন শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মুসলিমগণের এ ইচ্ছা তো কখনই ছিল না যে শত্রুদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হোক , তাদেরকে মৃত্যু ঘাটে অবতরণ করা হোক এবং জোরজবরদস্তি করে মুসলিম করা হোক । অর্থাৎ মুসলিমগণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটা ছিল যা আল্লামা ইকবাল তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন,

শাহাদাত হ্যায় মাতলূব মাকসূদে মু'মিন
না মালে গণীমত না কিশ্‌ওয়ার কুশায়ী

অর্থঃ একজন মু'মিন মুসলিম বান্দার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিল শাহাদাতবরণ করা। গণীমত লাভ অথবা বাদশাহ বা কোন অঞ্চলের মালিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল না।

এটা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এ সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমগণের উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাদি অর্জিত হয়ে গেল এবং সে সব এভাবে অর্জিত হল যে, অধিকাংশ সময় যুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেও তা সম্ভব হয় নি। সন্ধির মাধ্যমে প্রচার কাজের ঝুঁকি এবং বিপদাপদের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়ায় ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ময়দানে মুসলিমগণ অভূতপূর্ব কৃতকার্যতা অর্জন করতে থাকেন। সন্ধির পূর্বে যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণের সৈন্য সংখ্যা কখনই তিন হাজারের অধিক হয় নি সে ক্ষেত্রের সন্ধির পর মাত্র দুই

বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তা দশ হাজারে পৌঁছে গেল। দ্বিতীয় দফাও প্রকৃতপক্ষে এ প্রকাশ্য বিজয়েরই অংশ ছিল। কারণ, সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুশরিকগণই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [التوبة: ١٣]

'প্রথমে তারাই তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ১৩]

যে অঞ্চল পর্যন্ত মুসলিম প্রহরী চক্র বা টহলদারী সৈন্য দলের কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল মুসলিমগণের এটা উদ্দেশ্য এবং আশা ছিল যে, কুরাইশগণ তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত অহংকার পরিহার করে আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে কার্যাদি সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ পত্যেক পক্ষই আপন আপন লক্ষ্যে কার্যাদি নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এখন চিন্তা করে দেখলে ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে যাবে যে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির সন্ধি ছিল তাদের অর্থহীন অহংকার এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার। অধিকন্তু, এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, যারা যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল তারা দুর্বল এবং পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়ে গেল।

প্রথম দফার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করলেও এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, আপত দৃষ্টিতে মুসলিমগণের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাঁদের সাফল্যেরই প্রতীক। কারণ, এ শর্তের মাধ্যম মুসলিমগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। যেখানে তাঁদের প্রবেশের ব্যাপারে কুরাইশরা ইতোপূর্বে নিষেধাজ্ঞা জারী করে করেছিল। তবে এ শর্তের মধ্যে কুরাইশদের পরিতৃপ্ত হওয়ার যে বিষয়টি ছিল তা হচ্ছে, তারা ঐ বছরের জন্য মুসলিমগণকে মক্কায় প্রবেশ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সফলকাম হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল নিতান্ত গুরুত্বহীন একটি সামরিক ব্যাপার।

এ সন্ধির ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনার আরও একটি বিষয় হচ্ছে, কুরাইশগণ মুসলিমগণকে তিনটি বিষয়ে, সুযোগদানের বিনিময়ে তারা মাত্র একটি সুযোগ গ্রহণ করেছিল যা ৪র্থ দফায় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ ছিল খুবই সাধারণ এবং গুরুত্বহীন। এতে মুসলিমগণের কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ, এটা একটা বিদিত বিষয় ছিল যে, যতক্ষণ কোন মুসলিম ইসলামের বন্ধনের মধ্যে থাকবে সে ততক্ষণ আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং মদীনাতুল ইসলাম হতে পলায়ন করতে পারবে না। মাত্র একটি কারণেই সে পলায়ন করতে পারে এবং মদীনাতুল ইসলাম হতে পলায়ন করতে পারবে না। মাত্র একটি কারণেই সে পলায়ন করতে পারে এবং তা হচ্ছে স্বধর্ম ত্যাগ। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক কোন মুসলিম যখন স্বধর্ম ত্যাগ করবে তখন তো মুসলিম সমাজে তার কোন প্রয়োজন থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজে তার উপস্থিতির থেকে তার পৃথক হয়ে যাওয়াই হবে বহু গুণে উত্তম। এ মোক্ষম ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন

(إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله)

অর্থ: যে আমাদের ছেড়ে মুশরিকদের নিকট পলায়ন করল আল্লাহ তাকে দূর করে দিল এবং ধ্বংস করে দিল।[1]

এরপর অবশিষ্ট থাকে মক্কার সেই সব অধিবাসীর কথা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিংবা ইসলাম গ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান ছিল। অবশ্য এ চুক্তির ফলে যদিও তাদের জন্য একটি সান্তনার বিষয় এ ছিল যে, 'আল্লাহর জমিন প্রশস্ত।' ইসলামের প্রথম পর্যায়ে মক্কার মুসলিমগণের অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে কি হাবাশাকে মুসলিমগণের জন্য তার বহুবন্ধন উন্মুক্ত করে দেয় নি? যখন মদীনার অধিবাসীগণ ইসলামের নাম পর্যন্ত শোনেনি তখনকার কথা। অনুরূপভাবে আজও পৃথিবীর যে কোন অংশ মুসলিমগণের জন্য স্বীয় বাহু বন্ধন উন্মুক্ত করতে পারে।

---

[1] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৫ পৃঃ, হুদায়বিয়ার সন্ধি অধ্যায়।

এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, (ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجـاً ومخرجاً). 'তাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আসলে আল্লাহ তার জন্য যে কোন সুরাহা এবং প্রশস্ত তা বের করে দেবেন।'[১ক]

অতঃপর এ ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদিও বাহ্যিকভাবে কুরাইশগণের সাময়িক মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য তা ছিল ব্যক্তিগত ব্যকুলতা, চিন্তাভাবনা, গোত্রীয় চাপ এবং বিপর্যয়ের নির্দেশন। অধিকন্তু, এ থেকে এমনটিও বোধগম্য হচ্ছিল যে, তারা তাদের মূর্তি পূজক সমাজ সম্পর্কে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। তাছাড়া তারা এটাও উপলব্ধি করছিল যে, শিশুদের খেলা ঘরের ন্যায় ঠুনকো ও অর্থহীন সমাজ-ব্যবস্থা এমন একটি ফাঁকা অন্তসারশূন্য এবং অভ্যন্তর ভাগ হতে খননকৃত পরিখার পাশে অবস্থিত যা যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব এর হেফাজতের জন্য ঐ জাতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল।

অন্যপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উদার অন্তকরণের সঙ্গে এ শর্তগুলোর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন যে, কুরাইশগণের আশ্রিত কোন মুসলিমকে ফেরত চাইবেন না তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত করে যে প্রস্তর প্রতিম সুদৃঢ় ও সুসংঘটিত ইসলামী সমাজের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ পুরোমাত্রায় কার্যকর ছিল। এ প্রকার শর্তে সম্মতি জ্ঞাপনের ব্যাপারে তাঁর মনে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কিংবা আশংকার কোনই কারণ ছিল না।

মুসলিমগণের বিষন্নতা এবং ওমর (رضي الله عنه)-এর বিতর্ক (حزن المسلمين ومناقشة عمر النبي ﷺ) :

হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তির শর্তাদি এবং তার সমীক্ষাসূচক আলোচনা ইতোপূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ শর্ত সমূহের মধ্যে দুটি শর্ত স্পষ্ট এ প্রকারের ছিল যা মুসলিমগণের মনে দারুন দুঃখবেদনা হতাশা ও বিষন্নতার ভাব সৃষ্টি করেছিল। সেগুলো হচ্ছে (১) বিষয়টি ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর ঘরের নিকট গমন করবেন এবং তাওয়াফ করবেন, কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাওয়াফ না করেই মদীনা ফিরে যাওয়ার শর্তে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। (২) দুঃখ বেদনার দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে জয়যুক্ত করবেন বলে তিনি ঘোষণাও দিয়েছিলেন অথচ কুরাইশগণের চাপে পড়ে কি কারণে তিনি সন্ধির এ অবমাননাকর শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন তা কিছুতেই মুসলিমগণের বোধগম্য হচ্ছিল না। এ দুটি বিষয় মুসলিমগণের মনে দারুণ সংশয় সন্দেহ এবং শঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। এ দুটি বিষয় মুসলিমগণের অনুভূতি এতই আঘাতপ্রাপ্ত ও আহত হয়েছিল যে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এর সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার মতো মানসিক ধৈর্য তাঁদর ছিল না। ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং সম্ভবত ওমর (رضي الله عنه) আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সব চাইতে বেশী।

তিনি নাবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিতত হয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা কি সত্যের উপর দণ্ডায়মান নই এবং কাফিরেরা বাতিলের উপর?

নাবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই।'

তিনি পুনঃ রায় আরয করলেন, 'আমাদের শহীদগণ জান্নাত এবং তাদের নিহতগণ কি জাহান্নামে নয়? 'তিনি বললেন, 'কেন নয়।'

ওমর বললেন, 'তবে কেন আমরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে মুশরিকদের চাপ পড়ব এবং এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করব যে, এখনও আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনই ফয়সালা করেন নি?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبداً) 'ওহে খাত্তাবের সন্তান। আমি আল্লাহর রাসূল এবং কখনই তার অবাধ্য হতে পারব না। আমি বিশ্বাস করি যে সকল প্রয়োজন তিনিই সাহায্য করবেন এবং কখনই আমাকে ধ্বংস হতে দেবেন না।'

---

[1] ক সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৫ পৃঃ, হুদাইবিয়ার সন্ধি অধ্যায়।

ওমর (রাঃ) বললেন, 'আপনি কি আমাদের বলেন নি যে, আপনি আল্লাহর ঘরের নিকট গমন করবেন এবং তাওয়াফ করবেন?'

নাবী করীম (ﷺ) বললেন, (بلي، فأخبرتك أنا نأتيه العـــام؟) 'অবশ্যই, কিন্তু আমি কি এ কথা বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরই আসব।'

তিনি উত্তর করলেন, 'না'

নাবী (ﷺ) বললেন, (فإنك آتيه ومطوف بـــه) 'যাহোক ইনশাআল্লাহ্ তোমরা আল্লাহর ঘরের নিকট আসবে এবং তাওয়াফ করবে।

এরপর ওমর (রাঃ) ক্রোধে ও অভিমানে অগ্নিশর্মা হয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকেও সে সব কথা বললেন যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেছিলেন। প্রত্যুত্তরে আবু বকরও (রাঃ) সে সব কথাই বললেন যা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছিলেন এবং পরিশেষে এটুকুও বললেন যে, ধৈর্য সহাকারে নাবী (ﷺ) পথের উপর দণ্ডায়মান থাক যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য সমাগত না হয়। কেননা আল্লাহর শপথ তিনি সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।'

এরপর [سورة الفـــتح:١] ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ 'আমি তোমাকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয়।' [আল-ফাত্হ (৪৮) : ১] আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে এ সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমর (রাঃ)-কে আহ্বান করলেন এবং আয়াতটি পড়ে শোনালেন। তিনি তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি একে বিজয় বলতে পারি?

নাবী করীম (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ"।

এতে তিনি সান্তনা লাভ করলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

পরে ওমর (রাঃ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের বর্ণনা হচ্ছে, 'আমি সে দিন যে ভুল করেছিলাম এবং যে কথা বলেছিলাম তাতে ভীত হয়ে আমি অনেক আমল করেছি, প্রচুর দান খয়রাত করে আসছি, রোযা রেখে আসছি এবং দাস মুক্ত করে আসছি। এত শত করার পর এখন আমার মঙ্গলের আশা করছি।[1]

দুর্বল মুসলিমগণের সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গ (انحلت أزمة المستضـــعفين) : মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অন্য এক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেল। একজন মুসলিম মক্কায় যার উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল কোন ভাবে মুক্ত হয়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হল। তাঁর নাম ছিল আবু বাসীর। তিনি সাকীফ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কুরাইশদের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁকে ফেরত নেয়ার জন্য কুরাইশগণ দুই ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলল, 'আমাদের ও আপনার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা কার্যকর করে আবু বাসীরকে ফেরত দিন।'

তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু বাসীরকে তাদের হস্তে সমর্পণ করে দিলেন। তারা দুজন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল। পথ চলার এক পর্যায়ে তারা যুল হোলাইফা নামক স্থানে অবতরণ করে খেজুর খেতে লাগল। খাওয়া দাওয়া চলাকালীন অন্তরঙ্গ পরিবেশে আবু বাসীর একজনকে বলল, 'ওগো ভাই! আল্লাহর শপথ! তোমার তরবারী খানা আমার নিকট খুবই উৎকৃষ্ট মনে হচ্ছে। সে ব্যক্তি কোষ থেকে তরবারী

---

[1] হুদায়বিয়া সন্ধির চুক্তির বিস্তারিত বিবরণের উৎসগুলো হচ্ছে যথাক্রমে বারী ৭ম খণ্ড ৪৩-৪৫৮৮, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৩৭৮-৩৮১পৃ, ২য় খণ্ড, ৫৯৮-৬০০ ও ৭১৭ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৪-১০৬ পৃঃ। ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩০৮-৩২২ পৃঃ। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১২২-১২৭ পৃঃ, মোখতাসারুস সারীহ (শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত) ২০৭-৩৫০ পৃঃ, ইবনু জাওযী লিখিত তারীখে ওমর বিন খাত্তাব ৩৯-৪০ পৃঃ।

খানা বের করে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! এ হচ্ছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একে বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি।'

আবু বাসীর বলল, 'তরবারী খানা আমার হাতে একবার দাও ভাই, আমিও দেখি।'

সে তার কথা মতো তরবারী খানা তার হাতে দিল। এদিকে তরবারী হাতে পাওয়া মাত্রই আবু বাসীর তাকে আক্রমণ করে স্তুপে পরিণত করে দিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাণভয়ে পলায়ন করে মদীনায় এসে উপস্থিত হল এবং দৌড় দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে বললেন, (لقد رأى هذا ذعراً) 'কি হয়েছে একে এত ভীত দেখাচ্ছে কেন?'

লোকটি নাবী ﷺ-এর নিকট অগ্রসর হয়ে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাকেও হত্যা করা হবে।' এ সময় আবু বাসির সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ আপনার অঙ্গীকার পূরণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে তাদের হস্তে সমর্পণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাঁদের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ويل أمه، مِسْعَر حَرْبٍ لو كان له أحـــد)، 'তার মাতা ধ্বংস হোক , এ কোন সঙ্গী পেলে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করবে।'

নাবী করীম ﷺ-এর এ কথা শুনে আবু বাসীর বুঝে নিলেন যে, পুনরায় তাকে কাফিরদের হস্তেই সমর্পণ করা হবে। কাজেই , কালবিলম্ব না করে মদীনা থেকে বাহির হয়ে সমুদ্রোপকূল অভিমুখে অগ্রসর হনেল।

এদিকে আবু জান্দাল বিন সোহাইলও কোন ভাবে মুক্ত হয়ে মক্কা হতে পলায়ন করেন এবং আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হন। এরপর থেকে কুরাইশদের কেহ ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কা থেকে পলায়ন করে গিয়ে আবু বাসীরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতেন। এভাবে একত্রিত হতে তারা একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয়ে যান।

এরপর থেকে শাম দেশে গমনাগমনকারী কোন কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার খোঁজ খবর পেলেই তাঁরা তাদের উপর চড়াও হয়ে লোকজনদের মারধোর করতেন এবং ধনমাল যা পেতেন তা লুটপাট করে নিয়ে যেতেন। বার বার প্রহৃত এবং লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে অবশেষে কুরাইশগণ নাবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে আল্লাহ এবং আত্মীয়তারর মধ্যস্থতার বরাত দিয়ে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে তিনি যেন তাঁদরকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসেন। এ প্রেক্ষিতে নাবী করীম ﷺ তাঁদেরকে মদীনায় আগমনের জন্য আহ্বান জানালে তাঁরা মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশরা আরও প্রস্তাব করে যে, যে সকল মুসলিম মক্কা থেকে মদীনা চলে যাবে তাদের আর ফেরত চাওয়া হবে না।"[১]

কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণ (إسلام أبطـــال مـــن قـــريش) : হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর সপ্তম হিজরী সালের প্রথম ভাগে আমর বিন আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ওসমান বিন তালহা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরা যখন মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলেন তখন নাবী করীম ﷺ বললেন, (إن مكـــة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها). 'মক্কা তার কলিজার টুকরোদের (প্রিয়জনদেরকে) আমাদের নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে।[2]

---

[1] পূর্ব উৎস দ্রষ্টব্য।

[2] এ সাহাবাগণ কোন বছর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তি বৃত্তান্তা সংক্রান্ত পুস্তক সমূহে একে অষ্টম হিজরীর ঘটনা বলা হয়েছে। কিন্তু নাজ্জাশীর নিকট আমর বিন আসের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ছিল যা সপ্তম হিজরীতে ঘটেছিল। অধিকন্তু, এটাও বিদিত বিষয় যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ওসমান বিন তালহা ঐ সময় মুসলিম হয়েছিলেন। কারণ তিনি হাবশ হতে ফিরে এসে মদীনায় আসার ইচ্ছা করেন তখন পথিমধ্যে ঐ দুই জনের সহিত সাক্ষাত হয় এবং তিন জনেই এক সঙ্গে খিদমতে নববীতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, এঁরা সকলেই সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে মুসলিম হয়েছিলেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

المرحلة الثانية

দ্বিতীয় স্তর

طور جديد

নবতর পরিবর্তন ধারা

ইসলাম এবং মুসলামনদের জীবনে হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রকৃতই এক নবতর পরিবর্তন ধারার সূচনা করে। কারণ, ইসলামের শত্রুতা ও বিরোধিতায় কুরাইশগণই সর্বাধিক দৃঢ়, একগুঁয়ে এবং দাঙ্গাবাজ সম্প্রদায় হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। কিন্তু যখন তারা যুদ্ধের ময়দানে পশ্চাদপসরণ করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল তখন যুদ্ধবাজ তিনটি দলের মধ্যে (কুরাইশ, গাতফান ও ইহুদী) সব চাইতে শক্তিশালী দলটি (কুরাইশ) নমনীয়তা অবলম্বন করায় তাদের ঐক্যজোটের সুদৃঢ় বন্ধন আলগা হয়ে পড়ল। অধিকন্তু সমগ্র আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজার চাবিকাঠি এবং মূর্তিপূজকদের নেতৃত্বে ছিল কুরাইশদের হাতে অথচ তারা যখন যুদ্ধের ময়দান হতে পিছু হটে গেল তখন মূর্তিপূজকদের যুদ্ধোন্মাদনা ও উদ্দীপনা ভাটা পড়ে গেল এবং মুসলিমগণের প্রতি উৎকট বৈরী ভাবের গোত্রের দিক হতে বড় রকমের শত্রুতামূলক ক্রিয়াকলাপ কিংবা গোলমাল সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়নি। এ সব ব্যাপারে তারা যদি কিছু করেও থাকে তা তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার ফলশ্রুতি ছিল না, বরং তা ছিল ইহুদীদের প্ররোচনার কারণে।

ইহুদীগণের ব্যাপার ছিল, ইয়াসরির হতে বিতাড়িত হওয়ার পর খায়বরকে সর্বরকম যোগশাজস এবং ষড়যন্ত্রের আখড়া বা কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল। সেখানে শয়তান তাদের সর্বরকম ইন্ধনের যোগান দিচ্ছিল এবং তার ফেৎনা ফ্যাসাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মদীনার পার্শ্ববর্তী আবাদীর বেদুঈনদের উত্তেজিত করা এবং নাবী করীম (ﷺ) মুসলিমগণকে নিঃশেষ করা কিংবা তাঁদের উপর খুব বড় রকমের আঘাত হানার ফন্দি ফিকিরে ব্যস্ত ছিল। এ জন্যই হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নাবী করীম (ﷺ) সর্ব প্রথম ইহুদীদের প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

যাহোক, হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও শান্তি-স্বস্তির যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামী প্রচারভিযান ও দাওয়াতের বিস্তৃতির ব্যাপারে মুসলিমগণের জন্য তা একটি মোটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ সুযোগের ফলে তাঁদের উদ্যম যেমন উত্তরোণের বৃদ্ধি পেতে থাকল তেমনি কর্মক্ষেত্রের পরিধি ও প্রসারিত হতে থাকল। যুদ্ধ মহোদ্যমের তুলানায় শান্তিকালীন প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া অনেক বেশী কার্যকর প্রমাণিত হল। বিষয়ের উপস্থাপনা ও আলোচনার সুবিধার্থে সন্ধি পরবর্তী কার্যক্রমকে দ্বিবিধ দৃষ্টিকোন থেকে পরিবশেন করা হল।

১. প্রচারাভিযান এবং সম্রাট ও সামাজপতিদের নামে পত্র প্রেরণ, ২. এবং যুদ্ধাভিযান।

অবশ্য, এটা বলা অন্যায় কিংবা অমূলক হবে না যে, এ স্তরের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে বলার আগে সম্রাট এবং সমাজপতিগণের নামে পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা প্রয়োজন। কারণ ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রচার এবং প্রকাশের কথাই আগে আসে এবং এ কারণেই মুসলিমগণকে নানা নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও দুর্ভাবনার শিকার হতে হয়েছিল।

বাদশাহ ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ (مكاتبة الملوك والأمراء) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ ও সমাজপতিদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। নাবী করীম (ﷺ) প্রস্তাবিত পত্র সমূহ লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর নিকট এ বলে আরয করা হল যে, বাদশাহগণ সে অবস্থায় প্রত্র গ্রহণ করবেন যখন তার উপর সীলমোহর অংকিত থাকবে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি রূপোর আংটি করিয়ে নিলেন যার উপর মুদ্রিত বা খোদিত ছিল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ মুদ্রণ ছিল তিন পংক্তি বিশিষ্ট এক পংক্তিতে মুহাম্মাদুন অন্য এক পংক্তিতে 'রাসূলুন' এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'আল্লাহ' শব্দটি মুদ্রিত ছিল।

এ মুদ্রণের আকৃতি ছিল ঠিক এরূপ :

(وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر)[১]

অতঃপর বিচক্ষণ, সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাহাবীগণকে (রাঃ) বার্তাবাহক মনোনীত করে তাঁদের মাধ্যমে বাদশাহ ও সমাজপতিগণের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। আল্লামা মানসুরপুরী দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খায়বার যাত্রায় কয়েক দিন পূর্বে ১লা মুহরম ৭ম হিজরীতে এ বার্তা বাহকগণকে প্রেরণ করেছিলেন।[২] পরবর্তী পংক্তিগুলোতে ঐ সকল পত্র ও তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কার্যকর প্রভাব সমূহ সম্পর্কে উপস্থাপন করা হল।

১. হাবসের সম্রাট নাজ্জাশীর নামে পত্র (الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة) : উল্লেখিত নাজ্জাশির নাম ছিল আসহামা বিন আবযার। নাবী করীম ﷺ তাঁর নামে যে পত্রখানা লিখেছিলেন তা আমর বিন উমাইয়া যামরীর হাতে ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ কিংবা ৭ম হিজরীর প্রথমভাগে প্রেরণ করেছিলেন। তাবারী এ পত্রের রচনা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করলে এটা মনে হয় যে, এ পত্রটি সেই পত্র নয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর লিখেছিলেন বরং এটা ছিল সেই পত্র যা নাবী করীম ﷺ মক্কা যুগে জা'ফরকে তাঁর হাবশ হিজরতের সময় দিয়েছিলেন। কারণ, পত্রের শেষাংশে ঐ সকল হিজরত করীর সম্পর্কে বলা হয়েছে নিম্নলিখিত ভাষায় :

(وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر)

'আমি আপনার নিকট আমার চাচাতো ভাই জা'ফরকে মুসলিমগণের একটি দলসহ প্রেরণ করলাম। যখন তাঁরা আপনার নিকট পৌঁছবেন তখন তাঁদেরকে আপনার নিজের পাশে আশ্রয় দেবেন এবং কোন প্রকার জোর জবরদস্তি অবলম্বন করবেন না।'

ইমাম বায়হাকী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে অন্য একটি পত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন যা নাবী করীম ﷺ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এর অনুবাদ হল এরূপ :

(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي، الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدي، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبه ولا ولداً، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم،

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك)

'এটি নাবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে হাবশের সম্রাট নাজ্জাশী আসহামার নিকট প্রেরিত একটি পত্র। সালাম তাদের উপর যারা হেদায়াত অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর ও রাসূল ﷺ-এর উপর বিশ্বাস করবে। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় তাঁর কোনই অংশীদার নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর কোন সন্তানও নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দান করছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৮৭২-৮৭৩ পৃঃ।

[2] রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১৭১ পৃঃ।

জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ, অতএব, ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।'

'হে কিতাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ! এমন এক কথার দিকে আসুন যা আমাদের এবং আপনাদের মাঝে সমান এ জন্য যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করি না। তাঁর কোন অংশীদার ঠাওরাইনা এবং আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন কোন রবের কথা চিন্তা করি না। সুতরাং যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তাহলে বলে দাও যে সাক্ষী থাক, আমরা কিন্তু মুসলিম। যদি আপনারা (এ দাওয়াত) গ্রহণ না করেন তবে আপনার উপর নিজ জাতি নাসারাদের (খ্রিষ্টানদের) পাপ বর্তাবে)।" [সূরা আলু 'ইমরান (৩) : ৬৪]

ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেব (প্যারিস) ভিন্ন একটি পত্রের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। যা নিকট অতীতে হস্তগত হয়েছে। শুধুমাত্র একটি শব্দের পার্থক্যের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনু কাইয়ূমের গ্রন্থ যাদুল মাআদেও উল্লেখিত হয়েছে। এ পত্রখানার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ব্যাপারে ডক্টর সাহেব যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। নতুন যুগের আবিস্কার সমূহের নিরীখে তথ্যাদি চয়ণ করে এ পত্রখানার ফটো কেতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। পত্রখানার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিম্নরূপ :

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد:

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسي بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسي من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني، وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتى، والسلام على من اتبع الهدى)

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে হাবশের সম্মানিত সম্রাট নাজ্জাশীর নামে :

সে ব্যক্তির উপর সালাম যে হেদায়েতের অনুসরণ করবে। অতঃপর আমি আপনার প্রতি ঐ আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।

যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। যিনি পবিত্র এবং শান্তি, বিধানকারী, নিরাপত্তা প্রদানকারী, সংরক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, ঈসা (عليه السلام) বিন মরিয়ম আল্লাহ প্রদত্ত্ব আত্মা এবং তাঁর কালেমা। আল্লাহ তাঁকে পবিত্রতা এবং সতী-সাধ্বী মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তাঁর প্রদত্ত্ব আত্মা ও ফুৎকারের মাধ্যমে মরিয়ম ঈসার জন্য গর্ভ ধারণ করেছিলেন, যেমন ভাবে আদমকে স্বীয় কুদরতের হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন। আমি এক আল্লাহর প্রতি যাঁর কোনই অংশীদার নেই এবং তাঁর আনুগত্যের উপর পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাচ্ছি এবং সে কথার প্রতি ডাক দিচ্ছি যে, আপনি আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করবেন এবং আমার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন। কারণ, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ﷺ। আমি আপনাদের এবং আপনাদের সৈন্য সম্পদকে আল্লাহর প্রতি যিনি মহা-সম্মানিত ও মহা মহীয়ান আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমার উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পণ করেছেন তা আপনাদের পৌঁছে দিয়ে তা গ্রহণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করলাম। অতএব আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। সে ব্যক্তির জন্য সালাম যিনি হিদায়াত গ্রহণ ও অনুসরণ করবেন।[১]

---

[1] ডক্টর হামিদুল্লাহ বিরচিত 'রাসুলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী" দ্রঃ পৃঃ ১০৮, ১০৯, ১২২, ১২৩, ১২৫, যাদুল মাআদ এ শেষ বাক্য 'সালাম ঐ ব্যক্তির উপর যে হিদায়াত অনুসরণ করবে।" এর পরিবর্তে আপনি মুসলিম হউন দ্রঃ ৩য় খণ্ড ৬০ পৃঃ।

ডক্টর হামিদুল্লাহ পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, এটি সে পত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ যা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এ পত্রের প্রমাণপঞ্জী ভিত্তিক তথ্যাদি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এ কথার কোন দলিল পাওয়া যায় না যে, নাবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার পরে এ পত্রখানা প্রেরণ করেছিলেন, বরং ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় ইমাম বায়হাকী যে পত্রখানা উদ্ধৃত করেছেন তার বিষয় বস্তুর মিল ঐ সকল পত্রের সঙ্গে পরিলক্ষিত হয় নাবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে খ্রিষ্টান সম্রাট এবং সমাজপতিগণের নিকট যে সকল পত্র লিখেছিলেন। কারণ, উল্লেখিত পত্র সমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ভাবে আয়াতে কারীম :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ... ﴾

উদ্ধৃত করেছেন, অনুরূপভাবে বায়হাকীর বর্ণনাকৃত পত্রেও এ আয়াতে কারীমার উদ্ধৃতি রয়েছে। তাছাড়া, এ পত্রে স্পষ্টভাবে আসহামার নামও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ডক্টর হামিদুল্লাহর উদ্ধৃত পত্রে কাউরীর নামের উল্লেখ নেই। এ কারণে আমার জোরালো ধারণা হচ্ছে, ডক্টর হামিদুল্লাহর উদ্ধৃতি পত্রখানা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সে পত্র যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আসহামার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে লিখেছিলেন এবং সম্ভবত এ কারণেই ওর মধ্যে কারও নাম উল্লেখিত হয় নি।

পরে উল্লেখিত তরতীরের ব্যাপারে আমার নিকট কোনই প্রমাণ নেই, বরং ওর ভিত্তি শুধু ঐ অন্তর্নিহিত প্রমাণাদি যা উল্লেখিত পত্র সমূহের রচনা বা বিষয়বস্তু হতে পাওা যায়। তবে ডক্টর হামিদুল্লাহর উপস্থাপনের ব্যাপারে আমি অবাক হচ্ছি এই কারণে যে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা হতে বায়হাকীর উদ্ধৃত পত্র খানাকেই পূর্ণ দৃঢ়তার সাতে নাবী করীম ﷺ-এর সে পত্র সাব্যস্ত করেছেন যা আসহামার মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীর নামে লিখেছিলেন, অথচ এ পত্রে স্পষ্টভাবে আসহামার নাম উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান আছে আল্লাহর নিকটে।[1]

যাহোক, যখন আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) নাবী করীম ﷺ-এর পত্র খানা নাজ্জাশীর নিকট সমর্পণ করলেন, তখন নাজ্জাশী তা নিয়ে চোখের উপর রাখলেন এবং সিংহাসন থেকে অবতরণ করে জা'ফর বিন আবী তালিবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নাবী করীম ﷺ-এর নিকট পত্র লিখেন যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর খিদমতে নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ হতে :

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর তরফ হতে আপনার উপর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তা যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার উপযুক্ত নয়। অতঃপর হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অতীব মূল্যবান পত্রখানা আমার হস্তগত হয়েছে। যার মধ্যে আপনি নাবী ঈসা (عليه السلام)-এর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক আল্লাহর কসম! আপনি যা উল্লেখ করেছেন ঈসা (عليه السلام) তা হতে এক কণাও অতিরিক্ত ছিলেন না। তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন যেমনটি আপনি উল্লেখ করেছেন।[2]

অতঃপর আপনি যা কিছু আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন আমরা তা অবগত হলাম এবং আপনার চাচাত ভাই ও সাহাবা বৃন্দকে আপ্যায়ন করলাম। সুতরাং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। আমি আপনার পত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার চাচাত ভাইয়ের হাতে হাত রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম।[3]

---

[1] ডক্টর হামীদুল্লাহ সাহেবের গ্রন্থ 'হুযুর আকরাম ﷺ কী সিয়াসী জিন্দেগী পৃঃ ১০৮, ১১৪ এবং পৃঃ ১২১-১২৩।

[2] ঈসা (عليه السلام)-এর সম্পর্কে এ বাক্য ডঃ হামিদুল্লাহ সাহেবের এ মতামতের সাহায্য করছে যে, তার উল্লেখকৃত পত্রে আসাহাবার নাম ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

[3] যা'দুল মাআদ ৩য় খণ্ড ৬২ পৃঃ।

নাবী করীম ﷺ নাজ্জাশীকে এ কথাও বলেছিলেন যে, তিনি যেন জা'ফর এবং অন্যান্য হাবশ মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেন। এ কারণে তিনি আমর বিন উমাইয়া যামরী (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে দুটি নৌকা করে তাদের প্রেরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি নৌকায় আরোহীদের মধ্যে ছিলেন জা'ফর, আবু মুসা আশআরী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (رضي الله عنهم)। তাঁরা সরাসরি খায়বরে পৌঁছে খিদমতে নববীতে উপস্থিত হলেন। দ্বিতীয় নৌকার আরোহীদের মধ্যে ছিল বেশির ভাগই বিভিন্ন পরিবারের লোকজন। তারা সোজাসুজি মদীনায় গিয়ে পৌঁছল।[1]

এ নাজ্জাশী সম্রাট তাবুক যুদ্ধের পর ৯ম হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর দিনই নাবী করীম ﷺ সাহাবীগণ (رضي الله عنهم)-কে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। তাঁর মৃত্যুর পর অন্য একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সিংহাসনে সমাসীন হন। নাবী করীম ﷺ তাঁর নিকটেও একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।[2]

২. মিশরের সম্রাট মোকাওকেসের নামে পত্র (الكتاب إلى المقوقس ملـــك مصـــر) : নাবী করীম ﷺ মিশর ও ইসকান্দারিয়ার সম্রাট জোরাইজ বিন মাতার[3] নামে একটি মূল্যবান পত্র প্রেরণ করেন। তার উপাধি ছিল মুক্বাওকিস।

(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعـــد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبـــط،

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

পত্রখানার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে কিব্‌ত প্রধান মোকাওকেসের প্রতি-

সালাম তার উপর যে হিদায়াত অনুসরণ করবে। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুণ, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করবেন। কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরে নেন তাহলে কিবতীগণের পাপ বর্তিবে আপনারই উপর। হে কিবতীগণ এমন একটি কথার প্রতি তোমরা এগিয়ে এস যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান এ বিষয়ে যে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করব না এবং কাউকেও তাঁর অংশীদার করব না। অধিকন্তু, আমাদের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কাউকেও রব বা প্রভূ বানাবো না। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।[4]

এ পত্রখানা পৌঁছানোর জন্য হাতেব বিন আবি বালতা-কে মনোনীত করা হয়। তিনি মোকাওকেসের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এ পৃথিবীর উপর তোমাদের পূর্বে এ ব্যক্তি গত হয়ে গিয়েছেন যিনি নিজেই নিজেকে বড় প্রভূ মনে করতেন। আল্লাহ তাঁকে শেষ ও প্রথমের জন্য মানুষের শিক্ষণীয় করেছেন। প্রথমে তো তাঁর দ্বারাই

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৫৯ পৃঃ ও অন্যান্য।

[2] এ কথার অংশ বিশেষ সঞ্চীহ মুসলিমের র্বণনা হতে গ্রহণ করা যেতে পারে যা আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে। ২য় খন্ড ৯৯ পৃঃ।

[3] এ নাম আল্লামা মানসুরপুরী রহমাতুল্লিল আলামীন গ্রন্থে ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃঃ উল্লেখ করেছেন। ড. হামীদুল্লাহ তাঁর নাম বিণয়ামিন বলেছেন, দ্রঃ 'রাসূলে আকরাম ﷺ কী সিয়াসী জিন্দেগী পৃঃ ১৪১।

[4] ইবনু কাইয়ূম রচিত যাদুল মাআদ ৩/৬১ পৃঃ। অল্পদিন পূর্বে এ পত্র হস্তগত হয়েছে। ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেব যে, ফটোকফি ছেপেছেন তাতে এবং যাদুল মাআদে লিখিত পতে কেবল দুটি আক্ষরের পার্থক্য আছে। যা'দুল মাআদে আছে,'আসলিম তাসলাম, আসলিম ইয়ুতিকাল্লাহ........ আল ডক্টর হামিদুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ফটোকপির পত্রে আছে, 'ফাআসলিম তাসলাম ইয়ুতিকাল্লাহু। এ ভাবে যাদুল মাআদে আছে 'ইসমু আহলিল কিবতি' এবং পত্রে আছে 'ইসমুল বিততি' দ্রষ্টব্য 'রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী" পৃঃ ১৩৬-১৩৭ ।

মানুষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তাঁকেই প্রতিশোধের লক্ষ্য স্থলে পরিণত করেছেন। অতএব, অন্যদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং এমন যেন না হয় যে, অন্যেরা আপনার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।'

মোকাওকেস বলল, 'আমাদের একটি ধর্ম এবং যতক্ষণ এর চাইতে উত্তম কিছু না পাব ততক্ষণ আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারব না।' হাতেব বিন আবি বাতলাত' বলেন 'আমরা আপনাদেরকে ইসলামের দাওয়াতা দিচ্ছি যে ধর্মকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সকর ধর্মের পরিপূরক হিসেবে তৈরি করেছেন। দেখুন, এ নাবী ﷺ মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কুরাইশগরা এ ব্যাপারে সব চাইতে শক্তভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং ইহুদীরা সব চাইতে বেশী শত্রুতা করেছে। কিন্তু খ্রিষ্টানগণ সব চাইতে নিকটে থেকেছে। আমার জীবনের শপথ! মুসা (عليه السلام) যে ভাবে ঈসা (عليه السلام) সম্পর্কে শুভ সংবাদ দিয়েছেলেন। আমরা কুরআন মজীদের প্রতি আপনাদের ঐ ভাবে দাওয়াত দিচ্ছি, যেমনটি আপনারা তওরাতের অনুসারীদের ইঞ্জিলের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন। যখন যে সম্প্রদায়ের মাঝে যে নাবীর আবির্ভাব হয় তখন সেই সম্প্রদায়ের লোকজনদের সেই নাবীর উম্মত হিসেবে গণ্য করা হয়। সে নাবীর আনুগত্য করা তখন সে সম্প্রদায়ের লোকজনদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য হয়ে পড়ে। আপনারা এ নাবীর অনুসরণ করেছেন। আমরা কিন্তু আপনাদেরকে মসীহ-র দ্বীন হতে বিরত থাকতে বলছিনা, বরং তারই দ্বীনের পরিপূরক ব্যবস্থার অনুসরণের জন্য দাওয়াত দিচ্ছি।

মোকাওকেস বললেন, 'এ নাবীর ব্যাপারে আমি চিন্তাভাবনা করলাম। এতে আমি এটুকু পেলাম যে, তিনি কোন অপছন্দীয় কথা কিংবা কাজের নির্দেশ প্রদান করেন নি এবং কোন পছন্দনীয় কথা কিংবা কাজ হতে নিষেধও করেন নি। তাকে ভ্রষ্ট যাদুকর কিংবা মিথ্যুক ভবিষ্যদ্বক্তা বলেও মনে হয় না, বরং আমি তাঁর নিকট নবুওয়াতের এ সকল নিদর্শন পাচ্ছি যে তিনি গোপনকে প্রকাশ করেন এবং পরামর্শের সংবাদ দিতেছেন। আমি এ ব্যাপারে অধিক চিন্তাভাবনা করব। মোকাওকেস নাবী করীম ﷺ-এর পত্রখানা হাতে নিয়ে অন্যন্ত সম্মানের সঙ্গে হাতীর দাঁতের তৈরি একটি বাক্সে রাখলেন এবং তাতে সীলমোহর লাগিয়ে তা যত্ন সহকারে রেখে দেয়ার জন্য একজন দাসীর হাতে দিলেন। অতঃপর আরবী ভাষা লিখতে সক্ষম একজন কেরানী (লেখক) কে ডাকিয়ে নিয়ে রাসূলে করীম ﷺ-এর খিদমতে নিম্নবর্ণিত পত্রখানা লিখলেন।

(بسم الله الرحمن الرحيم. لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد:
فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين، لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت بغلة لتركبها، والسلام عليك).

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম মুহাম্মদ ﷺ বিন আব্‌দুল্লাহর প্রতি মহান মুক্বাওক্বিস কিবতের পক্ষ হতে :

'আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন। অতঃপর, আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রে উল্লেখিত আপনার কথাবার্তা ও দাওয়াত আমি উপলব্ধি করেছি। এখন যে, একজন নাবীর আবির্ভাব ঘটবে সে বিষয়ে আমার ধারণা রয়েছে। আমরা ধারণা ছিল যে, শাম রাজ্য থেকে আবির্ভূত হবেন।

আমি আপনার প্রেরিত সংবাদ বাহকের যথাযোগ্য সম্মান ও ইজ্জত করলাম। আপনার প্রতি আমর গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আপনার খিদমতে দুটি দাসী প্রেরণ করলাম। কিবতীদের মাঝে যারা বড় মর্যাদার অধিকারিণী। অধিকন্তু, আপনার পরিধানের জন্য কিছু পরিচ্ছদ এবং বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি খচ্চর পাঠালাম সামান্য উপঢৌকন হিসেবে। অতঃপর আপনার খিদমতে পুনরায় সালাম পেশ করলাম।'

মোকাওকেস এর অতিরিক্ত আর কিছুই লিখেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও তিনি কিন্তু ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। তাঁর প্রেরিত দাসী দুটির নাম ছিল মারিয়া এবং শিরীন। খচ্চরের নাম ছিল দুলদুল। খচ্চরটি মুয়াবিয়ার সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল।[1]

---

[1] যাদুল মাআদ ৩য় খন্ড ৬১ পৃঃ।

নাবী করীম ﷺ মারিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে নাবী পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন। **শিরীনকে** হাস্‌সান বিন সাবেত আনাসারীর হাতে দেয়া হয়।

৩. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট রাসূলুল্লাহর : নাবী করীম ﷺ পারস্য সম্রাট কেসসার (খসরু) নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। এ প্রত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فـارس، سـلام على من اتبع الهدي، وآمن بـالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك).

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কেসসার প্রতি।

সে ব্যক্তির উপর সালাম যে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপসনার যোগ্য নেই। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বনা করছি। কারণ, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য প্রেরিত, যাতে পাপাচারের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে জীবিতদের সতর্ক করে দেয়া যায় এবং কাফিরদের নিকট সত্য প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ দলিল প্রমাণাদি পুরোপুরি কার্যকর থাকে) অতঃপর তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে নিরাপদে থাকবে। আর যদি তা অস্বীকার কর তাহলে তোমার উপর অগ্নি পূজকদের পাপও বর্তিবে।

এ পত্র বহনের দূত হিসেবে নাবী করীম ﷺ আব্‌দুল্লাহ বিন হোযাফা সাহমীকে মনোনীত করেন। তিনি এ পত্রখানা বাহরায়েনের প্রধানের নিকট সমর্পণ করেন। কিন্তু এ কথাটা কেসসার নিকট পাঠিছেছিলেন আব্‌দুল্লাহ বিন হোযাফা সাহমীকেই প্রেরণ করেছিলেন। যাহোক, যখন এ পত্রখানা কেসসাকে পড়ে শোনানো হয় সে তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দাম্ভিকতার সঙ্গে বলল, 'আমার প্রজাদের অন্তর্ভূক্ত একজন নিকৃষ্ট দাস তার নিজ নাম আমার নামের পূর্বে লিখেছে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কেসসার এ ঔদ্ধত্যের কথা অবগত হলেন তখন বললেন, 'আল্লাহ যেন তার সাম্রাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে বিনষ্ট করে ফেলেন।' এবং যা তিনি বললেন বাস্তবক্ষেত্রে তাই কার্যকর হয়ে গেল। অতঃপর কেসরা তারা ইয়েমেনের গর্ভণর বাজানকে এ বলে লিখল যে, 'দুজন কর্মঠ এবং শক্তিশালী লোক পাঠিয়ে হেজাযের সেই লোককে আমার দরবারে হাজির কর।' কেসসার নিদের্শানুযায়ী বাজান দুই ব্যক্তিকে মনোনীত করল এবং তাদের হতে একটি পত্র রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করল। পত্রে রাসূলে করীম ﷺ-কে কেসরা প্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

যখন তারা মদীনা গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হল তখন তাদের একজন বলল, 'সম্রাট কেসরা ইয়েমেনের গভর্নর বাজানের নিটক একটি পত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেছেন একজন লোক পাঠিয়ে আপনাকে কেসরা প্রাসাদে হাজির করার জন্য। বাজান প্রধান সে নির্দেশ পালনার্থে আপনার নিকট আমাদের প্রেরণ করেছেন। অতএব, আপনি আমাদের কেসরা প্রাসাদে চলুন। সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই ধমকের সূরে কথাবার্তা ও বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আগামী কাল সাক্ষাত কর।'

এদিকে মদীনায় যখন এ চিত্তাকর্ষক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল তখন কেসরা প্রাসাদে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রচণ্ডবেগে প্রজ্জ্বালিত হচ্ছিল। এর ফল শ্রুতিতে কায়সারের সৈন্য দলের হাতে পারস্য সৈন্যদের পর পর পরাজয়ের পর খসরুর ছেলে শিরওয়াই পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে

আরোহণ করে। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৭ম হিজরীর ১০ই জুমাদাল উলা মঙ্গলবা রাত্রে।[১] ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন।

পরবর্তী প্রভাতে যখন পারস্য প্রতিনিধিদ্বয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হল তখন তিনি তাদেরকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা বলল, 'বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু আছে কি? এ আপনি কী বললেন? এ থেকে অনেক কিছু সাধারণ কথাও আমরা আপনার অপরাধগুলোর অন্তর্ভূক্ত গণনা করেছি। তবে কি আপনার এ কথা বাদশাহর নিকট লিখে পাঠাব?'

নাবী ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে আমার এ সংবাদ জানিয়ে দাও এবং এ কথাও বলে দাও যে আমার দ্বীন ও আমার শাসন ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যেখানে কেসরা পৌঁছেছে, রবং তার চাইতেও অগ্রসর হয়ে ঐ জায়গায় গিয়ে থামবে যার আগে উট এবং ঘোড়ার পা যাবে না। তোমরা উভয় তাকে এ কথাও বলে দিবে যে যদি সে মুসলিম হয়ে যায় তাহলে তার আয়ত্ত্বাধীনে যা কিছু সমস্তই তাকে দিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে তোমাদের জাতির জন্য বাদশাহ করে দেয়া হবে।'

এরপর তারা দুজন মদীনা থেকে যাত্রা করে বাজনার নিকট গিয়ে পৌঁছাল এবং তাকে বিস্তারিতভাবে সব কিছুই অবহিত করল। কিছু সময় পরে এ মর্মে একটি পত্র এল যে, শিরওয়াই আপন পিতাকে হত্যা করেছে। শিরওয়াই তার পত্র মাধ্যমে এ উপদেশও প্রদান করল যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমার পিতা তোমাদের পত্র লিখেছিল পুনরায় নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁকে উত্তেজিত করবে না।'

এ ঘটনার ফলে বাজান এবং তার পারসীয়ান বন্ধুগণ (যারা ইয়েমেনে অবস্থান করছিল) মুসলিম হয়ে গেল।[২]

৪. রোমের সম্রাট কায়সারের নামে পত্র : সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ হাদীসে এ পত্রখানার বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। নাবী করীম ﷺ এ পত্রখানা রোম সম্রাট হেরাকল এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এ পত্রখানার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিম্নরূপ :

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدي، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾) [آل عمران: ٦٤].

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হেরাকল এর প্রতি-

সেই ব্যক্তির উপর সালাম যে হেদায়াতের অনুসরণ করে চলবে। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান করবেন। কিন্তু যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার উপর প্রজাবৃন্দেরও পাপ বর্তাবে। হে আল্লাহর গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! এমন এক কথার প্রতি আসুন যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান এ জন্য যে, আমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারও উপাসনা করব না, তার সঙ্গে কাউকেও শরীক বা অংশীদার করব না। তা সত্ত্বেও যদি লোকজন মুখ ফিরে নেয় তবে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।[৩]

---

[1] আল্লামা ইবনু হাজার প্রণীত গ্রন্থ ফতহুলবারী , ৮ম ১২৭ পৃঃ।

[2] আল্লাম খুযরী 'মোহযারাত ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃঃ, ফতহুলবারী ৮ম খণ্ড ১২৭-১২৮ পৃ: এবং রহমাতুল্লিল আলামীন দ্রঃ।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৪-৫ পৃঃ।

এ পত্র প্রেরণের জন্য নাবী করীম ﷺ দূত মনোনীত করলেন দেহয়াহ বিন খলীফা কালবীকে। নাবী ﷺ তাঁকে দির্দেশ প্রদান করলেন যে, তিনি যেন এ পত্র খানা বসরার প্রধানের নিকট সমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি সেটা পৌঁছে দেবেন কায়সারের নিকট। এরপর এ প্রসঙ্গে যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল তাঁর বিবরণ সহীহ বুখারীতে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, আবু সুফয়ান বিন হারব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হেরাকল তাঁকে একটি কুরাইশ দলের সঙ্গে ডেকে পাঠান। এ দলটি হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির আওতায় নিরাপত্তা লাভ হেতু শামদেশে গিয়েছিল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। এঁরা ঈলিয়া (বায়তুল মোকাদ্দাস) নামক স্থানে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন।[1]

হেরাকুল তাঁদেরকে তাঁর দরবারে আহ্বান করলেন। ঐ সময় তাঁর পাশে রোমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দোভাষীর মাধ্যমে মুসলিমগণের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী বলে দাবী করেছেন তাঁর সঙ্গে আপনাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট?' আবু সুফয়ানের বর্ণনা যে, 'আমি বললাম আমি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট।'

হেরাকল বললেন, 'তাকে আমার নিকট নিয়ে এস এবং তার সঙ্গী সাথীদেরকেও তার পেছনে বসাও।"

এরপর হেরাকল নিজ দোভাষীকে বললেন, 'আমি এ ব্যক্তিকে এ নাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। এ যদি মিথ্যা বলে তবে তোমরা তা মিথ্যা বলে প্রমাণ করবে।'

> আবু সুফয়ান বলল, 'আল্লাহর কসম! মিথ্যা বলার কারণে আমাকে মিথ্যুক বলে আ্যখায়িত করার ভয় না থাকত তবে আমি অবশ্যই নাবী ﷺ সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।'

আবু সুফয়ান বলেছেন, 'এরপর নাবী ﷺ সম্পর্কে হেরাকল আমাকে প্রথম যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন তা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন?

আমি বললাম, 'তিনি উচ্চ বংশোদ্ভূত।'

হেরাকল বললেন, 'তবে এ কথা তাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি বলেছিল।?'

আমি বললাম, 'না", হেরাকল পুনরায় বললেন, 'তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিল? আমি বললাম, 'না' হেরাকল বললেন, 'আচ্ছা তবে সম্মানিত লোকজন তাঁর অনুসরণ করেছে না দুর্বল লোকজন?'

আমি বললাম, 'বরং দুর্বল লোকজন।'

হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে?'

আমি বললাম, 'কমছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

হেরাকল বললেন, 'এ দ্বীন গ্রহণের পর কোন ব্যক্তি কি বিদ্রোহী হয়ে ধর্মত্যাগ করছে?'

আমি বললাম, 'না'

হেরাকল বললেন, 'তিনি যখন থেকে এ সব কথা বলছেন তাঁর পূর্বে কি তাঁকে তোমরা কোন মিথ্যার সঙ্গে জড়িত দেখেছ?'

আমি বললাম, 'না'

হেরাকল বললেন, 'তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন?'

আমি বললাম, না, তবে এখন আমরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছি। এর মধ্যে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। জানি না, এ ব্যাপারে এরপর তিনি কি করবেন।'

---

[1] ঐ সময় কায়সার সে কথার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপননের জন্য হিমস হতে ঈলিয়া (বায়তুল মোকদ্দাস) গিয়েচিল যে, আল্লাহ তার হাতে পারস্য বাসিকে পরাজিত করেছে। (সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৯৯ পৃঃ) এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে পারস্যবাসী খসরু পারভেজকে হথ্যা করার পর রোমীদের নিকট হতে তাদের দখলকৃতঅঞ্চল সমূহ ফেরতের শর্থে সন্ধি করল এবং তারা ক্রুম ও ফেরত দিল। যে কারণে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যে এর উপর ঈ্সা (عليه السلام)-কে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল। উক্ত সন্ধির পর কায়সার ক্রুশকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রকাশ্যে বিজয়ের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনরে উদ্দেশ্যে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের অর্থাৎ ৭ম হিজরী তে (ঈলিয়া) বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আবু সুফয়ান বলেছেন যে, এ বাক্যটি ছাড়া অন্য কথাও তাঁর বিপক্ষে কিছু বলার সুযোগ আমি পাই নি।
হেরাকল বললেন, 'কোন সময় তাঁর সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছ?'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ'
হেরাকল বললেন, 'তোমাদের এবং তাঁর যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ ছিল?
আবু সুফয়ান বললেন, আমাদের ও তাঁর মাঝে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল বালতির ন্যায় অর্থাৎ তিনি আমাদের পরাজিত করেছেন এবং আমরা তাঁকে পরাজিত করেছি।'
হেরাকল বললেন, 'তিনি তোমাদেরকে কি ধরণের কথাবার্তা এবং কাজকর্মের নির্দেশ করেন?'
আমি বললাম, 'তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে তার সঙ্গে কউকেও শরীক না করতে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা বলতেন তা ছেড়ে দিতে সালাত কায়েম করতে, সত্যবাদিতা, মিথ্যাচার ও পুণ্যশীল আচরণ করতে এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিতেছেন।'
এরপর হেরাকল তাঁর দোভাষীকে বললেন, 'তুমি ঐ ব্যক্তিকে (আবু সুফয়ানকে) বল যে, আমি তোমাকে এ নাবীর সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম তখন তুমি বললে যে, তিনি হচ্ছেন উচ্চবংশোদ্ভূত ব্যক্তি। এটাই নিয়ম যে নিজ জাতির ক্ষেত্রে নাবীগণ উচ্চ বংশীয় হয়ে থাকেন।
আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, (নবুওয়াতের) এ কথা তাঁর পূর্বেও কি তোমাদের মধ্যে কেউ বলেছিল? তুমি উত্তর দিয়েছ 'না'। আমি বলছি যে, এর পূর্বে অন্য কেউ যদি এ কথা বলে থাকত তাহলে আমি বলতাম যে এ ব্যক্তি এমন এক কথার অনুকরণ করছে যা এর পূর্বে বলা হয়েছিল।
আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তাঁর পিতা কিংবা পিতৃব্যে মধ্যে কেউ কি বাদশাহী করেছেন। এর উত্তরে তুমি বলেছ, 'না"। এ প্রসঙ্গে আমি বলছি যে, যদি পিতা কিংবা পিতৃব্যের মধ্য হতে কেউ বাদশাহী করেছেন বলে প্রমাণিত হতো তাহলে বলতাম যে, এ ব্যক্তি পিতা কিংবা পিতৃব্যের রাজত্বের দাবীদার হওয়ার প্রেক্ষাপটেই এ কথা বলছেন।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইতোপূর্বে তাঁকে কি মিথ্যুক বলে দোষারোপ করা হয়েছে? তুমি বললে, 'না' আমি ভাল ভাবেই জানি যে, যে লোক মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করে না সে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর অনুসরণকারীগণ বিত্তশালী ও প্রভাবমালী লোক না নিম্নবিত্ত ও দুর্বলতর শ্রেণীর লোক। তার উত্তরে তুমি বললে যে, দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এ শ্রেণীর লোকেরাই পয়গম্বরদের অনুসারী হয়ে থাকেন।
আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, 'এ দ্বীনে প্রবেশ করার পর কি কেউ বিরক্ত হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়?' উত্তরে তুমি বলেছ, 'না'। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি হচ্ছে, দ্বীনে প্রবেশকারী ব্যক্তি ঈমানের আস্বাদ পেয়ে গেলে এরূপই হয়ে থাকে।
আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকেন?
উত্তরে তুমি বলেছিলে, 'না'
পয়গম্বরের ব্যাপার এ রকমই হয়ে থাকে। তিনি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।
আমি এ প্রশ্নও করেছিলাম যে, তিনি কি ধরণের কথা এবং কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন? উত্তরে তুমি বললে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক না করার জন্য বলেছেন। অধিকন্তু, মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে, সলাত কায়েম করতে এবং সত্যবাদিতা, মিথ্যাচারিতা ও পূণ্যশীলতা অবলম্বন করতে বলেছেন।
এ প্রসঙ্গে এখন কথা হচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে তুমি যা কিছু কলেছ তা যদি সঠিক ও সত্য হয়, তাহলে এ ব্যক্তি খুব শীঘ্রই আমার দুই পদতলের জায়গার অধিকার লাভ করবেন। আমার জানা ছিল যে, এ নাবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আসবেন। যদি নিশ্চিত হতাম যে আমি তাঁর নিকট

পৌঁছিতে সক্ষম হব তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করতাম। আর যদি তাঁর নিকটবর্তী হতাম তাহলে তাঁর পদদ্বয় ধৌত করে দিতাম।'

এরপর হেরাকল রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রেরিত পত্রখানা চেয়ে নিয়ে পাঠ করলেন। পত্রখানা পাঠ করে যখন শেষ করলেন তখন সেখানে শ্রুত কণ্ঠস্বর সমূহ ক্রমান্বয়ে উচ্চমার্গে উঠতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত খুব শোরগোল সৃষ্টি হয়ে গেল। হেরাকলের নির্দেশে আমাদের তখন সেখান থেকে বাহির করে দেয়া হল। আমাদের যখন বাহিরে নিয়ে আসা হল তখন আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, 'আবু কাবশার'[1] ছেলের ব্যাপারটি বড় শক্তিশালী হয়ে গেল। তার সম্পর্কিত বানুল আসফার[2] (রোমীয়দের) সম্রাট ভয় করছেন। আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, এর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীন জয়যুক্ত হয়ে যাবে। এমনকি আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের স্থান করে দিলেন।

এ কায়সরের উপর নাবী করীম ﷺ-এর মুবারক পত্রের যে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল তা আবু সুফয়ান নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ মুবারক পত্র যে কায়সারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, এর প্রভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত দেহয়া কালবী (রাঃ)-কে অর্থ সম্পদ এবং মূল্যবান পোশাক দ্বারা পুরস্কৃত করেছিলেন। কিন্তু দেহয়া কালবী (রাঃ) যখন এ সকল উপঢৌকন সহ প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন হুসমা নামক স্থানে জোযাম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক তাঁর কাছ থেকে সব কিছু লুট পাট করে নিয়ে যায়। দেহয়া মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর নিজ গৃহে না গিয়ে খিদমতে নববীতে উপস্থিত হন এবং নাবী করীম ﷺ-কে সব কিছু অবহিত করেন।

ঘটনা সবিস্তারে অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে পাঁচ শত সাহাবা কেরামের (রাঃ) একটি দলকে হুসমা অভিমুখে প্রেরণ করেন। যায়েদ (রাঃ) রাত্রিবেলা অতর্কিতেভাবে জোযাম গোত্রের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের কিছু সংখ্যক লোকাকে হত্যা করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক গবাদি পশু ও মহিলাকে আটক করে নিয়ে আসেন। গবাদি পশুর মধ্যে ছিল এক হাজার উট ও পাঁচ হাজার ছাগল। আটককৃতদের মধ্যে ছিল এক শত মহিলা এবং শিশু।

যেহেতু নাবী করীম ﷺ এবং জোযাম গোত্রের মধ্যে পূর্ব হতেই সন্ধিচুক্তি বলবৎ ছিল সেহেতু এ গোত্রের অন্যতম নেতা যায়েদ বিন রেফায়া জোযামী কালবিলম্ব না করে নাবী করীম ﷺ সমীপে উপস্থিত হয়ে বাদানুবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ করলেন। এ গোত্রের কিছু লোকজন সহ যায়েদ বিন রেফায়া পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে দেহয়া কালবী যখন ডাকাত দলে কবলে পতিত হল তখন তিনি তাঁর সাহায্যও করেছিলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিবাদ গ্রহণ করে গণিমতের সম্পাদ এবং আটককৃতদের ফেরতদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সাধারণ যুদ্ধের ইতিহাস বিশারদগণ উল্লেখিত ঘটনাকে হুদায়াবিয়া সন্ধির পূর্বের ব্যাপারে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা হচ্ছে চরম ভ্রান্তির ব্যাপার। কারণ, কায়াসারের নিকট মুবারক পত্র প্রেরণের ঘটনাটি ছিল হুদায়রিয়া সন্ধির পরের। এ জন্যই আল্লামা ইবনু কাইয়ূম বলেছেন যে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল নিসন্দেহে হুদায়বিয়া সন্ধির পরে।[3]

৫. মুনযির বিন সাভীর নামে পত্র (الكتاب إلى المنذر بن ساوي) : মুনযির বিন সাভী ছিলেন বাহরায়েনের গর্ভণর। ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে নাবী করীম ﷺ তাঁর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রখানা বহন

---

[1] অবু কাবশার ছেলে বলতে স্বয় নাবী করীম ﷺ-কে বুঝান হয়েছে। নাবী করীম ﷺ-এর দাদা কিংবা নানা উভয়ের মধ্যে কোন এক জনের উপনাম ছিল আবু কাবশা। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ উপনামটি ছিল নাবী করীম ﷺ-এর দুধ পিতার, অর্থাৎ হালিমা সা'দিয়ার স্বামী। যাহোক, আবু কাবশা নামটির পরিচিত তেমন একটা ছিল না। তৎকালীন আরবের একটি নিয়ম ছিল এ রকম যে, কেউ কারো দোষ বাহির করার ইচ্ছা করত তখন তাকে তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে হতে কোন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে দেয়া হত।

[2] বানুল আসফার বলতে আসফারের সন্তান বুঝানো হয়েছে। আসফার অর্থ হলুদ রঙ। রোমীদেরকে বানুল আসফার বলা হত। কারণ রোমের যে ছেলেন মাধ্যমে রোমীয় বংশের উদ্ভব হয়েছিল কোন কারণে সে আসফার উপাধিতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল।

[3] দ্রষ্টব্য আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম রচিত যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ, তালকিহুল ফোহুমের পৃষ্ঠার হাশিয়াহ ২৯ পৃঃ।

করেন আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)। পত্র পাওয়ার পর মুনযের রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ মর্মে উত্তর প্রদান করেন, 'হে আল্লাহর রাসল ﷺ! আপনার পত্রখানা আমি বাহরাইন বাসীগণকে পাঠ করে শুনিয়ে দিলাম। কতগুলো লোক ইসলামের ভালবাসা এবং পবিত্রতার মনোভাব ব্যক্ত করে তার সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকা বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে মুখ ফিরে নিল। আমার জমিনে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকও আছে। অতএব এ ব্যাপারে আপনি আপনার নিজস্ব কর্ম প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন।

প্রত্যুত্তরে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে এ পত্র লিখলেন,

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك. ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية).

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে মুনাযের বিন সাভীর নিকট পত্র-

আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক । সর্ব প্রথমে আমি ঐ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করছি যিনি ব্যতীত অন্য কেউ প্রশংসা কিংবা উপাসনার উপযুক্ত নয়। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল।

অতঃপর আমি তোমাদেরকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার স্মরণ করে দিচ্ছি। এটা অবশ্যই স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তি সৌজন্য প্রদর্শন করবে এবং পূণ্য অর্জন করবে সে নিজের উপকারার্থে তা করবে এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতিনিধির অনুকরণ ও তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করবে সে যেন আমারই আনুগত্য করবে। যে তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে। সে যেন আমারই সঙ্গে তা করল। আমার প্রতিনিধিগণ আপনার প্রশংসা করেছে এবং আপনার জাতি সম্পর্কে আমি আপনার সুপারিশ গ্রহণ করেছি। অতএব, মুসলিমগণ যে অবস্থার মধ্যে ঈমান এনেছে তাদরকে সেই অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিন। আমি অপরাধীদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছি। অতএব, তাদেরকে গ্রহণ করে নিন এবং যতক্ষণ আপনি সংশোধনের পথ অবলম্বন করে থাকবেন আমরা আপনাদেরকে আপনাদের কাজ হতে অপসারিত করব না। তবে যারা ইহুদী ধর্ম অথবা মাজ্জুসিয়াতের উপর বিদ্যমান থাকবে। তাদের উপর (জিজিয়া) কর প্রযোজ্য হবে।[1]

৬. ইয়ামামা প্রধান বিন আলীর নিকট পত্র (الكتاب إلى هَوْذَة بن علي صاحب اليمامة) : নাবী করীম ﷺ ইয়ামামার গর্ভণর হাওযা বিন আলীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهي الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك).

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে হাওযা বিন আলীর প্রতি-

---

[1] যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ৬১-৬২ পৃঃ। এ পত্র খানা নিকট অতীতে হস্তগত হয়েছে। ড: হামীদুল্লাহ এর ফটো প্রচার করেছেন। যাদুল মায়াদের রচনা এবং সেই ফটোর রচনায় শুধু একটি শব্দের পার্থ্য রয়েছে । অর্থাৎ ফটোতে লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার পরিবর্তে লা ইলাহা গায়রুহু রয়েছে।

সে ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে, হেদায়াতের অনুসরণ করে। আপনাদের জানা উচিত যে আমার দ্বীন, উট এবং ঘোড়াগুলোর উপস্থিতির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে থাকবে। অথএব, ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি তে থাকবেন। আপনার অধিনস্থ যা কিছু আছে তা আপনার জন্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখব।'

এ পত্রখানা বহনের জন্য দূত বা প্রতিনিধি হিসেবে সালীত বিন আমর আমেরীকে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মনোনীত করা হয়। সালীত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ মোহরাঙ্কিত পত্র খানা নিয়ে হাওয়ার নিকট গমন করেন। হাওযা তাঁকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন ও আতিথ্য প্রদান করেন। সালীত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে পত্রখানা পাঠ করে শোনান। পত্রের মর্ম অবগত হওয়ার পর তিনি মধ্যম পন্থায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে লিখলেন,

'আপনি যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন তার উৎকর্ষতা এবং শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার কিছুই নেই। এ ব্যাপারে আমার অন্তরে যথেষ্ট ভয় ভীতির সঞ্চার হয়েছে এবং আমি কিছু খিদমত প্রদানের মনস্থ করেছি। অতএব, আমার উপর কিছু কাজ কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে আমি আপনার আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত আছি।' তিনি সালীত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে অনেক উপঢৌকন ও প্রদান করেন। তাঁকে হিজরের তৈরি কাপড় চোপড়ও প্রদান করেন। সালীত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ সকল উপঢৌকন সহ মদীনায় ফিরে এসে খিদমতে নববীতে উপস্থিত হন এবং সব কিছুর সম্পর্কে অবহিত করেন।

নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পত্রখানা পাঠ করে শোনানো হলে তিনি বললেন, (لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد، وباد ما في يديـــه). 'যদি সে জমিনের একটি অংশ আমার নিকট থেকে চায় তবুও আমি তাকে তা দিব না। সে নিজে ধ্বংস হবে এবং তার হাতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে"। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের পর ফিরে আসেন তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এ সংবাদ প্রদান করেন যে, হাওযার মৃত্যু হয়েছে।

নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبي، يقتل بعـــدي) 'শোন! ইয়ামামায় একজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে যাকে আমার পর হত্যা করা হবে।'

একজন বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাকে কে হত্যা করবে।' নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (أنـــت وأصحابك)، 'তুমি ও তোমার সাথী। বাস্তবিক পক্ষে তাই হয়েছিল।[1]

৭. দামেশকের গভর্নর হারেস বিন আবি শামর গাসসানরীর নামে পত্র (الكتاب إلى الحارث بن أبي شَمِر الغساني صاحب دمشق) : নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট যে পত্র লিখেছিলেন তার বিয়বস্তু নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقي لك ملكك).

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ হতে হারেস বিন আবি শামর গাসসানীর প্রতি। সে ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং হেদায়াতের অনুসরণ করে। আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে, সেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন যিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনই অংশীদার নেই এবং যিনি একমাত্র উপসনার উপযুক্ত। ইসলামের দাওয়াত কবুল করুন, আপনাদের জন্য আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

---

[1] যা'দুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ৬৩ পৃঃ।

এ পত্র প্রেরণ করা হয় আসাদ বিন খোযায়মা গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবী শোজা' বিন অহাবে (রাঃ)-এর হাতে। যখন তিনি এ পত্রখানা হারেসের হাতে সমর্পণ করেন। তখন সে বলল, 'আমার রাজত্ব কে ছিনিয়ে নিতে পারে? আমি তার উপর আক্রমণ পরিচালনা করব।' সে ইসলাম গ্রহণ করে নি।

৮. আম্মানের সম্রাটের নামে পত্র (الكتاب إلى ملك عُمَان —) : নাবী করীম ﷺ আম্মানের সম্রাট জাইফার এবং তাঁর ভাই আবদের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাদের উভয়ের পিতার নাম ছিল জালান্দি। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدي، أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله ﷺ إلى الناس كافة، لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما [أن تقرا بالإسلام] فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মুহাম্মদ ﷺ বিন আব্দুল্লাহর পক্ষ হতে জালান্দির দুই পুত্র জাইফার এবং আবদের নামে।

শান্তি বর্ষিত হোক সে ব্যক্তির উপর যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করে চলেন। অতঃপর আমি আপনাদের দু'জনকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বমানবের নিকট প্রেরিত হয়েছি যাতে জীবিত ব্যক্তিদের শেষ পরিণতির বিভীষিকা হতে সতর্ক করে দেই এবং কাফিরদের উপর আল্লাহর কথা সত্য প্রমাণিত হয়। যদি আপনারা দুইজন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন তবে আপনাদেরকেই শাসক এবং গর্ভণর নিযুক্ত করে দিব। কিন্তু আপনারা যদি ইসলামের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের রাজত্বে ঘোড়সওয়ারী সৈন্যদের আক্রমণ পরিচালিত হবে এবং আপনাদের রাজত্বের উপর আমার নবুয়ত জয়যুক্ত হবে।

এ পত্র বহনের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে আমর বিন আসকে মনোনীত করা হয়। তিনি বর্ণনা করেছেন, 'মদীনা থেকে যাত্রা করে আমি আম্মানে গিয়ে পৌঁছি এবং আবদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনিই অধিক দূরদর্শী এবং কোমল স্বভাবের ছিলেন। আমি বললাম, আমি আপনার এবং আপনার ভাইয়ের নিকট রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেছি।' তিনি বললেন, বয়স এবং রাজত্ব উভয় দিক দিয়েই আমার ভাই আমার চাইতে বড় এবং আমার উর্ধ্বতন। এ কারণে আমি আপনাকে তাঁর নিকট পৌঁছে দিচ্ছি যেন তিনি আপনার পত্রখানা পাঠ করেন।

অতঃপর তিনি বললেন, 'বেশ! আপনি কোন কথার দাওয়াত দিচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যিনি একক এবং অদ্বিতীয়, যাঁর কোন অংশীদার নেই এবং যিনি ব্যতীত আর কেউ উপাসনার উপযুক্ত নয়। আমরা বলছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের উপাসনা করা হচ্ছে তাদের পরিত্যাগ করুন এবং সাক্ষ্য প্রদান করুন যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং প্রেরিত পুরুষ।'

আবদ বললেন, 'হে আমর! আপনি নিজ সম্প্রদায়ের নেতার পুত্র। বলুন আপনার পিতা কি কি করেছেন? কারণ, তাঁর কার্যক্রম হবে আমাদের অনুসরণীয়।'

আমি বললাম, তিনি তো মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন ছাড়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং নাবী ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তাহলে কতই না ভাল হত! আমি ও তাঁর পূর্বে তাঁর মতোই ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমার প্রতি ইসলামের হিদায়াত প্রদান করেছেন।'

অবদ বললেন, 'আপনি কখন তার আনুগত্য স্বীকার করেছেন?'

আমি বললাম, 'অল্প কিছু দিন হল।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় ইসলাম গ্রগণ করেছেন?'

আমি বললাম, 'নাজ্জাশীর নিকট। তিনি ও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।'

আবদ জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর সম্প্রদায় ও সাম্রাজ্যের লোকের কি করল?'

আমি বললাম, তাঁকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাঁর আনুগত্য করে।'

তিনি বললেন, মন্ত্রী পরিষদ এবং রাহেবগণ ও কি আনুগত্য করেছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'

আবদ বললেন, 'হে আমর, এ কী বলছেন। কারণ, মানুষের কোন অভ্যাস মিথ্যার চাইতে অপমানজনক আর কিছুই নেই।'

আমি বললাম, 'আমি মিথ্যা বলছি না এবং আমর মিথ্যা বলা বৈধ মনে করে না।'

আবদ বললেন, 'আমি মনে করছি, হেরাকুল নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের খবর জানেন না।'

আমি বললাম, 'কেন নয়?'

আবদ বললেন, আপনি এ কথা কিভাবে জানলেন?

আমি বললাম, নাজ্জাশীর হেরাকলকে কর দিতেন কিন্তু যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন তখন বললেন, 'আল্লাহর কসম! এখন যদি তিনি আমার নিকট একটি টাকাও চান তবুও আমি তা দেব না।'

হেরাকল যখন এ সংবাদ অবগত হলেন, তখন তাঁর ভাই ইয়ানক বললেন, 'আপনার দাস যদি আপনাকে টাকা না দেয় তাহলে কি আপনি তাকে ছেড়ে দেবেন? তাছাড়া, সে যদি আপনার পরিবর্তে অন্য এক জনের দ্বীন অবলম্বন করে? হেরাকল বললেন, 'এ ব্যক্তি যিনি এক নতুন দ্বীন পছন্দ করেছেন এবং নিজের জন্য তা অবলম্বন করেছেন। এখন আমি তার কি করতে পারি? আল্লাহর কসম! যদি আমার নিজের রাজত্বের লোভ না থাকত তাহলে তিনি যা করেছেন আমিও তাই করতাম।'

আবদ বললেন, 'আমর দেখুন! আপনি কি বলছেন?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে সত্যই বলছি।' আবদ বললেন, ভাল, তাহলে আমাকে বলুন, 'তিনি কোন কথা কিংবা কাজের দির্দেশনা দিচ্ছেন এবং কোন কথা কিংবা কাজ থেকে নিষেধ করছেন।'

আমি বললাম, 'মহিমান্বিত আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করছেন, সৎ এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করছেন। অন্যায়, অনাচার, ব্যভিচার, মদ্যপান, প্রস্তরমূর্তি এবং ক্রুশের আরাধনা বা উপাসনা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিচ্ছেন।'

আবদ বললেন, 'যে সব কথার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন তা কতই না উত্তম! যদি আমার ভাইও এ কথার উপর আমার অনুসরণ করত তাহলে যানবাহনে চড়ে যাত্রা করতাম। এমন কি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতাম এবং সত্যায়ন করতাম। কিন্তু আমার ভাইয়ের রাজত্বের মোহ এতই বেশী যে কিছুতেই কারো অধীনতা স্বীকার করতে তিনি রাজী নন।'

আমি বললাম, 'যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে রাসলে করীম ﷺ তাঁর সম্প্রদায়ের উপর তাঁর রাজত্ব স্থায়ী করে দেবেন এবং তাদের যারা সম্পদশালী তাদের নিকট থেকে সাদকা গ্রহণ করে দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন ও বিতরণ করে দেবেন।'

আবদ বললেন, 'এ তো বড় ভাল কথা। আচ্ছা বল তো সাদকা কি?

প্রত্যুত্তরে আমি সম্পদশালীদের বিভিন্ন সম্পদের মধ্য থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বাহির করে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের ব্যাপারটিকে যে সাদকা বলা হয় সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা

করলাম। যখন উটের প্রসঙ্গ এল তখন তিনি বললেন, 'হে আমর! আমাদের সে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকেও কি সাদকা দিতে হবে যা নিজেই বিচরণ করতে থাকে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'

আবদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় না যে, আমার সম্প্রদায় স্বীয় রাজত্বের প্রশস্ততা এবং সংখ্যাধিক্যতা সত্ত্বেও এটা যেন নেবেন।'

আমর নিবন আসের বর্ণনায় আছে যে, 'আমি তাঁর বারান্দায় কয়েক দিন অবস্থান করলাম। তিনি তাঁর ভাইয়ের নিকট গিয়ে আমার সকল কথা তাঁর নিকট ব্যক্ত করলেন। অতঃপর একদিন তিনি আমাকে তাঁর নিকট ডেকে পাঠালেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে প্রহরীগণ আমার বাহু ধরে বসল। তিনি বললেন, ওহে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দেয়া হলে। আমি বসতে চাইলাম কিন্তু প্রহরীগণ আমাকে বসতে দিল না। আমি সম্রাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বললেন, 'আপনার কথা কি তা বলে দিন।' আমি তখন মোহরকৃত পত্রখানা তাঁর হস্তে সমর্পণ করলাম।

তিনি সীল মোহর খুলে পত্রখানা পাঠ করলেন। পাঠ শেষ হলে পত্রখানা তিনি তাঁর ভাইয়ের হাতে দিলেন। তাঁর ভাইও তা পাঠ করলেন। এ প্রসঙ্গে আমি লক্ষ্য করলাম যে সম্রাটের তুলনায় তাঁর ভাই ছিলেন অধিক মাত্রায় কোমল স্বভাবের।

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে বল কুরাইশগণ কিরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে?'

আমি বললাম, 'সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে, কেউ কেউ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে এবং অন্যেরা তরবারীর দ্বারা পরাভূত হয়ে।'

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর সঙ্গে কেমন লোকেরা আছেন?'

আমি বললাম, 'ঐ সকল লোকেরা আছেন যাঁরা পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সব কিছুর উপর একে প্রধান্য দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর প্রদত্ত হিদায়াত এবং আপন বিবেকের আলোকে এ কথা উপলব্ধি করলেন যে পূর্বে তাঁরা ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত ছিলেন। আমি জানি না যে, এ অঞ্চলে এখন আপনি ছাড়া আর অন্য কেউ দ্বীনের বাহিরে অবশিষ্ট আছে। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ ﷺ-এর আনুগত্য না করেন তাহলে ঘোড়সওয়ারী বাহিনী আপনাকে পদদলিত করবে এবং আপনাদের সজীবতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন এবং রাসূলে করীম ﷺ আপনাকে আপনার কওমের শাসক নিযুক্ত করবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে কোন ঘোড়সওয়ারী কিংবা পদাতিক আপনার এলাকায় প্রবেশ করবে না।'

সম্রাট বললেন, 'আমাকে একটু চিন্তাভাবনা করার সময় দাও। আগামী কাল আবার এস।' অতঃপর আমি তাঁর ভাইয়ের নিকট আবার ফিরে গেলাম।

তিনি বললেন, 'আমর! আমার আশা হচ্ছে, যদি রাজত্বের লোভ জয়ী না হয় তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।'

আমর বিন আস (রাঃ) বললেন, 'দ্বিতীয় দিবস পুনরায় সম্রাটের নিকট গেলাম কিন্তু তিনি অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করলেন এ কারণে আমি তাঁর ভাইয়ের নিকট ফিরে গিয়ে বললাম যে, সম্রাটের সাক্ষাত লাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ প্রেক্ষিতে তাঁর ভাই আমাকে তাঁর নিকট পৌছে দিলেন'

তিনি বললেন, 'তোমার দাওয়াতের ব্যাপারে আমি চিন্তাভাবনা করেছি। যদি আমি রাজত্ব এমন এক ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করে দেই যাঁর নিপূণ ঘোড়সওয়ারী এখানে পৌছেও নি তখন আমি আরবের মধ্যে সব চাইতে দুর্বল ব্যক্তিকে পরিগনিত হয়ে যাব। পক্ষান্তরে, যদি তাঁর ঘোড়সওয়ারী বাহিনী এখানে পৌছে যায় তাহলে এমন এক সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যাবে যেমনটি ইতোপূর্বে তাঁদের সঙ্গে আর কখনো হয় নি।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা তাহলে আগামী কাল আমি ফেরত চলে যাচ্ছি।' যখন আমার ফেরত যাওয়ার ব্যাপারটি তাঁদের মনে একটি স্থির বিশ্বাসের সৃষ্টি করল তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এককভাবে আলাপ

আলোচনা করলেন এবং বললেন, 'এ পয়গম্বর যাঁদের উপরী বিজয়ী হয়েছেন তাঁদের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে আমাদের তেমন কোন স্থানই নেই। অধিকন্তু, তিনি যাঁদের নিকট দাওয়াত প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলেই সে দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়েছেন।

অতএব, পরবর্তী দিবস সকালে তাঁরা পুনরায় আমাকে আহ্বান জানালেন। আমি সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট এবং তার ভাই উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নাবী করীম ﷺ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। সাদকা গ্রহণ করা এবং লোকজনদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য আমাকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দিলেন এবং আমার বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা অবলম্বন করলেন।[1]

এ ঘটনা সূত্রে এটা জানা যাচ্ছে যে, অন্যান্য শাসক কিংবা বাদশাহের তুলনায় এ দুই জনের নিকট প্রেরিত পত্র বেশ বিলম্বে কার্যকর হয়েছিল। সম্ভবত এটি ছিল মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা।

উপরি উল্লেখিত পত্র সমূহের মাধ্যমে নাবী করীম ﷺ পৃথিবীর অধিকাংশ রাজ বাদশাহর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে কেউ কেউ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন, কেউ কেউ অস্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে এ সুবিধাটুকু হল যে, যারা দ্বীন অস্বীকার করল তারাও এ ব্যাপারে মনোযোগী হল এবং নাবী করীম ﷺ-এর নাম ও তাঁর দ্বীন তাদের নিকট বেশ পরিচিত হয়ে উঠল।

---

[1] যাদ'দুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ৬৩-৬৪ পৃঃ।

النشاط العسكري بعد صلح الحديبية

হুদায়বিয়ার পরের সৈনিক প্রস্তুতি

গা-বা যুদ্ধ অথবা যী কারাদ যুদ্ধ (غزوة الغابة أو غـــزوة ذي قَـــرَد) : প্রকৃত পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল বনু ফাযারার একটি দলের বিরুদ্ধে। ওরা রাসূলে করীম ﷺ-এর গৃহপালিত পশু লুটপাট করে নিয়ে যাওয়ার কারণে সূত্রপাত হয়েছিল এ যুদ্ধের।

হুদায়বিয়ার পরে এবং খায়বরের পূর্বে এটি ছিল একমাত্র যুদ্ধ যা রাসূলে করীম ﷺ-এর সামনে সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রঃ) এ পর্বটি নির্ধারণ করে বলেন যে, খায়বরের মাত্র তিন দিন পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট সৈনিক সালমা বিন আকওয়া' (রাঃ) হতেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা সহীহ মুসলিম শরীফে দেখা যেতে পারে। যুদ্ধ বিশারদ ইতিহাসবিদগণের অধিকাংশের মত আলোচ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে। কিন্তু সহী বুখারীতে যে কথা বর্ণিত হয়েছে আহলে মগাযীদের বর্ণনায় তুলনায় তাই অধিক বিশুদ্ধ।[১]

এ যুদ্ধের সেরা বীর সালমা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর সারাংশ হচ্ছে, নাবী করীম ﷺ চারণের উদ্দেশ্যে তাঁর সোয়ারীর উট পাঠিয়েছিলেন চারণভূমিতে স্বীয় দাস রেবাহর তত্ত্বাবধানে। আবু তালহার ঘোড়াসহ আমি ও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সকাল নাগাদ আকস্মিকভাবে আব্দুর রহমান ফাযারী এ পশুপালের উপর হামলা চালিয়ে রাখালকে হত্যার করার পর পশুপাল নিয়ে পলায়ন করে। আমি বললাম, 'রেবাহর এ ঘোড়া লও। তুমি একে তালহার নিকট পৌঁছে দিও এবং রাসূলে করীম ﷺ-এর এ দুর্ঘটনার সংবাদ দেবে। অতঃপর একটি ছোট পাহাড়ের উপর গিয়ে দাঁড়াই এবং মদীনামুখী হয়ে তিন বার চিৎকার করি, হায় প্রাতকালীন আক্রমণ! এরপর আক্রমণকারীদের পিছন পিছন আমি অগ্রসর হতে থাকি। এ পর্যায়ে তাঁদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে করতে এ চরণটি আবৃতি করতে থাকি,

[خُذْها] أنا ابنُ الأكْــوَع ** والیـــومُ یـــومُ الرُّضَّع

অর্থ : আমি আকওয়ার পুত্র এবং অদ্য দুগ্ধপানের দিন, অর্থাৎ অদ্য জানা যাবে যে, কে নিজ মায়ের দুধ পান করেছে।

সালমা বিন আকওয়া বলেছেন যে, আল্লাহর শপথ! আমি অবিরাম তীর নিক্ষেপের দ্বারা তাদের ক্ষতবিক্ষত করতে থাকি। যখন কোন ঘোড়সওয়ারী আমাকে লক্ষ্য করে ফিরে আসত তখন আমি কোন গাছের আড়ালে বসে গা ঢাকা দিতাম। যতক্ষণ তারা পর্বতের অপ্রশস্ত রাস্তায় প্রবেশ না করল ততক্ষণ রাস্তায় প্রবেশ করল তখন আমি পর্বতের উপর উঠে গেলাম এবং পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁদের অগ্রগতি সম্পর্কে আঁচ করতে থাকলাম। যে পর্যন্ত না রাসূলে করীম ﷺ-এর উটগুলো তারা তাদের পিছনে ছেড়ে না দিল সে পর্যন্ত আমি একই ধারায় কাজ করে চললাম। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটগুলো ছেড়ে দিলেও আমি তাদের পিছু ধাওয়া অব্যাহত রেখে তীর ছুঁড়তে থাকলাম। তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকল। তাদের গতির মাত্রা ঠিক রাখার প্রয়োজনে বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে ত্রিশেরও অধিক চাদর এবং বর্শা তারা ফেলে দিয়ে যায়। যে সকল জিনিস তারা ফেলে যাচ্ছিল চিহ্নস্বরূপ সে সবের উপর আমি পাথর চাপা দিয়ে রাখছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলে করীম ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীগণ যেন চিনতে পারেন যে, এগুলো হচ্ছে শত্রুদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ।

এরপর মাটির একটি অপ্রশস্ত মোড়ে বসে তারা দুপুরের খাবার খেতে লাগল। আমিও একটি চূড়ার উপর গিয়ে বসলাম। আমাকে এ অবস্থায় দেখে তাদের মধ্য থেকে চার জন পর্বতের উপর উঠে আমার দিকে আসতে

---

[1] দ্রঃ- সহীহ বুখারী, যাতুকারদ যুদ্ধের অধ্যায় ২/৬০৩ পৃঃ সহীহ মুসলিম বাবু গাযওয়াতি যী কারাদ অঅগাইরিহা ২/১১৩-১১৫ পৃঃ ফতহুল বারী ৭/৪৬০-৪৬২পৃ, যাদুল মায়াদ ২/১২০ পৃঃ।

থাকল। (যখন তারা এতটুকু নিকটে এসে গেল যাতে আমার কথা শুনতে পাবে তখন) আমি বললাম, 'তোমরা কি আমাকে চেন? আমার নাম সালমা বিন আকওয়া।' তোমাদের মধ্য হতে যার পিছনে আমি ধাওয়া করব তাকে খুব সহজেই নাগালের মধ্যে পেয়ে যাব। কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার পিছু ধাওয়া করলে কখনই আমার নাগাল পাবে না।'

আমার এ কথা শোনার পর তারা চার জনই ফিরে গেল। আমি কিন্তু আমার জাগাতেই রয়ে গেলাম। আমি সেখানেই অপেক্ষামান থাকলাম যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ -এর ঘোড়সওয়ারীগণকে বৃক্ষসারির মধ্যে অগ্রসরমান অবস্থায় দেখতে পেলাম। সকলের পুরোভাগে ছিলেন আখরাম। তাঁর পিছনে ছিলেন আবু কাতাদা এবং তাঁর পিছনে ছিলেন মেকদাদ বিন আসওয়াদ।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে আব্দুর রহমান ও আখরামের টক্কর লাগে। আখরাম আব্দুর রহামানের ঘোড়াকে আঘাত করলে তা আহত হয়। কিন্তু আব্দুর রহমান বর্শা নিক্ষেপ করে আখরামকে শহীদ করে দেয় এবং তাঁর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। ঠিক এমনি সময় আবু কাতাদা বর্শা দ্বারা আব্দুর রহমানকে আঘাত করেন। এ আঘাতের ফলে সে আহত কয়। অন্যেরা পশ্চাদসরণ করে পলায়ন করে। আমরা তাদের অনুসরণ করে আগ্রসর হতে থাকি। আমি আমার পায়ের ভরে লাভ দিয়ে দিয়ে চলছিলাম। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে তারা একটি ঘাটি অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে যেখানে ছিল যীকারাদ নামে একটি ঝরণা। তাঁরা পিপাসার্ত থাকার কারণে সেখানে পানি পান করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু আমি তাদেরকে ঝরণা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করার ফলে তাঁরা এক ফোঁটা পানি পান করতে সক্ষম হয় নি। রাসূলে করীম এবং ঘোড়সওয়ারী সাহাবীগণ আমার নিকট পৌঁছেন সূর্যাস্তের পর।

আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল তারা ছিল পিপাসার্ত, যদি আপনি আমার সঙ্গে একশত লোক দেন তাহলে আমি পালান সহ তাদের ঘোড়াগুলো ছিনিয়ে আনতে পারি এবং তাদের গলা ধরে আপনার দরবারে তাদের হাজির করে দিতে পারি।'

নাবী করীম বললেন, 'আকওয়ার পুত্র। তুমি অনেক করেছ এখন একটু ক্ষান্ত হও, এ সময় বনু গাতফান গোত্রে তাদের আপ্যায়িত করা হচ্ছে।'

রাসূলে করীম এ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বলেন, 'আজকের আমাদের সব চাইতে উত্তম ঘোড়সওয়ারী আবু কাতাদা এবং উত্তম পদাতিক সালমা বিন আকওয়া।'

সালমা বলেন, 'যুদ্ধলব্ধ অর্থ হতে নাবী করীম আমাকে দুই অংশ, প্রদান করেন। এক অংশ পদাতিক হিসেবে এবং অন্য অংশ ঘোড়সওয়ারী হিসেবে। অধিকন্তু, মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে আমাকে (সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ) তাঁর আযবা নামক উটের উপর নিজের পিছনে আরোহণ করে নেন।

এ যুদ্ধের সময় রাসূলে করীম মদীনার পরিচালন ভার ইবনু উম্মু মাকতুমের উপর অর্পণ করেছিলেন এবং পতাকা বহনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন মেকদাদ বিন আমরের উপর।[1]

---

[1] পূর্বোক্ত উৎস সমূহ।

غزوة خيبر ووادي القُري

(في المحرم سنة ٧ هـ)

খায়বার ও ওয়াদিল কোরা যুদ্ধ

মুহারম, ৭ম হিজরী

খায়বার ছিল মদীনার উত্তরে আশি (৮০) কিংবা ষাট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি বড় শহর। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন সেখানে একটি দূর্গ ছিল এবং চাষাবাদেরও ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সেটি একটি জন বসতি এলাকায় পরিণত হয়েছে। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য তেমন উপযোগী নয়।

যুদ্ধের কারণ (سبب الغزوة) : হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে রাসূলে করীম ﷺ যখন আহযাব যুদ্ধের তিনটি শক্তির মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী দল কুরাইশদের শত্রুতা থেকে মুসলিমগণকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করলেন তখন অন্য দুইটি শক্তি ইহুদী ও নাজদ গোত্র সমূহের সঙ্গেও একটি সমঝোতায় আসার চিন্তাভাবনা করতে থাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল এ সকল জনগোষ্ঠির সঙ্গে শত্রুতা ও বৈরীভাব পরিহারের মাধ্যমে মুসলিমগণের শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবন যাপন এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অধিক পরিমাণে আত্মনিয়োগ।

যেহেতু খায়বারছিল বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী ও কোন্দলকারীদের আড্ডা, সৈনিক মহড়ার কেন্দ্র এবং প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা ও যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু সেহেতু এ স্থানটি সর্বাগ্রে মুসলিমগণের মনোযোগদানের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে এখন একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে খায়বারসম্পর্কে মুসলিমগণের যে ধারণা তা যথার্থ ছিল কি না, এ ব্যাপারে মুসলিমগণের ধারণা যে যথার্থ ছিল তাা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কারণ, এ খায়বরবাসী খন্দক যুদ্ধে মুশরিক শক্তিগুলোকে সংগঠিত করে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লিপ্ত হতে সাহায্য এবং উৎসাহিত করেছিল। তাছাড়া, মুসলিমগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এরাই বনু কুরাইযাকে সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অধিকন্তু, এরাই তো ইসলামী সমাজের পঞ্চম শ্রেণীভূক্ত মুনাফিকদের সঙ্গে, আহযাব যুদ্ধের তৃতীয় শক্তি বনু গাতফান এবং বেদুঈনদের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রেখে চলছিল এবং নিজেরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তাঁরাা তাদের এ সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলিমগণের একটা চরম অস্বস্তিকর অবস্থা ও অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেছিল। এমন কি নাবী করীম ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র তারা করেছিল। এ সমস্ত অস্বস্তিকর অবস্থা প্রেক্ষাপটে অন্যন্যোপায় হয়ে মুসলিমগণ বার বার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সকল যুদ্ধের মাধ্যমে কোন্দল সৃষ্টিকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা ও পরিচালক সালমা বিন আবিল হুকাইক এবং আসির বিন যারেমকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। অথচ শত্রুমনোভাবপন্ন ইহুদীদের শায়েস্তা করার ব্যাপারটি মুসলিমগণের জন্য ততোধিক প্রয়োজনীয় ছিল।

কিন্তু এ ব্যাপারে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলিমগণ যে কারণে বিলম্ব করেছিলেন তা হচ্ছে, কুরাইশ মুশরিকগণ ইহুদীদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী যুদ্ধভিজ্ঞ ও উদ্ধত ছিল এবং শক্তি সামর্থে মুসলিমগণের সমকক্ষ ছিল। কাজেই কুরাইশদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার পূর্বে ইহুদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে শক্তি ও সম্পদ ক্ষয় করাকে নাবী করীম ﷺ সঙ্গত মনে করেন নি। কিন্তু কুরাইশদের সঙ্গে যখন একটা সমঝোতায় আসা সম্ভব হল তখনই ইহুদীদের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার অবকাশ তিনি লাভ করলেন এবং তাদের হিসাব গ্রহণের জন্য ময়দান পরিস্কার হয়ে গেল।

খায়বার অভিমুখে যাত্রা (الخروج إلى خيبر) : ইবনু ইসহাক সূত্রে জানা যায় যে, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলে করীম ﷺ পুরো যিলহাজ্জ মাস এবং মুহারম মাসের কয়েক দিন মদীনায় অবস্থায় করেন। অতঃপর মুহাররম মাসেরই শেষভাগে কোন এক সময়ে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। মুফাসসিরগণের বর্ণনা রয়েছে যে খায়বয়ের ব্যাপারে আল্লাহর যে ওয়াদা ছিল তা নিম্নে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ﴾ [الفتح: ٢٠]

' আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গানীমাতের ও'য়াদা দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে। এটা তিনি তোমাদেরকে আগেই দিলেন।' [আল-ফাত্‌হ (৪৮) : ২০]

এর অর্থ ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং অনেক গণীমতের সম্পদ এর অর্থ ছিল খায়বার প্রসঙ্গ।

ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা (عـدد الجـيش الإسـلامي) : যেহেতু মুনাফিকগণ এবং দুর্বল প্রকৃতির মুসলিমগণ হুদায়বিয়ার সফর হতে বিরত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গ লাভের পরিবর্তে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করেছিল সেজন্য আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-কে তাদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الفتح: ١٥].

'তোমরা যখন গানীমাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য যেতে থাকবে তখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকগুলো বলবে- 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্‌র ফরমানকে বদলে দিতে চায়। বল 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না, (খাইবার অভিযানে অংশগ্রহণ এবং সেখানে পাওয়া গানীমাত কেবল তাদের জন্য যারা ইতোপূর্বে হুদাইবিয়ার সফর ও বাই'আতে রিয্‌ওয়ানে অংশ নিয়েছে) এমন কথা আল্লাহ পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে- 'তোমরা বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ।' (এটা যে আল্লাহ্‌র হুকুম তা তারা বুঝছে না) তারা খুব কমই বুঝে।' [আল-ফাত্‌হ (৪৮) : ১৫]

কাজেই রাসূলে করীম ﷺ যখন খায়বার অভিযানের কথা ঘোষণা করলেন তখন ইরশাদ করলেন যে এ অভিযানে শুধু সে সকল ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করতে পারবেন যাঁরা প্রকৃত জিহাদের জন্য আগ্রহী। এ ঘোষণার ফলে তাঁর সঙ্গে শুধু সে সকল লোকই যাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন যাঁরা হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নীচে বাইয়াতে রিযওয়ানে শরীক হয়েছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দশত জন।

ঐ সময়ে আবু হুরাইরও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আগমন করেছিলেন। এ সময় সেবা'বিন আরফাতা ফজরের জামাতে ইমামতি করছিলেন। সালাত সমাপ্ত হলে আবু হুরাইরা (রাঃ) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর আবু হুরাইরা (রাঃ) খিদমতে নববীতে উপস্থিতির জন্য খায়বার অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি যখন খিদমতে নববীতে উপস্থিত হলেন তখন খায়বার বিজয় পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করে আবু হুরাইরা (রাঃ) তাঁর বন্ধুগণকেও গণীমতের অংশ প্রদান করেন।

ইহুদীদের জন্য মুনাফিকদের ব্যস্ততা (اتصال المنافقين بـاليهود) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খায়বার অভিযানের প্রাক্কালে মুনাফিকগণ ইহুদীদের সাহায্যার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই খায়বরের ইহুদীগণের নিকট এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করে যে, 'এখন মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন। অতএব, তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও এবং উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দেখ, তোমরা ভুল কর না যেন। উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাক, ভয়ের কিছুই নেই। কারণ, এক দিকে তোমাদের যেমন সংখ্যাধিক্য রয়েছে অন্যদিকে তেমনি অস্ত্রশস্ত্র এবং মাল সামানও অধিক রয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর জনবল যেমন সামান্য অন্যদিকে তেমনি তিনি প্রায় রিক্তহস্ত তাঁর অস্ত্রশস্ত্র খুব সামান্যই আছে।'

খায়বরবাসী যখন এ সংবাদ অবগত হল তখন বনু গাতফানের সাহায্য লাভের জন্য তারা কেননা বিন আবিল হোকাইক এবং হাওয়া বিন কাইসকে সেখানে প্রেরণ করল। কারণ, বনু গাতফান ছিল খায়বরবাসীগণের মিত্র এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারী। বনু গাতফানের নিকটে তারা এ প্রস্তাবও পাঠাল যে, যদি তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে জয়লাভে সক্ষম হয় তাহলে খায়বরের উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক তাদের দিয়ে দেয়া হবে।

খায়বরের পথ (الطريـــق إلى خيـــبر) : খায়বার যাওয়ার পথে রাসূলে করীম ﷺ পর্বত অতিক্রম করেন। অতঃপর (ইসরকে আসারও বলা হয়) 'সাহাবা' নামক উপত্যকা দিয়ে গমন করেন। এরপর রাজী নামক উপত্যকায় গিয়ে পৌছেন। (এ রাজী কিন্তু ঐ রাজি নয় যেখানে আযল ও কারার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বনু লেহয়ান গোত্রের হাতে আট জন সাহাবীগণ (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন, যায়েদ ও খোবাইবকে (রাঃ) বন্দী করা হয় এবং পরে মক্কায় শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হয়।)

রাজী হতে মাত্র একদিন ও একরাত্রির ব্যবধানে বনু গাতফানের জনবসতি অবস্থিত ছিল। যুদ্ধ প্রস্তুতি সহকারে বনু গাতফান খায়বরবাসীগণের সাহায্যার্থে খায়বার অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু পথের মধ্যে তাদের পিছন দিক থেকে কিছু শোরগোল শুনতে পেয়ে তারা ধারণা করল যে, তাদের শিশু ও পশুপালের উপর মুসলিমগণ আক্রমণ চালিয়েছে, এ কারণে তারা খায়বরকে মুসলিমগণের হাতে ছেড়ে দিয়ে পিছন ফিরে চলেন।

এরপর রাসূলে করীম ﷺ যে দুজন পথ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁরা সৈন্যদের পথ প্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক জনের নাম ছিল হুসাইল। তাঁদের নিকট থেকে এমন এক পথের খোঁজ জানতে চাইলেন যে পথ ধরে মদীনার পরিবর্তে তার উত্তরদিকে দিয়ে সিরিয়ার পথ ধরে খায়বরে প্রবেশ করা যায়। নাবী করীম ﷺ-এর এ কৌশল অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল শাম রাজ্যের দিকে ইহুদীদের পলায়নের পথে রোধ করা এবং বনু গাতফান থেকে ইহুদীদের সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করে দেয়া।

একজন পথভিজ্ঞ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! 'আমি আপনাকে সে পথ দিয়ে নিয়ে যাব।' অতঃপর আগে আগে চলতে থাকলেন। চলার এক পর্যায়ে তাঁরা এমন এক জায়গায় পৌছেন যেখান থেকে একাধিক পথ বাহির হয়ে গিয়েছে। তিনি আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ সকল পথ ধরে গিয়ে আপনি গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারবেন।'

নাবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেকটি পথের নাম বলে দাও।'

তিনি বললেন, 'এটির নাম হাযান (কঠিন এবং কর্কশ)। নাবী ﷺ এ পথ ধরে ধাওয়া পছন্দ করলেন না। দ্বিতীয় পথটির নাম বললেন, 'শাশ' (বিযুক্তকরণ এবং চাঞ্চল্যকর) নাবী করীম ﷺ এটাও গ্রহণ করলেন না। তিনি তৃতীয়টির নাম বললেন, 'হাতের' (কাষ্ঠ সংগ্রহকারী) নাবী করীম ﷺ এ পথ ধরে চলতেও অস্বীকার করলেন।

হোসাইল বললেন এখন অবশিষ্ট থাকে আর একটি মাত্র পথ। ওমর (রাঃ) বললেন, এ পথটির নাম কি? হোসাইল বললেন, 'এ পথের নাম 'মারহাব'। নাবী করীম ﷺ এ পথ ধরে চলা পছন্দ করলেন।

পথিমধ্যস্থ ঘটনাবলী (بعض ما وقع في الطريق) : সালমা বিন আকওয়া' (রাঃ) বলেছেন যে, নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে একত্রে খায়বার অভিমুখে পথ চলতে থাকলাম। রাতের বেলা আমরা চলছিলাম। এক ব্যক্তি আমেরকে বললেন, 'হে আমের! তোমার কিছু অসাধারণ কথা কাহিনী আমাদের শুনাচ্ছ না কেন? আমের ছিলেন একজন কবি। এ কথা শুনে তিনি বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। কবিতার চরণগুলো ছিল নিম্নরূপ :

اللهم لولا أنت ما اهتديـــنا ** ولا تَصدَّقْنا ولا صَلَّيـــنـــا

فاغـــفر فِدَاءً لك ما اقْتَفَيْنا ** وَثَبِّت الأقدام إن لاقيـــنا

وألْـــقِيَنْ سكـــينة عـــلينا ** إنا إذا صِـــيحَ بنا أبينـــا

وبالصياح عَوَّلُوا عـــلينا **

অর্থ : হে আল্লাহ! যদি তুমি অনুগ্রহ না করতে তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, সদকাহ করতাম না, সালাত আদায় করতাম না, আমরা তোমার নিকট উৎসর্গকৃত হলাম, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। যতক্ষণ আমরা তাকওয়া অবলম্বন করি এবং যদি যুদ্ধ করি তখন আমাদের কদম মযবুত করে রেখ এবং আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যখন আমাদের ভয় প্রদর্শন করা হয় তখন যেন আমরা অটল হয়ে যাই এবং চ্যালেঞ্জকালীন অবস্থায় আমাদের প্রতি লোকেরা আস্থা রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কবিতা আবৃত্তিকারী কে?'

লোকেরা বললেন, 'আমের বিন আকওয়া।'

নাবী করীম বললেন, 'আল্লাহ তার উপর রহম করুন।'

সম্প্রদায়ের একজন বললেন, 'এখন তো তাঁর শাহাদত কার্যকর হয়ে গেল। আপনি তাঁর অস্তিত্বের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ কেন দিলেন না।[১]

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) জানতেন যে যুদ্ধের সময় রাসূলে করীম ﷺ করো জন্য বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার অর্থই ছিল তাঁর শহীদ হওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া।[২] খায়বার যুদ্ধে আমেরে ব্যাপারে এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছিল। এ জন্যই সাহাবীগণ আল্লাহর নাবী ﷺ-এর দরবারে আরয করলেন যে কোন তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করা হল না যাতে আমরা তাঁর অস্থিত্বের দ্বারা ভবিষ্যতে আরও উপকৃত হতে পারতাম।

খায়বরের সন্নিকটে সাহাবা নামক উপত্যকায় নাবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সামান পত্র চাইলেন। কিন্তু শুধু আনা হল ছাতু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তা মাখানো হল। নাবী ﷺ এবং সাহাবাবৃন্দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সে খাবার খেলেন। এরপর নাবী করীম ﷺ মাগরিব সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। অবশ্য সালাতের প্রস্তুতি হিসেবে শুধু কুলি করলেন। সাহাবীগণও (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কুলি করলেন। অতঃপর নতুনভাবে অযু না করে সালাত আদায় করলেন।[৩] পূর্বের অজুকেই যথেষ্ট মনে করলেন। অতঃপর এশা ও ওয়াক্তের সালাতও আদায় করলেন।[৪]

খায়বার অঞ্চলে ইসলামী সৈন্যদল (الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر) : যে প্রভাতে খায়বার যুদ্ধ আরম্ভ হয় মুসলিম সৈন্যদল তার পূর্ব রাত্রি খায়বরের সন্নিকটে অতিবাহিত করেন। কিন্তু ইহুদীগণ এ ব্যাপারে কোন খবর পায় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে চাইলে সেখানে গিয়ে রাত্রি যাপন করতেন এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করতেন না। এ প্রেক্ষিতে রাত যখন শেষ হওয়ার উপক্রম হল তখন অন্ধকার থাকা অবস্থায় তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ঘোড়সওয়ারী মুসলিম সৈন্যগণ খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এদিকে খায়বরবাসীগণ তাদের প্রাত্যহিক কাজের ন্যায় আজও চাষাবাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু অগ্রসরমান মুসলিম সৈন্যদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে তারা শহরের দিকে দৌড় দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলতে থাকল যে, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সৈন্য সহকারে এসে গেছেন। নাবী করীম ﷺ এ দৃশ্য দেখে বললেন, (الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) 'আল্লাহ আকবর, খায়বার ধ্বংস হল, আল্লাহ আকবর খায়বার ধ্বংস হল। যখন কোন সম্প্রদায়ের ময়দানে অবতরণ করি যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় তাদের সকাল মন্দ হয়ে যায়।[৫]

---

[1] সহীহ বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ৬০৩ পৃঃ, সহীহ মুসলীম যী কারাদ যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খন্ড ১১৫ পৃঃ।

[2] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১১৫ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬০৩ পৃঃ।

[4] মাগাযী আলওয়াকেদী, খায়বর যুদ্ধ ১১২ পৃঃ।

[5] সহীহ বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬০৩-৬০৪ পৃঃ।

খায়বারের দুর্গসমূহ (حصون خيبر) : খায়বরের জনবসতি দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটি অঞ্চল নিম্নলিখিত পাঁচটি দূর্গ ছিল, ১. নায়েম দূর্গ, ২.সায়াব বিন মোয়ায দূর্গ, ৩. জোবাইরের কেল্লা দূর্গ, ৪. উবাই দূর্গ, ৫. নেযার দূর্গ। এসবের প্রথম তিনটি দূর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে নাতাত বলা হত। অবশিষ্ট দুইটি দূর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল শিক নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

খায়বরের জনবসতির দ্বিতীয় অঞ্চলকে কাতিবাহ বলা হত। এর মধ্যে মাত্র তিনটি দূর্গ ছিল ১. কমুস দূর্গ, (এটা বনু নাযীর গোত্রের আবুল হুকাইকের দূর্গ ছিল)। ২. ওয়াতীহ দূর্গ, ৩. সালালিম দূর্গ।

উপরি উল্লেখিত ৮টি দূর্গ ছাড়াও খায়বরের ছোট বড় আরও কিছু সংখ্যক দূর্গ এবং ঘাঁটি ছিল। কিন্তু শক্তি সামর্থ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে এ সকল দূর্গ পূর্বোক্তগুলোর সমপর্যারের ছিল না। তুলনামূলকভাবে এ দূর্গগুলো ক্ষুদ্রাকারের ছিল।

মুসলিম সেনা শিবির (معسكر الجيش الإسلامي) :

খায়বার যুদ্ধ প্রথম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় অঞ্চলের দূর্গ তিনটিতে যোদ্ধাদের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমগণের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিল।

অতঃপর নাবী করীম ﷺ সৈন্যদের শিবির স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করলেন। এ প্রেক্ষিতে হোবাব বিন মুনযির (রাঃ) আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ কথাটা বলুন যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ স্থানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন না যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এটা করছেন? এটা কি আপনার ব্যক্তিগত অভিমত?

নাবী করীম ﷺ বললেন, 'না এটা হচ্ছে নেহাত একটি অভিমতের ব্যাপার। যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক মনে করেই করা হচ্ছে।'

হোবাব বিন মুনযির (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ স্থানটি নাযাত দূর্গের সন্নিকটে অবস্থিত এবং খায়বরের যুদ্ধভিজাত সৈনিকগণ এ দূর্গে অবস্থান করছে। সেখান থেকে তারা আমাদের সকল অবস্থা ও অবস্থানের খবর জানতে পারবে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদের কোন অবস্থার খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। অধিকন্তু, আমরা তাদের নৈশকালীন আক্রমণ থেকেও নিরাপদে থাকব না। তাদের তীর আমাদের নিকট পৌঁছে যাবে কিন্তু আমাদের তীর তাদের নিকট পৌঁছবে না। তাছাড়া, এ স্থানটি খেজুর বাগানের মধ্যে নিচু ভূমিতে অবস্থিত। এ স্থানে রোগ ব্যাধি সংক্রমনেরও আশঙ্কা থাকবে। এ সকল অসুবিধার প্রেক্ষাপটে আপনি এমন কোন স্থানে শিবির স্থানের ব্যবস্থা করুন যাতে আমরা এ সকল ক্ষতিকর অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে পারি।' রাসূলে করীম ﷺ বললেন, 'তুমি যে পরামর্শ দিলে তা যথার্থ।' অতঃপর তিনি স্থান পরিবর্তন করে শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করলেন।

অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী খায়বারের এত নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন যে, সেখান থেকে শহর পরিস্কারভাবে দেখতে পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহিনীকে থেমে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করায় তাঁরা থেমে গেলেন। অতঃপর তিনি এ পর্যায়ে প্রার্থনা করলেন,

(اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية، وشر أهلها، وشر ما فيها، أقدموا، بسم الله).

অর্থ : হে আল্লাহ! সপ্ত আকাশ এবং যার উপর এর ছায়া রয়েছে তাদের প্রভূ এবং সপ্ত জমিন ও যাদের সে উঠিয়ে রয়েছে তাদের প্রভূ এবং শয়তান সমূহ এবং যাদেরকে তারা ভ্রষ্ট করেছে তাদের প্রতিপালক আমরা আপনার নিকট এ বস্তীর মঙ্গল, এর বাসিন্দাদের মঙ্গল এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করছি।

এ বসতির অনিষ্টতা, এখানে বসবসাকারীদের অনিষ্টতা এবং এখানে যা কিছু আছে তার অনিষ্টতা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (এরপর বললেন) চল, আল্লাহর নামে সামনে অগ্রসর হও।[১]

যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ (التهيؤ للقتال وبشارة الفتح) : যে রাত্রিতে নাবী করীম ﷺ খায়বার সীমানায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি বললেন,

(لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، [يفتح الله على يديه])

'আগামী কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা প্রদান করব, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালবাসা রাখেন এবং যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন।'

রাত্রি শেষে যখন সকাল হল তখন সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকেরই আশা পতাকা তাঁর হাতেই আসবে। রাসুলে করীম ﷺ বললেন, আলী ইবনু আবু তালেব কোথায়? সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চোখের পীড়া হয়েছে"।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।' তাঁকে ডেকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মুখ থেকে লালা নিয়ে তা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিয়ে দু'আ করলেন তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন, যেন তাঁর পীড়াজনিত কোন যন্ত্রনা ছিল না। অতঃপর তাঁর হাতে পতাকা প্রদান করা হল। তিনি আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি তাদের সঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করব যে, তারা আমাদের মতো হয়ে যাবে।"

নাবী করীম ﷺ বললেন,

(انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم).

'শান্তির সঙ্গে চল এবং তাদের ময়দানে অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত প্রাপ্য রয়েছে যা তাদের কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাধ্যমে যদি এক জনকেও হিদায়াত দেন তাহলে তোমাদের জন্য তা লাল উটের চাইতেও উত্তম হবে।[৩]

যুদ্ধারম্ভ এবং নায়েম দূর্গ বিজয় (بدء المعركة وفتح حصن ناعم) : উল্লেখিত ৮টি দূর্গের মধ্যে সর্ব প্রথম নায়েম দূর্গের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। কারণ, অবস্থানগত দিক এবং যুদ্ধ কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে এ দূর্গটি ছিল প্রথম শ্রেণীরও সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, অধিকন্তু, এটি ছিল মারহাব নামীয় সে পরাক্রান্তও পরিশ্রমী ইহুদীর দূর্গ যাকে এক হাজার পুরুষের সমকক্ষ মনে করা হতো।

আলী বিন আবু তালিব (رضي الله عنه) মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে এ দূর্গের সামনে গিয়ে পৌঁছে ইহুদীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তারা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের সম্রাট মারহাবের পরিচালনাধীনে মুসলিমগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য অবস্থান গ্রহণ করল। প্রথমে মারহাব প্রসিদ্বন্দ্বীতার জন্য মুসলিমগণকে আহ্বান জানাল।

যার অবস্থা সম্পর্কে সালমা বিন আকওয়া বর্ণনা করেছেন যে, 'যখন আমরা খায়বরে পৌঁছলাম তখন ইহুদী সম্রাট মারহাব স্বীয় তরবারী হস্তে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে গর্বভরে বলল,

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩২২ পৃঃ।

[2] সেই অসুখের কারনে তিনি পিছনে পড়েছিলেন, অতঃপর গিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

[3] সহীহ বুখারী খায়বর যুদ্ধ ২য় খণ্ড ৯০৫-৬০৬ পৃঃ, কোন কোন বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, খায়বরের একটি দূর্গ বিজয়ে একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আলী (رضي الله عنه)-কে পতাকা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে সেটাই যা উপরে উল্লেখিত।

قد عَلِمتْ خيبر أنِي مَرْحَب ** شَاكِي السلاح بطل مُجَرَّب

إذا الحروب أقبلتْ تَلَهَّب **

অর্থ : 'খায়বার অবহিত আছে যে, আমি মারহাব অস্ত্রে সজ্জিত বীর এবং অভিজ্ঞ, যখন যুদ্ধ ও সংঘাত অগ্নিশিখা নিয়ে সামনে আসে।'

এ প্রেক্ষিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার চাচা আমের এগিয়ে এসে বললেন,

قد علمت خيبر أني عامر ** شاكي السلاح بطل مُغَامِر

'খায়বার জানে যে, আমি আমের, অস্ত্র সজ্জিত, বীর এবং যোদ্ধা।"

অতঃপর উভয়ে উভয়ের প্রতি আঘাত হানে। মারহাবের তরবারী আমার চাচার ঢালে গিয়ে বিদ্ধ হয়। আমের তাকে নীচ হতে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর তরবারী ছোট থাকার কারণে তিনি ইহুদীর পায়ের গোছার উপর আঘাত হানেন। কিন্তু সে আঘাত মারহাবের পায়ে না লেগে তাঁর নিজের হাঁটুতেই এসে লাগে। নিজের তলোয়ারে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েই অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নাবী করীম (ﷺ) নিজের দুটি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখিয়ে তাঁর সম্পর্কে বলেন যে,

(إنَّ لَه لأجرين ــ وَجَمَعَ بين إصبعيه ــ إنَّه لجَاهِدٌ مُجَاهِد، قَلَّ عربي مَشَي بِهَا مِثْلَه)

'তিনি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবেন। তিনি বড় পরিশ্রমী যোদ্ধা ছিলেন। অল্প সংখ্যকই তাঁর মতো কোন আরব জমিনের উপর চলে থাকবে।[১]

যাহোক, আমেরে (রাঃ)-এর আহত হওয়ার পর মারহাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য আলী (রাঃ) গমন করেন।

সালাম বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, 'ঐ সময় আলী একটি কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করছিলেন,

أنا الذي سمتني أمي حَيْدَرَةْ ** كلَيْثِ غابات كَرِيه المَنْظَرَةْ

أُوفِيهم بالصَّاع كَيْل السَّنْدَرَةْ **

অর্থ : অমি সেই ব্যক্তি আমার মাতা যার নাম রেখেছিলেন হায়দার (বাঘ) বনের বাঘের মতো ভয়ংকর, আমি তাদেরকে 'সা' এর বিনিময়ে বর্শার দ্বারা তাদের মাপ পূর্ণ করে দিব।

অতঃপর তিনি মাহরহাবের মাথার উপর তরবারী দ্বারা এমনভাবে আঘাত করলেন যে, সে সেখানে স্তুপ হয়ে গেল। এভাবে আলী (রাঃ)-এর হাতে বিজয় অর্জিত হল।[২]

যুদ্ধের মাঝে আলী (রাঃ) ইহুদীদের দূর্গের নিকট পৌঁছলেন তখন একজন ইহুদী দূর্গের উঁচু স্থান থেকে উঁকি দিয়ে দেখার পর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? আলী (রাঃ) বললেন, 'আমি আলী বিন আবু তালিব।'

ইহুদী বলল, 'সে গ্রন্থের শপথ! যা মুসা (عليه السلام)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমরা সুউচ্চে রয়েছে।'

এরপর মারহাবের ভাই ইয়াসের এ কথা বলে বাহির হল, 'কে এমন আছে যে, আমার সামনে আসবে?'

তার এ আহ্বানে যুবাইর (রাঃ) ময়দানে অবতরণ করেন। তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখে তাঁর মা সাফিয়া (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পুত্র কি শহীদ হয়ে যাবে?'

---

[1] সহীহ বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ। যী কারাদ ইত্যাদি যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ১১৫, সহীহ বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬০৩ পৃঃ।

[2] মারহাবের হত্যাকারীর উ্যাসের মধ্যে অনেক মত বিরোধ রয়েছে, তাছাড়া এ তথ্যের মধ্যেও মত বিরোধ রয়েছে যে কোন দিন তাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং কোন দিন এ দূর্গ জয় করা হয়েছিল। সহীহাইনের বর্ণনা করেছি তা বুখারীর বর্ণনাকে প্রধান্য দিয়ে স্থির করেছি।

নাবী করীম ﷺ বললেন, 'না, বরং তোমার ছেলে তাকে হত্যা করবে।' কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের উক্তি সত্য প্রমাণিত হল, যুবাইর (رضي الله عنه) ইয়াসকে হত্যা করলেন।

এরপর নায়েম দূর্গের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কিছু সংখ্যক নের্তস্থানীয় ইহুদী নিহত হয়। অবশিষ্ট ইহুদীগণ হতোদ্যম হয়ে পড়ে যার ফলে মুসলিমগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। কতগুলো সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ যুদ্ধ কয়েক দিন যাবত অব্যাহত ছিল এবং মুসলিমগণকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দূর্গ থেকে মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এ কারণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তারা এ দূর্গ পরিত্যাগ করে সা'ব নামক স্থানে চলে যায়। ফলে নায়েম দূর্গ মুসলামানদের দখলে চলে আসে।

সায়াব বিন মোয়াজ দূর্গ বিজয় (فتح حصن الصعب بـــن معـــاذ) : অত্যন্ত সুরক্ষিত ও মজবুত দূর্গ হিসেবে নায়েম দূর্গের পরেই ছিল সা'ব বিন মোয়ায দূর্গের স্থান। মুসলিমগণ হোবাব বিন মুনযির আনসারী (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বাধীনে এ দূর্গের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তিন দিন যাবত তারা অবরোধ করে রাখেন। তৃতীয় দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দূর্গের উপর বিজয় লাভের জন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন।

ইবনু ইসহাকের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, আসলাম গোত্রের শাখা বনু সাহামের লোকজন, রাসূলে করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'আমরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছি, আমাদের সহায় সম্পদ বলতে কিছু নেই।' নাবী করীম ﷺ প্রার্থনা করলেন,

(اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست لهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظـــم حصونها عنهم غَنَاء، وأكثرها طعامًا ووَدَكًا)

'হে আল্লাহ! তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে আপনি সব চাইতে বেশী জানেন, আপনি অবশ্যই অবগত রয়েছেন যে, তাঁদের সহায় সম্পদ কিছু নেই এবং আমার নিকটেও এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমি তাঁদের সাহায্য করতে পারি। অতএব, ইহুদীদের এমন এক দূর্গের উপর তাঁদেরকে বিজয় দান করুন যা তাঁদের জন্য সকল দিক দিয়ে ফলোৎপাদক হয় এবং যেখান থেকে অধিক খাদ্য ও চর্বি হস্তগত হয়।' এরপর সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ পরিচালনা করলেন এবং মহান আল্লাহ সা'ব বিন মোয়ায দূর্গের উপর মুসলিমগণকে বিজয় প্রদান করলেন। খায়বরে এমন কোন দূর্গ ছিল না যেখানে এ দূর্গের তুলনায় অধিক খাদ্য ও চর্বি ছিল।[1]

আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করার পর নাবী করীম ﷺ যখন এ দূর্গে আক্রমণ পরিচালনার জন্য মুসলিমগণকে নির্দেশ প্রদান করলেন তখন আক্রমণকারীদের মধ্যে বনু আসলাম অগ্রভাগে ছিল। এখানেও দূর্গের সামনের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সংঘর্ষ হয়। অতঃপর সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বেই দূর্গটি মুসলিমগণের দখলে আসে। এ দূর্গের মধ্যে মুসলিমগণ কিছু মিনজানীক ও দাববাব[2] যন্ত্রও প্রাপ্ত হন।

ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় যে কঠিন ক্ষুধার আলোচনা করা হয়েছে তার ফল হচ্ছে লোকেরা (বিজয় অর্জন হতে না হতেই) গাধা যবেহ করল এবং চুলায় চাপিয়ে দিয়ে তা রান্নার আয়োজন করল। রাসূলে করীম ﷺ যখন এ ব্যাপারটি অবগত হলেন তখন গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করে দিলেন।

যুবাইর-এর দূর্গ বিজয় (فتح قلعة الزبير) : মুসলিমগণ কর্তৃক নায়েম এবং সা'ব দূর্গ বিজয়ের পর নাযাত এর দূর্গ সমূহ থেকে বাহির হয়ে ইহুদীগণ যুবাইর দূর্গে একত্রিত হল। এটি ছিল পর্বতের উঁচু চূড়ায় অবস্থিত কটি

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩২ পৃঃ।

[2] কাষ্ট নির্মিত এবং সুরক্ষিত গাড়ী ন্যায় নীচে কয়েকজন মানুষ প্রবেশ করে দেওয়ালের নিকটে পৌছে শত্রু হতে আত্মরক্ষা করে দূর্গের দেওয়াল ফুটো করতো তাকে দাববারা বলা হত। বর্তমানে ট্রাঙ্ককে দবাবাবা বলা হয়। মিনজানীক এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা বড় বড় প্রস্তাব নিক্ষেপ করা হয়, যাকে তোপ বলা যেতে পারে।

সুসংরক্ষিত দুর্গ। সেখানে যাওয়ার পথ ছিল এতই দুর্গম এবং কষ্টকর যে ঘোড়সওয়ারী তো নয়ই পদাতিক বাহিনীর পক্ষেও তা ছিল একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিলেন এর চতুর্দিকে অবরোধ সৃষ্টি করতে। তিন দিন পর্যন্ত এ অবরোধ অব্যাহত থাকল। এরপর একজন ইহুদী এসে বলল, 'হে আবুল কাসেম। আপনি যদি এক মাস পর্যন্ত এ অবরোধ অব্যাহত রাখেন তবুও তাদের কোন ভয় থাকবে না। তবে সেখানে তাদের পানীয় পানির সমস্যা রয়েছে। কারণ পানির ঝরণা রয়েছে নীচে জমিনে। রাতের বেলা এর দূর্গ থেকে বেরিয়ে এসে পানি পান করে এবং সংগ্রহ করে নিয়ে দূর্গে ফিরে যায়। কাজেই আপনার আক্রমণ থেকে তারা নিরাপদই থাকছে। যদি আপনি তাদের পানি বন্ধ করে দেন, তাহলে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।' এ কথা জানার পর নাবী করীম ﷺ তাদের পানি বন্ধ করে দিলেন। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইহুদীগণ দূর্গের বাইরে বেরিয়ে এসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সংঘর্ষে কয়েকজন মুসলিম শহীদ হন এবং আনুমানিক দশ জন ইহুদী নিহত হয়। কিন্তু দূর্গ মুসলিমগণের দখলে এসে যায়।

উবাই দুর্গ বিজয় (فتح قلعة أُبَي) : যুবাইর দূর্গের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ইহুদীগণ উবাই দূর্গে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ এ দূর্গেও অবরোধ সৃষ্টি করেন। এ দূর্গের দুজন বীর ও পরিশ্রমী ইহুদী যোদ্ধা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান দিয়ে একের পর এক ময়দান অবতরণ করে। এরা দু জনেই মুসলিম বীরদের হাতে নিহত হয়। দ্বিতীয় ইহুদীর হত্যাকারী ছিলেন লাল পট্টিধারী বিখ্যাত তেজস্বী বীর আবু দোজানা সাম্মাক বিন খারশাহ আনসারী رضي الله عنه। দ্বিতীয় ইহুদীকে হত্যা করার পর তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে দূর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে ইসলামী সৈন্যগণও দূর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। দূর্গের অভ্যন্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধে যায় এবং বেশে কিছুক্ষণ ধরে তা চলতে থাকে। কিন্তু ইহুদীগণ মুসলিম বীরদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে দূর্গ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নেয়ার দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেটি ছিল প্রথম অঞ্চলের শেষ দুর্গ।

নেযার দুর্গ বিজয় (فتح حصن النَّـــزَار) : এটি ছিল এ অঞ্চলের সব চাইতে শক্ত ও মজবুত দূর্গ। ইহুদীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এ দূর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মুসলিমগণের পক্ষে সম্ভব হবে না। এ জন্য তাদের মহিলা ও শিশুদের নিয়ে তারা এ দূর্গ মধ্যে অবস্থান করছিল। পূর্বোল্লিখিত চারটি দূর্গের কোনটিতেই মহিলা ও শিশুদের রাখা হয় নি।

মুসলিমগণ এ দূর্গটিও অবরোধ করলেন এবং প্রবল চাপ সৃষ্টি করে চললেন। কিন্তু যেহেতু দূর্গটি একটি উঁচু পর্বত চূড়ায় অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থান ছিল সেহেতু দূর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভের কোন সুযোগ মুসলিম সৈন্যরা করে নিতে পারছিলেন না। এদিকে দূর্গের বাহিরে দূর্গের বাহিরে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস ইহুদীদের ছিল না। তবে দূর্গের অভ্যন্তর ভাগ থেকেই তারা মুসলিমগণের উপর প্রবলভাবে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে আসছিল।

নেযার দূর্গ জয় করা যখন খুব আয়াসসাধ্য মনে হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনজানীক যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিলেন। কয়েকটি কামানের গোলা আঘাত হানার ফলে তাদের দেয়ালে বেশ বড় আকারে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায়। সে ফাটলের পথ ধরে মসুলমানেরা দূর্গ মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং ইহুদীদের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে ইহুদীরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করার পর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দূর্গ ছেড়ে পলায়ন করে। তারা প্রাণভয়ে এতই ভীত হয়ে পড়ে যে, তাদের মহিলা ও শিশুগণকে পিছনে রেখেই পলায়ন করে এবং তাদেরকে মুসলিমগণের দয়ার উপর ছেড়ে যায়। সুরক্ষিত নেযার ঘাঁটি দখলের ফলে খায়বরের প্রথম অর্ধেক অর্থাৎ নাতাত ও শিক্ অঞ্চলের সকল অংশই মুসলিমগণের দখলে চলে আসে। এ অঞ্চলে আরও কিছু সংখ্যক ছোট ছোট দূর্গ ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো মুসলিমগণের দখলে চলে যাওয়ার ফলে ইহুদীরা ছোট খাট দূর্গগুলো পরিত্যাগ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে খায়বার শহর পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় অঞ্চলে অর্থাৎ কাতীবার দিকে পলায়ন করে।

খায়বরের দ্বিতীয়ার্ধের বিজয় (فتح الشطر الثاني من خيبر) : নাতাত ও শিক্‌ অঞ্চল বিজয়ের পর রাসূলে করীম ﷺ কাতীবা, অতীহ এবং সালালেম অঞ্চলের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। সালালেম বনু নাযির গোত্রের এক প্রসিদ্ধ ইহুদী আবুল হোকাইকের দূর্গ ছিল। এদিকে নাতাত ও শিক অঞ্চলের বিজিত ইহুদীগণ এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং এ দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করেছিল।

এ তিনটি দূর্গের কোনটিতে যুদ্ধ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে যুদ্ধ বিশারদগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, কোমুস দূর্গ বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করা হয়েছিল এবং বর্ণনাভঙ্গী থেকে এটা বুঝা যায় যে, যুদ্ধের মাধ্যমেই এ দূর্গের উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ দূর্গ স্বেচ্ছায় সমর্পণের ব্যাপারে মুসলিমগণের সঙ্গে ইহুদীদের কোন কথাবার্তা হয়নি।[১]

কিন্তু ওয়াকেদী স্পষ্টভাবে দুটি শব্দে প্রকাশ করেছেন যে, এ অঞ্চলের দূর্গ তিনটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলিমগণের হাতে সসর্পণ করা হয়। সম্ভবত কোমুস দূর্গটি নিয়ে প্রথমাবস্থায় যুদ্ধ হয় এবং তারপর আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। তবে অন্য দুটি যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমগণের হাতে সমর্পণ করা হয়।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী কাতীবা গমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবরোধ সৃষ্টি করেন। এ অবরোধ চৌদ্দ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবরোধ কালে ইহুদীগণ সে সময় পর্যন্ত দূর্গ হতে বাহিরে আসে নি যে পর্যন্ত না রাসূলে করীম ﷺ মিনজানীক যুদ্ধ ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ না করেন। এ যুদ্ধ ব্যবহারের আশঙ্কায় যখন তারা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল তখন সন্ধির মনোভাব ব্যক্ত করল।

সন্ধির কথাবার্তা (المفاوضة) : ইবনু আবিল হোকাইক সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বলে সংবাদ প্রেরণ করে যে, 'আমি কি আপনার নিকট আগমণ করে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি? নাবী করীম ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ"।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হ্যাঁ সূচক উত্তর লাভের পর সে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করল যে, দূর্গের মধ্যে যে সকল সৈন্য অবলম্বন করছে তাদের জীবন রক্ষা করতে হবে, তাদের পরিবার বর্গকে তাদের সঙ্গে থাকতে দিতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে দাসাদাসী বানানো যাবে না) পরিবার পরিজন সহ তাদের খায়বার জমিন ছেড়ে বাইরে যেতে দিতে হবে। তাদের সম্পাদিত, যথা- বাগ-বাগীচা সোনাদানা, অশ্ব, যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য লৌহবর্ম ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সমর্পণ করবে। শুধু সে কাপড়গুলো তারা সঙ্গে নিতে পারবে যা মানুষের লজ্জা নিবারণ ও জীবন ধারণের প্রয়োজন হবে।[২]

রাসূল করীম ﷺ বললেন, (وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا) যদি তোমরা আমার নিকট থেকে কিছু গোপন কর তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ দায়িত্ব মুক্ত হবেন।'

ইহুদীগণ এ সকল শর্ত মেনে নেয়ার ফলে মুসলিমগণের সঙ্গে তাদের সন্ধি হয়ে গেল।[৩] এ সন্ধির ফলশ্রুতিতে আলোচ্য দূর্গ তিনটি মুসলিমগণের অধিকারে এসে যায় এবং এভাবে খায়বার বিজয় সম্পূর্ণ হয়।

আবুল হোকাইকের দুই ছেলের ওয়াদা ভঙ্গ এবং তাদের হত্যা (قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد) : আবুল হোকাইকের দুই ছেলে এ সন্ধি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে অনেক সম্পদ গোপনে সরিয়ে নেয়। তারা একটি চামড়া ও উধাও করে দেয় যার মধ্যে অনেক সম্পদ এবং হুয়াই বিন আখতাবের অলঙ্কারাদি ছিল। হুয়াই বিন আখতাব মদীনা হতে বনু নাযিরের বিতাড়নের সময় এ সকল অলঙ্কারাদি সঙ্গে এনেছিল।

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩১, ৩৩৬-৩৩৭ পৃঃ।

[2] কিন্তু সুনানে আবু দাউদের মধ্যে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, এ শর্তের উপর তিনি সন্ধি চুক্তি করেছিলেন যে, খায়বর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নিজ নিজ সওয়ারীর উপর যে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তাদের দেয়া হবে। দ্রঃ আবু দাউদ ২য় খণ্ড পৃঃ।

[3] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৩৬ পৃঃ।

ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, যখন কেনানা বিন আবিল হোকাইককে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল, তখন তার নিকট বনু নাযিরের সম্পদ গচ্ছিত ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তখন সে তার জানার ব্যাপারটি সরাসরি অস্বীকার করে বলল যে, এ গচ্ছিত সম্পদের স্থান সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এরপর একজন ইহুদী এসে বলল যে, 'আমি কেনানকে প্রতিদিন এ বিজন প্রান্তরের কোন এক স্থানে ঘোরাফেরা করতে দেখি।'

ইহুদীর এ কথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেনানকে বললেন, (أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟) 'এ কথা বল যে, যদি এ গচ্ছিত সম্পদ আমারা তোমার নিকট থেকে বাহির করে নিতে পারি তাহলে তোমাকে হত্যা করব কি না?'

সে বলল, 'জী হ্যাঁ'

সাহাবীগণ (রাঃ) সেই প্রান্তর খননের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কিছু সম্পদ পাওয়া গেল।

অবশিষ্ট সম্পদ সম্পর্কে নাবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলে আগের মতোই সে অস্বীকার করল। ফলে তার শাস্তি বিধানের জন্য তাকে যুবাইরের হস্তে সমর্পণ করা হল এবং এ কথাও বলা হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সম্পদ আমাদের হস্তগত হবে না ততক্ষণ শাস্তিদান অব্যাহত থাকবে।

যুবাইর (রাঃ) চকমকি পাথর দ্বারা তার বক্ষে আঘাত করতে থাকেন যার ফলে জীবন মরণ সন্ধিক্ষণের অবস্থা সৃষ্টি হল তার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাম্মদ বিন মাসলামার হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি মাহমুদ বিন মাসলামার হত্যার বদলাস্বরূপ তার গ্রীবা কর্তন করে তাকে হত্যা করেন। (মাহমুদ ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নায়েম দূর্গের দেয়ালের পাশে বসেছিলেন। এমনি সময়ে এ ব্যক্তি তাঁর উপর একটি চাকির পাট নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে।)

ইবনু কাইয়ূমের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলে করীম ﷺ আবুল হোকাইকের দুইজন ছেলেকে হত্যা করেছিলেন। ঐ দুজনের বিরুদ্ধে সম্পদ গোপন করার সাক্ষ্য দিয়েছিল কেনানার চাচাত ভাই। এরপর রাসূলে করীম ﷺ হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে বন্দী করেন। সে ছিল কেনানা বিন আবিল হোকাইকের স্ত্রী এবং তখনো সে নববধূ ছিল এ অবস্থায় তার বিদায় দেয়া হয়েছিল।

গণীমতের মাল বন্টন (قسمة الغنائم) : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছা করেছিলেন খায়বার হতে ইহুদীদের বিতাড়িত করতে এবং সেই শর্তেই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরয পেশ করল এ জমিন তাদের থাকতে দেয়ার জন্য। তারা বলল, 'আমাদের এ জমিন থাকতে দিন, আমরা এর দেখাশোনা করব। কারণ, এ জমিন সম্পর্কে আপনাদের তুলনায় আমাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ (রাঃ)-এর নিকট এমন দাস ছিল না যারা এ জমিন দেখাশোনা এবং চাষাবাদ ও বুননের কাজকর্ম করতে পারবে। তাছাড়া, সাহাবীগণ (রাঃ)-ও এমন অবসর ছিল না যে, তাঁরা এ সকল কাজকর্ম করতে পারবেন। এ কারণে নাবী করীম ﷺ এ শর্তে খায়বরের ভূমি ইহুদীদের হাত ছেড়ে দিলেন যে সমস্ত ক্ষেত খামার ও বাগ-বাগীচার উৎপাদনের অর্ধাংশ ইহুদীদের দেয়া হবে এবং তিনি যতদিন চাবেন ততদিন এ ব্যবস্থা বজায় থাকবে (যখন প্রয়োজন বোধ করবেন তখন তাদের বিতাড়িত করা হবে) উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-কে নিয়োজিত করা হয়।

খায়বরের লব্ধ সম্পদ ছত্রিশ অংশে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এর প্রতি পনুরায় একশত অংশে বিভাজন করে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে মোট সম্পদ বন্টন করা হতো তিন হাজার ছয়শ অংশে। এর মধ্য হতে অর্ধেক অর্থাৎ এক হাজার আটশ অংশ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণের (রাঃ)। সাধারণ মুসলিমগণের মতোই রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একটি অংশ গ্রহণ করতেন। অবশিষ্ট এক হাজার আটশ অংশ (অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলিমগণকে সামাজিক প্রয়োজন এবং আপাৎকালীন সময়ের জন্য পৃথক করে রাখতেন। খায়বরের লব্ধ

সম্পদ এ কারণে আঠার শত অংশে বন্টনের ব্যবস্থা ছিল যে, হুদায়বিয়ার অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটা ছিল এক বিশেষ দান। উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্যই অংশের ব্যবস্থা ছিল। হুদায়বিয়ার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শত। খায়বার আসার সময় এরা দুশ ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু আরোহী ছাড়া ঘোড়ারও অংশ নির্ধারিত ছিল এবং প্রতিটি ঘোড়ারর জন্য দু'শ দুইটি অংশ ধার্য ছিল সেহেতু লব্ধ সম্পদ আঠারশ অংশে বন্টন করা হয়েছিল। দু'শ ঘোড়সওয়ারীকে তিন তিন অংশ হিসেবে ছয়শ অংশ এবং বারশ পদাতিককে এক এক অংশ হিসেবে বার শত অংশ সর্ব মোট আঠারশ অংশে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[1]

খায়বরের যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের আধিক্যের কথা সহীহ বুখারীর আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে প্রমাণীত হয়েছে। তিনি এ কথাও বলেছেন, যে পর্যন্ত না খায়বার বিজয় করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম সে পর্যন্ত পরিতৃপ্তি হতে পারিনি। অনুরূপ প্রমাণ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'যখন খায়বার যুদ্ধে মুসলিমগণ বিজয়ী হলেন তখন আমরা বললাম এখন পেট পুরে খেজুর খেতে পারব।[2]

জা'ফর বিন আবু তালিব এবং আশয়ারী সাহাবাদের আগমন (قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين) : সেই যুদ্ধের মধ্যে জা'ফর বিন আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিদমতে নববীতে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আশয়ারী মুসলিমগণ অর্থাৎ আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর বন্ধুগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

আবু মুসা আশয়ারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, 'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে অবগত হলাম তখন আমাদের সম্প্রদায়ের পঞ্চাশ জন লোক সহ আমার ভাই ও আমি হিজরতের উদ্দেশ্যে একটি নৌকা করে যাত্রা করলাম খিদমতে নব্বীতে পৌঁছার জন্য। কিন্তু আমাদের নৌকাটি নাজ্জাশীর দেশে নিয়ে গিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। জাফর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সেখানেই আমাদের সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ আমাদের এখানে প্রেরণ করেছেন আপনারাও আমাদের সঙ্গে অবস্থান করুন। এ প্রেক্ষিতে আমরাও তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করলাম এবং খিদমতে নববীতে সে সময় পৌঁছতে পারলাম যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাফর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর বন্ধুদের এবং আমাদের সঙ্গে আগত নৌকার আরোহীদের জন্যও গনীমতের অংশ নির্ধারণ করেছিলেন।[3] এছাড়া যাঁরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি তাঁদের জন্য কোন হিসসা নির্ধারণ করা হয় নি।

জাফর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁকে খোশ আমদেদ জানিয়ে চুম্বন করে বললেন, (والله ما أدري بأيهما أفرح؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر) 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে, আমার অধিক আনন্দ কিসের খায়বার বিজয়ের না জাফরের আগমনের?[4]

এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ সকল লোকজনকে নিয়ে আসার জন্য রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ঐ সকল লোকজনকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। ফলে নাজ্জাশীর দুটি নৌকা করে তাঁদের মদীনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। এঁরা ছিলেন সর্বমোট ষোল জন। অধিকন্তু, কিছু সংখ্যক মহিলা এবং শিশুও ছিল সে দলে আর অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা এর পূর্বেই মদীনায় ফিরে এসেছিলেন।[5]

সাফিয়ার সঙ্গে বিবাহ (الزواج بصفية) : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, সাফিয়ার স্বামী কেনানা বিন আবিল হোকাইক স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মুসলিমগণের হাতে নিহত হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর স্ত্রী সাফিয়াকে বন্দী

---

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৩৭-১৩৮ পৃঃ, ব্যাখ্যাসহ ।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খন্ড ৬০৯ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৪৪৩ পৃঃ, পতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৪৮৪-৪৮৭ পৃঃ।

[4] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃঃ।

[5] তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ।

মহিলাদের দলভূক্ত করা হয়। এরপর যখন এ বন্দী মহিলাদের একত্রিত করা হয়। তখন দেহয়াহ বিন খলীফা কালবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর খিদমতে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর নাবী! বন্দী মহিলাদের ম্যধ থেকে আমাকে একটি দাসী প্রদান করুন।'

নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (خذ جارية من السبي غيرها) 'তাদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করে নিয়ে যাও।' তিনি সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে থেকে সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে মনোনীত করেন। এ প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! বনু কোরাইযা ও বনু নাযীর গোত্রের সাইয়েদা সাফিয়াকে আপনি দেহয়াহর হাতে সমর্পণ করলেন, অথচ সে শুধু আপনার জন্য শোভনীয় ছিল।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সাফিয়া সহ দেহয়াকে এখানে আসতে বল।'

দেহয়াহ যখন সাফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলেন তখণ তিনি বললেন, 'বন্দী মহিলাদের মধ্য থেকে তুমি অন্য একজনকে দাসী হিসেবে গ্রহণ কর।'

অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে সাফিয়ার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তাঁর এ মুক্ত করাকে বিবাহে তাঁর জন্য মোহর নির্ধারণ করা হয়।

মদীনা প্রত্যাবর্তন কালে সাদ্দে সাহাবা নামক স্থানে পৌছলে সাফিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হালাল হয়ে গেলেন। তখন উম্মু সুলাইম (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য তাঁকে সাজগোজ ও শৃঙ্গার সহকারে প্রস্তুত করে দিলেন এবং বাসর রাত্রি যাপনের জন্য প্রেরণ করলেন। দুলহা হিসেবে তাঁর সঙ্গে সকাল পর্যন্ত অবস্থার করলেন। অতঃপর খেজুর, ঘী এবং ছাতু একত্রিত করে আলীমা খাওয়ালেন এবং রাস্তায় দুলহা দুলহানের রাত্রি যাপন হিসেবে তিন দিন তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলেন।[1] ঐ সময় নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুখমণ্ডলের উপর শ্যামল চিহ্ন দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কি?

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খায়বার আগমনের পূর্বে আমি স্বপ্নযোগে দেখেছিলাম যে, চাঁদ তার কক্ষচ্যুত হয়ে এসে পড়ল আমার কোলের উপর। আল্লাহ তা'আলা জানেন, আপনার সম্পর্কে আমার কোন কল্পনাও ছিল না। কিন্তু আমার স্বামীর নিকট যখন এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম তখন তিনি আমার মুখে এক চপেটাঘাত করে বললেন, 'মদীনার বাদশাহর প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয়েছে।[2]

বিষাক্ত বকরীর ঘটনা (أمر الشاة المسمومة) : খায়বার বিজয়ের পর যখন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরাপদ হলেন এবং তৃপ্তিবোধ করলেন তখন সালাম বিন মুশরিকের স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেস উপঢৌকন হিসেবে বকরীর ভূনা গোশত তাঁর নিকট প্রেরণ করে। সে বিভিন্ন সূত্র থেকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জেনে নিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বকরীর গোশতের কোন কোন অংশ অধিক পছন্দ করেন। তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি রানের গোশত অধিক পছন্দ করেন। এ জন্য সে রানের গোশতগুলো ভাল ভাবে বিষ মিশ্রিত করেছিল এবং অবশিষ্ট অন্যগুলোতেও বিষ প্রয়োগ করেছিল। অতঃপর সে গোশতগুলো নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এনে রাখা হলে নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রানের গোশতের টুকরোটি উঠিয়ে তার কিছু অংশ চিবুনোর পর মুখ থেকে বের করে তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم) 'এ হাড্ডি আমাকে বলছে যে এর সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে।'

এরপর নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যয়নবকে ডাকিয়ে নিয়ে তাকে যখন বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন তখন সে বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করল। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এমন কাজ করলে কেন? সে উত্তরে বলল, 'আমি চিন্তা করলাম যে, এ ব্যক্তি যদি বাদশাহ হন তাহলে আমরা তাঁর থেকে নিস্কৃতি লাভ করব, আর যদি তিনি নাবী হন তাহলে তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি বেঁচে যাবেন। তার এ কথা শুনে নাবী

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫৪ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৬০৪-৬০৬ পৃঃ,, যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৩৭ পৃঃ।

[2] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৩৭ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩৬ পৃঃ।

করীম ﷺ তাকে ক্ষমা করলেন। এ সময় নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন বিশর বিন বারা বিন মারুব (রাঃ)। **তিনি** এক গ্রাস গিলে ফেললেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এ মহিলাকে নাবী ﷺ ক্ষমা করেছিলেন কিংবা হত্যা করেছিলেন সে ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে **মত** পার্থক্য রয়েছে। মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ প্রথমে মহিলাকে **ক্ষমা** করেছিলেন, কিন্তু বিশর (রাঃ)-এর মৃত্যু সংঘটিত হয়ে গেল। তখন তাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হল।[1]

খায়বার যুদ্ধে দু'দলের প্রাণহানি (قتلى الفريقين في معارك خيــبر) : খায়বরের বিভিন্ন সংঘর্ষে সর্ব মোট শহীদ মুসলিমগণের সংখ্যা ছিল আঠার জন। আল্লাম মানসুরপুরী উনিশ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন যে, 'চরিতকারগণ খায়বার শহীদগণের সংখ্যা পনের জন বলে উল্লেখ করেছেন। আমি অন্বেষণ করে তেইশ জনের নাম পেয়েছি। যানীফ বিন ওয়ালেলার নাম শুধু অকেদী উল্লেখ করেছেন। তাবারী বলেছেন শুধু যানীফ বিন হাবীবের নাম। বিশর বিন বারা বিন মারুবের মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধশেষে সে বিষ মিশ্রিত মাংস খাওয়ার ফলে যা যয়নব ইহুদীরী পাঠিয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপঢৌকনস্বরূপ। বিশর বিন আব্দুল মুনযির সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ১. তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, ২. খায়বার যুদ্ধেদ শহীদ হয়েছিলেন। আমার মতে প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী ও সমর্থনযোগ্য।[2] অন্য পক্ষ অর্থাৎ ইহুদীগণের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল তিরানব্বই।

ফেদাক (فَـــدَكْ) : খায়বরে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য মোহাইয়াসা বিন মাসউদকে ফেদাক অঞ্চলে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। ফেদাকবাসীগণ মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে প্রথমত ইসলাম গ্রহণের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন খায়বরের ইহুদীদের উপর মুসলিমগণকে বিজয় দান করলেন তখন তারা মনে প্রাণে ভীত হয়ে পড়ল এবং রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে খায়বরবাসীগণের চুক্তির অনুরূপ ফেদাকের উৎপাদনের অর্ধেক দেয়ার প্রতিশ্রুতি সহ সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যার ফলে অত্যন্ত সহজভাবে ফেদাকের উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমগণকে ঘোড়া, উট কিংবা তরবারীর ব্যবহার করতে হয় নি।[3]

ওয়াদিল কোরা (وادي القُــرَى) : খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মনের দিক দিয়ে যখন কিছুটা মুক্ত হলেন তখন ওয়াদিল কোরা বা কোরা উপত্যকায় গমন করলেন। সেখানে ইহুদীদের একটি দলের বসবাস ছিল। এক পর্যায়ে আরবদের একটি দল গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

মুসলিমগণ যখন কোরা উপত্যকায় অবতরণ করলেন তখন ইহুদীগণ তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে আক্রমণ করল। তারা পূর্ব হতেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের এ আক্রমণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন দাস মৃত্যুমুখে পতিত হল। লোকজনেরা বললেন, 'তার জন্য জান্নাত বরকতময় হোক । নাবী করীম ﷺ বললেন,

(كلا، والذي نفسي بيده، إن الشَّمْلَةَ التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارًا)

'কখনই না। সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন, খায়বার যুদ্ধ এ ব্যক্তি যুদ্ধ লব্ধ মাল হতে বন্টনের পূর্বেই যে চাদর খানা চুরি করেছিল তা আগুনে পরিবর্তিত হয়ে ওর জন্য দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা শুনে একটি ফিতা, দুটি ফিতা কিংবা যিনি যে জিনিস গোপনে নিয়ে গিয়েছিলেন সে সব

---

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৩৯-১৪০ পঃ, ফতহুলী বারী ৭ম খণ্ড ৪৯৭ পৃঃ, মূল ঘটনা সহীহ বুখারীতে বিস্তারিত এবং সংক্ষিপ্ত দুভাবে বর্ণিত হয়েছে ১ম খণ্ড ৪৪৯ পৃঃ, ২য় ৬১০ ও ৮৬০ পৃ: ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩৭ ও ৩৩৮ পৃঃ।

[2] রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৬৮-২৭০ পৃঃ।

[3] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩৭ ও ৩৫৩ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর খিদমতে এনে হাজির করলেন। নাবী করীম (ﷺ) বললেন, (شراك من نار أو شراكان من نار). 'এ একটি কিংবা দুটি ফিতা ছিল আগুনের।"[1]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের উপযোগী সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করলেন। সমগ্র বাহিনীর পতাকা সা'দ বিন উবাদার হাতে সমর্পণ করলেন। একটি পতাকা দিলেন হোবাব বিন মুনযিরকে এবং তৃতীয় পতাকা দিলেন উবাদাহ্ বিন বিশরকে। এরপর ইহুদীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। এ দাওয়াত গ্রহণ না করে তাদের এক ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য ময়দানে অবতরণ করল। আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর পক্ষে যুবায়ের বিন আওয়াম (رضي الله عنه) যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করলেন। অতৎপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। যুবায়ের (رضي الله عنه) তাকেও হত্যা করলেন। এরপর তাদের পক্ষ থেকে তৃতীয় ব্যক্তি ময়দানে অবতরণ করলেন। এর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আলী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে হত্যা করলেন। এভাবে একে একে তাদের ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। যখন একজন নিহত হতো তখন নাবী করীম (ﷺ) অবশিষ্ট ইহুদীগণকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

ঐ দিন যখন সালাতের সময় হতো তখন সাহাবাদের নিয়ে নাবী করীম (ﷺ) সালাত পড়তেন। সালাতের পর পুনরায় ইহুদীদের সামনে ফিরে যেতেন এবং তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন।

এভাবে যুদ্ধ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন সকালে পুনরায় গমন করলেন। তখনো সূর্য বর্শা বরাবর উপরে ওঠেন এমন সময় তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা সম্পূর্ণ নাবী করীম (ﷺ)-এর হাতে সমর্পণ করে দিল। অর্থাৎ নাবী (ﷺ) শক্তি দিয়ে বিজয় অর্জন করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদ সমূহের সবটুকুই নাবী করীম (ﷺ)-এর হাতে গণীমত হিসেবে প্রদান কনের। বহু সাজ-সরঞ্জামাদি সাহাবীগণ (رضي الله عنهم)-এর হস্তগত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওয়াদিল কোরা নামক স্থানে চার দিন অবস্থান করেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সাহাবীগণ (ﷺ)-এর মধ্যে বন্টন করে দেন। তবে জমিজমা খেজুরের বাগানগুলো ইহুদীদের হাতেই ছেড়ে দেন এবং খায়বরবাসীগণ অনুরূপ ওয়াদিল কোরাবাসীগণের সঙ্গেও একটি চুক্তি সম্পাদন করেন।[2]

তাইমা (تَيْمَاء) : তাইমার ইহুদীগণ যখন খায়বার খেদাক এবং ওয়াদিল কোরার অধিবাসীদের পরাভূত হওয়ার খবর পেল তখন তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শক্তির মহড়া প্রদর্শন ছাড়াই সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট দূত প্রেরণ করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করে সম্পাদিত সহ বসবাসের অনুমতি দেন।[3] অতঃপর তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন যার পরিভাষা ছিল নিম্নরূপ :

'এ দলিল লিখিত হল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে বনু আদিয়ার জন্য। তাদের উপর কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল এবং মুসলিমগণ তাদের জিম্মাদার হলেন। তাদের উপর কোন প্রকার অন্যায় করা হবে না এবং দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হবে না। রাত্রি হবে তাদের সাহায্যকারী এবং দিন হবে পূর্ণতা প্রদান কারী (অর্থাৎ এ চুক্তি হবে স্থায়ী ব্যবস্থা) এ চুক্তি লিপিবদ্ধ করেন খালিদ বিন সাঈদ।[4]

মদীনা প্রত্যাবর্তন (العـودة إلى المدينـة) : তাইমায়াবাসীগণের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর নাবী করীম (ﷺ) মদীনা প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। প্রত্যাবর্তনকালে লোকজনেরা একটি উপত্যকার নিকট পৌঁছে সকলে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) 'আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا) 'স্বীয় আত্মার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর। তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিতকে আহ্বান করছ না বরং সে সত্তাকে আহ্বান করছ যিনি শ্রবণ করছেন এবং নিকটে রয়েছেন।[5]

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬০৮ পৃঃ।

[2] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৪৬ পৃঃ।

[3] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃঃ।

[4] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৪০ পৃঃ। এ ঘটনা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং সাধারণ হাদীস পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃঃ।

[5] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬০৫ পৃঃ।

পথ চলার সময় একবার রাত্রি বেলা দীর্ঘ সময় যাবত চলার পর রাত্রির শেষভাগে পথের মধ্যে কোন এক জায়গায় শিবির স্থাপন করলেন এবং শয্যা গ্রহণের সময় বেলাল (রাঃ)-কে এ বলে তাগাদা দিয়ে রাখলেন যে, 'রাত্রিতে আমাদের প্রতি খেয়াল রেখ (অর্থাৎ প্রত্যুষে আমাদের জাগিয়ে দিও)।' কিন্তু বেলাল (রাঃ) ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে নিজ সওয়ারীর উপর হেলান দিয়ে বসেছিলেন এবং সে ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত্রি শেষে সকলের গায়ে রোদের আঁচ লাগলেও কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সর্ব প্রথম ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং সকলকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন। নাবী (ﷺ) সে উপত্যকা হতে বাহির হয়ে সামনের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হন। অতঃপর লোকজনদের ফজরের সালাতের ইমামতি করেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ঘটনাটি অন্য কোন সফরে ঘটেছিল।[১]

খায়বার সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণাদি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, নাবী করীম (ﷺ)-এর মদীনা প্রত্যাবর্তন হয় ৭ম হিজরী সফর মাসের শেষ ভাগে কিংবা রবিউল আওয়ার মাসে।

সারিয়্যায়ে আবান বিন সাঈদ (سرية أبان بن سعيد) : সেনাধ্যক্ষগণের তুলনায় নাবী করীম (ﷺ) অধিকগুরুত্বের সঙ্গে এ কথা বলতেন যে হারাম মাসগুলো শেষ হওয়ার পর মদীনাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রাখা কোন ক্রমেই দূরদর্শিতা কিংবা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মদীনার আশেপাশে এমন সব বেদুঈনদের অবস্থান ছিল যারা লুটতরাজ এবং ডাকাতি করার জন্য সব সময় মুসলিমগণের অমনোযোগিতাজনিত সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। এ কারণে তাঁর খায়বার প্রাক্কলে বেদুঈনদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আবান বিন সাঈদের (রাঃ) নেতৃত্বে নাজদের দিকে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। আবান বিন সাঈদ তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করলে খায়বরে নাবী করীম (ﷺ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। ঐ সময় খায়বার বিজয় পর্ব শেষ হয়েছিল। অধিকতর বিশুদ্ধ তথ্য হচ্ছে, অভিযান ৭ম হিজরীর সফর মাসে প্রেরণ করা হয়েছিল। সহীহ বুখরীতে এর উল্লেখ রয়েছে।[২] হাফেজ ইবনু হজর লিখেছেন, 'এ অভিযানের অবস্থা আমি জানতে পারিনি।"[৩]

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৪০ পৃঃ। এ ঘটনা বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ এবং সাধারন হাদীস পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী যুদ্ধের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য, ২য় খণ্ড ৬০৮-৬০৯ পৃঃ।

[3] ফথহুল বারী ৭ম খণ্ড ৪৯১ পৃঃ।

بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة

৭ম হিজরীর অবশিষ্ট সারিয়া ও যুদ্ধসমূহ

যাতুর রেকা যুদ্ধ ((غزوة ذات الرِّقَـاع) : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আহযাবের তিনটি অঙ্গের মধ্যে দুটি শক্তিশালী অঙ্গকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত ও সন্তিবোধ করলেন তখন তৃতীয় অঙ্গটির প্রতি পুরোপুরি মনোযোগদানের সুযোগ লাভ করলেন সদস্য ছিল ঐ সব বেদুঈন যারা নাজদের বালুকাময় প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে বসবাস করত এবং মাঝে মাঝে ডাকাতি ও লুট-তরাজে লিপ্ত হত।

যেহেতু এ বেদুঈনগণ স্থায়ী কোন জনপদ কিংবা শহরের অধিবাসী ছিল না এবং তাদের স্থায়ী কোন দূর্গও ছিল না সেহেতু মক্কা ও খায়বরের অধিবাসীদের ন্যায় তাদের বশীভূত করা কিংবা অন্যায় ও অনিষ্টতা থেকে তাদের বিরত রাখার ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কাজেই, তাদের শায়েস্তা করার জন্য তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্টের অনুরূপ সন্ত্রাসমূলক ও শাস্তিমূলক কার্যকলাপকেই উপযোগী বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল।

এ প্রেক্ষিতে বেদুঈনদের মনোভয় ভীতির সঞ্চার, চমক সৃষ্টি এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে একত্রিত বেদুঈনদের বিক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে নাবী করীম ﷺ যে শস্তিমূলক আক্রমণ পরিচালনা করেন তা 'যাতুর রেকা যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে।

সাধারণ যুদ্ধ বিশারদ ইতিহাসবিদগণ ৪র্থ হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন যে, ৭ম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু এ যুদ্ধে আবু মুসা আশয়ারী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু এটা প্রমাণিত হয় যে, এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল (সম্ভবত মাসটি ছিল) রবিউল আওয়াল)। কারণ খায়বার যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনা হতে বাহির হয়েছিলেন সে সময় আবু হুরায়রা মদীনায় পৌঁছে ইসলামের ছায়াতলে প্রবিষ্ঠ হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি খায়বার গিয়ে যখন খিদমতে নববীতে পৌঁছেন তখন খায়বার বিজয় পর্ব শেষ হয়েছিল।

অনুরূপভাবে আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) আবিসিনিয়া হতে গিয়ে ঐ সময় খিদমতে নববীতে পৌঁছেছিলেন যখন খায়বার বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। যাতুরা রেকা যুদ্ধে সাহাবী (রাঃ) দ্বয়ের অংশগ্রহণ এটাই প্রমাণিত করে যে, এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে চরিতবানগণ যা কিছু বলেছেন তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, নাবী করীম ﷺ আনমার অথবা বনু গাতফান গোত্রের দুটি শাখা বনু সা'লাবা এবং বনু মোহারেবের লোকজনদের সমবেত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু যার কিংবা উসমান ইবনু আফ্‌ফানের উপর মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ৪০০ শ' কিংবা ৭০০ শ' সাহাবা (রাঃ)-কে নাজ্‌দ অভিমুখে যাত্রা করেন। অতঃপর মদীনা হতে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিতত নাখল নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। তথায় বনু গাতফান গোত্রের মুখোমুখী হতে হয়, কিন্তু যুদ্ধ হয় নি। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় খওফের সালাত (যুদ্ধাবস্থার) আদায় করেন।

সহীহ বুখারীতে আবু মুসা আশয়ারী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বাহির হলাম। আমরা ছিলাম ছয় জন। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি উট যার উপর আমরা পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলাম। এ কারণে আমাদেপর পা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। আমার পা দুটি আহত হয়েছিল এবং নখ ঝরে পড়েছিল। কাজেই আমরা নিজ নিজ পায়ের উপর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলাম। এ কারণে এ যুদ্ধের নাম দেয়া হয়েছিল যাতুর রেকা (ছিন্ন বস্তের যুদ্ধ)।[১]

সহীহ বুখারীতে জাবের (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'যাতুর রেকা যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। (নিয়ম ছিল) আমরা যখন ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিকট পৌঁছতাম তখন তা নাবী করীম

---

[1] সহীহ বুখারী যাতুর রেকা যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৫৯২ পৃঃ, সহীহ মুসলিম যাতুর রেকা অধ্যায় ২য় খণ্ড ১১৮ পৃঃ।

ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিতাম। এক দফা, নাবী করীম ﷺ শিবির স্থাপন করলেন তখন লোকজনেরা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের মাঝে এদিক সেদিক এলোমেলো অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং বৃক্ষের সঙ্গে তরবারী খানা ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়েন।

জাবের বলেছেন, 'আমরা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম এমন সময় এক মুশরিক এসে নাবী করীম ﷺ-এর তরবারী খানা হাতে নিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে ভয় করছ?' নাবী করীম ﷺ বললেন, 'না"। সে বলল, 'তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' নাবী করীম ﷺ বললেন, 'আল্লাহ"। জাবের বললেন, 'আল্লাহ"। জাবের বলেছেন, 'রাসূলে করীম ﷺ হঠাৎ আমাকে ডাক দিলেন। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম যে একজন বেদুঈন রাসূল ﷺ-এর নিকট বসে রয়েছে।

নাবী ﷺ বললেন,

(إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صَلْتًا. فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس)

আমি শুয়েছিলাম এমন সময় এ ব্যক্তি আমার তরবারী খানা টেনে হাতে নিলে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে তরবারী খানা হাতে নিয়ে বলল, 'আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ"। এ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে বসে রয়েছে।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোন প্রকার তিরস্কার করলেন না বা ধমক দিলেন না।

আবু আওয়ানার বর্ণনা সূত্রে আরও বিস্তারিত জানা যায় যে, নাবী করীম ﷺ যখন তার উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ' তখন তরবারী খানা তার হাত থেকে পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তরবারী খানা নিজ হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, 'এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' সে বলল, 'আপনি ভাল ধৃতকারী প্রমাণিত হলেন।' (অর্থাৎ দয়া করুন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟) 'তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ﷺ।

সে বলল, 'আমি অঙ্গীকার করছি যে,আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব না এবং যারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সঙ্গেও থাকব না।'

জাবের-এর বর্ণনায় রয়েছে যে এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ছেড়ে দেন। অতঃপর সে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলে, 'আমি সর্বোত্তম মানুষের নিকট থেকে তোমাদের এখানে আসছি।[১]

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে যে, সালাতের ইকামত বলা হল এবং নাবী ﷺ এক দলকে দুই রাকাত সালাত পড়ালেন অতঃপর তারা পিছনে চলে গেলেন এবং নাবী করীম ﷺ দ্বিতীয় দলকে দুই রাকাত সালাত পড়ালেন। এমনিভাবে নাবী করীম ﷺ-এর চার রাকাত এবং সাহাবা কেরামের দুই দুই রাকাত করে হল।[২] এ বর্ণনার ভঙ্গীতে মনে হচ্ছে যে, এ সালাত উল্লেখিত ঘটনার পরেই পড়া হয়েছিল।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় মুসাদ্দাদ, আবু আওয়ানা হতে এবং তিনি আবু বিশর হতে বর্ণনা করেছেন যে, সেই লোকটির নাম ছিল (গোত্তরেস বিন হারেস)।[৩] ইবনু হাজার বলেছেন যে, ওয়াকেদীর নিকট এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে এ কথা বলা হয়েছে যে, এ বেদুঈনের নামি ছিল। দাসুর যে এ দুটি ছিল ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা যা ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল।[৪] আল্লাহই ভাল জানেন।

---

[1] শাইখ আব্দুল্লাহ নাজদীকৃত মোখতাসারুস সীরাত ২৬৪ পৃঃ। পথহুল বারী ৭ম খণ্ড ৪১৬ পৃঃ।
[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৪০৭-৪০৮ পৃঃ। ২য় খণ্ড ৫৯৩ পৃঃ।
[3] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৯৩ পৃঃ।
[4] ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৪১৭-৪২৮ পৃঃ।

এ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন কালে সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) একজন মুশরিক মহিলাকে বন্দী করেন। এর প্রেক্ষিতে তাঁর স্বামী মানত করল যে, সে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ (رضي الله عنهم)-এর মধ্যে থেকে এক জনের রক্ত প্রবাহিত করবে। এ উদ্দেশ্যে সে রাত্রিতে বাহির হল।

শত্রুদের আক্রমণ ও অনিষ্ট থেকে মুসলিমগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আব্বাস বিন বিশর ও আম্মার বিন ইয়াসিরকে পাহারার কাজে নিয়োজিত করা হয়। বন্দী মহিলার স্বামী যে সময়ে সেখানে এসেছিল সে সময় আব্বাদ (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তাঁর সালাতের ভঙ্গ না করে তাঁর প্রতি তীর নীক্ষেপ করে। তিনি সালাত অবস্থায় সে লোক তাঁর অঙ্গে বিদ্ধ তীরটি বাহির করে নিক্ষেপ করে দেন। অতঃপর সে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করে। কিন্তু তিনি সালাত ত্যাগ না করেই শেষ সালামের মাধ্যমে সালাত সমাপ্ত করেন। অতঃপর স্বীয় সঙ্গীকে জাগ্রত করেন।

অবস্থা বুঝে সুঝে সঙ্গী বললেন, 'আপনি আমাকে জাগান নি কেন?

তিনি বললেন, 'আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম। সম্পূর্ণ করা থেকে বিরত হওয়াটা আমি পছন্দ করি নি।'[1]

পাষাণ হৃদয় বেদুঈনদের ভীত সন্ত্রস্ত করার ব্যাপারে এ যুদ্ধের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আয়োজিত অভিযান সমূহ সম্পর্কে সমীক্ষা চালালে দেখতে পাওয়া যায় যে, এ যুদ্ধের পর গাতফানদের ঐ সমস্ত গোত্র মাথা উঁচু করার আর সাহস পায় নি। তাদের মনোবল ক্রমে ক্রমে শিথিল হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা পরাভূত হল এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিল। এমন কি সে সকল বেদুঈনদের কতগুলো গোত্রকে মক্কা বিজয়ের সময় এবং হুনাইন যুদ্ধে মুসলিমগণের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল এবং তাদেরকে হুনায়েন যুদ্ধের গণীমতের অংশও প্রদান করা হয়েছিল। আবার মক্কা বিজয় হতে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের সদকা গ্রহণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারা নিয়মিত সদকা ও যাকাত আদায় করেছিল। মূলকথা হচ্ছে, এ কৌশল অবলম্বনের ফলে ঐ তিনটি শক্তি ভেঙ্গে যায় যার খন্দকের যুদ্ধে মদীনার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল এবং যার ফলে সমগ্র অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিল।

এরপর কতগুলো গোত্র বিভিন্ন অঞ্চলে যে গণ্ডগোল ও চক্রান্তমূলক কাজকর্ম আরম্ভ করেছিল মুসলিমগণ খুব সহজেই তাদের আয়ত্বে নিতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকন্তু, এ যুদ্ধের পর বড় বড় শহর ও বিভিন্ন দেশ বিজয়ের পথ প্রশস্ত হতে শুরু করে। কারণ, এ যুদ্ধের পর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইসলাম ও মুসলিমগণের নিরাপত্তা ও শান্তি স্বস্তির জন্য পুরোপুরি অনুকূল হয়ে ওঠে।

সপ্ত হিজরীর কয়েকটি ঘটনা :

উপরোল্লিখিত যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তম হিজরীর শওয়াল মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় মদীনায় অবস্থান কালে তিনি যে সকল অভিযান প্রেরণ করেন তার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল-

কোদাইদ অভিযান ৭ম হিজরী সফর কিংবা রবিউল আওয়াল মাস

বনু মলুহ গোত্রকে শায়েস্তার জন্য গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়সীর পরিচালনাধীনে কোদাইদ নামকস্থানে এ অভিযান প্রেরিত হয়। বনু মলুহ বিশর বিন সোয়াইদের বন্ধুগণকে হত্যা করেছিল। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এ অভিযাত্রী দল রাত্রি বেলা আক্রমণ করে বনু মহুল গোত্রের অনেক লোককে হত্যা করেন এবং গবাদি পশু খেদিয়ে নিয়ে আসেন। শত্রু পক্ষ একটি বড় আকারের বাহিনী সহ মুসলিম বাহিনীকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীর উপর পাল্টা আঘাত হানা। কিন্তু তারা যখন মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি এসে পড়েন তখন প্রবর বেগে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১১২ পৃঃ। এ যুদ্ধের বিস্তাতি তথ্যাদির জন্য আরও দ্রষ্টব্য ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২০৩ থেকে ২০৯ পৃঃ। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১১০-১১২ পৃঃ। ফতহুল বারী ৪১৭-১২৮ পৃঃ।

প্লাবন দেখা দেয়। এ প্লাবনই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিরক্ষা প্রাচীর হিসেবে কাজ করে। সে সুযোগে মুসলিম বাহিনী নিরাপত্তা ও শান্তির মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করেন।

২. **হুসমা অভিযান (৭ম হিজরী, জুমাদাল আখেরাহ) :** এ অভিযান সংক্রান্ত আলোচনা রাজন্য বর্গের নিকট পত্রলিখন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৩. **তুরবাহ্ অভিযান (৭ম হিজরী শা'বান মাস) :** এ অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর নেতৃত্বে। এ অভিযান ত্রিশ জন মুসলিম সৈন্য অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা রাত্রি বেলা সফল করতেন এবং দিবা ভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। এ অভিযানের লক্ষ্যস্থল ছিল বনু হাওয়াযেন। মুসলিম অগ্রাভিযানের খবর পেয়ে বনু হাওয়াযেন পলায়ন করে যার ফলে মুসলিম বাহিনী সেখানে কাউকে না পেয়ে মদীনা ফিরে আসেন।

৪. **ফেদাক অঞ্চল অভিমুখে অভিযান (৭ম হিজরী শা'বান মাস) :** এ অভিযান প্রেরণ করা হয় বশীর বিন সা'দ আনসারী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে বনু মুররার সংশোধন উপলক্ষে। এ অভিযাত্রী দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন। বশীর (রাঃ) তাদের অঞ্চলে পৌঁছে ভেড়া বকরী এবং গবাদী পশু খেদিয়ে নিয়ে মদীনার পথে অগ্রসর হন। কিন্তু রাত্রিতে এবং গবাদী পশু খেদিয়ে নিয়ে মদীনার পথে অগ্রসর হন। কিন্তু রাত্রের শত্রুদল তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করে। অভিযাত্রীগণ তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তীর শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা নিরস্ত্র হয়ে পড়েন এবং অবশেষে সকলকেই শাহাদত বরণ করতে হয়। কেবলামাত্র বশীর (রাঃ) আহত অবস্থায় জীবত থাকেন। আহত অবস্থায় তাকে ফেদাকে আনা হয়। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীগণের নিকট অবস্থান করেন। সুস্থতা লাভের পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

৫. **মিফায়া অভিযান (৭ম হিজরীর রমাযান মাস) :** এ অভিযান প্রেরণ করা হয় গালিব বিন আব্দুল্লাহ লাইসীর নেতৃত্বে বনু ওয়াল ও বুন আবদ বিন সা'লাবার সংশোধন উপলক্ষে এবং বলা হয়েছে যে, জুহায়না গোত্রের শাখা হারাকাতকে শিক্ষা দানের জন্য। অভিযাত্রীদলের সদস্য সংখ্যা ছিল একশ ত্রিশ।

মুসলিম মুজাহিদগণ সংঘবদ্ধভাবে শত্রুদের উপর আক্রমণ পরিচালন করেন এবং যে কেউ মাথা উঁচু করে আক্রমণ প্রতিহত করতে আসে তাকে হত্যা করেন। অতঃপর শত্রুপক্ষের গবাদি পশুগুলো খেদিয়ে নিয়ে আসেন।

এ অভিযান কালে উসামা বিন যায়েদ নাহিক বিন মের্দসাকে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা সত্ত্বেও হত্যা করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে নাবী করীম (ﷺ) নিন্দা করে বলেছিলেন,

(أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟).

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? 'তুমি তার অন্তর চিরে কেন বুঝাবার চেষ্টা করল না? সে সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী ছিল?'

৬. **খায়বার অভিযান (৭ম হিজরী, শাওয়াল মাস) :** এ অভিযান ছিল ত্রিশ জন ঘোড়সওয়ারী সমন্বয়ে গঠিত একটি দল। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার (রাঃ) নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল এ অভিযান। এ অভিযানের কারণ ছিল, আসীর অথবা বশীর বিন যারাম মুসলিমগণের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য গাতফানকের একত্রিত করছিল।

মুসলিমগণ যথাক্রমে পৌঁছার পর আসীরকে এ মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে খায়বরের গর্ভনর নিযুক্ত করবেন। তার ত্রিশ জন বন্ধু সহ তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তাঁরা তাকে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু কারকা নেয়ার পৌঁছার পর দুই দলের মধ্যে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ার ফলে আসীর এবং তার ত্রিশ জন সাথী মুসলিমগণের হাতে নিহত হয়।

৭. **ইয়ামন ও জাবার অভিযান (৭ম হিজরী শাওয়াল মাস) :** জাবার নামে হচ্ছে বনু গাতফান এবং বলা হয়েছে যে, বনু ফাযারা ও বনু উযরা একটি এলাকার নাম। বসীর বিন কা'ব আনসারী -কে তিনশ মুসলিম সৈন্যের একটি দল সহ সেখানে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল মদীনার উপর আক্রমণ চালানোর লক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণরত এক বিরাট বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অভিযাত্রী মুসলিম বাহিনী রাত্রিবেলা পথ চলতেন এবং দিবাভাগ আত্মগোপন করে থাকতেন। শত্রুরা যখন বশীরের অগ্রাভিযানের সংবাদ অবগত হল তখন তার পলায়ন করল। বশীরের বাহিনী শত্রুপক্ষের দুই ব্যক্তিকে বন্দী করতে এবং অনেকগুলো গবাদি পশু আয়ত্বে নিতে সক্ষম হন। বন্দী দুইজনকে খিদমতে নববীতে হাজির করা হলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

৮. **গাবা অভিযান :** ইমামা ইবনু কাইয়ূম এ অভিযান উমরায়ে কাযার পূর্বে ৭ম হিজরীর অভিযান সমূহের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এ অভিযানের মূল কথা হচ্ছে, জাশম বিন মোয়াবিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি অনেক লোকজন নিয়ে গাবা নামক স্থানে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনু কাইস গোত্রের লোকজনদের একত্রিত করা। এ সংবাদ অবগত হয়ে নাবী করীম আবু হাদরাদ -কে মাত্র দুইজন সঙ্গী সহ তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হাদরাদ এমন এক যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে শত্রুদল শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করে। মুসলিম বাহিনী অনেক উট, ভেড়া ও ছাগল খেদিয়ে নিয়ে আসেন।[১]

---

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৪৯-১৫০ পৃঃ এ অভিযানগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২২৯-২৩১ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৪৮-১৫০ তালকীহুল ফুহুম, টীকাসহ ৩১ পৃঃ আব্দুল্লাহ নাজদী লিখিত সীরাত গ্রন্থের ৩২২-৩২৪ পৃঃ।

عمرة القضاء

কাযা উমরাহ

ইমাম হাকেম বলেছেন, এ সংবাদ ধারাবাহিকতার সঙ্গে প্রমাণিত যে, যখন যিলকা'দার চাঁদ দেখা গিয়েছিল, তখন নাবী করীম ﷺ সাহাবাবৃন্দের (রাঃ) প্রত্যেককেই কাযা হিসেবে নিজ নিজ উমরাহ আমায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। যাঁরা হুদায়বিয়ার উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই উমরাহ আদায়ে শরীক হবেন, কেউ পিছনে থাকবেন না। এ প্রেক্ষিতে (সেই সময়) যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই যাত্রা করেন। হুদায়বিয়া উপস্থিত ছিলেন না এমন কিছু সংখ্যক লোকও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে বের হন। এভাবে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বহির্গত লোকের সংখ্যা ছিল দুই হাজার। মহিলা এবং শিশুরা ছিল এ সংখ্যার অধিক।[1]

রাসূলে করীম ﷺ এ সময়ে আবু রহম গেফারী (রাঃ)-কে মদীনায় তাঁর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন ৬০টি উট এবং সে সব দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন নাজিয়া বিন জুন্দুর আসালামী (রাঃ)-কে। যুল হুলাইফাতে উমরার জন্য এহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বায়িক ধ্বনি উঁচু করলেন। নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মুসলিমরাও লাব্বায়িক পড়লেন। মুশরিকদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কায় কাফেলার লোকজনদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। ইয়ামেজ নামক উপত্যাকায় পৌঁছার পর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ বর্ম, ঢাল, তরবারী, তীর, বর্শা সব কিছু রেখে দেয়া হল এবং ওগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য আওস বিন কাওলী আনসারী (রাঃ)-কে ২০০ লোক সহ নিযুক্ত করা হল। আরোহীগণ অস্ত্র ও খাপ রক্ষিত তরবারী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।[2]

মক্কায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন। মুসলামগণ তরবারীগুলো কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং রাসূলে করীম ﷺ-কে সকলের মধ্যস্থলে রেখে লাব্বায়িক ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন।

মুশরিকরা মুসলিমগণের এ অগ্রাভিযানকে একটি তামাশা সুলভ ব্যাপার মনে করে তা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরে হয়ে এসে কা'বা গৃহের উত্তর দিকে অবস্থিত কায়াইকায়ান নামক পাহাড়ের উপর গিয়ে বসেছিল এবং কথোপকথন সূত্রে তারা পরস্পর বলাবলি করছিল যে,'তোমাদের নিকট এমন একটি দল আসছে ইয়াসরিবের অর্থাৎ মদীনার জ্বর যাদের একদম নষ্ট করে দিয়েছে।' এ কারণে নাবী করীম ﷺ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, প্রথম তিনটি চক্কর যেন তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শেষ করেন। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্বাভাবিক অবস্থায় অতিক্রম করবে। সাত চক্কর দৌড়ে পালন করার নির্দেশ শুধুমাত্র রহমত ও মমত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই দেন নি, বরং উল্লেখিত নির্দেশ প্রদানের অভিপ্রায় এই ছিল যে, মুশরিকগণ নাবী করীম ﷺ-এর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করুক।[3] এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে ইযতিবার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। ইযতিবার অর্থ হচ্ছে, ডান কাঁধ খোলা রাখা এবং গায়ের চাদর খানা ডান বগলের নীচ দিয়ে অতিক্রম করিয়ে অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিক হতে তার দ্বিতীয় কোনটি বাম কাঁধের উপর নিয়ে নেয়া।

রাসূলে করীম ﷺ সেই গিরিপথ ধরে মক্কায় প্রবেশ করলেন যা হাজূনের দিকে বাহরি হয়েছে। নাবী করীম ﷺ-কে দেখার জন্য মুশরিকগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। একটানা 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করে চলছিলেন। অতঃপর হারামে পৌঁছে তিনি নিজ লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা'বা ঘর

---

[1] ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫০০ পৃঃ।

[2] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৫১ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ১১৮ পৃ, ২য় খণ্ড ৬১০-৬১১পৃঃ, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৪১২ পৃঃ।

প্রদক্ষিণ করলেন। মুসলিমগণও কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। ঐ সময় আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) তরবারী কাঁধে ঝুঁলিয়ে রাসূলে করীম (ﷺ)-এর আগে আগে গমন করছিলেন এবং যুদ্ধাবৃত ছন্দের নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে ছিলেন-

বর্ণনা সমূহের মধ্যে উল্লেখিত কবিতাগুলো এবং তার বিন্যাস সম্পর্কে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলোকে আমি একত্রিত করে দিয়েছি।

خلو بني الكفار عنسبيله - خلوا فكل الخيرفي رسوله

قد أنزل الرحمن في تتزيله - في صحف تتلى على رسوله

يا رب إني مؤمن بقيله - إني رأيت الحق في قبوله

بأن خير القتال في سليله - اليوم نضربكم على تتزيله

ضربا يزيل الهام عن مقيله - ويذهل الخليل عن خليه

অর্থ : 'কাফিরগণের পুত্র! এদের পথ ছেড়ে দাও। পথ ছেড়ে দাও এই জন্য যে, যাবতীয় কল্যাণ তাঁর পয়গম্বরত্বে রয়েছে। রহমান স্বীয় কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ সহীফা সমূহের মধ্যে যা তাঁর পয়গম্বরের উপর পাঠ করা হয়। হে আমার প্রতিপালক! আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তা গ্রহণ করা সত্য বলে আস্থা পোষণ করছি যে, ঐ নিহত হওয়াই সর্বোত্তম যা আল্লাহর পথে হয়। আজ আমরা তাঁর কোরআন অনুযায়ী তোমাদেরকে এভাবে মারব যে মাথার খুলি মাথা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বন্ধুকে বন্ধু হতে বেখবর করে দেবে।

আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, এ প্রেক্ষিতে ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেন, 'ওহে রওয়াহার পুত্র! তুমি রাসূলে করীম (ﷺ)-এর সামনে এবং আল্লাহর পবিত্র ও মর্যাদামণ্ডিত স্থানে। কবিতা আবৃত্তি করছ?'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেন, (خَلِّ عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل) 'হে ওমর! ওকে আবৃত্তি করতে দাও। কারণ, এটা তাদের জন্য বর্শার আঘাত হতেও অধিক তীক্ষ্ণ।"[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ দৌড় দিয়ে তিন চক্কর শেষ করলেন। তা প্রত্যক্ষ করে মুশরিকগণ বলতে থাকল, এ সকল লোকজন ফেলেছে তাতো সঠিক নয়[২] বরং এরা সাধারণ লোকজন হতেও অধিক শক্তিশালী।

আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে নাবী করীম (ﷺ) সাফা' ও মারওয়ার সায়ী' করলেন। ঐ সময়ে নাবী করীম (ﷺ)-এর কুরবানীর পশু মারওয়া পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সায়ী' শেষে বললেন, 'এটা হচ্ছে কুরবানীর জায়গা এবং মক্কার সমস্ত জায়গা কুরবানীর স্থান। এরপর মারওয়ার নিকটে পশুগুলোকে কুরবানী করে দিলেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করলেন। সাহাবগণও (রাঃ) অনুরূপ করলেন। এরপর কিছু সংখ্যক লোককে ইয়াজেজ পাঠিয়ে দেয়া হল। উদ্দেশ্য ছিল এঁরা সেখানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গুলোকে তত্ত্বাবধান করবেন এবং যাঁরা এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর উমরাহ পালন করবেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করলেন। চতুর্থ দিবসে যখন সকাল হল তখন মুশরিকগণ আলী (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, 'তোমাদের সঙ্গীকে বল তিনি যেন এখান থেকে চলে যান। কারন, সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা থেকে বেরিয়ে এসে সরফ নামক স্থানে অবতরণ করে অবস্থান করলেন।

[1] তিরমিযী ৩- 'আদব ও অনুমতি' অধ্যায় কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড ১০৭ পৃঃ।

[2] সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৪১২ পৃঃ

মক্কা থেকে বেরে আসার প্রাক্কালে নাবী করীম -এর পিছনে পিছনে হামযা -এর কন্যাও 'চাচা, চাচা' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে এসে পড়ল। আলী তাকে কোরে তুলে নিলেন। এরপর তার সম্পর্কে আলী, জাফর এবং যায়েদের মধ্যে বিতর্ক হয়ে গেল। প্রত্যেকই দাবী করছিল যে, তিনি তার লালন পালনের জন্য অধিক দাবীদার। নাবী করীম জাফরের অনুকূলে মীমাংসা করলেন। কারণ, জাফরের স্ত্রী ছিলেন এ মেয়েটির খালা।

উল্লেখিত উমরাহ্ পালন কালে নাবী করীম মায়মুনা বিনতে হারেস আমেরিয়া -কে বিবাহ করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ জাফর বিন আবু তালিবকে মায়মুনা -এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত দায়দায়িত্ব আব্বাসকে সমর্পণ করেছিলেন। কারণ, মায়মুনার বোন উম্মুল ফযল ছিলেন তাঁর স্ত্রী। আব্বাস নাবী করীম -এর সঙ্গে মায়মুনার বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। অতৎপর মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় নাবী আবু রা'ফেকে পিছনে রেখে যান যেন তিনি মায়মুনা -কে সওয়ারীর উপর আরোহন করে তাঁর খিদমতে নিয়ে যান। যখন সারফ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন নাবী পত্নী মায়মুনা -কে তাঁর খিদমতে পৌঁছে দেয়া হল।[১]

উল্লেখিত উমরাহকে 'উমারায়ে কাযা' এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, তা উমারায়ে হুদায়বিয়ার কাযা হিসেবেই আদায় করা হয়েছিল। অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তা পালন করার কারণে (এ ধরণের সন্ধি বা আপোষকে আরবীতে কাযা বা মুকাযাত বলা হয়ে থাকে)। দ্বিতীয় কারণটিকে মুহাককেকীনে কেরাম অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।[২] প্রকাশ থাকে যে, এ উমরাহ চারটি নামে পরিচিত আছে যথা- উমরায়ে কাযা, উমরায়ে কাযিয়া, উমরায়ে কেসাস এবং উমরায়ে সুলাহ।[৩]

আরও কতগুলো অভিযান : কাযা উমরাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কয়েকটি অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। সেগুলো হলো :

১. **ইবনে আবুল 'আওজা' অভিযান (৭ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত) (سرية ابن أبي العوجاء) :** বনু সোলাইম গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম আবুল আওজার নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দল প্রেরণ করেন। বনু সোলাইমকে যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় তখন তারা উত্তরে বলল, 'তোমরা যে কথার দাওয়াত দিচ্ছ আমাদের তার কোনই প্রয়োজন নেই।' অতঃপর তারা মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে আবুল আওজা আহত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ শত্রুদলের দুই জনকে বন্দী করতে সক্ষম হন।

২. **গালিব বিন আব্দুল্লাহ অভিযান (৮ম হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত) (سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفَدَكَ) :** দু'শ লোকের সমন্বয়ে গঠিত দলের সঙ্গে তাঁকে ফেদাক অঞ্চলে বশীর বিন সা'দের বন্ধুদের শাহাদত স্থলে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা শত্রুদের পশুসম্পদ হস্তগত করেন এবং একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করেন।

৩. **যাত-ই-আতলাহ অভিযান (৮ম হিজরীর রবিউর মাসে সংঘটিত) (سرية ذات أطلح) :** এ অভিযানের বিবরণ হচ্ছে, বনু কোযায়াহ মুসলিমগণের আক্রমণের উদ্দেশ্যে বড় একটি দলকে একত্রিত করেছিল। নাবী করীম যখন এ ব্যাপারটি অবগত হলেন তখন কা'ব বিন উমাইরের নেতৃত্বে মাত্র পনের জন সাহাবীগণ -এর একটি দলকে সেখানে প্রেরণ করেন। সাহাবীগণ তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যানের পর তীর দ্বারা ছিদ্র করে সকলকে শহীদ করে। মাত্র একজন জীবিত ছিলেন যাকে নিহতদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়।[৪]

---

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৫২ পৃঃ।
[2] যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৭২ পৃঃ। ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫০০ পৃঃ।
[3] যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৭২ পৃঃ, এবং ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫০০ পৃঃ।
[4] রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৩১ পৃঃ।

৪. **যা-ত-ই ইরক্ অভিযান (৮ম হিজরী রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত)** (سرية ذات عرْق إلى بـــني هـــوازن) : এ অভিযানের কারণ হচ্ছে, বনু হাওয়ারেম গোত্র বার বার শত্রুপক্ষকে সাহার্য্য করছিল। কাজেই তাদের শায়েস্তা করার জন্য ৫০ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে শুজাবিন অহাব আসদীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। মুসলিমগণের সঙ্গে শত্রুদের যুদ্ধ হয়নি। তবে শত্রু পক্ষের পশু সম্পদ মুসলিমগণের হস্তগত হয়।[১]

---

[1] ঐ এবং তালকিহুল ফহুম ৩৩ পৃঃ (টীকা)।

معركة مؤتة

মূতা যুদ্ধ

মূতা হচ্ছে উরদুন অঞ্চলে 'বালকা' নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। সেখান হতে বায়তুল মুকাদ্দাস দুই মনজিল ভ্রমণ পথের দূরত্বে অবস্থিত। আলোচ্য যুদ্ধ এ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মুসলিমগণের সামনে এটাই ছিল সব চাইতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং এ যুদ্ধ ছিল পরবর্তী পর্যায়ের খ্রিষ্টান দেশ সমূহ বিজয়ের পূর্ব সূত্র। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে।

যুদ্ধের কারণ (سبب المعركة) : এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ হারেস বিন উমায়ের আযদীক-কে একটি পত্র সহ বুসরার শাসকের নিকট প্রেরণ করেন এবং তদানীন্তন রোম সম্রাটের গর্ভণর শোরাহবিল বিন আমর গাসসানী যিনি 'বালকা' নামক স্থানে নিযুক্ত ছিলেন তাঁকে বন্দী করার পর শক্ত করে বেঁধে হত্যা করে।

প্রকাশ থাকে যে, রাষ্ট্রীয় দূত এবং সংবাদ বাহকদের হত্যা করার ব্যাপারটি সব চাইতে নিকৃষ্ট কাজ এবং জঘণ্যতম অপরাধ। এ ধরণের কাজ ছিল যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, বরং বলা যায় যে, তার চাইতেও ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ সংবাদ অবগত হলেন তখন তাঁর সামনে অনভিপ্রেত এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। মুসলিমগণের পক্ষে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। এ উদ্দেশ্যে ৩০০০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তিনি প্রস্তুত করে নিলেন।[1] এবং এটাই ছিল সব চাইতে বড় ইসলামী যোদ্ধা বাহিনী। এর পূর্বে আহযাব যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে মুসলিমগণের এত বড় বাহিনী সংগঠিত হয় নি।

সৈন্য পরিচালকগণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসিয়ত (أمراء الجيش ووصـــية رســـول الله ﷺ إلـــيهم) : রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়েদ বিন হারেসকে এ সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এবং অসিয়ত করেন যে, যায়েদকে যদি শহীদ করা হয় তবে জাফর এবং জাফরকে শহীদ করা হলে আব্দুল্লাহ বনি রাওয়াহা সেনাপতি হবেন।[2] সৈন্যদলের জন্য সাদা পতাকা বেঁধে তা যায়েদের হাতে দিলেন।[3] অতঃপর সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উপদেশাবলী প্রদান করলেন।

যে জায়গায় হারেস বিন উমায়েরকে শহীদ করা হয়েছে তথায় উপস্থিত হয়ে তথাকার অধিবাসীগণের নিকট প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেটা হবে উত্তম। অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তিনি আরও বললেন,

(اغزوا بسم الله، في سبيل الله، مَنْ كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة، ولا كـــبيراً فانياً، ولا منعزلاً بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة، ولا تهدموا بناء).

আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে, আল্লাহর সঙ্গে কুফরীকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সাবধান! অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না, আমানতের খিয়ানত কর না, শিশু মহিলা, বৃদ্ধ এবং গীর্জায় অবস্থানরত পুরোহিতদের হত্যা কর না,খেজুর কিংবা অন্য কোন বৃক্ষ কর্তন কর না এবং বাড়ি ঘর ও দালানকোঠা বিনষ্ট কর না।[4]

ইসলামী সৈন্যদলের যাত্রা এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার ক্রন্দন (توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحـــة) : ইসলামী সৈন্যদল যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল তখন লোকেরা এসে রাসূলে করীম ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত

---

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৫৫ পৃঃ, ফতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৫১১ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী শাম রাজ্যে মূতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

[3] শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মুকতাসারুস সীরাহ ৩২৭ পৃঃ।

[4] পূর্বোক্ত এবং রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৭১ পৃঃ।

সেনাপতিদেরকে বিদায়ী সালাম জানালেন। ঐ সময় অন্যতম সেনাপতি রাওয়াহা ক্রন্দন করতে লাগলেন। জনগণ বললেন, 'আপনি কেন ক্রন্দন করছেন?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'দেখ, আল্লাহর শপথ! (এর কারণ পৃথিবীর মায়া মহব্বত কিংবা তোমাদের সঙ্গে আমার মধূর সম্পর্ক এ জন্য নয়, বরং আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে আল্লাহর কেতাবের একটি আয়াত পড়তে শুনেছি যাতে জাহান্নামের উল্লেখ আছে। আয়াতটি হচ্ছে :

:﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مريم:٧١]،

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়সালা।' [মারইয়াম (১৯) : ৭১]

আমি জানি না যে, জাহান্নামের নিকট আগমনের পর কেমন করে ফিরে আসতে পারব?

অন্যেরা বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গী হয়ে, নিরাপত্তা দান করববেন, আপনার পক্ষ হতে শত্রুদের প্রতিহত করবেন, আপনাকে সওয়াব দ্বারা পুরস্কৃত করবেন এবং ফিরে এসে গণীমত দান করবেন। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহ আবৃত্তি করলেন :

لكنني أسأل الرحمن مغفـــــرة ** وضربة ذات فرع تقذف الزبدا

أو طعنة بيدي حران مجـــهزة ** بحربة تنفذ الأحشـــاء والكبدا

حتى يقال إذا مروا على جدثي ** أرشده الله من غاز وقد رشدا

অর্থ : 'কিন্তু আমি দয়ালু আল্লাহর নিকট ক্ষমা এবং হাড় কুকড়ান, মস্তিষ্ক বিচ্ছুরণকৃত তরবারীর কর্তন অথবা কোন বর্শা পরিচালনাকারীর হাতগুলো, নাড়িভুঁড়ি সমূহ এবং কলিজার উপর অতিক্রমকারী বর্শার আঘাতের প্রার্থনা করছি। যাতে লোকজনেরা যখন আমার কবরের পাশ দিয়ে যাত্রা করবে তখন যেন তারা বলে কি আশ্চর্য এ সেই গাজী যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দিয়েছিলেন এবং যিনি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছিল।

এরপর সৈন্যদল যাত্রা শুরু করলেন। রাসূলে করীম ﷺ এঁদের অনুসরণ করে সানিয়াতুল অদা' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন এবং সেখান হতে তাদের আলবিদা (বিদায়) বলেন।[1]

ইসলামী সৈন্যদলের পূর্ব গমন এবং হঠাৎ ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন (تحرك الجيش الإسلامي، ومباغتته حالة رهيبـــة) : ইসলামী সৈন্যদল উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মায়ান নামক স্থানে পৌঁছেন। এ স্থানটি উত্তর হেজাযের সন্নিকটে শামী (উরদুনী) অঞ্চলে অবস্থিত। মুসলিম বাহিনী এখানে শিবির স্থাপন করেন। মুসলিম বাহিনীর গোয়েন্দাগণ সংবাদ পরিবেশণ করেন যে, রোমান সম্রাট হিরককল বালকা' নামক অঞ্চলের মাআব নামক স্থানে এক লক্ষ রোমান সৈন্য সহ অবস্থান করেছেন এবং লাখম ও জোযাম বিলকিন ও বোহরা এবং বলা (আরবের বিভিন্ন গোত্র) গোত্রের অতিরিক্ত এক লক্ষাধিক সৈন্য তাদের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে।

মায়ান নামক স্থানে পরামর্শ বৈঠক (المجلس الاستشاري بمَعَـــان) : মুসলিমগণের ধারণায় এ চিন্তা মোটেই ছিল না যে যুদ্ধ প্রিয় এরূপ এক বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে। এ দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করার পরে হঠাৎ এ সমস্যার মুখোমুখী হয়ে তাঁরা চিন্তায় একদম জর্জরিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের সামনে এখন যে প্রশ্নটি সব চাইতে বড় হয়ে দেখা দিল তা হচ্ছে, দুই লক্ষ সৈন্যের সমুদ্র সমতুল্য এ বিশাল বাহিনীর সঙ্গে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁরা মোকাবেলা করবেন কিনা। চিন্তায় চিন্তায় তাঁরা যেন অস্থির ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবং দারুন দুশ্চিন্তা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দুই রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করলেন। কিছু সংখ্যক মুজাহিদ এ রকম

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৭৩-৩৭৪ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ মুখতাসারুস সীরাহ ৩২৭ পৃঃ।

একটি চিন্তাভাবনা করছিলেন যে, একটি পত্র লিখে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করা হোক। এর ফলে তাঁর নিকট থেকে সঠিক নির্দেশনা লাভ কিংবা অধিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহ (রাঃ) এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, 'হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহর কসম! যে ব্যাপারটিকে আপনারা ভয় করছেন সেটিও হচ্ছে সেই শাহাদত যার খোঁজে আপনারা বের হয়েছেন। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে, শত্রুর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সৈন্য সংখ্যা শক্তি কিংবা সমরাস্ত্রের আধিক্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে, যার দ্বারা আল্লাহ অমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই, চলুন আমরা অগ্রসর হই। আল্লাহর দ্বীনের খারিরে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের জন্য রয়েছে দুটি কল্যাণ এবং এর যে কোন একটি আমরা পাবই। আমরা বিজয়ী হলে বিজয়ের সম্মান লাভ করব, আর যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করব।' অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহর প্রস্তাবকৃত কথার উপর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

শত্রুদের উপর ইসলামী সৈন্যদলের আক্রমণ (الجيش الإسلامي يتحرك نحـــو العـــدو) : মূল কথা, ইসলামী সৈন্যদল মায়ান নামক স্থানে দুই রাত্রি অতিবাহিত করার পর শত্রুদের আক্রমণ করেন এবং 'বালকা' নামক জায়গায় একটি বস্তিতে যার নাম ছিল 'মাশারেফ' হিরাক্কলের সৈন্যদের সম্মুখীন হন। এরপর শত্রু সৈন্য আরও নিকটবর্তী হলে মুসলিম সৈন্যগণ মূতা নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর সৈন্যদের শৃঙ্খলা বিন্যাস করা হয়। ডান বাহুতে কুতবাহ বিন কাতাদা ওযরী (রাঃ)-কে এবং বাম বাহুতেত উবাদাহ বিন মালেক আনসারী (রাঃ)-কে নিযুক্ত করা হয়।

যুদ্ধারম্ভ এবং সেনাপতিগণের পর পর শাহাদত বরণ (بداية القتال، وتنـــاوب القـــواد) : এরপর মূতায় দুই দলের মধ্যে মুখোমুখী সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে অত্যন্ত সাধারণ অস্ত্র সম্ভার সজ্জিত মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য, অন্যপক্ষে উন্নত সমর সাজে সজ্জিত দুই লক্ষ সৈন্য। এ যুদ্ধ ছিল সৈন্য সংখ্যা এবং সাজ-সরঞ্জামের ব্যাপারে এক অকল্পনীয় অসম যুদ্ধ। সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়াভিভূত হয়ে লক্ষ্য করছিল এবং গতি প্রকৃতি। কিন্তু যখন ঈমানের বসন্তকালীন হাওয়া প্রবাহিত হল তখন ঠিক সে রকম বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরম প্রিয় যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) সর্ব প্রথম পতাকা গ্রহণ করেন এবং উদ্দীপনা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন যে, ইসলামী বাজপক্ষীদের ছাড়া অন্য কোথাও আর এর নজীর পাওয়া যায় না। অমিত বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন এবং যুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর যুদ্ধোন্মাদের এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষের বর্শা বিদ্ধ হয়ে শাহাদতের পেয়ালায় অমৃত পান করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এরপর পালা ছিল জাফর (রাঃ)-এর অনতিবিলম্বে তিনি পতাকা উঠিয়ে নিলেন এবং পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। যুদ্ধ যখন পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছল তখন তিনি তাঁর লাল-কালো ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়লেন। ঘোড়ার পা সমূহ কর্তন করে দিলেন এবং আঘাতের পর আঘাত হেনে বাধা দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে শত্রুর আঘাতে তাঁর দক্ষিণ হাতটি কর্তিত হয়ে পড়ল। এরপর বাম হাত দ্বারা পতাকা ধারণ পূর্বখ তাকে উর্ধ্বে উত্তোলিত অবস্থায় রাখার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তাঁর বাম হাতও কর্তিত হল। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাতের অবশিষ্টাংশ দ্বারা বুকের সঙ্গে পতাকা জড়িয়ে ধরে যতক্ষণ না শাহাদতের পেয়ালা পান করলেন ততক্ষণ পতাকা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

বলা হয়েছে যে, একজন রোমীয় তাঁকে এমন ভাবে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছিল যে, তাতে তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁই দুই হাতের বিনিময়ে জান্নাতে দুইটি হাত প্রদান করেছেন যার ফলে তিনি যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াতে পারছেন। এ জন্য তাঁকে জাফর তাইয়ার এবং 'যুল জানাহাইন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর উপাধি সহ নাম হয়েছে জাফর তাইয়ার যুল জানাহাইন বা দুই পাখা বিশিষ্ট উড়ন্ত জাফর (তাইয়ার অর্থ উড়ন্ত এবং যুল জানাহাইন অর্থ দুই বাহু বিশিষ্ট)।

ইমাম বুখারী (রঃ) নাফে'র বরাতে ইবনু ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মূতার যুদ্ধের দিন জাফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাহাদতের পর তাঁর শরীরে বর্শাও তরবারীর ৫০টি আঘাত গণনা করেছিলাম। এসবের মধ্যে একটি আঘাতও পিছন দিক থেকে লাগেনি।[১]

অন্য এক সূত্রের ভিত্তিতে ইবনু ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'অমি সে যুদ্ধে মুসলিমগণের সঙ্গে ছিলাম। জাফর বিন আবু তালিবের খোঁজ করতে গিয়ে আমরা তাঁকে শাহাদত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধো পেলাম। আমরা তাঁর দেহে বর্শা এবং তীরের নব্বইটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করলাম।[২]

নাফে' হতে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণনায় আরও অতিরিক্ত এ কথাগুলো আছে যে, 'এই আঘাতের চিহ্নগুলো আমরা তাঁর শরীরের সামনের দিকে পেলাম।"[৩]

এভাবে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করার পর জাফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পতাকা ধারণ করে নিজের ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে মোকাবেলা করা জন্য আহ্বান জানিয়ে নীচের কবিতার চরণগুলো আবৃত্তি করতে থাকলেন,

أقسمت يا نفس لتنزلنه - كارهة أو لتطـــاوعنه

إن أجلب الناس وشدوا الرنه - مالي أراك تكرهين الجنه

অর্থ : 'হে আত্মা! আমি শপথ করছি যে, তুমি অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ করবে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় হোক যদি লোকেরা যুদ্ধরত থাকে এবং বর্শা পরিচালনা করতে থাকে তাহলে আমি তোমাকে জান্নাত হতে কেন পশ্চাদপসরণ করতে দেখছি।

এরপর তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ করেন। এমতাবস্থায় তাঁর চাচাত ভাই মাংস যুক্ত একটি হাড় নিয়ে আসেন এবং বলেন এ দ্বারা আপন পৃষ্ঠদেশ শক্ত করে নাও। কারণ এ দিবসে তোমাকে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তিনি হাড়টি নিয়ে একবার কামড়ালেন তারপর তা ফেলে দিয়ে তরবারী ধরলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।

ঝাণ্ডা, আল্লাহর তলোয়ার সমূহের মধ্য হতে এক তলোয়ারে হাতে (الراية إلى سيف من سيوف الله) ঃ

ওই সময় বনু আজলান গোত্রের সাবেত বিন আকরাম নামক এক সাহাবী লাফ দিয়ে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'হে মুসলিম ভ্রাতাগণ! আমাদের মধ্য হতে কোন এক জনকে সেনাপতি নির্বাচিত করে নাও।' সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বললেন, 'আপনি এ দায়িত্ব পালন করুন।'

এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'এ দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' এ প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) খালিদ বিন ওয়ালীদকে সেনাপতি মনোনীত করেন। সেনাপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। সহীহ বুখারীতে খালিদ বিন ওয়ালীদ নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, 'মূতা যুদ্ধের দিন আমার হাতে ৯টি তলোয়ার ভেঙ্গেছিল এবং ইয়েমেনের তৈরি মাত্র একটি ছোট তলোয়ার হাতে অবশিষ্ট ছিল।[৪] অন্য এক বর্ণনায় তাঁর বিবরণটি এভাবে রয়েছে যে, 'মূতা যুদ্ধের দিন আমার হাতে ৯ খানা তরবারী ভেঙ্গে যায় এবং মাত্র এক খানা ইয়েমেনী তরবারী অবশিষ্ট থাকে।[৫]

---

[1] সহীহ বুখারী শাম রাজ্যে মূতা যুদ্ধ সম্পর্কিথ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

[2] ঐ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

[3] ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫১২ পৃঃ। বাহ্যত দুই হাদীসে সংখ্যার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হচ্ছে, সামঞ্জস্য বিধান হেতু বলা হয়েছে যে, তীরের আঘাত হিসেবে ধরার কারণে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রঃ ফতহুল বারী)।

[4] সহীহ বুখারী শাম রাজ্যে মূতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

[5] সহীহ বুখারী শাম রাজ্যে মূতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ময়দান থেকে কোন খবর না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। এমন সময় ওহীর মাধ্যমে তাঁকে খবর দেওয়া হয় যে,

(أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب – حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم).

পতাকা হাতে যুদ্ধ করতে গিয়ে যায়েদ (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। অতঃপর জাফর (রাঃ) পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান। তাঁর শাহাদত বরণের পর আব্‌দুল্লাহ বিন রাওয়াহ পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়ে যান।

এ সংবাদ অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুযুগল অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার তলোয়ার সমূহের মধ্য হতে এক তলোয়ার পতাকা হাতে নিয়ে অমিত বিক্রমে এমন ভাবে যুদ্ধ করতে থাকেন যে, আল্লাহ মুসলিমগণকে বিজয়ী করেন।[1]

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি (نهاية المعركة) : জীবন বাজী রেখে যতই বীরত্ব এবং সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করুক না কেন এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, অত্যন্ত রণ পিপাসা ও রণ কুশলী বিশাল রোমীয় বাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিমগণের ছোট্ট একটি বাহিনী পর্বতের ন্যায় অটল থাকবে এবং তার চাইতেও আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল খালিদ বিন ওয়ালীদের রণ প্রজ্ঞা ও রণ নৈপুণ্য। মূতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা থেকে সম্মানের সঙ্গে বের করে আনার ব্যাপারে তিনি যে রণ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে এবং প্রত্যেক মুসলিমগণের জন্য তা গর্ব ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, যুদ্ধের প্রথম দিন খালিদ বিন ওয়ালিদ রোমীয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সর্বক্ষণই অটল থাকেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমন এক রণ কৌশল অবলম্বন করেন যা রোমীয়গণের মনে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ভীতির সঞ্চার করে এবং অত্যন্ত দক্ষতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীকে পশ্চাদপসারণ করে এবং অত্যন্ত দক্ষতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করে নিতে সক্ষম হন। তাঁর এ রণ কৌশলে কারণেই রোমীয় বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করা সাহস পায়নি। সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারে এ যুদ্ধ ছিল দারুণ অসম দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। কাজেই, মুসলিমগণের স্বসম্মানের পশ্চাদপসরণ ছিল অনিবার্য। কিন্তু পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের পশ্চাদ্ধাবনের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) পশ্চাদ্ধাবনের প্রলুব্ধতা থেকে শুধু যে বিরত রেখেছিলেন তাই নয় বরং তারা কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত্রও হয়ে পড়েছিল।

তাঁর পরিবর্তিত রণ কৌশলের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় দিবসে প্রভাতে তিনি নতুন এক ধারায় তাঁর বাহিনীকে বিন্যাস্ত করে নেন। এ বিন্যাস সাধন করতে গিয়ে তিনি সম্মুখ ভাগের দলকে পশ্চাদ ভাগে এবং পশ্চাদ ভাগের দলকে সম্মুখ ভাগে, ডান পাশের দলকে এবং বাম পাশে এবং বাম পাশের দলকে ডান পাশে স্থানান্তরিত করেন। পরিবর্তিত বিন্যাস ধারা প্রত্যক্ষ করে শত্রু চমকিত হয়ে ভাবল যে তাঁরা নতুন ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে। এর ফলে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল। এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত মুসলিম বাহিনীকে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। কিন্তু রোমীয়গণের এই ভেবে তাদর পশ্চাদ্ধাবন করল না যে, মুসলিমগণ হয় তো এমন এক কৌশল অবলম্বন করেছেন যার মাধ্যমে তাদেরকে মরু প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে এবং তেমনি যদি হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে দারুণ দূর্বিপাকে নিপতিত হতে হবে। এর ফলে রোমীয়গণ মুসলিমগণকে পশ্চাদ্ধাবন করার

---

[1] সহীহ বুখারী শাম রাজ্যে মূতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

পরিবর্তে নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করল। এ দিকে মুসলিমগণ নিরাপদে পশ্চাদপসরণ ক'রে মদীনা প্রত্যাবর্তন করল।[1]

উভয় পক্ষের নিহত সৈন্য সংখ্যা (قتلى الفـــريقين) : এ যুদ্ধে ১২ জন মর্দে মু'মিন শাহাদতবরণ করেন। কিন্তু কত জন রোমীয় সৈন্য নিহত হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় নি। তবে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, তাদের বহু সৈন্য নিহত হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ একা যখন নিজ হাতে নয় খানা তলোয়ার ভেঙ্গেছেন তখন নিহত এবং আহতের সংখ্যা কতই না অধিক হতে পারে।

এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া (أثر المعركة) : যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের নিপতিত করা হয়েছিল যদিও সে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব হয় নি, তবুও মুসলিমগণের জন্য তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুসলিমগণ যে একটি অকুতোভয় জাতি এবং কোন পার্থিব শক্তি তা যত বিশালই হোক না কেন তার কাছে যে তাঁরা মাথা নোয়াতে পারেন না। তা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, মুসলিমগণের শৌর্যবীর্যের কথাও বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল এবং এর ফলশ্রুতিতে সমগ্র আরব জাহান স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে পড়ল। কারণ, তদানীন্তন রোমক শক্তি ছিল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎশক্তি। শত্রুভাবাপন্ন আরব জাহান মনে করে ছিল রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি হবে মুসলিমগণের জন্য আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু মাত্র তিন হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুদক্ষ দুই লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি ছাড়াই নিরাপদ পশ্চাদপসরণে সক্ষম হওয়ার ব্যাপারটি ছিল একটি অচিন্তণীয় ব্যাপার। অধিকন্তু, আরব জাহানের নিকট এ সত্যটিও উদঘাটিত হয়ে গেল যে, আরব ভূখণ্ডে যে ধরণের লোকজন সম্পর্কে তাদের পরিচিতি ছিল মুসলিমগণের সে সব হতে ভিন্নতর অনন্যসাধারণ একটি গোষ্ঠি। এঁরা হচ্ছেন আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত এবং তাঁদের পরিচালক প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল ।

এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে, আরবের যে সকল গোত্র মুসলিমগণের প্রতি বৈরিতা পোষণ করত এবং কারণে অকারণে যখন তখন তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো মূতা' যুদ্ধের পর তারাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। এদের মধ্যে বনু সোলাইম, আশজা', গাতফান, যুবইয়ান এবং ফাযারাহ ও অন্যান্য কতগুলো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়েই রোমকদের সঙ্গে মুসলিমগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে যায়, যার ফলে পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন দেশ বিজয় এবং দূর দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর মুসলিমগণের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

যাতুসসালাসেল অভিযান (ســرية ذات السّلاســل) : মূতা যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ -এর যখন শাম রাজ্যে বসবাসকারী আরব গোত্র সমূহের মনোভাব বুঝতে পারলেন যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা রোমকগণ পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল তখন তিনি এমন এক কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করলেন যার মাধ্যমে এক দিকে গোত্র সমূহ ও রোমকদের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি করা যায় এবং অন্যদিকে মুসলিমগণের নিকটে নিজেদেরকে তাদের বন্ধু হিসেবে পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে তাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থার মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই রকম এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ভবিষ্যতে তারা আর মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রোমকদের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রয়োজন বোধ করবে না।

আলোচ্য উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন নাবী করীম আমর বিন আসক -কে মনোনীত করেন। কারণ, উপত্যকার বালা গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। তাই মূতা যুদ্ধের পর

[1] ফতহুলী বারী ৫১৩-৫১৪ পৃঃ। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ। যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পূর্বোল্লিখিত কিতাবসহ এ দুই কিতাব হতে গৃহীত হয়েছে।

পরই অর্থাৎ ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাতে সে সকল গোত্রে লোকদের সান্তনা দানের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম আমর বিন আসক -কে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। বলা হয়েছে যে, গোয়েন্দাগণ এই খবরও দিয়েছিল যে বনু কোযায়া গোত্র মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর আক্রমণ পরিচালনের উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যদল সংগ্রহ করে রেখেছে। সম্ভবত এ দুইটি উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখেই রাসূলুল্লাহ -এর আমর বিন আস -কে তাদের নিকট প্রেরণ করেন।

যাহোক, আমর বিন আস -এর হাতে একটি সাদা ও একটি কালো পতাকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ তাঁর অধীনে মুহাজিরীন ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত তিনশ সৈন্যর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর সঙ্গে ত্রিশটি ঘোড়াও ছিল। বিদায় কালে বাহিনী প্রধানের নিকট তিনি এ নির্দেশ প্রদান করলেন যে, বালা, উযরা এবং বিলকীন গোত্রের নিকট দিয়ে যাবার সসয় যে সকল লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হবে তাদের সাহায্য কামনা করবে। মুসলিম বাহিনী রাতের অন্ধকারে ভ্রমণ করতেন এবং দিবাভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে চলতে চলতে তাঁরা যখন শত্রু পক্ষের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন তখন জানতে পারলেন যে, তাদের বাহিনীতে বহুগুণে বেশী সৈন্য রয়েছে। তাই আমর বিন আস সাহায্য পাঠানোর আরজি সহ রাফে বিন মুকাইস জুহানী -কে রাসূলুল্লাহ -এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ -এর হস্তে পতাকা প্রদান করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে দু'শ সৈন্যর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে মুহাজিরীনদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেমন, আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর ইবনু খাত্তাব এবং আনসার প্রধানগণও ছিলেন। আবু উবাইদাহকে এ নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, তিনি যেন আমর বিন আসের সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয়ে একত্রে মিলে মিশে কাজ-কর্ম সম্পন্ন করেন, কোন ব্যাপারে যেন মতবিরোধের সৃষ্টি না হয়, আমর বিন আস -এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আবু উবাইদাহ ইমামতি করতে চাইলে আমর বিন আস বললেন, 'আপনি তো এসেছেন আমার সাহায্যকারী হিসেবে আর আমি এসেছি বাহিনীর পরিচালক হিসেবে।' আবু উবাইদাহ সে কথা মেনে নিলেন। আমর বিন আস সালাতে ইমামতি করতে থাকলেন।

সাহায্য আসার পর মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে কোযায়ার অঞ্চলে প্রবেশ করলেন এবং এ অঞ্চলকে পদানত করার পর দূর দূরান্তের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অগ্রগমনের এক পর্যায়ে এক দল সৈন্যের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ বেঁধে যায়। কিন্তু মুসলিমগণ যখন তাদের আক্রমণ করল তখন তারা বিক্ষিপ্ত এদিক সেদিক পলায়ন করল।

এরপর আউফ বিন মালেক আশজায়ী -কে সংবাদ বাহক হিসেবে রাসূলুল্লাহ -এর খিদমতে প্রেরণ করা হয়। তিনি মুসলিম বাহিনীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধের অন্যান্য খবরাদি রাসূলুল্লাহ -এর খিদমতে পেশ করেন। যাতুস সালাসেল (সোলাসেল উভয়ই পড়া যেতে পারে) (সে দেশের একটি মাঠের নাম) ওয়াদিউল কোরা হতে কিছু দূর অগ্রসর হয়। এখান হতে মদীনার দূরত্ব দশ দিনের পথ। ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনার সূত্রে জানা যায় যে, মুসলিমগণ জোযাম গোত্রের দেশে 'সালসাল' নামক স্থানে একটি ঝরণার নিকটে অবতরণ করেছিলেন। এ কারণেই এ যুদ্ধের নাম 'যাতুসসালাসেল' হয়েছিল।[1]

খাযেরাহ অভিযান (سرية أبي قتادة إلى خضرة) : (৮ম হিজরী শা'বান মাস) এ অভিযানের কারণ ছিল, নাজ্‌দের অন্তর্ভূক্ত মুহারিব গোত্রের অঞ্চলে খাযেরা নামক এ জায়গায় বনু গাতফান সৈন্য একত্রিত করছিল। এ প্রেক্ষিতে তাদের সমুচিত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পনের জন মুজাহিদ সহ আবু কাতাদা -কে প্রেরণ করা হয়। তিনি শত্রুদের একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা এবং বন্দী করেন। কিছু গণীমতও হস্তগত হয়। এ অভিযানে তাঁরা পরের দিন বাইরে অবস্থান করেন।[2]

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬২৩-৬২৬ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৫৭পৃঃ।

[2] রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৩৩ পৃঃ, তালকীহুল ফহুম ৩৩ পৃঃ।

غزوة فتح مكة

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ

ইমাম ইবনু কাইয়ুম মক্কা বিজয় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'এ ছিল সে মহাবিজয় যার মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় দ্বীনকে, স্বীয় রাসূল ﷺ-কে, স্বীয় সৈন্যসম্পদকে এবং স্বীয় আমানত রক্ষাকারী দলকে ইজ্জত দান করেছেন এবং স্বীয় শহর ও স্বীয় ঘরকে, যা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের কেন্দ্রের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কাফির ও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত থেকে মুক্ত করেছেন। এ বিজয়ে আসামনবাসীগণের অন্তরেও খুশীর ঢল নেমেছিল এবং তার মান-ইজ্জতের রশ্মিগুলো আকাশের চূড়ার কাঁধের উপর বিস্তৃতি লাভ করেছিল যার ফলে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল এবং পৃথিবীর মুখমণ্ডল আলোর ঝলকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।'[১]

যুদ্ধের কারণ (سبب الغزوة) : হুদায়বিয়ার সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, এ সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কেউ যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হতে চায় তাহলে হতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হতে চায় তাহলে তাকেও সে সুযোগ এবং স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু, এ রকম আশ্রিত কোন ব্যক্তি কিংবা গোত্র যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে এ আক্রমণকে আশ্রয়দাতা পক্ষের উপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে।

উল্লেখিত শর্তের আওতায় বনু খোযায়াহ গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশ্রিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এভাবে আপাতঃদৃষ্টিতে উভয় গোত্র পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিস্কৃতি ও নিরাপত্তা লাভ হবে। কিন্তু যেহেতু উল্লেখিত গোত্রদ্বয়ের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগ হতে পারস্পরিক শক্রতা বিবাদ চলে আসছিল সেহেতু চুক্তিবদ্ধ দুটি পক্ষের আশ্রিত হয়েও প্রতিহিংসার প্রশ্নটি তাদের মন থেকে অপসৃত হল না। সেজন্য যখন ইসলাম প্রভাব বিস্তার আরম্ভ করল ও হুদাইবিয়ার চুক্তি লিপিবদ্ধ হল তখন কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মনে করে বনু গোত্র বনু খোযায়হর উপর তাদের পুরাতন শক্রতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মোক্ষম সুযোগ মনে করল। এ ধারণার প্রেক্ষিতে নাওফাল বিন মুয়াবিয়া দাইলী ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে বনু বকরের একটি বাহিনী নিয়ে রাতের আঁধারে বনু খোযায়াহকে আক্রমণ করে বসল। ঐ সময় বনু খোযায়াহ গোত্র ওয়াতির নামক এক ঝরণার ধারে শিবির স্থাপন করে বসবাস করছি এ আক্রমণে খোযায়াহ গোত্রের অনেক নিহত হয়।

এ যুদ্ধে কুরাইশগণের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বনু বকরকে সাহায্য করে। এমন কি রাতের অন্ধকারে কুরাইশ যোদ্ধাগণও এ যুদ্ধে বনু বকরের পক্ষে অংশ গ্রহণ করে। এ যুদ্ধে বনু খোযায়াহর বহুলোক নিহত হয় এবং তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে হারাম পর্যন্ত পৌছে দেয়।

হারামে পৌছে বনু বকর বলল, 'হে নাওফাল! এখন তো আমরা হারামে প্রবেশ করেছি। তোমাদের উপাস্য! তোমাদের উপাস্য! এর উত্তরে নাওফাল একটি অত্যন্ত গুরুতর কথা বলল। সে বলল, 'হে বনু বকর! আজ কোন উপাস্য নেই, প্রতিশোধ গ্রহণ করে নাও। আমার জীবনের কসম! তোমার হারামে চুক্তি করছ, তা সত্ত্বেও কি হারামে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না?'

এদিকে বনু খোযয়া গোত্র মক্কায় পৌছে বোদাইল বিন ওবর কায়া খোজায়ী এবং নিজেদের মুক্ত করা দাস রাফের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর আমর বিন সালেম খোযারী সেখান থেকে বাহির হয়ে তৎক্ষণাৎ মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মদীনা পৌছে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন।

---

[১] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৬০ পৃঃ।

সে সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর মাঝে অবস্থান করছিলেন। আমর বিন সালেম বললেন,

يارب إني ناشدٌ محمداً — حلف أبينا وأبيه إلا تلدا

كُنتَ لنا أباً وكنا ولداً — ثّمت أسلمنا ولم نترع يدا

فانصر هداك الله نصراً (عتدا) — وادع عباد الله يأتوا مددا

فيهم رسول الله قد تجرّدا — أبيض مثل الشمس ينمو صعدا

إن سيم خسفاً وجهه تربدا — في فيلق في البحر تجري مزبداً

إن قريشاً لموافوك الموعدا — ونقضوا ميثاقك المؤكدا

وجعلوا لي في كداء رصدا — وزعموا أن لست تدعو إحدا

وهم أذلّ وأقلّ عددا — هم (وجدونا) بالحطيم هُجّدا

وقتلونا رُكّعاً وسُجّداً

অর্থ : 'হে প্রতিপালক! আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকটে তাঁর প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর পিতার পুরাতন প্রতিজ্ঞার দোহাই উদ্ধৃত করছি।[1] আপনারা শিশু ছিলেন এবং আমরা ছিলাম জন্মদাতা।[2] অতঃপর আমরা অনুগত হয়েছি এবং কখনও হাত টেনে নেই নি। আল্লাহ আপনাদেরকে হিদায়াত করুন আপনি শক্তভাবে সাহায্য করুন এবং আল্লাহর বান্দাদের আহ্বান করুন। তাঁরা সাহায্যের জন্য আসবেন যেখানে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থাকেন। অস্ত্রসজ্জিত এবং পূর্ণিমার চাঁদের মতো এবং গমের রঙের মতো সুন্দর। তাদের উপর যদি অত্যাচার করা হয় এবং তাদের অবমাননা করা হয় তবে মুখমণ্ডল বিবর্ণ করে উঠবে। আপনি এক যুদ্ধপ্রিয় সৈন্যদলের মধ্যে আগমন করবেন যা হবে ফেনায় পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গযুক্ত। কুরাইশগণ অবশ্যই আপনার প্রতিজ্ঞার বিরোধীতা করেছে এবং আপনার পরিপক্ক অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা আমার জন্য কোদা নামক স্থানে গোপনে অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং মনে করেছে যে সাহায্যের জন্য আমি কাউকেও আহ্বান করব না। অথচ তারা বড়ই নিকৃষ্ট এবং সংখ্যায় অল্প। তারা রাত্রি বেলায় ওয়াতিরে আক্রমণ চালিয়েছে এবং আমাদেরকে রুকু ও সেজদাহ অবস্থায় হত্যা করেছে। অর্থাৎ আমরা ছিলাম মুসলিম এবং আমাদেরকে তাঁরা হত্যা করেছে।'

রাসুল্লাহ (ﷺ)-এর বললেন, 'হে আমর বিন সালেম তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে। এর পর আকাশে মেঘমালার একটি অংশ দেখতে পাওয়া যায়। নাবী করীম (ﷺ) বললেন, 'এ মেঘমালা বনু কা'বের সাহায্যের শুভ সংবাদে চমকাচ্ছে।

এর পর বোদাইল বিন অবকা' খোযায়ী তত্ত্বাবধানে বনু খোযায়ার এক দলটি মদীনায় আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ অবহিত করেন যে, কা'বা নিহত হয়েছেন এবং কিভাবে কুরাইশগণ বনু বকরকে সাহায্য করেছে। এরপর এ লোক মক্কায় ফিরে গেলেন।

নতুনভাবে সন্ধিচুক্তির জন্য আবু সুফিয়ানের মদীনা আগমন (أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجـــدد الصـــلح) : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরাইশ এবং তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ দল যা করেছিল তা ছিল প্রকাশ্য অঙ্গীকারভঙ্গ এবং সন্ধিচুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের এ ধরণের কাজকর্মকে কোনক্রমেই সঠিক কিংবা সঙ্গত বলা যেতে পারে না। এ কারণে কুরাইশরাও সঙ্গে সঙ্গে এটা অনুধাবন করল যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সত্যি সত্যিই তারা এটা

---

[1] এ দ্বারা সে প্রতিজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা বনু খোযায় এবং বনু হাশেমের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবের সময় হতে চলে আসছিল।

[2] এ দ্বারা সে কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা আবদে মানাফের মা অর্থাৎ কুসাইয়ের স্ত্রী হুবা খোযায়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল এ জন্য পুরো পরিবারটাকে বনু খোযায়বার সন্তান বলা হয়েছে।

অন্যায় করেছে এবং এর ফলাফল অত্যন্ত তিক্ত ও ভয়াবহ হতে পারে। এ আশঙ্কায় তারা একটি পরামর্শ বৈঠকের আয়োজন করে। এ বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, চুক্তির পুনরুজ্জীবনের জন্য দলের পরিচালক আবু সুফিয়ানকে অনতিবিলম্বে মদীনায় প্রেরণ করা হোক ।

সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের পর কুরাইশগণ কি করতে পারে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা কেরামের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এমন অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁদের বললেন, (كأنكم بأبي سفيان قد جـــاءكم ليشـــد العَقْدَ، ويزيد في المدة)'আমি যেন আবু সুফিয়ানকে দেখছি যে, অঙ্গীকারনামা পুনঃ দৃঢ়তার করা এবং সন্ধিচুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সে মদীনায় এসে গিয়েছে।

এদিকে কুরাইশ পরামর্শ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু সুফিয়ান যখন উসফান নামক স্থানে পৌছলেন তখন বোদাইল বিন ওয়ারকারে সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়ে গেল। বোদইল মদীনা হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। আবু সুফিয়ান বুঝতে পারল যে, সে নাবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে ফিরে আসছে। 'সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বোদাইল! কোথায় থেকে আসছ?'

বোদাইল বলল, 'আমি খোযায়ার সঙ্গে এ পার্শ্ববর্তী তীরে এবং ওয়াদী উপত্যাকায় গিয়েছিলাম।'

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলে? '

সে বলল, 'না'।

কিন্তু বোদাইল যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল তখন আবু সুফিয়ান বলল, 'সে যদি মদীনায় গিয়ে থাকে তাহলে সেখানে তার উটকে যে ফলের আঁটি খাইয়েছিল তা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। অতৎপর সে বোদইল যেখানে তার উটকে বসিয়েছিল সেখানে গেল এবং উটের বিষ্টায় খেজুরের বীচি দেখতে পেল। খেজুরের বীচি পরোক্ষ করে সে বলল, 'আল্লাহর কসম! বোদাইল মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট গিয়েছিল।

যাহোক, আবু সুফিয়ান মদীনায় গিয়ে পৌছল এবং নিজ নিজ কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হাবীবা (রাঃ)-এর ঘরে গেল। সে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানায় বসার ইচ্ছা করল তখন তিনি বিছানা জাড়িয়ে নিলেন। এ অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান বলল, 'হে আমার কন্যা! তুমি কি মনে করছ যে, এ বিছানা আমার জন্য উপযুক্ত নয়, না আমি এ বিছানার উপযুক্ত নই?'

উম্মুল মু'মিনীন বললেন, 'এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা, আপনি হচ্ছেন অপবিত্র মুশরিক।'

শুনে আবু সুফিয়ান বলতে লাগল, 'আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমার অমঙ্গল রয়েছে।'

অতঃপর আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বাহির হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল এবং কথাবার্তা বলল। নাবী করীম ﷺ তার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। এর পর সে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে বলল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য কেন সুপারিশ করব?' আল্লাহর কসম! আমি যদি একটি লাঠি ছাড়া অন্য কিছু না পাই তাহলে তার দ্বারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তবুও তোমাদের ক্ষমা করব না।'

অতঃপর সে আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ)-এর নিকট গেল। সেখানে ফাতিমা এবং হাসানও (রাঃ) ছিলেন। হাসান (রাঃ) তখনো ছোট ছিলেন এবং লাফালাফি করে বেড়াচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান বলল, 'হে আলী! অন্যান্যদের তুলনায় তোমাদের সঙ্গে আমার গাঢ় বংশীয় সম্পর্ক আছে। আমি এখন একটি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। এমনটি যেন না হয় যে, আমাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। তুমি আমার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট সুপারিশ কর। আলী (রাঃ) বললেন, 'আবু সুফিয়ান! তোমার উপর দুঃখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কথার উপর কৃতসংকল্প হয়ে গিয়েছেন। সে ব্যাপারে আমরা তাঁর নিকট কোন কথাই বলতে পারব না। এরপর সে ফাতিমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি কি আমার জন্য এতটুকু করতে পারবেন যে, আপনার এ ছেলেকে নির্দেশ করবেন যেন সে লোকজনের মাঝে আমার আশ্রয়ের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে সর্ব সময়ের জন্য আরবের নেতা হয়ে যাবে। ফাতিমা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার এ ছেলে তেমন উপযুক্ত হয় নি যে, সে লোকজনের মাঝে কারো

আশ্রয়ের জন্য ঘোষণা করতে পারবে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে অন্য কেউ ঘোষণা দিতেও পারবে না।

উদ্দেশ্য সাধনের ব্যর্থ হয়ে আবু সুফিয়ানের সামনে পৃথিবী অন্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত্র চিন্তিত ও নৈরাশ্যজনক অবস্থায় সে বলল, 'হে হাসানের পিতা! আমি অনুধাবন করছি যে, অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, আমাকে ভবিস্যৎকর্মপন্থার ব্যাপারে কিছুটা ইঙ্গিত প্রদানকর।'

আলী (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমার উপকারে আসতে পারে এমন কোন পথ আমি দেখছি না। তবে যেহেতু তুমি বনু কেনানার সর্দার সেহেতু জনগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে আশ্রয়ের ঘোষণা করে দাও। অতঃপর আপন দেশে প্রত্যাবর্তন কর।

আবু সুফিয়ান বলল, 'তুমি কি মনে করছ যে, এটা আমার জন্য ফলপ্রসূ হবে।'

আলী (রাঃ) বললেন, 'না, আল্লাহর কসম! তোমার জন্য এটা ফলপ্রসূ হবে আমি তা মনে করি না। কিন্তু এর বিপল্প অন্য কোন কিছুই আমার মনে আসছেনা। এরপর আবু সুফিয়ান মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'হে জনগণ! সকলের মাঝে আমি আশ্রয়ের ঘোষণা করছি। অতঃপর স্বীয় উটের পিঠে আরোহণ করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল।

অতঃপর সে যখন কুরাইশদের নিকট গিয়ে পৌঁছল তখন কুরাইগণ তার পিছনের অবস্থা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আবু সুফিয়ান বলল, 'আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট গিয়ে কথাবার্তা বললাম, কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি কোন উত্তর দেন নি। এরপর আবু কোহাফার ছেলের নিকট গেলাম, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন মঙ্গল দেখতে পেলাম না। সেখান থেকে ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তাঁকে পেলাম সব চাইতে শক্র শক্রর ভূমিকায়। অতঃপর গেলাম আলীর নিকটে মন মানসিক তার ক্ষেত্রে তাঁকে পেলাম সব চাইতে নরম অবস্থায়। সে আমাকে কিছু পরামর্শ দিল এবং সেই মোতাবেক কাজ করলাম। কিন্তু কার্যকর হবে কিনা তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। লোকেরা বলল, 'সে পরামর্শটা কি?'

আবু সুফিয়ান বলল, 'তাঁর পরামর্শ ছিল, আমি জনগণের নিকট আশ্রয়ের ঘোষণা করে দেই। পরে আমি তাই করলাম।'

কুরাইশগণ বলল, 'তাহলে কি মুহাম্মদ ﷺ তা বাস্তবায়ণ করে মেনে নিয়েছে।'

লোকেরা বলল, 'তুমি ধ্বংস হও। ঐ ব্যক্তি (আলী) তোমার সঙ্গে কেবল রহস্যই করেছে।

আবু সুফিয়ান বলল, 'আল্লাহর কসম! এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ই ছিল না।'

সঙ্গোপণে যুদ্ধ প্রস্তুতি (التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء) : ইমাম তাবরানীর বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গের তিন দিন পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা (রাঃ) সফরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রস্তুতি সঙ্গোপনে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এ খবর কেউ জানতেন না। আয়িশা (রাঃ) যখন প্রস্তুতি পর্বে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আবু বকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'কন্যা! এ কিসের প্রস্তুতি?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না।'

আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'এ তো বনু আসফার অর্থাৎ রোমকদের সাথে যুদ্ধের সময় নয়। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইচ্ছা আবার কোন দিকের? আয়িশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই।'

তৃতীয় দিবসে প্রত্যুষে আমর বিন সালেম খোযায়ী ৪০ জন ঘোড়সওয়ারী সহ মদীনায় এসে উপস্থি হলেন এবং পূর্বেকার কবিতাটি পড়লেন, ... শেষ পর্যন্ত। তখন সাধারণ লোকেরা জানতে পারলেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়েছে। এরপর এল রোকাইল। অতঃপর আবু সুফিয়ান এল। অবস্থার প্রেক্ষাপটে জনগণ পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুধাবন করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'মক্কা যেতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ প্রার্থনাও করলেন যে, (اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها). 'হে

আল্লাহ! গোয়েন্দাদের এবং কুরাইশদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি কর এবং থামিয়ে দাও যাতে আমরা তাদের অজানতেই একেবারে তাদের মাথার উপর গিয়ে পৌঁছতে পারি।'

অতঃপর অত্যন্ত সঙ্গোপনে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ৮ম হিজরী রমাযান মাসের প্রথম ভাগে আবু কাতামা বিন রিবয়ী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে আট জন মুজাহিদ সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট বাহিনীকে বাতনে আযামের দিকে প্রেরণ করেন। এ স্থানটি যী খাশাব এবং যিল মারওয়াহর মধ্যস্থলে মদীনা হতে প্রায় ৩৬ আরবী মাইল দূরত্বে অবস্থিত। উদ্দেশ্য ছিল অভিমুখী অভিযান প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ যেন ধারণা করে যে, নাবী করীম (ﷺ) এ অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং শেষ পর্যন্ত খবরটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এ দলটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। অতঃপর তাঁরাও গিয়ে নাবী করীম (ﷺ)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন।[1]

এদিকে হাতেব বিন আবী বালতা কুরাইশের নিকট এক পত্র লিখে এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণ করেন। মহিলা তাঁর চুলের খোঁপার মধ্যে পত্রটি রেখে পথ চলছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসমান হতে ওহীর মাধ্যমে হাতেবের এ গতিভঙ্গী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি আলী (রাঃ), মেকদাদ (রাঃ), যুবায়ের এবং আবু মুরশেদ গানাভী (রাঃ)-কে এ বলে প্রেরণ করলেন যে, 'তোমরা 'খাখ' নামক উদ্যানে গিয়ে সেখানে একটি হাওদা নশীন মহিলাকে দেখতে পাবে, সে পত্রটি তার কাছ থেকে উর্দ্ধার করতে হবে। উল্লেখিত সাহাবীগণ ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলার নাগাল পাওয়ার জন্য ছুটে চললেন। তাঁদের অগ্রাভিযানের এক পর্যায়ে তাঁরা উটের পিঠে আরোহণকারিণী মহিলাটির নাগাল পেলেন। তাঁরা তাঁকে উটের পিঠ থেকে অবতরণ করে জিজ্ঞেস করলেন তার কাছে কোন পত্র আছে কিনা। কিন্তু সে তার নিকট পত্র থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তার উটের হাওদা তল্লাশী করেও তাঁরা কোন পত্র না পাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আলী (রাঃ) বললেন, 'আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিথ্যা বলেন নি, কিংবা আমরাও মিথ্যা বলছিনা। হয় তুমি পত্রখানা বাহির করে দেবে, নতুবা আমরা তোমাকে একদম উলঙ্গ করে তল্লাশী চালাব। সে যখন তাদের দৃঢ়তা অনুধাবন করল, তখন বলল, 'আচ্ছা তাহলে তোমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাও।' অন্য দিকে মুখ ফেরালে মহিলা তার খোঁপা থেকে পত্রখানা বের করে তাঁদের নিকট সমর্পণ করল। তাঁরা পত্রখানা নিয়ে নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছল। পত্রখানা খুলে পড়া হল। তাতে লেখা ছিল,

হাতেব বিন বালতায়ার পক্ষ হতে কুরাইশদের প্রতি, অতঃপর কুরাইশগণকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছিল।[2]

---

[1] এটা ওই বাহিনী যাদের সঙ্গে আমর বিন আহবতের দেখা হলে সে ইসলামী কায়দায় সালাম করে। কিন্তু মোহাল্লাম বিন জোসামা পুর্বের ক্রোধের কারনে তাকে হত্যা করেন এবং তার উট ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিজ দখলে নিয়ে নেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, 'অলা তাকুলু লিমান আলকা ইলাই কুমুস সালা মা লাসতা মু'মিনা' শেষ'... শেষ পর্যন্ত।

অর্থঃ যিনি তোমাদের প্রতি সালাম করেন তাকে তুমি 'মুমিন নও' বোলনা। আয়ত নাযিল হওয়ার কারণে সাাহাবা কেরাম মোহল্লামকে নাবী (ﷺ)-এর দরবারে নিয়ে আসলেন এ হেতু যে, নাবী (ﷺ) তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু মোহল্লাম যখন নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন তিতি তিন বার বললেন, 'হে আল্লাহ মোহাল্লামকে ক্ষমা কর না।' এ কথা শূনে মোহল্লাম নিজ কাপড়ের আঁচলে অশ্রু মুছতে মুছতে সেখান থেকে উঠে গেলেন। ইবনু ইসাহাকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছেন যে, পরে আল্লাহর নাবী (ﷺ) তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৫০ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬২২, ৬২৭ ও ৬২৮ পৃঃ।

[2] ইমাম সোহাইলী কতকগুলো যুদ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণের উদ্ধৃতি পূর্বখ এ পত্রের বিবরণ দিয়েছেন,তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'অতৎপর, হে কুরাইশগণ রাসূলে করীম (ﷺ) তোমাদের আক্রমণের উদ্দেশে রাত্রি অন্ধকারে প্রবাহিত সমুদ্র স্রোতের ন্যায় অগণিত সৈন্য সম্পদ নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। আল্লাহর কসম! তিনি যদি একাকীও তোমাদের নিকটে যান তাহলেও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করে তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন। অতএব, নিজেদের ব্যাপার তোমরা চিন্তা করে নিও। তোমাদের প্রতি আমার সালাম। ইমাম ওয়াকেদী একটি মুর্সাল সনদে বর্ণিত বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, হাতের সোহাইল বিন আমর, সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং একরামার নিকট এ পত্র লিখেছিলেন যে, নাবী করীম (ﷺ) লোকদের

নাবী করীম ﷺ হাতেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তুমি এহেন গুরুতর কাজ করেছ?

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমি স্বধর্মত্যাগী হই নি এবং আমার মধ্যে কোন পরিবর্তনও আসেনি। কুরাইশদের সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্কও নেই। তবে কথা হচ্ছে, কোন ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং আমার পরিবারের সদস্য এবং সন্তান-সন্ততিরা সেখানেই আছে। তাদের সঙ্গে আমার এমন কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নেই যে, তারা আমার পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনা করবে। পক্ষান্তরে আপনার সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন মক্কায় তাঁদের সকলেরই আত্মীয় স্বজন রয়েছে। যাঁরা তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন যদিও সম্পূর্ণ বেআইনী ও অধিকার বহির্ভূত তবুও ঐ একই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে আমি কুরাইশদের জন্য একটু এহসানি করতে চেয়ে ছিলাম যার বিনিময়ে তারা আমার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি যত্নশীল হবে।

এ কথাবার্তার প্রেক্ষিতে ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গ্রীবা কর্তন করে ফেলি। কারণ, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সে মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ তখন বললেন,

(إنه قد شهد بدراً، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)

'হে ওমর! তুমি কি জান না যে, সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। আর হতে পারে আল্লাহ তা'আলাহ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলে দিয়েছেন যে, 'তোমরা যা চাও তা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'

এ কথা শ্রবণ করে ওমর (রাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রু সজল হয়ে উঠল। অতঃপর বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভাল জানেন।'[১]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা গোয়েন্দাদের গ্রেফতার করে দেন এবং মুসলিমগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত কোন খবর কুরাইশদের নিকট পৌঁছনোর পথ বন্ধ করে দেন।

ইসলামী বাহিনী মক্কার পথে (الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة) : ৮ম হিজরী ১০ই রমাযান নাবী করীম ﷺ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর দশ হাজার সাহাবী (রাঃ)-এর এক বাহিনী। এ সময় মদীনার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আবু রাহাম গেফারী (রাঃ)-এর উপর।

জুহফা কিংবা তার কিছু অংশ আগে নাবী করীম ﷺ-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় পরিবার পরিজন সহ তিনি মদীনা হিজরত করে যাচ্ছিলেন। আবার আবওয়া নামক স্থানে নাবী করীম ﷺ-এর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারেস এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়ার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের উভয়কে দেখে নাবী করীম ﷺ মুখ ফিরে নেন। কারণ এরা উভয়েই নাবী করীম ﷺ-কে দারুণ দুঃখ কষ্ট দিয়েছিল এবং তাঁর নামে কুৎসা রটনা করেছিল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে উম্মু সালমা (রাঃ) আরয করেন, এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, আপনার চাচাতো এবং ফুফাতো ভাই আপনার নিকট সব চেয়ে বেশী হতভাগ্য হবে। এদিকে আলী (রাঃ) আবু সুফিয়ান বিন হারেসকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে গিয়ে সে কথা বল যা ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিলেন :

﴿قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ﴾ [يوسف: ٩١]

মাছে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আমি তোমাদের ছাড়া অন্য কারো ধারণা করি না এবং আমি চাচ্ছি যে, আমার দ্বারা তোমাদের একটি উপকার হোক। ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫২১ পৃঃ।

[১] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৪২২, ২য় খণ্ড ৬১২ পৃঃ। যুবায়ের এবং আবু মুরশেদের নামের অতিরিক্ত উল্লেখ সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে।

'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপর সম্মানিত করেছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা দোষী ছিলাম।' [ইউসুফ (১২) : ৯১]

কারণ, নাবী করীম এটা পছন্দ করবেন না যে, অন্য কারো উত্তর তাঁর চাইতে উত্তম ছিল। অতএব, আবু সুফিয়ান তা'ই করল এবং উত্তরে রাসূলুল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে বললেন,

﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف:٩٢]

'অদ্য তোমাদের উপর কোন নিন্দা নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়াশীলদের চাইতেও অধিক দয়ালু।' [ইউসুফ (১২) : ৯২]

এ প্রেক্ষিতে আবু সুফিয়ান কবিতার নিম্নরূপ কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করে শোনাল,

لعغمرك إني حين أحمل راية - لتغلب خيل اللات خيل محمد

لكالمدلج الحيران أظلم ليله - فهذا أواني حين أهدى فأهتدي

هداني هاد غير نفسي ودلني - على الله من طردته كل مطرد

অর্থ : 'তোমার জীবনের কসম! সেই সময় আমি এ জন্য পতাকা উত্তোলন করেছিলাম যে, লাতের ঘোড়সওয়ারী মুহাম্মদ -এর ঘোড়সওয়ারীর উপর বিজয় হবে, তখন আমার অবস্থা সে রাত্রিকালের প্রবাসীর ন্যায় ছিল যে অন্ধকারে দিগ্বিদিক হারিয়ে ঘুরতে থাকে। কিন্তু এখন সময় এসে গিয়েছে যে, আমাকে পথ দেখানো হবে এবং আমি হিদায়াত লাভ করব। আমাকে আমার আত্মার পরিবর্তে একজন পথ পরিদর্শক হিদায়াত করেছেন এবং সে ব্যক্তিই আমাকে আল্লাহর পথের কথা বলেছেন যাকে আমি প্রতি মুহূর্তে তিরস্কারের মাধ্যমে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এ কবিতা শ্রবণান্তে আল্লাহর রাসূল তার বক্ষে একটি থাবা মারলেন এবং বললেন, 'প্রতি মুহূর্তে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।'[১]

মাররায্ যাহরান নামক স্থানে ইসলামী সৈন্যদের শিবির স্থাপন (الجيش الإسلامي يــنزل بِمَــرِّ الظَّهْــرَان) : রাসূলুল্লাহ নিজ সফর অব্যাহত রাখলেন। এ সফর কালে রাসূলুল্লাহ এবং সাহাবীগণ রোযাবস্থায় ছিলেন। কিন্তু উসফান এবং কোদাইদের মধ্যবর্তী স্থানে কাদীদ নামক ঝর্ণার নিকট পৌঁছে রোযা ভঙ্গ করলেন।[২] সাহাবীগণও রোযা ভঙ্গ করলেন। এরপর আবার সফর অব্যাহত রাখলেন, এভাবে রাত্রির পূর্বভাগ সফর করে মাররায় যাহরান নির্দেশক্রমে লোকেরা পৃথক পৃথক আগুণ জ্বালাল। এভাবে দশ হাজার স্থানে আগুন জ্বালানো হয়। রাসূলুল্লাহ ওমর বিন খাত্তাব -কে প্রহরী নিযুক্ত করেন।

আবু সুফিয়ান নাবী করীম -এর দরবারে (أبو سفيان بين يدي رسول الله ﷺ) : মাররায যাহরানে শিবির স্থাপনের পর আব্বাস রাসূলুল্লাহ -এর সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে বের হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যদি উপযুক্ত কোন লোক পাওয়া যায় তাহলে তার মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট এ খবরটি পাঠানো যে, রাসূলুল্লাহ -এর মক্কা প্রবেশের পূর্বেই তারা যেন নাবী করীম -এর নিকট উপস্থিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে।

---

[1] আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের ফলে পরবর্তী সময়ে তাঁর মধ্যে অনেক গুণাবলীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যখন হতে ইসলাম গ্রহণ করেন তখণ হতে লজ্জায় রাসূলে করীম -এর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান নাই। নাবী করীম তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদ দিতেন এবং বলতেন আমার আশা আছে যে, এ হামযার বিনিময় প্রমাণিত হবে। মৃত্যুর সময় তিনি বলতেছিলেন, 'আমার জন্য ক্রন্দন করনা। কারণ ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কখনো পাপের কথা বলিনি।' যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৬২-১৬৩ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬১৩ পৃঃ।

এদিকে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের নিকট খবর পাঠাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে এ সংক্রান্ত কোন খবরাখবরই তাদের নিকট পৌঁছেনি। তবে তারা অত্যন্ত ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় কাল যাপন করছিল এবং আবু সুফিয়ান বারবার বাইরে খবরখবরা নেয়ার চেষ্টা করছিল। ঐ সময় সে এবং হাকীম বিন হেযাম এবং বোদাইল বিন ওয়ারকা খবর জানাবার জন্য বাহিরে গিয়েছিল।

আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূলে করীম ﷺ-এর খচ্চরের উপর সোওয়ার হয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় আবু সুফিয়ান এবং বোদাইল বিন ওয়ারকা' কথোপকথন আমার কর্ণগোচর হল। আবু সুফিয়ান বলল, আল্লাহর কসম! অদ্য রাত্রির মতো এত অধিক আগুণ এবং সৈন্য আমি ইতোপূর্বে কখনো দেখি নি।

উত্তরে বোদাইল বলল, 'আল্লাহর কসম! এরা বনু খোযায়া। যুদ্ধ তাদের রাগান্বিত করেছে।'

আবু সুফিয়ান বলল, 'বনু খোযায়া সংখ্যায় কতই না অল্প এবং নিকৃষ্ট সৈন্যবাহিনীতে এত লোকজন এবং এত আগুণ তারা পাবে কোথায়?'

আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, 'আমি তাদের কথপোকথন শুনে সব কিছু বুঝে নিলাম এবং বললাম, 'আবু হানযালা না কি? সে আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলল, 'আবু ফযল না কি?'

আমি বললাম, হ্যাঁ'।

সে বলল, 'কী ব্যাপার? আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক ।'

আমি বললাম, 'সেখানে লোকজন সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ রয়েছেন। হায় কুরাইশদের ধ্বংস! আল্লাহর শপথ!'

সে বলল, 'এখন উপায় কী? আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক ।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! তিনি যদি তোমাদের পেয়ে যান তাহলে গ্রীবা কর্তন করে ফেলবেন। অতএব, এস আমার এ খচ্চরের পেছনে বসে যাও। আমি তোমাদেরকে রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' অতঃপর আবু সুফিয়ান আমার পিছনে উঠে বসল। তার অন্য দুই বন্ধু ফিরে চলে গেল।

আব্বাস (رضي الله عنه) বলছেন, 'আমি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে চললাম। যখন কোন উনুনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সেখানকার লোকেরা বলছিলেন, কে যায়?' কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চর এবং আমি তার ঘোড়সওয়ারী তখন বলত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা এবং তাঁর (নাবী করীম ﷺ) খচ্চর। এভাবে চলতে চলতে যখন ওমর বিন খাত্তাব (رضي الله عنه)-এর উনুনের নিকট গেলাম, তিনি বললেন, 'কে'? অতঃপর গাত্রোত্থান করে আমার নিকট আসলেন এবং আমার পিছনে আবু সুফিয়ানকে দেখে তিনি বললেন, 'আবু সুফিয়ান আল্লাহর দুষমন। যাক আল্লাহর অশেষ প্রশংসা যে কোন অঙ্গীকার কিংবা কৌশল ছাড়াই তাকে আমাদের মধ্যে পাওয়া গেছে।' এ কথা বলার পর সেখান থেকে বের হয়ে তিনি দ্রুতপদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থান স্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি ও খচ্চরকে উত্তেজিত করে দ্রুত এগিয়ে চললাম।

আমি কিছুক্ষণ আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম এবং খচ্চর পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট হলাম। ইতিমধ্যে ওমর (رضي الله عنه)-ও এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইনি আবু সুফিয়ান! আমাকে নির্দেশ দেয়া হোক , আমি তাঁর গর্দান কেটে ফেলি।' তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। তারপরে আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট বসে তাঁর মাথা ধরে বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি ছাড়া অন্য কেউ আজরাত্রে আপনার সাথে কানাঘুষা করবে না।' এদিকে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে ওমর (رضي الله عنه) বারবার বলতে থাকলেন। তখন আমি বললাম, ওমর (رضي الله عنه) থাম, আল্লাহর কসম! এ যদি বনু আদী বিন কা'ব গোত্রের লোক হত, তুমি এমন কথা বলতে না । ওমর (رضي الله عنه) বললেন, 'আব্বাস তুমি থাম, আল্লাহর কসম! তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে (সে যদি ইসলাম গ্রহণ করত) অধিক পছন্দনীয় ছিল। ইহার কারণ ইহাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তোমার ইসলাম গ্রহণ খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চাইতে অধিক পছন্দনীয় ছিল।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فـأتني بـه) 'আব্বাস ইহাকে (আবু সুফিয়ানকে) নিজ তাঁবুতে নিয়ে যাও, প্রত্যুষে আমার নিকট নিয়ে এসো। নাবী করীম ﷺ এ নির্দেশ মোতাবেক তাকে তাঁবুতে নিয়ে যান এবং সকালে নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির করেন। তাঁকে দেখে তিনি ﷺ বললেন, (ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلـم أن لا إلـه إلا الله؟) 'হে আবু সুফিয়ান! তোমার উপর দুঃখ হচ্ছে এই জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এই মহাসত্য উপলব্ধি করার সময় কি এখনো তোমার হয় নি?

আবু সুফিয়ান বলল, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক । আপনি যে, কত সহনশীল, কত সম্মানিত এবং স্বজনরক্ষক! আমি বুঝে নিয়েছি যে, যদি অন্য কোন উপাস্য থাকত তাহলে এতদিন তা আমার কাজে আসত।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟) 'আবু সুফিয়ান! তোমার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। এখনো কি তোমার বুঝবার সময় আসে নি যে, আমি সত্যিই আল্লাহর রাসূল ﷺ অর্থাৎ আমি যে সত্যিই আল্লাহর রাসূল ﷺ এ সত্য উপলব্ধি করা কি এখনো তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।'

আবু সুফিয়ান বলল, 'আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক । আপনি যে কতইনা ধৈর্য্যশীল, কতইনা দয়ালু ও আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনকারী! কিন্তু ঐ ব্যাপারে এখনো কিছু না কিছু সংশয় তো আছেই। এ প্রেক্ষিতে আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, 'ওহে শোন! গ্রীবা কর্তনের পূর্বেই ইসলাম কবুল করে নাও এবং এ কথা স্বীকার করে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ। আব্বাস (رضي الله عنه)-এর এ কথার প্রেক্ষিতে আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করলেন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে কালেমা পাঠ করলেন।

আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান সম্মান প্রিয় তাই তাঁকে কোন সম্মান প্রদান করুন। নাবী করীম ﷺ বললেন,

(نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن).

'ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে আশ্রিত হবে এবং যে নিজ ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে নেবে সে আশ্রিত হবে এবং যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও আশ্রিত হবে।

ইসলামী সৈন্য মাররাযযাহরান হতে মক্কার দিকে (الجيش الإسلامي يغادر مـر الظهـران إلى مكـة) : ঐ সকালেই মঙ্গলবার ৮ম হিজরী ১৭ ই রমাযান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাযরায্যাহরান হতে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি আব্বাস (رضي الله عنه)-কে এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, 'আবু সুফিয়ানকে উপত্যকার সংকীর্ণতার উপর পর্বত প্রান্তে থামিয়ে রাখবে যাতে ঐ পথ দিয়ে গমণাগমণকারী আল্লাহর সৈনিকদের সে স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। আব্বাস (رضي الله عنه) রাসলুল্লাহ ﷺ-এর নিদের্শ পালন করলেন। এদিকে গোত্রগুলো নিজ নিজ পতাকা বহন করছিলেন এবং সেখান দিয়ে যখন কোন গোত্র গমন করত তখন আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করতেন, এ সকল লোকজন কারা?' উত্তরে আব্বাস (رضي الله عنه) উদাহরণস্বরূপ হয় তো বলতেন, 'বনু সোলাইম। আবু সুফিয়ান তখন বলতেন, 'সোলাইমের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

অতঃপর পরবর্তী গোত্রের গমনের সময় আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা?

আবু সুফিয়ান বললেন, 'মোযায়না'।

আবু সুফিয়ান বললেন, 'মোযায়নার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?'

এমনিভাবে গোত্রগুলো এক এক করে গমন করল, যখন কোন গোত্র গমন করত তখন আবু সুফিয়ান আব্বাস (رضي الله عنه)-কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, যখন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতো তখন তিনি গোত্রের নাম ধরে বলতেন, 'এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন তাঁর সবুজ দলের মাঝে অত্যন্ত জাঁকজমক ও জমকালো অবস্থার মধ্য দিয়ে আগমন করলেন। তিনি মুহাজির ও আনসারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এখানে মানুষ ব্যতিরেকে শুধু লোহার বেড়া দেখা যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বললেন, 'সোবহানল্লাহ! হে আব্বাস! এরা কারা?'

তিনি বললেন, 'আনসার ও মুহাজিরগণের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করছেন।' আবু সুফিয়ান বললেন, 'এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ক্ষমতা কি কারো কখনো হতে পারে?'

এরপর আরো বললেন, 'আবুল ফযল! তোমার ভাতিজার রাজত্ব আল্লাহ বড় জবরদস্ত করে দিয়েছেন।'

আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'আবু সুফিয়ান! এ হচ্ছে নবুওয়াতী সম্মান।'

আবু সুফিয়ান বললেন, 'হ্যাঁ', এখন তো তাই বলতে হবে।'

এ সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে যায়। আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ বিন উবাইদা (রাঃ)-এর নিকট। তিনি আবু সুফিয়ানের নিকট দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আজ রক্তক্ষরণ এবং মারপিটের দিন, আজ হারামকে হালাল করা হবে।'

আজ কুরাইশদের ভাগ্যে অপমান নির্ধারিত করে রেখেছেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি সে কথা শুনেননি যা সা'দ বলল। তিঁনি বলেলেন, সা'দ কি বলছেনম, আবু সুফিয়ান বললেন, 'এ কথা বলেছে।'

এ কথা শুনে ওসমান (রাঃ) এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) আরয পেশ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ভয় করছি যে, সা'দ আবার না জানি কুরাইশদের মারধর শুরু করে না দেয়।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, (بل اليوم يوم تُعَظَّم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشاً) 'না তা হবে না, বরং আজকের দিনটি হবে সে দিন যে দিন কা'বা ঘরের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শিত হবে। আজকের দিনটি হবে সে দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের ইজ্জত প্রদান করবেন।'

এর পর নাবী করীম ﷺ লোক পাঠিয়ে সা'দ (রাঃ)-এর নিকট থেকে পতাকা আনিয়ে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়েসের হাতে প্রদান করেন। উদ্দেশ্য ছিল এটা তাঁকে বুঝতে দেয়া যে, পতাকা খানা তাঁর হাতেই রইল, তাঁর থেকে বের হল না। অবশ্য, এ কথাও বলা হয়েছে যে, নাবী করীম ﷺ পতাকা নিয়ে জোবায়ের (রাঃ)-এর হাতে প্রদান করেছিলেন।

আকস্মিকভাবে ইসলামী সৈন্য কুরাইশদের মাথার উপর (زحف الجيش الإســلامي تباغت قريش) : রাসূলে করীম ﷺ যখন আবু সুফিয়ানের নিকট হতে চলে গেলেন তখন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'শীঘ্র এখন মক্কায় নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন কর।' আবু সুফিয়ান অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মক্কায় ফিরে এসে উচ্চকণ্ঠে এ বলে আহ্বান জানালেন, 'ওহে কুরাইশগণ! মুহাম্মদ ﷺ এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আগমন করছেন যার সঙ্গে মোকাবেলা বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তারা আশ্রিত হবে। এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবা এসে তাঁর মোচ ধরে বলল, 'মেরে ফেল এ চর্বিযুক্ত ও শক্ত মাংসধারী মশককে। এরূপ সংবাদ পরিবেশকারী ও পূর্বাভাষদাতা বিনষ্ট হোক ।

আবু সুফিয়ান বলল, 'তোমাদের সর্বনাশ হোক । দেখ, তোমাদের জীবন সম্পর্কে এ মহিলা যেন তোমাদের ধোঁকায় নিক্ষেপ না করে। কারণ মুহাম্মদ ﷺ এত অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আগমন করছেন যে, এর সঙ্গে মোকাবেলা করার সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে আশ্রয় লাভ করবে।

লোকেরা বলল, 'আল্লাহ যেন তোমাকে ধ্বংস করে। তোমার বাড়ি আমাদের কত জনের আশ্রয় স্থান হবে?'

আবু সুফিয়ান বললেন, 'আরো কথা আছে। যারা ভিতর থেকে নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে তারও আশ্রিত বলে গণ্য হবে। অধিকন্তু, যারা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করবে তারাও আশ্রিত বলে গণ্য হবে। এ কথা শোনার পর লোকেরা সকলে নিজ নিজ ঘর ও মসজিদুল হারাম অভিমুখে পলায়ন করতে থাকল।

তবে কিছু সংখ্যক লম্পটকে তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল এবং বলল যে, 'এদেরকে আমরা অগ্রভাগে রাখছি। যদি কুরাইশগণ কৃতকার্য হল তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হব, কিন্তু যদি তাদের খুব মারধর করা হয় তাহলে আমদের নিটক হতে যা কিছু চাওয়া হবে আমরা মেনে নিব।

মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এ সকল নির্বোধ কুরাইশগণ একরামা বিন আবু জাহল, সফওয়ান বিন উমাইয়া এবং সোহাইল বিন আমরের পরিচালনায় খান্দাময় একত্রিত হল। তাদের মধ্যে বনু বকর গোত্রের হেমাস বিন কাইস নামক এক লোকও ছিল যে, ইতোপূর্বে অস্ত্র ঠিক ঠাক করছিল। এ প্রেক্ষিতে তার স্ত্রী এক দিন বলেছিল, 'আমি যা কিছু দেখছি তা কিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে?'

সে বলল, 'মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

স্ত্রী বলল, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের মোকাবেলায় কোন কিছুই স্থির হতে পারবে না।'

সে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমার আশা যে, আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর কোন সঙ্গীকে তোমার খাদেম করে ছাড়ব।' তারপর সে বলল,

إن يقبلوا اليوم فمالي عِلّه ** هـــذا ســـلاح كامـــل وألّه

وذو غِرَارَيْن سريع السَّلّة **

অর্থ : তারা যদি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আসে তবে আমার কোন আপত্তি হবে না। এ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র, লম্বা ফলা বিশিষ্ট বর্শা এবং আকস্মিক আক্রমণাত্মক দুই ধার বিশিষ্ট তরবারী রয়েছে।

খান্দামর যুদ্ধে এ ব্যক্তিও এসেছিল।

যু তুওয়া নামক স্থানে ইসলামী সৈন্য (الجيش الإسلامي بـذي طُـوَى) : অগ্রগমনের এক পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাহিনী মাররায্যাহরান হতে যুতাওয়ায় গিয়ে পৌছলেন, সে সময় আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ীর সম্মানের জন্য অত্যধিক বিনয়ের সঙ্গে নাবী করীম ﷺ স্বীয় মস্তক এমন ভাবে অবনমিত রেখেছিলেন যে, দাড়ির লোম সওয়ারীর খড়ির সঙ্গে গিয়ে লাগতেছিল। নাবী করীম ﷺ যুতাওয়ায় গিয়ে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিধান ও বিন্যাস করে নিলেন। ডান পাশে নিযুক্ত করলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (رضي الله عنه)-কে। সে স্থানে ছিল আসলাম, সোলাইম, গেফার, মোয়ায়অনাহ, জোহায়ান এবং আরও অন্যান্য গোত্র সমূহ। খালিদ বিন ওয়ালিদ (رضي الله عنه)-কে নির্দেশ দেয়া হল নীচু অঞ্চল দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে। কুরাইশগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাদের সকলকে হত্যা করে দিবে, তারপর সাফা পাহাড়ের উপর নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করবে।

যুবায়ের বিন আওয়াম (رضي الله عنه) ছিলেন বাম পাশে। তাঁর সঙ্গে ছিল রাসূলে করীম ﷺ-এর পতাকা। নাবী করীম ﷺ তাঁকে দির্দেশ প্রদান করলেন মক্কার উপরিভাগ অর্থাৎ কোদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করতে এবং হাজুনে গিয়ে পতাকা উত্তোলন করে তথায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে।

পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদাহ (رضي الله عنه)। তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, বাতনে ওয়াদীর পথ দিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হতে যাতে তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর পূর্বেই মক্কায় অবতরণ করতে সক্ষম হন।

মক্কায় ইসলামী সৈন্যের প্রবেশ (الجيش الإسلامي يدخل مكة) : উপরোক্ত এ নির্দেশনা লাভের পর ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী নিজ নিজ নির্ধারিত পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকলেন। খালিদ বিন ওয়ালীদের বাহিনীর সম্মুখে যে সকল মুশরিক এসেছিল তাদের সকলকেই হত্যা করা হল। অবশ্য, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে থেকে কুরয বিন জাবের ফাহরী এবং খোনাইস বিন খালিদ বিন রাবীয়া শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। এর কারণ ছিল এই যে দুই জন সেনা বাহিনী থেকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভিন্ন পথ ধরে গমন করছিলেন। সেই অবস্থায় তাদের হত্যা করা হয়।

খান্দামায় পৌঁছানোর পর খালিদ (رضي الله عنه) এবং কুরাইশ লম্পটদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সামান্য সংঘর্ষে বারো জন মুশরিক নিহত হওয়ার পর তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। হেমাস বিন কাইস, যে মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পূর্ব থেকেই অস্ত্রশস্ত্র ঠিক-ঠাক করে রেখেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়ন করার পর নিজ গৃহে প্রবেশ করল এবং তার স্ত্রীকে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও।' তার স্ত্রী বলল, 'ওই কথাটি কোথায় গেল যা তুমি বলতেছিলে?' উত্তরে সে বলল,

إنك لو شهدت يوم الخندمة - إذ فر صفوان وفر عكرمه

واستقبلتنا بالسيوف المسلمه - يقطعن كل ساعد وجمجمه

ضربا فلا يسمع إلا غمغمه - لهم نهيت خلفنا وهمهمه

অর্থঃ 'তুমি যদি খান্দামায় যুদ্ধের অবস্থা দেখতে যখন সাফওয়ান ও ইকরামা পলায়ন করতে উদ্যত হয় এবং উন্মুক্ত তরবারী দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় যা হাতের কবজি এবং মাথার খুলিগুলোকে এমন ভাবে কর্তন করতেছিল যে পিছনে তাদের গর্জন ও গোলমাল ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তবে তুমি নিন্দনীয় একটুও কথা বলতে পারতে না।'

এরপর খালিদ (رضي الله عنه) দৃপ্ত পদে মক্কার গলি পথগুলো অতিক্রম করে সাফা পাহাড়ের উপর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সঙ্গে মিলিত হন।

এদিকে যুবাইর (رضي الله عنه) অগ্রভাগে এগিয়ে গিয়ে হাজুন নামক স্থানে ফাতাহ মসজিদের নিকট রাসূলুল্লাহর (ﷺ) পতাকা উত্তোলন এবং তাঁর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করেন। অতঃপর সেখানে একটানা অবস্থান করতে থাকলেন যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে আগমন করলেন।

মাসজিদুল হারামে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রবেশ মূর্তি অপসারণ (الرسول ﷺ يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام) : এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উঠলেন এবং সম্মুখ পেছনে ডান ও বাম পাশের মোতায়েন আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে মাসজিদুল হারামে আগমন করলেন। মাসজিদুল হারামে আগমনের পর সর্বাগ্রে তিন হাজার আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তার পর আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে একটি কামান (ধনুক) ছিল এবং আল্লাহর ঘরের আশপাশে ও ছাদের উপর ৩৬০টি মূর্তি ছিল। নাবী করীম (ﷺ) সে ধনুক দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে করতে বলেছিল,

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء:٨١]

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبا:٤٩]

'হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। আর বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।' (আল-ইসরা (১৭) : ১৮]

'বল– সত্য এসে গেছে, আর মিথ্যের নতুন করে আবির্ভাবও ঘটবে না, আর তার পুনরাবৃত্তিও হবে না।' [সাবা (৩৪) : ৪৯]

নাবী করীম (ﷺ)-এর আঘাতে মূর্তিগুলো ভূপতিত হচ্ছিল।

নিজের উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন এবং এহরাম অবস্থায় না থাকার কারণে শুধু তাওয়াফ করাই যথেষ্ট মনে করেন। তাওয়াফ সম্পন্ন করার উসমান বিন তালহা (رضي الله عنه)-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কা'বা ঘরের চাবি গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে কা'বা ঘর খোলা হয় এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। এ সময় অভ্যন্তরস্থিত ছবিগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁদের মধ্যে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (عليهما السلام)-এর প্রতিকৃতদ্বিয়ও ছিল। তাঁদের হাতে ভবিষ্যত কথন সম্পর্কিত তীর ছিল। এ দৃশ্য দেখে বললেন, (قاتلهم الله، والله)

ما استقسما بها قط 'আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুশরিকদেরকে ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! ঐ দুই জন কখনই ভবিষ্যত জানার জন্য এ ধরণের তীর ব্যবহার করেন নি।

কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে কাঠের তৈরি একটি কবুতরীর প্রতিকৃতিও তাঁর চোখে পড়ে। এ প্রতিকৃতিটি তিনি নিজ হাতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেন। অন্যান্য মূর্তিগুলোকেও তাঁর নির্দেশে মুছে ফেলা হয়।

কা'বা ঘরের ভিতরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায় এবং কুরাইশদের নিকট ভাষণ প্রদান (الرسـول ﷺ يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش) : এরপর নাবী করীম ﷺ ভিতর থেকে কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা ও বেলাল (رضي الله عنهما) ভিতরেই ছিলেন। অতঃপর তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে থেমে যান। এ অবস্থায় নাবী করীম ﷺ-এর বাম পামে থাকে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি এবং পিছনে তিনটি। ঐ সময়ে কা'বা ঘরটি ছিল ছয় স্তম্ভবিশিষ্ট। অতঃপর নাবী করীম ﷺ সেখানেই সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশগুলো তিনি ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন এবং তাকবীর ও একত্ববাদের আয়াতগুলো উচ্চারণ করতে থাকেন। অতঃপর কা'বা ঘরের দরজা খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশাল সংখ্যক কুরাইশ কা'বা ঘরের সম্মুখে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিল। দরজার দুই অংশ ধারণ করে নিম্নভাগে দণ্ডায়মান কুরাইশদের সম্বোধন করে নাবী করীম ﷺ বললেন,

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثُرَة أو مـــال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سِدَانَة البيت وسِقاية الحاج، ألاوقتيل الخطأ شبه العمد ــ السوط والعصا ــ ففيــه الدية مغلظة، مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد.

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি একক ভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানো সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান, অথবা পূর্ণতা, অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এ দুই পদতলে রইল। স্মরণ রেখ, ভুলবশত হত্যা যা লাঠি সোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোনিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশ উট দিতে হবে যার মধ্যে ৪০টি হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে জাহেলিয়াত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষগদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ)-এর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি।'

এরপর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন,

﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾..

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি এবং সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু জ্ঞাত আছেন এবং সব খবর রাখেন। [আল-হুজুরাত (৪৯) : ১৩]

অদ্য কারো কোন নিন্দা নেই (لا تثريب عليكم اليوم) : অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন, (يا معشــر قريش ما ترون أني فاعــل بكـــم؟) 'ওগো কুরাইশ জনগণ! তোমাদের কি ধারণা, তোমাদের সঙ্গে আমি কিরূপ ব্যবহার করব বলে মনে করছ?'

সকলে বলল, 'খুব ভাল। আপনি সদয় ভাই এবং সদয় ভাইয়ের পুত্র।'

নাবী ﷺ বললেন, (فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾ اذهبوا فأنتم الطلقاء) 'তাহলে তোমরা জেন রাখ যে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ কথাই বলছি। যেমনটি ইউসুফ (عليه السلام) তাঁর ভাইদের সঙ্গে বলেছিলেন যে, আজ তোমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই।' যাও আজ তোমাদের সকলকে মুক্তি দেয়া হল।'

কা'বা ঘরের চাবি (مفتاح البيت إلى أهلـــه) : (যার অধিকার তাকেই দেওয়া হল) এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদুল হারামে বসে পড়লেন। আলী (رضي الله عنه) বলেছেন, 'যার হাতে চাবি ছিল তিনি নাবীজী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হুজুর! আমাদের জন্য হাজীদের পানি পান করানোর সম্মানের সহিত কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণের সম্মান ও একই সঙ্গে প্রদান করুন।' আল্লাহ আপনার উপর রহম করুক। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক এ আরযটি আব্বাস (رضي الله عنه) করেছিলেন। অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন, ওসমান বিন তালহা কোথায়? তাঁকে ডাকা হলে নাবী করীম ﷺ বললেন, (هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفـــاء) ওসমান! এ নাও তোমার চাবি। অদ্য পুণ্য এবং ওয়াদা পুরণের দিন। তাবাকাত ইবনু সা'দ (رضي الله عنه)-এর বর্ণনায় আছে যে, চাবি দেয়ার সময় নাবী করীম ﷺ আরও বলেছিলেন,

(خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إلـــيكم من هذا البيت بالمعروف

'সর্বক্ষণের জন্যই তুমি এ চাবি গ্রহণ কর। তোমার নিকট থেকে এ চাবি সেই ছিনিয়ে নিবে যে অত্যাচারী হবে। ওসমান! আল্লাহ নিজ ঘরের জন্য তোমাকে বিশ্বাসভাজন করেছেন। অতএব, আল্লাহ এ ঘরে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তুমি যা পাবে তা ভোগ করবে।'

কা'বার ছাদে বেলালের আযান (بلال يؤذن على الكعبـــة) : তখন সালাতের সময় হয়েছিল তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলাল (رضي الله عنه)-কে নির্দেশ প্রদান করলেন কা'বার ছাদে উঠে আযান দিতে। সে সময় কা'বা বারান্দায় উপবিষ্ট ছিল আবু সুফিয়ান বিন হরব, আত্তাব বিন আসীদ এবং হারেস বিন হিশাম।

আত্তাব বলল, 'আল্লাহ আসীদকে এ সম্মান প্রদান করেছেন যে, তিনি এ আযান ধ্বনি শুনেন নি, নতুবা তাকে এক অপছন্দনীয় জিনিস (আযান) শুনতে হত। এর প্রেক্ষিতে হারেস বলল, 'শোন! আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতে পারি যে, তা সত্য তাহলে আমি তাদের অনুসারী হয়ে যাব।'

এ প্রেক্ষিতে আবু সুফিয়ান বলল, 'দেখ! আল্লাহর কসম! আমি কিছুই বলব না, কারণ, যদি আমি কিছু বলি তবে এ কঙ্করগুলো আমার সম্পর্কে সংবাদ দেবে। এরপর নাবী করীম ﷺ তাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, (لقد علمت الذي قلتم) 'এখন তোমরা যে আলাপ করলে তা আমাকে জানানো হয়েছে।' অতঃপর তিনি তাদের আলাপের কথাগুলো পূনরাবৃত্তি করলেন। এ প্রেক্ষিতে হারেস এবং আত্তাব বলে উঠল, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। আল্লাহর কসম! আমাদের সঙ্গে এমন কেউ ছিল না যে, আমাদের কথাবার্তা শুনতে পারে। এ রকম কিছু হলে আমরা বলতাম যে, সে ব্যক্তিই আমাদের কথাবার্তা নাবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছে দিয়েছে (তা না হলে তিনি খবর পেলেন কি ভাবে?)'

বিজয়োত্তর শোকরানা সালাত (صلاة الفتح أو صلاة الشكر) : সে দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু হানী বিনতে আবু তালিবের ঘরে গমন করেন। সেখানে গোসল করেন এবং তাঁর ঘরেই আট রাকাত সালাত আদায় করেন। সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি এ সালাত আদায় করেন। এ কারণেই কেউ কেউ বিজয়োত্তর শোকরানা চাশতের সালাত বলে ধারণা করেছেন। উম্মু হানী তাঁর দুজন দেবরকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) 'হে উম্মু হানী তুমি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছ আমিও তারেকে আশ্রয় দিলাম।' তাঁর এ ঘোষণার কারণ ছিল উম্মু হানীর ভাই আলী (رضي الله عنه) বিন আবু তালিব এ দুজনকে

হত্যা করতে চেয়ে ছিলেন। এ কারণে উম্মু হানী এ দুজনকে ঘরের দরজা বন্ধ করে গোপনে রেখেছিলেন। নাবী করীম ﷺ যখন সেখানে গমন করলেন তখন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং উপরি এ ঘোষণা দিলেন।

বড় বড় পাপীদের রক্ত অনর্থক সাব্যস্ত করা হল (إهدار دم رجال من أكابر المجـــرمين) **:** মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ বড় বড় পাপীদের মধ্য থেকে নয় ব্যক্তির রক্ত অনর্থক সাব্যস্ত করে নির্দেশ প্রদান করেন যে, যদি তাদেরকে কা'বার পর্দার নীচেও পাওয়া যায় তবুও তাদের হত্যা করা হবে। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে (১) আবুল উয্যা বিন খাতাল, (২) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ, (৩) একরামা বিন আবু জাহল, (৪) হারেস বিন নুফাইল বিন অহাব, (৫) মাকীস বিন সাবাবাহ, (৬) হাব্বার বিন আসওয়াদ, (৭) ও (৮) ইবনু খাতালের দুই দাসী যার কবিতার মাধ্যমে নাবী করীম ﷺ-এর বদনাম রটাত, (৯) সারাহ যে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে কারো দাসী ছিল। এর নিকটে হাতরেবর লিখিত পত্রখানা পাওয়া গিয়েছিল।

ইবনু আবি সারাহর ব্যাপার ছিল ওসমান ইবনু আফ্ফান তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রাণ রক্ষার জন্য সুপারিশ করলেন। নাবী ﷺ তাকে ক্ষমা করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। কিন্তু এর পূর্বে নাবী করীম ﷺ এ আশায় দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকলেন যে, কোন সাহাবী উঠে এসে তাকে হত্যা করবে। কারণ এ ব্যক্তিই ইতোপূর্বে একবার ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা হিজরত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে পুনরায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল (তবুও তার পরবর্তী সময়ের কার্য কলাপ ইসলামের সৌন্দর্য বর্ধনে আয়নাস্বরূপ ছিল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হউন)।

ইকরামা বিন আবু জাহল পলায়নের অবস্থায় ইয়েমেনের পথ ধরে চলে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী নাবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এরপর সে ইকরামার পশ্চাদনুসরণ করে তাকে নিয়ে আসে। মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ঈমানের অবস্থা খুব ভাল থাকে।

ইবনু খাতাল কা'বা ঘরের পর্দা ধরে ঝুলছিল। একজন সাহাবী নাবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তার সম্পর্কে অবগত করালে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন ফলে তাকে হত্যা করা হয়। মাকীস বনি সাবারকে নুমায়লাহ বিন আব্দুল্লাহ হত্যা করেন। মুকিসও পূর্বে মুসলিম হয়েছিল। কিন্তু পরে এক আনসারীকে হত্যা কের মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

হাব্বার বিন আসওয়াদ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তাঁর হিযরতের প্রাক্কালে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করেছিল যাতে তিনি উটের হাওদা হতে এক খণ্ড কঠিন পাথরের উপর পড়ে যান এবং এর ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় এ ব্যক্তি পলায়ন করে। পরবর্তী সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তার ঈমানের অবস্থা ভাল থাকে।

ইবনু খাতালের দুই দাসীর একজনকে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় জন আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে সারাহর জন্য আশ্রয় চাওয়া হলে তাকে তা দেয়া হয় এবং পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে (সার কথা হচ্ছে নয় জনের মধ্যে চার জনকে হত্যা করা হয় এবং পাঁচজনকে ক্ষমা করা হয়। এরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে)।

হাফেজ ইবনু হজর লিখেছেন, 'যাদের রক্ত অনর্থক সাব্যস্ত করা হয় তাদের প্রসঙ্গে আবু মাশার হারেস বিন তেলাল খোযায়ীরও উল্লেখ রয়েছে। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে হত্যা করেন। ইমাম হাকিম এ তালিকায় কা'ব বিন যোহইরের উল্লেখ করেছেন, কা'বের ঘটনা প্রসিদ্ধ ছিল। পরে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসা করেন। এ তালিকাভুক্ত ছিল ওয়াহশী বিন হারব এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল ইবনু খাতালের দাসী আরনব এবং উম্মু সা'দ এদের হত্যা করা হয়েছিল। ইবনু ইসহাকও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। এভাবে পুরুষদের সংখ্যা দাঁড়ায় আট এবং মহিলাদের সংখ্যা ছয়। এ পার্থক্যের কারণ এই হতে পারে যে, দুই জন দাসী আরনব এবং উম্মু সা'দ ছিল এবং পার্থক্য ছিল শুধ নাম উপনাম অথাব উপাধির।[1]

---

[1] ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ১১৯১২ পৃঃ।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং ফোযালাহ্ বিন উমাইয়ের ইসলাম গ্রহণ (**إسلام صفوان بن أمية، وفضالة بـــن عمـــير**) : সাফওয়ানের রক্ত অনর্থক সাব্যস্ত করা হয় নি কিন্তু যেহেতু সে ছিল কুরাইশদের একজন বড় নেতা সেহেতু তার নিজ জীবনের ভয় ছিল যথেষ্ট এ কারণে সে পলায়ন করেছিল। উমায়ের বিন অহাব জোমাহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নাবী করীম ﷺ তাকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং এর প্রতীকস্বরূপ তাকে তাঁর সে পাগড়িটি প্রদান করেন মক্কায় প্রবেশ কালে যা তিনি নিজ মস্ত কে বেঁধে রেখেছিলেন। উমায়ের যখন সাফওয়ানের নিকট পৌঁছল তখন সে জেদ্দা হতে ইয়েমেন যাওয়ার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উমায়ের তাকে ফিরিয়ে আনলেন। তাকে দুই মাস সময় দেবার জন্য সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'তোমাকে চার মাস দেয়া হল।' এরপর সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের উভয়ের বিবাহ বন্ধন পূর্ববৎ বহাল রাখলেন।

ফোযালা একজন বীর পুরুষ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাওয়াফ করছিলেন তখন সে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট এসেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার গোপন কুমতলবের কথা বলে দিলে সে মুসলিম হয়ে যায়।

বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষণ (**خطبة الرسول ﷺ الثاني من الفتح**) : বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে ভাষণ দেয়ার জন্য আল্লাহর নাবী ﷺ জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। ভাষণের প্রারম্ভে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি বর্ণনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

(أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحـــل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً، أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسولة ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب)

'ওহে লোক সকল! আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই দিন মক্কাকে হারাম (নিষিদ্ধ শহর) করে দিয়েছেন। এ কারণে কেয়ামত পর্যন্ত তা হারাম বা পবিত্র থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হবে তার এটা বৈধ, হবে না যে, সে এখানে রক্তপাত ঘটাবে অথবা এখানকার কোন বৃক্ষ কর্তন করবে। কেউ যদি এ কারণে জায়েয মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে যুদ্ধ করেছেন তবে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূল ﷺ-কে অনুমতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তোমাদেরকে অনুমতি দেন নি এবং আমার জন্যও শুধুমাত্র দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা বৈধ করেছিলেন। অতঃপর আজ তার পবিত্রতা অনুরূপ প্রয়োজন যে যারা উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিতদের নিকট এ বাণী পৌঁছিয়ে দিবে।'

অন্য এক বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, **(لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه)** এখানে কোন কাঁটা কাটা বৈধ নয়, শিকার তাড়ান ঠিক নয় এবং পড়ে থাকা কোন জিনিস উঠানোও ঠিক নয়। তবে সেই ব্যক্তি নিতে পারবে যে, সে সম্পর্কে প্রচার করবে। তাছাড়া, কোন প্রকার ঘাস ও উপড়ানো যাবে না।

আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিন্তু ইযখির ঘাসের অনুমতি দিন (আরবের প্রসিদ্ধ ঘাস যা উর্মির ন্যায় হয় এবং চা ও ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। কারণ, এটা কর্মকার এবং বাড়ির নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস) নাবী করীম ﷺ বললেন, **(إلا الإذخر)** 'বেশ, ইযখিরের অনুমতি রইল।'

ওই দিন বনু খোযায়া বনু লাইসের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। কারণ, জাহেলিয়াত আমলে বনু লাইসের হাতে তাদের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সম্পর্কে বললেন,

(يا معشر خزاعة، ارفعو أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيالا لأدينه، فمـــن قتـــل بعـــد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله)

'ওহে খোযায়া সম্প্রদায়ের লোকজনেরা তোমরা নিজের হাতকে হত্যা ও খুন হতে নিবৃত্ত রাখ। কারণ, হত্যায় যদি কোন উপকার পাওয়া যেত তাহলে এ যাবত যত হত্যা সংঘটিত হয়েছে তা থেকে কোন উপকার লাভ সম্ভব হত, কিন্তু কোথায় সে লাভ? তোমরা এমন এক জনকে হত্যা করেছ যার শোনিত পাতের খেসারত অবশ্যই আমাকে দিতে হবে। অতঃপর এ স্থানে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তবে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দুটি বিষয়ের অধিকার থাকবে। হয় তারা নিহত ব্যক্তির বিনিময় হত্যাকারীকে হত্যা করবে, কিংবা শোণিত পাতের খেসারত গ্রহণ করবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এর পর ইয়েমেনের আবু শাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার জন্য তা লিখে দিন।' নাবী করীম ﷺ বললেন, 'আবু শাহর জন্য লিখে দাও।'

আনসারদের সন্দেহপরায়ণতা (تخوف الأنصار من بقاء الرسول ﷺ في مكــة) : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করলেন এবং এটা সর্বজনবিদিত ব্যাপারে যে মক্কাই ছিল নাবী করীম ﷺ-এর আবাসস্থল এবং জন্মভূমি ও মাতৃভুমি এ প্রসঙ্গে আনসারগণ পরস্পর বলাবলি করতে থাকলেন যে, নিজ শহর ও জন্মভূমি বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মক্কাতেই অবস্থান করতে থাকবেন? ঐ সময় তিনি সাফা পাহাড়ের উপর হাত দু'টো উত্তোলন করে প্রার্থনারত ছিলেন। প্রার্থনা শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তেমন কিছু নয় হে আল্লাহর রাসূল ﷺ।' কিন্তু আল্লাহর নাবী ﷺ বিষয়টি জানাবার ব্যাপারে মত পরিবর্তন না করায় তাঁরা তাঁদের আলোচনার বিষয়টি তাঁর নিকট প্রকাশ করলে তিনি বললেন, (معاذ الله، المحيا محياكم، والممات مماتكم) 'আল্লাহর আশ্রয়, এখন জীবন এবং মরণ তোমাদের সঙ্গেই হবে।'

আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ : আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমগণের মক্ক বিজয় দান করেন, তখন মক্কাবাসীদের উপর একটি অধিকার সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে যায় যে ইসলাম ছাড়া কৃতকার্যতার আর কোন পথই নেই। এ জন্যই তারা ইসলামের আনুগত্য ও আজ্ঞাবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণের জন্য একত্রিত হয়। সাফা পাহাড়ে উপবিষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের আজ্ঞানুবর্তার শপথ গ্রহণ শুরু করেন। ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) নাবী করীম ﷺ-এর উপবেশন স্থানের নীচে বসে জনগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করছিলেন। লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বলে ওয়াদ করেন যে, 'আপনার আমরা শ্রবণ করব এবং সাধ্যমতো তা মান্য করে চলব।'

তফসীর মাদারেকের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ সমাপ্ত করে অবকাশ প্রাপ্ত হলেন তখন সাফা পাহাড়ের উপরেই মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ আরম্ভ করলেন। ওমর (রাঃ) নাবী করীম ﷺ-এর নীচে অবস্থান করে তাঁর নির্দেশমতো বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন এবং তাঁদের নিকট নাবী করীম ﷺ-এর বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন।

উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা বেশভূষার পরিবর্তন সহকারে আগমন করল। প্রকৃতই হামযা (রাঃ)-এর লাশের সঙ্গে সে যে গর্হিত আচরন করেছিল সে কারণেই ভীত সন্ত্রস্ত্র ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাকে চিনে ফেলেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইয়াত গ্রহণ কালে ইরশাদ করলেন, (أبايعكن على ألا تشركن بالله شـــيئا) 'আমি তোমাদের নিকট এ বলে অঙ্গীকার গ্রহণ করছি যে, আমরা কখনও আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।'

ওমর (রাঃ) ঐ কথার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন যে, তারা কখনও আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'চুরি করবে না।' এ প্রেক্ষিতে হিন্দা বলে উঠল, 'আবু সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি। তার সম্পদ থেকে তার অজানতে আমি যদি কিছু নেই তাহলে?' আবু সুফিয়ান (সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, বললেন, আমার সম্পদ থেকে তুমি যা নিয়ে নেবে তা তোমার জন্য হালাল হবে।'

হিন্দাকে চিনতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'তুমিই হিন্দা।'

হিন্দা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমিই হিন্দা।' অতীতে যা কিছু হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দিন। নাবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।'

অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন, (ولا يزنين) 'ব্যভিচার করবে না।'
প্রত্যুত্তরে হিন্দা বলল, 'আচ্ছা স্বাধীন মহিলারা কি কখনো জেনা করে?'
নাবী করীম ﷺ বললেন, (ولا يقتلن أولادهن) 'নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না।'

হিন্দা বলল, 'বাল্যকালে আমরাও তাদের লালন-পালন করছি, কিন্তু বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর আপনারা তাদের হত্যা করেছেন। এ জন্য তারা এবং আপনিই ভাল জানেন।' প্রকাশ থাকে যে হিন্দায় সন্তান হাঞ্জালা বিন আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হিন্দার মুখ থেকে এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) হাসতে হাসেত চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মৃদু মৃদু হাসলেন।

অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন, (ولا يـــأتين بـبـــهتان) 'কাউকেও মিথ্যা অপবাদ দেবেনা।' হিন্দা বলল, আল্লাহর কসম! মিথ্যা অপবাদ অত্যন্ত খারাপ কথা। আপনি বাস্তবিকই হিদায়াত এবং উত্তম চরিত্রের নির্দেশ প্রদান করছেন।' এরপর নাবী করীম ﷺ বললেন, (ولا يعصينك في معروف) 'কোন সদুপদেশে রাসূল ﷺ-এর অবাধ্য হবে না।' হিন্দা বলল, 'আল্লাহর কসম, আমরা এমন মনোভাব নিয়ে এ বৈঠকে বসি নি যে, আপনার আবাধ্য হব।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত থেকে ফিরে এসে হিন্দা তার উপাস্য মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলে। মূর্তি ভাঙ্গার সময় যে বলতেছিল, 'আমরা তোমার সম্পর্কে ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত ছিলাম। আমাদের সে ভুল এখন ভেঙ্গে গিয়েছে।"[1]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কায় অবস্থান এবং কর্ম (إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وعمله فيهـــا) : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় তৎপর থাকেন এবং মানুষকে হিদায়েত ও তাকওয়ার আদেশ দিতে থাকেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই নাবী করীম ﷺ-এর নির্দেশক্রমে আবু উসাইদ (রাঃ) খোযায়ী নতুন ভাবে হারামের সীমানার স্তম্ভ খাড়া করেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও মক্কার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। অধিকন্তু নাবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী মক্কায় ঘোষণা করতে থাকেন যে নিজ গৃহে কোন মূর্তি রাখবেন না। যদি ঘরে মূর্তি থাকে তাকে অবশ্যই তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ (السرايا والبعوث) : (১) মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার পর যখন তিনি কিছুটা অবকাশ লাভ করলেন তখন ৮ম হিজরীর ২৫ রমযান উয্যা নামক দেব মূর্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। উয্যা মূর্তির মন্দিরটি ছিল নাখলা নামক স্থানে। এটি ভেঙ্গে ফেলে খালিদ (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, (هل رأيـــت شـــيئا؟) 'তুমি কি কিছু দেখেছিলে?' খালিদ (রাঃ) বললেন, 'না' রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, (فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها) 'তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি তা ভাঙ্গ নি। পুনরায় যাও এবং তা ভেঙ্গে দাও।' উত্তেজিত খালিদ (রাঃ) কোষমুক্ত তরবারি হস্তে পনুরায় সেখানে গমন করলেন। এবারে বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত চুলবিশিষ্ট এক মহিলা তাঁদের দিকে বের হয়ে এল। মন্দির প্রহরী তাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। কিন্তু এমন সময় খালিদ (রাঃ) তরবারি দ্বারা তাকে এতই জোরে আঘাত করলেন যে, তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি এ সংবাদ অবগত করালে তিনি রললেন, (نعم، تلك العزى، وقد أيســت أن تعبد في بلادكم أبدا) 'হ্যাঁ', সেটাই ছিল ওয্যা। এখন তোমাদের দেশে তার পূজা অর্চনার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে পড়েছে (অর্থাৎ কোন দিন তার আর পূজা অর্চনা হবে না)।

২. এরপর নাবী করীম ﷺ সে মাসেই আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-কে 'সোয়া' নামক বেদমূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন। এ মূর্তিটি ছিল মক্কা হতে তিন মাইল দূরত্বে 'রেহতা' নমাক স্থানে বনু হোযাইল তখন প্রহরী একটি

---

[1] নাসাফী রচিত তাফসীর মাদাররেকে বা'ইয়াত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য :

দেবমূর্তি। আমর যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেন তখন প্রহরী জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি চাও?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর নাবী এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।'

সে বলল, 'তোমরা এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না।'

আমর বললেন, 'কেন?'

সে বলল, 'প্রাকৃতিক নিয়মেই তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে।'

আমর বললেন, 'তোমরা এখনও বাতিলের উপর রয়েছ? তোমাদের উপর দুঃখ, এই মূর্তিটি কি দেখে কিংবা শোনে?'

অতঃপর মূর্তিটির নিকট গিয়ে তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন এবং সঙ্গীসাথীদের নির্দেশ প্রদান করলেন ধন ভাণ্ডার গৃহটি ভেঙ্গে ফেলতে। কিন্তু ধন-ভাণ্ডার থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি প্রহরীকে বললেন, 'বল, কেমন হল?'

সে বলল, 'আল্লাহর দ্বীন ইসলাম আমি গ্রহণ করলাম।'

৩. এ মাসেই সা'দ বিন যায়েদ আশহলী -এর নেতৃত্বে বিশ জন ঘোড়সওয়ারী সৈন্য প্রেরণ করেন মানাত দেবমূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। কোদাইদের নিকট মোশাল্লাল নামক স্থানে আওস, খাযরাজ, গাসসান এবং অন্যান্য গোত্রের উপাস্য ছিল এ 'মানত' মূর্তি। সা'দ -এর বাহিনী যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেন তখন মন্দিরের প্রহরী বলল, 'তোমরা কি চাও?'

তাঁরা বললেন, 'মানাত বেদমূর্তি ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি।'

সে বলল, 'তোমরা জান এবং তোমাদের কার্য জানে।'

সা'দ মানাত মূর্তির দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে একজন উলঙ্গ কালো ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেলেন। সে আপন বক্ষদেশ চাপড়াতে চাপড়াতে হায়! রব উচ্চারণ করছিল।

প্রহরী তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মানত! তুমি এ অবাধ্যদের ধ্বংস কর।'

কিন্তু এমন সময় সা'দ তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেন। ধন-ভাণ্ডারে ধন-দৌলত কিছুই পাওয়া যায় নি।

৪. উয্যা নামাক দেবমূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার পর খালিদ বিন ওয়ালীদ প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ ৮ম হিজরী শাওয়াল মাসেই বনু জাযামাহ গোত্রের নিকট তাঁকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণ না করে ইসলাম প্রচার। খালিদ মুহাজির, আনসার এবং বনু সোলাইম গোত্রের সাড়ে তিনশ লোকজনসহ বনু জাযীমাহর নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা (ইসলমা গ্রহণ করেছি) বলার পরিবর্তে (আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছি, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছি) বলল। এ কারণে খালিদ তাদের হত্যা এবং বন্দী করতে আদেশ দিলেন। তিনি সঙ্গী সাথীদের এক একজনের হস্তে এক এক জন বন্দীকে সমর্পণ করলেন। অতঃপর এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকটে সমর্পিত বন্দীকে হত্যা করবে। কিন্তু ইবনু ওমর এবং তাঁর সঙ্গীগণ এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর যখন নাবী করীম -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি দুই হাত উত্তোলন করে দুইবার বললেন, (اللهم إِنِّي أبرأ إليك مما صــنع خالــدًا) 'হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা হতে তোমার নিকটে নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি।'[১]

এ পরিস্থিতির শুধুমাত্র বনু সোলাইম গোত্রের লোকজনই নিজ বন্দীদের হত্যা করেছিল। আনসার ও মহাজেরীনগণ হত্যা করেন নি। রাসূলুল্লাহ আলী -কে প্রেরণ করে তাদের নিহত ব্যক্তিদের শোণিত খেসারত এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে খালিদ ও আব্দুর রহমান বিন আওয়ফ

---

[1] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড ৬২২ পৃষ্ঠা।

(রাঃ)-এর মাঝে কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এবং সম্পর্কের অবণতি হয়েছিল। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا، ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجـــل من أصحابي ولا روحته)

'খালিদ থেমে যাও, আমার সহচরদের কিছু বলা হতে বিরত থাক। আল্লাহর কসম! যদি ওহুদ পাহাড় সোনা হয়ে যায় এবং তার সমস্তই তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করে দাও তবুও আমার সাহাবাদের মধ্য হতে কোন এক জনেরও এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যার ইবাদতের নেকী অর্জন করতে পারবে না।[1]

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত মীমাংসাকারী যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ই ছিল প্রকৃত বিজয় যা মুশরিকদের শক্তিমত্তা ও অহংকারকে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল যে, আরব উপদ্বীপে শিরক বা মূর্তিপূজার আর কোন অবকাশ ছিল না। কারণ, মুসলিম ও মুশরিক এ উভয় পক্ষ বহির্ভূত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল যে, মুসলিম ও মুশরিকদের সংঘাতের পরিণতিটা কি রূপ নেয়। সাধারণ গোষ্ঠিভূক্ত মানুষ এটা ভাল ভাবেই অবগত ছিল যে, যে শক্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেবলমাত্র সে শক্তিই হারামের উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। তাদের বিশ্বাসকে অধিক বলীয়ান করেছিল অর্ধশতাব্দী পূর্বে সংঘটিত আবরাহ ও তার হস্তী বাহিনীর ঘটনা। আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান হস্তীবাহিনী কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তা তৎকালীন আরবাসীগণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিল।

প্রকাশ থাকে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ছিল এই বিরাট বিজয়ের চাবি কাঠি। এ সন্ধি চুক্তির ফলেই শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, মানুষ প্রকাশ্যে একে অন্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এবং ইসলাম সম্পর্কে মত বিনিময় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মক্কায় যাঁরা গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এ চুক্তির ফলে তাঁর স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে প্রাকাশ্যে কথাবার্তা বলা ও প্রচারে সুযোগ লাভ করেন, এ চুক্তির ফলে শান্তি ও নিরাপত্তার একটি বাতাবরণ সৃষ্টি ফলে বহু লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ফলে ইসলামী সৈন্যের সংখ্যাও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। ইতোপূর্বে যেক্ষেত্রে কোন যুদ্ধই তিন হাজারের বেশী মুসলিম সৈন্যের সমাবেশ সম্ভব হয় নি সেক্ষেত্রে মক্কা বিজয়ের অভিযানে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য অংশ গ্রহণ করেন।

এ মীমাংসাকারী যুদ্ধ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্ট পর্দা যা ইসলাম গ্রহণের পথে চিল একটি বিরাট অন্ত রায়স্বরূপ উন্মোচিত করে দিয়েছিল। এ বিজয়ের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গগণ প্রদীপ্ত সূর্যালোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মক্কা বিজয়ের পর ধর্মীয় ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব মুসলিমগণের হাতে এসে গিয়েছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পর মুসলিমগণের অনুকূলে পরিবর্তনের যে সহায়ক ধারা সূচিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে। অধিকন্তু, এ বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপে মুসলিমগণের অধিকার ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যার ফলে আরবের গোত্রসমূহের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা রইল যে, তারা বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধির আকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের দাওয়াত কবুল করবে এবং ইসলামের বিস্তৃতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে।

---

[1] এ যুদ্ধ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নো উৎস সমূহ থেকে নেয়া হয়েছে। ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৮৯-৪৩৭ পৃঃ, সহীহ বুখারী ১ম ও জিহাদ পর্ব এবং হজ্জ ২য় খণ্ড ৬১২-৬২৫ পৃঃ, ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৩-২৭ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৩৭-৪৩৯ পৃঃ, ২য় খণ্ড ১০২, ১০৩, ১৩০ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১৬০-১৬৮ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মুখতাসারুস সীরাহ ৩২২-৩৫১ পৃঃ।

المرحلة الثالثة

তৃতীয় স্তর

এ স্তর হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত জীবনের শেষ স্তর যা তাঁর ইসলামী দাওয়াতের সে ফলাফল সমূহের প্রতিনিধিত্ব করে যা দীর্ঘ তেইশ বছরের কঠোর পরিশ্রম, অজস্র সমস্যা ও সংকট নিরসন,, অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিলেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ছিল অবিমিশ্র বিজয় ও কৃতকার্যতার অভূতপূর্ব ও অভাবিতপূর্ব ঘটনার সমাহার। তবে এসবের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কৃতকার্যতা ছিল মক্কা বিজয়। প্রকৃতপক্ষে এ বিজয় ছিল বিজয়পূর্ব এবং বিজয়োত্তর দুই যুগের মধ্যে যুগসৃষ্টিকারী একটি ঘটনা এবং দুই বৈপরীত্যের সীমান্ত রেখা। আরব অধিবাসীগণের দৃষ্টিতে কুরাইশগণ ছিল দ্বীনের সংরক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক, কুরাইশগণের পরাজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপের জনগণের মূর্তিপূজার ভিত, চিরতরে উৎপাটিত হয়ে গেল এবং ইসলামের ভিত সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

এই শেষের স্তরকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় :

(১) সাধনা এবং লড়াই ও

(২) ইসলাম গ্রহণের জন্য জাতি এবং গোত্র সমূহের দৌড়।

এই দুই পরিস্থিতির এক অন্যের সঙ্গে বিজড়িত এবং এ স্তরের মধ্যে আগের পিছনের এবং একে অন্যের মাঝেও সংঘটিত হয়ে এসেছে। তবে এ পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা একটি থেকে অন্যটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করব। কাজেই পিছনের আলোচনা গুলোতে যে সংগ্রাম যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে পরবর্তী যুদ্ধ তারই আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপটে আলোচিত হবে।

غزوة حنين

হোনাইন যুদ্ধ :

মুসলিমগণের মক্কা বিজয় এক আকস্মিক অভিযানের ফলশ্রুতি। যার ফলে আরব গোত্রসমূহ প্রায় হতভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাদের এবং পার্শ্ববর্তী গোত্র সমূহের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে, তারা এ আকস্মিক অভিযানকে প্রতিহত করতে পারে। এ কারণে কিছু সংখ্যক জেদী অপরিণামদর্শী ও আত্মগর্বী গোত্র ছাড়া আর সব গোত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। এই জেদী ও আত্মগর্বী গোত্রগুলোর মধ্যের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল হাওয়াযেন এবং সাকাফ গোত্র। এদের সঙ্গে মুযার জোশাম এবং সায়াদ বিন বকরের গোত্রসমূহ এবং বনু হেলালের কিছু সংখ্যক লোক। এই সব গোত্রের সম্পর্ক ছিল কাইসে আইলানের সঙ্গে। পরাজয় স্বীকার ক'রে মুসলিমগণের নিকট আত্মসমর্পণ করাকে তারা অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে করছিল। এ কারণে ঐ সকল গোত্র মালেক বিন আওফ নাসরীর নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা মুসলিমগণকে আক্রমণ করবে।

শত্রুদের যাত্রা এবং আওতাস নামক স্থানে শিবির স্থাপন (مُجَرِّب الحروب يُغَلِّط رأي القائد) : এ সিদ্ধান্তের পর মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ ক'রে মালেক বিন আওফের নেতৃত্বে তারা যাত্রা করল। সম্পাদাদি, গবাদি, শিশু সন্তানেরাও ছিল তাদের সঙ্গে। সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হয়ে তারা আওতাস উপত্যকায় শিবির স্থাপন করল। এটি হোনাইনের নিকটে বনু হাওয়াযেন গোত্রের অঞ্চলভূক্ত একটি উপত্যকা। কিন্তু এ উপত্যকাটি হোনাইন হতে পৃথক। হোনাইন হচ্ছে অন্য একটি উপত্যকা যা যুল মাজায নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত। সেখান থেকে আরাফাতের পথ দিয়ে মক্কার দূরত্ব দশ মাইলেরও বেশী।[১]

সমর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক সেনাপতির ত্রুটি বর্ণনা : আওতাসে অবতরণের পর লোকজনেরা তাদের নেতার নিকট একত্রিত হল। তাদের মধ্যে দোরাইদ বিন সেম্মাও ছিল। এ ব্যক্তি অত্যন্ত বার্ধক্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই, যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যাদি অবগত হয়ে পরামর্শ দান ছাড়া আর কোন কিছুই করার উপযুক্ততা তার ছিল না। কিন্তু প্রকৃতই সে ছিল একজন বাহাদুর দাঙ্গাবাজ ও বিজ্ঞ যোদ্ধা। সে জিজ্ঞেস করর তোমরা কোন উপত্যকায় অবস্থান করছ?' উত্তর দেয়া হল, 'আওতাস উপত্যকায়।' সে বলল, 'ঘোড়সওয়ারীদের জন্য উত্তম ভ্রমণ স্থান বটে। না, কঙ্করময়, না খানা খন্দক বিশিষ্ট, না খারাপ নিম্নভূমি। কিন্তু ব্যাপারটি কি যে, আমি উটের উচ্ছ্বাস ধ্বনি, ঘাধার চিৎকার, শিশুদের ক্রন্দন এবং বকরীর ব্যা ব্যা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি?'

লোকজনেরা বলল, 'মালেক বিন আওফ সৈন্যদের সঙ্গে তাদের মহিলাদের, শিশুদের, গবাদি এবং সম্পাদাদি নিয়ে এসেছেন। এ প্রেক্ষিতে দোরাইদ মালেক ইবনু আওফাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি ভেবে এমন কাজ করেছ?'

সে বলল, 'আমি চিন্তা করেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবার এবং সম্পাদাদি থাকবে, যাতে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের উত্তেজনা নিয়ে তারা যুদ্ধ করে।'

দোরাইদ বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি ভেড়ার রাখাল বটে, যুদ্ধে যদি পরাজিত হও তাহলে কোন বস্তু কি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে? দেখ! আর যদি তুমি যুদ্ধে বিজয়ী হও তাহলে তলোয়ার এবং বর্শা দ্বারাই তো তুমি উপকৃত হতে। আর যদি পরাজয় বরণ কর তাহলে তোমাদের পরিবার পরিজন এবং সহায় সম্পদ সর্ব ব্যাপারেই অপমানের শিকার হতে হবে।

অতঃপর কতগুলো গোত্র এবং নেতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পর দোরাইদ বলল, 'হে মালেক! তুমি বনু হাওয়াযেন গোত্রের মহিলা এবং শিশুদেরকে ঘোড়সওয়ারীদের গলায় ঝুঁলিয়ে নিয়ে এসে খুব একটা ভাল কাজ কর

---

[1] ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ২৭ ও ৪২ পৃঃ।

নি। তাদেরকে তাদের অঞ্চলে উচ্চ ও সংরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দাও। এরপর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হও। যদি তোমরা জয়ী হও তাহলেও তোমাদের পরিবারবর্গ ধন সম্পদ এবং গবাদিগুলো সংরক্ষিত থাকবে।'

কিন্তু জেনারেল কমাণ্ডার মালেক এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি এমনটি করব না। তুমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছ এবং তোমার বিচার বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। আল্লাহর শপথ! হয় হাওয়াযেন আমার আনুগত্য করবে, নতুবা আমি এই তলোয়ারের উপর নির্ভর করব এবং তা আমার পিঠের এক দিক হতে অপর দিকে বেরিয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে মালেক এটা সহ্য করতে পারল না যে, এই যুদ্ধে দোরাইদের সুনাম হবে কিংবা ওর পরামর্শ মতো কাজ করতে হবে। হাওয়াযেন বলল, 'আমরা তোমার আনুগত্য করছি। এর প্রেক্ষিতে দোরাইদ বলল, 'এ এমন যুদ্ধ যাতে আমি অংশ গ্রহণ তো করবই না, বরং মনে করব যে, আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে।'

يا ليتنـي فيها جـذَعْ ** أخُبُّ فيها وأضَعْ

أقود وطْفاءَ الزَّمَـعْ ** كأنها شـاة صَدَعْ

দুঃখ আমি এ সময় যুবক হতাম, পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতাম। পায়ের লম্বা চুল বিশিষ্ট এবং মধ্যম প্রকারের বকরীর মতো ঘোড়ার পরিচালনা করতাম।

শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা (سلاح استكشـاف العـدو) : এরপর মালেকের ঐ গোয়েন্দা আসলে যাদের প্রেরণ করা হয়েছিল মুসলিমগণের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্য তারা প্রত্যাবর্তন করল। তাদের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি ছিল যে, তাদের হাত,পা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সন্ধিস্থলে ও চিড় ধরে গিয়েছিল। তাদের এ অবস্থা দেখে মালেক বলল, 'তোমরা ধ্বংস হও, তোমাদের এ কি অবস্থা হয়েছে? তারা বলল, 'আমরা যখন কিছু সংখ্যক সাদা-কালো মিশ্রিত ঘোড়ার উপর সাদা মানুষ দেখেছি আল্লাহর কসম! তখন থেকে আমাদের এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা তুমি প্রত্যক্ষ করছ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোয়েন্দা (سلاح استكشاف رسول اللـه ﷺ) : এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও শত্রুদের অবস্থানের খবর প্রাপ্ত হয়ে আবু হাদরাদ আসালামী (রাঃ)-কে এ নির্দেশপ্রদান করে প্রেরণ করলেন যে, মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অবস্থান করবে এবং তাদের সঠিক খোঁজ খবর নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর তা তাঁকে অবহিত করবে।' প্রাপ্ত নির্দেশ মোতাবেক তিনি তাই করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা হতে হোনাইনের পথে (الرسول ﷺ يغادر مكة إلى حنين) : ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা হতে রওয়ানা হলেন। এটি ছিল মক্কা আগমনের ঊনিশতম দিবস। নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিল বার হাজার সৈন্য। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সঙ্গে এনেছিলেন দশ হাজার সৈন্য এবং মক্কার নও মুসলিমগণের মধ্য হতে সংগ্রহ করেছিলেন আরও দুই হাজার সৈন্য। এই যুদ্ধের জন্য নাবী করীম ﷺ সফওয়ান বিন উমায়ার নিকট হতে একশ লৌহ বর্ম নিয়েছিলেন এবং আত্তাব বিন আসীদকে মক্কর গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন।

দুপুরের পর এক ঘোড়সওয়ারী এসে খবর দিলেন যে, 'আমি অমুক অমুক পর্বতের উপর আরোহণ করে প্রত্যক্ষ করলাম যে, বনু হাওয়াযেন গোত্র চ্যাট প্যাট সহ যুদ্ধের ময়দানে আগমন করেছে। মহিলা, শিশু, গবাদি সব কিছুই তাদের সঙ্গে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন, (تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شـاء الله)। 'আল্লাহ চায় তো এর সব কিছুই গণীমত হিসেবে কাল মুসলিমগণের হাতে এসে যাবে।' দিন শেষে রাতের বেলা আনাস বিন আবি মুর্শেদ গানাভী (রাঃ) স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নৈশ্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেন।[1]

---

[1] আওনুল মাবুদ সহ আবু দাউদ দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ড ৩১৭ পৃঃ। আল্লাহর পথে প্রহরীর মর্যাদা অধ্যায়।

হোনাইন যাওয়ার পথে লোকজনেরা একটি বেস বড় বড় আকারের সতেজ কুলের গাছ দেখতে পেল। তৎকালে এ গাছকে যাতো আনওয়াত বলা হত। আরবের মুশরিকগণ এর উপর নিজেদের অস্ত্র শস্ত্র ঝুঁলিয়ে রাখত, ওর নিকট পশু যবেহ করত, মন্দির তৈরি করত, এবং মেলা বসাত। মুসলিম বাহিনীল মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, 'আমাদের জন্য আপনি যাতো আনওয়াত তৈরি করে দিন যেমনটি তাদের জন্য রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسي: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قــوم تجهلون، إنها السَّنَنُ، لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم).

'আল্লাহ অকবর! সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন তোমরা ঠিক সেরূপ কথা বলেছ, যেমন বলেছিল মুসা (عليه السلام)-এর কওম, 'ইজ্‌আল লানা ইলা হান, কামা লাহুম আ লিহাহ' (আমাদের জন্য উপাস্য তৈরি করে দিন যেমন তাদের জন্য উপাস্য রয়েছে।অঃ) এটাই রীতিনীতি। তোমরাও পূর্বের রীতিনীতির উপর অবশ্যই আরোহণ করে বসবে।[1]

ইসলামী সৈন্যদের উপর হঠাৎ তীর নিক্ষেপ (الجيش الإسلامي يُباغَتُ بالرمـــاة والمهـــاجمين) : মঙ্গলবার ও বুধবার পথ চলার পর ১০ই শাওয়াল মধ্য রাত্রি মুসলিম বাহিনী হোনাইনে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু মালেক বিন আওফ পূর্বেই তারা বাহিনী নিয়ে সেখানে অবতরণ করে এবং রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তারা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোতায়েন করে দেয়। অধিকন্তু, তাদের এ নির্দেশও প্রদান করা হয় যে, মুসলিম বাহিনী উপত্যকায় অবতরণ করা মাত্রই যেন প্রবলভাবে তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করে তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হয় এবং একযোগে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

এদিকে সাহরীর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করে নিলেন এবং পতাকা বেঁধে লোকজনের মধ্যে বিতরণ করলেন। অতঃপর সকালে মুসলিম বাহিনী দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে হোনাইন উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল না। তাঁরা জানতেন না যে, শত্রুপক্ষের সাকীক ও হাওয়াযেন গোত্রের বীর সৈনিকগণ এ উপত্যকায় সংকীর্ণ গিরিপথে অবস্থান গ্রহণ করেছে অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিতভাবে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। এ কারণে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তেই তাঁরা সেখানে অবতরণ করছিলেন। এমন সময় আকস্মিকভাবে তাঁদের তীর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু দলে দলে তাঁদের উপর এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকস্মিক এ আক্রমণের প্রচণ্ডতা সামলাতে না পেরে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ অবস্থায় এমনভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকল যে কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য করল না। এ ছিল এক পর্যুদস্ত অবস্থা এবং অবমাননাকর পরাজয়। এমন কি আবু সুফিয়ান বিন হারব (যনি নতুন মুসলিম হয়েছিলেন) বললেন, 'এখন তাদের দৌড়াদৌড়ি সমুদ্রের আগে থামবে না। জাবলা অথবা কুলদাহ বিন জোনাইদ চিৎকার করে বললেন, 'দেখ, জাদু বাতিল হয়ে গেল।' ইবনু ইসহাকের বর্ণনাসূত্রে এ তথ্য জানা যায়, বারা' বিন আয়েব (رضي الله عنه) হতে যে বর্ণনা সহীহ বুখারীতে পাওয়া যায় তা কিছুটা ভিন্নতর। এ বর্ণনায় আছে যে হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীর নিক্ষেপ অত্যন্ত পটু ছিল। আমরা যখন তাদের আক্রমণ করলাম তখন তারা পলায়ন করতে উদ্যত হল। এরপর আমরা যখন যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে ব্যাপৃত হলাম তখন তারা আমাদের উপর উপর্যুপরি তীর নিক্ষেপ শুরু করল।[2]

আনাস (رضي الله عنه) হতে সহীহ মুসলিমে যে বিবরণটি বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু অনেকাংশে তা সম-অর্থবোধক প্রতীয়মান হয়। অনাস (رضي الله عنه)-এর বর্ণনা হচ্ছে, 'আমরা মক্কা বিজয় করলাম। অতঃপর হোনাইনের উপর আক্রমণ চালালাম। মুশরিকগণ এত সুশৃঙ্খল ও শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় আগমন

---

[1] তিরমিযী বাবুল ফিতান, তোমরা পুর্বপুরুষদের নিয়ম মেনে চলবে, প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড ৪১ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী বাবু ইয়াওমা হোনাইনিন ইয আ'জাবাতকুম ,..... অধ্যায় ।

করল যা ইতোপূর্বে আর কখনই দেখি নি। সর্বাগ্রে ঘোড়সওয়ারীদের তার ঠিক পিছনেই পদাতিক সৈন্যদের শ্রেণী, তার পিছনে মহিলঅ, তার পিছনে ভেড়া এবং বকরী এবং সব শেষে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু।

আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক। আমাদের ঘোড়সওয়ারীদের দক্ষিণভাগে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)। কিন্তু আমাদের ঘোড়সওয়ারীগণ আমাদের পশ্চাদ্ভাগে আশ্রিত হতে চাইলেন অতঃপর পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। বেদুঈনরাও পলায়ন করল। ঐ সকল লোকজনও যাদেরকে তুমি জান।[1]

যাহোক, যখন দৌড় ঝাঁপ অরম্ভ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ডান দিক থেকে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, 'ওহে লোকজনেরা! আমার দিকে এস, আমি মুহাম্মদ (ﷺ) বিন আব্দুল্লাহ। ঐ সময় কিছু সংখ্যক মুহাজির এবং পরিবারের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ছিলেন না।[2]

উল্লেখিত সংকটপূর্ণ সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে তেজোদীপ্ততা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন তার কোন তুলনা ছিল না। মুসলিম বাহিনী ইতস্তত বিক্ষিপ্ততা এবং দৌড় ঝাঁপের মুখেও তিনি ছিলেন অচল অটল ও শত্রু অভিমুখী এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁর খচ্চরকে উত্তেজিত করতে থাকেন। এ সময় তিনি বলতেছিলেন

(أنـــا النبي لا كَذِبْ ** أنا ابن عبد المطلبْ)

অর্থ : আমি সত্যই নাবী, মিথ্যা নই, আমি আব্দুল মুত্তালিব পুত্র।

কিন্তু সে সময় আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রাঃ) নাবী করীম (ﷺ)-এর খচ্চরকে লাগাম ধরে টেনে রেখেছিলেন এবং আব্বাস (রাঃ) খচ্চরের রেকাব ধরে তাকে থামিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা উভয়েই এ কারণে খচ্চরকে থামিয়ে রেখেছিলেন যেন সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে না যায়।

মুসলিমগণের প্রত্যাবর্তন ও অভিযানের জন্য জেগে ওঠা (رجوع المسلمين واحتدام المعركة) :

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আপন চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করলেন সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উচ্চস্বরে আহ্বান জানাতে। (তিনি ছিলেন দরাজ কণ্ঠ বিশিষ্ট)। আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানালাম, 'ওহে বৃক্ষ- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। (বাইয়াত রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীবৃন্দ) কোথায় আছ? আল্লাহর কসম! আমার কণ্ঠ শ্রবণ করা মাত্র তার এমনভাবে ফিরে এল বাচ্চার ডাক শুনে গাভী যেমনটি ফিরে আসে এবং উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা আসছি'। এ সময় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে কোন ব্যক্তি যদি তাঁর উটকে ফিরানোর চেষ্টা করেও ফিরাতে সক্ষম না হলে তিনি নিজ লৌহ বর্ম তার গলায় নিক্ষেপ করে নিজ ঢাল ও তলোয়ার সামলিয়ে নিয়ে উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ত এবং উপকে ছেড়ে দিয়ে এ শব্দের দৌড় দিতে থাকত। এভাবে সমবেত হয়ে যখন নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট একশ লোকের সমাবেশ ঘটল তখন তাঁরা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন।

এরপর শুরু হল আনাসরদের প্রতি আহ্বান, 'এসো, এসো আনসারের দল দ্রুত এগিয়ে এসো।' আনসারদের উদ্দেশ্যে উচ্চাতি এ আহ্বান বনু হারেস বিন খাযরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এ দিকে মুসলিম সৈন্যগণ যে গতিতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন[3] ঠিক সে গতিতেই পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করতে থাকলেন।

---

[1] ফতহুল বারী ৮ম হিজরী ২৯ পৃঃ।

২৫৯ ইবনু ইসহাক প্রদত্ত তথ্য মোতাবেক তাঁদের সংখ্যা ছিল নয় কিংবা দশ জন। নববী বলেছেন যে, নাবী করীম (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন বার জন। হাকিম ইবনু মাসউদ হতে ইমাম আহমদ বর্ণণা করেছেন 'হোনাইনের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। লোকজনেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করছিল। কিন্তু মাহজির ও আনসারদের একটি দল নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট অটল ছিলেন। আমরা ছিলাম পদাতিক এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি নাই। উত্তম সনদ সূত্রে তিরমিযী ইবনু ওমরের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবরণে আছে যে, 'হোনাইন দিবসে অমি আমাদের লোকজনের পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বখ পলায়ন করতে দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এক শত লোকও ছিল না। ফতহুল বারী ৮ম হিজরী ২৮-৩০ পৃঃ।

[3] সহীহ কুভারী ২য় খণ্ড ১০০পৃঃ।

দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে কালো ধোঁয়ার স্রোতের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ময়দানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এখন চুলা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।' প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে তখন চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর তিনি জমিন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তা শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করে দিয়ে বললেন, 'শাহাতিল উজুহ' 'মুখমণ্ডল বিকৃত হোক '। এ এক মুষ্টি মাটি এমনভাবে বিস্তার লাভ করল যে, শত্রুপক্ষের এমন কোন লোক ছিল না যার চক্ষু এ মাটি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়নি। এরপর থেকে তাদের যুদ্ধোন্মাদনা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হতে থাকে এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়।

শত্রুদের শোচনীয় পরাজয় (انكسار حدة العدو وهزيمته الساحقة) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাটি নিক্ষেপের কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুদের পরাজয়ের ধারা সূচিত হয়ে গেল এবং আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হতে না হতেই তার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। সাকীফের সত্তর জন লোক নিহত হল এবং তাদের সঙ্গে যা কিছু সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্র, মহিলা, শিশু এবং গবাদি ছিল সবই মুসলিমগণের হস্তগত হল। এটাই হচ্ছে সে পরিবর্তন, যে সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলা কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন,

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة:٢٥، ٢٦]

'বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদেরকে বহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন আর হুনায়নের যুদ্ধের দিন, তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোমাদেরকে গর্বে মাতোয়ারা করে দিয়েছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা নিয়ে তোমাদের কাছে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পিছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রসূলের উপর, আর মু'মিনদের উপর তাঁর প্রশান্তির অমিয়ধারা বর্ষণ করলেন, আর পাঠালেন এমন এক সেনাবাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি, আর তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকেন।' [আত্‌তাওবাহ (৯) : ২৫-২৬]

পশ্চাদ্ধাবন (حركة المطاردة) : পরাজিত হওয়ার পর শত্রুদের একটি দল তায়েফ অভিমুখে চলে যায়। অন্য একটি দল নাখলার দিকে পলায়ন করে অধিকন্তু অন্য একটি দল আওতাসের পথ ধরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু আমর আশয়ারী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি পশ্চাদ্ধাবনকারী দল আওতাসের দিকে প্রেরণ করেন। উভয় দলের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষের পর মুশরিক দল পলায়নে উদ্যত করেন। তবে এ সংঘর্ষে দলনেতা আবু আমের আশয়ারী (রাঃ) শহীদ হয়ে যান।

মুসলিম ঘোড়সওয়ারীদের একটি দল নাখলার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দোরাইদ বিন মিম্মাহকে পাকড়াও করেন যাকে রাবিয়া বিন রাফী হত্যা করেন।

পরাজিত মুশরিকগণের তৃতীয় এবং সব চাইতে বড় দলটির পশ্চাদ্ধাবন যাঁরা তায়েফের পথে গমন করেন যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ একত্রিত করার পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করেন।

গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (الغنائم) : গণীমতের মধ্যে ছিল যুদ্ধ বন্দী ছয় হাজার উট, বিশ হাজার বকরি, চল্লিশ হাজারেও বেশী ছিল এবং রৌপ্য চার হাজার উকিয়া (অর্থাৎ এক লক্ষ ষাট হাজর দিরহাম যার পরিমাণ ছয় কুইন্টাল কয়েক কেজি কম হয়) রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল সম্পদ একত্রিত করার নির্দেশ প্রদান কনের। অতঃপর সেগুলো জেয়েররানা নামক স্থানে জমা রেখে মাসউদ বিন আমর গেফারীকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তায়েফ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং অবসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি গণীমত বন্টন করেন।

যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ বোন শায়মা বিনতে হারেস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনীত হয়ে সে নিজ পরিচয় পেশ করলে তিনি তার একটি পরিচিত চিহ্নের মাধ্যমে তাকে সহজেই চিনতে

পারলেন এবং নিজ চাদর বিছিয়ে তার উপর স্বসম্মানে বসালেন। অতঃপর তাকে তার কওমের নিকট ফেরত পাঠালেন।

তায়েফ যুদ্ধ (غزوة الطائف) :

প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধ ছিল হোনাইন যুদ্ধেরই বিস্তরণ। যেহেতু হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রের অধিক সংখ্যক পরাস্ত ফৌজ মুশরিক বাহিনীর কমাণ্ডার মালেক বিন আওফ নাসরীর সঙ্গে পলায়ন করে তায়েফে গিয়েছিল এবং সেখানেই দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের ব্যস্ততা থেকে অবকাশ লাভের পর তায়েফের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং এ ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসেই তায়েফের উদ্দেশ্যে এক বাহিনী প্রেরণের মনস্থ করলেন।

প্রথমে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্যর এক তেজস্বী বাহিনী প্রেরণ করলেন। অতঃপর নাবী ﷺ নিজেই তায়েফ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথের মধ্যে নাখলা ইয়ামানিয়া, কারনে মানাযিল, লিয়াহ প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে গমন করেন। লিয়াহ নামক স্থানে মালেক বিন আওফের একটি দূর্গ ছিল। নাবী করীম ﷺ দূর্গটি ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর ভ্রমন অব্যাহত রেখে তায়েফে গিয়ে পৌছেন এবং তায়েফের দূর্গের নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করে দূর্গ অবরোধ করে রাখলেন। অবরোধ ক্রমে ক্রমে দীর্ঘায়িত হতে থাকে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবরোধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কোন কোন চরিতকার এ অবরোধের সময়সীমা বিশ দিন বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদের মধ্য থেকে কেউ কেউ দশ দিনের অধিক, কেউ কেউ আঠার দিন এবং কেউ কেউ পনের দিন বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

অবরোধ চলাকালে উভয় পক্ষ হতে তীর নিক্ষেপ এবং প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের মতো ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে থাকে। প্রথমাবস্থায় মুসলিমগণ যখন অবরোধ শুরু করেন তখন দূর্গের মধ্য থেকে তাঁদের উপর এত অধিক সংখ্যক তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল যেন টিড্ডী দল ছায়া করেছে। এতে কিছু সংখ্যক মুসলিম আহত হন এবং বার জন শহীদ হন। কবর উঠিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে বর্তমান তায়েফের মসজিদের নিকট নিয়ে যেতে হয়।

এ পরিস্থিতি হতে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম ﷺ তায়েফবাসীদের উপর মিনজানিক যন্ত্র ব্যবাহারের মাধ্যমে একাধিক গোলা নিক্ষেপ করেন। যার ফলে দূর্গের দেয়ালে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মুসলিমগণের একটি দল দাবাবার মধ্যে প্রবেশ করে আগুন জ্বালানোর জন্য দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু শত্রুগণ তাঁদের উপর লোহার উত্তপ্ত টুকরো নিক্ষেপ করতে থাকে, ফলে কিছু সংখ্যক মুসলিম শহীদ হয়ে যান।

শত্রুদের ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ভিন্নতর কৌশল হিসেবে আঙ্গুর ফলের বৃক্ষ কর্তন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু মুসলিমগণ অধিক সংখ্যক বৃক্ষ কর্তন করে ফেললে সাকীফ গোত্র আল্লাহ ও আত্মীয়তার বরাত দিয়ে বৃক্ষ কর্তন বন্ধ করার জন্য আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মঞ্জুর করেন।

অবরোধ চলা কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা দেন যে, যে গোলাম দূর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করবে সে মুক্ত বা স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে তেইশ ব্যক্তি দূর্গ থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমগণের দলভূক্ত হয়।[২] এদের মধ্যেই ছিলেন আবু বাকরাহ (রাঃ) দূর্গ হতে দেয়ালের উপর উঠে চরকার সাহায্যে (যার মাধ্যমে কূয়া হতে পানি উত্তোলন করা হয়) ঝুঁলে পড়ে নীচে নামতে সক্ষম হন। যেহেতু ঘারারীকে আরবী ভাষায় বাকরাহ বলা হয় সেহেতু নাবী করীম ﷺ তাঁর নাম রেখেছিলেন আবু বাকরাহ। এ সকল গোলামকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্ত করে দিয়ে এক একজনকে এক একজন মুসলমানের নিকট সমর্পণ করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল তারা তাদের প্রয়োজনের জিনিস পরস্পরকে পৌঁছে দেবে। এ ঘটনা ছিল দূর্গওয়ালাদের জন বড়ই দুর্বলতার পরিচায়ক।

---

[1] ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৪৫ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ২৬০ পৃঃ।

অবরোধ দীর্ঘায়িত হতে থাকলে এবং দূর্গ আয়ত্ত করার কোন সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হল না, অথচ মুসলিমগণের উপর তীর এবং উত্তপ্ত লোহার আঘাতদ আসতে থাকল। উপরন্তু দূর্গাবাসীগণ পুরো এক বছরের জন্য পানীয় এবং খাদ্য সম্ভার মজুদ করে নিয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নওফাল বিন মোয়াবিয়া দোয়েলীর পরামর্শ তলব করলেন। তিনি বললেন, 'খেঁকশিয়াল নিজ গর্তে প্রবেশ করেছে। আপনি যদি এ অবস্থার উপর অটল থাকেন তাহলে তাদের ধরে ফেলতে পারবেন, আর যদি ছেড়ে চলে যান তাহলেও তারা আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবরোধ শেষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন যে, আগামী কাল মক্কা প্রত্যাবর্ত করতে হবে। কিন্তু এ ঘোষণায় সাহাবীগণ (রাঃ) সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'তায়েফ বিজয় না করেই আমরা প্রত্যাবর্তন করব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (اغدوا على القتال)، : 'তাহলে আগামী কাল সকালে যুদ্ধ শুরু করতে হবে।' কাজেই, দ্বিতীয় দিবস মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য গেলেন। কিন্তু আঘাত খাওয়া ছাড়া কোনই সুবিধা করা সম্ভব হল না। এ প্রেক্ষিতে নাবী করীম ﷺ বললেন, (إنا قافلون غداً إن شاء الله) 'ইন-শা-আল্লাহ আমরা আগামী কাল প্রত্যাবর্তন করব।'

নাবী করীম ﷺ-এর এ প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হলেন এবং কোন আলাপ আলোচনা ব্যতিরেকেই প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসতে থাকলেন। এরপর লোকজনেরা যখন তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন তখন নাবী করীম ﷺ বললেন যে, তোমরা বলতে থাক, (آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون) আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তৌবাকারী, উপাসনাকারী এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।

বলা হল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাকিফদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করুন। নাবী করীম ﷺ বললেন, (اللّهم اهد ثقيفا، وائت بهم)'হে আল্লাহ, সাকিফদের হিদায়াত কর এবং তাদেরকে নিয়ে এসো।'

জি'রানা নামক স্থানে গনীমত বন্টন (قسمة الغنائم بالجِعْرَانَة) : তায়েফ অবরোধ পর্ব সমাপনান্তে নাবী করীম ﷺ ফিরে আসেন। গনীমত বন্টন ব্যতিরেকেই জেয়েররানা নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। এ বিলম্বের কারণ ছিল হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধিদল ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করবে এবং তাদের সম্পদাদি ফেরত নিয়ে যাবে। কিন্তু সদিচ্ছা প্রণোদিত বিলম্ব করা সত্ত্বেও তাদের পক্ষ থেকে কেউ যখন আগমন করল না রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন গনীমতের মাল বন্টন শুরু করে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গনীমতের ব্যাপারে বিভিন্ন গোত্রের নেতা এবং মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের যারা সন্দিগ্ধ চিত্ত ছিল এবং অনর্থক কথাবার্তা বলাবলি করে বেড়াত তাদের মুখ বন্ধ করা। মোওয়াল্লাফাতুল কলুবগণই[1] সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হলো। তাঁদেরকে বড় বড় অংশ দেয়া হল।

আবু সুফিয়ান বিন হরবকে চল্লিশ উকিয়া (ছয় কিলো হতে কিছু কম রৌপ্য এবং একশ উট প্রদান করা হল। তিনি বললেন, 'আমার ছেলে ইয়াযীদ?' নাবী করীম ﷺ ইয়াযীদকেও অনুরূপ অংশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, 'আমার ছেলে মোয়াবিয়া?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও অনুরূপ অংশ প্রদান করলেন, (অর্থাৎ তাঁর ছেলেদের সহ শুধু আবু সুফিয়ানকে আনুমানিক আঠার কিলো রৌপ্য) এবং তিনশ উট দেয়া হয়েছিল)।

---

[1] যারা নতুন ভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ইসলামের প্রতি তাদের মনে আরও অধিক পরিমাণে আকর্ষণ সৃষ্টি এবং ইসলামের উপর তারা যাতে শক্তভাবে বসে যায় তার জন্য সাহায্য করা হয়েছিল।

হাকীম বিন হেযামকে একশ উট দেয়া হয়েছিল। তিনি আরও একশ উটের জন্য আবেদন জানালে পুনরায় তাঁকে একশ উট দেয়া হয়েছিল। অনুরূপ ভাবে সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে একশ উট, দ্বিতীয় দফায় আরও একশ উট এবং তৃতীয় দফায় আবারও একশ উট (মোট তিনশ উট) দেয়া হয়েছিল।[১]

হারেস বিন কুলাদাহকেও একশ উট দেয়া হয়েছিল। কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত কুরাইশ এবং অন্যান্য নেতাগণকেও কয়েক শ' উট দেয়া হয়েছিল। অধিকন্তু, অন্যান্য কিছু সংখ্যক নেতাকেও পঞ্চাশ এবং চল্লিশ চল্লিশ করে উট দেয়া হয়েছিল। এমনকি জনগণের মাঝে প্রচার হয়ে গেল যে, মুহাম্মদ ﷺ এমনভাবে দান খয়রাত করছেন যে, তাদের আর পরমুখাপেক্ষী হওয়ার কোন ভয় নেই। কাজেই, অর্থ সাহয্য গ্রহণের জন্য বেদুঈনদের দল নাবী করীম ﷺ-এর নিকট ভিড় জমাতে থাকল। অতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর কারণে একটি বৃক্ষের দিকে সরে পড়তে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর চাদর খানা বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। তখন তিনি বললেন :

(أيها الناس، ردوا علي ردائي، فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً)

ওহে লোক সকল! আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। সুতরাং সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার নিকট যদি তিহামা বৃক্ষের সমপরিমাণ চতুষ্পদ জন্তু থাকে তবু তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেব। তারপর তোমরা দেখবে যে, আমি কৃপণ নই, ভীতও নই আর মিথ্যাবদীও নই।

তারপর তিনি তাঁর স্বীয় উটের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং এবং খানিকটা লোম উপড়ে নিয়ে হাত উপরে তুলে বললেন, (أيها الناس، والله مالى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مـردود علـيكم) 'ওহে জনগণ! আল্লাহর কসম! তোমাদের ফাই সম্পদের মধ্যে আমার জন্য কিছুই নেই। এমনকি এ লোমগুলোর পরিমাণও নেই। শুধু এক পঞ্চমাংশ আছে এবং সেটুকুও তোমাদের হাতেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।

মোওয়াল্লাফাতুল কুলবুকে দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ বিন সাবেতকে নির্দেশ প্রদান করলেন সৈন্যদের মধ্যে গণীমত বন্টনের জন্য হিসাব কিতাব তৈরি করতে। তিনি যে হিসাব তৈরি করলেন তাতে দেখা গেল যে, প্রত্যেক সাধারণ সৈনিকের অংশে এসেছে চারটি করে উট এবং চল্লিশটি করে বকরি। ঘোড়সওয়ারীদের প্রত্যেকের অংশে এসেছে বারটি উট এবং একশ বিশটি বকরি।

এ বন্টনের ভিত্তি ছিল এক কৌশলময় রাজনীতি। কারণ, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাদের সত্যের পথে আনা হয়। বিবেক বুদ্ধির পথ ধরে নয়, বরং পেটের পথ ধরে। অর্থাৎ তৃণভোজী পশুর সামনে এক গুচ্ছ সতেজ ঘাস ধরলে সে যেমন লাফ দিয়ে অগ্রসর হয়ে সেস্থানে পৌঁছে যায়, অনুরূপ ধারায় উল্লেখিত ধরণের লোকজনদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে তারা ঈমানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে তার জন্য আগ্রহী ও উদ্যমী হতে পারে।[২]

আনসারদের বিমর্ষতা ও দুর্ভাবনা (الأنصار تَجِدُ علـى رسـول اللّـه ﷺ) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ প্রাজ্ঞ রাজনীতির ব্যাপারে প্রাথমিক অবস্থায় কোন কোন লোকের মতো সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি না হওয়ার কারণে কিছু কিছু মৌখিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে আনসারদের উপর এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া ছিল সব চাইতে বেশী। কারণ, হোনাইন যুদ্ধের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। অথচ বিপদের সময় তাঁদেরকেই আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং সে আহ্বানে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়ে তাঁরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কঠিন বিপর্যয় সুন্দর বিজয়ে

---

1 কাযী আয়ায, আশ শিফা বেতা'রিফি হকুকিল মোস্তফা ১ম খণ্ড ৮৬ পৃঃ।

2 মুহাম্মদ গাজ্জালী, ফেখহুস সীরাহ ২৯৮ ও ২৯৯ পৃঃ।

পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, পলায়নকারীদের হাত হল পূর্ণ অথচ তাঁদের হাতই রয়ে গেল শূন্য।[1]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকে গণীমত বন্টন করে দিলেন, আনাসারদের ভাগে কিছুই পড়ল না তখন তাঁরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁদের মনে এতসংক্রান্ত অনকে প্রশ্নের উদয় হল। এমনকি তাঁদের মধ্য থেকে একজন বলেই বসলেন যে, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজ কওমের সঙ্গে মিশে গেছেন।' এ প্রেক্ষিতে সা'দ (রাঃ) রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ফাই বন্টনের ব্যাপারে আপনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে আনসারগণ আপনার প্রতি দুঃখিত এবং মনক্ষুন্ন হয়েছেন। আপনি নিজ কওমের লোকজনদের মধ্যেই তা বন্টন করেছেন এবং তাঁদেরকে অনেক বেশী বেশী পরিমাণ দান করেছেন কিন্তু আনসারদের কিছুই দেন নি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (فأين أنت من ذلك يا ســعد؟) 'হে সা'দ! এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমিও তো আমার কওমের লোকজনদের মধ্যে একজন।'

নাবী করীম ﷺ বললেন, (فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة). 'আচ্ছা তাহলে তোমার কওমের লোকজনকে তুমি অমুক স্থানে একত্রিত কর।'

সা'দ (রাঃ) তাঁর কওমের লোকজনদের নির্ধারিত স্থান সববেত করলেন। কিছু সংখ্যক মুহাজির আগমন করলে তাঁদেরকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। কিছু সংখ্যক অন্যলোক সেখানে আগমন করলে তাদের ফিরে দেয়া হল। যখন সংশ্লিষ্ট লোকজনেরা সেখানে একত্রিত হলেন, তখন সা'দ (রাঃ) নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'আনসারগণ আপনার জন্য একত্রিত হয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ সেখানে আগমন করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগান করার পর বললেন,

(يا معشر الأنصار، ما قَالَةٌ بلغتني عنكم، وَجِدَةٌ وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم اللّــه؟ وعالة فأغناكم اللّه؟ وأعداء فألف اللّه بين قلوبكم؟)

'ওহে আনসারগণ! কি কারণে তোমরা আমার প্রসঙ্গে অসন্তুষ্টি পোষণ করেছ? আমি কি তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসি নি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিল? আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা অসহায় ছিলে তিনি তোমাদেরকে সহয় সম্পদ দান করেছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের মধ্যে মহব্বতের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। লোকজনেরা বললেন, 'অবশ্যই, এ সব কিছুই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর বড়ই অনুগ্রহ।'

অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন,

(أما واللّه لو شئتم لقلتم، فصَدَقْتُمْ ولصُدِّقْتُمْ: أتيتنا مُكَذَّبًا فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فآسَيْنَاك).

(أوَجَدْتُمْ يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من الدنيا تَألَّفْتُ بها قوماً لِيُسْلِمُوا، ووَكَلْتُكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول اللّه صلى الله عليــه وســلم إلى

[1] প্রাগুক্ত।

رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شِعْبًا، وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللّهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار).

'আনসারগণ! তোমরা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?' আনসারগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা কি উত্তর দিব? এ সব তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'দেখ, আল্লাহর কসম! ইচ্ছা করলে তোমরা বলতে পার সত্য কথাই বলবে এবং তোমাদের কথা সত্য বলে ধরা নেয়া হবে যে, 'আপনি আমাদের নিকট এমন সময় এসেছিলেন যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল। আমরা আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি। আপনি যখন ছিলেন বন্ধু-বান্ধব ও সহায় সম্বলহীন তখন আমরা আপনাকে সহায়তা দান করেছিলাম। আপনাকে যখন বিতাড়িত করা হয়েছিল তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দান করেছিলাম। আপনি যখন ছিলেন অভাবগ্রস্থ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ আমরা তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতে আপনাকে সাহায্য করেছিলাম।'

অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন, 'হে আনসারগণ! একটি নিকৃষ্ট ঘাসের জন্য তোমরা নিজ নিজ অন্তরে অসন্তুষ্ট হয়েছ, অথচ এর মাধ্যমে আমি তোমাদের অন্তরকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা মুসলিম হয়ে ইসলামের প্রতি সমর্পিত হয়ে যাও। হে আনসারগণ! তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, সে সকল লোকেরা উট এবং বকরি নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে নিজ কওমের নিকট ফিরে যাবে? সে সত্তার কসম যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন! যদি হিজরতের বিধান না হতো তবে আমিও হতাম আনাসারদের মধ্যকার একজন। যদি অন্যান্য লোকেরা এক পথে চলেন এবং আনসারগণ অন্য পথে চলেন তাহলে আমিও আনাসারদের পথে চলব। হে আল্লাহ! আনসারদের তাঁদের সন্তানদের এবং তাঁদের সন্তানদের (অর্থাৎ নাতিপুতিদের) প্রতি রহম করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ভাষণ শ্রবণ করে উপস্থিত লোকজনেরা এতই ক্রন্দন করলেন যে, তাঁদের মুখমণ্ডলের দাড়িগুলো ভিজে গেল। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'আমরা এ জন্য সন্তুষ্ট যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের অংশে এবং সঙ্গে রয়েছেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসেন এবং লোকজনেরাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন।[১]

হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধির আগমন (قدوم وفد هوازن) : যুদ্ধ লব্ধ বন্টনের পর হাওয়াযেন গোত্রের এক প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণান্তে আগমন করলেন। এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। এ দলের নেতা ছিলেন যোহাইর বিন সুরাদ। নাবী করীম ﷺ-এর দুধ চাচা আবু বারকানও ছিলেন এ দলে। প্রতিনিধিদল আরয করলেন, 'আপনি দয়া করে আকটকৃতদের এবং তাদের অর্থ সম্পদাদি ফেরত দিয়ে দিন।' তাঁদের কথাবার্তায় এমন ভাব প্রকাশ পেল যেন অন্তর গলে যাবে।[2]

কবিতার ভাষায় তা ছিল নিম্নরূপ :

فامنن علينا رسول الله في كـــرم ** فإنـــك المرء نرجـــوه وننتظر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها ** إذ فوك تملؤه من محضها الدرر

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৪৯৯-৫০০ পৃঃ। অনুরূপ বর্ণনা সহীহ বুখারীতে ২য় খণ্ড ৬২০ ও ৬২১ পৃ: রয়েছে।

[2] ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় অছে যে, তাঁদের মধ্যে নয় জন শরীফ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণকরেন। এরপর নাবী করীম ﷺ-এর নিকট আরোজ করেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি যাদের আকট করেছেন তাদের মধ্যে মা বোন আছেন এবং খালা ফুফুও আছেন এবং এটাই হচ্ছে জাতির অবমাননার কারণ, (ফথহুল বারী ৮ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ) প্রকাশ থাকে যে, মা এবং অন্যান্য, কথার অর্থ হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই মা, খালা, ফুফুও যোগ ছিলেন বন্দীদলে। তাঁদের উপস্থাপক ছিলেন যোহাইর·বিন সোরাদ। আবু বারকানের উচ্চারণের মত পার্থক্য আছে। অতএব তাকে আবু মারওয়ান ও আবু সারওয়ানও বলা হয়েছে।

নাবী বললেন,

(إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلى أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟)

'আমার সঙ্গে যে সকল লোকজন আছে তোমরা তো তাদের দেখতেই পাচ্ছ এবং আমি সত্য কথা অধিক ভালবাসি।' সুতরাং তোমরা বল তোমাদের নিকট খুব প্রিয় বস্তু কোনটি? সন্তান সন্ততি না ধন-সম্পত্তি?'

তারা বলল যে, 'আমাদের নিকট খানাদানী মর্যাদার তুল্য আর কোন কিছুই নেই।'

নাবী করীম ﷺ বললেন,

(إذا صليت الغداة ــ أي صلاة الظهر ــ فقوموا فقولوا: إنا نستشــفع برســول اللّــه ﷺ إلى المــؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله ﷺ أن يرد إلينا سبينا)

'আচ্ছা আমি যখন যোহর সালাত শেষ করব তখন তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে বলবে যে, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'মিনদের জন্য এবং মু'মিনদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সুপারিশকারী বানাচ্ছি। অতএব, আমাদের আটককৃতদের ফিরিয়ে দিন।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত সমাপ্ত করলেন তখন তারা তাই বলল, উত্তরে নাবী করীম ﷺ বললেন, 'এ অংশের সম্পর্কে যা আমার জন্য এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবের জন্য আছে আমি যে সবই তোমাদের জন্য দিয়ে দিলাম এবং এখন আমি লোকজনদের নিকট তা জেনে নিচ্ছি। এর প্রেক্ষিতে আনসার ও মুহাজিরগণ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের নিকট যা আছে তার সব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দিয়ে দিলাম। এরপর আকরা' বিন হারেস বললেন, 'কিন্তু আমর ও বনু তামীম গোত্রের যা আছে তা আপনাকে দিলাম না।' অতঃপর উত্তয়ায়না বিন হিসন বললেন, 'আমার এবং বনু ফাজারাদের নিকট যা রয়েছে তা আপনার জন্য নয়।' আব্বাস বিন মেরদাস বললেন, 'আমার এবং বনু সোলাইমদের যা কিছু আছে সে আপনার জন্য নয়। এর প্রেক্ষিতে বনু সোলাইম বললেন, 'জী না, আমাদের সঙ্গে যা কিছু আছে তার সবই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। সেহেতু আব্বাস বিন মিরাদাস বললেন, 'তোমরা আমাকে বেইজ্জত করে দিলে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سَبْيَهُمْ، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبنــاء والنســاء شيئاً، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا)،

'দেখ, এ সকল লোক ইসলাম গ্রহণের পর এসেছে এবং (এ উদ্দেশ্যেই) আমি তাদের আটককৃতদের বন্টনে বিলম্ব করেছিলাম। এখন আমি তাদেরকে অধিকার প্রদান করলাম। তবে তারা অন্য কিছুকে সন্তানাদির সমতুল্য মনে করে নি। অতএব, যার নিকট আটককৃত কোন কিছু রয়েছে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে যদি সে তা ফেরত দেয় তাহলে সেটাই হবে সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা। আর কেউ যদি নিজ অধিকার আটকিয়ে রাখতে চায় তবুও তা হবে তাদের আটককৃত। অতএব, তাদেরকে সে সব ফিরিয়ে দেবে। আগামীতে সর্বাগ্রে যে সরকারী সম্পদ অর্জিত হবে ওর মধ্য থেকে ফেরতদানকারীকে ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই একটির পরিবর্তে ছয়টি দেয়া হবে।'

লোকজনেরা বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আমরা সব কিছুই সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছে এবং কে নেই, অতএব, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের প্রধানগণ তোমাদের ব্যাপারে আমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। এরপর লোকজনেরা তাদের সন্তানাদি ফিরিয়ে দিলেন। শুধু উওয়ায়না বিন হিসন অবশিষ্ট রইলেন। তাঁর অংশ

ছিল এক বৃদ্ধা মহিলা। তিনি প্রথমে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেও পরে ফিরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক বন্দীকে মুক্তিদানের সময় এক খানা করে কিবতী চাদর প্রদান করলেন।

ওমরাহ পালন এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন (العمرة والانصراف إلى المدينة) : গণীমত বিতরণের পর জেয়েররানা হতেই ওমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধলেন এবং ওমরাহ্ পালন করলেন। অতঃপর আত্তাব বিন আসীদকে মক্কা অভিভাবক নিযুক্ত করে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। ৮ম হিজরী ২৪শে যিলকাদাহ তারিখে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ফিরে আসেন।

মুহাম্মদ গাজ্জালী বলেছেন যে, ঐ সকল বিজয়ের সময় যখন আল্লাহ তা'আলা নাবী করীম ﷺ-এর মাথায় সুস্পষ্ট বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দিচ্ছিলেন এবং ঐ সময় যখন আটটি বছর পূর্বে নাবী করীম ﷺ এ সম্মানিত শহরে আগমন করছিলেন। এ দুই সময়ের মধ্যে কতই না ব্যবধান এবং তারতম্য।

নাবী কারীম ﷺ প্রথম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি ছিলেন আশ্রয়প্রার্থী। তাঁকে হত্যা কিংবা বহিস্কার করার এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের মুখেই তিনি মক্কা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন অপরিচিত, ভীত এবং নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বের অন্বেষণকারী মদীনাবাসীগণ তাঁর সম্মান করলেন, আশ্রয় দিলেন, সকল ব্যাপারে সাহায্য করলেন এবং যে আলোর দিশারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন তার অনুসরণ করে চলবেন, অধিকন্তু, নাবী করীম ﷺ-এর খাতিরে সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতাকে তাঁরা সামান্য ব্যাপার মনে করলেন। সেদিন মদীনা একজন মুহাজির ধর্মপ্রচারক হিসেবে নাবী করীম ﷺ-এর স্বাগত জানিয়েছিল।

কিন্তু আট বছর পর আজ সেই মদীনায় তাঁকে এভাবে স্বাগত জানাচ্ছে যে, মক্কা তাঁর অধীনস্থ হয়ে গিয়েছে এবং মক্কাবাসীগণ তাঁদের অহংকার ও অজ্ঞাতপ্রসূত অর্থহীন বড়ত্বকে তাঁর পদতলে নিক্ষেপ করে দিয়েছে এবং নাবী করীম ﷺ তাঁদের পূর্বের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে ইসলামের মাধ্যমে মক্কাকে মর্যাদা ও উচ্চস্থান প্রদান করেছেন।[1]

---

[1] ফেকহুস সীরাহ ৩০৩ পৃঃ, মক্কা বিজয় এবং তায়েফ যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য আল্লামা ইবনুল কাইয়ূমের রচিত যাদুল মায়াদ গ্রন্থ ২য় খণ্ড ১৬০-২০১ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৮৯-৫০১ পৃঃ, সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬১২-৬২২ পৃঃ, ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৩-৮৫ পৃঃ।

البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح

মক্কা বিজয়ের পর ছোটখাট অভিযান এবং কর্মচারীগণের যাত্রা :

মক্কা বিজয় সংক্রান্ত সুদীর্ঘ ও সফল ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় অবস্থানের মধ্য দিয়ে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। এর মাঝে তিনি মদীনায় আগমনকারী প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান, প্রশাসনের কর্মচারীগণকে প্রেরণ করতে থাকেন, দ্বীনের দাওয়াত দাতাগণকে আলোড়নকারী বিষয়ের সামনে পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকার করছিল তাদের অধীনস্থ করতে থাকেন। এ বিষয়াদি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখিত হল :

যাকাত আদায়কারী বৃন্দ (المصـــدقون) : ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরী শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনা ফিরে আসেন। অতঃপর ৯ম হিজরীর মুহামরমের চাঁদ উদিত হওয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন গোত্রের মুসলিমগণের নিকট থেকে সদকা ও যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য কর্মচারী প্রেরণ করেন। যে কর্মচারী যে গোত্রে প্রেরিত হয়েছিল তার তালিকা হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

কর্মচারীগণের নাম	যে গোত্র থেকে সদকা এবং যাকাত আদায় করা হয়েছিল
১. উওয়ায়না বিন হিসন	বনু তামীম
২. ইয়াযীদ বিন হোসাইন	আসলাম এবং গেফার গোত্র
৩. আববাদ বিন বাশির আশহালী	সোলাইম এবং মোযাইনা গোত্র
৪. রাফে বিন মাকীস	জোহাইন গোত্র
৫. আমর বিন আস	বনু ফাযারা
৬. যাহহাক বিন সুফিয়ান	বুন কেলাব
৭. বাশীর বিন সুফিয়ান	বনু কা'ব
৮. ইবনুল লুতবিয়াহ আযদী	বনু যুবিয়ান
৯. মুহাজির বিন আবি উমাইয়াহ	সানয়া শহরে (তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে আসওয়াদ আনসী সানয়ায় নাবী দাবী করেছিল)।
১০. যেয়াদ বিন লাবীদ	হাযরা মাওত অঞ্চল
১১. আদী বিন হাতেম	তাই এবং বনু আসাদ গোত্র
১২. মালেক বিন নোওয়াইরাহ	বনু হানযালাহ গোত্র
১৩. যবরকান বিন বদর	বনু সা'দ (এর একটি শাখা)
১৪. কাইস বিন আসেম	বনু সা'দ (এর অন্য একটি শাখা)
১৫. আলা' বিন হাযরামী	বাহরায়েন অঞ্চল
১৬. আলী ইবনু আবু তালিব	নাজরায় অঞ্চল (যাকাত এবং কর আদায় করার জন্য)

প্রকাশ থাকে যে, ৯ম হিজরীর মুহারম মাসেই এ সকল কর্মচারীর সকলেই প্রেরণ করা হয় নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট গোত্রগুলোর বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের কারণ। তবে এ পরিচালন বন্দোবস্তের সঙ্গে উল্লেখিত কর্মচারীবৃন্দের প্রেরণের কাজ শুরু হয়েছিল ৯ম হিজরীর মুহারম মাসে এবং এর মাধ্যমেই হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলামী দাওয়াতের কৃতকার্যতার প্রশস্ততা অনুমান করা যেতে পারে। অবশিষ্ট থাকে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী যুগের আলোচনা। অবশ্য ঐ সময়ে লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে।

অভিযান (السرايا) : বিভিন্ন গোত্রের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের জন্য যেমন কর্মচারী প্রেরণ করা হয় তেমনিভাবে আরব উপদ্বীপের সাধারণ অঞ্চল সমূহের মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ বজায় থাকার সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে সৈনিক মহোদ্যমও গ্রহণ করা হয়। এ সকল অভিযানের বিবরণ হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

উওয়াইনা বিন হিসন ফাযারীর অভিযান (سرية عيينة بن حصن الفزاري) (৯ম হিজরী, মুহারম) : উওয়াইনের নেতৃত্বে ৫০ জন ঘোড়সওয়ারীর সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনী বনু তামীম গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করে বনু তামীম গোত্র কর প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এ অভিযানের কোন মুহাজির কিংবা আনসার ছিলেন না।

উওয়াইন বিন হিসন রাত্রিবেলা পথ চলতেন এবং দিবাভাগে অত্যন্ত সঙ্গোপনে অগ্রসর হতেন। এভাবে সাহাবায়ে বনু তামীম গোত্রের উপর আক্রমণ চালানো হয়। আকস্মিক আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বনু তামীম গোত্র শিশু মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হবে। তাদের মদীনায় আনয়ন করে রামলা বিনতে হারেসের বাড়িতে রাখা হয়।

অতঃপর বুন তামীমের দশ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দীদের ব্যাপারে মদীনায় আগমন করল এবং নাবী করীম ﷺ-এর দরজায় গিয়ে এভাবে বলল, 'হে মুহাম্মদ ﷺ আমাদের নিকট এস।' তাদের আহ্বানে নাবী করীম ﷺ যখন বাইরে আগমন করলেন তখন তারা তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলোচনা চালাতে থাকল। অতঃপর নাবী করীম ﷺ তাদের সঙ্গে অবস্থান করতে থাকলেন এবং এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যোহর সালাতের সময় হলে তিনি যোহর সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর মসজিদে নববীর বারান্দায় গিয়ে বসে পড়লেন। তারা ওতারেদ বিন হাজেরকে দলের মুখপাত্র হিসেবে এগিয়ে দিয়ে অহমিকা ও আত্মগর্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কথাবার্তা বলতে থাকল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের বক্তা হিসেবে তাদের কথাবার্তার উপযুক্ত জবাব দানের জন্য সাবেত বিন কাইস বিন শাম্মাসকে নিযুক্ত করলেন। তিনি তাদের আলোচনায় আলোকে যথোপযুক্ত বক্তব্য পেশ করলেন। এরপর তারা তাদের কবি যারকান বিন বদরকে অগ্রভাগ রাখলে সে তাদের গৌরবসূচক কিছু কবিতা আবৃত্তি করল। মুসলিম কবি হাস্‌সান বিন সাবেত (رضي الله عنه) তাদের জবাবে বক্তব্য পেশ করলেন।

যখন উভয় দলের বক্তা এবং কবিগণ উপস্থাপনা শেষ করলেন তখন আকবা বিন হাবেস বলল, 'তাদের বক্তা আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী এবং তাদের কবি আমাদের কবির তুলনায় অধিক শক্তিশালী বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের কথাবার্তা আমাদের কথাবার্তার তুলনায় অধিক জোরালো এবং তাদের আলোচনা আমাদের আলোচনার তুলনায় অধিক উন্নত মানের। এবং তারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উত্তম উপঢৌকন প্রদান করে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাদের আটককৃত শিশু ও মহিলাদেরকে ফিরিয়ে দিলেণ।[1]

কুতবাহ বিন আমেরের অভিযান (سرية قُطْبَة بن عامر إلى حي من خَثْعَم بناحية تَبَالَة) (সফর ৯ম হিজরী) : তুরবার নিকটে তাবালার অঞ্চলে খাশতাম গোত্রের একটি শাখার উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। বিশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল নিয়ে কুতবারহ এ অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ দলের বাহন ছিল ১০টি উট যার উপর তাঁরা পালাক্রমে আরোহন করতেন।

মুসলিম বাহিনী রাত্রি বেলা লক্ষ্যস্থলের উপর আক্রমণ চালান, এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকজন হতাহত হয়। মুসলিশ বাহিনীর মধ্য থেকে কুতবাহ এবং আরও কয়েক জন নিহত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ কিছু সংখ্যক ভেড়া, বকরি ও শিশুদের মদীনায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

যহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবীর অভিযান (سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب) (৯ম হিজরী, রবিউল আওয়াল মাস): এ অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য। কিন্তু তার তা অস্বীকার করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলিম বাহিনী পরাজিত করেন এবং একজনকে হত্যা করেন।

---

[1] যুদ্ধ বিষয়খ ইতিহাসবিদগণের বিবরণ হচ্ছে এই যে, এ ঘটনা ৯ম হিজরীর মুহাব্বম মাসে মংঘটিত হয়। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্টভাবে আপত্তিকর। কারণ, ঘটনার প্রসঙ্গ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, আকরা বিন হারেসএর আগে মুসলিম হননি। অথচ চরিতকারগেনৈর দেয়ার জন্য বললেন তখন আকরা বিন হারেস নিজেই বললেন, যে আমি এবং বনু তামীম ফিরিয়ে দেব না। এ কথাই প্রমাণ করছে যে, আকরা বিন হারেস ৯ম হিজরী মুহারম মাসের পূবেই মুসলিম হয়েছিলেন।

আলকামা বিন মুজরেয মুদলেজীর অভিযান (سرية علقمة بن مُجَزِّز الْمُدْلجي إلى سواحل جُدَّة) (৯ম হিজরী, রবিউল আখের) : তিনশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীর পরিচালক হিসেবে তাঁকে জেদ্দহ তীরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। কিছু সংখ্যক হাবশী জেদ্দাহ তীরবর্তী অঞ্চলে একত্রিত হয়ে মক্কাবাসীদের উপর এক ডাকারি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আলকামা সমুদ্রে অবরণ পূর্বক এক উপদ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হন। হাবশীরা মুসলিমগণের আগমনের সংবাদ অবগত হয়ে পলায়ন করে।[1]

আলী বিন আবু তালিবের অভিযান (سرية على بن أبي طالب إلى صنم لطيئ) (৯ম হিজরী, রবিউল আওয়াল মাস) : তাঁকে তাই গোত্রের ফুল্‌স নামক একটি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁর পরিচালনাধীনে এ বাহিনীতে ছিল দেড়শ লোক এবং বাহন ছিল একশ উট এবং পঞ্চাশটি ঘোড়া রণ-পতাকাগুলো ছিল কালো এবং নিশান ছিল সাদা। এ বাহিনী ফজরের সময় হাতেম তাই-এর মহল্লায় আক্রমণ চালিয়ে ফুল্‌সকে ভেঙ্গে ফেলার পর অনেক লোককে বন্দী করে এবং মেষ ও বকরিসহ অনেক গবাদি সম্পদ হস্তগত কলে। বন্দীদের মধ্যে হাতেম তই এর কন্যাও ছিল। হাতেম তই-এর পুত্র আদী শাম দেশে পলায়ন কলে। মুসলিমগণ ফুল্‌স মূর্তি ধন-ভাণ্ডারে তিনট তলোয়ার ও তিনটি যুদ্ধের লৌহবর্ম পেয়েছিলেন। পথের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করে নেয়া হয়। অবশ্য কিছু পছন্দসই দ্রব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পৃথক করে রাখা হয়। হাতেম তাই-এর পরিবারকে বণ্টন করা হয় নি।

মদীনায় পৌঁছার পর হাতেম তনয়া এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আরয করে, 'হে আল্লাহর রাসূল! এখানে আসা যার পক্ষে সম্ভব ছিল তার কোন খবর নেই। পিতা বিগত এবং আমি বৃদ্ধা। সেবা করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।'

নাবী কারীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, (من وافدك؟) 'তোমার জন্য কার আসার সম্ভবনা ছিল?

উত্তর দিলেন, 'আদি বিন হাতেম। সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে পলায়ন করেছে।' অতঃপর নাবী করীম ﷺ সেখান থেকে এগিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দিবস আবার সে সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করল এবং রাসূলে করীম ﷺ আবার সে কথাই বললেন, যা গতকাল বলেছিলেন।

তৃতীয় দিবসে আবারও সে সেই কথাই বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মুক্ত করে দিলেন। সে সময় নাবী ﷺ-এর পাশে একজন সাহাবী ছিলেন, সম্ভবত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তিনি বললেন, 'নাবী করীম ﷺ-এর নিকট একটি সওয়ারীও চেয়ে নাও।' সে একটি সওয়ারীর জন্য আরয করলে নাবী করীম ﷺ তাকে তা সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।

মুক্তি লাভের পর হাতেম তনয়া শাম রাজ্যে নিজ ভাইয়ের নিকট ফিরে গেল। সেখানে সে তার ভাইয়ের নিকট সাক্ষাতের পর সব কিছু স্ববিস্তারে বর্ণনা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে বলল যে, তিনি এত সুন্দর ভাবে কাজ সম্পাদন করেছেন যে, তোমার পিতাও তেমনটি করতে পারতেন না। তাঁর নিকটে যাও ভরসা অথবা ভয়ের সঙ্গে।

কাজেই আশ্রয় প্রার্থনা কিংবা লিখিত আবেদন ছাড়াই আদী নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাজির হল। নাবী করীম ﷺ তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সে যখন তাঁর সামনে বসল তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করলেন এবং বললেন, 'তোমরা কোন জিনিস হতে পলায়ন করছ? লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হতে কি পলায়ন করছ? যদি সেটাই হয় তাহলে বল তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য আছে বলে কি তোমরা মনে কর?' সে উত্তর দিল 'না'। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর নাবী করীম ﷺ পুনরায় বললেন, 'আচ্ছা বল তো, তোমরা কি আল্লাহ আকবর বলা থেকে পলায়ন করছ? তবে কি আল্লাহ হতে কিছু বড় আছে বলে তোমরা মনে কর?' উত্তরে সে বলল, 'না'। রাসূলে করীম ﷺ বললেন, 'শোন ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর গজব পতিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট।'

---

[1] ফতহুল বারী ৮ম হিজরী ৫৯ পৃঃ।

সে বলল, 'তবে আমি একনিষ্ঠ মুসলিম।' তার মুখ থেকে এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর তাকে এক আনসারীর বাড়িতে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে আনসারীর বাড়িতে থাকত এবং সকাল সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হতো।[১]

আদী হতে ইবনু ইসহাক এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, নাবী করীম ﷺ যখন তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালেন তখন জিজ্ঞেস করলেন,

(يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطـــوف بالكعبــــة، لا تخاف أحداً إلا اللّه، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسري، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج مـــلء كفه من ذهب أو فضة، ويطلب من يقبله فلا يجد أحداً يقبله منه...)

'ওহে আদী বিন হাতেম! তোমরা কি পুরোহিত ছিলে না?' উত্তরে আদি বলল, 'অবশ্যই'। অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন, 'তোমরা কি নিজ কওমের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ গ্রহণের নীতি অনুসরণ করে চলতে না? সে বলল, আমি বললাম, 'অবশ্যই' নাবী করীম ﷺ বললেন, অথচ তোমাদের দ্বীনে এটা বৈধ নয়।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ' আল্লাহর কসম! এবং তখনই আমি জেনেছি যে, বাস্তবিক আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ, কারণ, আপনি সে কথাও জানেন যা জানা যায় .....।'[২]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, নাবী করীম ﷺ বললেন, 'হে আদী! ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকবে।' আমি বললাম, 'আমি তো নিজেই এক দ্বীনের অনুসারী।' নাবী করীম ﷺ বললেন, 'তোমার দ্বীন সম্পর্কে আমি তোমার চাইতে অধিক অবগত আছি।' আমি বললাম, 'আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার চাইতেও বেশী জানেন?' নাবী করীম ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ' আচ্ছা বলো তো, এমনটি কি নয় যে, তোমরা পুরোহিত অথচ নিজ কওমের গণীমত থেকে এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই'। নাবী করীম ﷺ বললেন, 'তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এটা বৈধ নয়।'

'আপনার এ কথার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে আমাকে মাথা নত করতে হল।[৩]

সহীহ বুখারীতে আদী হতে বর্ণিত আছে যে, 'আমি একদা খিদমতে নববীতে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে অভাব অনটনের অভিযোগ পেশ করল। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসে ছিনতাইয়ের অভিযোগ পেশ করল। নাবী করীম ﷺ বললেন, 'আদি, তুমি কি হীরা দেখেছ? জীবন যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে দেখবে যে পর্দা নশীন মহিলাগণ হীরা হতে নিরাপদে চলে আসবে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তার আর কোন কিছুর ভয় থাকবে না। তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হলে তোমরা কেসরার ধন-ভাণ্ডার জয় করবে এবং দেখবে যে, লোকজনেরা হাত ভর্তি করে সোনা রূপা বাহির করবে, কিন্তু তালাশ করেও সে সব গ্রহণ করার মতো লোকজন পাবে না।'

এ বিষয় প্রসঙ্গে আদী বলেছেন, 'আমি দেখেছি যে, পর্দানশীন মহিলারা হীরা হতে এসে কা'বা ঘরে তাওয়াফ করছে এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন কিছুরই ভয় নেই। তিনি আরও বলেছেন, 'আমি নিজেই সে সব লোকজনের মধ্যে ছিলাম যারা কেসরা বিন হুরমুজের ধন-ভাণ্ডার জয় করেছিল। তাছাড়া, তোমাদের জীবন দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তোমরাও ঐ সব কিছু দেখে নিতে পারবে যা নাবী আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, মানুষ হাত ভর্তি করে সোনারূপা বাহির করবে।[৪]

---

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ২০৫ পৃঃ।

[2] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫৮১ পৃঃ।

[3] মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ২৫৭ ও ৩৭৮ পৃঃ।

[4] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৭ পৃঃ।

غـــزوة تبـــوك
في رجب سنة ٩هـ
তাবুক যুদ্ধ
নবম হিজরীর রজব মাসে

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছিল সত্য মিথ্যা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতে সম্পর্কে আরববাসীগণের মনে দ্বিদা-দ্বন্দ্ব কিংবা সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইল না। এ কারণে, পরিস্থিতির মোড় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এবং মানুষ আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবিষ্ট হতে থাকল। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ 'প্রতিনিধি প্রেরণ' অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে এবং 'বিদায় হজ্জ' সম্পর্কিত আলোচনায়ও এ সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব হবে। যাহোক, আলোচ্য সময়ে আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলতে আর তেমন কিছুই ছিল না। ফলে মুসলিমগণ শরীয়তের শিক্ষা বিস্তার এবং ইসলামের প্রচার প্রসারে একনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

যুদ্ধের কারণ (سبب الغزوة) : ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এমনি এক পর্যায়েও মদীনার উপর এমন এক শাক্তির প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছিল কোন কারণ ব্যতিরেকেই যারা মুসলিমগণকে হর হামেশা ত্যক্ত বিরক্ত করে চলছিল। ইতিহাসে এরা রোমক বা রোমীয় নামে পরিচিত। তদানীন্তন পৃথিবীতে এরা ছিল সর্বাধিক সৈন্য সম্পদে সমৃদ্ধ। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এ বিরক্তিকর কাজ আরম্ভ করে শোরাহবীল বিন আমর গাসসানী নাবী করীম ﷺ-এর দূত হারেস বিন উমাইর আযদীকে (رضي الله عنه) হত্যা করার মাধ্যমে। তাছাড়া এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ বিন হারেসা (رضي الله عنه)-এর অধিনায়কত্বে যে সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন এবং যাঁরা মূতা নামক স্থানে রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন সে কথাও ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এ সৈন্যদল সে আত্মগর্বী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন নি। অবশ্য এর ফলে দূরের ও নিকটের আরব অধিবাসীদের উপর মুসলিমগণের প্রভাব প্রতিপত্তির একটি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়।

বস্তুত আরব গোত্র সমূহের উপর মুসলিমগণের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্ট সচেতনতা এবং রোমকদের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সৃষ্ট সংকল্পের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। এ সংক্রান্ত ব্যাপারে রোকমদলে যে ভয় ছিল তা ক্রমে ক্রমে সীমান্তের দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। বিশেষ করে আরব ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী শাম রাজ্যের জন্য তার একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই ইসলামী শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন রোমক সম্রাট যাতে রোম সাম্রাজ্যের সংলগ্ন আরব এলাকা থেকে ভবিষ্যত কোন ফেতনা কিংবা হাঙ্গামার সম্ভাবনা না থাকে।

উপরোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষাপটে মূতা যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর একটি বছর পূর্ণ হতে না হতেই রোম সম্রাট রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্য থেকে এবং অধীনস্থ আরব গোত্রসমূহ অর্থাৎ গাসসনা পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিল এবং এক রক্তক্ষয়ী ও চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকল।

রোমক এবং গাস্‌সানীদের প্রস্তুতির সাধারণ সংবাদ (الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسّان) : এদিকে মদীনায় ক্রমে ক্রমে খবর আসতে থাকে যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত ও মীমাংসাকারী যুদ্ধের জন্য রোমক সম্রাট অত্যন্ত ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে চলেছেন। রোমক সম্রাটের এহেন সময় প্রস্তুতির সংবাদে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমগণের মনে কিছু অস্বস্তির ভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রহণযোগ্য নয় এমন সব সংবাদ শ্রবণের ব্যাপারেও তাঁরা উৎসাহী হয়ে ছিলেন। তাঁদের মনে এ রকম একটি ধারণারও সৃষ্টি হয়েছিল যে, না জানি কখন রোমক

বাহিনীর স্রোত এসে আঘাত হানে। ৯ম হিজরীর ঠিক এমনি সময়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বিবিগণের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এক মাসের ইলা[১] করেন এবং তাঁদের সঙ্গ পরিহার করে একটি ভিন্ন কক্ষে নির্জনতা অবলম্বন করেন।

প্রাথমিক অবস্থায় সাহাব কেরাম প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, নাবী করীম ﷺ তাঁর পত্নীদের তালাক দিয়েছেন এবং এ কারণে তাঁদের অন্তরে দারুণ দুঃখ বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল। ওমর বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিল, আমি যখন খিদমতে নববীতে উপস্থিত না থাকতাম, তখন তিনি আমার নিকট সংবাদাদি পৌঁছে দিতেন এবং তিনি যখন উপস্থিত না থাকতেন তখন আমি তাঁর নিকট তা পৌঁছে দিতাম। তাঁরা উভয়েই মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন এবং পালাক্রমে খিদমতে নববীতে উপস্থিত থাকতেন ঐ সময়ে আমরা গাস্‌সানী সম্রাটকে ভয় করতাম। কারণ, আমাদের বলা হয়েছিল যে, তারা আমাদের আক্রমণ করবে এবং এ ভয়ে আমরা সব সময় ভীত থাকতাম।'

একদিন আমার এ আনসারী বন্ধু আকস্মিক দরজায় করাঘাত করতে করতে বলতে থাকলেন, 'খুলুন, খুলুন' আমি বললা, 'গাস্‌সানীরা কি এসে গেল?' তিনি বললেন, 'না' বরং এর চাইতেও কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন।[২]

ভিন্ন এক সূত্র থেকে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর (رضي الله عنه) বললেন, 'আমাদের মাঝে সাধারণভাবে এ কথা প্রচারিত হয়েছিল যে, গাস্‌সান গোত্রের লোকজনেরা আমাদের আক্রমণ করার জন্য ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাচ্ছে। একদিন আমার বন্ধু তাঁর পালাক্রমে খিদমতে নববীতে হাজির হন। অতঃপর বাদ এশা তিনি বাড়ি ফিরে এসে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে করতে বলতে থাকেন, 'এরা কি শুয়ে পড়েছেন? ' আতঙ্কিত অবস্থায় আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম তখন তিনি বললেন যে, একটি বড় ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, 'গাস্‌সানীরা কি এসে গিয়েছে?' তিনি বললেন, 'না' বরং এর চাইতেও কঠিন সমস্যা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিবিদেরকে তালাক।' শেষ পর্যন্ত[৩]

ওমর বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) বর্ণিত ঘটনার থেকে সহজেই অনুমান ও অনুধাবন করা যায় যে, রোমকগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি মুসলিমগণকে কতটা চিন্তিত এবং বিচলিত করে তুলেছিল। মদীনায় মুনাফিকদের শঠতা ও চক্রান্ত সমস্যাটিকে আরও প্রকট করে তুলেছিল। অথচ মুনাফিকরা এ কথাটি ভালভাবেই অবগত ছিল যে, উদ্ভূত সমস্যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী হয়েছেন এবং পৃথিবীর কোন শক্তিকেই তিনি কখনো ভয় করেন না। অধিকন্তু, এ কথাটিও তারা ভালভাবেই অবগত ছিল যে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সকলেই পর্যুদস্ত এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। তবুও অন্তরে অন্তরে তারা একটি ক্ষীণ আশা পোষণ করে আসছিল যে, যুগের আবর্তনের গতিধারায় মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তাদের লালিত প্রতিহিংসার অগ্নি একদিন না একদিন প্রজ্জ্বলিত হবেই এবং খুব সম্ভব এটাই হচ্ছে কাঙ্খিত সময়। তাদের সেই কল্পিত সুযোগের প্রেক্ষাপটে তারা একটি মসজিদের আকার আকৃতিতে (যা মাসজিদে 'যেরার' ক্ষতিকর নামে প্রসিদ্ধ ছিল) ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানা তৈরি করল। এ উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে করীম ﷺ-এর কুফরী করা ও মুসলিমগণের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশে গোপনে তথ্য সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে তা ব্যবহার করা। তাদের এ অসদুদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখার কৌশলস্বরূপ সেখানে সালাত আদায়ের জন্য তারা নাবী করীম ﷺ-কে অনুরোধ জানায়।

---

[1] ইলা বলা হয় স্ত্রী নিকট গমন না করার শপথ করাকে। যদি এ শপথ ৪ মাস কিংবা এর কম সময়ের জন্য হয় তাহলে এর উপর শরীয়তের কোন হুকুম প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু এ ভাবে ৪ মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে শরীয়তের বিচার প্রযোজ্য হয়ে যায়। এতে স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারে কিংবা তালাক দিতে পারে। কোন কোন সাহাবীর উক্তি অনুযায়ী ৪ মাস অতিক্রান্ত হলেই তালাক পড়ে যায়।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৭৩০ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৩৩৪ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেখানে সালাত পড়ানোর অনুরোধ জানানোর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলিমগণ কোনক্রমেই যেন চিন্তাভাবনা করার সুযোগ না পায় যে, সেখানে তাঁদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া এ মসজিদে যাতায়াতকারীদের ব্যাপারে ঘূর্ণাক্ষরেও যেন কোন সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এমনিভাবে এ মসজিদটি মুনাফিক ও তাদের দোসরদের নিরাপদে আড্ডা ও গোপন কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মসজিদে সালাত আদায় করার ব্যাপারটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কারণ, যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য তাঁকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। এর ফলে তাদের দূরভিসন্ধির ব্যাপারে মুনাফিকগণ কৃতকার্য হতে সক্ষম হল না। অধিকন্তু, যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই আল্লাহ তাদের অসদুদ্দেশ্যে যবনিকা উন্মোচন করে দিলেন। কাজেই, যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মসজিদে সালাত আদায় না করে তা বিধ্বস্ত করে দেন।

রুমী ও গাস্সানীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশেষ খবর (الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان) : মুসলিমগণ যখন ক্রমাগতভাবে উপরিউল্লেখিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েই চলেছিলেন এমন সময় শাম রাজ্য হতে আগমণকারী তৈল বাহক [1] দলের মাধ্যমে আকস্মিকভাবে জানা গেল যে, হিরাকল ৪০ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে এক যুদ্ধ প্রিয় বাহিনী গঠন করেছে এবং রোমের একজন প্রখ্যাত কামাণ্ডারের অধিনায়কত্বে এ বাহিনীকে ন্যস্ত করেছে। তাছাড়া, নিজ পতাকার আওতায় খ্রিষ্টান গোত্র সমূহের মধ্যে লাখম জোযাম ও অন্যান্য গোত্রগুলোও একত্রিত করেছে এবং তাদের বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি বালকা' নামক স্থানে পৌঁছে গেছে। এমনিভাবে এক ভয়াবহ বিপদ মূর্তরূপে মুসলিমগণের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিপদাপন্ন পরিস্থিতির বিবৃদ্ধি (زيادة خطورة الموقف) : এমনি এক নাজুক পরিস্থিতির মুখে আরও বিভিন্নমুখী সমস্যার ফলে অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং সঙ্গীন হয়ে উঠল। সময়টা ছিল অত্যন্ত গরম। মানুষ ছিল অসচ্ছলতা এবং দুর্ভিক্ষের কবলে। যান বাহনের সংখ্যাও ছিল খুব সীমিত। বাগ-বাগিচার ফলমূলে পরিপক্কতা এসে গিয়েছিল। ফলমূল সংগ্রহ এবং ছায়ার জন্য বাগ-বাগিচায় অবস্থান করাটা মানুষের অধিকতর পছন্দনীয় ছিল। এ সব কারণে তাৎক্ষণিক যুদ্ধ যাত্রার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। তদুপরি, পথের দূরত্ব এবং সফরের ক্লেশকীষ্টতা তাদের মনকে দারুনভাবে প্রভাবিত করছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে যুদ্ধ যাত্রার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ (الرسول ﷺ يقرر القيام بإقدام حاسم) : রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর মনোনিবেশ সহকারে সমস্যা সংকুল পরিস্থিতির এবং বিভিন্নমুখী প্রতিকূলতা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। তিনি এটা পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করছিলেন যে এ চরম সংকটময় মুহূর্তে যদি রুমীগণের সঙ্গে মোকাবেলা করার ব্যাপারে শৈথিল্য কিংবা গড়িমসি করা হয়, কিংবা আরও অগ্রসর হয়ে তারা যদি মদীনার দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়ে তাহলে ইসলামী দাওয়াত ও মুসলিমগণের জন্য তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অমবমাননাকর। এতে মুসলিমগণের সামরিক মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুন্ন হবে এবং যে অজ্ঞতার কারণে হোনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ডভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অধিকন্তু, যুগের আবর্তন-বিবর্তনের ধারায় মুনাফিকগণ যে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে এবং ফাসেক আবু আমেরের মাধ্যমে দিকে থেকে মুসলিমগণের পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার শামিল। আর সামনের দিক থেকে রুমীদের সৈনিক প্লাবন রক্ষক্ষয়ী আঘাত হানবে তাদের উপর। এমনিভাবে অর্থহীন হয়ে যাবে সে সকল অসাধারণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাবৃন্দ ব্যয় করেছিলেন আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার কার্যে, অকৃতকার্যতার পর্যবসিত হয়ে যাবে সে সময় দুর্লভ সাফল্য যা অর্জন করা হয়েছিল অসামান্য ত্যাগ তিতীক্ষা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে।

---

[1] নাবেত বিন ইসমাঈলের বংশ উত্তরে হেজাযে এক কালে যাদের অত্যন্ত সমাদর ও উচ্চ মর্যাদা ছিল। কিন্তু কালক্রমে তার ধীরে ধীরে সাধারণ কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের পর্যায়ে চলে যায়।

ইসলাম ও মুসলিমগণের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে সুক্ষতিসূক্ষ্ম আলোচনা পর্যালোচনা পর বিভিন্নমুখী সমস্যা সত্ত্বেও নাবী করীম ﷺ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে রুমীদের প্রবেশের সুযোগ না দিয়ে বরং তাদের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যেই তাদের সঙ্গে এক চূড়ান্ত ফয়সালা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা (الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان) : রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সাহাবীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া, মক্কার বিভিন্ন গোত্র এবং অধিবাসীদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য। এ সব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটা নীতি ছিল তিনি যখনই কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তখনই অন্য কোন দিকের জন্য তাওরিয়া করতেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং প্রকট অভাব অনটনের কারণে এবার তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, রুমীগণের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যোদ্ধাগণ যেন উত্তম প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধের জন্য তিনি সাহাবীগণকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। এ সময়েই যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারেই সূরা তাওবার একটি অংশ অবতীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাদকা খয়রাত করার ফযীলত বর্ণনা করা হয় এবং আল্লাহর পথে আপন আপন উত্তম সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য মুসলিমগণের দৌড় ঝাঁপ (المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو) : সাহাবীগণ (রাঃ) যখনই অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুমীগণের বিরুদ্ধে উত্তম যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখনই তাঁরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন গোত্র এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজনেরা মদীনায় সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। যাদের অন্তরে কপটতা ছিল তারা ব্যতীত কোন মুসলিমই এ যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকার কথাটা ঘূর্ণাক্ষরেও মনে ঠাঁই দেন নি। তবে তিন জন মুসলিম এ নির্দেশের বাইরে ছিলেন। নিষ্ঠাবান ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি।

পক্ষান্তরে অবস্থা এই ছিল যে, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করতেন যে, তাঁদের জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করা হলে তাঁরাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। নাবী করীম ﷺ যখন তাঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যে,

﴿لَآ أَجِدُ مَا أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ﴾ [التوبة:٩٢]

'তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার কাছে যখন বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিল তখন তুমি বলেছিলে, 'আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাচ্ছি না'। তখন তারা ফিরে গেল, আর সে সময় তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল- এ দুঃখে যে, ব্যয় বহন করার মত কোন কিছু তাদের ছিল না।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ৯২]

যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে মুসলিমগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। পরস্পর পরস্পরের তুলনায় সাদকা এবং দান-খয়রাত করতে পারে কে কত বেশী আল্লাহর রাহে। সেই সময় ওসমান বিন আফ্ফান শাম রাজ্যের উদ্দেশ্যে এমন একটি বাণিজ্য কাফেলা প্রস্তুত করছিলেন যার মধ্যে ছিল ঘোড়ার পালান ও গদিসহ দু'শ উট এবং দু'শ উকিয়া রৌপ্য (যার ওজন ছিল প্রায় ঊনত্রিশ কেজি। এর সব কিছুই তিনি সাদকা করে দেন যুদ্ধের জন্য। এর পর তিনি হাওদাসহ আরও একশ উট দান করেন। এর পরও পুনরায় তিনি এক হাজার (আনুমানিক সাড়ে পাঁচ কেজি ওজনের) স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসে নাবী করীম ﷺ-এর কোলের উপর ঢেলে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণমুদ্রাগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'আজকের পর ওসমান যা কিছু করবে তা কোনই ক্ষতি হবে না। এর পরও ওসমান আবার দান করেন এবং আরও সাদকা করেন। এমন কি তাঁর দানকৃত জিনিসের পরিমাণ নগদ অর্থ বাদে নয়শ উট এবং একশ ঘোড়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল।[1]

---

[1] জামে তিরমীযি, ওসমান বিন আফ্ফান (রাঃ)-এর কৃতিত্ব অধ্যায় :

অন্যদিকে আব্দুর রহমান বিন আওফ দু'শ উকিয়া রৌপ্য (যার ওজন ছিল প্রায় সাড়ে উনত্রিশ **কেজি)** নিয়ে এলেন এবং আবু বকর তাঁর সমস্ত সম্পদ নাবী করীম -এর খিদমতে এনে সমর্পণ করলেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ছাড়া তাঁর পরিবারবর্গের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর দানের পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম এবং নাবী করীম সমীপে দান সামগ্রী আমার জন্য তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। ওমর বিন খাত্তাব দান করেন তাঁর অর্ধেক সম্পদ। আব্বাস অনেক সম্পদ নিয়ে আসেন। তালহা সা'দ বিন অবী ওয়াক্কাস এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা যথেষ্ট অর্থ নিয়ে আসেন। আসেম বিন আবী নব্বই অসাক (অর্থাৎ সাড়ে তের হাজার কেজি) খেজুর নিয়ে হাজির হন। অন্যান্য সাহাবীগণও কম বেশী দান খয়রাতের বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে আসেন। এমনকি কেউ কেউ এক মুঠ দুই মুঠ যার নিকট যা ছিল তাই দান করেন। কারণ, এর বেশী দান করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। মহিলাগণ গলার মালা, হাতের চুড়ি, পায়ের অলংকার, কানের কানের রিং, আংটি অন্যান্য যার যা ছিল তা নাবী করীম -এর খিদমতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কেউ কৃপণতা করেন নি এবং এমন কোন হাত ছিল না যে, হাত কিছুই দান করে নি। শুধু মুনাফিকগণ দান খয়রাতে অংশ গ্রহণ করে নি। শুধু তাই নয় যে সকল মুসলিম দান খয়রাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, কথাবার্তায় তাঁদের খোঁচা দিতে তার ছাড়েনি। যাঁদের শ্রম ছাড়া অন্য কিছুই দেবার মতো ছিল না, তাঁদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বল, 'একটা দুইটা খেজুর দিয়েই এরা রোমক সাম্রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখছে। (৯:৭৯)।

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩]

'মু'মিনদের মধ্যে যারা মুক্ত হস্তে দান করে, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে আর সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে যারা বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।' আত্-তাওবাহ (৯) : ৭৯]

তাবুকের পথে ইসলামী সৈন্য (الجيش الإسلامي إلى تبوك) : উল্লেখিত তৎপরতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা দৌড় ঝাঁপের মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে (মতান্তরে সেবা বিন আরফাতকে) মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং নিজ পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনা করার জন্য আলী ইবনু আবি তালিবকে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু মুনাফিকগণ তাঁর প্রতি কটাক্ষ করে কিছু কথাবার্তা বলায় মদীনা হতে বাহির হয়ে রাসূলুল্লাহ -এর নিকট চলে যায়। কিন্তু নাবী করীম পুনরায় তাঁকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন এবং বললেন : (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي). 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সঙ্গে তোমার সে রূপই সম্পর্ক রয়েছে যেমনটি ছিল হারুন (ﷺ)-এর সঙ্গে মুসা (ﷺ)-এর তবে এটা জেনে রাখ যে আমার পরে কোন নাবী আসবে না।'

যাহোক, এ ব্যবস্থাদির পর রাসূলুল্লাহ উত্তর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। (নাসায়ীর বর্ণনা মোতাবেক দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার)। গন্তব্যস্থল ছিল তাবুক ও সৈন্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। এর পূর্বে মুসলিমগণ আর কখনই এত বড় সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হন নি। বিশাল এক বাহিনী এবং সাধ্যমতো অর্থসম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও সৈন্যদের পুরোপুরি প্রস্তুত করে নেয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। খাদ্য সম্ভার এবং যান বাহনের যথেষ্ট অভাব ছিল। আঠার জনের প্রতিটি দলের জন্য ছিল মাত্র একটি করে উট যার উপর তাঁরা আরোহণ করতেন পালাক্রমে। অনুরূপভাবে খাওয়ার জন্য প্রায়ই গাছের পাতা ব্যবহার করতে হতো যার ফলে ওষ্ঠাধরে স্ফীতি সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকন্তু, উটের অভাব থাকা সত্ত্বেও উট যবেহ করতে হতো যাতে পাকস্থলী এবং নাড়িভূড়ির মধ্যে সঞ্চিত পানি এবং তরল পদার্থ পান করা যেতে পারে। এ কারণে এ বাহিনীর নাম রাখা হয়েছিল 'জায়শে উসরাত' (অভাব অনটনের বাহিনী)।

তাবুকের পথে মুসলিম বাহিনীর গমণাগমণ চলল হিজর অর্থাৎ সামুদ সম্প্রদায়ের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। সামুদ ছিল সেই সম্প্রদায় যারা ওয়াদিউল কোরা নামক উপত্যকায় পাথর কেটে কেটে ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। সাহাবীগণ (ﷺ) সেখানকার কূপসমূহ হতে পানি সংগ্রহ করার পর যখন যাত্রা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئاً) 'তোমরা এখানকার পানি পান করনা, এ পানি দ্বারা অযু করোনা এবং এ পানির দ্বারা আটার যে তাল তৈরি করেছ তা পশুদের খাইয়ে দাও, নিজে খেও না।'

তিনি এ নির্দেশও প্রদান করেন যে, 'সালেহ (ﷺ)-এর উট যে কূপ থেকে পানি পান করেছিল তোমরা সে কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে ইবনু ওমর (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী করীম ﷺ যখন হিজর (সামুদ সম্প্রদায়ের অঞ্চল) দিয়ে গমন করছিলেন তখন বলেন, (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين) 'সেই অত্যাচারী সামুদের আবাসভূমিতে প্রবেশ করো না যাতে তোমাদের উপর যেন সে মুসিবত নাযিল হয়ে না যায়, যা তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। হ্যাঁ, তবে কাঁদতে কাঁদতে অতিক্রম করতে হবে। অতঃপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করে নিয়ে দ্রুত গতিতে সেই উপত্যকা অতিক্রম করে গেলেন।[1]

পথের মধ্যে সৈন্যদের পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল। এমন কি লোকজনেরা পিপাসার কষ্ট সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ করল। তিনি পানির জন্য দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করলেন এবং বৃষ্টিও হয়ে গেল। লোকেরা পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করলেন এবং প্রয়োজন মতো তা সংগ্রহ করে নিলেন।

অতঃপর যখন তাবুকের নিকট গিয়ে পৌঁছেন তখন নাবী করীম ﷺ বললেন, (إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يَضْحَي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي)، 'ইনশাআল্লাহ, আগামী কাল আমরা তাবুকের ঝর্ণার নিকট গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু সূর্যোদয় ও দুপুরের মধ্যবর্তী সময়ের পূর্বে পৌঁছানো যাবে না। কিন্তু আমার পৌঁছানোর পূর্বে কেউ যদি সেখানে পৌঁছেন তাহলে আমি যতক্ষণ সেখানে গিয়ে না পৌঁছি ততক্ষণ যেন তাঁরা সেখানকার পানিতে হাত না লাগায়।

মু'আয (ﷺ) বলেছেন, 'আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম তার পূর্বেই দু'জন সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন। ঝর্ণা দিয়ে অল্প অল্প পানি আসছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, (هل مسستما من مائها شيئاً؟) 'তোমরা কি এর পানিতে কেউ হাত লাগিয়েছ? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। নাবী করীম ﷺ সে দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই বললেন।

অতঃপর অঞ্জলির সাহায্যে ঝর্ণা থেকে অল্প অল্প পানি বাহির করলেন এবং এভাবে কিছুটা পানি সংগৃহীত হল। এ পানির দ্বারা তিনি মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করলেন এবং ঝর্ণার মধ্য হতে নিষ্কাষণ করে দিলেন। এর পর ঝর্ণায় ভাল পানির প্রবাহ সৃষ্টি হল। সাহাব কেরাম (ﷺ) পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (يوشك يا معاذ، إن طالت بك حياة أن ترى ماهاهنا قد ملئ جنانا) 'হে মু'আয! যদি তোমার জীবন দীর্ঘ হয় তাহলে এ স্থান তুমি বাগানে পরিপূর্ণ ও শ্যামল দেখবে।[2]

পথের মধ্যে কিংবা তাঁবুকে পৌঁছার পর বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (هب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقالَه) 'আজ রাতে তোমাদের উর দিয়ে প্রবল ঘূর্ণি ধূলি ঝড় বয়ে যেতে পারে। কাজেই, কেউই উঠবে না। অধিকন্তু, যার নিকট উট আছে সে তাকে মজবুত রশি দ্বারা শক্তভাবে বেঁধে রাখবে।' হলও ঠিক তাই, চলতে থাকল প্রবল থেকে প্রবলতর ধূলো বালি যুক্ত ঘূর্ণি

[1] সহীহ বুখারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরে অবতরণ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

[2] মুসলিম শরীফ মু'আয বিন জাবাল হতে বর্ণিত ২য় খণ্ড পৃ: ২৪৬

বায়ু। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। ঘূর্ণি ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাই গোত্রের দুই পর্বতের নিকট নিক্ষেপ করল।[1]

পথ চলা কালে নাবী করীম ﷺ-এর এটা ব্যবস্থা ছিল যে, তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করতেন। তাছাড়া, তিনি জমা তাকদীমও করতেন এবং জমা তাখীরও করতেন (জমা তাকদীমের অর্থ হচ্ছে যোহর ও আসর এ দুই সালাতকে যোহরের সময় এবং মাগরিব ও এশা এ দুই সালাতকে মাগরিবের সময় আদায় করা এবং জমা তাখিরের অর্থ হচ্ছে যোহর ও আসর এ দুই সালাত আসরের সময় এবং মাগরিব ও এশা এ দুই সালাতকে এশার সময়ে আদায় করা)।

ইসলামী সৈন্য তাবুকে (الجـيش الإســلامي بتبــوك) : ইসলামী সৈন্য তাবুকে অবতরণ করে শিবির স্থাপন করলেন। রোমকগণের সঙ্গে দুই দুই হাত করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে জাওয়ামেউল কালাম দ্বারা (এক সারগর্ভ) ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশাবলী প্রদান করেন, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করেন, আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং তাঁর রহমতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। নাবী করীম ﷺ-এর এ ভাষণ সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করে। তাঁদের খাদ্য সম্ভার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঘাটতি জনিত যে অসুবিধা ছিল এ ভাবে মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তিবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে বহুলাংশে তা পূরণ করা সম্ভব হল।

অন্য দিকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ অবগত হয়ে রুমী এবং তাদের মিত্র গোত্রসমূহের মধ্যে এমন ভয় ভীতির সঞ্চার করে যে, সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁদের মোকাবেলা করার সাহস তারা হারিয়ে ফেলল এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে দেশের অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। রুমীদের এ ভয় ভীতিজনক নিষ্ক্রিয়তা আরব উপদ্বীপের ভিতরে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল এবং মুসলিম বাহিনীর জন্য তা এমন সব রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল যুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জন করা মোটেই সহজ সাধ্য ছিল না। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

আয়লার প্রশাসক ইয়াহনাহ্ বিন রুবা নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কর দানের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করল। জারবা এবং আজরুহর অধিবাসীগণ ও খিদমতে নববীতে হাজির হয়ে কর দানের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের লিখিত প্রমাণ প্রত্র প্রদান করেন যা তাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। তিনি আয়লার প্রশাসকের নিকটও লিখিত একটি প্রমাণ পত্র প্রেরণ করেন যার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিম্নরূপ:

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهــل أيلــة، ســفنهم وسيارهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي، ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر، فمن أحــدث منهم حدثاً، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر)

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম : এ হচ্ছে শান্তির আদেশ পত্র আল্লাহর এবং নাবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে ইয়াহনাহ বিন রুমা এবং আয়লার অধিবাসীদের জন্য স্থল এবং সমুদ্র পথে তাদের নৌকা এবং ব্যবসায়ী দলের জিম্মা আল্লাহর এবং নাবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর রইল। তাছাড়া, এ দায়িত্ব সিরিয়া এবং ঐ সকল সমুদ্র তীরবর্তী অধিবাসীদের জন্য রইল যারা ইয়াহনার সঙ্গে থাকে। হ্যাঁ, যদি তাদের কোন ব্যক্তি কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তবে তার অর্থ তার জীবন রক্ষা করবে না এবং যে ব্যক্তি তার অর্থ নিয়ে নেবে তার জন্য তা বৈধ হবে। তাদেরকে কোন ঝর্ণার নিকট অবতরণ করতে এবং স্থল কিংবা জলভাগের কোন পথ অতিক্রম করতে বাধা দেয়া যাবে না।

[1] প্রাগুক্ত।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ চারশ' বিশ জন সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-কে দুমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দেরের নিকট প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁকে বলেন, (إنك ستجده يصيد البقر) 'তোমরা তাকে নীল গাভী শিকার করার সময় দেখতে পাবে।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক খালিদ (রাঃ) তথায় গমন করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন একটুকু দূরত্বে অবস্থান করছিলেন যে দূর্গটি পরিস্কার চোখে পড়ছিল তখন হঠাৎ একটি নীল গাভী বেরিয়ে এসে দূর্গের দরজার উপর শিং দ্বারা গুঁতো দিতে থাকল। উকায়দের তাকে শিকার করার জন্য বাহির খালিদ (রাঃ) এবং তাঁর ঘোড়সওয়ারী দল তাকে বন্দী করে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করলেন এবং দুই হাজার উট, আটশ' দাস, যুদ্ধের চারশ' লৌহ বর্ম এবং চারশ' বর্শা দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। এ সন্ধি চুক্তিতে কর প্রদানের শর্তও সংযোজিত হল। সুতরাং তিনি তার সাথে ইয়াহনাহ্সহ দুমাহ, তাবুক, আয়লাহ এবং তাইমার শর্তানুযায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

যে সকল গোত্র তখনো রোমকগণের পক্ষে কাজ করছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যখন তারা অনুধাবন করল যে, পুরাতন ব্যবস্থাধীনে থাকার দিন শেষ হয়েছে তখন তারা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে মুসলিমগণের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃতি লাভ করে রোমক সাম্রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফলে যে সকল গোত্র রোমকদের শক্তি জোগাত তারা একদম নিঃশেষ হয়ে গেল।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন (الرجوع إلى المدينـــة) : সংঘর্ষ এবং রক্তক্ষয় ছাড়াই মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদের আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। তবে পথের মধ্যে এক জায়গায় একটি গিরিপথের নিকট ১২ জন মুনাফেক নাবী করীম ﷺ-কে হত্যার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়। সে সময় নাবী সে গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শুধু আম্মার (রাঃ) যিনি উটকে লাগাম ধরে ছিলেন এবং হোযায়ফা (রাঃ) ইয়ামান যিনি উটকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) দূরবর্তী উপত্যকার নিম্নভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। এ কারণে মুনাফিকগণ তাদের এ ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্য এটিকে একটি মোক্ষম সুযোগ মনে করে, নাবী করীম ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকল।

এদিকে সঙ্গীদ্বয়সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ যথারীতি সম্মুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিলেন এমন সময় পশ্চাত দিকে থেকে অগ্রসরমান মুনাফিকদের পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পান। এরা সকলেই মুখোশ পরিহিত ছিল। তাদের আক্রমণের উপক্রমমুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হোযায়ফাকে তাদের দিকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর ঢালের সাহায্যে মুনাফিকদের বাহনগুলোর মুখের উপর প্রবল ভাবে আঘাত করতে থাকলেন। এর ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করতে করতে গিয়ে লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাদের নাম বলে দেন এবং তাদের অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এ জন্য হোযায়ফা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'রাযদান' রহস্যবিদ বলা হয়। এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহর এ ইরশাদ অবতীর্ণ হয়

﴿وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟﴾ [التوبة:٧٤]

'তারা ঐ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল যা তারা পায় নি।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ৭৪]

সফর শেষে নাবী করীম ﷺ যখন দূর হতে মদীনার দৃশ্য দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, (তাবা) এবং (উহুদ), এগুলো হচ্ছে সেই পর্বত যা অমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালবাসি। এদিকে যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন সংবাদ পৌঁছে গেল তখন মহিলা ও কিশোরেরা ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) খোশ আমদেদ জানিয়ে এ সঙ্গীতে গুঞ্জণধ্বনি উচ্চারণ করল।[1]

---

[1] এ হচ্ছে ইবনুল কাইয়ুমের বিবরণ। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

طلع البـــدر علينا ** من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ** ما دعا للع داع

অর্থ : সানিয়াতুল ওয়াদ' নামকস্থান হতে আমাদের উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র উদিত হল। আহ্বানকারীগণ যতক্ষণ আল্লাহকে আহ্বান করতে থাকবে ততক্ষণ আমদের কর্তব্য হবে শোকর করা।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাসে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং প্রত্যবার্তন করেছিলেন রমযান মাসে। এ সফরে পূর্ণ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। বিশ দিন তাবুকে এবং ত্রিশ দিন পথে যাতায়েত। তাবুকে অভিযান ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযান যাতে স্বশরীরে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

যারা যুদ্ধে পিছনে ছিলেন (الْمُخَلَّفُــون) : তাবুক যুদ্ধ ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন এক কঠিন পরীক্ষা যা দ্বারা ঈমানদার ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রভেদের একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা তৈরি হয়েছিল। এ ধরণের অবসরে আল্লাহর বিধি-বিধান ও এরূপ ঃ

﴿مَّا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾[آل عمران:١٧٩].

'আল্লাহ মু'মিনদেরকে সে অবস্থায় পরিত্যাগ করতে পারেন না। যার উপর তোমরা আছ, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করে দেন।' (আলু 'ইমরান (৩): ১৭৯]

কাজেই, এ যুদ্ধে মু'মিন ও সত্যবাদিগণ শরীক হন। যুদ্ধ হতে অনুপস্থিত কপটতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সুতরাং তখন ঠিক এ রকম এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে যদি কেউ পিছনে পড়ে থাকত কিংবা পিছুটান হয়ে থাকত তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বলতেন,

(دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه)

'তাকে ছেড়ে যাও। যদি তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকে তাহলে আল্লাহ শীঘ্রই তাকে তোমাদের নিকট পৌঁছে দিবেন। আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার অনুপস্থিতির মাধ্যমে শান্তি প্রদান করবেন।' প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এ যুদ্ধ হতে সেই সকল লোক অনুপস্থিত ছিল, যারা ছিল অপারগ, অথবা ছিল মুনাফিক। মুনাফিকগণ আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমানের মিথ্যা দাবী করত এবং এ দাবীর ভিত্তিতেই তারা যুদ্ধে শরীক হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। মিথ্যা অযুহাতের দোহাই দিয়ে তারা যুদ্ধরত সৈন্যদের পিছনে বসে থাকত। হ্যাঁ, তিন ব্যক্তি এমন ছিল যারা প্রকৃতই মু'মিন ছিল এবং কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে শরিক হওয়া থেকে বিরত ছিল। আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেন এবং পুনরায় তাদের তওবা কবুল করেন।

এর বিবরণ হচ্ছে, প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় প্রবেশের পর সর্ব প্রথম মাসজিদে নববীতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। অতঃপর লোকজনদের জন্য সেখানে বসে পড়েন। এ সময় আশি জনেরও অধিক মুনাফিকের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়ে নানা ওযর আপত্তি আরম্ভ করে দেয়।[1] এবং শপথ করতে থাকে। নাবী ﷺ বাহ্যিকভাবে তাদের গ্রহণ করে আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন এবং ক্ষমা প্রদান করেন। অতঃপর প্রশ্নটি আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে দেন।

অবশিষ্ট তিন জন মু'মিন অর্থাৎ কা'ব বিন মালেক, মোরারাহ বিন রাবী' এবং হেলাল বিন উমাইয়া সত্যবাদিতা অবলম্বন ক'রে স্বীকার করে যে, কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই তারা যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বিরত

---

[1] ইমাম ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন যে, এই সংখ্যা ছিল মুনাফিক আনসারদের। এদের ছাড় বনু গেফার এবং অন্যন্যদের মধ্যে বাহানাকারীদের সংখ্যাও ছিল। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার অনুসারীগণ ছিল ওই সংখ্যার বাইরে এবং এদের সংখ্যাও ছিল বেশ বড়। দ্রঃ ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ১১৯ পৃঃ।

ছিল। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলার জন্য সাহাবীগণ (রাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।

সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কঠিন বয়কট বা বর্জন ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে গেল। মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসে গেল, পৃথিবী ভয়ানক আকার ধারণ করল এবং প্রশস্ততা থাকা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গেল। তাদের জীবনের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল।

এমনি এক বিপদের সৃষ্টি হয়ে গেল যে, ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদেরকে আপন আপন স্ত্রী এবং পরিবার পরিজন থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেওয়া হল। যখন বয়কটের ৫০ দিন পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করা সুসংবাদ প্রদান করে আয়াত নাযিল করলেন,

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة:١١٨].

'আর (তিনি অনুগ্রহ করলেন) ঐ তিনজনের প্রতিও যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল [কা'ব ইবনে মালিক, মুরারা ইবনে রাবী'আ ও হিলাল ইবনে উমায়্যা (রাযি।) তাঁরা অনুশোচনার আগুনে এমনি দগ্ধীভূত হয়েছিলেন যে] শেষ পর্যন্ত পৃথিবী তার পূর্ণ বিস্তৃতি নিয়েও তাদের প্রতি সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই তাঁর পথে ফিরে যাওয়া ব্যতীত। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন যাতে তারা অনুশোচনায় তাঁর দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ অতিশয় তাওবাহ কবূলকারী, বড়ই দয়ালু।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ১১৮]

মীমাংসা সম্পর্কিত এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় সাধারণ মুসলিমগণ এবং ঐ তিন জন সাহাবা অত্যন্ত আনন্দিত হন। লোকেরা দৌড় দিয়ে গিয়ে এ শুভ সংবাদ প্রচার করতে থাকে। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সকলের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় এবং সকলে দান খয়রাত করতে থাকে। প্রকৃতই এ দিনটি ছিল তাদের জন্য চরম ও পরম সৌভাগ্যের দিন।

যারা অপারগতার কারণে যুদ্ধে শরিক হতে পারেন নি অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যও বলেন,

﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

[التوبة: ٩١]

তাঁদের সম্পর্কে নাবী করীমও ﷺ মদীনায় পৌছার পর বলেছেন, (إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مَسِيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، حبسهم العُذْرُ) 'মদীনায় এমন কতগুলো লোক আছে তা তোমরা যেখানেই সফর করেছ এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছ তারা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে। তাদের অপারগতা তাদেরকে রেখেছিল।'

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা মদীনায় অবস্থান করেও আমাদের সঙ্গে ছিল? নাবী করীম ﷺ বললেন, (وهم بالمدينة) 'হ্যাঁ' মদীনায় অবস্থান করেও তারা সঙ্গেই ছিল।'

এ যুদ্ধের প্রভাব (أثر الغـزوة) : আরব উপদ্বীপের উপর মুসলিমগণের প্রভাব বিস্তার এবং তাঁদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলোৎপাদক ঘটনা। এ যুদ্ধের পর থেকে মানুষের নিকট এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরব উপদ্বীপের মধ্যে ইসলামী শক্তিই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠিত শক্তি। অন্য কোন শক্তিরই আর তেমন কোন কার্যকারিতা নেই। এর ফলে অর্বাচীন ও মুনাফিকগণের সেই সকল অবাঞ্ছিত কামনা বাসনা যা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুগের বিবর্তনের গতিধারায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশায় আশিম্বিত ছিল তা একদম নিঃশেষ হয়ে গেল। কারণ, তাদের সকল আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে,

রোমক শক্তি তা যখন ইসলামী শক্তির মোকাবেলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের লালিত আকঙ্খা পূরণের আর কোন পথই রইল না। তখন তাদের কাছে এটাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামী শক্তির নিটক আত্মসমর্পণ করা ছাড়া নিস্কৃতি লাভের আর কোন পথই অবশিষ্ট রইল না।

কাজেই পরিবর্তিত এ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তখন এ রকম কোন প্রয়োজন ছিল না যে, মুসলিমগণ মুনাফিকদের সঙ্গে নম্র ও অযাচিত ভাবে ভদ্র ব্যবহার করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমগণ নির্দেশিত হলেন তাদের সঙ্গে শক্ত, সাহসিকতাপূর্ণ ও শঙ্কাহীন আচরণ করতে। এমনকি তাদের সদকা গ্রহণ, তাদের সালাতে জানাযায় অংশ গ্রহণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাদের কবরের পাশে যাওয়ার ব্যাপারেও মুসলিমগণকে নিষেধ করে দেয়া হল। অধিকন্তু, ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে মসজিদদ নামের যে ক্ষুদ্র কুটিরটি তৈরি করেছিল তা ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। এ সময় তাদের সম্পর্কে এমন এমন সব আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকল যার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপ উলঙ্গ ভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তাদের শঠতা ও দুরভিসন্ধির ব্যাপারে সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইল না। এ যেন মদীনাবাসীদের জন্য উল্লেখিত আয়াতসমূহ ছিল ঐ মুনাফিকদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি সংকেত।

এ যুদ্ধের ইতিবাচক প্রভাবসমূহের মধ্যে এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পরে এমন কি পূর্বে যদিও আরবের প্রতিনিধিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের পরই যথোচিতভাবে শুরু হয়েছিল।[1]

এ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল (نزول القرآن حول موضـــوع الغـــزوة) : উল্লেখিত যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখিত যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে সূরা 'তাওবায়' অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়, কিছু যাত্রার পূর্বে, কিছু যাত্রার পরে, কিছু কিছু ভ্রমণ কালে এবং কিছু মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর। উল্লেখিত আয়াতসমূহে মুনাফিকদের চক্রান্তের যবনিকা উন্মোচন, যুদ্ধের অবস্থা ও মুখলেস মুজাহিদদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া, সিদ্দীকীন মু'মিনদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং যাঁরা হন নি তাদের তওবা কবুল ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

এ সনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনবলী (بعض الوقائع المهمة في هـــذه الســـنة) : এ সনে (৯ম হিজরী) যে সকল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় তা হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপঃ

১. তাবুক হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পর উওয়ায়মের আজলানী ও তার স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়। (স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয় আর তার সাক্ষী না থাকে তাহলে যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয় তাকে লেআন বলা হয়।)

২. গামেদিয়া মহিলা যে নাবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দিয়েছিল তাকে প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছিল। এ মহিলার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যখন শিশুটি দুগ্ধ পান থেকে বিরত হয়েছিল তখন তাকে প্রস্তরঘাত করা হয়েছিল।

৩. সম্রাট আসাহামা নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

৪. নাবী করীম ﷺ-এর কন্যা উম্মু কুলসুম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে নাবী করীম ﷺ গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। তিনি ওসমানকে বলেন যে, (لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها) 'আমার তৃতীয় কন্যা থাকলে তার বিবাহও তোমার সঙ্গে করতাম।'

---

[1] উল্লেখিত যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্ত উৎস হতে সংঘৃহীত হয়েছে, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫১৫-৫৩৭ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড, ২-১৩ পৃঃ, সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৩-৬৩৭ ও ১ম খণ্ড ২৫২-৪১৪ পৃঃ অন্যান্য সহীহ মুসলিম নববী সহ ২য় খণ্ড ২৪৬ পৃঃ, ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ১১০-১২৬ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসারুস সীরাহ ৩৯১-৪০৭ পৃঃ।

৫. রাসূলুল্লাহ -এর তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ওমর -এর বাধা দান সত্ত্বেও তার সালাতে জানাযা আদায় করেন। পরে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে তাতে ওমর -এর মত সমর্থন করে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করা হয়।

আবূ বাকর -এর হজ্জ পালন (حج أبي بكر رضي الله عنه) :

নবম হিজরীর হজ্জ (আবু বকর সিদ্দীক -এর নেতৃত্বে) এ সালের (৯ম হিজরী) যিলকাদা কিংবা যিলহজ্জ মাসে রাসূলুল্লাহ মানাসেকে হজ্জ (হজ্জের বিধি বিধান) কায়েম করার উদ্দেশ্যে আবু বকর সিদ্দীক -কে আমিরুল হজ্জ (হজ্জযাত্রী দলের নেতা) হিসেবে প্রেরণ করেন। এরপর সূরা বারাআতে (তাওবার) প্রথমাংশে অবতীর্ণ হয় যাতে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা সমতার ভিত্তিতে শেষ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে ঘোষণা প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ আলী -কে প্রেরণ করেন। যেহেতু রক্ত এবং সম্পদ সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার বা চুক্তিনামার প্রশ্নে এটাই ছিল আরবের নিয়ম, সেহেতু এমনটি করতে হয় (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই ঘোষণা করবে কিংবা পর কোন সদস্যের মাধ্যমে তা করানো হবে। পরিবার বহির্ভূত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদত্ত ঘোষণা স্বীকৃত হতো না।) আবু বকর -এর সঙ্গে আলী -এর সাক্ষাত হয় আরয অথবা জাজনান নামক উপত্যকায়। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন নির্দেশদাতা না নির্দেশ প্রাপ্ত? আলী বললেন, না, বরং নির্দেশ প্রাপ্ত।

অতঃপর দুই জনই সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আবু বকর সকল লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী দিবসে আলী বিন আবু তালিব মাজরার (কংকর নিক্ষেপের স্থান) নিকট দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার মাঝে রাসূলুল্লাহ -এর নির্দেশিত বিসয়ে ঘোষণা প্রদান করেন, অর্থাৎ অঙ্গীকারকারীগণের সকল অঙ্গীকারের বিলুপ্তি ঘোষণা প্রদান করেন এবং এ সকল বিষয় চূড়ান্ত করা জন্য চার মাস মেয়াদের কথা বলা হয়। যাদের সঙ্গে কোন চুক্তি ছিল না তাদেরকেও চার মাসের সময় দেয়া হয়। তবে যে মুশরিকগণ মুসলিমগণের সঙ্গে অঙ্গীকার পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করে নি, কিংবা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে অন্য কাউকেই সাহায্য প্রদান করে নি, তাদের অঙ্গীকার নামা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবত রাখা হয়।

আবু বকর একদল সাহাবা কেরামের মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান করেন যে, আগমীতে কোন মুশরিক খানায়ে কা'বার হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

এ ঘোষণা ছিল মূর্তিপূজার জন্য শেষ অশনি সংকেত অর্থাৎ এর পর থেকে মূর্তি পূজার আর কোন সুযোগই রইল না।[1]

যুদ্ধ পরিক্রমা (نظرة على الغزوات) ঃ

রাসূলুল্লাহ -এর পরিচালনায় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ, যুদ্ধাভিযান ও সৈনিক মহোদ্যম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়ার পর যুদ্ধের পটভূমি, পরিবেশ, পরিচালনা, নিকট ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যিনি বিচার বিশ্লেষণ করবেন তাঁকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নাবী করীম ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর বিশারদ এবং সমর নায়ক। শুধু তাই নয়, তাঁর সমরাদর্শও ছিল সকল যুগের সকল সমর ও নায়কের অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর যুদ্ধ সম্পর্কিত উপলব্ধি ও অনুধাবন ছিল সঠিক ও সময়োপযোগী, অন্তদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর এবং সিদ্ধান্ত ছিল সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাপ্রসূত রিসালাত ও নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য তিনি ছিলেন রাসূলগণের সরদার (সাইয়্যিদুল মুরসালীন) এবং ছিলেন নাবীকূল শিরোমনি (আ'যামুল আমবিয়া)। সৈন্য পরিচালনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্ব এবং একক গুণের

---

[1] এ হজ্জের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ২২০ ও ৪৫১ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৬২৬ ও ৬৭১ পৃঃ. যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ২৫ ও ২৬ পৃঃ,ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫৪৩-৫৪৬ পৃঃ, এবং সূরা বারাআতের প্রথমাংশের তফসীর।

অধিকারী। যখনই কোন যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন তখই দেখা গেছে যে, যুদ্ধের স্থান নির্বাচন, সেনাবাহিনীর বিন্যাস ব্যবস্থা, সমর কৌশল, সমরাস্ত্রের ব্যবহার বিধি , অক্রমণ, পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারে তিনি সাহসিকতা, সতর্কতা ও দূরদুর্শিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সমর পরিকল্পনা হয় নি এবং এ কারণেই মুসলিম বাহিনীকে কখনই কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয় নি।

অবশ্য উহুদ এবং হোনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাময়িকভাবে কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সমর পরিকল্পনা কিংবা সমর কৌশলের ত্রুটি কিংবা ঘাটতির কারণে এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত কৌশল নিষ্ঠার সঙ্গে অবলম্বন করলে এ বিপর্যয়ের কোন প্রশ্নই আসত না। এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল কিছু সংখ্যক সৈন্যের ভুল ধারণা এবং দুর্বল মানসিকতা থেকে। উহুদ যুদ্ধে যে ইউনিটকে গিরিপথে পাহাড়ার দায়িত্বে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল তাঁদের ভুল বুঝাবুঝির কারণেই সেদিন কিছুটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। হোনাইন যুদ্ধের দিন কিছুক্ষণের জন্য বিপর্যয়ে সৃষ্টি হয়েছিল কিছু সংখ্যক সৈন্যের কিছুটা মানসিক দুর্বলতা এবং শত্রুপক্ষের আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ার কারণে।

উল্লেখিত দুই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের মুখে নাবী করীম ﷺ যে অতুলনীয় সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন মানব জাতির যুদ্ধের ইতিহাসে একমাত্র তিনিই ছিলেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকার মুখেও পর্বতের ন্যায় অটল অচল থাকার কারণেই বিপর্যস্ত প্রায় মুসলিম বাহিনী ছিনিয়ে এনেছিলেন বিজয়ের গৌরব।

ইতোপূর্বে যে আলোচনা করা হল তা ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত। কাজেই, যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে সে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়াও এমন কতগুলো সমস্যা যেগুলো ছিল সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা সে সকল সম্যাসার সমাধানের নাবী করীম ﷺ তৎকালীন আরব সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন, অশান্তি ও অনিষ্টতার অগ্নি নির্বাপিত করেন, মূর্তিপূজার মূলোৎপাটনের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়ে করেন এবং আপোষ ও সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মুশরিকদের বৈরিতার অবসান ঘটান। তাছাড়া সে সকল সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতি হন এবং তাদের ষড়যন্ত্র এবং ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে মুসলিমগণকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন।

অধিকন্তু, বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখী মোকাবেলায় লিপ্ত হয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত সৃষ্টির মাধ্যমে এত যুদ্ধাভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে মুসলিম বাহিনীকে তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন যে পরবর্তী কালে এ বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ার ময়দানে বিশাল বিশাল পারস্য ও রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করার পর তাদের বাড়িঘর, সহায় সম্পদ, বাগ-বাগিচা ঝর্ণা ও ক্ষেতখামার থেকে বিতাড়িত করেন এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সকল যুদ্ধের মাধ্যমে হিজরতের কারণে ছিন্নমূল মুসলিমগণের আবাসভূমি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আয় উপার্জনহীন মরণার্থীদের জন্য উত্তম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের উপযোগী সরঞ্জামামি, ঘোড়া এবং যুদ্ধের ন্যায় নির্বাহের জন্য অর্থ সম্পদ ইত্যাদিও সংগ্রহ করে দেন, অথচ এ সব করতে গিয়ে কখনই তিনি বিধিবহির্ভূত কোন ব্যবস্থা, অন্যায় কিংবা উৎপীড়নের পথ অবলম্বন করেন নি।

যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং নীতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। জাহলিয়াত যুগে যুদ্ধের রূপ ছিল লুটতরাজ, নির্বিচার হত্যা অত্যাচার ও উৎপীড়ন, ধর্ষণ, নির্যাতন, কায়ক্লেশ ও কঠোরতা অবলম্বন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। কিন্তু ইসলাম জাহেলী যুগের সে যুদ্ধ নামের দানাবীর কাণ্ডকারখানাকে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে পবিত্র জিহাদে রূপান্তরিত করেন। জিহাদ হচ্ছে অন্যায় ও অসত্যেরত মূলোৎপাটনের করে ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে সত্য, প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। জিহাদদ বা সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি, অন্যায় উৎপীড়ন, ধ্বংস, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অপহরণ, অহেতুক হত্যা ইত্যাদি কোন

কিছুরই সামান্যতম অবকাশও ছিল না। ইসলামে যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হত।

শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা, সাক্ষাত সমরে যুদ্ধ পরিচালন, যুদ্ধ বন্দী, যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নিয়ম নীতি অনুসরণ করেছিলেন সর্বযুগের সমর বিশারদগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ভূমি কিংবা সম্পদ দখল, সাম্রাজ্য বিস্তার কিংবা আধিপত্যের সম্পসারণ নির্যাতিত নিপীড়িত ও অবহেলিতত মানুষকে সত্যের পথে আনয়ন, ন্যায় ও কল্যাণ ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে সম্মানজনক জীবন যাপন, সকল প্রকার ভূয়া আভিজাত্যের বিলোপ সাধনের মাধ্যমে অভিন্ন এক মানবত্বরোধের উন্মেষ, লালন ও অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল তদস্থলে মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন এবং নিরাপদ ও শান্তি স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ [النساء:٧٥]

'তোমার কোন কল্যাণ হলে তা হয় আল্লাহ্‌র তরফ হতে এবং তোমার যে কোন অকল্যাণ হয় তা হয় তোমার নিজের কারণে এবং আমি তোমাকে মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করেছি, (এ কথার) সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।' [আন-নিসা (৪) : ৭৫]

যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল মানবোচিত আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান কিংবা সাধারণ সৈনিকগণ যাতে কোনক্রমেই তার অপপ্রয়োগ না করেন কিংবা এড়িয়ে না যান তার প্রতি তিনি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

সোলায়মান বিন বোরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন ব্যক্তিকে কোন মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা অভিযাত্রী দলের নেতা নির্বাচিত করতেন তখন গন্তব্যস্থলে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে তাঁর নিজের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ভাল মন্দের ব্যাপারে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করতেন। অতঃপর বলতেন,

(اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، فلا تغلوا، ولاتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً...)

'আল্লাহর নির্দেশিত পথে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করবে, যারা আল্লাহর কুফরী করেছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। ন্যায় সঙ্গতভাবে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, শত্রুপক্ষের কোন ব্যক্তির নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করবে না। কোন শিশুকে হত্যা করবে না।' - শেষপর্যন্ত।

অনুরূপভাবে নাবী করীম ﷺ সহজভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতেন এবং বলতেন, (يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا) 'সহজভাবে কাজ করো, কঠোরতা অবলম্বন করো না। মানুষকে শান্তি দাও, ঘৃণা করো না'[1]

যখন তিনি আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোন বস্তির নিকট রাত্রে গমন করতেন তখন সকাল হওয়ার পূর্বে কখনই তিনি আক্রমণ করতেন না। কোন শত্রুকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কোন ব্যক্তিকে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় হত্যা করতে এবং মহিলাদের মারধর এবং হত্যা করতেও নিষেধ

[1] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৮২-৮৩ পৃঃ।

করতেন। লুণ্ঠন কার্যকে তিনি কঠোর ভাবে নিরুৎসাহিত করে বলতেন, (إن النُّهْبَى ليست بأحل من الميتة) : 'লুণ্ঠন-লব্ধ মাল মুর্দার চাইতে অধিক পবিত্র নয়।' তাছাড়া ক্ষেতখামার নষ্ট করা, পশু হত্যা এবং অহেতুক গাছপালা কেটে ফেলতে তিনি নিষেধ করতেন। অবশ্য যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে গাছপালা কেটে ফেলার অনুমতি যে তিনি দিতেন না তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও না।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালেও নাবী করীম ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, (لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبراً، ولا تقتلن أسيراً) আহত ব্যক্তিদের আক্রমণ করবে না, কোন পলাতকের পিছু ধাওয়া করবে না, এবং কোন বন্দীকে হত্যা করবে না, কোন কওম কিংবা রাষ্ট্রের দূতকে হত্যা করবে না।'

অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলিম দেশের নাগরিকদেরও হত্যা করতে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, (من قتل معاهداً لم يُرِحْ رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً) 'কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তিকে যে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধদ চল্লিশ বছরেরও অধিক পথের দূরত্বে পাওয়া যাবে।'

উল্লেখিত বিষয়াদির বাইরে আরও অনেক উন্নত মানের নিয়ম-কানুন তিনি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন যার ফলে তাঁর সমর কার্যক্রম জাহেলিয়াত যুগের পৈশাচিকতা ও অপবিত্রতার কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জিহাদের রূপ লাভ করে।

আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ (الناس يدخلون في دين الله أفواجاً) ঃ

ইতোপূর্বে যেমনটি আলোচিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছিল এমন একটি যুগান্তকারি ঘটনা যা মূর্তিপূজার মূলকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করে এবং আরবে মিথ্যাকে অপসৃত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামের বিজয় গৌরব আরববাসীগণের মনের সর্বপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশে করতে থাকে। আমর বিন সালমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'আমরা এক ঝর্ণানর ধারে বসবাস করতে ছিলাম। সে স্থানটি ছিল বাণিজ্য কাফেলার গমনাগমনের পথ। বাণিজ্য কাফেলা যখন সে পথ দিয়ে গমনাগমন করত তখন লোকজনদের জিজ্ঞেস করতাম, 'লোকজনেরা সব কেমন আছ? ঐ লোক , অর্থাৎ নাবী করীম ﷺ-এর অবস্থা কেমন? তারা বলত, 'তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ তাঁকে নাবী করছেন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নিকট ওহী আসে। আল্লাহ তাঁর নিকট এ এ বিষয়ে ওহী অবতীর্ণ করেছেন।' তিনি তাদের কথা এমনভাবে স্মরন করে রাখতাম যে সেগুলোকে যেন আমার সীনা চিমটিয়ে ধরে রাখত।'

ইসলামের সুশীতল ছায়াতল আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা বলত 'তাঁকে এবং তাঁর দলকে ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য ছেড়ে দাও। যদি তিনি কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের উপর বিজয়ী হন তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি প্রকৃতই নাবী। কাজেই, যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হল তখন বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের উন্মুখতা নিয়ে মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হল। আমরা গোত্রের লোকজনদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আমার পিতাও গমণ করলেন। অতঃপর যখন তিনি খিদমতে নববী থেকে ফেরত আসলেন তখন বললেন, 'আল্লাহর শপথ! একজন সত্য নাবীর নিকট থেকে আমি তোমাদের নিকট আসছি। নাবী ﷺ বললেন, 'অমুক সময় সালাত আদায় করা। যখন সালাতের সময় হবে তোমাদের মধ্য হতে একজন আযান দেবে এবং কোরআন শরীফ যার ভাল জানা আছে সে সালাতে ইমামতি করবে।[1]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনা, ঘটনা প্রবাহের মোড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, ইসলামকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে, আরব অধিবাসীদের নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে এবং তাদের বহুত্ববাদের ধারণাকে মন মস্তিষ্ক থেকে অপসারণ করে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করার ব্যাপারে কত ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে তাবুক অভিযানের পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এ অবস্থার বিস্তৃতি ঘটতে

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬১৫-৬১৬ পৃঃ।

থাকে। এর প্রমাণ হিসেবেই এটা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ৯ম ও ১০ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণেচ্ছু বিভিন্ন দলের মদীনা আগমণ একের পর এক অব্যাহত থাকে এবং তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকে।

এ সময় আরববাসীগণ যে অত্যন্ত অধিক সংখ্যক হারে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে সেনাবাহিনী। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজারে সেক্ষেত্রে একটি বছর অতিবাহিত না হতেই মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা উন্নীত হয় ত্রিশ হাজারে। এর অল্প কাল পরেই বিদায় হজ্জের সময় এ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা উন্নীত হয় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অথবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে। শ্রাবণ প্লাবনের ন্যায় উচ্ছ্বসিতত হয়ে ওঠে ইসলামের সৈন্যসংখ্যা। বিদায় হজ্জের সময় এ বিশাল বাহিনী নাবী করীম ﷺ-এর চার পাশে এমনভাবে লাব্বায়িক, তাকবীর, হামদ ও তসবীহ ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন যে, আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর একত্ববাদের ঐক্যতানে সমগ্র উপত্যকা মুখরিত হয়ে ওঠে।

প্রতিনিধিদল সমুহ (الـوفــــــود) : ধর্ম যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে, সকল প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেছেন তার সংখ্যা ছিল সত্তরের অধিক। কিন্তু এখানে সে সবের পুরো বিবরণ প্রমাণের অবকাশ নেই এবং তার কোন প্রয়োনও সেই। এ প্রেক্ষিতে আমরা শুধু সে সকল প্রতিনিধিদলের কথা আলোচনা করব যে গুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আরও যে বিষয়টির প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন তা হচ্ছে যদিও সাধারণ গোত্র সমূহের প্রতিনিধি দলগুলো মক্কা বিজয়ের পর খিদমতে নববীতে উপস্থিত হতে আরম্ভ করেছিল,কিন্তু কোন কোন গোত্র এমন যে তাদের প্রতিনিধিদলগুলো মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মদীনাতে আগমন করেছিল। এখানে আমরা তাদের কথাও উল্লেখ করছি।

১. আব্দুল কাইসের প্রতিনিধিদল (وفد عبــد القــيس) : এ গোত্রের প্রতিনিধিদল দুইবার খিদমতে নববীতে উপস্থিত হয়েছিল। প্রথম বার ৫ম হিজরীতে কিংবা তারও কিছু পূর্বে এবং দ্বিতীয় বার ৯ম হিজরীতে। প্রথমবার তাদের আগমণের কারণ ছিল ঐ গোত্রের মুনকেজ বিন হেব্বান নামক এক ব্যক্তি বাণিজ্য পণ্যাদি নিয়ে মদীনায় যাতায়াত করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের পর প্রথমবার যখন সে মদীনায় আগমন করল তখন ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হয়ে মুসলিম হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি পত্র সহ নিজ গোত্রে প্রত্যাবর্তন করল। ইসলামের বিষয়াদি অবগত হয়ে সেই গোত্রের লোকজনেরাও ইসলাম গ্রহণ করল। ১৩ কিংবা ১৪ জনের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল হারাম মাসগুলোর মধ্যে খিদমতে নববীতে গিয়ে হাজির হল। সে সময় ঐ প্রতিনিধিদল নাবী করীম ﷺ-এর নিকট ঈমান এবং পানীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। এ দলের নেতা ছিল আল আশাজ্জ আল আসরী।[1] যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন যে,

(إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)

'তোমাদের মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তা হচ্ছে (১) দূরদর্শিতা ও (২) ধৈর্য্য।'

ইতোপূর্বে যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে, এ গোত্রের দ্বিতীয় দলটি আগমন করে ছিল ৯ম হিজরীতে। ঐ সময় দলের সদস্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাদের অন্যতম ছিল আলা' বিন জারুদ আবদী নামক একজন খ্রিষ্টান। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার ইসলামই ছিল উত্তম।[2]

২. দাউদ গোত্রের প্রতিনিধি দল (وفــد دَوْس) : ৭ম হিজরীর প্রথম ভাগে এ প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় খায়বরে অবস্থান করছিলেন। ইতোপূর্বে এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, এ গোত্রের নেতা তোফায়েল বিন আমর দাউসী (রাঃ) ঐ সময় ইসলামের আওতাভূক্ত হয়েছিলেন, যখন নাবী করীম ﷺ

---

[1] মওলানা ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) প্রণীত মিরআতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড ৭১পৃঃ।

[2] আল্লামা নববী রচিত মুসলিম শরীফের শারাহ ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ, এবং ফতুহুল বারী ৮ম খণ্ড

মক্কায় ছিলেন। অতঃপর তিনি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে মনোনিবেশ করে অবিরামভাবে কাজ করে যেতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রাদায়ের লোকেরা নানা প্রকার ছলনার আশ্রয় নিয়ে বিলম্ব করতে থাকে। এভাবে অযথা সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তোফায়েল তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন এবং খিদমতে নববীতে হাজির হয়ে দাউস গোত্রের লোকজনদের বদ দু'আর পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বলে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! দাউস গোত্রের লোকজনদের হিদায়েত করুন।'

নাবী ﷺ-এর দু'আর বরকতে দাউস গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে যায়। তোফায়েল দাউসী নিজ সম্প্রদায়ের ৭০ কিংবা ৮০টি পরিবারের একটি দল সহ ৭ম হিজরীর প্রথমভাগে মদীনায় আগমন করেন। ঐ সময় নাবী করীম ﷺ খায়বার গিয়েছিলেন এ কারণে তোফায়েল সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে খায়বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হন।

৩. ফারওয়াহ বিন আমর জোযামীর সংবাদ বহন (ـــ رسول فَرْوَةَ بن عمرو الجُـــذَامي) **:** ফারওয়াহ ছিলেন রোমক সেনাবাহিনীতে একজন আরবীয় সেনাপতি। রুমীগণ তাঁকে রোমক সাম্রাজ্যের সীমান্তে আরব অঞ্চলসমূহের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কেন্দ্র ছিল মায়ান (দক্ষিণ উরদুন) এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এর কার্যকারিতা ছিল। মূতা যুদ্ধে (৮ম হিজরী) তিনি মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে তিনি মুসলিমগণের বীরত্ব এবং সমর দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর একজন সংবাদ বাহকের মাধ্যমে তাঁর মুসলিম হওয়ার সংবাদ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করেন। উপঢৌকনের মধ্যে একটি সাদা খচ্চরও তিনি প্রেরণ করেন। রুমীগণ তাঁর মুসলিম হওয়ার সংবাদে তাঁকে বন্দী করে কয়েদখানার নিক্ষেপ করে। অতঃপর ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় পূর্ব ধর্মে প্রবেশ করা নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁকে বলা হয়। তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করার চাইতে মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দেন। কাজেই, ফিলিস্তীনের আফরা' নামক এক ঝর্ণার উপর সুলীকাষ্ঠে ঝুঁলিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।[1]

৪. সাদা' প্রতিনিধি দল (وفـــد صُـــدَاء) **:** নাবী করীম ﷺ-এর জেয়েররানা হতে প্রত্যবর্তনের পর ৮ম হিজরীতে এ প্রতিনিধিদল খিদমতে নববীতে উপস্থিত হয়। এর কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ৪০০ (চারশ) মুজাহেদীন সমন্বয়ে এক বাহিনী সংগঠন করে ইয়েমেনের সাদা' গোত্রে আবাসিক অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনের নির্দেশ প্রদান করেন। এ বাহিনী যখন কানাত উপত্যকায় স্থাপিত শিবিরে অবস্থান করছিল তখন মেয়াদ বিন হারেস সাদায়ী এ ব্যাপারটি অবগত হয়ে তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হন এবং আরয করেন যে, আমার পরে যারা আছেন তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আমার সম্প্রদায়ের জন্য জামিন হচ্ছি। নাবী করীম ﷺ কাল বিলম্ব না করে উপত্যকা থেকে মুসলিম বাহিনীকে ফিরিয়ে আনেন। এরপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে যেয়াদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনদের উৎসাহিত করতে থাকেন। এর ফলে ১৫ জনের একটি দল খিদমতে নববীতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণ করে। অতঃপর নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে রত হয়। এর ফলে এ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রসার লাভ করে। বিদায় হজ্জের সময় এ সম্প্রদায়ের একশ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সম্মান অর্জন করেন।

কা'ব বিন যোহাইর বিন আবী সালমার আগমন (قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى) **:** তিনি ছিলেন আরবের এক অভিজাত বংশোদ্ভূত একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি কাফির ছিলেন এবং নাবী করীম ﷺ-এ নামে কুৎসা রটনা করতেন। ইমাম হাকিমের বর্ণনাতেও তিনিও সে অপরাধীদের অন্তভূক্ত ছিলেন মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যাদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, যদিও তাদেরকে কা'বা পর্দা ধরে আশ্রিত অবস্থায়ও পাওয়া যায় তাহলেও যেন তাদের গ্রীবা কর্তন করা হয়। কিন্তু এ ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পেয়ে যায়। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তায়েফ যুদ্ধ

---

[1] যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ৪৫ পৃঃ।

হতে ফিরে এসে (৮ম হিজরী) তখন কা'বের নিকট ভাই বোজাইর বিন যোহাইর এ মর্মে পত্র লিখেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার এমন কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন যার তাঁর নামে কুৎসা রটনা করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। কুরাইশদের ছোটখাটো কবিগণের মধ্যে যার যে দিকে সুযোগ সুবিধা হয়েছে সে সেদিকে পলায়ন করেছে। অতএব, যদি তুমি প্রাণে রক্ষা পেতে চাও তাহলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে হাজির হয়ে যাও। কারণ, নাবী করীম ﷺ-এর দরবারে গিয়ে কেউ তওবার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তাকে হত্যা করেন না। যদি এ কথার উপর তুমি আস্থাশীল না হও তাহলে যেখানে খুশী গিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করতে পারে।"

এরপর দুই ভাইয়ের মধ্যে পত্রালাপ চলতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে কা'বের নিকট পৃথিবীর পরিসর সংকীর্ণ মনে হতে থাকে। এমনকি তার নিকট নিজের জীবনের ফুল নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল- এ কারণে অবশেষে সে মদীনায় আগমন করল এবং জোহাইন গোত্রের এক ব্যক্তির মেহমান হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করল। অতঃপর তার সঙ্গে ফজরের সালাতা আদায় করল। ফজরের সালাত হতে ফারেগ হওয়া মাত্রই জোহাইন গোত্রের লোকটি তাঁকে ইঙ্গিত করলে তিনি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে চিনতেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কা'ব বিন জোহাইর তওবা করে মুসলিম হয়েছেন এবং আপনার নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। আমি যদি তাঁকে আপনার খিদমতে হাজির করি তাহলে আপনি কি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করবেন?

নাবী করীম ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'

অতঃপর তিনিই বললেন, 'আমি হচ্ছি কা'ব বিন জোহাইন'। এ কথা শুনে একজন আনসারী সাহাবী তাকে হত্যা করার জন্য লাফ দিয়ে ওঠেন এবং তাঁর গ্রীবা কর্তন করার জন্য অনুমতি চান। নাবী করীম ﷺ বললেন,

(دعه عنك، فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه)

'ক্ষান্ত হও, এ ব্যক্তি তাওবা করেছে, এবং তাওবা করার কারণে সমস্ত দোষক্রটি থেকে সে মুক্তি লাভ করেছে।'

এ সময়েই কায়াব বিন জোহাইন তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা পাঠ করে নাবী করীম ﷺ-কে শোনাল যার প্রথম পংক্তিটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল,

بانت سعاد فقلبي اليوم مَتْبُول ** مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا، لم يُفْدَ، مَكْبُول

অর্থ : 'সু' আদ চলে গিয়েছে, বিরহ ব্যথায় আমার অন্তর বিদীর্ণ, আমি বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ আমার মুক্তিপণ দেয়া হয়নি।

এ কবিতবতেই কা'ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসাসহ তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত লাইনগুলো আবৃত্তি করেন,

نبئت أن رسول الله أوعدني ** والعفو عند رسول الله مأمول

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الـــ ** قرآن فيها مواعيظ وتفصيل

لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم ** أذنب، ولو كثرت فيَّ الأقاويل

لقد أقوم مقاما ما لو يقوم به ** أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل

لظل يرعد إلا أن يكون له ** من الرسول بإذن الله تنويل

حتى وضعت يميني ما أنازعه ** في كف ذي نقمات قيله القيل

فلهو أخوف عندي إذ أكلمه ** وقيل: إنك منسوب ومسئول

من ضيغم بضراء الأرض مخدرة ** في بطن عثر غيل دونه غيل

إن الرسول لنور يستضاء به ** مهند من سيوف الله مسلول

অর্থ : আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ধমক দিয়েছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ক্ষমার আশা করা হয়। আপনি অপেক্ষা করুন। যে আল্লাহ আপনাকে হিদায়েতপূর্ণ কুরআন দিয়েছেন, তিনি আপনাকে হিদায়েতের কাজে সাফল্য দান করুন। (নিন্দুকদের কথায়, কান দিবেন না) যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমি কোন অপরাধ করেনি। আমি এমন এক জায়গায় দণ্ডায়মান আছি, আমি সেই কথাই শুনেছি এবং দেখেছি যে হাতীও যদি সেখানে দাঁড়ায় এবং সেই কথাগুলো শুনে তাহলে কম্পিত হবে। এ অবস্থা ব্যতীত যে তার উপর আল্লাহর অনুমতিতে রাসূল ﷺ-এর মেহেরবানী হয়। এমন কি আমি নিজ হাত কোন দ্বিধা ছাড়াই এমন এক সম্মানিত ব্যক্তির হাতে রেখেছি যাঁর প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং যার কথাই আসল কথা যখন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। এমতাবস্থায় আমাকে বলা যে, 'তুমি এ কথা বলেছ এবং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তা তো আমার নিকট সে সিংহের চাইতেও ভয়ানক যার থাকার স্থান এমন এক উপত্যকায় অবস্থিত যা অত্যন্ত কঠিন এবং ধ্বংসাত্মক যার পূর্বেও ধ্বংস হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই রাসূল আলোকস্বরূপ, তাঁর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়। কোষমুক্ত হিন্দুস্থানী ধারালো তলোয়ার।

এরপর কা'ব বিন জোহাইন কুরাইশ মুহাজিরগণের প্রশংসা করেন। কারণ, কা'বের আগমনে তাদের কোন ব্যক্তি ভাল উক্তি ছাড়া কোন মন্তব্য করে নি এবং কোন গতিভঙ্গীও পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু তাদের প্রশংসা কালে আনসারদের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন। কারণ তাঁদের একজন তার গ্রীবা কর্তনের অনুমতি চেয়েছিল। কাজেই তিনি বললেন,

يمشون مَشْي الجمال الزُّهْرِ يعصمهم ** ضَرْبٌ إذا عَرَّد السُّودُ التَّنَابِيل

অর্থ : ওরা (কুরাইশগণ) সুশ্রী উটের ন্যায় হেলে দুলে চলেন। অসিযুদ্ধ তাদের রক্ষা করে যখন কদাকার কুৎসিত লোকেরা রাস্তা ছেড়ে পলায়ন করে।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর যখন তাঁর ঈমান দৃঢ় হয় তখন আনসারদের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং তাঁদের ব্যাপারে তাঁর যে ত্রুটি হয়েছিল তার তিনি সংস্কার করে নেন। এ কবিতাটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

من سره كَرَمُ الحـــياة فلا يَزَلْ ** في مِقْنَبٍ من صالحي الأنصار

ورثوا المكارم كابراً عن كـــابر ** إن الخـــيار هـــم بنـــو الأخيار

অর্থ : ভদ্রোচিত জীবন যাপন যার পছন্দনীয় হয় তিনি সর্বদাই সৎ সাহায্যকারীদের দলভূক্ত হয়ে থাকেন। তার ভাল স্বভাবগুলো পিতা এবং পূর্বের পিতৃপুরুষগণের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতই ভাল লোক ভাল লোকেরাই সন্তান হয়।

৬. উযরাহ প্রতিনিধি দল (وفد عُــذْرَة) : এ প্রতিনিধি দল ৯ম হিজরীতে মদীনায় আগমন করেন। এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল বার জন। এদের মধ্যে হামাযাহ্ বিন নোমানও ছিলেন। তাঁদের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে দলনেতা বলেন যে, তাঁরা বনু উযারাহ অন্তর্ভূক্ত কুসসি গোত্রের বৈমাত্রেয় ভাই। আমরাই কুসসির সমর্থন দান করে বনু বকর এবং বনু খোযায়া গোত্রকে মক্কা হতে বহিস্কার করেছিলাম। এদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে। এ প্রেক্ষিতে নাবী করীম ﷺ তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং শাম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তাঁদের নিষেধ করলেন এবং তাঁদেরকে সে সব যবেহ থেকে নিষেধ করলেন যা তাঁরা (মুশরিক থাকা কালীন)

যবেহ করতেন। এ দলটি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করার পর নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যান।

৭. বেলী প্রতিনিধি দল (وفد بَلــي) : ৯ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে এ দলটি মদীনায় আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর ৩ দিন সেখানে অবস্থান করেন। মদীনায় অবস্থান কালে দলের নেতা আবু যবীর জিজ্ঞেস করেন যে, নিমন্ত্রণ করাতে কিরূপ সওয়াব আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة)،

'ধণাঢ্য কিংবা মুখাপেক্ষীদের যে কোন ভাল আচরণই করবে সেটাই সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'নিমন্ত্রণের সময় সীমা কত?

নাবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, 'তিন দিন'।

তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, 'মালিক বিহীন হারানো ভেড়া কিংবা বকরী পেলে তার হুকুম কি? নাবী করীম বললেন, (هي لك أو لأخيك أو للــذئب) 'তা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের জন্য হবে অথবা বাঘের খোরাক হবে।' এরপর তিনি হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (مالك وله؟ دعه حتى يجــده صاحبه) 'এ সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তার মালিক প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ওকে ছেড়ে দিতে হবে।'

৮. সাকীফ প্রতিনিধি দল (وفــد ثقيــف) : তাবুক হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পর ৯ম হিজরীর রমাযান মাসে এ দলটি খিদমতে নববীতে উপস্থিত হন। এ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনার গতি প্রকৃতি ছিল ৮ম হিজরীর যীলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তায়েফ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের করেন তখন তাঁর মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই এ গোত্রের সর্দার উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফী মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজ কওমের নিকট ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। যেহেতু তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং শুধু এটাই নয় যে, কওমের লোকেরা তাকে মান্য করে চলত বরং তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মেয়েদের এবং মহিলাদের চাইতেও বেশী প্রিয় ভাবত। এ কারণেই তাঁর ধারণা ছিল যে, লোকেরা অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করে চলবে। কিন্তু যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন সম্পূর্ণ উল্টো ফল ফলল। লোকেরা তীরের আঘাতে আঘাতে তাঁকে হত্যা করে ফেলল।

তাঁকে হত্যার পর একই অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এটা তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের যারা ইসলাম ধর্ম করেছেন তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় টিকে থাকার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং অবস্থার প্রেক্ষিতে আলাপ আলোচনা ও সলাপরামর্শের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে একজন লোক পাঠানোর সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করল এবং এ কাজের জন্য আবদে ইয়ালিল বিন আমরকে মনোনীত কলর কিন্তু এ কাজের জন্য সে প্রথমাবস্থায় রাজি হল না। তার আশঙ্কা ছিল যে, তার সঙ্গেও সে আচরণ করা হতে পারে যা উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফীর সঙ্গে করা হয়েছিল। এ কারণে তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে আরও কিছু সংখ্যক লোক না পাঠালে আমার পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়।'

লোকেরা তাঁর এ দাবী মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাহায্যকারীদের মধ্য হতে দুইজনকে এবং বনু মালেক গোত্রের মধ্য হতে তিনজনকে তাঁর সঙ্গে দিল। কাজেই, তাঁকে সহ মোট ছয় জনের সমন্বয়ে দলটি গঠিত হল। এ দলের ওসমান বিন আবিল আস সাকাফীও ছিলেন যিনি ছিলেন বয়ষে সর্বকনিষ্ঠ।

যখন তাঁরা খিদমতে নববীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের জন্য মসজিদের এক কোণে একটি তাঁবু খাটিয়ে দিলেন। যাতে তাঁরা কুরআন শ্রবণ করতে এবং সাহাবীগণ (রাঃ)-কে সালাতরত অবস্থায় দেখতে পারেন। অতঃপর তাঁরা নাবী করীম ﷺ-এর নিকট যাতায়াত করতে থাকেন এবং তিনি তাঁদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। অবশেষে তাঁদের নেতা প্রস্তাব করলেন যে, নাবী করীম ﷺ তাঁর নিজের এবং সাকীফ গোত্রের মধ্যে এমন একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে দেবেন যার মধ্যে ব্যাভিচার,

মদ্যপান এবং সুদ খাওয়ার অনুমতি থাকবে। অধিকন্তু, তাদের উপাস্য লাত বিদ্যমান থাকবে, তাদের জন্য সালাত মাফ করে দিতে হবে এবং তাদের মূর্তি গুলোকে বিনষ্ট করা হবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের অযৌক্তিক দাবী সমূহের কোনটিকেই মেনে নিতে পারলেন না। অতএব তাঁরা নির্জনে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে থাকলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁরা কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা একটি শর্ত আরোপ করলেন এবং তা হচ্ছে তাঁদের মূর্তি লাতকে বিনষ্ট করার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যবস্থাবলম্বন করতে হবে। সাকীফ গোত্রের লোকেরা কখনই নিজ হাতে তা ধ্বংস করবে না। ওমমান বিন আবিল আস সাকাফীকে তাঁদের দলের নেতা মনোনীত করে দিলেন। কারণ, ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ এবং দ্বীন ও কুরআনের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সব চাইতে উৎসাহী এবং অগ্রণী। এর কারণ ছিল দলের সদস্যগণ প্রত্যহ সকালে যখন খিদমতে নববীতে উপস্থিত হতেন তখন ওসমান বিন আবিল আস শিবিরে থাকতেন। অতঃপর দলের লোকেরা যখন দুপুর বেলা শিবিরে ফিরে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন তখন ওসমান বিন আবিল আস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কুরআন পাঠ করতেন এবং দ্বীনের কথাবার্তা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তিনি যখন নাবী করীম ﷺ-এর বিশ্রামের অবস্থায় পেতেন তখন আবু বকরের খিদমতে গিয়ে হাজির হতেন। ওসমান বিন আবিল আসের নেতৃত্বে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুবরণ করার সময়ের পর আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে যখন নব্য মুসলিমগণের মধ্যে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় তখন সাকীফ গোত্রের লোকেরা ধর্মত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ওসমান বিন আবিল আস (রাঃ) সকলকে সম্বোধন করে বলল,

(يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاماً، فلا تكونوا أول الناس ردة، فامتنعوا عن الـردة، وثبتـوا علـى الإسلام)

'হে সাকীফ গোত্রের লোকজনেরা! তোমরা সকলের শেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ। এখন স্বধর্ম ত্যাগ করলে সকলের পূর্বেই তোমরা স্বধর্ম ত্যাগী, তোমরা এভাবে স্বধর্ম ত্যাগ করো না।' এ কথা শ্রবণের পর ধর্মত্যাগের চিন্ত া পরিহার করে তাঁরা ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকেন।

যাহোক, দলের লোকেরা নিজ গোত্রীয় লোকজনদের নিকট ফিরে আসার পর তাঁদের প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ভবিষ্যত লড়াইয়েরর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে চিন্তান্বিত ও দুঃখিত হয়ে বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ এবং ব্যাভিচার, মদ ও সুদ পরিত্যাগ কর, অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করা হবে।' এ কথা শ্রবণের পর প্রথমাবস্থায় সাকীফ গোত্রের লোকদের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের অহমিকা প্রাবল্য লাভ করে এবং দুই তিন দিন যাবত তাঁরা যুদ্ধের কথাই চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু এর পর আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন, যার ফলে পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁর সমস্ত শর্ত মেনে নেয়ার চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় প্রতিনিধিদল প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করে এবং যে সকল কথার পর উপর সন্ধি হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলে। সব কিছু অবগত হওয়ার পর সাকীফ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ লাত মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে প্রেরণ করেন। মুগীরা বিন শো'বা দাঁড়িয়ে লৌহ নির্মিত গদা বিশেষ উত্তোলন করলেন এবং তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহর শপথ আমি আপনাদের জন্য সাকীফদের সম্পর্কে একটু হাসির ব্যবস্থা করব।

অতঃপর লাতের উপর গুর্জ দ্বারা আঘাত করলেন এবং নিজেই মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন এবং পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে থাকলেন। এ উদ্ভট দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তায়েফবাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলতে লাগল 'আল্লাহ মুগীরাকে ধ্বংস করুক'। লাত দেবী তাকে হত্যা করেছে'। এমন সময় মুগীরা

লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের মন্দ করুন। এ তো হচ্ছে মাটি এবং পাথরের তৈরি একটি মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতঃপর তিনি দরজার উপর আঘাত করেন এবং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। এর পর সব চাইতে উঁচু দেয়ালের উপর ওঠেন, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক সাহাবীও ওঠেন। অতঃপর তা ভেঙ্গে মাটির সমতল করে ফেলেন। এমনকি ভিত পর্যন্ত উঠিয়ে ফেলেন এবং অলঙ্কার ও পোশাকাদি বাহির করে ফেলেন। সাকীফ গোত্রের লোকেরা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় এ সব কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। খালিদ (রাঃ) অলংকার ও পোশাকাদিসহ নিজ দলের সঙ্গে মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লাতের মন্দির থেকে আনীত দ্রব্যাদি বন্টন করে দেন এবং নাবী ﷺ-এর সাহায্য এবং দ্বীনের সম্মানের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন।[1]

৯. ইয়ামান সম্রাটের পত্র (رسالة ملـــوك الـــيمن) : তাবুক হতে নাবী করীম ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পর হিমইয়ার সম্রাট অর্থাৎ হারেস বিন আবদে কালাল, নায়ীম বিন আবদে কালাল এবং রায়ীন হামদান ও মোয়াফেরের অধিনায়ক নোমান বিন কীলের পত্র আসে। পত্রবাহক ছিলেন মালেক বিন মুররাহ হাদী। ঐ সম্রাটগণ ইসলাম গ্রহণ এবং শিরক্ ও শিরককারী হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের সংবাদাদিসহ পত্র প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের পত্রের উত্তরে পত্র লিখে ঈমানদারদের প্রাপ্য এবং দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। এ পত্রে লিখে ঈমানদারদের প্রাপ্য এবং দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। এ পত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গীকারাবদ্ধদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর অঙ্গীকারাবদ্ধদের জন্য শর্ত সাপেক্ষ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। এতে শর্ত ছিল তাঁরা যথারীতি কর পরিশোধ করবেন। অধিকন্তু, নাবী করীম ﷺ কতিপয় সাহাবা (রাঃ)-কে ইয়েমেন প্রেরণ করেন। মু'আয বিন জাবালকে এ দলের আমীর নিযুক্ত করেন।

وجعله على الكورة العلياء من جهة عَدَن بين السَّكُون والسَّكَاسِك، وكان قاضياً وحاكماً في الحروب، وعاملاً على أخـــذ الصدقة والجزية، ويصلي بهم الصلوات الخمس، وبعث أبا موسي الأشعري رضي الله عنه على الكورة السفلي: زُبَيْد ومأرب وَزَمَع والساحل، وقال: (يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا). وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسي الأشعري رضي الله عنه فقدم عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

১০. হামদান প্রতিনিধি দল (وفـــد همـــدان) : তাবুক যুদ্ধ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পর ৯ম হিজরীতে এ প্রতিনিধিদল খিদমতে নববীতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু তথ্য জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁদের একটি পত্র দেন এবং মালেক বিন নামতকে (রাঃ) তাঁদের নেতা এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট মুসলিম হয়েছিলেন তাঁদের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। অবশিষ্ট অন্যান্যদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য খালিদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন এবং দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নি। অতঃপর নাবী করীম ﷺ আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে সেখানে প্রেরণ করেন এবং খালিদকে মদীনায় ফেরত পাঠানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

আলী (রাঃ) হামদান গোত্রের লোকজনদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র পাঠ করে শোনান এবং ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এর ফলে তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আলী (রাঃ)-এর নিকট থেকে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় পতিত হন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বলেন,

(السلام على همدان، السلام على همدان)

'হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক , হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক ।'

১১. বনু ফাযারার প্রতিনিধি দল (وفد بني فَـــزَارَة) : তাবুক হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পর এ প্রতিনিধিদল ৯ম হিজরীতে মদীনায় আগমন করেন। এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দশ জনের অধিক। এরা

---

[1] যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ২৬-২৮ পৃঃ। ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫৩৭-৫৪২ পৃঃ।

সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কথা বলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপর পদার্পণ করলেন এবং দুই হাত তুলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি আল্লাহর সমীপে আরয করলেন,

(اللهم اسق بلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً، مريئاً مَريعاً، طَبَقاً واسعاً، عاجلاً غير آجل، نافعاً غير ضار، اللّهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولاهَدْم ولا غَرَق ولا مَحْق، اللّهم اسقنا الغيث، وانصرنا على الأعداء)

'হে আল্লাহ! তোমার রহমত ধারা বর্ষণ ও বিস্তৃতি করে তোমার সৃষ্টিরাজিকে পরিতৃপ্তি করো এবং মৃতপ্রায় জনপদকে সঞ্জীবিত কর। হে আল্লাহ! আমদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ কর যা আমাদের জন্য আনন্দায়ক কল্যাণকর ও আরামদায়ক হয় এবং বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হয় তা যেন বিলম্বে না হয়ে শীঘ্র হয়। হে আল্লাহ! এ বৃষ্টি যেন তোমরা রহমতের সৃষ্টি হয়, শাস্তিমূলক কিংবা ধ্বংসাত্মক না হয়, তা যেন আমাদের ভাসিয়ে না দেয় এবং নিশ্চিহ্ন করে না ফেলে। হে আল্লাহ! বৃষ্টিদ্বারা আমাদের পরিতৃপ্তি কর এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।[1]

১২. নাজরানের প্রতিনিধি দল (وفد نجـران) : মক্কা হতে ইয়েমেনের দিকে যেতে সাত দিনের দূরত্বে একটি বড় অঞ্চল ছিল, ঐ অঞ্চলটি ছিল ৭৩ পল্লী বিশিষ্ট। কোন দ্রুতগামী বাহন একদিনে পুরো অঞ্চল ভ্রমণ করতে সক্ষম হতো না এ অঞ্চলে এক লক্ষ যোদ্ধা পুরুষ ছিল। এরা ছিল সকলেই খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী।

নাজরানের প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করেন ৯ম হিজরী সনে। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ষাট। ২৪ জন ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। যার মধ্যে ৩ জন ছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এর মধ্যে একজনের নাম ছিল আব্দুল মাসীহ। তিনি ছিলেন আকেব। তাঁর দায়িত্ব ছিল অধিনায়কত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনা। দ্বিতীয় জনের নাম ছিল আইহামা অথবা সোরাহবিল। তিনি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখাশোনা করতেন, উপাধি ছিল সাইয়্যিদ। তৃতীয় জনের নাম ছিল আবু হারিসা বিন আলকামা। তিনি ছিলেন ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক নেতা (লাট পাদরী) উপকুফ।

মদীনায় পৌঁছার পর এ দলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অতঃপর নাবী করীম ﷺ এবং এ প্রতিনিধি দলের মধ্যে উভয় পক্ষের কিছু প্রশ্ন নিয়ে কথাবার্তা হয়। এরপর নাবী করীম ﷺ তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শোনান। কিন্তু তাঁরা ইসলাম গ্রহণ না করে পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি মাসীহ (عليه السلام) সম্পর্কে কি বলছেন? তাঁদের জবাবে কিছু না বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরুত্তর রইলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হল:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ - الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ - فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران:٥٩-٦١]

'আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদামের অবস্থার মত, মাটি দ্বারা তাকে গঠন করে তাকে হুকুম করলেন, হয়ে যাও, ফলে সে হয়ে গেল। এ বাস্তব ঘটনা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতেই, সুতরাং তুমি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে (ঈসার সম্বন্ধে) বিতর্ক করবে তাকে বল, 'আসো, আমাদের পুত্রদেরকে এবং তোমাদের পুত্রদেরকে আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে আহ্বান করি, অতঃপর আমরা মুবাহলা করি আর মিথ্যুকদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষণ করি।' [আলু 'ইমরান (৩) : ৫৯-৬১]

---

[1] যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

সকাল হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আয়াত সমূহের আলোকে ঈসা (عليه السلام) সম্পর্কে তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন এবং এর পর সারা দিন যাবত এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ দেন। কিন্তু তাঁরা ঈসা (عليه السلام) সম্পর্কিত নাবী করীম (ﷺ)-এর কথাবার্তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর পরবর্তী দিবস সকালের কথা যেহেতু দলের সদস্য ঈসা (عليه السلام) সম্পর্কিত নাবী করীম (ﷺ)-এর কথাবার্তা মেনে নিতে এবং ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন সেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে মুবাহালার জন্য দাওয়াত দিলেন। হাসান ও হোসাইন (رضي الله عنهما) একই চাদর পরিবেষ্টিত অবস্থায় আগমন করলেন। পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন ফাতেমা (رضي الله عنها)।

প্রতিনিধি দল যখন লক্ষ্য করলেন যে, প্রকৃতই নাবী (ﷺ) সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন তখন নির্জনে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। আকেব এবং সাইয়্যিদ একজন অপরজনকে বললেন, 'দেখ মুবাহালা করো না। আল্লাহর কসম! তিনি যদি সত্যিই নাবী হন এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে মুলাআনত করি তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কখনই কৃতকার্য হবে না। পৃথিবীর উপরিভাগে আমাদের একটি লোম এবং নখও ধ্বংস হতে রক্ষা পাবে না। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ ব্যাপারে বিচারক নির্ধারণ করা হোক।

কাজেই তাঁরা নাবী করীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন যে, 'আপনি যে দাবী করবেন আমরা তার মানার জন্য প্রস্তুত থাকব।' এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের নিকট থেকে কর গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তাঁদের দুই হাজার জোড়া কাপড় প্রদানের স্বকৃতি সাপেক্ষে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। তাঁরা এ কাপড় প্রদান করবেন এক হাজার জোড়া রজব মাসে এক হাজার জোড়া সফর মাসে। অধিকন্তু, এটাও স্বীকৃত হল যে, প্রতি জোড়া কাপড়ের সঙ্গে এক উকিয়া রৌপ্য (একশ বায়ান্ন গ্রাম) প্রদান করবে। এর বিনিময়ে নাবী করীম (ﷺ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে করীম (ﷺ)-এর জামানত প্রদান করলেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করলেন। পক্ষান্তরে তাঁরা এ আরজি পেশ করলেন যে, তাঁদের নিকট হতে কর আদায়ের জন্য নাবী করীম (ﷺ) যেন একজন আমানতদার প্রেরণ করেন। চুক্তি মোতাবেক এ কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মতের আমানতদার আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে প্রেরণ করেন।

এরপর তাদের মধ্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। চরিত বিশারদগণের বর্ণানানুযায়ী সৈয়দ এবং আকেব নাজরানে প্রত্যাবর্তনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নাবী করীম (ﷺ) তাঁদের সাদকা ও কর আদায়ের জন্য আলী (رضي الله عنه)-কে প্রেরণ করেন। এটি একটি বিদিত বিষয় যে, মুসলিমগণের নিকট থেকেই সাদকা গৃহীত হয়ে থাকে।[1]

১৩. বনু হানীফার প্রতিনিধি দল (وفد بني حنيفة) : এ প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করেছিলেন ৯ম হিজরী সনে। মুসায়লাম কায্যাবসহ এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন।[2]

মুসায়লামার বংশ পরিচয় : মুসায়লামা বিন সুমাম বিন কাবীর বিন হারিসের এ দলটি একজন আনাসারী সাহাবীর বাড়িতে আশ্রিত হন। অতঃপর খিদমতে নববীতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে মুসায়লমা কায্যার সম্পর্কে ভিন্নমুখী বর্ণনা রয়েছে। সকল বর্ণনার সার সংক্ষেপসূত্রে বুঝা যায় যে, অধিনায়কত্বের বাসনা ও উৎকট অহংবোধের কারণে সে নাবী করীম (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হয় নি। নাবী করীম (ﷺ) প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রোচিত আচরণের মাধ্যমে তাঁর মন তুষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন তিনি অনুধাবন করেন যে ভদ্রোচিত আচরণ ফলোৎপাদক হবে না তখন তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, এর মধ্যে অনিষ্টতার সম্ভাবনা রয়েছে।

---

[1] ফথহুল বারী ৮ম খণ্ড ৯৪-৯৫ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ৩৮-৪১ পৃঃ। নাজরান প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত বিবরণে কিছু বিরোধ আছে এবং সেই কারণেই কোন কোন মুহাক্কেকীন বলেছেন যে, নাজরদের প্রতিনিধিদল মদীনায় দুইবার এসেছিলেন। কিন্তু আমরা উপরে যা বর্ণনা করেছি সেটাই অমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

[2] ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৮৭ পৃঃ।

এর পূর্বে নাবী করীম ﷺ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তাঁর নিকট এনে রাখা হয়েছে তার মধ্যে দুটি সোনার তৈরি বালা এসে তাঁর হাতে পড়েছে। এ দেখে নাবী করীম ﷺ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কাজেই, ওহীর মাধ্যমে তাঁকে ঐ দু'টিতে ফুঁক দেয়ার কথা বলা হল। তিনি সে মোতাবেক তাতে ফুঁক দিলেন এবং তৎক্ষনাত তা উড়ে গেল। নাবী করীম এভাবে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর পরে দুই মিথ্যুকের (নিম্ন শ্রেণীর মিথ্যুক) আবির্ভাব ঘটবে। কাজেই মুসলিম যখন আত্মম্ভরিতার সঙ্গে বললেন যে, 'মুহাম্মদ যদি তাঁর পরে আমার উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে হাওয়ালা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব।'

এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট গেলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি খেজুরের শাখা এবং তাঁর মুখপাত্র হিসেবে সঙ্গী ছিলেন সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস (রাঃ)। মুসায়লাম নিজ সঙ্গীগণের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তাঁর মাথার উপর গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কথা বললেন।

মুসায়ালাম বললেন, 'আপনি যদি চান তাহলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিব। কিন্তু আপনার পরবর্তী অবস্থায় আমাদের জন্য আপনাকে নেতৃত্বে দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নাবী করীম (খেজুরের শাখাটির প্রতি ইঙ্গিত করে) বললেন, (لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيـــك، ولئن أدبرتَ ليعقرنك الله، والله إني لأراك الذي أريتُ فيه ما رأيتُ، وهذا ثابت يجيبك عني)، 'যদি তুমি আমার নিকট হতে এর অংশটুকুও চাও তবুও আমি তোমাকে তা দেব না। অথচ তুমি নিজের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত অংশের একটুও ব্যতিক্রম করতে পারবে না। যদি তুমি পশ্চাদমুখী হও তবুও আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে সে ব্যক্তিই মনে করছি যার ব্যাপারে আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। আমাকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে আমার পক্ষ থেকে সাবেত বিন কায়েস তার বিবরণ দেবেন।'

অতঃপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।[1]

তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অনুধাবন করে ছিলেন ঠিক তাই হল। মুসায়লামা কায্যাব ইয়মামা ফিরে গিয়ে প্রথমে নিজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। অতঃপর দাবী করেন যে, তাঁকে নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে নবুওয়াতের কাজে শরীক করা হয়েছে। কাজেই, সে নবুওয়াতের দাবী করতে থাকে এবং অমিল ছন্দের কবিতা রচনা করতে থাকে। নিজ সম্প্রদায়ের জন্য ব্যভিচার এবং মদ্যপনা বৈধ করে দেয় এবং এ সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে এ সাক্ষ্যও দিতে থাকে যে, নাবী মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নাবী। এ ব্যক্তির প্রচারণার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনদের মধ্যে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা এত বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে যে, তাকে ইয়ামামার রহমান বলা হতে থাকে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তিনি এ মর্মে একটি পত্র লিখেন যে, 'আপনি যে কাজে রত আছেন আমাকে সে কাজে আপনার শরীক করা হয়েছে রাষ্ট্রের অর্ধেক আমাদের জন্য এবং অর্ধেক কুরাইশদের জন্য।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمـــتقين) 'পৃথিবী আল্লাহর! নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং এর শেষ ফলাফল সমীহকারীদের জন্যই।[2]

ইবনু মাসউদ হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনু নওয়াহা এবং ইবনু আসাল মুসায়লামার পত্র বাহাক হিসেবে নাবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে। নাবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, (أتشهدان أني رسول الله؟) 'তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?' তারা বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লাম আল্লাহর রাসূল'। নাবী করীম ﷺ বললেন, (آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما) 'আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল

---

[1] সহীহ বুকারী বনু হানীফা এবং আসওয়াদ আনাসীর অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬২৭-৬২৮ পৃঃ, এবং ফতুহুল বারী ৮ম খণ্ড ৮৭-৯৩ পৃঃ।

[2] যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ৩১-৩২ পৃঃ।

(ﷺ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যদি কোন পত্র বাহককে হত্যা করা আমার নীতি হতো তাহলে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতাম।'[1]

মুসায়লামা কায্যার ১০ম হিজরীতে নুবওয়াতের দাবী করেন। আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে ইয়ামামা যুদ্ধে দ্বাদশ হিজরী রবিউল আওয়ালে তাকে হত্যা করা হয়। তার হত্যাকারী ছিল একজন ওয়াহশী যে হামযাহ (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল।

নুবওয়াতের দাবীদার মুসায়লাম কায্যারের পরিণতি হয়েছিল এই নবুওয়াতের দ্বিতীয় দাবীদার ছিল আসওয়াদ আনসী যে ইয়েমেনে বিবাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। রাসূলে করীম (ﷺ)-এর ওফাত প্রাপ্তির মাত্র ২৪ ঘন্টা পূর্বে ফিরোয (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। অতঃপর তার সম্পর্কে নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট ওহী নাযিল হয় এবং তিনি সাহাবীগণ (রাঃ)-কে তা অবহিত করেন। এরপর ইয়েমেন হতে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট নিয়মিত সংবাদ আসতে থাকে।[2]

১৪. বনু আমের বিন সা'সার প্রতিনিধি দল (وفد بني عامر بن صعصعة) : এ প্রতিনিধি দল আল্লাহর শত্রু আমের বিন তোফাইল, লাবীদের বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ বিন কায়স, খালিদ বিন জাফর এবং জাব্বার বিন আসলাম অন্তর্ভূক্ত ছিল। এরা ছিল নিজ কওমের নেতা এবং শয়তান গোছের লোক। আমের বিন তোফাইল ছিল সে ব্যক্তি যে, 'বীরে মউনায়' সত্তর জন্য সাহাবীগণকে (রাঃ) শহীদ করিয়েছিল। এরা যখন মদীনায় আসার ইচ্ছা করল তখন আমের এবং আরবাদ দুই জনে মিলে ষড়যন্ত্র করল যে, প্রতারণার মাধ্যমে তারা নাবী করীম (ﷺ)-কে হত্যা করবে। কাজেই, যখন তারা দলবদ্ধভাবে মদীনায় পৌছল তখন আমের নাবী করীম (ﷺ)-এর কথোপকথন আরম্ভ করল এবং আরবাদ পাশ কাটিয়ে নাবী করীম (ﷺ)-এর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর সে তার তলোয়ার খানা কোষমুক্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোষ হতে তলোয়ার খানা একটু বাহির হওয়ার পর আর বের হল না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নাবী (ﷺ)-কে হেফাযত করলেন।

নাবী করীম (ﷺ) তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলেন। যার ফলে তাদের প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা আরবাদ এবং তার উটের উপর বিজলী নিক্ষেপ করেন যাতে আরবাদ দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে। এদিকে আমের এক সলুলিয়া মহিলার নিকট অবতরণ করল। সে সময় তার গ্রীবাদেশে একটি ফোঁড়া ওঠে এবং তার ফলে তার অবস্থার দারুন অবনতি ঘটায়। সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময় সে বলতে থাকে 'আপসোস! উটের ফোঁড়ায় ন্যায় ফোঁড়া এবং একজন সুললিয়া মহিলার ঘরে মৃত্যু?'

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অমের বলল, 'আমি আপনাকে তিনটি কথার অধিকার দিচ্ছি,

১. আপনার জন্য থাকবে উপত্যকার লোকজন আর আমার জন্য থাকবে জনবসতি।
২. অথবা আপনার পরে আমি বহ খলীফ।
৩. অন্যথায় আমি গাতফান এক হাজার ঘোটক এবং এক হাজার ঘোটকী সহ আপনার উপর আক্রমণ চালাব।

অতঃপর সে এক মহিলার গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত চিন্তান্বিত অবস্থায় বলতে থাকে 'উটের ফোঁড়ার ন্যায় ফোঁড়া হল কেন? এবং সে আবার বনু ফোলানার এক মহিলার ঘরে? আমার নিকট আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।' অতঃপর সে ঘোড়ার পিঠে উঠল এবং সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করল।

১৫. তোজাইর প্রতিনিধি দল (وفد تُجيب) : এ প্রতিনিধি দলটি নিজ কওমের সাদকার অর্থ যা ফকীদের দেওয়ার পর অতিরিক্ত ছিল তা নিয়ে মদীনায় আগমন করেছিল। এ দলে ১৩ জন লোক ছিল, যারা কুরআন ও

---

[1] মুসনাদে আহমদ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৩৪৭ পৃঃ।

[2] ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ।

সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত এবং শিক্ষা গ্রহণ করত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি তাদেরকে সেগুলো লিখে দেন। মদীনায় স্বল্পকাল অবস্থান করে। যখন নাবী করীম ﷺ তাদেরকে উপঢৌকন দ্বারা পুরস্কৃত করেন তখন তারা নিজেদের এক যুবককেও প্রেরণ করে। এ যুবককে তারা শিবিরে রেখে এসে ছিল। যুবক খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, 'হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমাকে আমার অঞ্চল থেকে এর এছাড়া অন্য কোন বস্তু টেনে আনেনি যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে প্রার্থনা করবেন যেন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের সঙ্গে আমার সম্পদ আমার অন্তরে নিহিত করে দেন। নাবী করীম ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। এর ফল হল এ ব্যক্তি সব চাইতে অল্প তুষ্ট হল। যখন অন্যদেরকে ধর্ম ত্যাগের ঢেউ বয়ে যেতে থাকল তখন শুধু এ ব্যক্তিই ইসলামের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রইল এবং নিজ কওমের লোকজনদের নসীহত করতে থাকল এর ফলে তারাও ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ করল। অতঃপর এ দলভূক্ত লোকজনেরা ১০ম হিজরী বিদায় হজ্জের সময় দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে।

১৬. 'তাই' প্রতিনিধি দল (وفـد طيِّـــئ) : এ দলের সঙ্গে আরবের প্রসিদ্ধ ঘোড়সওয়ারী যায়েদুল খাইলও ছিলেন। তাঁরা নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁদের সামনে ইসলাম উপস্থাপন করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অনেক ভাল মুসলিম হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ (রাঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন,

(ما ذكر لي رجل من العرب بفضل، ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه ، إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه)

'আমাকে আরবের যে কোন লোকের প্রশংসা শুনানো হয়েছে এবং সে আমার নিকট এসেছে তখন আমি তাকে তার প্রচারকৃত প্রশংসা থেকে কম পেয়েছি। কিন্তু তার বিপরীত হচ্ছে যায়েদুল খাইল। কারণ, তাঁর খ্যাতি তাঁর প্রকৃত গুণের নিকটেই পৌঁছে নি।'

অতঃপর নাবী করীম ﷺ তাঁর নাম রাখেন 'যায়েদুল খাইর'।

এমনি ভাবে ৯ম ও ১০ম হিজরীতে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করতে থাকেন। চরিতকারগণ ইয়ামান, আযদ, কোযায়ার বনু সা'দ, হোযাইম, বুন আমের বিন কায়েস, বনু আসাদ, বোহরা, খাওলান, মুহারিব, বনু হারেস বিন কা'ব, গামেদ, বনু মুনতাফিক, সালামান, বনু আবস, মুযাইনা, মোরদ, যাবীদ, কিন্দাহ, যীমুরাহ, গাস্‌সান, বুন আইশ এবং নাখ এর প্রতিনিধি দল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'নাখ' এর দলই ছিল শেষ দল যা ১১শ হিজরী মুহারম মাসের মধ্যে এসেছিল। ঐ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দুই শত। অবিশষ্ট অন্যান্য দলগুলো আগমন করে ৯ম ও ১০ম হিজরীতে। অল্প কিছু সংখ্যক পরে একাদশ হিজরীতে আগমন করেছিল।

ওই সকল প্রতিনিধি দলের আগমন ধারা থেকেই বুঝা যায় যে, সে সময় ইমলামী দাওয়াত কতটা বিস্তার লাভ করেছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের কতটা স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছিল। অধিকন্তু, এটাও আঁচ অনুমান করা সম্ভব যে, আরববাসীগণ মদীনাকে কি পরিমাণ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। এমন কি মদীনার নিকট মাথা নত করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃতই মদীনা সমগ্র আরব উপদ্বীপের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এবং মদীনাকে এড়িয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অবশ্য সকল আরববাসীর অন্তর ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এমনটি বলা হয়ত সঙ্গত হবে না। কারণ, তাদের মধ্যো তখনো এমন কিছু সংখ্যক বেদুঈন ছিল যারা শুধুমাত্র তাদের নেতাদের অনুসরণে মুসলিম হয়েছিল। মুসলিম হিসেবে পরিচিত প্রদান করলেও তাদের মধ্যে হত্যা এবং লুটতরাজের মনোভাব পূর্বের মতোই ছিল। ইসলামী আদর্শের প্রভাবে তারা ততটা প্রভাবিত হয় নি। এ প্রেক্ষিতে কুরআন কারীমের সূরা তাওবায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة:٩٧، ٩٨]

'বেদুঈন আরবরা কুফুরী আর মুনাফিকীতে সবচেয়ে কঠোর, আর আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার তারা অধিক উপযুক্ত, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা প্রজ্ঞাবান। কতক বেদুঈন যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে জরিমানা ব'লে গণ্য করে আর তোমাদের দুঃখ মুসিবতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, মন্দের চক্র তাদেরকেই ঘিরে ধরুক। আর আল্লাহ তো সব কিছুই শুনেন, সব কিছু জানেন।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ৯৭-৯৮]

আবার কিছু লোকের সুনামাও করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة:٩٩].

'কতক বেদুঈন আল্লাহতে ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে আর তারা যা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য ও রসূলের দু'আ লাভের মাধ্যম মনে করে, সত্যিই তা তাদের (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভের মাধ্যম, অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন, অবশ্যই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ৯৯]

যতদূর পর্যন্ত মক্কা, মদীনা, সাকাফ, ইয়েমেন ও বাহরায়েন অধিকাংশ শহরের অধিবাসীদের সম্পর্ক বিস্তৃত ছিল তাঁদের মধ্যে ইসলাম পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ করেছিল এবং তাঁদের মধ্য হতেই প্রখ্যাত সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) এবং নেতৃস্থানীয় মুসলিমগণের আবির্ভাব ঘটেছিল।[1]

[1] এ কথা বলেছেন খুযরী মোহাযারাতে, ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ, এবং যে সকল প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথবা যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বুখারী ১ম খণ্ড ১৩ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৬২৬-৬৩০ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫০১-৫০৩ পৃঃ, ৫১০-৫১৪ পৃঃ, ৫৩৭-৫৪২ পৃ: ৫৬০-৬০১ পৃঃ, যাদুল মায়াদ ৩য় খণ্ড ২৬-৬০ পৃঃ, ফতহুল বারী ৮ম হিজরী ৮৩-১০৩ পৃঃ, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১৮৪-২১৭ পৃঃ।

نجاح الدعوة وأثرها

দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব

এখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জীবনের শেষ দিনগুলো আলোচনার পর্যায়ে পৌঁছেছি। কিন্তু এ আলোচনার জন্য কলমকে গতিশীল করার পূর্বে তাঁর সফল বিচিত্র ও বিশিষ্ট জীবনধারা যা অন্যান্য নাবী ও রাসূলগণের তুলানায় তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছিল এবং প্রাধান্য প্রদান করেছিল। সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা নাবী করীম ﷺ-এর মাথার উপর পূর্ব ও পরের সকল নেতৃত্বের মুকুট স্থাপন করেছিলেন। নাবী করীম ﷺ-কে বলা হয়,

﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ –قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الآيات [المزمل:١، ٢].

'ওহে চাদরে আবৃত (ব্যক্তি)! ২. রাতে সলাতে দাঁড়াও তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে।' (আল-মুয্যাম্মিল (৭৩) : ১-২]

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ –قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر:١، ٢]

'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। [আল-মুদ্দাসসির (৭৪) : ১-২]

অতঃপর কি ছিল? প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং এ পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অনবরত দণ্ডায়মান রইলেন। অর্থাৎ পূর্নাঙ্গ মান বিকাশের সুমহান দায়িত্ব, একত্ববাদ বিশ্বাসের গুরুদায়িত্ব এবং আল্লাহর আমানত বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট গন্তব্যের পানে এগিয়ে চলা যা জাহেলিয়াত যুগের গাঢ় অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, যা বস্তুবাদী ও বহুত্ব বাদী ভাবধারায় ছিল দারুনভাবে ভারাক্রান্ত যা ছিল পশু প্রবৃত্তি ও লালসার বেড়াজাল আবদ্ধ। অতঃপর একদল অত্যন্ত বিবেক সম্পন্ন, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত সাহাবার সহায়তার সব কিছুকে পরাভূত ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে আল্লাহর ধ্যান ধারণা ও আলোয় সমুজ্জ্বল এক প্রান্তরে গিয়ে যখন দণ্ডায়মান হলেন তখন আরম্ভ হল ভিন্নতর এক জীবন সংগ্রাম।

আরম্ভ হল যুদ্ধের পর যুদ্ধ। সেই সকল শত্রুর বিরুদ্ধে দাওয়াত ইলাহী এবং তার বিশ্ববাসীদের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শিশু ইসলাম চারাটি তরতাজা হয়ে ভূগর্ভে তার শিকড় প্রোথিত এবং উন্মুক্ত আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করানোর পূর্বেই চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করে ফেলতে। দ্বীনে ইলাহির দাওয়াতে ঐ সকল শত্রুর সঙ্গে নাবী করীম ﷺ-কে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশাল রোমক বাহিনী এ নতুন উম্মতকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সীমান্ত এলাকায় সৈন্য মহড়া শুরু করে দেয়।

যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রসজ্জিত মুশরিক, মুনাফিক ও কাফিরদের সঙ্গেই যে তাঁকে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল শুধু তাই নয় বরং আরও এক ভয়ংকর এবং সার্বক্ষণিক শত্রুর সঙ্গে তাঁকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। সে শত্রুটি ছিল মানব জাতির চির শত্রু শয়তান। সে মানুষের শিরায় শিরায় বিচরণ করে মানুষকে এক গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করার জন্য সর্বক্ষণ চক্রান্ত চালাতে থাকে। শয়তানের চক্রান্তের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে মুসলিমগণকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সে সরের মোকাবিলা করে করে সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁরা সাহাবীগণ যে নিষ্ঠা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী করীম ﷺ-এর উপর দ্বীনের দাওয়াতের যে মহাসম্মানজনক এবং মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁরা বড় করে দেখতেন না। দ্বীনের কাজে অকাতরে তাঁরা দিতেন প্রাণ এবং সর্বস্ব দিয়ে এদদম নিঃস্ব হয়ে যেতে তাঁরা কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদতলে যখন সঞ্চিত হতো সম্পদের পাহাড় সে সব আল্লাহর পথে খরচ না করে তিনি অবসর নিতেন

না। তাঁর নিকট প্রাচুর্য ছিল পরিত্যাজ্য, দারিদ্র ছিল কাম্য। দিবাভাগে দ্বীনের দাওয়াত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষণ থাকতেন তিনি ব্যস্ত, রাত্রিবেলা দীর্ঘ সময় প্রভূর উদ্দেশ্যে থাকতেন নিবেদিত।[1]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনিভাবে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনায় বিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় তাঁকে অন্যান্য বিষয় হতে উদাসীন কিংবা গাফেল করতে পারেনি। আভ্যন্তরীন এবং বহিস্থ বহু প্রতিকূলতা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াত এক বিশালায়তনে কৃতকার্যতা লাভ করেছিল যে তা প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব বিবেক একেবারে স্তম্ভিত এবং হতচকিত হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূভাগ থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে ঈমান আমান, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও শৌর্য-বীর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং শিরক্ কুফরী, মুনাফিকী ও মূর্তিপূজার মূল উৎপাটিত হয় এবং আপামর আরববাসী দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুগত হয়ে পড়ে। আল্লাহর একত্ববাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকাম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র মুয়ায্যিনের সুরেলা কণ্ঠে দিগ্বিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। মদীনা অভিমুখী বিভিন্ন গোত্রের আনাগোনা, নব্য মুসলিমগণের তাকবীরধ্বনি এবং কুরআন তেলওয়াতকারীগণের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সূরে মরুপ্রান্তর মউ মউ করে ওঠে।

ভিন্ন ও পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন বহুবিভক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য স্বহৃদয়তা ও সমঝোতার প্লাবন প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ প্রবেশে করতে থাকে আল্লাহর দাসত্বে। কেউই অত্যাচারী রইল না কিংবা অত্যাচরিতও রইল না। রইল না মালেক কিংবা মামলুক, না হাকেম, না মাহকুম, না জালেম কিংবা মজলুম। সব ভেদাভেদের অবসান হয়ে গেল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারী। অন্যথায় সকল মানুষ আদমসন্তান এবং আদম (عليه السلام) মাটির সৃষ্টি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল আরবী একাত্মতা, বিশ্ব মানবতার একাত্মতা এবং সামাজিক সুবিচার। পাওয়া গেল মানব জাতির সমস্যা-সংকুল পার্থিব জীবনে চলার পথের ঠিক দিক নির্দেশনা এবং পরকালীন কল্যাণের মূলপাত্র। মানুষের জীবনযাত্রায় সূচিত হল আমূল পরিবর্তন। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই সূচিত হল যুগান্তকারী পরিবর্তন। মানব সভ্যতা হল মানবোচিত, ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্য মণ্ডিত।

ইসলামী দাওয়াতের পূর্বে পৃথিবীতে ছিল অন্ধকারে প্রাধান্য পৃথিবীর পরিবেশ ছিল দূর্গন্ধযুক্ত এবং আত্মা ছড়িয়ে চলেছিল দূর্গন্ধ। মাপ ও পরিমাপ ছিল অস্পষ্ট। সর্বত্র বিরাজিত ছিল অন্যায়, দাসত্ব, শোষণ ও সন্ত্রাসের শাসন। অশান্তি, অশ্লীলতা এবং ধ্বংস প্রবণতা পৃথিবীকে চরম অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত করছিল। কুফর ও ভ্রষ্টতার ঘন পর্দায় ঢাকা পড়েছিল মানুষের সনাতন জীবনধারার শাশ্বত রূপ। অথচ আসমানী জীবন বিধান ছিল তখনো বিদ্যমান। কিন্তু সে বিধান হয়ে পড়েছিল বিকৃত এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। সে বিধানের গ্রহণী শক্তি গিয়েছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে। যার ফলে তা প্রাণহী একটি লোকচার বা রেওয়াজে পরিণতি হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াত যখন তার অসামান্য প্রাকশক্তি, সর্ববাদীসম্মত আল্লাহ বিধি বিধান, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মি চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখন প্রচলিত রেওয়াজ সর্বস্ব জীবনের বিধানের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নামে যে অর্থহীন লেকচার, শ্রেণীবিভেদ, অহমিকা, অস্থিরতা, শিরক ও বহুত্ববাদী, বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটল। এর ফলে আরব উপদ্বীপে এমন এক বরকতপূর্ণ পরিবেশ এবং উন্নতি ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা সূচিত হল ইতোপূর্বে কোন কালেও যা দেখা যায় নি।[2]

---

[1] সৈয়ধ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন ২৯ খণ্ড ১৬৮-১৬৯ পৃঃ।

[2] সৈয়দ কুতুব, ভূমিকা মা-যা খাসেরাল আলামু বিইনাহিতা তিল মুসলিমীন পৃষ্ঠা ১৪।

حجـــة الـــــوداع

বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মোয়ায বিন সাবল (رضي الله عنه)-কে ইয়েমেনের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায় কালে অন্যান্য উপদেশবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন,

(يا معاذ، إنك عسي ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري)

'হে মোয়ায! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করেব।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে মোয়ায (رضي الله عنه) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নাবী করীম ﷺ-কে ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা এবং সুফল বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবেন। এ দাওয়াতের কাজেই নাবী করীম ﷺ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর এ অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ডের অন্তিম পর্যায়ে এটাই সুসঙ্গত হবে যে, হজ্জের মৌসুমে যখন মক্কার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্র সমূহের সদস্য ও প্রতিনিধিগণ একত্রিত হবেন তখন তাঁরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট থেকে দ্বীনের আহ্বান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ নেবেন এবং নাবী করীম ﷺ তাঁদের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর পবিত্র আমানত যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনার প্রাপ্য আদায় করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদাচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকাঙ্খিত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।[১]

অতঃপর যী কা'দা মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।[২]

তিনি চুলে চিরুনী ব্যবহার করলেন, তেল মালিশ করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কুরবানীর পশুগুলোকে মালা বা হার পরালেন এবং যোহর সালাতের পর রওয়ানা হয়ে গেলেন। আসরের পূর্বে যুল হোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে আসরের দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং শিবির স্থাপন ক'রে সারারাত সেখানের অবস্থান করলেন। সকাল বেলা তিনি সাহাবীগণদের (رضي الله عنهم) বললেন, (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمـــرة في حجـــة) 'আজ রাতে আমার প্রভূর পক্ষ হতে একজন অগন্তুক এসে বলেছেন, 'এ পবিত্র উপত্যকায় সালাত আদায় করা এবং হজ্জের সঙ্গে ওমরা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।[৩]

---

[1] এ কথাটি সহীহ মুসলিমে জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে। নাবী করীম ﷺ-এর হজ্জ পর্ব দ্রষ্টব্য। ১ম খণ্ড ৩৯৪ পৃঃ।

[2] হাফজ হজর (رحمه الله) এর উত্তমরূপে তাহকীক করেছেন। কোন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে যী কা'দর পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল তখন নাবী ﷺ যাত্রা করেন। এর সংশোধনও করেছেন দ্র: ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ১০৪ পৃঃ।

[3] ওমর (رضي الله عنه) হতে বুখারী শরীফে এটা বণিত হয়েছে ১ম খণ্ড ২০৭ পৃঃ।

অতঃপর যোহরের সালাতের পূর্বে নাবী করীম ﷺ ইহরামের জন্য গোসল করলেন। এরপর আয়িশা (রাঃ) রাসূল ﷺ-এর শরীর এবং পবিত্র মাথার নিজ হাতে যারীরা এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকর সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নাবী ﷺ-এর মাথার সিঁথী এবং দাঁড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সেই সুগন্ধি না ধুয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু' রাকাত সালাত আদায় করেন।

এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং ওমরাহ্‌র ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহরাম বাঁধার পর বাহিরে এসে 'কাসওয়া' নামক উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ ক'রে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচ্চ কণ্ঠে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কাল ব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ যকন মক্কার নিকট বর্তী যী'তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যিলহজ্জ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান, মধ্যমভাবে এ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ সময়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে কা'বা গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং ওমরার জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ী ও (কুরবানীর পশু) ছিল। তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উপরিভাগে হাজূন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের তাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন তাওয়াফ করেন নি। সাহাবাগণের মধ্যে তাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নিজ নিজ ইহরাম ওমরায় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হালাল হচ্ছিলেন না সেহেতু সাহাবীগণ এ ব্যাপারে ইতস্তত করেছিলেন। নাবী করীম ﷺ বললেন,

(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت)

'আমি যা পরে জানলাম আমার ব্যাপারে আমি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদয়ী আনতাম না। তাছাড়া, আমার সঙ্গে হাদীয়া না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়েও যেতাম।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর যাঁদের সঙ্গে হাদীয়া ছিল না তাঁরা নাবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ মেনে নিয়ে হালাল হয়ে গেলেন।

যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নাবী করীম ﷺ মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যিলহজ্জের সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামেরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নাবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, (أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً). 'ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা।'[1]

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০৩ পৃঃ,

(إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمـــر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ــ وكان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هُذَيْل ــ وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبـــد المطلب، فإنه موضوع كله).

তোমাদের রক্ত এবং তোমারে ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হুরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রেসম আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল। জাহেলিয়াত যুগের শোনিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবিয়া বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বুন সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হোজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল।

(فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم علـــيهن ألا يـــوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوقمن بالمعروف).

হ্যাঁ, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আনতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে উত্তমরূপে খাওয়াবে পড়াবে।

(وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله).

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেকে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।[১]

(أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها أنفسكم، وتحجون بيت ربكم، وأطيعوا أولات أمركم، تدخلوا جنة ربكم)

হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নাবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উম্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমাযান মাসে রোযা রেখো, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভূর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সৎ নেতৃত্বের অনুসরণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[2]

(وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟)

আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কি উত্তর দিবে?

সাহাবীগণ বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ব আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন, (اللهم اشهد) (اللهم اشهد) (اللهم اشهد) 'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষ্য থাক।'[৩]

---

[1] সহীহ মুসলিম নাবীর হজ্জের অধ্যায় ১ম খণ্ড ৩৯৭ পৃঃ।

[2] ইবনু মাজা, ইবনু আসাকের, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২২৩ পৃঃ।

[3] সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৯৭ পৃঃ।

নাবী করীম ﷺ-এর বাণীসমূহকে রাবীয়া বিন উমাইয়া বি খালফ উচ্চস্বরে লোকজনদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছিলেন।[1] রাসূলে করীম ﷺ যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারেগ হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম। তবে কেউ পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় (নিষিদ্ধ বস্তু খেতে) বাধ্য হলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [আল-মায়িদাহ (৫) : ৩]

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি এ জন্য কাঁদছি যে পূর্ণতার পর অসম্পূর্ণতাই তো থাকে।[2]

নাবী করীম ﷺ-এর ভাষণের পর বিলাল (রাঃ) প্রথমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাতে ইমামতি করলেন। এরপর বিলাল (রাঃ) অবারাও ইকামত করলেন। এ দুই সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট কাসওয়ার পেট পাথর সমূহের দিকে করলেন এবং জাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের মাঝে অবস্থিত স্তূপ) সামনে করলেন এবং কেবলামুখী হয়ে নাবী করীম ﷺ (একই অবস্থায়) অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্যের অল্প অল্প হলুদ বর্ণ শেষ হল, আবার সূর্য মণ্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালেফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালেফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দুই ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেননি। এরপর নাবী করীম ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আযান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে মাশয়ারে হারামে আগমন করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তৌহিদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মীনা অভিমুখে রওয়ান হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়ে ছিলেন ফাযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে। বাতনে মোহাসসারে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন সাওয়ারীকে একটু দ্রুত খেদালেন।

আর মধ্যের পথ দিয়ে যা জামরায়ে কুবরার দিকে বের হয় সে পথ ধরে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এ বৃক্ষটির জন্যও জামরায়ে কুবরা প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া জামরায়ে কুবরাকে জামরায়ে আকাবা এবং মাজরায়ে উলাও বলা হয়। নাবী করীম ﷺ জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নাবী করীম ﷺ বাতনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নাবী করীম ﷺ কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা ৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে আলী (রাঃ) ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে এক শতটি উট কুরবানী করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নাবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রান্না করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আলী (রাঃ) এ গোশত খান এবং ঝোল পান করেন।

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০৫ পৃঃ।

[2] বুখারী ইবনু ওমর হতে দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৬৫ পৃঃ।

অতঃপর আপন সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছার পর **তিনি** বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযা বলা হয়। তাওয়াফ শেষে যোহর সালাত **আদায়** করেন। সালাত শেষে জমজম কূপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদের**কে** জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

(انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم)

'বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশঙ্খা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল। অন্যথায় এ ব্যবস্থা তাঁদের আয়ত্বে আর থাকত না। কাজেই, বনু অব্দুল মুত্তালিব নাবী করীম ﷺ-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলে তিনি তা হতে ইচ্ছানুযায়ী পান করলেন।[1]

দিনটি ছিল যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং আলী (রাঃ) তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছিলেন দণ্ডায়মান অবস্থায়।[2] অদ্যকার ভাষণে নাবী করীম ﷺ গত কালকের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহ বুখারী এব সহীহ মুসলিমে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যিরহজ্জ কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مُضَر الذي بين جمادي وشعبان)

'আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌঁছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। পরস্পরাগতভাবে তিন অর্থাৎ যিকা'দাহ, যিলহজ্জ এবং মুহারম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আখিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।'

অতঃপর নাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন মাস? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভাল জানেন।' এ প্রেক্ষিতে নাবী করীম ﷺ নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মাসটি কি যিলহজ্জ নয়?' আমরা বললাম, 'তা কেন হবে না'? এর পর নাবী করীম ﷺ বললেন, 'এ শহরটি কোন শহর?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।' নাবী করীম ﷺ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ শহর কি মক্কা নয়'? আমরা বললাম তা কেন হবে না'? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নাবী করীম ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন দিবস'? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন'। এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়'? অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ নয়'? আমরা বললাম অবশ্যই'। তিনি বললেন, (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا). 'তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমনভাবে হারাম যে, তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাসে তোমাদের আজকের দিনের হুরমত যেমন আছে।

---

[1] মুসলিম, জাবের হতে, নাবী করীম ﷺ-এর হজ্জ অধ্যায় ১ম খণ্ড ৩৯৭-৪০০ পৃঃ।

[2] আবু দাইদ, কুরবানীর দিন কোন সময়ে তিনি খুৎবা দিয়েছিলেন সে অধ্যায় ১ম খণ্ড ২৭০ পৃঃ।

(وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض) (ألا هل بلغت؟)

তোমরা অতি শীঘ্রই আপন প্রতিপালক প্রভূর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার নিকট থেকে পরে পুনরায় পশ্চাদমুখীনতা অবলম্বনের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা হয়ে না যাও। অধিকন্তু তোমরা এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বল! আম কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?

সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, অতঃপর নাবী করীম ﷺ বললেন,

(اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فَرُبَّ مُبَلَّغ أوعي من سامع)

'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক' যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতিদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া কারণ ঐ অনুপস্থিতিদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।[1]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ ভাষণে নাবী করীম ﷺ এ কথাও বলেছিলেন,

(ألا لا يجْنِي جَانٍ إلا على نفسه، ألا لا يجْنِي جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يُعْبَد في بلدكم هذا أبداً، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم، فسيرضى به)

স্মরণ রেখো! কোন অপরাধী নিজ অপরাধের দোষ অন্যের উপর আরোপ করতে পারবে না। (অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে নিজকেই ভোগ করতে হবে। অপরাধের জন্য নিজেকেই গ্রেফতার হতে হবে)। আরও স্মরণ রেখো! পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। স্মরণ রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন থেকে তোমাদের এ শহরে আর কখনো তার পূজা করা হবে না। কিন্তু যে সব অন্যায় কাজকে তোমরা খুব তুচ্ছ মনে করবে ওতেই তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট হবে।[2]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ১১, ১২, ও ১৩ যিলহজ্জ (আইয়ামে তাশরীক) মীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে থাকেন এবং লোকজনকে শরীয়তের আহ্বানগুলো শিক্ষা দিতে থাকেন ও আল্লাহর যিকির করতে থাকেন। অধিকন্তু ইবরাহীমী রীতিনীতির সুনানে হাদীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। নাবী করীম ﷺ আইয়ামে তাশরীকেও ভাষণ প্রদান করেন। সুনানে আবী দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত আছে রাসূলে করীম ﷺ সারায়া বিনতে নাবহান (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে রউসের দিন ভাষণ দেন।[3] তিনি বলেন, (أليس هذا أوسط أيام التشـــريق). 'এটা আইয়ামে তাশরীকের মধ্য দিবস নয়'[4] নাবী করীম ﷺ-এর আজকের ভাষণও গতকালের ভাষণের অনুরূপ ছিল। এ ভাষণ দেয়া হয়েছিল সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পর। আইয়ামে তাশরীকের শেষে, দ্বিতীয় ইয়াওমুন নাফারে অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে নাবী করীম ﷺ মীনা হতে রওয়ানা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খাইফে বনু কেনানায় অবস্থায় করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি তিনি তথায় অতিবাহিত করেন এবং যোহর সালাত, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত সেখানেই আদায় করেন। এশার সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং তাওয়াফে বেদা' আদায় করেন।

---

[1] সহীহ বুখারী, মীনার ভাষণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃঃ।

[2] তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৬৫ পৃঃ। ইবনু মাজাহ হজ্জ পর্ব, মিশকাত ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃঃ।

[3] অর্থাৎ ১২ই যিলজহজ্জ (আউনুল মাবূদ ২য় খণ্ড ১৪৩ পৃঃ।

[4] আবু দাউদ মীনায় কোন দিন ভাষণ দেন। ১ম খণ্ড ২৬৯ পৃঃ।

সকল মানুষ যখন হজ্জ (হজ্বের নিয়ামাবলী) হতে ফারেগ হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন সওয়ারীকে মদীনা মনোয়ারাভিমুখী করলেন। তাঁর মদীনামুখী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে আরাম আয়েশে গা ঢেলে দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে আর এক নবতর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।[১]

শেষ সামরিক অভিযান (آخر البعوث) :

আত্মাভিমানী ও অহংকারী রোমক সম্রাটদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না যে, তারা ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ ও মুসলিমগণের প্রাধান্য লাভকে তারা বরদাশত করে নেবে। এ কারণে তাদের শাসনধীন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জান-মাল সব কিছু সাংঘাতিকভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ত। মায়ানের রুমী শাসক ফারওয়াহ বিন আমের জোযামীর সঙ্গে যেমনটি আচরণ করেছিল।

রোমক সম্রাটের এরূপে সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব এবং অর্থহীন অহংকারের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১১ হিজরী সফর মাসে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুতত করলেন এবং ওসমা বিন যায়েদ বিন হারেসাকে (رضي الله عنه) নেতৃত্ব প্রদান করে বালকা' অঞ্চল এবং দারুমের ফিলিস্তিনী আবাসভূমিকে ঘোড়সওয়ারীদের দ্বারা পদদলিত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ কার্যক্রমের কারণ হল এর ফলে রোমকগণের মধ্যে যেন ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। তাদের অঞ্চলে বসবাসরত আরব গোত্রসমূহের স্থিতাবস্থা বহাল থাকে এবং কেউই যেন এ ধারণা করতে না পারে যে গীর্জাকর্তৃক অনুসৃত কঠোরতার উপর কোন অনুসন্ধানী নেই ইসলাম কবুল করার অর্থই হচ্ছে মৃতুকে দাওয়াত দেয়া।

ওই সময় কিছু সংখ্যক লোক বাহিনী প্রধানের বয়সের স্বল্পতার কারণে তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে এবং এ মহোদ্যমে অংশ গ্রহণ করতে বিলম্ব করে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

(إن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله، إن كان لخليقاً للإمارة، وإن كـــان من أحب الناس إلى، و إن هذا من أحب الناس إلى بعده)

এর নেতৃত্বের ব্যাপারে আজ যেমন তোমার প্রশ্ন উত্থাপন করছ ইতোপূর্বে এর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলে। অথচ আল্লাহর কসম! সৈন্য পরিচালনের ব্যাপরে সে ছিল খুবই উপযুক্ত এবং আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম এ ব্যক্তিও উপযুক্ত এবং আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম।[২]

যাহোক, সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) উসামার (رضي الله عنه) আশেপাশে একত্রিত হয়ে সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন এবং অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে মদীনা হতে তিন মাইল দূরত্বে জুর্ফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতাজনিত দুশ্চিন্তার কারণে অগ্রযাত্রা স্থগিত হয়ে গেল এবং আল্লাহর মীমাংসার জন্য বাহিনী অপেক্ষামান রইলেন। আল্লাহর মীমাংসায় এ বাহিনী আবু বকর (رضي الله عنه)-এর খিলাফত আমলের প্রথম সৈনিক মহোদ্যমের ভূমিকায় ভূষিত ও সম্মানিত হল।[৩]

---

[1] বিদায়ী হজ্জের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সহীহ বুখারী মানাসিক পূর্ব ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ৬৩১ পৃঃ, সহীহ মুসলিম নাবী করীম ﷺ-এর হজ্জ অধ্যায় ফতহুল বারী ৩য় খণ্ড মানাসিক পর্বের ব্যাখ্যা ৮ম খণ্ড ১০৩-১১০ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০১-৬০৫ পৃঃ।, যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৯৬ এবং ২১৮-২৪০ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী, উসামাকে প্রেরণ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১২ পৃঃ।

[3] প্রাগুক্ত সহীহ বুখারী এবং ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০৬ পৃঃ।

إلى الرفيق الأعلى
সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান

বিদায়ের আলামাতসমূহ (طلائع التوديع) : যখন দ্বীনের দাওয়াত পুরোপুরী পূর্ণতা লাভ করল, আরবের পুরো নিয়ন্ত্রণ মুসলিমগণের আয়ত্বে এসে গেল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবেগ ও অনুভূতি, প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণ হতে এমন কতগুলো আলামত প্রকাশ পেতে থাকল যাতে এটা ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অস্থায়ী জীবন থেকে বিদায় নিতে এবং এ অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে তাঁর ই'তেকাফের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে রমাযান মাসে তিনি শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। কিন্তু ১০ম হিজরীতে তিনি ই'তেকাফ করে বিশ দিন।

অধিকন্তু জিবারাঈল (عليه السلام) এ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুই বার কুরআন পুনঃপাঠ করেছিলেন যেক্ষেত্রে অন্যান্য বছর গুলোতে মাত্র একবার কুরআন পুনঃপাঠ করেছিলেন। তাছাড়া নাবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে বলেছিলেন, (إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبــداً)، 'আমি জানিনা এ বছর পর এ স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হতে পারব কিনা'। জামরায়ে আকাবার নিকট বলেছিলেন, (خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامي هذا)

'আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম কানুনগুলো শিখে নাও। কারণ, এ বছর পর সম্ভবত আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না। আইয়ামে তাশরীকের মধ্যভাগে নাবী করীম ﷺ-এর নিকট সূরা 'নাসর' অবতীর্ণ হয় এবং এর মাধ্যমে নাবী করীম ﷺ উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর যাওয়ার সময় সমাগত প্রায়।

একাদশ হিজরী সফর মাসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ প্রান্তে গমন করে আল্লাহ তা'আলার সমীপে শহীদের জন্য এমনভাবে দু'আ করেন যেন তিনি জীবিত এবং মৃত সকলের নিকট থেকেই বিদায় গ্রহণ করেছেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন,

(إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها).

'আমি তোমাদের যাত্রীদলের প্রধান এবং তোমাদের উপর সাক্ষী, আল্লাহর কসম! আমি এ আপন 'হাউযে কাওসার' দেখছি। আমাকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর খাজনাসমূহের চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার এ ভয় হয় যে, আমার পর তোমরা শিরক করবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে পৃথিবী সম্পর্কে তোমরা এক অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে।[1]

এ সময় একদা মধ্য রাত্রে তিনি 'বাকীউল গারকাদ' কবরস্থানে গমন করলেন এবং কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন,

(السلام عليكــم يــا أهل المقابر، لِيَهْنَ لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليــل المظلم، يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى)،

'ওহে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক! দুনিয়ার মানুষ যে অবস্থায় আছে তার তুলনায় তোমাদের সে অবস্থানই ধন্য হোক যার মধ্যে তোমরা রয়েছ। অন্ধকার রাত্রির অংশের ন্যায় অনিষ্টতা একটির পর

---

[1] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৫ পৃঃ।

একটি চলে আসছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম অতীত প্রজন্মের তুলনায় অধিক খারাপ।' এরপর এ বলে কবরবাসীদের শুভ সংবাদ প্রদান করলেন যে, (إنا بكم للاحقون). 'তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমরাও আগমন করছি।'

অসুস্থতার সূচনা (بـــدايـــة المـــرض) : একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর সোমবার দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জানাযার উদ্দেশ্যে বাকী'তে গমন করে করেন। সেখান থেকে ফেরার পথেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তাপ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, মাথায় বাঁধা পটির উপরেও তাপ অনুভূত হতে থাকে। এ অসুস্থতাই ছিল তাঁর ওফাতকালীন রোগ ভোগের সূচনা। এ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি এগার দিন পর্যন্ত সালাতে ইমামতি করেন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৩ কিংবা ১৪ দিন অতিবাহিত করেন।

শেষ সপ্তাহ (الأسبوع الأخير) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, (أين أنا غداً؟ أين أنا غـــداً؟)'আমি আগামী কাল কোথায় থাকব, আমি আগামী কাল, কোথায় থাকব?'

এ জিজ্ঞাসার কারণ অনুধাবন করতে পেরে বিবিগণ বললেন, 'আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারবেন।'' বিবিগণের কথার প্রেক্ষিতে নাবী করীম ﷺ স্থান পরিবর্তন করে আয়িশার গৃহে গমন করেন। স্থান পরিবর্তনের সময় তিনি ফযল, বিন আব্বাস (রাঃ) এবং আলী বিন আবু তালিবের কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধাছিল এবং পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে তিন চলছিলেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নাবী করীম ﷺ আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে গমন করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

আয়িশা (রাঃ) সূরা নাস ও ফালাক্ব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মুখস্থকৃত দু'আ পড়ে নাবী করীম ﷺ-কে ঝাঁড় ফুঁক করতে থাকেন এবং বরকতের আশায় নাবী করীম ﷺ-এর হাত তাঁর পবিত্র শরীরে বুলিয়ে দিতে থাকেন।

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে (قبل الوفاة بخمسة أيـــام) : ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস দেহের উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগ যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, (هريقوا علي سبع قِرَب من آبار شتي، حتى أخرج إلى الناس، فأعهـــد إلـــيهم)'আমার শরীরে বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি ঢাল, যাতে আমি লোক জনদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিকে পারি। এ প্রেক্ষিতে নাবী করীম ﷺ-কে একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে তাঁর উপর এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালা হল যে, তিনি নিজেই (حسبكم، حسبكم). 'ক্ষান্ত হও', ক্ষান্ত হও' বলতে থাকলেন।

সে সময় নাবী করীম ﷺ-এর রোগ যন্ত্রণা কিছুটা উশমিত হয় এবং তিনি মসজিদে গমন করেন। তখনো তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বসেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সাহাবীগণ (রাঃ) আশপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, (لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبـــور أنبيـــائهم مســـاجد) 'ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক এ কারণে যে, তারা তাদের নাবী গণের উপর আল্লাহর অভিশাপ বানিয়ে নিয়েছে। অন্য এক রেওয়াতে রয়েছে

(قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)

'যে ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র শাস্তি যে তারা তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদে বানিয়ে নিয়েছেন।'[1] তিনি আরও বললেন, (لا تتخذوا قبري وثنـــا يعبـــد). 'তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিওনা এ কারণে যে তার পূজা করা হবে।'[2]

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ, মোওয়াত্তা ইমাম মালিক ৩৬০ পৃঃ।

[2] মোওয়াত্তা ইমাম মালিক ৬৫ পৃঃ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন,

(من كنت جلدت له ظَهْرًا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عِرْضاً فهذا عرضي فليستقد منه)

'আমি যদি কারো পিঠে কোঁড়া মেরে থাকি তাহলে সে যেন এ পিঠে কোঁড়া মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আর যদি কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি উপস্থিত আছি, সে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বর হতে নীচে অবতরণ করলেন এবং যোহরের সালাতে ইমামতি করলেন। তারপর আবারও মিম্বরের উপর আরোহন করলেন এবং হিংসা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর পুরাতন কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করলেন। একজন বললেন, 'আপনার দায়িত্বে আমার তিন দিরহাম অবশিষ্ট আছে। নাবী করীম ﷺ ফযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, 'তাঁকে পরিশোধ করে দাও'। এর পর আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

(أوصيكم بالأنصار، فإنهم كِرْشِي وعَيْبَتِي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من مُحْسِـــنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم)،

'আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তারা ছিল আমার অন্তর এবং কলিজা। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্যসমূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অতএব তাদের সৎ লোকদের হতে গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করবে।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(إن الناس يكثرون، وتَقِلُّ الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم).

'মানুষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কিন্তু আনসারগণ কমে যেতে থাকবে। এমনকি তারা হয়ে পড়বে খাবারের মধ্যে লবনের ন্যায়। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোন লাভ কিংবা ক্ষতি পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবে তখন সে যেন তাদের মধ্যকার সৎ ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং অসৎ ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দেয়।[১]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(إن من أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا تخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر).

'এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অধিকার প্রদান করেছেন যে, সে পৃথিবীর চাকচিক্য এক জাঁকজমকের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন, অথবা সে আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে সে পছন্দ করবে, তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তাই পছন্দ করে নিয়েছে।' আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, এ কথা শ্রবণ করে আবু বকর (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত! তাঁর এ আচরণে আমরা আশ্চর্য হলাম।

লোকেরা বলল, 'এ বুড়োকে দেখ! রাসূলুল্লাহ ﷺ- তো একজন বান্দা সম্পর্কে এ কথা বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে অধিকার প্রদান করেছেন যে, পৃথিবীর চমক দমক এবং জাঁকজমক হতে সে যা চাবে তিনি তাকে তাই

---

[১] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫৩৬ পৃঃ।

দেবেন অথবা আল্লাহর নিকট যা আছে তা সে পছন্দ করে নেবে। অথচ এ বুড়ো বলছেন যে, **আপন** পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কয়েক দিন পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, বান্দাকে **সে** অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। আবু বকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চাইতে বিজ্ঞ **ও** বুদ্ধিমান।[1]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'স্বীয় সাহচর্য এবং ধন-সম্পদে আমার উপর সর্বাধিক দয়া দাক্ষিণ্যের মালিক ছিলেন আবু বকর (রাঃ) এবং আমি যদি আপন প্রভূ ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকর (রাঃ)-কে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। মসজিদে কোন দরজাই অবশিষ্ট রাখা হবে না, বরং তা অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া হবে একমাত্র আবু বকর (রাঃ)-এর দরজা ছাড়া।[2]

চার দিন পূর্বে (قبل أربعة أيام) : ওফাত প্রাপ্তির চার দিনে পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিন রোগযন্ত্রণার সম্মুখীন হলেন তখন বললেন,

(هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده)

'তোমরা আমার নিকট কাগজ কলম নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য একটি নোট লিখে দেই যাতে তোমরা আমার পরে কোন দিনই পথ ভ্রষ্টতা হবে না।'

ঐ সময় ঘরে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমর (রাঃ), তিনি বললেন, 'আপনার উপর রোগ যন্ত্রণার প্রাধান্য রয়েছে এবং আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব কুরআন রয়েছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট'- এ কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, 'কাগজ কলম আনা হোক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলবেন তা লিখে নেয়া হোক।' অন্যেরা উমর (রাঃ)-এর মত সমর্থন করলেন। লোকজনদের মধ্যে যখন এভাবে কথা কাটাকাটি চলতে থাকল তখন নাবী করীম ﷺ বললেন, (قوموا عني) 'আমার নিকট থেকে তোমরা উঠে যাও'।[3]

অতঃপর নাবী করীম ﷺ সে দিনটি উপদেশ প্রদান করলেন। এর প্রথমটি হচ্ছে,'ইহুদী, নাসারা এবং মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বহিস্কার করবে। দ্বিতীয়টি হল, 'প্রতিনিধিদলের সে ভাবেই আপ্যায়ণ করবে যেমনটি (আমার আমলে) করা হতো।' তৃতীয় উপদেশটি বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত সেটি ছিল আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকার উপদেশ, অথবা তা ছিল উমামা (রাঃ)-এর বাহিনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপদেশ, অথবা তা ছিল (الصلاة وما ملكت أيمانكم) 'সালাত' এবং তোমাদের অধিনস্থ অর্থাৎ দাসদাসীদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপদেশ। কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিন (অর্থাৎ ওফাত প্রাপ্তির চার দিন পূর্বের বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সকল সালাতেই ইমামতি করেন। এ দিবস মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন এবং সূরা 'ওয়াল মুরসালাতাতে উরফা' পাঠ করেন।[4]

কিন্তু এশা সালাতের সময় অসুস্থতা এতই বৃদ্ধি পেল যে, মসজিদে যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ আর তাঁর রইল না। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, (أَصَلَّى الناس؟) 'লোকজনেরা সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমি উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ضعوا لي ماء في المخضب) 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি দাও।' তাঁর চাহিদা মোতাবেক পানি

---

[1] সহীহ বুখারী, মুসলিম, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫১৬ পৃঃ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৪৯ পৃঃ ও ৫৫৪ পৃঃ।

[2] মুসলিম ও বুখারী, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৪৬, ৫৫৪, ৬৫৫, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫১৬ পৃঃ।

[3] বুখারী, মুসলিম, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ ৪২৯, ৪৪৯ পৃঃ ২য় খণ্ড ৬৩৮ পৃঃ।

[4] সহীহ বুখারী উম্মুল ফযল হতে নাবী ﷺ-এর অসুখ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

দেয়া হলে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, (أصلى الناس؟) 'লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষামান রয়েছেন।'

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও তিনি একইরূপ করলেন, যেমনটি প্রথমবার করেছিলেন, অর্থাৎ গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না।, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে বলে পাঠালেন সালাতে ইমামতি করার জন্য। এ প্রেক্ষিতে আবু বকর (রাঃ) ঐ দিনগুলোতে সালাতে ইমামতি করেন।[১] নাবী করীম (ﷺ)-এর পবিত্র জীবদ্দশায় আবু বকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে সালাতে সংখ্যা ছিল সতের ওয়াক্ত।

আয়িশা (রাঃ) তাঁর পিতা আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবর্তে অন্য কারো উপর ইমামতি দায়িত্ব অর্পণের জন্য নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট তিনি কিংবা চারবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর এ অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা যেন তাঁর পিতা সম্পর্কে কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণের কোন অবকাশ বা সুযোগ না পায়। কিন্তু নাবী করীম (ﷺ) প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করে বললেন, (إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصـــل بالنـــاس) 'তোমরা সকলেই ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গীসাথীদের মতোই হয়ে গিয়েছ।[২] সালাতে ইমামতি করার জন্য আবু বকর (রাঃ)-কে নির্দেশ দাও।'[৩]

তিন দিন পূর্বে (قبل ثلاثــة أيــام) : জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে তাঁর ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন ....

قال جابر: سمعت النبي ﷺ قبل موته بثلاث وهو يقول: (ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظــن بالله).

এক দিন অথবা দুই দিন পূর্বে (قبل يوم أو يومين) : শনিবার কিংবা রবিবারে নাবী করীম (ﷺ) কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। কাজেই, দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যোহর সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করেন। সেই সময় আবু বকর (রাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-এর সালাতের জামাতে ইমামতি করছিলেন আবু বকর (রাঃ)। তিনি নাবী করীম (ﷺ)-এর আগমনের আভাস পেয়ে পিছনের সারিতে আসার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে ইশারায় পিছনে আসতে নিষেধ করে সামনেই থাকতে বললেন এবং নিজকে তাঁর ডান পাশে বসিয়ে দেয়ার জন্য সাহায্যকারীদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন। এ প্রেক্ষিতে আবু বকর (রাঃ)-এর ডান পাশে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হল। এরপর আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাতের অনুকরণ করছিলেন এবং সাহাবীগণ (রাঃ)-কে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন।[৪]

একদিন পূর্বে (قبــل يــوم) : ওফাত প্রাপ্তির পূর্বের দিবস রবিবার তিনি তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। তাঁর নিকটে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তা সাদকা করে দেন। নিজ অস্ত্রগুলো মুসলিমগণকে হিবা করে দেন। রাত্রিবেলা গৃহে বাতি জ্বালানোর জন্য আয়িশা (রাঃ) প্রতিবেশীর নিকট থেকে তেল ধার করে আনেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি লৌহবর্ম ত্রিশ 'সা' (৭৫ কেজি) জবের পরিবর্তে এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল।

---

[1] বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা, মিশকাত ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ।

[2] ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে যে মহিলাগণ আযীয মিসরের স্ত্রীকে ভাল মন্দ বলেছিল যা প্রকাশ্যে তার নিন্দনীয় কাজ কর্মের রূপ প্রকাশ করছিল। কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে যখন তারা নিজ নিজ আঙ্গুল কাটল তখন বুঝা গেল যে, মুখে বললেও প্রকৃতপক্ষে মনে মনে তারও তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছে। এর অনুরূপ ব্যাপারে এখানেও ছিল। রাসূলে কারীম (ﷺ)-কে প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল যে, আবু বকর (রাঃ) নরম অন্তকরনের মানুষ, আপনার স্থানে যখন দাঁড়াবেন তখন তাঁর পক্ষে কেরাত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তাঁদের অন্তরে একথা নিহিত ছিল যে, (আল্লাহ না করুন) এ অসুখের কারণে যদি নাবী করীম (ﷺ)-এর পবিত্র জিন্দেগীর পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে মানুষের অন্তরে অমঙ্গল জনক এবং অশুভ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, আয়িশা (রাঃ)-এর অনুরোধের কন্ঠের সঙ্গে অন্যান্য বিবিগণের কণ্ঠও মিলিত ছিল। এ কারণেই নাবী করীম (ﷺ) বললেন, তোমরা সকলেই ইউসুফ (আঃ)-এর এবং সহচরীবৃন্দের মতই বলছ। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে রয়েচে এক কথা কিন্তু প্রকাশ করছ অন্য কথা।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৯৯ পৃঃ।

[4] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৯৮-৯৯ পৃঃ।

পবিত্র জীবনের শেষ দিন (آخر يوم من الحياة) : আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিবস ফজর ওয়াক্তে আবু বকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে সাহাবা কেরমা (রাঃ) যখন সালাতরত ছিলেন এমন সময় নাবী করীম ﷺ আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সালাতরত সাহাবীগণ (রাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মৃদু হাসলেন। এদিকে আবু বকর (রাঃ) নিজ পায়ের পিছনে ভর দিয়ে পিছনে দিকে সরে গেলেন এবং কাতারে সামিল হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছা করছেন। আনাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, (হঠাৎ নাবী করীম ﷺ সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায়) সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরিক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল (অর্থাৎ নাবী করীম ﷺ-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে ফেলেন।[1]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ওয়াক্ত সালাতের জামাতে শরীক হতে পারেন নি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নাবী করীম ﷺ তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা শুনে কন্যা কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও কন্যার কানে কানে কিছু কথা বললেন, পিতার কথায় কন্যা এবার হাসতে লাগলেন। আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনা আছে যে, পরে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফাতেমা (রাঃ) বললেন যে, নাবী করীম ﷺ আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এ অসুখেই তাঁর ওফাত প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যেই আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, নাবী করীম (রাঃ)-এর পরিবারবর্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি তাঁর অনুসরণ করব। এ কারণে আমি হাসলাম।[2]

অধিকন্তু নাবী করীম ﷺ ফাতেমা (রাঃ)-কে এ শুভ সংবাদও প্রদান করেন যে, তুমি হবে মহিলা জগতের নেত্রী।[3]

ওই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কষ্টকর সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দেখে ফাতেমা (রাঃ) কোন চিন্তা ভাবন না করেই চিৎকার করে উঠলেন 'হায় আব্বাজানের কষ্ট! নাবী করীম ﷺ বললেন, আজকের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।[4]

নাবী করীম ﷺ হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। পবিত্র বিবিগণকে আহ্বান জানালেন এবং ওয়ায ও নসীহত করলেন।

এদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল এবং সে বিষের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল যা তাঁকে খায়বরে খাওয়ানো হয়েছিল। সে সময় তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন,

(يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أَبْهَرِي من ذلك السم)

'হে আয়িশা! খায়বরে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি। এ মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে, এ বিষের প্রভাব আমার শিরা উপশিরা সমূহের জীবন কর্তিত হচ্ছে।[5]

তখন তাঁর চেহারার উপর চাদর ফেলে দেয়া হল। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো তখন তার চেহারা মুবারক থেকে তা সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এরূপই হয়। এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ কথা ও মানুষের জন্য অসীয়ত : (তিনি বললেন), (لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد — يحذر ما صنعوا — لا

---

[1] সহীহ বুখারী, নাবী করীম ﷺ-এর অসুখের অধ্যায় ২য় খণ্ড ২৪০ পৃঃ।

[2] বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৮ পৃঃ।

[3] কতকগুলো বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, কথাবার্তা এবং শুভ সংবাদ দেওয়ার এ ঘটনা পবিত্র জীবনের শেষ দিনের নয় বরং শেষ সপ্তাহের মধ্যে ঘটেছিল। দ্রঃ রহামাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৮২ পৃঃ।

[4] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬৪১ পৃঃ।

[5] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

(يقين ديان بأرض العرب) আল্লাহর অভিসম্পাত ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যা তৈরি করেছে তাথেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরব ভূখণ্ডে আর কখনো এ দু'টি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উপদেশ প্রদান করে বললেন, (الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم) **অর্থ :** সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাসদাসী)! এ শব্দগুলো নাবী করীম ﷺ বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।[১]

অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্রণা (الاحتضار) : অতঃপর শুরু হল মৃতু যন্ত্রণা। আয়িশা (রাঃ) নাবী করীম ﷺ-কে নিজ দেহের উপর ভর করিয়ে থেমে রইলেন। তাঁর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে নাবী করীম ﷺ আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমার গ্রীবা ও বক্ষের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলা আমার লালা এবং তাঁর লালাকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম যে, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) নাবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার শরীরে হেলান অবস্থায় ভর করেছিলেন। আমি দেখলাম যে, নাবী করীম ﷺ মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছেন। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি বললাম, 'আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিব?' তিনি মাথার নেড়ে তা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর একটি মিসওয়াক নিয়ে নাবী করীম ﷺ-কে দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ'। আমি মিসওয়াক খানা নরম করে দিলে খুব সুন্দরভাবে তিনি মিসওয়াক করলেন। সম্মুখেই ছিল পানির পাত্র। পানিতে দুই হাত ডুবিয়ে তিনি মুখমণ্ডল মুছতে মুছতে বলছিলেন, (لا إله إلا الله، إن للموت سكرات...) 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।[২]

মিসওয়াক থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত অথবা অঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠল। আয়িশা (রাঃ) কান পেতে শ্রবণ করলেন, তিনি বলছিলেন,

(مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلي. اللهم، الرفيق الأعلي).

'হে আল্লাহ! নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভূক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ'লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! রফীকে আ'লা।[৩]

এ ঘটনা সংঘটিত হয় একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সূর্য্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় নাবী করীম ﷺ-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

সীমাহীন দুঃখ-বেদনা (تفاقم الأحزان على الصحابة) : হৃদয় বিদীর্ণকারী এ দুর্ঘটনার সংবাদ তৎক্ষনাত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনাবাসীগণের উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। পৃথিবীর প্রান্ত এবং পার্শ্বস্থ সব কিছুই যেন অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সে দিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখি নি এবং যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিনের মতো এত নিকৃষ্ট এবং অন্ধকার দিন আর কখনো দেখি নি।[৪]

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬৪০ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী, নাবী করীম ﷺ-এর অসুস্থতা অধ্যায় এবং শেষ কথোপকথন অথ্যায় ২য় খণ্ড ৬৩৮-৬৪১ পৃঃ।

[4] দারেমী, মিশকাত, ২য় খণ্ড ৫৪৭ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুতে ফাতেমা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. يا أبتاه، مَنْ جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه **অর্থ :** 'হায় আব্বাজান! যিনি আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, হায় আব্বাজান! যাঁর ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস, হায় আব্বাজান! আমরা জিবরাঈল (عليه السلام)-কে আপনার মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি।

উমর -এর অবস্থান (موقف عمــر) : নাবী করীম ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র উমর -এর হুস বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিক মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। যেমন মুসা বিন ইমরান (عليه السلام) গমন করেছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে ৪০ রাত্রি অনুপস্থিত থাকার পর তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বলা হতো যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[1]

আবু বকর -এর অবস্থান (موقف أبي بكر) : এদিকে আবু বকর সানাহতে অবস্থিত নিজ বাড়ি হতে ঘোড়ায় চড়ে আগমনের পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর লোকজনদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়িশা -এর নিকট গমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলেন। নাবী করীম ﷺ-এর দেহ মুবারক তখন জরীদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। আবু বকর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন,'আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আল্লাহ আপনার উপর দুইবার মৃত্যু একত্রিত করবেন না, যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যলিপিত ছিল সেটা এসে গিয়েছে। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। সে সময় উমর লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আবু বকর তাঁকে বললেন, 'উমর বস'। উমর বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবীগণ উমর -কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর -এর প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। আবু বকর বললেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران:١٤٤].

'আল্লাহর প্রশস্তির পর, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর পূজা করতেছিল তারা জেনে রাখ যে মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতেছিলে, অবশ্যই আল্লাহ সর্বদাই জীবিত থাকবেন, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, আল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর পূর্বের অনেক রাসূল বিগত হয়ে গিয়েছেন তাতে কি, তবে কি যদি নাবী মৃত্যুবরণ করেন, কিংবা তাঁকে হত্যা করবে? স্মরণ রেখো, যারা আপন পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এবং অতিত শীঘ্রই আল্লাহর শোকরগোজারদের প্রতিদান দেয়া হবে।' [আলু 'ইমরান (৩) : ১৪৪]

সাহাব কেরাম যাঁরা এতক্ষণ পর্যন্ত সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন আবু বকর -এর এ ভাষণ শ্রবণের পর তাঁরা সুনিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে ইবনু আব্বাস বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে এমনটি মনে হচ্ছিল যে, লোকজনেরা যেন জানতই না যে, আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবু বকর যখন এ আয়াত পাঠ করলেন তখন সকলেই এ আয়াত সম্পর্কে যেন নতুনভাবে ওয়াকেফহাল হলেন এবং সকলকেই এ আয়াত তেলওয়াত করতে দেখা গেল।

---

[1] ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৫৫ পৃঃ।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন যে, ‘উমর বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি যখন আবু বকর-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনলাম তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করলাম। কিন্তু (অথবা আমার পিঠ ভেঙ্গে পড়ল) এমনকি আমার দ্বারা আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আবু বকর-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, আমি তখন অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে, নাবী করীম প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।[1]

কাফন-দাফন (التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض) : এদিকে নাবী করীম-এর কাফন-দাফনের পূর্বেই নাবী করীম-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল। সাকীফা বনু সায়েদার মধ্যে, মুহাজির ও আনাসারগণের মধ্যে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলতে থাকল এবং দলীল প্রমাণাদি পেশ ও প্রশ্নোত্তর চলছিল, অবশেষে আবু বকর-এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় এবং রাত্রি আগমন করে। লোকজনেরা নাবী করীম-এর কাফন-দাফনের পরিবর্তে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হয়ে সমাগত হয় মঙ্গলবার সকাল। এ সময় পর্যন্ত নাবী করীম-এর দেহ মুবারক একটি জরীদার ইয়েমেনী চাদর দ্বারা আবৃত্ত অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিল। ঘরের মানুষেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।

মঙ্গলবার দিবস নাবী করীম-কে কাপড় সহ গোসল দেওয়া হল। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন আব্বাস, আলী, আব্বাসের পুত্র ফযল এবং কাশেম রাসূলে করীম-এর আযাদকৃত দাস শাকরান, উসামা বিন যায়েদ এবং অওস বিন খাওলী। আব্বাস, ফযল ও কোশম নাবী করীম-এর পাশ পরিবর্তন করে দিচ্ছেলেন। উসামা এবং শাকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, আলী ধৌত করছিলেন এবং আওস নাবী করীম-এর দেহ মুবারককে আপন বক্ষের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন।

গোসলের পর তিনটি সাদা ইয়েমেনী চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ-এর কাফনের ব্যবস্থা করা হল। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।[2]

নাবী করীম-এর অন্তিম আরামগাহ (শান্তি শয্যা) সম্পর্কে সাহাবীগণ-এর মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আবু বকর বললেন, ‘আমি নাবী করীম-কে বলতে শুনেছি যে, ‘কোন নাবীকে (পৃথিবী) থেকে উঠানো হয় নি (মৃত্যুবরণ করেন নি) কিন্তু তাঁকে সেই স্থানে দাফন করা হয়েছে যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’ এ মীমাংসার পর নাবী করীম যে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন আবু তালহা তা উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর তার নীচের বগলী কবর খনন করা হল।

এরপর সাহাবীগণ পালাক্রমে দশ দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযা আদায় করলেন। নির্ধারিত কোন ইমামের ব্যবস্থা ছিল না। সর্ব প্রথম নাবী করীম পরিবার বনু হাশিমের লোকজনেরা সালাত আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির ও আনসারগণ জানাযা সালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ সালাত আদায় করেন।

সালাতে জানাযা আদায় করতে মঙ্গলবার দিবস পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বুধাবারের রাত্রে নাবী করীম-এর দেহ মুবারককে সমাহিত করা হয়। আয়িশা বর্ণনা করেছেন যে, পুরো দিবসটাই সালাতে জানাযা চলার কারণে রাসূলুল্লাহ-এর দাফন সম্পর্কে আমাদের জনা ছিল না। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকার পর বুধবার রাত্রের মধ্যভাগে দাফন-কাফনের শব্দ কর্ণগোচর হয়।[3]

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৬৪০ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ১৬৯ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৩০৬ পৃঃ।

[3] শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসারুস সীরাতে রাসূল ৪৭১ পৃঃ। মৃত্যু বিবরণ বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্রষ্টব্য সহীহ বুখারীম, নাবী অসুস্থতা অধ্যায়, এবং এর পরের কয়েকেটি অধ্যায়, ফতহুল বারী সহ। সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ, নাবী-এর মৃত্যু অধ্যায় দ্রঃ।

البيت النبوي

নাবী ﷺ-এর পরিবার

১. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (خديجـــة بنـــت خويلـــد) : হিজরতের পূর্বে মক্কায় নাবী করীম ﷺ-এর পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি এবং তাঁর প্রথমা পত্নী খাদীজা (রাঃ)। বিবাহের সময় নাবী করীম ﷺ-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কাউকেও বিবাহ করেন নি। নাবী করীম ﷺ-এর সন্তানাদির মধ্যে ইবরাহীম ছাড়া পুত্র কন্যাদের সকলেই খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে জন্মলাভ করেন। পুত্র সন্তানগণের মধ্যে কেউই জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কন্যা সন্তানগণ সকলেই জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে, যয়নব, রোকাইয়্যা, উম্মু কুলসুম এবং ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)। যয়নব (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয় তাঁর ফুফাত ভাই আবুল আস রাবীর সঙ্গে হিজরতের পূর্বে। রোকাইয়্যা এবং উম্মু কুলসুম (রাঃ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (একজনের পর অন্য জন) উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে। ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পাদিত হয় আলী (রাঃ) ইবনু আবু তালিবের সঙ্গে, বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন হাসান ও হুসাইন, যয়নব এবং উম্মু কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

এটি একটি বিদিত বিষয় যে, উম্মতবর্গের তুলনায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এ রকম যে, আল্লাহর দ্বীনের খুঁটিনাটি প্রচারার্থে চারটিরও অধিক পত্নীগ্রহণের জন্য তিনি আদীষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে যে সকল যে সকল মহিলার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল এগার জন। এঁদের মধ্যে নাবী করীম ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিলেন নয় (৯) জন। নাবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন দুইজন। এ দুইজন ছিলেন খাদীজা (রাঃ) এবং উম্মুল মাসাকীন, যয়নব বিনতে খোযায়মাহ (রাঃ)। অধিকন্তু, আরও দুই জন মহিলার সঙ্গে নাবী করীম ﷺ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ দুই জনকে নাবী করীম ﷺ-এর নিকট বিদায় করা হয় নি নাবী করীম ﷺ-এর পবিত্র বিবিগণ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুন্না)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হল।

২. সওদাহ বিনতে যাময়াহ (سودة بنت زمعة) (রাঃ) : খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর কয়েক দিন পর নুবওয়াতের দশম বর্ষ শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবি সওদা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে সওদা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই সাকরান বিন আমরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কারণে তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হয়েছিল।

৩. আয়িশা সিদ্দীকা বিনতে আবু বকর (রাঃ) (عائشة بنت أبي بكر الصـــديق) : আয়িশা (রাঃ)-এর সঙ্গে নাবী করীম ﷺ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে। অর্থাৎ সওদা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহের এক বছর পর এবং হিজরতের দুই বছর পাঁচ মাস পূর্বে। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অতঃপর হিজরতের সাত মাস পর প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাঁকে বিদায় জানানো হয়। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল নয় বছর। তিনি কুমারী। আয়িশা (রাঃ) ছাড়া আর অন্য কোন স্ত্রীকেই তিনি কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন নি। আয়িশা (রাঃ) ছিলেন নাবী করীম ﷺ-এর সব চাইতে প্রিয়পাত্রী অধিকন্তু, নাবী পত্নীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সব চাইতে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী।

ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৪৯-৬৬৫ পৃঃ। তালকিহুল্লেহমি আহলিল আসার ৩৮-৩৯ পৃঃ। রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৭৭-২৮৬ পৃঃ। সময়ের নির্দিষ্টতা সাধারণভাবে রহমাতুল্লিল আলামীন হতে গৃহীত।

৪. হাফসাহ বিনতে ওমর বিন খাত্তাব (حفصة بنت عمر بن الخطاب) : রাসূলুল্লাহ তাঁর সঙ্গে তৃতীয় হিজরীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন বিধবা তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল খোনইস বিন হোযাফা বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫. যয়নব বিনতে খোযায়মাহ (زينب بنت خزيمة) : এ মহিলার সম্পর্কে ছিল বনু হিলাল বিন আমরে বিন সা'সাহ গোত্রের সঙ্গে। মিসকীনদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে তার পদবী হয়েছিল উম্মুল মাসাকীন। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহশ। উহুদ যুদ্ধে তিনি শাহাদতবরণ করেন। অতঃপর চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ-এর সঙ্গে মাত্র আট মাস সংসার জীবন যাত্রার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬. সালমাহ হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (أم سلمة هند بنت أبي أمية) : এ মহিলা আবু সালমা-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। চতুর্থ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ মাসে আবু সালামাহ মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন শাওয়াল মাসে।

৭. যয়নব বিনতে জাহশ বিন রেয়াব (زينب بنت جحش بن رباب) : এ মহিলা বনু আসাদ বিন খোযাইমা-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ-এর ফুফাতো বোন। পূর্বে তিনি যায়েদ বিন হারিসার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যাঁকে রাসূলে করীম-এর পুত্র মনে করা হত। কিন্তু যায়েদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব সৃষ্টি না হওয়ার কারণে তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ-কে সম্বোধন করে এ আয়াত নাযিল করেনঃ

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧]

'অতঃপর যায়দ যখন তার (যায়নাব'র) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম।' [আহযাব (৩৩) : ৩৭]

তাঁর সম্পর্কেই সূরা আহযাবের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। যাতে মুতাবান্না পৌষ্যপুত্রের বিতণ্ডার মীমাংসা করা হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা হবে পরে। পঞ্চম হিজরীর যীলকা'দা মাসে কিংবা এর কিছু পূর্বে নাবী করীম-এর সঙ্গে যয়নব-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

১. **জাওয়ায়রিয়া বিনতে হারিস** (جويرية بنت الحارث) : তাঁর পিতা ছিলেন খোযায়া গোত্রের শাখা বুন মুসতালিকের সর্দার। জোওয়ায়রিয়াকে বনু মুসতালিক গোত্রের বন্দীদের সঙ্গে ধরে আনা হয়েছিল এবং সাবেত বিন কাইস বিন সাম্মাসের অংশ দেয়া হয়েছিল। তিন জোওয়ায়রিয়ার সঙ্গে 'মোকাতাবাত' করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বাধীন করে দেয়ার চুক্তি হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে চুক্তি মুতাবিক অর্থ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে।

২. **উম্মু হাবীবা রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান** (أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان) : প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন উবাইদুল্লাহ বিন জাহশের স্ত্রী। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে হাবশে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে উবাইদুল্লাহ মুরতাদ হয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করে কিন্তু উম্মু হাবিবা ইসলামের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর ৭ম হিজরী মুহাররম মাসে রাসূলুল্লাহ যখন আমর বিন উমাইয়া যামরীকে একটি পত্র সহ সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন উম্মু হাবীবার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ-এর বিবাহের প্রস্তাবও পেশ করা হয়। উম্মু হাবীবার স্বীকৃতি গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করা হয় এবং শোরাহ বিল বিন হাসানার সঙ্গে তাঁকে নাবী করীম-এর খিদমতে প্রেরণ করা হয়।

৩. **সাফিয়া বিনতে হোওয়ায় বিন আখতাব** (صفية بنت حيي بن أخطب) : এ মহিলা ছিলেন বনি ইসরাঈলের অন্তর্ভূক্ত। খায়বার যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করা হয়। কিন্তু পত্নী হিসেবে গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেন এবং তাঁকে মুক্তি প্রদান করে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এটি ছিল ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পরের ঘটনা।

৪. **মায়মুনা বিনতে হারিস** (ميمونة بنت الحارث) : তিনি ছিলেন উম্মুল ফযল লোবাবাহ বিনে হারিসের বোন। রাসূলুল্লাহ -এর ৭ম হিজরীতে যীলকা'দা মাসের কাযা উমরাহ্ শেষ করার পর বিশুদ্ধ কথায় ইহরাম হতে হালাল হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

উপরোক্ত এগার জন মহিলা রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে খাদীজা এবং উম্মুল মাসাকীন যয়নব নাবী করীম -এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওফাত প্রাপ্তির পর ৯ জন উম্মাহাতুল মু'মিনীন জীবিত ছিলেন। এছাড়া, আরও দুইজন মহিলা সম্পর্কে জানা যায় যাঁদেরকে নাবী করীম -এর খিদমতে বিদায় করা হয় নি। এ দুই জনের মধ্যে একজন ছিলেন বুন কেলাব গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অন্য জন ছিলেন কিন্দাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্দাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এ মহিলাই জোনিযা সম্পর্কের সহিত প্রসিদ্ধ। এ মহিলার সঙ্গে নাবী করীম বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা এবং তাঁর পরিচয়ের ব্যাপারে চরিত্রকারদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।

মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর সংসারে দুই জন দাসী রেখেছিলেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে মারিয়া কিবতীয়া যাকে মিশরের শাসক মুকাওয়াকেস উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এর গর্ভে নাবী করীম -এর পুত্র ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। নাবী করীম -এর পুত্র ২৮ কিংবা ২৯শে শাওয়াল ১০মে হিজরী মুতাবিক ২৭শে জানুয়ারী ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় দাসী ছিলেন রায়হানা বিনতে যায়েদ যিনি ইহুদী গোত্র বনু নাযীর কিংবা বনু কোরায়যার সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি ছিলেন বনু কোরায়যা যুদ্ধবন্দীদের দলভূক্ত। রাসূলুল্লাহ এবং তিনি তাঁর তত্ত্বাধানেই থাকেন। তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করে নেন। তাঁর সম্পর্কে কতক চরিতকারদের ধারণা ছিল এরূপ যে, নাবী করীম তাঁকে মুক্তি করে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কিন্তু ইবনু কাইয়ূমের মতে প্রথম কথাই অগ্রগণ্য। আবু উবাইদাহ্ ঐ দুই দাসী ছাড়া অতিরিক্ত আরও দুইজন দাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ দুই জনের মধ্যে একজনের নাম জামীলা যিনি কোন যুদ্ধবন্দীদের দলভূক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় জনকে যয়নব বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ -এর জন্য হিবা করেছিলেন।[1]

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ -এর পবিত্র জীবনের প্রাসঙ্গিক একটি দিক সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। নাবী করীম তাঁর যৌবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রায় ত্রিশ বছর যাবত একমাত্র স্ত্রীর সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর সে স্ত্রী অর্থাৎ বিবি খাদীজা ছিলেন প্রায় বিগত যৌবনা। এরপর তিনি বিবাহ করেন সওদা -কে তিনিও ছিলেন বর্ষিয়সী মহিলা। তবে কি এ ধারণা করা সঙ্গত কিংবা গ্রহণযোগ্য হবে যে, বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে যৌন প্রয়োজনেই তাঁকে পরবর্তী সময়ে ৯টি স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়? তা কখনোই হতে পারে না। নাবী করীম -এর পবিত্র জীবনের উভয় স্তর সম্পর্কে নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমীক্ষা করে দেখলে কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিই এ মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারবে না। বরং তাঁকে অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, নাবী করীম -এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের পিছনে ছিল তাঁর নবুওয়াতী কার্যক্রমের মহান উদ্দেশ্য যা ছিল পরিণয় বিবাহর থেকে অনেক মহান।

---

[1] যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ২৯ পৃঃ।

এ ব্যাখ্যাস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আয়িশা এবং হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আবু বকর ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এ ভাবেই উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দুই কন্যা (রোকেয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং উম্মু কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে কলিজার টুকরো ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিবাহ দিয়ে যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে এ চার জন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা। কারণ, এ চার ব্যক্তিই ইসলামের চরম দুর্যোগপূর্ণ বিভিন্ন সময়ে কুরবানী ও আত্মত্যাগের অসামান্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন।

তৎকালীন আরবের প্রচলিত রীতি ছিল বৈবাহিক সম্পর্কের উপর চরম গুরুত্ব ও সম্মান প্রদান। তাদের নিকট জামাতা সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার এবং জামাতার সঙ্গে যুদ্ধ করা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারটি ছিল চরম লজ্জার ব্যাপার। প্রচলিত এ পদ্ধতিকে এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাধিক বিবাহ করেন ইসলামের বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে সহায়ক শক্তিকে রূপান্তর করার লক্ষ্যে। তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কৌশলটি ইসলামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচনা করে।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করেন। উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন বনু মাখযুমের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা ছিল আবু জাহল এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের গোত্র। উহুদ যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যে ভূমিকা ছিল বিবি উম্মু সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সঙ্গে নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিবাহের পর সে ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অল্প দিন পরেই তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিবাহ করলেন আবু সুফিয়ান আর তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেন না। অধিকন্তু, জোওয়ায়রিয়া এবং সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে যখন পত্নীত্বে বরণ করে নিলেন তখন বনু মুস্তালিক গোত্র এবং বনু নাযীর গোত্রের যুদ্ধংদেহী ভাব আর রইল না। এ বিবাহ বন্ধনের পর এ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে কোন যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অসদ্ভাবের তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং এ বিবাহের পর জোওয়ায়রিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য একজন অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন এবং বরকতময় মহিলা হিসেবে অভিহিত হন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর পরিবারভূক্ত একজন বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, 'এরা যেহেতু নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শশুর বংশের লোক সেহেতু এদের মুক্তি দেয়া হল।'- এ মুক্তি এবং এ বাণী তাদের অন্তরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ওই সকল ব্যাপারের চাইতেও যে বিষয়টি ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক অপরিণামদর্শী সম্প্রদায়ের লোকজনদের শিক্ষাদীক্ষা, তাদের প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও সুসংহত করা এবং সভ্যতা ও সামাজিক শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশিত ছিলেন। যার ছিল শালীনতা, সামাজিকতা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। অথচ ইসলামী সজাম সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ সংমিশ্রণের কোন অবকাশ ছিল না এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল মহিলাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন কোন অংশেই কম ছিল না, বরং যেহেতু তাদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত সেহেতু তার প্রয়োজন ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী।

এ কারণেই নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে একটি পথ খোলা ছিল এবং সেটি ছিল বিভিন্ন বয়স এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এমন কতগুলো মহিলা মনোনীত করা যাদের মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁদের নির্বাচনের পর তিনি তাঁদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করবেন, তাঁদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে পবিত্র করে নেবেন। তাঁদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবেন এবং ইসলামী সভ্যতা এবং সাজ-সজ্জায় এমনভাবে সজ্জিত করে তুলবেন যাতে তাঁরা শহর এবং গ্রামের সর্বত্র গমন করে যুবতী, বয়স্কা বৃদ্ধা সকল বয়সের মহিলাদের ইসলামের হুকুম আহকাম ও মসলা মাসায়েল শেখাতে পারেন। নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রচার কাজে তাঁর সুযোগ সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারেন।

এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজের মহিলাদের নিকট ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা ও নাবী ﷺ-এর সুন্নাত পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে উম্মাহতুর মু'মিনীনগণের (রাঃ) ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে থেকে যাঁরা দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যথা আয়িশা (রাঃ) নাবী ﷺ-এর কথা ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

নাবী করীম ﷺ-এর এক বিবাহ জাহেলিয়াত যুগের এমন এক প্রথার ভিত্তি মূল উৎপাটিত করেছিল যা বহু পূর্ব থেকে চলে আসছিল এবং একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্কারে পরিণিত হয়েছিল। প্রথাটি ছিল পোষ্য পুত্র সম্পর্কিত। জাহেলিয়াত যুগে পোষ্য পুত্রকে ঔরষজাত সন্তানের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হতো এবং ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় সে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও সম্মান লাভ করত। এ প্রথার শিকড় আরব সমাজ ব্যবস্থার অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ছিল যার মূল উৎপাটন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কিন্তু ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনের ফলে জাহেলিয়াত যুগের সেই সকল সামাজিক ভিত্তিমূল ক্রমন্বয়ে শিথিল হতে শেষ পর্যন্ত উৎপাটিত হয়ে পড়ে।

অধিকন্তু, জাহেলিয়াত যুগের বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং অশ্লীল। কাজেই, ইসালামের প্রথম কর্তব্য ছিল সমাজ থেকে সে সকল ক্ষতিকর বিধি ব্যবস্থা এবং অশ্লীলতা নির্মূল করা। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যয়নব বিনতে জাহশের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। যয়নব ছিলেন যায়েদের স্ত্রী এবং যায়েদ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পোষ্য পুত্র। কিন্তু যায়েদ ও যয়নবের মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টি না হওয়ার কারণে যায়েদ তাঁকে তালাক দেয়ার মনস্থ করলেন। এটা ছিল সে সময় যখন কাফিরগণ নাবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সম্মুখভাগে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উপরন্তু, খন্দকের যুদ্ধের জন্যও তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল।

এদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পোষ্য পুত্র সম্পর্কে রহিত করার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে এ আশঙ্কার সৃষ্টি হল যে এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যায়েদ যদি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন এবং যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে যদি নাবী ﷺ-কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় তাহলে মুনাফিক, মুশরিক ও ইহুদীরা এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে খুব জোরে সোরে অপপ্রচার শুরু করবে যা সরল প্রাণ মু'মিনদের মনে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা চাচ্ছিলেন যে যায়েদ যেন যয়নবকে তালাক না দেন এবং সে রকম কোন পরিস্থিতিও যেন সৃষ্টি না হয়।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নাবী করীম ﷺ-এর এ মনোভাব পছন্দ করলেন না। ইরশাদ হল,

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]

'স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে তুমি যখন বলছিলে– তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিবাহবন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে লুকিয়ে রাখছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে বেশি এ অধিকার রাখেন যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে।' [আহযাব (৩৩) : ৩৭]

যায়েদ শেষ পর্যন্ত যয়নবকে তালাক দিয়ে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর ইদ্দত কাল অতিক্রান্ত হল তখন তাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহের ব্যাপারটি স্থিরীকৃত হয়ে গেল। এটা এড়ানোর আর কোন পথই রাখা হল না। আল্লাহ তা'আলা নাবী করীম ﷺ-এর জন্য এ বিবাহ আবশ্যকীয় করে দিলেন। ইরশাদ হল

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]

'অতঃপর যায়্দ যখন যায়নাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।' [আহযাব (৩৩) : ৩৭]

এ উদ্দেশ্য ছিল, পোষ্য ছেলেদের সম্পর্কে জাহেলিয়াত যুগে যে সংস্কার ও সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে তার মুলোৎপাটিত করা এর পূর্বে যে ভাবে এ আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়ে গেল।

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]

'তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্‌র কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ।' [আল-আহযাব (৩৩) :৫]

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নাবী। [আল-আহযাব (৩৩) :৪০]

এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সমাজে যখন কোন প্রথার ভিত্তিমূল দৃঢ় হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র কথার দ্বারা তার মূলোৎপাটন কিংবা সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বস্তুত যে ব্যক্তি তার মুলোৎপাটন কিংবা পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হন তাঁর বাস্তব কর্মপদ্ধতির নমুনা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তির সময় মুসলিমগণের পক্ষ হতে যে আচরণ ধারা এবং ভাবভঙ্গী প্রকাশিত হয় তা থেকে এ প্রকৃত সত্যটি মুশরিকদের দৃষ্টিপটে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময় মুসলিমগণের মধ্যে ইসলামের প্রতি উৎসর্গীকরণ এবং নাবী প্রীতির যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় তাতে মুশরিকগণ অভিভূত হয়ে পড়ে। উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী যখন প্রত্যক্ষ করল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখের থুথু এবং লালা সাহাবীগণ গভীর আগ্রহে ভরে হাত পেতে গ্রহণ করছেন এবং নাবী করীম ﷺ-এর অযুর নিক্ষিপ্ত পানি গ্রহণের জন্য সাহাবীগণের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাচ্ছে তখন তার মনে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে যায়।

জী হ্যাঁ, এরা ছিলেন সে সকল সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যাঁরা বৃক্ষের নীচে মৃত্যু অথবা পলায়ন না করার শপথ গ্রহণের জন্য একজন অপর জনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এরা ছিলেন সেই সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যাদের মধ্যে আবু বকর এবং উমর-এর মতো জীবন উৎসর্গকারীগণও বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু নাবী করীম ﷺ-এর জন্য অর্থাৎ ইসলামের স্বার্থে মৃত্যুবরণ করাকে যাঁরা চরম সৌভাগ্য এবং কামিয়াবি মনে করতেন। হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁদের কুরবাণীর পশু যবেহ করার নির্দেশ প্রদান করলেন তখন নাবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ পালনের জন্য তাঁরা কোন সাড়াই দিলেন না। তাঁদের এ মনোভাব প্রত্যক্ষ করে নাবী করীম ﷺ অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিচলিত বোধ করতে থাকলেন। কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন উম্মু সালমা-এর পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো সঙ্গে কোন বাক্যলাপ না করে নিজে কুরবানীর পশুর যবেহ করলেন তখন তাঁর অনুসরণে নিজ নিজ কুরবানীর পশুর যবেহ করার জন্য সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন এবং নিজ নিজ পশু যবেহ করলেন। এ ঘটনা থেকেই এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠিত কোন রেওয়াজ রসমের মূলোৎপাটন করতে হলে কথা ও কাজের প্রভাবের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে। এ কারণেই জাহেলিয়াত যুগের পোষ্য পুত্র প্রথার বিলোপ সাধনের ব্যাপারটিকে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নাবী করীম ﷺ-এর পালিতপুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বন্ধনের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যম অবলম্বনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দশন প্রদান করলেন।

এ বিবাহ সম্পর্কে কাজে পরিণত হওয়া মাত্রই মুনাফিকগণ নাবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে খুব জোরেসোরে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা শুরু করে দিল। এ সকল মিথ্যা প্রচার ও গুজবের ফলে কিছু সংখ্যক সরল প্রাণ মুসলিম কিছুটা প্রভাবিতও হল। এ সকল অপপ্রচারে মূলসূত্র হিসেবে মুনাফিকগণ শরীয়তের যে রীতিটি নিয়ে

তোলপাড় শুরু করে দিল তা হচ্ছে নাবী করীম -এর ৫ম বিবাহ। যেহেতু মুসলিমগণ একই সঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা বৈধ জানতেন না সেহেতু এ বিবাহের ফলে যয়নব যখন ৫ম স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ গ্রহণ করলেন তখন তারা একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেল। তাছাড়া যেহেতু যায়েদকে নাবী করীম -এর পুত্র হিসেবে গণ্য করা হতো সেহেতু তিনি যখন যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন অপ প্রচারের জন্য তারা আরও একটি সুযোগ হাতে পেয়ে গেল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের কয়েকটি আয়াত নাযিল করে সমস্যার সমাধান করে দেন। এতে সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অবহিত হন যে, ইসলামে পোষ্যপুত্র সম্পর্কের কোন ভিত্তি কিংবা মর্যাদা নেই। অধিকন্তু এর ফলে তারা এটাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, জাহেলিয়াত যুগের একটি খারাপ রেওয়াজের মূলোৎপাটন কল্পেই একটি বিশেষ নবুওয়াতী ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা নাবী করীম -এর এ বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। বিবাহের এ সংখ্যা (৫ম) শুধুমাত্র নাবী -এর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না) সঙ্গে রাসূলুল্লাহ -এর বসবাসের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত ভদ্রোচিত, সুশোভন, স্বহৃদয়তাসম্পন্ন এবং সর্বোত্তম মর্যাদাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র বিবিগণও (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না) ছিলেন ভদ্রতা, ধৈর্য্য সহ্য, অল্পে তুষ্টি, বিনয় সেবা, এবং ত্যাগ তিতীক্ষার মূর্ত প্রতীক, অথচ নাবী করীম -এর জীবনযাত্রা ছিল এমন এক কষ্ট সাধনের স্বেচ্ছাবলম্বিত দারিদ্র এবং অভাব অনটনের যা মেনে নেয়া কিংবা যে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা কোন সাধারণ মহিলাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আনাস এ বলে বর্ণনা করেছেন যে, 'মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ যে, কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন আমার জানা নেই এবং তিনি যে কখনো স্বচক্ষে বকরির ভূনা গোস্ত দেখেছেন সে কথাও আমার জানা নেই।'[1]

আয়িশা বর্ণনা করেছেন যে, দুই মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়ে তৃতীয় মাসের চাঁদা দেখা যেত অথচ রাসূলে করীম -এর গৃহে আগুণ জ্বলত না।' উরওয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনারা কি খেতেন?' তিনি বললেন, 'শুধু দুইটি কালো জিনিস খেজুর এবং পানি'।[2] এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

উল্লেখিত অসচ্ছলতা সত্ত্বেও পবিত্র বিবিগণ কখনই কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি এবং এমন কোন কথা বলেন নি কিংবা কাজ করেন নি যা নাবী করীম -এর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শুধু একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে নাবী কিছুটা বিব্রতবোধ করেছিলেন। কিন্তু সেটা মানব প্রকৃতির চাহিদার অনুরূপ ক্ষেত্রে তৈরি করে নিয়েছিলেন তা বলা মুশকিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতে 'তাখয়ীর' অবতীর্ণ করেন। (অর্থাৎ দুটি জিনিসের সমানভাবে অবলম্বনের অধিকার দেয়া)। আয়তটি হচ্ছে,

﴿أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

[الأحزاب: ٢٨، ٢٩]

'হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও– তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এসো, তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। ২৯. আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালের গৃহ কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।' [আল-আহযাব (৩৩) : ২৮-২৯]

এ আয়াতে কারীমার প্রেক্ষিতে নাবী করীম -এর পবিত্র বিবিগণ সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তাঁরা কতটা উন্নত রুচিসম্পন্ন এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল -

---

[1] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৯৫৬ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ৯৬৫ পৃঃ।

এর তাঁরা কতটা ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ ও আরাম আয়েশের পরিবর্তে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং পরলৌকিক জীবনকেই প্রাধাণ্য প্রদান করেছেন।

সাধারণ ক্ষেত্রে সতীনদের মধ্যে যে হিংসা-বিদ্বেষ বাদানুবাদ, কলহ কিংবা অযাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে পবিত্র বিবিগণের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও অনাকাঙ্খিত সেরূপ কোন কিছু ঘটতে দেখা যায়নি। কদাচিৎ কখনো কোন ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হতে দেখা গেলে আল্লাহ তা'আলা যখন আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁদের সচেতন করে তুলছেন তার পর আর কখনই সে সবের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়নি। সূরা তাহরীমের প্রথম পাঁচটি আয়াতে সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এ প্রসঙ্গে আমরা অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করি নি। কারণ, এ ব্যাপারে যারা অধিক সমালোচনা মুখর থাকে অর্থাৎ ইউরোপবাসীগণ অধিক বিবি গ্রহণ ব্যবস্থাকে নিরুতসাহিত করে তারা যে ধরণের দুর্বিষহ জীবন যাপনকে বৈধ করে নিয়েছে, ফ্রী স্টাইলে যৌন সম্ভোগকে পরোক্ষ অনুমোদন দান করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুহূর্তে হলাহল পান করে যেভাবে সমাজ জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে তুলেছে তা চিন্তা করতেও বিবেক দারুণভাবে বিপন্নবোধ করে। ইউরোপবাসীগণের পশু প্রবৃত্তিজাত ঘৃণ্য জীবন যাপন অধিক বিবি গ্রহণের যৌক্তিকতার সব চাইতে বড় সাক্ষী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য উত্তম শিক্ষা ও চিন্তার বিষয়।

الصفات والأخلاق

আচার-আচরণ ও গুণাবলী

নাবী করীম ﷺ ছিলেন অসামান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং পরিপূর্ণ স্বভাবের এমন এক ব্যক্তিত্ব, মানব সমাজে কোন কালেও যাঁর তুলনা মেলে না। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সর্বপ্রকার চরিত্র ভূষণে বিভূষিত এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সংশ্রবে আসা ব্যক্তিমাত্রই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পদে হৃদয় মন পরিপূর্ণ না করে পারতেন না। জাতি ধর্ম বর্ণ এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষরেই তিনি ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু, একান্ত নির্ভরযোগ্য সুহৃদ এবং পরম হিতৈষী আপন জন। তাঁর সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও তাঁর জানমালের হেফাজত, সেবা যত্ন এবং মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে এতই সচেতন ও তৎপর থাকতেন যে, মানব জাতির ইতিহাসে কোন কালেও এর কোন নজির মেলে না। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও কখনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

নাবী করীম ﷺ-এর বন্ধু ও সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) তাঁকে মহব্বত করতেন আত্মহারার সীমা পর্যন্ত। নাবী করীম ﷺ-এর দেহ কিংবা মনে সামান্যতম আঁচড় লাগাটাও তাঁরা বরদাশত করতে পারতেন না। যদিও এ ব্যাপারে তাঁদের গ্রীবা কর্তন করার পর্যায়ে উপনীত হতে হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তাঁদের প্রাণাধিক এ ভক্তি ভালবাসার কারণ ছিল মানবত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁকে এত অধিক পূর্ণত্ব প্রদান করা হয়েছিল যা কোন দিন কাউকেও দেয়া হয়নি। আমাদের অসহায়ত্বের স্বীকারোক্তি করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এ পর্যায়ে উপরিএ বিষয় সমূহের সার সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করছি।

দৈহিক গঠন (جمال الخلق) : হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু মা'বাদ খোযারিয়া নাম্নী এক মহিলার তাঁবুর পাশ দিয়ে গমন করেন। নাবী করীম ﷺ-এর গমনের পর তাঁর চেহারা মুবারক সে মহিলা স্বীয় স্বামীর নিকট যে বর্ণনা চিত্র তুলে ধরে ছিলেন তা হচ্ছে এই, ঝকঝকে গাত্রবর্ণ, সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল, সুশোভন দেহ সৌষ্ঠব, লম্বোদর ও টেকো মাথা হতে ত্রুটিমুক্ত, সুমিষ্ট উজ্জ্বলতায় সুস্নাত সুশোভন চিত্র, দীর্ঘ পলক বিশিষ্ট সুরমা সুশোভিত চক্ষু গাম্ভীর্যমণ্ডিত কণ্ঠস্বর, দীর্ঘ গ্রীবা, পরস্পর সন্নিবেশিত চিকন ভ্রূযুগল, জাঁকাল কৃ' কেশরাল, নীরবতা অবলম্বন করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে গাম্ভীর্য, অত্যন্ত আকর্ষনীয় কথনভঙ্গী, সুমিষ্টভাষী, সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা না সংক্ষিপ্ত, না অতিরিক্ত, কথা বললে মনে হয় মালা থেকে মুক্তা ঝরছে, মানানসই মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট দেহ, না স্বাভাবিক দীর্ঘ, না খর্ব, দুই শাখার মধ্যে এক শাখা বিশিষ্ট তিনটির মধ্যে যেটি সব চাইতে তাজা, সুন্দর ও উজ্জ্বলতাপূর্ণ। বন্ধুগণ তাঁর চারপাশে গোলাকৃতি ধারণ করেন। তিনি যখন কোন কিছু বলেন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশপ্রাপ্ত হলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। আনুগত্যশীল, সম্মানিত, সুমিষ্ট ও স্বল্পভাষী।[1]

নাবী করীম ﷺ-এর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আলী (رضي الله عنه) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বেমানান দীর্ঘকায় কিংবা হ্রস্বকায় কোনটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ দুয়ের সমন্বয়ে অত্যন্ত মানানসই মধ্যম দেহী পুরুষ। তাঁর চুলগুলো অতিরিক্ত কোঁকড়ানো ছিল না, কিংবা একেবারে সোজা খাড়াও ছিল না, বরং এ দুয়ের সমন্বয়ে ছিল এক চমৎকার রূপভঙ্গী বিশিষ্ট। তাঁর গণ্ডদেশে মাংস বাহুল্য ছিল না। চিবুক ক্ষুদ্রাকার এবং কপাল নীচু ছিল না। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার গাত্রবর্ণ ছিল গোলাপী ও বাদামীর সংমিশ্রণ। চোখের পাতা ছিল লম্বাটে গড়নের, সন্ধিসমূহ এবং কাঁধের হাড্ডিগুলো ছিল বড় আকারের, বক্ষের উপরিভাগ থেকে নাভী পর্যন্ত ছিল স্বল্প পশমবিশিষ্ট একটি হালকা বক্ষরেখা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল কেশমুক্ত। হাত ও পাদ্বয় ছিল মাংসল, পথ চলার সময় একটু সম্মুখভাগে ঝুঁকে পা ওঠাতেন এবং এমনভাবে চলতেন যা দেখে মনে হতো যে, যেন কোন ঢালু পথ। যখন

[1] যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ৫৪ পৃঃ।

কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তখন সে ব্যাপারে পুরোপুরী মনোযোগী হতেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশে উভয় কাঁধের মধ্যভাগে ছিল মোহরে নবুওয়াত। নাবী করীম ﷺ ছিলেন সর্বশেষ নাবী। দানশীলতা, সাহসিকতা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন সকলের চাইতে অধিক। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক আমনতের হেফাজতকারী এবং অঙ্গীকার পালনকারী, তিনি ছিলেন সর্বাধিক কোমল স্বভাবের অধিকারী এবং সকলের চাইতে বিশ্বস্ত সহচর এবং নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

কেউ আকস্মিকভাবে নাবী করীম ﷺ-এর সাক্ষাতপ্রাপ্ত হলে তার অন্তর ভয়ে কম্পিত হত। কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করলে ঐকান্তিক আন্তরিকতার সহিত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করত। নাবী করীম ﷺ-এর সীরাত বর্ণনাকারীগণ শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারেন যে, তাঁর আগে এবং পরে অনুরূপ কোন ব্যক্তিকেই তাঁর মতো দেখি নি।[১]

আলী (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ছিল বড়, সন্ধির (জোড়ের) হাড্ডিগুলো ছিল ভারী এবং বক্ষপুটে ছিল পশমের দীর্ঘ রেখা। পথ চলার সময় সামনের দিকে এমন ভাবে একটু ঝুঁকে চলতেন যাতে মনে হতো যে, তিনি যেন কোন ঢালু স্থান হতে অবতরণ করছেন।[২]

জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নাবী করীম ﷺ-এর মুখমুণ্ডল ছিল প্রশস্ত, চক্ষু ছিল হালকা লাল বর্ণের এবং পায়ের গোড়ালি ছিল পাতলা।[৩]

আনাস বিন মালেক বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাত্রবর্ণ ছিল গৌর, মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত সুশ্রী ও মাধূর্যমণ্ডিত এবং দেহ মুবারক ছিল মাঝারী গড়নের।[৪]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের তালু ছিল প্রশস্ত, গাত্রবর্ণ ছিল সাদা এবং বাদামীর মাঝামাঝি উজ্জ্বল। মৃত্যু পর্যন্ত চুল ও দাড়ি মুবারক তেমন সাদা হয় নি।[৫] শুধু কান এবং মাথার মধ্যবর্তী স্থানে চুলগুলো কিছুটা সাদা হয়েছিল এবং মাথার উপরি ভাগে সামান্য কিছু সংখ্যক চুল সাদা হয়েছিল।[৬]

আবু হোযাইফাহ (রাঃ) বলেছেন, 'আমি নাবী করীম ﷺ-এর অধরের নিম্ন ভাগে কিছু সংখ্যক সাদা দাড়ি লক্ষ্য করেছি।[৭]

আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 'নাবী করীম ﷺ-এর নীচের চুলগুলোর মধ্যে কয়েকটি চুল সাদা ছিল।[৮]

বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'নাবী করীম ﷺ-এর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম ধরণের। উভয় কাঁধের মধ্যে ছিল দূরত্ব ছিল এবং কেশরাশি ছিল দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি নাবী করীম ﷺ-কে সৌন্দর্যমণ্ডিত পোশাকাদি পরিহিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। নাবী করীম ﷺ-এর চাইতে অধিক সুন্দর কোন কিছু আমি কখনো প্রত্যক্ষ করি নি।[৯]

প্রথমাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে কেতাবের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে চলা পছন্দ করতেন এবং এ কারণে চুলে চিরুনী ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাঁর সিঁথী প্রকাশ পেত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সিঁথী প্রকাশিত।[১০]

---

[1] ইবনু হিশাম ১ম খণ্ড ৪০১-৪০২ পৃঃ। তিরমিযী তোহফাতুল আহহওয়াযী সহ ৪র্থ খণ্ড ৩০৩ পৃঃ।
[2] তিরমিযী মায়া শরহ।
[3] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৮ পৃঃ।
[4] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৮ পৃঃ।
[5] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।
[6] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ ও সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ।
[7] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০১ -৫০২ পৃঃ ।
[8] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।
[9] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।
[10] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৩ পৃঃ।

বারা' (رضي الله عنه) বলেছেন, 'নাবী করীম ﷺ-এর মুখমণ্ডল ছিল সর্বাধিক সুশ্রী এবং তাঁর আচার আচরণ ছিল সর্বোত্তম।[১] তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে, নাবী করীম ﷺ-এর মুখমণ্ডল কি তলোয়ারের মতো ছিল? উত্তরে বলা হল, 'না, বরং পূর্ণ চন্দ্রের মতো ছিল।' এক বর্ণনায় আছে যে, 'নাবী করীম ﷺ-এর মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার।[২]

বারী' বিনতে মুওয়াভেয় বলেছেন, 'যদি তোমরা নাবী করীম ﷺ-কে দেখতে তাহলে মনে হতো যে, তোমরা উদিত সূর্য দেখছ।[৩]

জাবের বিন সামুরাহ বলেছেন, 'আমি এক চাঁদনী রাতে নাবী করীম ﷺ-কে দেখলাম। তাঁর উপর লালিম আভা ছড়ানো ছিল। আমি তখন একবার রাসূল ﷺ-এর দিকে একবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, চাঁদের চাইতেও তিনি অধিক সুন্দর।[৪]

কা'ব বিন মালেক বর্ণনা করেনে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রফুল্ল থাকতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল এরূপ চমকিত হতো যে, মনে হতো যেন তা চন্দ্রের একটি অংশ।[৫]

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা (رضي الله عنها)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় যখন তাঁর দেহ মুবারক ঘর্মাক্ত হল তখন তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতায় ঝলমলিয়ে উঠল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আয়িশা (رضي الله عنها) আবু কাবীর হোযালীর এ কবিতার আবৃত্তি করলেন,

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ** برقت كبرق العارض المتهلل

অর্থ: তাঁর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতার দিকে লক্ষ্য করবে তখন তা এমনভাবে আলোকিত দেখবে যেন ঘনঘটার মধ্য থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।'

আবু বকর (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কবিতা আবৃত্তি করতেন,

أمين مصطفى بالخير يدعو ** كضوء البدر زايله الظلام

অর্থ : নাবী করীম ﷺ বিশ্বাসী ছিলেন, মনোনীত এবং পছন্দনীয়। ভালোর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, যেন পূর্ণমাত্রার আলো যা হতে অন্ধকার চলু মুখে খেলছে।[৬]

উমর (رضي الله عنه) কবি যোহাইয়েরের এ কবিতা আবৃত্তি করতেন যা হারাম বিন সেনান সম্পর্কে বলা হয়েছিল,

لو كنت من شيء سوى البشر ** كنت المضيء لليلة البدر

অর্থ : 'যদি আপনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর অন্তর্ভূক্ত হতেন তবে আপনি স্বয়ং চতুর্দশী রাত্রিকে আলোকিত করতেন।' অতঃপর ইরশাদ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটিই ছিলেন।[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাগন্বিত হতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করত। মনে হতো যেন গণ্ডদ্বয়ের উপর ডালিমের রস সিঞ্চিত হয়েছে।[৮]

জাবের বিন সামুরাহ হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী করীম ﷺ মুখের সম্মুখে গোড়ালি কিছুটা পাতলা ছিল। তিনি যখন হাসতেন তখন মৃদু মৃদু হাসতেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল সুরমা বর্ণের। দেখে মনে হতো যে তিনি সুরমা ব্যবহার করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ব্যবহার করেন নি।[১]

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ ও সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ।
[2] সহীহ মুসলিশ দারেমী, মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড ৫১৭ পৃঃ।
[3] তিরমিযী শামায়েলের মধ্যে পৃ: ২ দারমী মিশকাত ২য় খণ্ড ৫১৭ পৃঃ।
[4] শারহা তোহফা সহ তিরমিযী ৪র্থ ৩০৬ পৃঃ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫১৮ পৃঃ।
[5] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।
[6] খোলাসাতুস সিয়ার ২০ পৃঃ।
[7] খোলাসাতুস সিয়ার ২০ পৃঃ।
[8] মিশকাত ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ, তিরমিযী কাদার অধ্যায় ভাগ্য সম্পর্কে খোঁজে কঠোরতা ২য় খণ্ড ৩৫ পৃঃ।

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, 'নাবী করীম ﷺ-এর মুখের **সম্মুখ ভাগে দুটি দাঁতের মধ্যে কিছু ফাঁক** ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁর দুটির ফাঁক দিয়ে আলোর আভাষ পাওয়া যেত।[২]

নাবী করীম ﷺ-এর গ্রীবা ছিল যেন চন্দ্রের পরিচ্ছন্নতায় উজ্জ্বল একটি পুতুলের গ্রীবা দাড়ি **মুবারক ছিল ঘন** সন্নিবেশিত, ললাট প্রশস্ত, ভ্রূযুগল ছিল বিজড়িত অথচ একটি হতে অন্যটি ছিল পৃথক, নাসিকা সমুন্নতা, গণ্ডদ্বয় ছিল হালকা গড়নের, গর্দান থেকে নাভী পর্যন্ত ছড়ির ন্যায় বক্ষকেরেশ একটি সুশোভন রেখা বিদ্যমান ছিল। সে রেখার পশম ব্যতীত বক্ষ এবং পেটের অন্য কোথাও পশম ছিল না। তবে হাতের কবজি এবং কাঁধের উপর পশম ছিল। পেট এবং বক্ষের সম্মুখ ভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করে বক্ষ সমতল ও প্রশস্ত, প্রতীয়মান হত। হাতের কবজিদ্বয় কিছুটা বড় আকারে, হাতের তালুদ্বয় প্রশস্ত ছিল সোজা, পায়ের পাতা শূন্য এবং আঙ্গুলগুলো কিছুটা বড় সড় আকারের ছিল। চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে সহজ ভাবে চলতেন।[৩]

আনাস (رضي الله عنه) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের তুলনায় অধিক কোমল এবং মোলায়েম রেশম কিংবা মলমল আমি স্পর্শ করি নি। অধিকন্তু, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহ মুবারক নিঃসৃত সুগন্ধির তুলনায় অধিক সুগন্ধিযুক্ত কোন আতর কিংবা মেশকেআম্বরের সুগন্ধি আমি গ্রহণ করি নি।[৪]

আবু হোযায়ফা (رضي الله عنه) বলেছেন, 'রাসূলে করীম ﷺ-এর হাত মুবারক আমার মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন করায় আমি তা বরফের ন্যায় শীতল এবং মেশক অম্বর হতে অধিক সুগন্ধিযুক্ত অনুভব করলাম।[৫]

আনাস (رضي الله عنه) বলেছেন, 'নাবী করীম ﷺ-এর ঘর্মবিন্দু দেখতে মণিমুক্তার মতো মনে হতো এবং উম্মু সোলাইম (رضي الله عنها) বলেছেন, 'নাবী ﷺ-এর ঘর্মরাজির থেকে উত্তম সুগন্ধি প্রকাশ পেত।[৬]

জাবের (رضي الله عنه) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন পথ ধরে চলতেন এবং তার পর অন্য কেউ সে পথ ধরে চললে, তাঁরা (নাবী ﷺ-এর) দেহ নিঃসৃত সুগন্ধি থেকে বুঝতে পারতেন যে, নাবী করীম ﷺ এ পথে গমন করেছেন।[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল 'মোহর নবুওয়াত'। আকার আকৃতি ছিল কবুতরের ডিমের ন্যায় এবং তা ছিল পবিত্র গাত্রবর্ণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ মোহরের অবস্থিতি ছিল বাম কাঁধের নরম হাড়ের নিকট। এ মোহরের উপর ছিল সবুজ রেখার ন্যায় তিলের সমাহার।[৮]

আত্মার পূর্ণত্ব ও আচার আচরণের আভিজাত্য (كمال النفس ومكارم الأخلاق) : নাবী করীম ﷺ বাকপটুত্ব ও বাগ্মীতার জন্য অত্যন্ত মশহুর ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক বাকপটু ব্যক্তিত্ব। প্রয়োজন মতো সঠিক শব্দ চয়ন ও সংযোজনের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বাক্য বিন্যাসের ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তৎকালীন আরবে প্রচলিত সর্বপ্রকার ভাষারীতি অনুধাবন এবং যে কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তার যথাযথ প্রয়োগের এক দুর্লভ ক্ষমতা তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই, আরবের যে কোন গোত্রের ভাষা অনুধাবন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তা ব্যবহার করতে তিনি সক্ষম হতেন। একদিকে প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলের বেয়াড়া বেদুঈনদের সঙ্গে যেমন তিনি অত্যন্ত সঙ্গত পন্থায় ভাব বিনিময় করতে এবং বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হতেন, অন্য দিকে তেমনি আবার নগরবাসী আরবগণের সঙ্গে অত্যন্ত উন্নত ও মার্জিত ভাষায় কথোপকথন ও বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হতেন। তাছাড়া তাঁর জন্য ছিল ওহীর মাধ্যমে আসমানী সমর্থন।

---

[1] জামে তিরমিযী সারাহ সহ ৪র্থ খণ্ড ৩০৬ পৃঃ।
[2] তিরমিযী, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫১৮ পৃঃ।
[3] খোলাসাতুস সিয়ার ১৯-২০ পৃঃ।
[4] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৩ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৭ পৃঃ।
[5] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৬ পৃঃ।
[6] সহীহ মুসলিম ।
[7] দারমী, মিশকাত, ২য় খণ্ড ৫১৭ পৃঃ।
[8] সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ২৫৯ ও ২৬০ পৃঃ।

নাবী করীম ﷺ ছিলেন সর্ব প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ধৈর্য্যশীল, সহনশীলতা, দয়ার্দ্রচিত্ততা, সংবেদনশীল, পরহিতব্রততার, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক গুণাবলী বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায়। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহুবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও কোন না কোন দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হত। কিন্তু রাসূলে করীম ﷺ ছিলেন সকল রকম মানবিক গুণে গুণান্বিত এমন ব্যক্তিত্ব যে ক্ষেত্রে কস্মিনকালেও কোন ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতিও পরিলক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে সব চাইতে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার ছিল এটা যে, শত্রুদের শত্রুতা এবং দুষ্ট লোকদের দুষ্টুমির মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেত নাবী করীম ﷺ-এর সহনশক্তি এবং ধৈর্যশীলতা তদোধিক মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতো।

আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দুটি কাজের অধিকার দেয়া হতো কিংবা দুটি কাজের সুযোগ তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত তিনি সহজতর কাজটি গ্রহণ করতেন। কিন্তু কোন প্রকার অন্যায় কিংবা পাপের কাজ হলে কখনই তা গ্রহণ করতেন না। অন্যায় কিংবা পাপের কাজ হলে সর্বপ্রথম তিনিই তা থেকে বিরত হয়ে যেতেন। নাবী করীম ﷺ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি কৃত কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অবমাননাকর কোন কাজ কিংবা কথার তিনি তৎক্ষণাত প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রোধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার উর্ধ্বে অবস্থান করতেন।[১]

ন্যায়সঙ্গত কোন চুক্তি কিংবা বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তিনিই সহজভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন। সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে তাঁর দয়া ও দানশীলতার কোন তুলনা মেলেনা। নাবী করীম ﷺ অভাব অনটন এবং দরিদ্রতা বিমুক্ত মন নিয়েই সব সময় দান খয়রাত করতেন। দান খয়রাতের ব্যাপারে অভাব অনটন দরিদ্রতা সম্পর্কে তাঁর মনে কখনই কোন আশঙ্কার উদয় হতো না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 'নাবী করীম ﷺ ছিলেন সর্বাধিক দান-দক্ষিণার মূর্ত প্রতীক। দান-দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দরিয়ার ন্যায় উদার, উন্মুক্ত। নাবী করীম ﷺ-এর এ দানের হাত রমাযানুল মুবারকের সে সময় আরও অধিক প্রসারিত হতো যখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তশরীফ আনয়ন করতেন। এ প্রসঙ্গে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, জিবরাঈল (আঃ) আগমন করতেন এবং কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকা খায়রাতে (রহমতের ভাণ্ডারের পরিপূর্ণ) প্রেরিত হাওয়া হতেও অধিক অগ্রসর থাকতেন।[২] জাবের (রাঃ) বলেছেন, 'এমনটি কখনোও হয় নি যে, নাবী করীম ﷺ-এর নিকট কিছু যাঞ্চা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি যাচাজ্ঞাকারীকে যাচাজ্ঞাকৃত বস্তু দান করেন নি কিংবা 'না' কথাটি বলেছেন।[৩]

বীরত্ব এবং সাহসিকতায় নাবী করীম ﷺ-এর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ। অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে এবং সমস্যাসংকুল স্থানে যেক্ষেত্রে প্রখ্যাত বীর পুরুষদের পর স্থানচ্যুত হয়ে তাঁদের পশ্চাদসরণ করতে দেখা গেছে সেরূপ ক্ষেত্রেও নাবী করীম ﷺ স্বস্থানে অটল থেকে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়েছেন। সম্মুখ সমরে কোন না কোন ক্ষেত্রে মশহুর বীর পুরুষদেরও পলায়ন রত পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু নাবী করীম ﷺ-এর ক্ষেত্রে কখনই এমনটি পরিলক্ষিত হয় নি। আলী (রাঃ) বলেছেন, 'সম্মুখ সমরে যখন বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আড়ালে করতাম। কোন শত্রু নাবী করীম ﷺ-এর নিকটবর্তী হওয়ার সাহস পেত না।[৪]

আনাস (রাঃ) বলেছেন, 'মদীনাবাসীগণ বিকট এক শব্দ শ্রবণে এক রাত্রে কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। শব্দ গ্রহণের পর শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে দৌড় দিয়ে যেতে থাকলেন। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হল। শব্দ শ্রবণ করে পূর্বাহ্নে তিনি লক্ষ্যস্থলে গমন করেছিলেন 'খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ

---

[1] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৩ পৃ।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

[3] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

[4] কাজী আয়াত রচিত শেফা ১ম খণ্ড ৮৯ পৃঃ। সেহাত্ এবং সুনানে মধ্যেও উত্তর অর্থবহ হাদীষ বিদ্যমান আছে।

ﷺ ঐ সময় আবু তালহা (রাঃ)-এর একটি পালনবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহিত ছিলেন। তাঁর কাঁধে তরবারী কোষবদ্ধ অবস্থায় ছিল। তিনি লোকজনদের বললেন, 'ভয়ের কিছুই নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।' এটি হচ্ছে তাঁর নির্ভিকচিত্ততার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।[১]

নাবী করীম ﷺ ছিলেন সব চাইতে লজ্জাশীল এবং অবনত দৃষ্টিসম্পন্ন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দানুশীনা কুমারীর চাইতেও অধিক মাত্রায় লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোন কিছু অপছন্দ করতেন কিংবা কোন কিছু তাঁর অসহনীয় মনে হতো তাঁর মুখমণ্ডলেই তা প্রকাশ পেয়ে যেত।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনই নিজ দৃষ্টি অন্যের উপর নিক্ষেপ করে অধিকক্ষণ ধরে রাখতেন না। তিনি সব সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখতেন এবং আকাশের দিকে রাখার চাইতে মাটির দিকে দৃষ্টি রাখাটাই অধিক পছন্দ করতেন। সাধারণ দৃষ্টি নিম্নমুখী রেখেই তিনি কোন কিছু দেখতেন। লজ্জা প্রবণতা তাঁর মধ্যে এত অধিক ছিল যে, কোন অপছন্দনীয় কথা কাউকেও তিনি মুখোমুখী বলতেন। তাছাড়া কারো কোন অসহনীয় কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কান পর্যন্ত পৌঁছতই না। তবে নাম ধাম নিয়ে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচন করা হত। বরং বলা হত, 'এ কেমন কথা যে কিছু লোক এরূপ বলাবলি করছে। ফারায়দাকের নিম্নোক্ত কবিতার তুলনা বিশুদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই ছিলেন,

يغضي حياء ويغضي من مهابته ** فـــلا يكلـــم إلا حيـــن يبتســـم

অর্থ : লজ্জাশীলতার কারণে নাবী করীম ﷺ দৃষ্টি নীচু রাখতেন এবং তাঁর ভয়ে অন্যান্যরা দৃষ্টি নীচু রাখতেন। তিনি যখন মৃদু হাসতেন তখন তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করা হত।

নাবী করীম ﷺ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক সর্বাধিক পবিত্র, সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। তাঁর এ সকল গুণাবলীর কথা বন্ধুগণ তো বটেই শত্রুগণও এক বাক্য স্বীকার করে থাকেন। নবুওয়াতের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগের তাঁকে আমীন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সে যুগেও বিরোধের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার উদ্দেশ্যে লোকেরা তাঁর নিকট আগমন করত। জামে তিরমিযীতে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'একবার নাবী ﷺ-এর নিকট আবু জাহল এসে বলল, 'আমরা আপনাকে মিথ্যুক বলছি না, তবে আপনি যা এনেছেন তাকে মিথ্যা বলছি'। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام:٣٣]

'এ লোকজনেরা আপনাকে মিথ্যা বলে না বরং এ জালেমেরা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করছে।' [আল-আন'আম (৬) : ৩৩)।[৩]

রোমক সম্রাট হিরাকল আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'ওই নাবী সম্পর্কে তোমরা যে সব কথা বলছ তার পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে পেয়েছে?' তখন আবু সুফিয়ান উত্তরে বললেন, 'না'।

নাবী করীম ﷺ ছিলেন সব চাইতে বিনয়ী। তাঁর আচার আচরণে অহংকার কিংবা আত্মম্ভরিতার কোন ঠাঁই ছিল না। শাসক বা সম্রাটগণ যেভাবে খাদেম বা সেবকদের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন তিনি তাঁর সাহাবা কিংবা সেবকগণের সঙ্গে কখনো সেরূপ আচরণ করতেন না। তিনি তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণকে দণ্ডায়মান থাকতে নিষেধ করতেন। তিনি অসহায়দের দেখাশোনা করতেন, পরমুখাপেক্ষীদের সঙ্গে উঠাবসা করতনে এবং দাসদের দাওয়াত কবুল করতেন। তাঁর এবং সাহাবগণের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান থাকত না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে এবং সাধারণ ভাবেই তাঁদের সঙ্গে উঠা বসা করতেন। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি নিজেই জুতা সেলাই

[1] সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫২ পৃঃ, সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৪০৭ পৃঃ।

[2] সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৪ পৃঃ।

[3] মিশকাত ২য় খণ্ড ৫২১ পৃঃ।

করতেন বা জুতার পটি লাগাতেন এবং নিজের কাপড় চোপড় নিজেই সেলাই করতেন। একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজেই সম্পন্ন করতেন। নিজ হাতে ছাগী দোহন করতেন, কাপড় থেকে উকুন বেছে নিতেন এবং কাপড় চোপড় পরিস্কার করতেন।[1]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক প্রতিজ্ঞাপরায়ন এবং সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত উঁচু মানের সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। দয়ার্দ্রতা, স্নেহশীলতা এবং দানশীলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম শিষ্টাচারী এবং তাঁর আচার আচরণ ছিল সব চাইতে উদার ও সর্বাধিক প্রশস্ত। কোন প্রকার সংকীর্ণতা কিংবা অশালীনতা থেকে তাঁর স্থান ছিল পূর্ব থেকে পশ্চিম ন্যায় দূরত্বে। মুশরিককর্তৃক অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণা সত্ত্বেও কাউকেও তিনি কোন অভিশাপ দেননি কিংবা অন্যায়াচরণে পরিবর্তে অন্যায়াচরণ করেননি বরং প্রতিদানে তিনি দিয়েছেন ক্ষমা ও মার্জনা।

পথে চলতে গিয়ে কাউকেও তিনি পিছনে ফেলে যেতেন না। তাছাড়া, পানাহারের ব্যাপারে আপন দাসদাসীদের নিকট তিনি কখনই অহংকার করতেন না। স্বীয় সেবকদের প্রতি ইহসানির উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাজ কর্মে সাহায্য। স্বীয় সেবকদের কাজকর্মের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি কখনই 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি কিংবা নিন্দা করেন নি। তিনি অনাথ ও অসহায়দের ভাল বাসতেন, তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন এবং তাদের জানাজায় উপস্থিত থাকতেন। দারিদ্রতার কারণে কোন দরিদ্রকে তিনি দীন-হীন মনে করতেন না।

একদা নাবী করীম ﷺ-এর প্রবাসে থাকা অবস্থায় একটি ছাগল যবেহ করে তা রান্নাবন্নার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। একজন সাহাবী বললেন, 'যবেহ করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তিবে।' দ্বিতীয় জন বললেন,'ওর চামড়া ছাড়ানো আমার উপর বর্তিবে।' নাবী করীম ﷺ বললেন, (وعلي جمع الحطب) 'জ্বালানী সংগ্রহ আমার দায়িত্বে থাকবে।' সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন, 'আপনার কাজটা আমরাই করে নিব।' তিনি বললেন,

(قد علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه)

'আমি জানি যে, তোমরা আমার কাজটা করে দেবে, কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার ও তোমাদের মাঝে কোন পার্থক্য বা দূরত্ব থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেন না যে, তাঁর বান্দা নিজ বন্ধুদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন।'

অতঃপর তিনি জ্বালানী একত্রীকরণের কাজেরত হয়ে গেলেন।[2]

আসুন হিন্দ বিন আবী হালার বাচনিক তথ্য সূত্রে রাসূলে করীম ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবগত হই। হিন্দ এক দীর্ঘ বর্ণনায় বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ একের পর এক কতগুলো দুশ্চিন্তায় ভূগছিলেন। সর্বক্ষণ চিন্তাগ্রস্ত থাকার কারণে তাঁর মানসিক শান্তি স্বস্তির যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া তিনি কথাবার্তা তেমন বলতেন না। দীর্ঘক্ষণ যাবত নীরব থাকতেন। তবে কথাবার্তা যা বলতেন তা সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্টভাবেই বলতেন। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা অসম্পূর্ণ কোন কথাবার্তা থাকত না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল স্বভাবের, মিষ্টভাষী এবং কৃতজ্ঞতাপরায়ন। সামান্য অনুগ্রহেরও তিনি বড়ই কদর করতেন। কোন ব্যাপারে তিনি কারো নিন্দা করতেন না কিংবা অসাক্ষাতে কিছু বলতেন না।

নাবী করীম ﷺ উঠতে বসতে সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম স্মরণ করতেন। নিজের জন্য কখনো তিনি স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন না। কোন সভা সমাবেশে গিয়ে তিনি যেখানে স্থান পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। সঙ্গী সাথীদের প্রত্যেককেই ন্যায্য অংশ প্রদান করতেন। তিনি কখনো কাউকেও এমন ধারণা করার সুযোগ দেন নি যে, নাবী করীম ﷺ-এর নিকট অমুকের তুলনায় অমুক অধিক সম্মানিত। কেউ কোন প্রয়োজনে নাবী করীম ﷺ-এর নিকট বসলে কিংবা দাঁড়ালে নাবী ﷺ এত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকতেন যে, সে নিজেই

---

[1] মিশকাত ২য় খণ্ড ৫২০ পৃঃ।

[2] খোলাসাতুল সিয়ার।

প্রত্যাবর্তন না করে পারত না। কোন প্রয়োজনে তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে তা দিতেন, কিংবা ভাল কথা বলে বিদায় করতেন।

কোন খাদ্যদ্রব্যকে তিনি কখনো খারাপ বলতেন না। সত্য সম্পর্কিত প্রশংসায় কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে ততক্ষণ তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করতেন ততক্ষণ তাঁর ক্রোধ স্তিমিত হতো না। তবে, নিশ্চিতরূপে তিনি প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে তিনি ক্রোধান্বিত হতেন না, প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। কোন কিছুর জন্য যখন হাত দিয়ে ইশরা করতেন তখন পুরো হাত ব্যবহার করতেন। কোন ব্যাপারে অবাক হওয়ার সময় হাত ফিরাতেন। যখন রাগান্বিত হতেন তখন চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয়ে যেত যখন সন্তুষ্ট হতেন তখন দৃষ্টি নিম্নমুখী হয়ে যেত। হাসির প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসি হাসতেন। হাসির সময় দাঁতগুলো বরফের ন্যায় চমকাতে থাকত।

অনর্থক কথাবার্তার ক্ষেত্রে তিনি মুখ বন্ধ রাখতেন। বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে তিনি সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের তিনি সম্মান করতেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিভাবক হিসেবে গণ্য করতেন। মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন সব কার্যকলাপ থেকে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন কিন্তু এ জন্য কারো নিকট তিনি নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ সঙ্গীসাথীগণের খবরাখবর রাখতেন এবং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। ভাল জিনিসের প্রশংসা ভাল কাজের সুফল এবং খারাপ জিনিসের মন্দ প্রভাব ও খারাপ কাজের কুফল সম্পর্কে বলতেন এবং সর্বক্ষেত্রেই সততা ও সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করতেন। কোন ব্যাপারেই তিনি বাড়াবাড়ি করতেন না কিংবা চূড়ান্ত পন্থাও অবলম্বন করতেন না। সর্ব ব্যাপারেই তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন এবং অনুরূপ পন্থাবলম্বনের জন্য অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। কোন ব্যাপারেই তিনি অমনোযোগী থাকতেন না যেন আল্লাহ না করুন লোকেরাও অমনোযোগী এবং আত্মসমাহিত হয়ে না পড়ে। যে কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তৎপরতা অবলম্বনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। কোন সত্যকেই তিনি ক্ষুদ্র ভাবতেন না। কোন অসত্য, অন্যায় কিংবা অসুন্দরকে তিনি কখনই সমর্থন করতেন না। কোন অসত্য, অন্যায় কিংবা অসুন্দরকে তিনি কখনই সমর্থন করতেন না। যাঁরা নাবী করীম ﷺ-এর সংস্পর্শে থাকতেন তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম শ্রেণীভূক্ত। এঁদের মধ্যে আবার তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি ছিলেন সকলের চাইতে মঙ্গলকারী। রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী যিনি সাহায্য ও সহানুভূতিতে ছিলেন সবার চাইতে অগ্রগামী।

নাবী করীম ﷺ উঠাবসায় সর্বক্ষণ আল্লাহ জিকর করতেন। নিজের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করেন নি। যখন কোন মজলিশে উপস্থিত হতেন তখন যেখানে খালি জায়গা পেতে সেখানে বসে পড়তেন এবং অন্যান্যদেরকে একই নির্দেশ প্রদান করতেন। সকল সাহাবীকে তাঁর নির্দেশ প্রদান করতেন। সকল সাহাবীকে তাঁর নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করতেন কেউ যেন এটা অনুভব করতে না পারে যে আমাকে ছাড়া অন্যের জন্য তাঁর নিকট অৰ্দ্ধ সম্মানিত।

তখন তাঁর নিকট কোন লোক কোন প্রয়োজনে বসতেন কিংবা দাঁড়াতেন তিনি ধৈর্য সহকারের তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে যতক্ষণ না তাঁরা নিজেরাই ফিরে না যায় যখন তাঁর নিকট কোন বস্তু চাওয়া হতো তিনি তা দিতেন অন্যথায় ভাল কথা বলে বিদায় করতেন তিনি সাহায্য বদনে সকলকে আপ্যায়ন করতেন।

নাবী করীম ﷺ ছিলেন সকলের জন্য পিতৃসমতুল্য এবং সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর নিকট অন্যদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা পরহেযগারী। তাঁর বৈঠক ছিল ধৈর্য, লজ্জা, শিক্ষা এবং বিশ্বাসের বৈঠক। স্বাভাবিক কথোপকথনে কিংবা আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে কখনই তিনি উচ্চ কণ্ঠ ব্যবহার করতেন না। কারো মান মর্যাদার হানিকর কোন কথাবার্তা তিনি কখনই বলতেন না। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখতেন। তিনি বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গত মর্যাদা দান করতেন।

ছোটদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ার্দ্র থাকতেন। গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতেন এবং পরিচিত অপরিচিত সকলেরই সমাদর করতেন।

নাবী করীম ﷺ-এর সব সময়ই প্রফুল্লতা বিরাজমান থাকত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল স্বভাবসম্পন্ন। অপ্রয়োজনীয় কাজ, কথা কিংবা বিষয় বস্তুর প্রতি তিনি মনোযোগ দান করতেন না। স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করতেন, যথা : (১) বাহ্যাড়ম্বরের বাড়াবাড়ি বর্জন, (২) কোন কিছুর আধিক্য পরিহার করে চলা, (৩) অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা। তাছাড়া তিনটি অপ্রীতিকর বিষয় থেকে তিনি মনকে মুক্ত রেখেছিলেন, যথা : (১) গীবত বা পরনিন্দা, (২) অন্যকে লজ্জা দেয়া, (৩) অন্যের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সকল কথাই বেশী বলতেন যে সকল কথায় পূণ্যের আশা থাকত। তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন তখন তাঁর সাহাবগণ এমনভাবে মস্তক অবনত করে নিতেন যে, মনে হতো যেন তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে রয়েছে। নাবী করীম ﷺ যখন কথা বন্ধ করে দিতেন তখন সাহাবীগণ কথাবার্তা আরম্ভ করতেন। নাবী করীম ﷺ-এর উপস্থিতিতে লোকজনেরা কখনই কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। তাঁর উদ্দেশ্যে এক জন কথা বললে অন্যেরা নীরবতা অবলম্বন করতেন এবং তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই কথাবার্তা বলতেন না। কোন প্রসঙ্গ নিয়ে সকলের মুখে হাসি দেখা দিলে তিনিও সে হাসিতে অংশ গ্রহণ করতেন। কোন ব্যাপারে লোকজনেরা আশ্চর্য বোধ করলে তিনি তা প্রকাশ করতেন।

অপরিচিত ব্যক্তি বাচালতাজনিত অত্যাচারের মাধ্যমে কাজ হাসিল করতে চাইলে তিনি ধৈর্যাবলম্বন করতেন এবং বলতেন, 'যখন তোমরা অভাবগ্রস্তদের দেখবে যে তারা আপন আপন প্রয়োজন পরিপূরণের অন্বেষায় রয়েছে তখন তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান কর'। নাবী করীম ﷺ ইহসানের পারিশ্রমিক দাতা ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করতেন না।[1]

খারিজা বিন যায়েদ (رضي الله عنه) বলেছেন, 'নাবী করীম ﷺ আপন আলোচনা বৈঠকে প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা সহকারে কথাবার্তা বলতেন। স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবরণের বাইরে প্রকাশ করতেন না। অযৌক্তিক কিংবা অপ্রয়োজনে কোন কথাবার্তা বলতেন না নীরবতা অবলম্বন করতেন, কেউ কোন অযৌক্তিক কথা বললে তিনি তা থেকে মুখ ফিরে রাখতেন। হাসির প্রয়োজনে তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলতেন না এবং বেশী কথা না বলে অল্প কথাতেই বক্তব্য পরিস্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। হাসির প্রয়োজনে সাহাবীগণও নাবী করীম ﷺ-এর অনুসরণে মৃদু হাসতেন।[2]

সার কথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে সুসজ্জিত ও সুশোভিত সর্ব কালোপযোগী এক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী করীম ﷺ-কে এক অতুলনীয় আদর্শবোধ, একাগ্রচিত্ততা এবং চরিত্র সম্পদে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর সুমহান চরিত্র সম্পদ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]

'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উচ্চমার্গে উন্নীত।' [আল-ক্বলাম (৬৮) : ৪]

নাবী করীম ﷺ-এর প্রতি ভালবাসায় জনগণের অন্তর পরিপূর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু, তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব ও প্রাজ্ঞ পরিচালনাধীন আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের ফলে নাবী করীম ﷺ-এর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখত। তাঁর এ ব্যক্তিমাধূর্যের প্রভাবেই রুক্ষ প্রকৃতির মরুচারী আরবগণ নম্রতাভূষণে ভূষিত হয়ে দ্বীনে ইলাহীতে দলে দলে প্রবিষ্ট হতে থাকেন।

---

[1] কাজী আয়াজ রচিত শেফাগ্রন্থের ১ম খণ্ড ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬ পৃঃ। শামায়েল তিরমিযী দ্রষ্টব্য।

[2] প্রাগুক্ত।

এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখ না করে পারা যায় না তা হচ্ছে, রাসূলে করীম ﷺ-এর অতুলনীয় ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য এবং অনুপম চরিত্র সম্পদ সম্পর্কে ইতোপূর্বে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কয়েকটি উপখণ্ড ব্যতীত আর কীবা বলা যেতে পারে। আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহামানবের ﷺ চরিত্রের রূপরেখা চিত্রায়ণ কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় তা তিনি এ বিষয়ে যতই বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হোন না কেন যেমনটা অসম্ভব এর তলদেশ পরিমাপ করা।

এ পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব ঐ মহা মহিম ব্যক্তিটির পূর্ণত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তা সঠিক পরিমাপ করা যার আবাসিক ঠিকানা মানবত্বের সর্বোচ্চ শিখরে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং আপন প্রভূ পরোয়ারদেগারের নূরে নূরান্বিত হয়ে অসামান্য কিতাব আলকুরআনের অবিকল ছাঁচে নিজ চরিত্রকে তৈরি করে নিয়েছেন।

কবির ভাষায় ঃ....

قاری نظر آتا ہے حقیت میں قرآن

ক্বারী নাযার আ-তা হ্যায়
হাকীকাত মে হ্যায় কুরআন
অর্থ : বাহ্যত কুরআনের পাঠক, প্রকৃত পক্ষে নিজেই কুরআন।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلىٰ آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (عليه السلام) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (عليه السلام) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।'

সফিউর রহমান মুবারকপুরী
১৮ রবীউল আউওয়াল, ১৪১৫ হিজরী
২৬ আগষ্ট ১৯৯৪ খৃঃ

হোসাইনাবাদ
মুবারকপুর আযমগড়
ইউ. পি.

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

পুস্তক নির্দেশিকা

ক্রম	পুস্তকের নাম	লেখক	মৃত্যু	প্রেস	যে সনে মুদ্রিত
১	ইখবারুল কিরাম বি আখিবারিল মাসজিদুল হারাম	শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল আসাদী আল মাক্কী (রহঃ)	১০৬৬ হিঃ	সালাফিয়া প্রেস বানারাস	১৩৯৬ হিঃ
২	আল আদাবুল মুফরাদ	মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ)	৩৫৬ হিঃ	ইসাতম্বুল	১৩০৪ হিঃ
৩	আল আ'লা-ম	খায়রুদ্দীন আল যারকালী (রহঃ)		কায়রো	১৯৫৪ খৃঃ
৪	আল বিদায়াহ্ অননিহা-য়াহ	ইসমাঈল বিন কাসী-র দেমাশক্বী (রহঃ)		আসাসাঅদাহ মিশর	১৩২৩ খৃঃ
৫	বুলূগুল মারা-ম মিন্ আদিল্লাতিন আহকা-ম	আহমদ ইবনু হাজার আসক্বালীন (রহঃ)	৮৫৩ হিঃ	কাইয়ূমী প্রেস কানপুর	১৩২৩ হিঃ
৬	তারীখু আরযিল কুরআন	সাইয়্যিদ সুলাইমান নাদভী (রহঃ)	১৩৭৩ হিঃ	মাআ-রিফ প্রেস, আযমগড়	১৯৯৫ খৃঃ
৭	তারীখে ইসলাম্	আকবার শাহ নাজীব্যাবদী (রহঃ)		মাকতাবা রহমত দেওবন্দ	
৮	তারীখুল উমাম্ অল মুলূক	ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ)		আলহোসাইনিয়্যাহ আল মিসরিয়্যাহ	
৯	তারীখু উমারাবনিল খাত্তা-ব	ইবনুল জাওযী (রহঃ)		আত্তাওফীক্কুল আদাবিয়্যাহ, মিশর	
১০	তুহফাতুল আহ্ওয়াযী	আঃ রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)	১৩৫৩হিঃ/১৯৩৫ খৃঃ	বরকী প্রেস দিল্লি	১৩৪৬/১৩৫৩ হিঃ
১১	তাফসীর ইবনু কাসীর	ইসমাঈল ইবনু কাসীর দেমাশক্বী (রহঃ)		দারুল আনদালুস, বাইরুত	
১২	তাফহীমুল কুরআন	উসতায সৈয়দ আবুল আ'লা মাওদূদী (রহঃ)		মারকাযী মাকতবা ইসলামী	
১৩	তালকীহু ফুহুমি আহ্লুল আসার	আবুল ফার্জ আব্দুর রহমান জাওযী (রহঃ)	৫৯৭ হিঃ	জায়্যিদ বারকী প্রেস দিল্লি	
১৪	জা-মে তিরমিযী	আবু ঈসা মোহাম্মদ বিন ঈসা	২৯৭ হিঃ	কুতবখানা রাশীদিয়া দিল্লী	
১৫	আল্ জিহাদু ফিল ইসলাম (উর্দু)	সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)		ইসলামিক পাবলিকেসেন্স লিমিটেড, লাহোর	১৯৬৭ খৃঃ
১৬	খুলা-সাতুসসিয়ার	ইবনু আব্দুল্লাহ আত্তাবারী (রহঃ)	৬৭৪ হিঃ	দিল্লী প্রিন্টিং প্রেস, দিল্লী	১৩৪৩ হিঃ
১৭	রহমাতুল্লিল আলামীন	মুহাম্মদ সোলাইমান মানসুরপুরী (রহঃ)	১৯৩০ খৃঃ	হানীফ বুকডিপো দিল্লী	
১৮	রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী-যিন্দেগী	ডাঃ হামীদুল্লাহ প্যারেস		সালেম কোম্পানী দেওবন্দ	১৯৬৩ খৃঃ
১৯	আররওযুল উনুফ	আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ সোহাইলী (রহঃ)	৫৮১ হিঃ	আলজামলিয়্যাহ মিশর	১৩৩২ হিঃ

২০	যা-দুল মাআ-দ	হাফিয ইবনু কাইয়ূম (রহঃ)	৭৫১ হিঃ	আলমিসরিয়্যাহ	১৩৪৭ হিঃ
২১	সাফারুত্তাক ভীন				
২২	সুনানুন ইবনু মা-জাহ	ইমাম ইবনু মাজাহ আল কাযওয়ায়নী (রহঃ)	২৭৩ হিৎ		
২৩	সুনানু আবী দাউদ	আবী দাউদ সুলমাইমান আল আশআস আস সাজেসতানী (রহঃ)	২৭৫ হিঃ	মাকতাবা রাহীমিয়াহ দেওবন্দ	১৩৭৫ হিঃ
২৪	সুনানুন মাসায়ী	আহমাদ বিন শুআইব আননাসা-য়ী	৩০৩ হিঃ	মাকতাবা সালাফিয়াহ, লাহোর	
২৫	আসসীরাতুল হালাবিয়াহ	ইবনু বুরহানুদ্দীন (রহঃ)			
২৬	আস্‌সীরাতুন নাবাভীয়্যাহ	ইবনু হিশাম বিন আইয়ূব হিময়্যারী (রহঃ)	২১৩/২১৮ হিঃ		১৩৭৫ হিঃ
২৭	শারহু শুযূরি যযাহাব	আব্‌দুল্লাহ জামালুদ্দীন বিন ইউসুফ ইবনু হিশাম আনসারী (রহঃ)	৭৬১ হিৎ	আসসাআদাহ মিশর	
২৮	শারহ সহীহ মুসলিম	আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়্যাহয়্যাহ বিন শারফ্ আননভবী (রহঃ)	৬৭৬ হিৎ	কুতুবখানা রাশীদিয়া দিল্লী	১৩৭৬ হিঃ
২৯	শারহ মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়্যাহ	আয্‌যারকানী (রহঃ)		অত্যন্ত পুরাতন কপি প্রথমাংশ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়	
৩০	আশশিফা' বিতা'রীফি হুকুক্বিল মুসতাফা	কাযী আয়ায (রহঃ)		মাতবাআহ ওস্‌সানিয়াহ ইসতামবূল	১৩১২ হিঃ
৩১	সহীহ বুখারী	মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ)	২৫৬ হিঃ	মাকতাবা রহীমিয়াহ দেওবন্দ	১৩৮৭ হিঃ
৩২	সহীহ মুসলিম	মুসলিম ইবনুর হাজ্জাজ আল কুশাইরী		কুতুবখানা রাশীদিয়াহ, দিল্লী	১৩৭৬ হিঃ
৩৩	সহীফা হাবক্বূক্ব				
৩৪	সুলহুল হোদাইবিয়্যাহ	মুহাম্মদ আহমাদ বা-শামীল		দারুল ফিকর মিশর	১৩৯১ হিঃ
৩৫	আত্তাবাক্বা-তুল কুবরা	মুহাম্মদ বিন সা'দ		মাতবাআহ বারীল-লীডন	১৩২২ হিৎ
৩৬	আত্তনুল মা'বূদ	শামসুল হক আযীমাবাদী		১ম সংস্করণ	
৩৭	গাযওয়ায়ে উহুদ	মুহাম্মদ আহমদ বা-শমীল		২য় সংস্করণ	
৩৮	গাযওয়ায়ে বাদর আল কুবরা	মুহাম্মদ আহমদ বা-শামীল			১৩৭৬ হিঃ
৩৯	গাযওয়ায়ে খয়বর	মুহাম্মদ আহমদ বা-শামীল		দারুল ফিকর	১৩৯১ হিঃ
৪০	গাযওয়ায়ে বানী কুরাইযাহ	মুহাম্মদ আহমদ বা-শামীল			১৩৭৬ হিঃ
৪১	ফাতহুলবারী	আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী	৮৫২ হিঃ	মাতবাআহ সালাফিয়াহ	
৪২	ফিকুহুস সীরাহ	মুহাম্মদ গাযা-লী		দারুল কিতাব	১৩৭০ হিঃ

				আলআরাবী	
৪৩	ফী যিলালিল কুরআন	সাইয়্যিদ কুতুব		দারুএহয়্যাউত্তুরাস আলআরাবী	
৪৪	আল কুরআনুল কারীম				
৪৫	ক্বালবু জাযী-রাতিল আরাব	ফুঅ-দ হামযাহ		মাতবাআহ সালাফিয়্যাহ,মিশর	১৩৫২ হিঃ
৪৬	মা-যা-খসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন	আবুল হাসান নদভী		মাকতাবা দারুল আরুবাহ কায়রো	১৩৮১ হিঃ
৪৭	মুহাযারা-তু তারীখিল উমাম আল ইসলামিয়্যাহ	শায়খ মুহাম্মদ আল খুযরবিক		আল মাকতাবা আত্তিজারিয়্যাহ মিশর	১৩৮২ হিঃ
৪৮	মুখতাসার সীরাতুর রসুল	মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আননাজদী (রহঃ)	১২০৬ হিঃ	আলমাতবাআহ আসসুন্নাহ	১৩৭৫ হিঃ
৪৯	মুখতাসার সীরাতুর রসুল	আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী	১২৪২ হিঃ	মাতআবাহ সালাফিয়্যাহ মিশর	১৩৭৯ হিঃ
৫০	মাদা-রেকুওানযীল লিন্নাসাফী				
৫১	মিরআ-তুল মাফতীহ ২য় খণ্ড	শায়খ ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী (রহঃ)		নামী প্রেস লক্ষ্ণৌ	১৩৭৮ হিঃ
৫২	মরুজুয যাহাব	আবুল হাসান আলী আলমাসউদী		আশ্শারকুল ইসলমিয়াহ	
৫৩	আলমুসতাদরাফ	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাকিম নিশানপুরী		দায়েরাতুল, মাআ-রিফ আলওসামানিয়্যাহ হায়দারাবাদ	
৫৪	মুসনাদে আহমাদ	ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বাল	২৬৪ হিঃ		
৫৫	মুসনাদে দারেমী	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী	২৫৫ হিঃ		
৫৬	মিশকা-তুলমাসাবীহ	অলিউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আত্তাবরেযী		মাকতাবাহ রহীমিয়্যাহ দেওবন্দ	
৫৭	মু'জামুল বুলদান	ইয়া'কূত আলহামাভী			
৫৮	আল মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়্যাহ	আল কাসতালানী		আলমাতবাআতুশ শারক্বিয়্যাহ	১৩৩৬ হিঃ
৫৯	মুআত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক বিন আনাস আলআসবাহী	৬৯ হিঃ	মাকতাবাহ রহীমিয়্যাহ দেওবন্দ	
৬০	অফাউল অফা	আলী বিন আহমাদ আসসামহুদী			

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

ISBN : 978-984-8766-06-4